পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(নব পর্য্যায়)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৩৪৭
শ্রেণী সং ৭
কলিকাতা।

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

সপ্তম বর্ষ।

প্রথম খণ্ড।

১৩২৯ সনের অগ্রহায়ণ—১৩৩০ সনের বৈশাখ।

কোচবিহার।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
সংখ্যা নং

[illegible] ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	লেখক, লেখিকা	পত্রাঙ্ক
	অ	
অজ্ঞাতে (কবিতা)	সম্পাদিকা	১৭৩
অশ্রুকণা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০৫
	আ	
আঁখি (কবিতা)	সম্পাদিকা—	২১১
আবাহন (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	২
	ও	
ওপারে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অজয়কুমার বসু বি, এ,	৭৩
ও-পারের মেয়ে	শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	২৪১
	ক	
কণিকা	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৭৪
কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি	অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহ এম-এ,	৫৬
	খ	
খোকার ঘুমন্ত মুখের হাসি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	৩৬৫
	গ	
গীত	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	১৬১
গোঁড়ামী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ,	২০২
গ্রন্থ-সমালোচনা—		১৩৫, ৩৯৫
	চ	
চয়নিকা—		
আত্ম সমর্পণ	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত	৩৪
ফুলশয্যা	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত	৩৭
চরকার কথা—	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ,	৭০

বিষয়।		লেখক, লেখিকা	পত্রাঙ্ক
চার্ব্বাক দর্শন		অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল,	৯৮
চার্ব্বাক ও বৌদ্ধদর্শন	”	শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল,	২২১
		জ	
জন্ম অভিশপ্তা	(সমালোচনা)	শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী	১৯৮
জয় জগন্নাথ (গান)		‘ব্রহ্মানন্দ দাস’	২ ৬
জাগরণী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন	১৪৭
		ঢ	
ঢেউ	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	৫৩
		ত	
তৈত্তিরিয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী নাম তৃতীয় বল্লীর আভাসে	(কবিতা)	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী	২৯৫
		দ	
দান	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৯
দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে—		শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ, বিদ্যানিধি	৪, ৭১, ১৩৯, ২৩৩, ২৭৯
দাসী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরসীকান্ত দত্ত	১৬১
দিশারী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত অজয়কুমার বসু বি-এ,	১৩৭
দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানা		শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ,	২৬৫
দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা		শ্রীযুক্ত অশ্রুমান দাশ গুপ্ত এম-এ, বি-এল,	৩১৬
		ন	
নারী প্রচেষ্টা		বঙ্গনারী	৩০৭
নারীসমস্যা		‘সোনার বাঙলা’	৩৫৭
নারীর স্বাবলম্বন		শ্রীমতী অমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৩
নারীর সাহস		মিসেস্ রহিম জেড্ রহিম চৌধুরী	৩১৫
নিবেদন—			১

বিষয়।		লেখক, লেখিকা	পত্রাঙ্ক
নিবেদন	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়	২৮৪
নিভৃত সুখ	(কবিতা)	সম্পাদিকা	২১
নিয়তি—		শ্রীযুক্ত পতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ,	১২৯
		প	
পণপ্রথা	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	২৩৯
পথের গান	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৪৯
প্রকৃতির গান	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২ ৩
প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতায় নারীর স্থান—		শ্রীযুক্ত অশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত এম, এ, বি, এল,	১২২, ১৯০
		ফ	
ফুলশয্যা	(কবিতা)	সম্পাদিকা	২৭৬
		ব	
বক্তব্য			১৮১
বসন্তে পল্লীশ্রী	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	২৬৫
বর্ষ-বোধন	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ	৩১৩
বিধবা	(কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	৩৫৫
বিশ্বাস	(কবিতা)	ঐ	১০৪
বুদ্ধদেবের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম		অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,	২ ৬
বৃন্দাবন	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	৮৩
বৈশাখীবর্ষা	(কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৩৪১
		ভ	
ভারতবর্ষীর ধর্ম্মভাব		শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	২৯৯
ভারতের দুর্ভাগ্য		৺শশীপ্রভা দেবী	৩০৩
ভেরী		শ্রী—	১৬৫

বিষয়।		লেখক, লেখিকা	পত্রাঙ্ক
		ম	
মজ্জমান	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ.	২০১
মরণ আড়াল	(উপন্যাস)	শ্রী—	২৩, ১০৬, ১৮১, ২৪৭, ৩১২, ৩৮৩
মোগল-সন্ধ্যা	(নাটক)	শ্রীযুক্ত অশ্রুমান দাশ গুপ্ত এম-এ বি-এল, ও শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪০, ৮৪, ১৪৯, ২০৬, ২৭৫, ৩৫৪
		র	
রাজতরঙ্গিণী	(কাশ্মীরের ইতিহাস)	শ্রী—	৩৬
		শ	
শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা		শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি	১১৩
শীতের রাতে	(গল্প)	শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার মজুমদার	১৬৯
শুদ্ধিপত্র			২০২
শোক সংবাদ—			১১৮
		স	
সমাজের দাবী		শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ,	৩৬১
সাময়িক প্রসঙ্গ—			৫০, ১৩১, ১৯৩, ২৫০, ৩০৭, ৩৮৯
স্বরলিপি		শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৬২, ২০৯
		হ	
হতাশ্বাস	(কবিতা)	সম্পাদিকা	১০৩
হোলি	(গান)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	২২১
হৃদয় বিলাস	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ,	১০৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল। | ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

—:০:—

'পরিচারিকা'র আজ জন্ম-দিন। জন্ম-দিনে নতুন হয়ে মনে পড়ে—জীবনের কথা, মনে জাগিয়ে দেয় দায়িত্ববোধ। এক এক করে জীবনের ও ওর ছয়টি বৎসর কেটে গেল,—ব্রত উদ্‌যাপনে কর্ম্মের পথে কতটুকু অগ্রসর হতে পারা গেছে ,সাফল্য লাভ হয়েছে কতটুকু, তার হিসাবনিকাশের ইচ্ছা মনে আজ স্বতঃই উদ্রেক হয়, কিন্তু সে ইচ্ছার আর ফল কি,—মূল্যই বা তার কতটুকু! পরিচারিকা যে,—সেবা যার জীবনের ব্রত,—আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে পরার্থপরতাকেই যে মেনে নিয়েছে জীবনের সাধনা,—আনন্দের স্বরূপ, তার আবার কর্ম্মের ফলাফল বিচার! সর্ব্বনিয়ন্তা যিনি, বিধানে যাঁর আগম-নিগম, জন্ম-মৃত্যু, গতি-স্থিতি, সাধনানন্দে সাফল্য সেই বিশ্ববিধাতার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মহীন হয়ে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত,—তাঁর সর্ব্বজয়ী আশীর্ব্বাদভিখারী

হওয়া ছাড়া পরিচারিকার আর অন্য কাম্য কি হতে পারে! হে সত্য, শিব, সুন্দর, অনন্ত! তোমার অফুরন্ত আশীর্বাদ তার জীবনব্রতে অক্ষুণ্ণভাবে অনুক্ষণ বর্ষিত হোক। তোমার আশীর্বাদে তার সর্ব্ব অক্ষমতা, লজ্জা, অভাব অনটন, সকল সঙ্কট সমস্তই তোমারি কর্ম্মসাধনায়, সাফল্যের সুখে. তা'হলে সার্থক হবে। আদিতে উদ্বোধন–মন্ত্রে প্রাণমন প্রজ্ঞা ভক্তিরসে তোমার চরণে কেন্দ্রীভূত করে সে যে প্রার্থনা করেছিল—

"সুন্দর, তুমি লহ লহ মোরে
লহ জীবনের সাধন-ধন,
সুন্দর কর তোমার আদরে
আমার সেবার এ আয়োজন।"

আজ এই জন্মদিনে তার সেই আন্তরিক প্রার্থনা, আত্মনিবেদন—তার জীবনে কর্ম্মানুরক্তি জাগ্রত রেখে সার্থক কর বিশ্ব-বিধাতা!

আবাহন।

—:*:—

মরম-কমল-দল শিহরণ-চঞ্চল,
বিয়াকুল নবরসগন্ধে,
নীরব কুঞ্জে কল-গীতি-ধারা উচ্ছল,
মুখরিত জাগরণ-ছন্দে;
বনতল চঞ্চল, কমল-কান্ত কই?
রুদ্ধ তিয়াস বুকে মধুকর ফিরে ওই!
কুমুদিনী থরথর, পাণ্ডুর শশধর,
সমীরণ মন্থর বন্দে!

এস হে ঘুচায়ে নবকলিকার গুণ্ঠন
তুহিন-পরশ-ভীত কুঞ্জে,
গোপন মর্ম্ম-মধু কর বঁধু লুণ্ঠন
সরম-নিলীম ফুলপুঞ্জে।
হের তরু-মর্ম্মর গুমরে রুদ্ধভাষ,
স্তব্ধ কানন জুড়ি' বেদনার হাহাশ্বাস,—
জাগাও নীরব সুর ঝঙ্কারি' সুমধুর
নব নব সঙ্গীত-গুঞ্জে।

হৃদয়-তটিনী-বুকে প্রেম-গীতি কল্লোল
সিকতা-শয়নে আজি সুপ্ত,
আকুল ঊর্ম্মি-দোলে নাহি হিয়া-হিল্লোল,
অবসিত স্রোতধারা গুপ্ত।—
কোথা গিরি-কন্দর নিরোধি উৎসধার।
শীর্ণা তটিনী জাগে বুকে লয়ে হাহাকার!
ধূ ধূ মরু-বালুকায় পঞ্জর বাহিরায়,
লীলায়িত যৌবন লুপ্ত!

যমুনা শুকায়ে যায়, এস শ্যাম-সুন্দর!
তোল তোল বাঁশরীতে ছন্দ,
পুলক-কম্প্র গীতি মুখরিত অন্তর
প্লাবিয়া টুটাও বালুবন্ধ।

গোপবধূ উন্মন, নয়নে অশ্রু হায়,
বৃন্দাবনের কানু আজি কোন্ মথুরায় ?
ঝরি' পড়ে ফুলদল, পঙ্কিল নদীজল,
ব্রজবাসী ক্রন্দন-অন্ধ !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে ।

——:০:——

বর্ষাকাল ; চতুর্দ্দিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত । প্রাতঃকাল হইতেই মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘরের বাহির হওয়া মহা দায় । রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই চলে, শুধু দু'এক জন মাত্র 'ডুকপা' ভুটিয়া একরাশি বিভিন্ন ক্রমের dilution দুগ্ধের চোঙ্গা স্কন্ধে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল । কর্ত্তব্যের তাড়নে বাধ্য হইয়া এমনি দুর্য্যোগে প্রাতে দশটার সময় বহু কষ্টে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া মিরিক যাত্রা করিলাম । আর্দ্দালিরা কুলীর পিঠে মালপত্র চাপাইয়া আমার অনুসরণ করিল, সহিস ছাতি বর্ষাতি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল । 'জলা-পাহাড়' হইয়া যখন ঘুমএ আসিয়া পৌঁছিলাম তখন ৬ নম্বর নিম্নগামী যাত্রী গাড়খানি 'ফুঁ ফুঁ' শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কার্শিয়ং অভিমুখে যাত্রা করিল । হিলকার্টরোড হইতে বাহির হইয়া সুকীয়াপোখরি কার্টরোড রেল ষ্টেশনের উপর দিয়া সেঞ্চল সুকীয়া পর্ব্বতমালার ধারে ধারে পশ্চিম দিকে সীমানা প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে ।

কার্টরোড ধরিয়া উৎরাই পথে ধীরে ধীরে সুকীয়াপোখরি অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, চতুর্দ্দিকের অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়া কবি কালিদাসের—

"সতোয়নম্রাম্বুদচুম্বিনোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলৈঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥"*

শ্লোকটী বার বার মনে পড়িতে লাগিল ।

'হ্যাট্‌কোটধারী' বাঙ্গালী সাহেবকে জলে ভিজিতে দেখিয়া ভুটীয়া বালকগণ মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছিল । প্রায় বিশ পঁচিশখানি গো গাড়ী ষ্টেশনে চাএর বাক্স পৌঁছাইয়া দিয়া সঙ্কীর্ণ পথটী জুড়িয়া "ক্যাঁক্ ক্যাঁক্" শব্দে সুকীয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, সহিসের আদেশক্রমে ভুটীয়া গাড়োয়ানেরা বলদগুলিকে সংযত করিয়া গাড়াগুলি এক পার্শ্বে সরাইয়া লইল । কোনক্রমে সেস্থান অতিক্রম করিয়া অল্পকাল মধ্যেই ভঞ্জং আসিয়া পৌঁছিলাম । ভঞ্জংএ এক সার পাহাড় শেষ হইয়া অপর একশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে, এনিমিত্তই এস্থানের নাম ভঞ্জং । এখানে একটি 'গোট্' (ডেয়েরী ফারম্) ও দুইটি বনবিভাগের বাংলো আছে, বাংলো দুটিতে দুই জন রেঞ্জার বাবু বাস করেন ।

ভঞ্জংএর পর হইতে কার্টরোডটিকে "মটর সার্ভিসের" উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল । কোথাও ডিনামাইট সাহায্যে পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া, কোথাও অপরপার্শ্বে নীচু হইতে দেওয়াল গাঁথিয়া উঠাইয়া রাস্তটিকে প্রশস্ত করা হইতেছিল । স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল রাস্তা প্লাবিত করিয়া সবেগে বহিয়া যাইতেছিল, ফলে পথটীর কতক অংশ মাঝে মাঝে ধ্বসিয়া গিয়াছিল ।

হঠাৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল, কোথা হইতে এ শ্রুতি-সুখকর স্বর-লহরী উদ্ভূত হইতেছিল কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না ; গ্রীক-উপকথে "সাইরেণ" সঙ্গীতের গল্প স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠিল । শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইতে লাগিল । কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী মোড় ফিরিতেই দেখিতে পাইলাম প্রায় বিশ পঁচিশটী যুবতী একত্র হইয়া রাস্তার উপর 'রোলার' টানিতেছে ও গান গাহিতেছে । কি কোমল তাহাদের কণ্ঠস্বর,—কি প্রাণমাতান সে সঙ্গীতের তান্ ! আজিও যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"Music when soft voice is dead vibrates in the memory." স্ত্রীলোকেরা বসিয়া বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছিল, পুরুষেরা কেহ পাহাড়ের গায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া "ডিনামাইট" পুরিতেছিল, কেহ বা প্রকাণ্ড হাতুড়ির আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিল, বালিকারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলিকে ঝাঁকায় ভরিয়া পিঠে করিয়া বহিয়া আনিতেছিল, মাথার উপরে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতেছিল কিন্তু কুলীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সকলেই আপন মনে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছিল । যুবতীর দল রোলার টানিতে টানিতে মাঝে

মাঝে রমণীসুলভ উদ্দাম হাসিতে দিগন্তমুখরিত করিতেছিল, অন্যান্য স্ত্রীপুরুষেরাও কখন কখন তাহাদিগের সহিত হাসি কৌতুকে যোগদান করিতেছিল। নিকটে ছাতি বর্ষাতি লইয়া "বাইদার" (ঠিকাদারের কর্ম্মচারী) মিস্ত্রীদিগকে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেছিল।

আমাদের দেশের মত এদেশের লোকেরা কুলীগিরিকে নীচ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না। প্রয়োজন বোধ করিলে ব্রাহ্মণ ছেত্রীরা পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষে রাস্তায় মাটি টানা, পাথর ভাঙ্গার কাজ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাহার অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার আছে এমন স্ত্রীলোকও অম্লান বদনে কুলীর কাজ করিতেছে ; নিজে উপার্জ্জনক্ষম থাকিতে ইহারা গৃহে বসিয়া স্বামীর অন্নধ্বংস করিতে বাস্তবিকই ঘৃণা বোধ করে। এ নিমিত্ত এ দেশে দু'চারিটী ভুটীয়া লামা ও দু'একজন রুগ্ন অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায় না।

ধীরে ধীরে চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লেপ্‌চা-জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর আড়ষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছিল, সম্মুখে একটি চায়ের দোকান দেখিতে পাইয়া অশ্বটিকে সহিসের হিল্লায় রাখিয়া দোকানের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। চাওয়ালী আমাকে একটি ছোটখাট সেলামে আপ্যায়িত করিয়া উনানের পার্শ্বে একটি মোড়ায় বসিতে দিল। দোকানে কতকগুলি অর্দ্ধ সিদ্ধ কচু ও মেটে আলু ও চাউলের গুঁড়া নির্ম্মিত "খাজা" নামক পিষ্ঠক বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকও তথায় চা পান করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দু'একজন যে দুইটী যুবতী চা ছাঁকিয়া গ্লাশে গ্লাশে ঢালিতেছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছিল। যুবতীরা তাহাদিগের রসিকতায় "আপ্নি! আপ্নি" শব্দ করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। চাওয়ালীদ্বয় স্মিতমুখে সকলের অভাব পূরণ করিতেছিল, কখনও বা তাহাদিগের সহিত হাসি কৌতুকে যোগ দিতে-ছিল, কিন্তু এত হট্টগোলের মধ্যেও আপনার পাওনাটি ঠিক কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে ভুলিতেছিল না। দৈব বিড়ম্বনায় এখানে চা পান করিতে আসিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। "Adversity makes strange bed pillows" সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অগ্নির উত্তাপে ও এক পেয়ালা সদ্যোষ্ণ চা পান করিয়া বেশ একটু আরাম বোধ করিলাম, চাওয়ালিকে তাহার সহৃদয় আতিথেয়তার বিনিময়ে পুরস্কৃত করিয়া গন্তব্য

পথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে আর একটি সঙ্কীর্ণ পথ উত্তর দিকে চড়াই উঠিয়া চুংটুং চাবাগানের ভিতর দিয়া পুল-বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একটু রৌদ্রের রেখাও দেখা গিয়াছিল। অদূরে পাহাড়ের গায় শাদা শাদা মেঘগুলি শ্যামল সিক্ত তরুরাজির শিরে রজত মুকুটের মত শোভা পাইতেছিল। সদ্যস্নাত পর্ব্বত শিখরগুলিকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর ও অধিকতর নিকটে বলিয়া বোধ হইতেছিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম Church of Scotland Missionary Society হইতে পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে শাদা কাল অক্ষরে বাইবেলের উপদেশগুলি লিখিয়া রাখা হইয়াছে। এক স্থানে এক হাজার ফুট উচ্চ হংসডিম্বাকৃতি একটি সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড উচ্চ-শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই "গুম-রকের" উপর হইতে 'তরাই'এর মনোরম দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেক সাহেব মেম এখানে আসিয়া থাকেন।

রাস্তা হইতে একটি "পাক্‌ডাণ্ডী" সরু চড়াই পথ ধরিয়া গুম-রকে আরোহণ করিলাম। রকের উপরটা চারিদিকে লোহার শক্ত রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখান হইতে তরাইএর দৃশ্য সত্য সত্যই নয়নমনমুগ্ধকর, পর্ব্বত পাদমূলে নিবিড় ঘন বৃক্ষরাজির শিরে অস্তায়মান সূর্য্যের সোণালি কিরণ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল, পার্শ্বে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদটি বনের গায় শুভ্র রজত বেষ্টনীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিয়াছেন দেখিয়া সত্বর "গুম-রক" ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যেই পর্ব্বতের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, আঁধার হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না।

সমতল প্রদেশে ম্লানমুখী সন্ধ্যা ধূসর বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধীর মন্থর গমনে পৃথিবীর বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্ধ্যা গাঢ় তিমির বসনে আবৃত হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এক বিকটাকার দানবীর মত সমস্ত দেশটাকে যুগপৎ গ্রাস করিয়া ফেলে।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলাম, কিন্তু করুণাময় ভগবানের কৃপায় অল্প-ক্ষণের মধ্যেই যখন সুকীয়াপোখরির ডাকবাংলোতে আসিয়া পৌঁছিলাম—তখন কেবল ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সুকীয়াপোখরি। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি বালারুণ সূর্য্যের রক্তিম চ্ছটায় সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের নবীন কিরণ বৃক্ষপত্রে প্রতিফলিত হইয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল, মৃদুমন্দ বায়ুভরে বৃক্ষশাখা সঞ্চালিত হইতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল যেন সমস্ত বনভূমি আনন্দে নৃত্য করিতেছে 'পবন চলিত শাখৈঃ শাখিভি নৃত্যতীব' বৃক্ষ শাখে নানা জাতীয় পার্ব্বত্য বিহঙ্গ আনন্দে কলরব করিতেছিল, দীর্ঘ অদর্শনের পর সূর্য্যদেবকে পাইয়া সমস্ত জীবজগৎ পুলকে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভরে তরুণ তপনকে প্রণিপাত করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সুকীয়া পোখরির বাজার দেখিতে বাহির হইলাম।

সুন্দর সমতল ভূমির উপর বাজার, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সারিবদ্ধ দোকান, মধ্যভাগে হাটের জন্য সারি সারি টীনের চালা ঘর! সওদাগরী, মনোহারী, বেনেতি প্রভৃতি দ্রব্য দোকান গুলিতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন চা, মিঠাই মাড়োয়ারী দোকান, মুদিখানা, ও দর্জ্জির দোকানও রহিয়াছে, এমন কি একখানা ঘড়ি চশমার দোকানও দেখিতে পাইলাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ছোট খাট সহরে যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এখানে তাহার কিছুই অভাব নাই।

বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে পোষ্ট অফিস, থানা, কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মিশনারী স্কুল ও ফরেষ্ট রেঞ্জার বাবুর বাড়ী, উত্তর দিকে মদের দোকান, ও 'গোস্‌খানা' কসাইএর দোকান, উত্তর পূর্ব্ব কোণে পাহাড়ের উপর "পচুই মদ্য জার"এর দোকান।

সুকীয়াপোখরির হাটটি—"দার্জ্জিলিং ইম্প্রুভমেণ্ট ফাণ্ডের" অধীন এনিমিত্ত এখানে পায়খানা, জল নিকাশের নর্দ্দামা ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে ও হাট-খোলাটিকে ঝাঁট্‌ঝুট্‌ দিয়া পরিস্কার রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সুকীয়াপোখরি—আলু ও মাখন ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল, এজন্য নানা দেশীয় মহাজন আসিয়া এখানে অস্থায়ীভাবে বাসা করিয়া আছেন। নেপালের অন্তর্গত ইলাম, তাপলেজুং প্রভৃতি থানার এলাকাধীন গ্রাম সমূহ হইতে পাইকারেরা কুলীর পিঠে আলু বোঝাই করিয়া হাটে লইয়া আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রী পুরুষ শাক সব্‌জী মাখন বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। তাহাদিগের বেশ ভূষা চাল চলন হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এখনও বৈদেশিক

বিলাসিতার হাওয়া তাহাদিগের জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিতে পারে নাই।

শুক্রবারেই সুকীয়া পোখরির বড় হাট, দিনটি বেশ খোলসা থাকাতে প্রায় আটটা বাজিতে বাজিতেই হাটে লোক সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পুরুষেরা অনেকেই হাফ্ প্যাণ্ট, কোট্, সার্ট, গোলটুপি, কেহ কেহ বা জাতীয় পোষাক যোধপুরী ধরণের ঢোলা পায়জামা, কুর্ত্তা, কাপড়ের টুপি পরিয়া আসিয়াছিল, কাহারও কাহারও পায় মোজা ও বুট জুতাও ছিল। স্ত্রীলোকেরা অনেকেই বিচিত্র বসনে সজ্জিত হইয়া হাটে বিক্রী কিনি করিতে আসিয়াছিল। কাহারও পরণে সাধারণ ছিটের রঙিন কাপড়, জামা, উড়ানি, কাহারও বা পেটিকোট, কাল ভেলভেটের জ্যাকেট ও ঘাগড়া, সিল্কের উড়ানি ছিল। দু' এক জনের পায় জুতা মোজাও দেখিয়াছিলাম। ইতর ভদ্র সকলেরই অঙ্গে অল্প বিস্তর স্বর্ণালঙ্কার ছিল, দু' একটি যুবতীর মস্তকের উপর প্রায় চারি ইঞ্চি ব্যাস চক্রাকার সোণার ফুল ছিল।

হাটে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, ব্রাহ্মণ ছেত্রী জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা পরিয়া শাক সব্জী বিক্রয় করিতেছিল, মস্তকের উপরি ভাগে ∞ (ক্রশবো) আকারের খোঁপা বাঁধিয়া নেওয়ার জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা বানিয়াতি দ্রব্যাদি লইয়া বসিয়াছিল, দর্জ্জির দোকানে স্ত্রীলোকেরা কল চালাইয়া সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় সেলাই করিতেছিল।

ওদিকে মদের দোকানের সম্মুখে ভিড় করিয়া স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকারা, ঠেলাঠেলি করিতেছিল। মদ্য ইহাদিগের অতি প্রিয় সামগ্রী, ব্রাহ্মণ, ছেত্রী ব্যতীত, আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদ্য পান করিয়া থাকে। মদের দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটা ভুটিয়া লামা ঘণ্টা বাজাইয়া ভিক্ষা করিতেছিল। তাহার গায়ে বৈরাগীদিগের আলখেল্লার মত একটি ঢোলা লালবর্ণের পশমী পোষাক, মুণ্ডিত মস্তকের উপর সম্মুখভাগে এক সারি কৃষ্ণবর্ণ লোমযুক্ত, চর্ম্মনির্ম্মিত গোলটুপি, ও পায় হাঁটু পর্য্যন্ত "দে-চা নামক চর্ম্মপাদুকা। হাটের মধ্যে আরও দুই তিনটি বৃদ্ধা ভুটিয়া লামানীকে ভিক্ষা করিতে দেখিলাম, তাহারা সকলেই এক স্থানে বসিয়া দক্ষিণ হস্তে অনবরত একটি তাম্র নির্ম্মিত "মানে" ঘুরাইতেছিল।

চূড়াযুক্ত গোলাকার ঢাকনি বিশিষ্ট, তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত নলাকৃতি একটি চোঙ, এবং তাহার নিম্ন ভাগে অতি দক্ষতার সহিত আটকান একটি হাতল। চোঙের মধ্যে

তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধ মন্ত্র লেখা এক টুকরা ভূর্জ্জপত্র, এবং চোঙ্গের তলায় হাতলের উপরি ভাগে পাতলা একখানি গোলাকার তাম্রখণ্ড। ভুটিয়াদিগের বিশ্বাস মানেটি ঘুরাইবার সময় তাম্রখণ্ডটি ঘর্ষণে ঘর্ষণে যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে তাহাদিগের ইহ জন্মের পাপও তত নাশ হইবে। এ নিমিত্ত লামাগণ "গুম্বায়" ধর্ম্মমন্দিরে সদা সর্ব্বদা * "ওঁ মানে পেমে হুম্" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মানে ঘুরাইতে থাকে।

হাটের এক স্থানে খুব জনতা দেখিয়া কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক উত্তেজিত ভাবে "এই ত আমার মেয়ে" "এই ত আমার মেয়ে" বলিতেছে, নিকটে একটি তরুণ যুবতী লজ্জাবনত মুখে হাতের নখ খুঁটিতেছে, পার্শ্বে একটি বিংশতি বর্ষীয় যুবক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হস্তস্থিত বেত্র দ্বারা নিজ পায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মিল, পার্শ্বস্থ একটি ভদ্রবেশধারী পাহাড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, যুবতীটি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ঐ যুবকটির সহিত গোপনে পলায়ন করিয়াছিল।

আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে দেখিয়া লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "ইহাতে বিস্মিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই, গুর্খাদিগের চির সনাতন প্রথা অনুসারে প্রত্যহই এরূপ কতশত যুবক যুবতী প্রেমের দুশ্চেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। যাহারা এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল প্রণয়ীর প্রেমের কুহকে ভুলিয়া গোপনে পলায়ন করে, তাহাদিগের আর পিতামাতার আমন্ত্রণ বিনা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবার অধিকার থাকে না এবং তাহাদিগের আর শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হইতে পারে না। অনেক সময় হাট বাজার করিতে আসিয়া সেখান হইতেই কন্যা নিরুদ্দেশ হয়, হয়ত তাহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। দৈবাৎ কখন সাক্ষাৎ ঘটিলে অথবা সংবাদ পাইলে কোন কোন কোমল হৃদয় পিতা স্নেহপরবশ হইয়া কন্যা জামাতাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগের ললাটে দধি চাউলের "টীকা" ফোঁটা পরাইয়া দেন, এবং কন্যা জামাতা শির নত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে 'ধোক্ দিনু'।" ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্নানাহার করিতে বাংলাতে ফিরিয়া গেলাম। অপরাহ্নে থানায় বেড়াইতে গেলাম, থানায় একজন দারোগা ও একজন

* ঐ মণিপদ্মে ওঁ, কিন্তু সাধারণ লামাগণ পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চারণ করে।

জমাদার থাকেন, সকলেই এতদ্দেশীয়। দারোগা বাবু তখন বন বিভাগের জঙ্গল হইতে বিনা পাট্টায় ঘাস কাটার এক মামলা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, জমাদার বাবু খাসমহলের মণ্ডল ও চা বাগানের চৌকিদারগণের নিকট হইতে জন্ম মৃত্যুর সংবাদ লিখিয়া লইতেছিলেন। এদেশে চৌকিদারী প্রথার প্রচলন নাই সুতরাং প্রতি হাট বারে মণ্ডল ও বাগানের পাহারাওয়ালারাই থানায় আসিয়া এ সকল সংবাদ লিখাইয়া দিয়া যায়।

দারোগাবাবু আমাকে স্মিত মুখে অভ্যর্থনা জানাইয়া হাসিয়া বলিলেন "মামলা মোকদ্দমা মোটেই কিছু নাই শুধু এই ঘাসকাটা কাঠকুড়ান মামলা নিয়ে মিছে দিক্‌দারি। মাঝে মাঝে দু'চারটি মারামারি জখমের মামলা হয় বটে, কিন্তু অপরাধীর সন্ধান মিলা কঠিন। রাগের মাথায় খুক্‌রী বসিয়ে দেয়, আবার হুঁস হ'লেই এক দৌড়ে নেপাল এলাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

তাড়াতাড়ি থানার কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া "জোড়পুখরীর দিকে বেড়াইতে বাহির হইলেন। আঁকা বাঁকা পথ দিয়া প্রায় মাইল খানেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া জোড়পুখরী পৌঁছিলাম। ক্ষুদ্র পাহাড়টির শীর্ষ দেশে সুন্দর একটী নির্জ্জন বাংলো, চতুর্দ্দিক জঙ্গলে ঘেরা। বাংলোতে চারিজন ব্যক্তির উপযোগী খাট বিছানা এবং চৌকিদারের তত্ত্বাবধানে আবশ্যকীয় বাসন পত্র, প্লেট্, কাপ, ল্যাম্প প্রভৃতি আছে। বাংলোতে রাত্রিবাসের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পাব্‌লিক্ ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেণ্টের অফিস হইতে পাশ সংগ্রহ করিতে হয়। বেসরকারী কি সরকারী কাহাকেও বিনা পাশে বাংলো অধিকার করিতে দেওয়া হয় না, কারণ এরূপ আইন না থাকিলে অনেকেই অনিশ্চিত ভাবে আসিয়া বাংলোয় স্থানাভাব নিবন্ধন অনেক সময় বিপদে পড়িতে পারেন। বাংলোর একটি প্রকোষ্ঠে দার্জ্জিলিং জিলার আবকারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম্, এ, পেসে ছিলেন। সাহেবটি ফরাসী পিতা—মাতার সন্তান, এরূপ মিষ্টভাষী, অমায়িক, সহৃদয় সাহেব আমি আর কখন দেখি নাই।

জঙ্গলের মধ্যে হরিণের ডাক শুনিতে পাইয়া সাহেব বন্দুক লইয়া বাহির হইলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও শিকারের সন্ধান পাওয়া গেল না। আঁধার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সাহেবকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া উৎড়াই পথে সত্বর সুকীয়াপোখরি ফিরিয়া আসিলাম।

সীমানা :—পরদিন প্রাতঃকালে সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া বেলা প্রায় ৮ টার সময় সুকীয়াপোখরি ত্যাগ করিলাম। সুকীয়া বাজার হইতে কাটরোড দিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "সীমানা" আসিয়া পৌঁছিলাম।

সীমানাতে আবকারী বিভাগের একটি "পেট্রল হাউস্", সামান্য কয়েকখানি দোকান ও দু'চারজন লোকের বাস আছে মাত্র। এই স্থান হইতেই ইংরাজ অধিকার শেষ হইয়া নেপাল রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ জন্য একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সুবৃহৎ শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ রহিয়াছে, স্তম্ভের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং পশ্চিমে নেপাল। সীমানা বড়ই ভয়ঙ্কর স্থান, খুন জখমাদি ব্যাপার এস্থানে প্রায়ই সংঘটিত হয়। স্থানটি সীমান্তদেশে অবস্থিত বলিয়া এ স্থানের অধিবাসীরা রাজদণ্ডের ভয় করে না, কোন ক্রমে স্তম্ভের অপর পারে পৌঁছিতে পারিলেই অপরাধী নিরাপদ।

স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে এক সারি বাড়ীতে কতকগুলি ভুটিয়ার বাস। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে ফলকের ন্যায় অগ্র বিশিষ্ট কয়েকটি করিয়া সুদীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে, তিন চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ এক হস্ত প্রস্থ এক একখানি বস্ত্রখণ্ডে বৌদ্ধ মন্ত্র লিখিয়া প্রত্যেক কাষ্ঠখণ্ডের সহিত লম্বিত ভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভুটিয়াদিগের বিশ্বাস ইহাতে ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতাগণ গৃহস্বামীর ও তাহার পরিবারবর্গের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

কার্টরোড এই পর্যন্ত আসিয়াই শেষ হইয়াছে, এখান হইতে দুইটি পথ দুই দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে। উত্তরদিকের পথটি জনমানবহীন নির্জ্জন গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া টাম্‌লিং, স্যান্‌ডাকাফু হইয়া ফালেলং বাংলোতে গিয়া মিশিয়াছে। এই ৩৬ মাইল ব্যাপী অপ্রশস্ত বন্ধুর পথে কখন চড়াই কখন উৎড়াই চলিতে হয়, অবিরত দুঃসহ শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ফলুট্ (ফালেলং) যাত্রিগণকে শীতে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পথে হিংস্রজন্তুর উপদ্রবের কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, শীত কালে যখন অধিক পরিমাণে বরফ পড়িতে থাকে তখন উপর হইতে "শোক্‌পা" পরিলা নামিয়া আইসে। দুর্ভাগ্য ক্রমে কখনও এ ভীষণ জানোয়ারের সম্মুখে পতিত হইলে ইহার কবল হইতে পরিত্রাণ

লাভ করা বড়ই সুকঠিন। শোকপা নাকি মনুষ্যের প্রাণ বধ করিয়া তা
অগ্রভাগ ও কর্ণের নরম অংশ মাত্র ভক্ষণ করে।

এই সকল কারণে নিতান্ত দুঃসাহসী ও কষ্ট সহিষ্ণু অর্থশালী ব্যক্তি
ফলুট্ দর্শনে সাহসী হয় না। সচরাচর সেপ্টেম্বর মাসে ফলুট্ যাত্রিগণ
অভিযান করিয়া থাকেন।

পথে টামলিং ও স্যানডাকাফুর ডাক বাংলোতে এক এক রাত্রি অ
তৃতীয় দিনে ফলুট্ পৌঁছা যায়। প্রত্যেক বাংলোতেই প্রায় আট দশ জন
খাট্, গদি আছে, এতদ্ভিন্ন খানসামা, বাবুর্চ্চি ও কুলীগণের জন্যও যথেষ্ট স্থ
রাখিবার নিমিত্ত এক একটি আস্তাবলও আছে। পাকের বাসন, চায়ে
ল্যাম্প, জ্বালানি কাষ্ঠ চৌকিদারের নিকট হইতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন অ
দ্রব্যাদি সমস্তই পূর্ব্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, নচে
দুর্গম অরণ্য প্রদেশে দৈবাৎ কোন দ্রব্যের অনটন ঘটিলে প্রভূত অর্থব্যা
কোন সম্ভাবনা নাই। ভুটিয়া চৌকিদারেরা বাংলোতে সপরিবারে ব
সুদূর সুকীয়াপোখরির শুক্রবারের হাট হইতে নিজ নিজ আবশ্যকীয়
লইয়া আইসে। আশ্বিনের প্রারম্ভ হইতে ফাল্গুনের মধ্য পর্য্যন্ত ফলুট্ ব
থাকে, প্রায়ই জল জমিয়া বরফে পরিণত হইয়া যায়। স্থানটি প্রায় ১
উচ্চ, এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্নিকট বলিয়া শীত অত্যন্ত বেশী, এ নিমিত্ত
নাই, শুধু বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র শিব চতুর্দ্দশীর দিনে এখানে ব
থাকে। ফলুট্, সিকিম, নেপাল ও দার্জ্জিলিংএর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত

মিরিকের পথে—ফলুটের পথ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদিকে মি
হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলাম কয়েক জন
করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং তৎপশ্চাতে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ প্র
"আউড়" বিচালিখড় সঙ্গে লইয়া ওঁ ওঁ, উঁ উঁ শব্দ করিতে করিতে
হঠাৎ শব দর্শন করিয়া মনে মনে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতে
কারিগণের অদ্ভুত ক্রন্দনের স্বর লক্ষ্য করিয়া কারণ অবগত হইবার

হইয়া উঠিলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম মৃত ব্যক্তিটি জাতিতে নেওয়ার, নেওয়ারগণের জাতীয় প্রথা অনুসারে শবানুগমনকারী প্রত্যেককেই শোক প্রকাশ করিতে হয়, এবং নেওয়ারের মৃত দেহ একমাত্র বিচালিখড় সাহায্যেই দাহন করিবার প্রথা।

কিয়ৎক্ষণ পরে লোকগুলি রাস্তা হইতে নামিয়া ঝরণার দিকে চলিয়া গেল, তখন আমি মনে মনে শান্তি বোধ করিয়া গন্তব্য পথ অভিমুখে বেগে অশ্ব চালনা করিলাম। পথটি কখন চড়াই, কখন উৎড়াই ভাবে সীমান্তবর্ত্তী গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষগুলির ঘণপত্রজাল ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া বনের ভিতর সাঁৎসেঁতে, এবং দিনমানেই আঁধার আঁধার মনে হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষগুলিতে অসংখ্য জোঁক পথিকের দর্শন মাত্রেই কিল কিল করিতে থাকে, এবং উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পথিকের পায় আঁকড়াইয়া ধরে। অশ্ব পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া আপনাকে বেশ নিরাপদ ভাবিয়াছিলাম কিন্তু পোষাক ছাড়িবার সময় দেখিতে পাইলাম যে পুরু পট্টি, বুট ও মোজা ভেদ করিয়া এ অদ্ভুত জীব ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক রক্তশোষণ করিয়াছে।

পথে এক স্থানে কয়েক জন "লামা" জাতীয় কুলী প্রকাণ্ড ভারী চায়ের বাক্স পিঠে করিয়া পাহাড়ের গায় ঠেঁস দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ইহারা অত্যন্ত শক্তিশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী, সামান্য একখানি "খুকরী" ছোরা কোমরে ঝুলাইয়া এই সকল কুলীগণ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করে।

গুর্খালিরা ইহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক "সা'য়েনা ভুটীয়া" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে।

এ জাতি গোমাংসের এতই প্রিয় যে ইঁহারা* মৃত বলদের মাংস ভক্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। মুর্ম্মিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন সহোদর একত্র হইয়া শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিবসের নিষ্ফল প্রয়াসের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে মধ্যম ভ্রাতা বিষ্ণু একটি 'গৌরী গাই' (Cow Bison) দেখিতে পাইয়া শরাঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশ্বরকে গাভীর অন্ত্রগুলি ধৌত করিতে ঝরণায় প্রেরণ করিয়া তাঁহারা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন,

* Vide Dr: F. Hamilton's Account of Napal, 1829.

এবং রন্ধনান্তে আপন আপন অংশ অন্তরালে লুকাইয়া রাখিলেন। কনিষ্ঠ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহারা কহিলেন "আমরা উভয়ে ভোজন করিয়াছি, তুমি সত্বর আহার করিয়া লও", সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে মহেশ্বর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনতিবিলম্বে আহার সমাধা করিলেন। তদন্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু আপন আপন অংশ বাহির করিয়া তাঁহাকে গোমাংস ভক্ষণহেতু তিরস্কার করিতে লাগিলেন, ভ্রাতাগণের নীচ ষড়যন্ত্রে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অন্ত্রগুলির দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিলেন, এবং তদবধি লামা, তামাঙ্, ঈশাঙ্, সামাঙ্ প্রভৃতি মুর্ম্মিগণের গোহত্যা করা নিষেধ।

বন অতিক্রম করিয়া যখন চাবাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম তখন বিশ্রাম সূচক "ভোঁ" বাজিয়া উঠিল, অমনি কুলীরা কাজ বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। প্রত্যূষে কাজে আসিবার সময় সকলেই বাটী হইতে ভুট্টার খৈ ও "জার" মদ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম লাভ করিয়া স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা প্রত্যেকে আপন আপন পুটুলি বিছাইয়া জলযোগে প্রবৃত্ত হইল। সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দার বাইদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।

দার্জ্জিলিং জিলার যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই শুধু চা বাগান, প্রত্যেক বাগানে এক এক জন মাত্র শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর ঈঙ্গিতে প্রত্যহ কত শত কুলী যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন চা-করেরাই সমগ্র জিলাটিকে শাসন করিতেছে। আপন আপন বাগানে ম্যানেজার সাহেবরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। সুন্দর বাগান বেষ্টিত চমৎকার বাড়ী, সুসজ্জিত গৃহ, বহুব্যয় নির্ম্মিত টেনিস্ প্রাঙ্গন, দাস দাসী, যান বাহন, কর্ম্মচারী কিছুরই অভাব নাই, সুদূর মফঃস্বলে দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়াও তাহারা সহরের সুখসুবিধা ও বিলাসিতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আবার "ভোঁ" বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার কুলীরা আপন আপন কাজে মনোনিবেশ করিল। বেচারীরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কাজে আইসে এবং প্রায় আট দশ ঘণ্টার অধিক কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া যায়, সমস্ত দিবসের

হাড়ভাঙ্গা খাটুনির উপার্জ্জন শুধু ছয় হইতে দশ পয়সা মাত্র। ইহারা এই যৎসামান্য পারিশ্রমিক লাভ করিয়াই সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে এবং আপন আপন বাসগৃহের অঙ্গনে যৎকিঞ্চিৎ শাক শব্জী উৎপাদন করিয়া উহারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

পাছে চা বাগানের কুলীদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপ অসন্তোষের সৃষ্টি করে অথবা কোন "আড়কাঠি গোপনে প্রবেশ করিয়া কুলী ফুঁসলাইয়া" অন্য বাগানে লইয়া যায়, এ নিমিত্ত বাগানে কোন অপরিচিত আগন্তুক আসিলেই ম্যানেজার মহাশয় তাহার গতিবিধির উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

প্রায় চারি পাঁচ মাইল পথটি চা বাগানের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। পথের দুধারে কোথাও শুধু চা গাছ, কোথাও কলকারখানা গুদামঘর, কোথাও বা কুলীদিগের বাসের নিমিত্ত লম্বা লম্বা টিনের ঘর। প্রত্যেক ঘরে বিশ পঁচিশটি ছোট ছোট কুঠুরী আছে, এবং প্রত্যেক কুঠুরীতে এক একটী কুলী পরিবার বাস করে।

এইরূপ তিন চারি সারি টীনের ঘরগুলিতে এক শত হইতে দেড়শত কুলী পরিবার একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। পাহাড়ী ভাষায় ইহাকে "কুলীধুরা" কহে। এতগুলি কুলীর একত্রাবস্থান হেতু চা বাগানের এলাকাধীন কোন বাটী তল্লাস বা কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে ধৃত করা পুলিশ কর্ম্মচারিগণের পক্ষেও বিপজ্জনক। এ নিমিত্ত এরূপ কোন কার্য্য ব্যপদেশে বাগানের ভিতর যাইতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি ও সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু ইহাতে কার্য্য হানিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কখন কখন আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গভীর রাত্রিতে সদলবলে বাগানে প্রবেশ করিয়া কুলীধুরা হইতে মদ্য চোলাই করার অপরাধে অনেক কুলী ও কুলী রমণীকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে কোন কোন স্থলে দাঙ্গা হাঙ্গামাও ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ বাগানের ম্যানেজার ও কুলীগণ আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে চির শত্রু মনে করেন এ নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও বাগানের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়।

চা বাগান অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে মেচীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রিটিশ ও নেপাল রাজ্যের প্রান্তসীমা ধৌত করিয়া ক্ষুদ্র মেচীর উদ্দাম জলস্রোত নিম্নদিকে ধাবিত হইয়াছে। মেচীর ধার দিয়া আসিতে আসিতে এক স্থানে কতকগুলি লিম্বু জাতীয় লোক একটি গোর খনন করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

দার্জ্জিলিং জিলার সর্ব্বত্র তখন যেরূপ ইনফুলুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রকোপ হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যহ বহু লোক এই ভীষণ ব্যাধির করাল কবলে পতিত হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিতেছিল। নিকটেই দুইটি সদ্য নির্ম্মিত "মানেগুম্পা" স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। স্তম্ভ দুটির উপরে যোগাসীন বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম এ দুইটি কোন অবস্থাপন্ন ভুটিয়ার সমাধি হইবে। নিকটে যে একটি নূতন গোর খোঁড়া হইতেছিল তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একটি "পেঁডাংগ্মা" পুরোহিত কোন অশরীরী আত্মা অথবা কোন দেবতা কি অপদেবতার উদ্দেশে স্তবস্তুতি করিতেছিলেন। লিম্বু "কুরা" ভাষা দার্জ্জিলিংএর প্রচলিত ভাষা হইতে পৃথক্, সুতরাং আমি তাঁহার অঙ্গভঙ্গি ও হস্ত সঞ্চালন ব্যতীত কোন কথারই অর্থবোধ করিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমার সহিসটি লিম্বু জাতীয় হওয়ায় সে আমাকে সকল বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিল।

লিম্বু জাতীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃত দেহকে গোরস্থানে বহন করিয়া আনিয়া পুরোহিতকে একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে হয়। তদ্দ্বারা তিনি মৃতের সমাধির নিমিত্ত তৎস্থানাধিবাসী দেবদেবীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিয়া লন, তখন ঐ স্থানে গোর খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ পুরুষ পক্ষে চারি, স্ত্রী পক্ষে তিন সরি প্রস্তর দ্বারা সাজান হয়। তন্মধ্যে শবটিকে চিৎভাবে শায়িত করিয়া বদ্ধকর হস্ত দু'খানিকে বুকের উপর স্থাপন করা হয় এবং সমস্ত দেহটিকে বৃক্ষ পত্র দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন শ্রেণীর লিম্বুর শিয়রে কখন কখন কাংস পাত্রে একটি রৌপ্য অথবা তাম্র মুদ্রা রক্ষা করা হয়। গোরটি মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করা হইলে পুরোহিত মৃতের প্রেতাত্মাকে সম্বোধন করিয়া মানবের ভাগ্য ও জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করেন, এবং জীবিতগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে পূর্ব্বপুরুষগণের অনুগমন করিতে আদেশ করেন।

তদন্তর পুরোহিত সকলের সহিত মৃত ব্যক্তির গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পান ভোজন করিয়া থাকেন।

মৃতের পুত্রাদি ও অপরাপর ঘনিষ্ট আত্মীয়গণ পুরুষের মৃত্যু হইলে চারিদিন, স্ত্রীর তিনদিন পর্য্যন্ত "জুঠা বাড়িয়া" থাকেন অর্থাৎ এই কয়েকদিন তাঁহারা আমিষ, লবণ, তৈল, মসলা, ডাইল প্রভৃতি আহার করেন না। অশৌচান্তে পুনরায় পুরোহিত ও আত্মীয়কুটুম্ববর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে শূকর মাংস দ্বারা ভোজন করাইতে হয়। ভোজনান্তে তাঁহারা অশৌচ পালনকারিগণকে মাংসাদি ভোজন করিতে অনুমতি দেন, এবং "ফেড়াংগ্মা" পুনঃ মৃতের আত্মাকে সম্বোধন করিয়া তাহাকে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হইতে আজ্ঞা করেন।

মৃতের সৎকার সম্বন্ধে লিম্বুদিগের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন দেখা যায়, কেহ কেহ মৃতদেহ অগ্নিতে সৎকার করে, কেহ সমাধি দেয়, আবার কেহ বা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী দেখা যায়, কেহ বৌদ্ধ, কেহ শৈব, কেহ না কিছুই নয়। যে স্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা অধিকাংশ বৌদ্ধ সে স্থলে ইহারা "ওং মণিপদ্মে ওং" মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া ঘোষিত করে, আবার যে স্থানে চতুর্দ্দিকে হিন্দু অধিবাসীর বাস তথায় ইহারা হর গৌরীর উপাসক। তবে শৈব হউক অথবা বৌদ্ধ হউক "যুমা কাপোবা" ও "থিবা" ইহাদিগের গৃহে দেবতা, সংসারে কোনরূপ ব্যাধি পীড়া ও অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটিলে "আইতাবার" রবিবার ভিন্ন অন্য কোন দিনে গৃহের বহির্ভাগে মহিষ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়া গৃহদেবতার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়। যাহারা হেলা করিয়া গৃহ দেবতাকে পাঁচ বৎসর মধ্যে অন্ততঃ একটি বারেও অর্চ্চনা করে না তাহাদিগের সংসারে নানারূপ বিপৎপাত ঘটে এবং তাহারা বাত ব্যাধিগ্রস্থ (গেঁটে বাত) হয়। সহিসের নিকট লিম্বুদিগের সামাজিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে মিরিকের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পথে এক স্থান হইতে ছোট একটি রাস্তা বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে মেচী পার হইয়া নেপালের দিকে চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাইলাম অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় মিরিক বাজারে আসিয়া পৌঁছিলাম।

মিরিক পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে আবার এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় উঠিয়াছে। বাজারের মধ্য স্থলে এরূপ একটি ছোট পাহাড়, পাহাড়টিকে চতুষ্পার্শে গোল করিয়া দুই সারি হাটের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, হাটের দিন সওদা পত্র ক্রয় করিতে হইলে পাহাড়টিকে অন্ততঃ একবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে একসারি দোকান, দোকান-গুলিতে পল্লীবাসীর উপযুক্ত আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্যাদিই সকল সময়ে পাওয়া যায়।

সুকীয়া অপেক্ষা এখানে মাড়োয়ারী দোকানদারের সংখ্যা অধিক এবং অনেকেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতেছেন। মাড়োয়ারীগণের জাতিগত বস্ত্রব্যবসায় ছাড়াও ইঁহাদিগের চাউল ডাইল প্রভৃতির কারবার রহিয়াছে, তরাইএর অতি উৎকৃষ্ট "নুনীয়া" আতপ ও উষ্ণা চাউল সর্ব্বদা এই সকল দোকানে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

বাজারের উত্তর পশ্চিম কোণে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস। দার্জ্জিলিং জিলার মফস্বলে পোষ্ট আফিসের সংখ্যা অতি বিরল, এবং দু' একটি বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যতীত টেলিগ্রাফ অফিস অন্যত্র কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মিরিকের চতুষ্পার্শ্বে মারমা, সৈরিনী, বোথিম, থারবো প্রভৃতি অনেকগুলি চা বাগানে বহু সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাস করেন বলিয়া এখানে পোষ্ট অফিসের সহিত একটি টেলিগ্রাফ আফিসও খোলা হইয়াছে। বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় তিন চারি মাইল নিম্নে ক্ষুদ্রকায়া মেচী প্রবাহিত হইতেছে, মেচীর অপর পারে বিশাল পর্ব্বত যেন স্বাধীনতাগর্ব্বে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত তরাইএর মনোরম দৃশ্য, পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র তড়াগ। তড়াগের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ঘাস জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কেবল দু'এক স্থানে জল পাওয়া যায় মাত্র। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে এখানে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তখন তড়াগের জল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, যে সামান্য পঙ্কিল জল অবশিষ্ট থাকে লোকে উহাতেই স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত করে এবং ঐ কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া থাকে।

তড়াগটির অবস্থা পূর্ব্বে এরূপ ছিল না; এক সময়ে নাকি ইহা সুন্দর স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ থাকিত, এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হংসরূপ ধারণ করিয়া সহচরীর সহিত তড়াগের সলিলে আনন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেন। মিরিকবাসীর দুরদৃষ্টক্রমে একদা একটি সাহেব

হংসদম্পতির প্রাণ হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তদবধি দেবতা এ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে তড়াগটিও এ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

এ কিংবদন্তীর মধ্যে কোনরূপ সত্য নিহিত আছে কিনা জানি না, তবে এককালে যে তড়াগটি বেশ জলপূর্ণ ছিল তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহার সহিত দু'একটি ঝরণার সংযোগ ছিল, কিন্তু মিরিক বাজার নির্ম্মিত হইবার সময় কোনক্রমে হয়ত সে জল প্রবাহের গতি রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তড়াগটি জলহীন হইয়া গিয়াছে।

মিরিকের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পানিঘাটা রোডের নিম্নে "কালীখোলা" "শ্বেতীখোলা" নামে অতি ক্ষুদ্র দুইটি ঝরণা পাশাপাশি প্রবাহিত, যখন দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয় তখন লোকে উক্ত দুই "খোলা" হইতে জল লইয়া আইসে।

বাজারের উত্তরপূর্ব্ব কোণে কতকগুলি লোকের বাস, তন্মধ্যে একটি গৃহের নীচতালায় "কসাইখানা"। হাটের দিন প্রাতে কসাইখানার বীভৎস্য দৃশ্য দর্শন করিলে চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়।

কসাইখানায় একটু উপরে পানিঘাটা রোডের ধারে আবকারী বিভাগের একটি "পেট্রলপোষ্ট" একজন জমাদার ও চারিজন সিপাহী বাস করে। পানিঘাটা রোড দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বামদিকে মাঠের ভিতর কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই উত্তরদিকে ছোট একটি পাহাড়ের উপর "পুলিশ পেট্রলপোষ্ট" ও দক্ষিণদিকে আর একটি পাহাড়ের উপর সুন্দর ডাকবাংলা। যখন বাংলোয় পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যদেব পাহাড়ের অপর পারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

নিভৃত সুখ।

—:*:—

বঁধু তুমি কি বুঝিবে তোমার কি রূপ ?
যদি দেখিবারে চাও আপন স্বরূপ
এস তবে আজি আমার প্রাণের
গভীর অন্দরে ;

সেথা বিশ্ব আমার অপলক আঁখি
মুগ্ধ নেত্র শ্রীচরণে রাখি
যুগ যুগান্ত দেখিছে আমার
প্রেমিক-সুন্দরে !

সেথা আমার গগন জলধির নীলে
শিহরি উঠিছে প্রণয় সলিলে
লেপিয়া দিয়াছে অঙ্গ তাহার
নীলের অঞ্জনে,

দিবস আমার পীত-অম্বর
জড়ায়েছে তার তনু সুন্দর ;
রজনী আমার নয়নে রেখেছে
নয়ন রঞ্জনে !

আমার জন্ম মরণের সুর
রচিয়াছে তার পায়ের নূপুর
তাহার যুগল চরণ ঘেরিয়া
নিয়ত গুঞ্জরে,

আমার বুকের রক্ত লালিমা
মুছাইয়া তার পায়ের কালিমা
রক্ত রাগের রক্ত-কমল
চরণে মুঞ্জরে !

এ মোর পূর্ণ যৌবন ভার
ধন্য হয়েছে অঙ্গে তাহার
লেপিয়া রয়েছে গন্ধ আকুল
শুভ্র চন্দনে,

বুকের পুলক ঝুলন ঝোলায়
প্রণয় তাহারে গোপনে দোলায়,
চুম্বন সুধা অধরে ছোঁয়ায়
সোহাগ নন্দনে !

আমার হৃদয় তনু মন প্রাণ
বাজিতেছে তার বাঁশীর সমান
অধরের ছায় নাচিছে তাহার
প্রণয় মন্তরে,

ওগো এস তুমি এস বন্ধু সুজন
নিভৃতে শুনাব প্রাণের কূজন
নিভৃতে দেখাব প্রেমের পূজন
নিভৃত অন্তরে !

মরণ আড়াল।

—:o:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি একটা। দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর প্রকাণ্ড পুরীটার অধিবাসীবর্গ সুপ্ত! কেবল আমরা কয়েকটি প্রাণী,—হুকুমের দাস, তখনও জাগ্রত, প্রেতপুরীর পাহারায় নিযুক্ত! বন্ধনের উপর বন্ধন, অবরোধের উপর অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াও প্রভুদের সোয়াস্তি নাই—পাহারার উপর পাহারা,—প্রহরে প্রহরে অনুসন্ধান, হাঁক ডাক। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই কাহারও প্রতি; সাধ্য নাই কাহারও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া একপদ অগ্রসর হয়; অন্যের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, কথাবার্ত্তা বলে, শাসন এখানে এমনি কড়া! এমনি কঠিন নিয়মে সকলই বাঁধা! সে নিয়ম পালনে প্রাণ যায় আর থাকে, তাহা দেখিবার নিয়ম নাই, আছে কেবল পদে পদে নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ, আর তাহার জন্য বিনা বিচারে অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন! মন বলিয়া যে কোন বস্তু এখানকার অভিশপ্ত অধিবাসীদের থাকিতে পারে, তাহা কর্ত্তাদের ধারণার অতীত। মানুষ এখানে এতই তুচ্ছ, এমনি হেয়! পশুর অধম! পশুর প্রভুরও প্রাণ আছে, পালিত জীবের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি আছে, দয়ামায়া আছে! এ প্রেতপুরীর প্রভুদের আনন্দই পরপীড়নে,—দলিয়া পিষিয়া 'কাজ' লওয়াই ইহাদের পরম ও চরম লক্ষ্য! এ হেন নরকের পাহারা আমরা, নিজ মুখে আত্মপরিচয় দিবার 'মুখ' আছে কি! ছি! ছি! নিজের অবস্থা ভাবিতে নিজেই লজ্জায় মরিয়া যাই। হৃতনামা নম্বরের দাগে পরিচিত হতভাগ্য আমরা! আমাদের আবার পরিচয়! আমাদের জীবন-কথা আবার বলিবার! বলিলে শুনেই বা কে, কে'ই বা তাহার বিচার করে! আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কে অন্যের চক্ষে নিজকে হেয় অপরাধী করিবে! বাঙ্গলায় ত তেমন কাহাকেও দেখি না। যে বাঙ্গালী গৃহের পরমাত্মীয়ার সত্য মিথ্যা কলঙ্ক-কথা কোন প্রকারে প্রচারিত হইলে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে, প্রত্যয় নাও হয় যদি তথাপি বিনা বিচারে সতীকে পরিত্যাগ করিতেও

পারাঙ্মুখ হয় না, সে দেশে আমাদের মত নরকবাসীর জীবন-কাহিনীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া অপরাধ নিরপরাধের নির্দ্ধারণ কে করিবে! বিচারে অবিচারে, ন্যায় বা অন্যায়েযে ভাবেই হ'ক না কেন, এ রৌরবে একবার নিক্ষিপ্ত হইলেই সে ব্যক্তি বিচার আচারের বহির্ভূত মানুষের সহানুভূতির অতীত, তাহার সুখ শান্তি, ধর্ম্মাধর্ম্মের চিরসমাধি, মানুষ তখন প্রেত, নরের ত্রাস—সমাজের কলঙ্ক! মনুষ্যসমাজ হইতে তখন তার প্রাপ্য কেবল লোকলজ্জা, তীব্র ঘৃণা, আর এই দোর্দণ্ড প্রতাপ নরকের প্রভুদের হস্তে অসহ্য তাড়না! আজ নয় বৎসর আমি এই নরকে! ওগো! এখন আর ও-সকল ঘৃণা টিট্‌কারীকে ভয় করি না; অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ও-সমস্ত বহু পূর্ব্বেই মানিয়া লইয়াছি। জীবনের সুকুমার বৃত্তি, মনুষ্যোচিত প্রবৃত্তি অনেক দিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন আমি এই নরকের বিকট আনন্দেই সুখী, এ পশু-জগতের পাশবিক কার্য্যকলাপে কৃতিত্ব দেখাইয়া আমার এই নারকীয় জীবনে, নারকীয় বিধানে প্রমোশন,—উন্নতি হইয়াছে। আমি প্রেত হইতে প্রেতের পাহারার পদে উন্নীত হইয়াছি। দিবসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, রাত্রে সটান দাঁড়াইয়া জাগরণ—তবুও অন্যের তুলনায় আমি সুখী, গণ্যমান্য! প্রভুদের পায়ের পয়জারের ধূলার অধম হইলেও দুর্ব্বলের উপর আমার অসীম প্রতাপ,—কণামাত্র স্বাধীনতাহীন জীবনে পরপীড়নের স্বাধীনতা লাভেও এত আনন্দ! ত্রপণেয় কলঙ্কের টীকা,—রৌরবের চিহ্ন আমার এখন গৌরবের! এখনও কি মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে আমি কে? কোথায়? সে স্থানে পাছে পতিত হইতে হয় বলিয়া, তোমরা সাধুজন সর্ব্বদা ভীত,—কোন গুরুতর অপকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে স্থানের নাম একবার স্মরণে না আসিয়া যায় না,—স্মরণ মাত্র ভয়ে ত্রাসে ঘৃণায় মানুষ কুকর্ম্ম হইতে ঘুরিয়া দাঁড়ায় সেই স্থানে এই গভীর রাত্রে একা—প্রাণহীন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত পাহারায় আমি নিযুক্ত! পরিচয় প্রমাণ আমার কার্য্যই,—আর ভনিতায় ঢাকিয়া কি করিব—লজ্জায় "ল" জীবনে আছে যে লজ্জা করিব! অপরাধী আমি—জেলের কয়েদী আমি—প্রেতের প্রেত পাহারা কন্‌ভিক্ট-ওয়ার্ডার! ওয়ার্ডারীতে সুখের সীমা নাই,—দিনে খাটিয়াছি—রাত একটা—শরীর অবসাদে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে—তবুও, তখনও 'ডিউটী' দিতেছি,—পশুর অধম পরাধীন নই কি আমরা!

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া "বিপদের ঘণ্টা" বাজিয়া উঠিল! বিপদ! এ মহা বিপদসঙ্কুল স্থানে নতুন করিয়া বিপদ আর কি হইতে পারে! এ বিপদ অধিবাসীবর্গের ব্যক্তিগত বিপদ নহে—তাহা ত এখানে নিত্য ব্যাপার,—গ্রাহের মধ্যেই নয় তাহা প্রচারের যোগ্য নয়—গোপন করিবার। এ বিপদ সাধারণের,—সকলের—জেলটায়—তাই এ ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি,—বিপদের প্রচার। সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল "আগুন আগুন" চীৎকার! জেলের কোন স্থানে তাহা হইলে আগুন লাগিয়াছে! চাহিয়া দেখিলাম চট-গুদামের দিকটা আলোকে উদ্ভাষিত! তাহা হইলেই হইয়াছে! চট-গুদামের পার্শ্বেই রেড়ীবীজের গুদাম, তাহাতে আগুন লাগিলে আর রক্ষা নাই! বাঁধা পশুর মত কক্ষরুদ্ধ কত কয়েদীকে পুড়িয়া 'ভা' হইলে প্রাণ হারাইতে হইবে! মানুষ মরিবে তবুও ইহারা কখনও এতগুলি কয়েদীকে এত রাত্রে কক্ষের বাহিরে ছাড়িয়া দিতে সাহসী হইবে না।

একবার মনে হইল আগুন নিভাইতে ছুটি! এরূপ বিপদে ওয়ার্ডারের সে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কি করিয়া কক্ষবদ্ধ এতগুলি কয়েদীকে ছাড়িয়া পলাই,—জানি না কখন কোন নিয়মের কোন ব্যাখ্যা,—হয় ত আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগের অপরাধে অপরাধী হইলেও হইতে পারি! স্থান পরিত্যাগ কয়েদীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ—শাস্তি তার ভয়ানক! অধীনতা আর অপরাধ লইয়াই কয়েদীর জীবন! সে কথা এতদিন অভ্যাস বশে বড় মনে উঠে নাই! মন এতই মুসড়িয়া গিয়াছে,—ধারণাই আসে নাই যেন কয়েদীর জীবন আবার অন্য প্রকার হইতে পারে! নিয়ত আশে পাশে তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় লোককে নির্ম্মম ভাবে নির্য্যাতিত হইতে দেখিয়া তাহার তুলনায় নিজকে সৌভাগ্যবানই মনে হইয়াছে। ভুলিয়াও ভাবিতে পারি নাই কত অসহায় আমরা—জীবনের আমাদের মূল্য কত কম,—ইচ্ছা অনিচ্ছা আমাদের কিছুই না। ইহারা বাঁচাইলে বাঁচি মারিলে পশুর মত মরিতে হয়, তাহাতে 'না' শব্দটি করিবার অধিকার নাই! কথা কয়টা মনে উঠিতেই শরীর শিহরিয়া উঠিল! কি ভয়ানক! ইহারা না ছাড়িলে এ বিপদেও আত্মত্রাণের উপায় নাই! মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াও কি মানুষ এমন পরাধীন হইতে পারে। কেন? ভগবানের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ—সে কি কখন বুদ্ধি বিবেচনাহীন পশুতে পরিণত হইয়া এমন ভাবে প্রাণটার জন্যও পরপ্রত্যাশী? আর না—এ নরকে আর না! যেরূপেই হ'ক এ স্থান

পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সংশোধনের জন্য ন্যায় বিচারক পাঠাইয়াছেন এখানে,—আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিপদগামীকে সুপথে ফিরাইতে ? বিচারক ! বেশী নয় একটা দিন কয়েদী জীবন গ্রহণ করিয়া দেখ, তোমার এ সংশোধন যন্ত্র কিরূপ ভীষণ ! কাজ কর্ম্মে, স্নান আহারে, এমনকি শৌচে পর্য্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া সংশোধন ! সংশোধন না দ্রুত অধঃপতনের যন্ত্র যে জেল ! যদি শুভ ইচ্ছায়,—অপরাধীর সংশোধন উদ্দেশ্যে এ রৌরবে নিক্ষেপ করিয়া থাক বিচারক ! সে উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ ! তোমার শুভ ইচ্ছার মানা—ধর্ম্মাধিকরণের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলেই আমাকে এ মুহূর্ত্তেই এ নরক ত্যাগের চেষ্টা করিতে হইবে ! দশটী বৎসরের জন্য এ অদ্ভুত সংশোধন আগারে পাঠাইয়াছিলে, দীর্ঘ নয়টী বৎসর তাহার অতিবাহিত, উন্নতিও হইয়াছে আমার অনেকখানি—মনুষ্য নামের অযোগ্য—প্রকৃ ই প্রেতে পরিণত হইয়াছি; রেমিশন নিয়মে আর একটি মাস পরেই আমার মুক্তি, মুক্তিই বটে কিন্তু একটা মাস কেন আর একটা মুহূর্ত্তও এ নরকে নয়, আত্ম অবস্থা মনে পড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে !

বিধাতার কৃপায় সুযোগ উপস্থিত ! উপর হইতে আদেশ আসিয়াছে, দেবতার সঙ্কেত আমি অবহেলা করিব না—জীবন যায় সেও ভাল জেল পরিত্যাগ আমাকে করিতেই হইবে। এক মাস পরে মুক্ত স্বাধীন হইবার অপেক্ষায় না থাকিয়া আজই আমি জেল পলাতক দুর্দ্ধর্ষ নামে অভিহিত হইব। সে ইচ্ছা আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে, দেরী আর সহ্য হয় না—এ সুযোগ-মুহূর্ত্ত যে অধিকক্ষণ থাকিবেনা !

জেলের সমস্ত আমার জানা শুনা,—ওয়ার্ডাররূপে পুরাতন কয়েদীর কোথায় এ দিবসে যাওয়ায় বাধা নাই। আমার ওয়ার্ডের পরেই জেলের গোশালা—ডেয়ারী সেই পথে পলায়ন করা স্থির করিলাম ! সঙ্কল্প স্থির, বিলম্ব নয় আর এক মুহূর্ত্ত। বাহির হইয়া পড়িলাম, আমাকে বাধা দিবার তখন কেহই ছিল না। ওয়ার্ডারগণ বিপদ স্থলে বিপদের আহ্বানে ছুটিয়া ছিল ! ভগবানের নির্দ্দেশে আজ, আমার ছুটির দিন। জেলের অভ্যন্তরে প্রাচীর বহিপ্র্রাচীরের মত অত উচ্চ নয় অতিকষ্টে বারংবারের চেষ্টায় তাহা অতিক্রম করিয়া গোশালা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। গোশালার পূর্ব্ব পার্শ্বে বহিপ্র্রাচীর। গোশালার ড্রেন প্রাচীরের তলদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লৌহ শিক

এমন ভাবে বসান যে তাহার ভিতর দিয়া লোক যাতায়াত একবারে অসম্ভব। গোশালার লৌহ রেলিং সাহায্যে ড্রেনের সে শিকগুলি সরাইয়া সেই পথে পলায়ন করিলাম !

জেলের ভিতরে তখনও আগুন জোর জ্বলিতেছে,—সোরগোল—চীৎকার সমভাবে চলিয়াছে। জেলবাগানের দক্ষিণ দিকে পুকুর,—কয়েদীর সারি বসাইয়া তাহা হইতে বালতীতে বালতীতে জল হাতে হাতে লইয়া চটগুদামে ঢালা হইতেছে। পুকুরের দিকে উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া সমস্ত অনুমান করিয়া লইলাম। আর মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী করা নয় ! জেল প্রাচীরের বাহিরে নিশ্চয়ই পুরাতন বিশ্বাসী কয়েদী দ্বারা সারি বসান হইয়াছে,—হয়ত সেই জন্যই আমারও খোঁজ পড়িবে বা এতক্ষণ পড়িয়াছে। ছুট, ছুট, ছুট ! বাহিরে ঘোর অন্ধকার ! নিকটের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। নয় বৎসরের অধিবাসী আমি ! অন্ধ হইতামও যদি, তথাপি আমার চলাফেরার বাধা হইত না ! রুদ্ধশ্বাসে জেলের বাগান অতিক্রম করিলাম ! তাহার পরই একটা ছোট মাঠ,—তাহার পর লোকের বসতি। লোকালয় ! মনে হইতেই প্রাণটা আঁৎকাইয়া উঠিল ! আমি যে লোকালয়ে প্রবেশের অযোগ্য। এ বেশে আত্ম-গোপন সম্পূর্ণ অসম্ভব ! যে দেখিবে তখনই সে এ হতভাগাকে পাকড়াইবে,—আবার জেলে নরকে পুরিবার ব্যবস্থা করিবে,—পলাতক কয়েদী,—ফেরার জগতে কাহারও নিকট সহানুভূতি আশা করিতে পারে না ! মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে তল্প করে !

কতক্ষণ যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছি, তাহার ধারণা নাই; সহর সীমা অতিক্রম করিয়া পল্লীপথে ছুটিতেছি,—শরীর ক্লান্ত—ঘর্ম্মে আবৃত হইয়া গিয়াছে, তীরের মত ছুটিবার প্রবৃত্তি আমাকে তখনও পরিত্যাগ করে নাই। পথ বিপথের জ্ঞান নাই, কেবল সম্মুখ দিকে দৌড়াইতেছি ! ক্রমে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম; জানি এ রাস্তা গোঁসাইগঞ্জ হইয়া 'ম' সহরে গিয়াছে ! গতি রোধ করিলাম ! এখন যাই কোথায় !

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ! অন্ধকার ! প্রিয়তম বন্ধু আর ঘণ্টাখানেক জোর আমাকে তোমার মসীময় বক্ষে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে ! তারপর ! আমার উপায় ! আবার সেই জেলে,—সেই নরকে—তবে আর হইল কি ! কেন ভগবান ! তাহা হইলে আমার বক্ষে কেন স্বাধীনতার মাদকতা ঢালিয়া দিলে ? একমাস পরেই ত আমি জেলের

বাহির হইতে পারিতাম,—সে সময়টা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে কেন দিলে না প্রভু! জেলে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিবার জন্যই কি? না—কিছুতেই তাহা নহে,—কতবার ওয়ার্ডারদের কার্য্যসরবরাহে একা জেলের বাহিরে আসিয়াছি, তখন ত পলায়নের প্রবৃত্তি মনে জাগে নাই, আজকার এ পলায়নে তোমার ঈঙ্গিত নিশ্চয় আছে দেবতা।

মনটা একটু হাল্কা বোধ করিলাম।

ভোর হইয়া আসিয়াছে। শাখীতে বসিয়া বিহঙ্গমকুল সুস্বরে নির্জ্জন মাঠ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে! সে সঙ্গীতেও স্বাধীনতার সুর—অবাধ উন্মুক্ত জীবনের গৌরব-গাথা! সে সুমধুর সুর আমাকে মুগ্ধ করিল—কিন্তু শান্তি দিতে পারিল না! স্বাধীনতা! সে যে আমার জীবনে স্বপ্নাতীত স্বপ্ন!

এখন কি করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল হওয়া যায় সেই ভাবনায় আমি অস্থির! আলোক তোমাতে পুলোক, পবিত্রতা কোথায়? অন্ধকার! আশ্রয় দাও আমায়।

অদূরে একটা বাবলা বন। বাবলাগাছের চতুর্দ্দিকে উলুখড় বেশ বড় বড় হইয়াছে—দিবসের জন্য তন্মধ্যে আশ্রয় লইব স্থির করিলাম। একবার মনে হইল যদি এখানেও ওরা আমার অনুসন্ধানে আসে,—কয়েদী আর বন্য জন্তু একই,—তার সন্ধান বনে হওয়াই স্বাভাবিক! ভীত হইলাম কিন্তু উপায়ান্তর খুঁজিয়া পাইলাম না,—উলুবনে উপর হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

বেলা প্রহরে প্রহরে বাড়িয়া চলিল। খড়ের মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে না! এক একবার একটা শব্দ হয়, আর মাথা একটু উঁচু করিয়া খড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখি—ব্যাপার কি! ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে সাহসে কুলায় না! মনে কত আশঙ্কা—পদে পদে সন্দেহ! অসহ্য কষ্টে, উদ্বেগে দিনটা প্রায় কাটিয়া গেল! সন্ধ্যা হয় হয়—একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম,—মোটর সাইকেলের শব্দ! শব্দ ক্রমেই স্পষ্টতর হইতে লাগিল। যাক্—এমন সময় সাধ্য নাই ও-সাইকিলিষ্টের আমাকে আবিষ্কার করে! তবুও মাটীর সহিত মিশিয়া আত্ম-গোপন করিলাম—সাবধানের মার নাই।

‘ফট্ ফট্ কটাস্’—একটা বিকট শব্দ হইয়া শব্দের শেষ! আমার বুঝিতে বাকী থাকিল না—ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল,—নিশ্চয় সাইকেলের দফা রফা!

সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে গোপন-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—উলু খড়ের মধ্যে নিজকে লুক্কায়িত রাখিয়াই মাথা তুলিয়া দেখি—আমার অনুমান সত্য!—সাইক্লিষ্ট্ ভদ্রলোকটি চাকায় নতুন টায়ার পরাইতে পরাইতে গলদঘর্ম্ম হইতেছেন!

ভয় বলিয়া বস্তু আমার প্রথম জীবনে ছিল না। অবস্থা আমাকে এরূপ কাপুরুষ করিয়াছে! ভদ্রলোকটির অবস্থা দেখিয়া মনে হইল—গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করি। পলাতক কয়েদী আমি, সে ইচ্ছায় সার্থকতা কি! লোকটা পাছে আমাকে ধরাইয়া দেয়! মানুষে বিশ্বাস আমি হারাইয়াছি—জানি, জগতের কেহই আমাকে বিশ্বাস করিবে না—আমিও নিঃসঙ্কোচে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না!

মনটা কিন্তু মানিল না, মনে যে তখন স্বাধীনতার হাওয়া—যতটুকুই হ'ক—আসিয়া লাগিয়াছে—মনুষ্যত্বকে—পরোপকার প্রবৃত্তিকে আর কি তখনও ঠেলিয়া দূরে রাখা চলে! তাও যদি না হইল তবে জেল ভাঙ্গিয়া এ পলায়নের মূল্য কি—কি সার্থকতা!

মস্তক উত্তোলন করিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম—লোকটি হৃষ্টপুষ্ট হইলেও আমা অপেক্ষা বলিষ্ঠ নয়,—এই দ্বিতীয়-জন-হীন প্রান্তরে আমার অনিষ্ট করিবার সাধ্য ওর একার নাই।

ধীরে ধীরে রাস্তার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। অকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশাকেই সাহায্য করতে পারি কি?"

যুবকটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন—এক গাল হাসিয়া বলিলেন—"ভালো ভালো—বন্ধু তুমি এখানে! সহর যে তোমার খোঁজে তোলপাড়! জেলে আগুন তোমার না কি কীর্ত্তি! যা'হোক্ কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে এক জন তুমি! সরকারী জেলে লঙ্কাকাণ্ড যে সে কথা!"

বলিলাম "সে আলোচনাটা না হয় পরেই হবে—ধরিয়ে দিতে হয় ধরিয়ে দেবেন—সন্ধ্যা যে হয়ে এল—টায়ারটা বদলান একা ত সহজ নয়।

যুবক মাথা নাড়িয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, সে হাস্য পুরা পাঁচ মিনিট—তার পর আমার হাতটা টানিয়া ধরিয়া ঝাঁকির পর ঝাঁকি দিয়া বলিলেন "ঠিক ঠিক—টায়ারটার বিধি-ব্যবস্থা হতে আর বাধা কি! দুই-দুইটা জোয়ান মরদ থাকৃতে তা'তে আর

মুস্কিল দেখছি না—মুস্কিল-আশান—সব ব্যবস্থাই আগে হতে করে রাখা হয়েছে! নতুন টায়ার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে—সাহায্যকারীও মিলেছে—বস্!”

আমি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলাম—“তারপর।”

তিনি বলিলেন—“তারপর—পলায়ন! না—তোমার জেলে ফিরে গিয়ে অন্য একটা কাণ্ড বাধাবার ইচ্ছে আছে?”

বলিয়া উঠিলাম—“বিলক্ষণ! ধরিয়ে দেবেন না কি? ভালই ত!”

“চাকাটা ধর ত আগে,—তারপর দেখা যাবে কোন্‌টা, ভাল,—কোন্‌টা মন্দ!”

মিনিট পনেরর মধ্যে সাইকেলটা মেরামত হইয়া গেল। যুবক সাইকেলে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “এবারে সাইড্‌কারে ঝাঁ করে উঠে বসো ত বন্ধু। যতটুকু এগিয়ে দিতে পারি!”

দ্বিধা তখনও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের কথা রহস্যচ্ছলে ব্যক্ত করিয়া বলিলাম—“কোন দিকে? কারে ওঠা মানে ত মশায়ের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।”

যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন “বলিহারি দাদা, নৈলে কি জেলে একদম লঙ্কাকাণ্ড!—সেখানে সীতাও নেই, সরমাও নেই, নিছক রাবণের দরবার! তাদেরও দাগা দিয়ে এসেছ বাবা—তুমি করবে আত্মসমর্পণ! তা হলে বল যাচ্ছ না??”

পলায়নের এ সুযোগটা ছাড়িয়া দেব,—কিছুতেই নয়, বলিলাম “যাব না বল্‌তে গেলাম কেন! চল্‌তে হবেই,—বলেছেন এগিয়ে দেবেন—পেছনে না ফেরেন সেই সন্দেহ হওয়াটা এ অবস্থায় আমার অস্বাভাবিক নয়।

যুবক তখনি হাসিয়া বলিলেন “বাহবা—ব্রেভো—দস্তুর মত পলিটিক্যাল পাকা চাঁল! চটপট্ উঠে পড় দাদা—রাত হয়ে যাচ্ছে—যেতে হবে এখনো অনেকটা পথ—ফেরবার অবসর থাকলে না-হয় জেলে ঘুরে গিয়ে দেখা যেত দাদা খেলয়ারটা কেমন!—এখন—”

মুখের কথা শেষ না করিয়াই যুবক আমার হাত ধরিয়া এক টানে সাইড্‌কারে তুলিয়া লইলেন। ষ্টার্ট দিয়া বলিলেন “কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলেম যা হোক!—ভাগ্যে পথে তুমি উঁকি মেরেছিলে দাদা,—নৈলে ঝাড়া এক প্রহর নষ্ট হত ত।”

তাহার বড় কোট্‌টা আমার গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন “গায়ে দিয়া নাও—গরম ও আত্মগোপন দুইই হবে।”

ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে গাড়ীখানা ছুটিয়াছে,—আর মোটার সাইকেলের যে শব্দ তাতে বেশী কথাবার্ত্তার সম্ভাবনা কমই তবুও তিনি মাঝে মাঝে হাসি তামাসা চালাইতেছিলেন! প্রায় আধ ঘণ্টা চলাবার পর তিনি গাড়ীর গতি কমাইয়া আমার গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিলেন “কি হে—একবারে যে চুপচাপ—কথা কানে পৌঁছোচ্ছে না বোধ হয়,—বলছি যে—দিনমান কিছু মিলেছে কি?”

ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করিতেছিল—কপালে হাত দিয়া বলিলাম ‘এ বেশে আবার আহারের আশা! এবারে সত্যিই হাসালেন যা হোক!”

যুবক টিফিন-ক্যারিয়ার বাহির করিয়া বলিলেন “মাপ করো ভাই অন্য ধান্দায় ও-কথাটা একদম ভুলে গেছিলেম,—চট্‌পট যা আছে খেয়ে নাও.—আমার আর দরকার হবে না—আটটা, স’ আটটায় পেঁাছে যায়!”

জানি না ভগবানকে না তাঁহাকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইব। বলিলাম—“জন্ম জন্মের বুঝি বন্ধু আপনি—”

আমাকে বাধা দিয়া তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যকৌতুকময় স্বরে বলিলেন—“এতই আত্মীয়তা! ঘণ্টার বহরে কুলোল না দাদা জন্ম-জন্মান্তরের দাবি—মানুষ সুবিধে পেলেই চায় জড়াতে—আমি কিন্তু চাই মুক্তি—পথের কাজ পথে মিটে গেল—বস্!”

সাইকেলে পূর্ণ বেগ দিয়া তিনি স্পষ্ট শিশে গান ধরিলেন। আরামের আনন্দে আমার ঘুম পাইতেছিল।

গোঁসাইগঞ্জ পেঁাছিবার মাইল দুই থাকিতে তিনি সাইকেলটা একদম থামাইয়া বলিলেন “বন্ধু! এবারে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুত্বের যবনিকা পতনের পালা! এসে পড়েছি—নেমে পড় চট্‌পট্—সহরটার ভেতর এ বেশে নিশ্চয়ই যাবার প্রবৃত্তি তোমার নেই! টেলিগ্রামের তার অন্যের পক্ষে যাই হক তোমার যে বন্ধু নয় নিশ্চয়।”

সত্যাই,—আমার আর বলিবার কি আছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে কার হইতে নামিয়া পড়িলাম। বড় কোটটা খুলিয়া কারে রাখিয়া বলিলাম—"জেল-ভাঙ্গা কয়েদী জেনেও আপনার এ সৌজন্য—এমন শুনিনি কখনো—কি করে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাব।"

তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "জেল অজেল বুঝিনে দাদা,—স্থান অস্থানের বিচার জীবনে বড় করি নি—যেখানেই হ'ক যে অবস্থাতেই হ'ক মানুষ যখন মাথা তুলে থাকতে চেষ্টা করে, মানুষ মানুষ থাকৃতে চায়—আমার মনে হয় সে তখন নিজ স্বভাবে স্বার্থক হয়! মানুষ হবে মানুষ, ভেড়া নয়—মনে ও দেহে। সেই হিসেবেই কয়েদী জেনেও তোমায় বাহবা দিয়েছি—যে অবস্থায়ই থাক মনে রেখো তুমি মানুষ—ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব—তার অপমাননা করলে মঙ্গল নেই! তবে আসি—গুড্‌নাইট।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই যুবক পুরাদমে কারে ষ্টার্ট দিলেন। নিমেষে সাইকেল দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। শব্দ তখনও শুনা যাইতেছিল—সে শব্দ যেন দৈববাণীর মত আমার প্রাণে পৌঁছিয়া তাঁহার শেষ কথা বার বার হৃদয়বীণায় ঝঙ্কৃত করিতেছিল—মনুষ্যত্বের অবমাননায় মঙ্গল নেই।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

ঢেউ।

—:*:—

(১)

হীরামণির টুক্‌রা যত
মাথায় নিয়ে খালি,
ঢেউ নাচ্‌ছে দিয়ে তালি!
লীলায়িত রূপের নাটে
এরা চলে কোন্ সে হাটে?
পৌঁছে দে' যায় ঘাটে ঘাটে
আনন্দেরি ডালি।

(২)

চল্‌ছে নিয়ে শুধু ওরা
সাঁজ সকালের গান—
আহা! সরল ওদের প্রাণ।
ফুলের থালি নিয়ে শিরে
আস্‌চে প্রাতে, আস্‌চে ধীরে;
সন্ধ্যে বেলা দে' যায় চিরে
এম্নি হৃদয় ঢালি'।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

চয়নিকা।

—ঃ০ঃ—

আত্ম-সমর্পণ।

আজকালকার গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসীর যুগে এই কথাটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যে প্রত্যেক মানুষই ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ স্বাধীন স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তাহার থাকিবে নিজের পথে যথেচ্ছ চলিবার ফিরিবার পূর্ণ অধিকার, মুক্ত অবকাশ। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" এই আমাদের আজকালকার জীবনসাধনার মূলমন্ত্র। মানুষের সার্থকতা নিজের নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠায়, আত্ম-প্রকাশে। শিক্ষা ও দীক্ষা এই আত্ম-কর্ত্তৃত্বকেই ফুটাইয়া তুলিবে, সমাজের গড়ন এমন ভাবে দিতে হইবে যেন মানুষ এই আত্ম-কর্ত্তৃত্বের পথই খোলা পায়। বাহিরের, পরের দেওয়া বাঁধন—সে বাঁধন যতই সৎউদ্দেশ্যমূলক হউক না কেন, মানুষ পরিণামে তাহাতে খাটো হইয়াই পড়িবে। তাই এমন কোথাও কোথাও শুনিতে পাই যে কোন বিশেষ মানুষের কথা ছার, ভগবানের বিরুদ্ধেও মানুষকে দাঁড়াইতে হইবে নিজের নিজত্ব লইয়া, ভক্ত তাঁবেদার হইয়া চলা মানুষের পক্ষে কোন ক্রমে মঙ্গলকর নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই আত্ম-বশ হইয়া চলার দরুণ যদি ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু পরবশ হইয়া সমৃদ্ধিলাভ "শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ"—To reign is worth ambition though in hell.

নিজত্বের এই যে সাধন তত্ত্ব ইহার মধ্যে একটা খুব বড় সত্য আছে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সত্যটি এখানে ঢাকা পড়িয়াছে তাহা হইতেছে এই যে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রকৃতভাবে হইতে হইলে আগে জানা দরকার, প্রকৃত "স্ব" কি, আত্ম-কর্ত্তৃত্বকে পাইতে হইলে আগে পাওয়া দরকার আত্মাকে। নিজের নিজত্ব খুব ভাল কথা, কিন্তু সে "নিজ" জিনিষটা কি? পশু "নিজ" অর্থ বুঝে শরীর এবং এই শরীরের দাবি দওয়া মিটাইয়াই সে পায়, তাহার নিজের চরম চরিতার্থতা। পশু-প্রকৃতির মানুষ যে, তাহারও নিজত্ববোধ এই শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ। মানুষ শিশু অবস্থায় এবং ক্রমবিকাশের আদিমযুগে এই পশুর একান্ত দেহ ধর্ম্ম উদযাপন

করিয়াই নিজের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে! তখনকার পুরুষার্থ শরীরকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখা। মানুষের এই স্তরের ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।" তারপরে যখন তাহার চেতনা একটু প্রসারিত হয়, তখন সে শরীরকে ছড়াইয়া যায়—শরীরের উপরে আছে যে প্রাণের স্তর, তাহাকেই "নিজে" বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে। তখন ফুটিয়া ওঠে তাহার রাক্ষস-প্রকৃতি। এই প্রাণের তোড়ে পড়িয়া তাঁহার শত বুভুক্ষা জাগিয়া ওঠে—সে চায় বিরাট বিপুল ভোগ-বৈচিত্র্য। নূতন নূতন তৃষ্ণা তাহার মধ্যে নিত্য দেখা দিতে থাকে, যে তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যে নূতন নূতন উপকরণ সম্ভার নিত্য সৃষ্টি করিতে থাকে। তারপরে মানুষ আরও একটু উপরে তখন উঠিয়া যায়, তাহার চেতনা পায় আর এক ধারা, যখন প্রাণ হইতে সে মনের পর্দ্দায় উঠিয়া দাঁড়ায়। এই মনকেই তখন সে নিজ-জ্ঞানে উপাসনা করে, এই মনই হয় তখন তাহার আত্মা। মনের ধর্ম্ম পাইয়া মানুষ হয় অসুর। মনের মধ্যে আসিয়া মানুষ হয় সজ্ঞান, নিজত্ব সম্বন্ধে সচেতন। প্রাণের দেহের স্তরে মানুষ চলে প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসান দিয়া, প্রকৃতির যন্ত্র হইয়া তখন প্রাণকে ও দেহকে আত্মা বলিয়া সে বোধ করে মাত্র, একটা ভাব, তাতে জ্ঞান নাই। কিন্তু মনের আলোতে আসিয়া আত্ম-কর্ত্তৃত্ব তাহার সজাগ হ'য়ে ওঠে—তাহার মধ্যে ফুটিয়া ওঠে অহংকার এবং এই অহংকারের শক্তি দিয়াই সে ধীর প্রকৃতিকে সমস্ত বস্তুকে নিজের বশীভূত করিতে। তাহার মন অর্থাৎ যতটুকু জ্ঞানের আলো সে পাইয়াছে তাহা নিযুক্ত করে এই অহমিকার এ সাধনে, পরিস্ফুরণে। আমি যে একটা কিছু, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে সকলের—প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, নিজের একধা বিশেষ কোট আঁকিয়া লইতে হয়। অধিকার, দাবী তখনকার যুগের হয় যুদ্ধ মন্ত্র। মানুষ তখন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কল্যাণ, অকল্যাণ, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য বিচার করে না—সে চায় কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিয়া সে বাস্তবিকই নিধনকে বরিয়া লইতে দৃকপাত করে না।

জগতে আজও পাশব ও রাক্ষস ধর্ম্মের যে অনেকখানি চলিয়াছে, তার পরিচয় আমাদের চোখের সম্মুখে যথেষ্টই মিলে। তবুও ইহাদের বিরুদ্ধেও যে একটা আন্দোলনের স্রোত চলিয়াছে তাহাও স্পষ্টই দেখি। কিন্তু যে বাণী এখনও অরণ্যে রোদন মাত্র, তাহা হইতেছে ঐ আসুরী ভাবকেও অতিক্রম করিয়া চলিবার আহ্বান। কারণ, দেখিতে পাই,

মানুষের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্তরে, চিন্তা জগতে যাঁহারা নূতনের আলো লইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও অনেক স্থলে আসুরী ভাবকেই প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার করিতেছেন। স্বাতন্ত্র্য, স্বধর্ম্ম, স্বাধীনতার নামে তাঁহারা যে "স্ব"কে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, তাহা হইতেছে অসুরের স্ব—মনের স্তরে যে আত্মা প্রকট অর্থাৎ বিদ্রোহী বিজিগীষু অহমিকা।

মানুষের আসল নিজত্ব দেহেও নয়, প্রাণেও নয়, মনেও নয়—সে নিজত্ব আরও উপরে। সে তুরীয়, নিজত্বে নিজত্ব বোধ হয় তত বড় কথা নয়, সেখানকার ধর্ম্ম বোধ হয় আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ততখানি নয়, যতখানি হইতেছে একটা বৃহৎ সমগ্রত্ব, একটা অকুণ্ঠ আত্ম-সমর্পণ, একটা পরিপূর্ণ প্রণতি (বৈদিক 'নমঃ')। অসুর ভাবের উপরে দেব-ভাব। এই দেব-ভাব অসুরের সে তীব্র সঙ্কীর্ণতা, সে বিরোধের আনন্দ নেশা, জোর করিয়া শক্তি ফলানের উৎকট চেষ্টা নাই—তাই দেব-ভাবের মানুষকে আমরা শক্তিহীন ক্লীব বলিয়া অনেক সময়ে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। কিন্তু দেব-ভাবের বিশেষত্বই এই যে এখানে স্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্ব ও পরের একটা নিবিড় মিলনের মধ্যে মনের দ্বৈত এখানে ঘুচিয়া গিয়াছে, তাই এখানকার শক্তিতে আছে একটা উদার প্রশান্ত প্রসন্ন অথচ অমোঘ সামর্থ্য। মনের অস্মিতা ভূমার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকা আপনার মাথা নুয়াইয়া দিয়াছে একটা বৃহত্তর শক্তির কাছে। ক্ষুদ্রের, ব্যষ্টির যে প্রকৃত নিজত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, তাহা ক্ষুদ্র যতক্ষণ ক্ষুদ্রের মধ্যে, ব্যষ্টি যতক্ষণ ব্যষ্টির মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। আপনাকে হারাইয়া তবে আপনার প্রকৃত "স্ব"কে স্বধর্ম্মকে লাভ করা যায়—He that findeth his life shall lose it and he that loseth his life for my sake shall find it.

এই ভাবে যে প্রকৃত স্বধর্ম্ম পাইয়াছে তাহার স্বধর্ম্মে কখন নিধন নাই, স্বধর্ম্মে তাহার পূর্ণতা সার্থকতাই নিয়ত ফুটিয়া উঠিবে—অসুরেরই স্বধর্ম্মে নিধন সম্ভব, দেবতার নহে। দেবতা স্বরাট্ বটে কিন্তু সে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত একটা পরম সেবা-ভাবের উপরে। দেবতা স্বরাট্ সেই জন্যেই তিনি সেবক হইতেও কুণ্ঠিত নহেন, অসুর স্বরাট নহে বলিয়াই, জোর করিয়া স্বারাজ্য ফলাইতে চায়।

আর আমরা কর্ম্মী আজ আমরা জ্ঞানী হইতে চাহিতেছি, কিন্তু কর্ম্মের উৎস আমাদের দেহের ও প্রাণের 'স্ব' ও জ্ঞানের উৎস আমাদের মনের 'স্ব'এর মধ্যে নিহিত, তাই আমাদের

জ্ঞান কর্ম্ম সঙ্কীর্ণ নিষ্ফলই হইয়া চলিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানকে একটা নূতন স্তরে উঠাইয়া, একটা দিব্য সত্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার রহস্য আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। "গীতার স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" কথাটিই আমরা একান্ত করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু ভগবানের সে সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ সেই—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ সেই অনন্যা পরাভক্তি, যাহা জ্ঞানকে কর্ম্মকে সত্যসন্ধ ও শ্রেয়োমুখী করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লয়, যাহা অহঙ্কারের সঙ্গে একটা শাশ্বতং অব্যয়ং পদে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার প্রসাদ যতদিন না পাইতেছি ততদিন আমরা আমাদের যথার্থ ও স্বাতন্ত্র্য পাইব না, ততদিন আমাদের সকল চেষ্টা সকল সাধনা বিফল।

বিজলী। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

ফুলশয্যা।

চল্লিশটাকা মাইনের কেরাণী কন্যাকে একটু শিক্ষিতা করে তুলেচেন। মেয়েটি বাংলা বেশ শিখেছে। মাইনর পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েছে। পাড়াগাঁয়ে অর্দ্ধশিক্ষিত বরের হাতে দিলে পাছে রাজযোটক না হয়; তাই ভেবে ভিটেখানি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে এক আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট বরকে তিন হাজার টাকা নগদ দিয়ে তিনি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

বরপ্রবর মেয়েটির শিক্ষার বিষয় শুনেছেন, কিন্তু সঙ্গীতে তার জ্ঞান আছে কিনা, তাই পরীক্ষার জন্য ফুলশয্যার রাত্রে নিভৃতে পত্নীকে একখানি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। পত্নী একটু দূরে সরে বসলেন। তখন বর বল্লেন—"ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া শিখেও তুমি লজ্জার বাধ ভাঙ্‌তে পারলে না! আমি যে শিক্ষিতা, সঙ্গীত-কুশলা ওয়াইফ্ চেয়েছিলুম! মানসী আমার, এস কাছে এস। একটি গান গাও।" বর পত্নীর হাত চেপে ধরলেন। দুহিতার হিতাকাঙ্ক্ষী পিতার সর্ব্বস্বাপহারী পতিপরমগুরুর অনুরোধে পত্নী গাইলেন :—

তুমি প্রভু, আমি দাসী,
আমি স্ত্রী তুমি স্বামী।

(যেহেতু) তোমার বাবা মহাজন আর
আমার বাবা আসামী।
মুখে বলেন বেয়াই বেয়াই,
অন্নে কিন্তু দেন নি রেহাই
তাঁর মুখে মধু অন্তরে বিষ,
ব্যবহারে চাষামি।
অন্ন নাই মোর বাপের ঘরে
(তবুও) এলাম কত গয়না পরে
আমার ভাইরা খাবে ভিক্ষা করে,
না হয় করবে গোলামী।
পেয়েছিলে উচ্চশিক্ষা,
শ্বশুরকে করাতে ভিক্ষা,
এই হৃদয়ে গর্ব্ব কর,
বল—এম-এ, বি-এ পাশ আমি।
ছি ছি পরের পয়সায় করতে ফূর্ত্তি!
শ্বশুরের কাছে কাবলী মূর্ত্তি!
সাহেবদের চরণ ধরে
বলবে "প্রভু, দাস আমি।"

গান শুনে পতি দেবতার চক্ষু ছানাবড়া। পত্নীকে বল্লেন "আমাদের তোমার বাপের শত্রু মনে করে আমাদের ঘরে এলে! তবে তো তুমি আমার ভক্তি করতে পারবে না।"

পত্নী কাতর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"কেন পারব না? খুব পারব। প্রহ্লাদ তাঁর পিতৃশত্রুকে এমন কি তাঁর পিতৃহন্তাকে উপাস্য দেবতা বলে ভক্তি করতে পেরেছিলেন আর আমরা পারব না? তোমাদের হিন্দুকুলকামিনী আমরাও এক একটি প্রহ্লাদ। পিতাকে

যাঁরা সর্ব্বস্বান্ত করেন, তাঁকে যারা জ্যান্তে মেরে ফেলেন তাঁরাই আমাদের গুরু, পতি পরম গুরু। শাস্ত্র দূরে থাক্ নিত্য-ব্যবহার্য্য চিরুণীতে, সেফ্‌টীপিনে পর্য্যন্ত সে নজীর বেরিয়েছে।"

বর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"যাক্ ওসব কথা। তোমার গলাটি কিন্তু বড় মিষ্টি, আর একটি ভাল গান শোনাও।"

পত্নী আবার গাইলেন :—

আমরা কলির প্রহ্লাদ,
প্রভু আমরা কলির প্রহ্লাদ।
পিতৃ শত্রু মোদের গুরু,
তাঁর আহ্লাদেই আহ্লাদ।
প্রভু আমরা কলির প্রহ্লাদ।
পিতৃহন্তা মোদের গুরু,
মোদের প্রেমের কল্পতরু
গুরুর গুরু পরম গুরু
শ্বশুর মশাই জল্লাদ।
প্রভু আমরা কলির প্রহ্লাদ।

পত্নীর গান শুনে পতি গালে হাত দিয়ে বসলেন—বাহির থেকে বন্ধুর দল হাততালি দিল।

"বিজলী"

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:০:—

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

বাহাদুর শাহ	মোগল সম্রাট।
জাহান্দার শাহ	মোগল সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
আজীম	,, ২য় পুত্র।
জাহান	,, ৩য় পুত্র।
ফরোকসিয়ার	আজীম পুত্র।
অজিতসিংহ	মারবার রাজ।
অমরসিংহ	মেবারের রাণা।
জয়সিংহ	অম্বরাধিপতি।
রাজসিংহ	মারবারস্থ সামন্তরাজ।
চিন্‌কালিচ্‌ খাঁ	সম্রাটের প্রধান আমাত্য।
জুলফিকার খাঁ	ঐ প্রধান সেনাপতি।
রুস্তমদিল্‌ খাঁ	আজীমের অধীনস্থ সেনাপতি।
হামিদ খাঁ	মন্‌সবদার।
হোসেনআলি খাঁ }	বাংলার শাসনকর্ত্তা।
আবদুল্লা খাঁ }	বিহারের শাসনকর্ত্তা।
প্রেমদেব	বাংলার দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী।
নসিরুদ্দিন	ফকীর।
মুজাহের	জোহেরার প্রিয় ভৃত্য।

সৈনাগণ, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ, সেবাব্রতচারিগণ. ওস্তাদজী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লালকুমারী	পরে জাহান্দারের বেগম ইমতিয়াজ।
দুর্গাবতী	অজিতসিংহের ম হণী।
লয়লা	চিনকালিচের দৌহিত্রী।
জুলেখা	আবদুল্লার কন্যা পরে সিয়ারের বেগম।
জোহেরা	লালকুমারীর বাঁদী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর দরবার কক্ষ। কাল—প্রথম রাত্রি—বাহাদুর শাহ সিংহাসনে অর্দ্ধশায়িত; জাহান্দার, জাহান, চিন্‌কালিচ্‌ খাঁ, জুলফিকার খাঁ দণ্ডায়মান।

বাহাদুর। চিন্‌কালিচ্‌! জুলফিকার!

উভয়ে সমস্বরে। জনাব!

বাহাদুর। এই বোধহয় আমার শেষ দরবার। এই দরবার ছেড়ে সব চেয়ে বড় দরবারে হাজির হ'বার পরোয়ানা এসেছে—তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

চিন্‌কালিচ্‌। অনুরোধ কেন ব'লছেন্ জাঁহাপনা? বলুন আদেশ।

বাহাদুর। না, চিন্‌কালিচ্‌! এ আমার আদেশ নয়; মরণের পারে দাঁড়িয়ে কি আর আদেশ করা সাজে?—হোক্ না সে দিন-দুনিয়ার মালিক দিল্লীর বাদশাহ? আমার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্ব্বে?

জুলফিকার। বাদশা'র হুকুম তামিল ক'র্ব্বে না এত সাহস কার হ'বে জাঁহাপনা?

বাহাদুর। রাজ্যে বিপ্লব অশান্তি ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে। এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য, উত্তরে যার অভ্রভেদী হিমালয়, দক্ষিণে যার সিন্ধু প্রক্ষালিত লঙ্কা, পশ্চিমে রূঢ়, দীপ্ত, কঠোর আফ্‌গানিস্থান, আর পূর্ব্বে চিরশ্যামল স্নিগ্ধরূপ বঙ্গভূমি এই বিরাট সাম্রাজ্য অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করা সে কি একটা কথার কথা! জুলফিকার? শুধু তরবারির জোরে এ'কে শাসন ক'র্ত্তে গেলে প্রতি আঘাতেই এ শতধা হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়্‌বে। পিতা ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে যে বিদ্রোহানল সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত জীবনের চেষ্টাতেও তাকে নির্ব্বাপিত কর্ত্তে পারলেম না।

চিন্‌কালিচ্‌। চেষ্টা আপনি একটুও কম করেন নি সম্রাট! কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এ অনিষ্টের প্রতিকার হল না তখন আর ক্ষোভ করবার কি আছে, জাঁহাপনা?

বাহাদুর। ক্ষোভের কথা বলছ, চিন্‌কালিচ্! ক্ষোভ! সে আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত এ হৃদয় ব্যথায় ভ'রে দেবে। তুমি বুঝ্‌তে পারছ্ না, যে অগ্নি দেশে জ্বলে উঠেছে তাতে এ মোগল সাম্রাজ্য অচিরেই ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।—যাক্ যা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, তৈমুর বংশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমার মৃত্যুর পর জাহান্দারেরই দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্য। কিন্তু আমি আজ আজিমকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে চাই—জানিনা আমার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা।

জুলফিকার। জাঁহাপনা! আমার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত আপনার আদেশ পালনে ব্যয়িত হ'বে।

বাহাদুর। তোমার কথায় তুষ্ট হ'লাম জুলফিকার—আজিম বাংলার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত; আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে বসিয়ে যেতে পাল্লে বোধহয় ভাল হ'ত। কি চিন্‌কালিচ্! তুম অধোমুখে নীরবে রইলে যে?

চিন্‌কালিচ্। সম্রাট! একটা নিবেদন আছে।

বাহাদুর। কি বলবে বল।

চিন্‌কালিচ্। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করার চাইতে কি মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধন মহত্তর নয়। আপনি আজ একটা ভয়ানক অমঙ্গলজনক ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন অচিরেই গৃহ বিবাদ বাধ্‌বে, চারদিক হ'তে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সুবিধা পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌বে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দে, রণভেরীর ভৈরব নিনাদে, আর্ত্তের কাতর কণ্ঠস্বরে দিল্লীর আকাশ ভরে যাবে। স্বর্গে বসেও এ দৃশ্য দেখে আপনি সুখ পাবেন না বাদশা'। তাই ভাবছি আপনার আদেশ পালন কোর্ত্তে পারব কি না।

বাহাদুর। (ঈষৎ বিষাদের হাস হাসিয়া) চিন্‌কালিচ্! তাই বলেছিলাম আমার অনুরোধ আছে, মরবার পথে ব'সে আর আদেশ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় নি।—অসহায় নিরুপায় দিল্লীর সম্রাট তোমাদের করযোড়ে নিবেদন জানিয়েছিল।

চিন্‌কালিচ্। কেন বৃথা ক্ষুব্ধ হ'চ্ছেন সম্রাট?

বাহাদুর। বৃথাই ক্ষুব্ধ হ'চ্ছি চিন্‌কালিচ্!—ভেবে দেখ একদিন যার চোখের ইঙ্গিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পিত হ'ত—যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তোমার মত কত শত

চিন্‌কালিচ্ স্রোতমুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেছে—আজ তার এত অধঃপতন—এত অপমান! চিন্‌কালিচ্ তুমি ভেবো না যে বাহাদুর বাদশা' এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে যে সে তার প্রধান অমাত্যেরও ঔদ্ধত্য সহ্য করবে।

চিন্‌কালিচ্। বাদশা! আপনি ভুল বুঝেছেন। ন্যায্য কথা বলতে চিন্‌কালিচ্ কখনও ভয় করে নি—এখনও বলছি আমাদের গৌরবান্বিত পিতৃপুরুষেরা যে নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন যাতে ক'রে ক্ষুদ্র মোগল সাম্রাজ্য ঝড়ের মেঘের মত সমস্ত ভারতবর্ষ দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলেছে—সে নিয়মটা মান্‌তেই হ'বে। যে দিন হ'তে এ নিয়ম ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়েছে সে দিন থেকে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশঃই হীনবল হ'য়ে পড়ছে। আপনি আজ তাকে আর এক ধাপ পতনের দিকে নাবিয়ে দিচ্ছেন।—ভেবে দেখুন কথাগুলো ঠিক বলেছি কিনা।

জাহন্দার। খাঁ সাহেব! একটা বিরোধের ছায়া দেখিয়ে দিয়ে পিতার শেষ সময়টাকে কেন তিক্ত ক'রে তুল্‌ছেন? পিতা আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ—আজ মাথা পেতে আপনারও আদেশ গ্রহণ করছি। দিল্লীর সিংহাসনের চাইতে কি জগতে আর কিছুই বেশী আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নাই! পিতা, জাহান্দার জানে আপনার ঐ সিংহাসনে বসবার যোগ্যতার দাবী একটুও কম নয়। আপনার আদেশ যাতে পালন করা হ'য় সে আমিই দেখাব।

বাহাদুর। এ বড় শক্ত কথা জাহান্দার—বড় কঠিন। (মাথা ঘুরাইয়া) কেও জাহান্!

জাহান। হাঁ, পিতা—আমায় কি কিছু আদেশ করবেন পিতা!

বাহাদুর। না কিছুই না, প্রভুত্বের ঝঙ্কার এ কণ্ঠ হতে চির নির্ব্বাসিত হয়েছে মুমূর্ষু সম্রাটের আদেশ ওষ্ঠপ্রান্তে উচ্চারিত হতে না হতেই ধূমের মত—বাতাসে মিশে যাবে।

চিন্‌কালিচ্। বাদশা' ক্ষমা করবেন।

বাহাদুর। চিন্‌কালিচ্! কি অপরাধ তুমি ক'রেছ যে ক্ষমা চাইছ? এ আমারই ভুল—কেন মিছিমিছি এত ভাবছি? যেদিন চোখের সামনে দূরের দৃশ্যগুলি ছায়ার মত হয়ে আসবে—কালো শেষ যবনিকা নেবে এসে সমস্ত জগতটাকে আমার চিরদিনের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবে—সেদিন হ'তে কোথায় বা মোগল সাম্রাজ্য আর কোথায় বা তার সম্রাট বাহাদুর শা'?

বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আজকার মত দরবার এই শেষ।

(কুর্ণিশ করিয়া সকলের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) আমায় দুর্ব্বল দেখে আজ সকলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবে শিখ, রাজপুতানায় রাজপুত আর দাক্ষিণাত্যে মারাট্টা। আর কয়েকটা দিন যদি পেতুম—বৃথা আশা।

প্রায় একমাস হ'ল আজীমকে ফিরে আসবার জন্য লিখেছি, কই সেও আর এল না।

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(স্থান—দিল্লীর সেনানিবাসের তোরণ। হামিদ পায়চারি করিতে করিতে।)

হামিদ। হুসিয়ার! হুসিয়ার! খবরদার! পাহারা সব খাড়া রহ—বন্দুককা সঙ্গিনকা মাফিক, তাজকা গম্বুজকা মাফিক!

(নেপথ্যে—খাড়া হায় হুকুমদার)

ইয়াদ রাখ্খো, ফরসিকা নচিয়াকা মাফিক্—একদম্ খাড়া সিধা।

(নেপথ্যে—যো হুকুম মন্সব্দার)

বাস্ ব্যাটারা সব ঠিক আছে—আমি এইবার ঘাটি আগ্লে বসি। স্ফুর্ত্তি আজ এইখানেই চালাবো। এই পথ দিয়ে বিবি হর রোজ যায় আসে, পিয়ারের আসনাই এ, ঠিক এই সময়েই কি খপ্সুরৎ চেহারা! একদম্ কেয়াবাৎ! এইসা উমদা নয়না—বিবি দিলকা বিচ্মে কাটারী হানে—ছোরা মারে বাবা ছোরা মারে! আজ যা থাকে নসিবে। এইসা নয়না ঠারে বিবির জান নিকাল লেগা। ঐ কেল্লার ঘড়ি বাজিল। এখনই সে আসবে বিবিজান।

(হামিদ গান ধরিল)

মেরা দিল্কা পিয়ারী—(কাশিয়া লইয়া)

মেরা দিলকা—

নাঃ সাফাই লাগ্ছে না—একটু জমিয়ে নিতে হ'বে।

(বোতল হইতে সুরাপান।)

(কাশিয়া লইয়া)—মেরা দিল্কা পিয়ারী উম্দা তেরা নয়না ঐযে আসছে!—দিল মেরা ঠিক হো যাও।

(জোহেরার প্রবেশ)

জোহেরা। এইটাই ত কেল্লার ফটক ব'লে মনে হ'চ্ছে—কিন্তু খবর নি কি করে?

হামিদ। এই কোন হ্যায় খাড়া রহো।

জোহেরা। এই ত একজন প্রহরী দেখ্ছি, দেখা যাক্—বন্দিগি জনাব।

হামিদ। সেলাম, সেলাম বিবি। এ রূপের রোসনাই জ্বেলে এ রাতে কোথায় চ'লেছ।

জোহেরা। একটা জরুরী কাজে এসেছি, সাহেব!

হামিদ। এই কালো চোখে সুরমা টেনে, হাসির জলুসে আগুনের ফুল্কি ছড়িয়ে এই আঁধারে বেরিয়েছ, একটুও ভয় নেই বিবি সাহেব? ও রূপ দেখ্লে যে ফকিরও পাগল হ'য়ে উঠবে।

জোহেরা। সে আপনাদের মেহেরবাণী সাহেব। দয়ার চোখে ঐ রকমই দেখে থাকেন। আমি ত দেখ্তে একটুও ভাল নই।

হামিদ। আরে ছোঃ ছোঃ বিবিসাহেব! কোন কমবখৎ বেইমান এ কথা স্বীকার কর্ব্বে? চেহারা ত নয় যেন একেবারে মহরমের চাঁদ।

জোহেরা। থাক্ ও কথা সাহেব। এ আমার বড় জরুরী কাজ। আজ একমাস হ'ল ঘোরাঘুরি কচ্ছি, কিন্তু কাজ হাসিল হ'ল না। যদি মেহেরবাণী ক'রে আমায় একটু সাহায্য—

হামিদ। সাহায্য! হুকুম কর, হুকুম কর—বান্দা খেদমতে হাজির আছে।

জোহেরা! একটা কস্বীর এমন মান বাড়াবেন না। আমি একটা বাঁদী, আমার মনিবানীর কিযে চেহারা সাহেব! বাদশা'র হেরেমের সব চাইতে খপ্সুরৎ বেগমও তার দাসী হ'লে ভাগ্য মান্ত তিনি আমায় কাজের ভার দিয়েছেন—তা যদি ক'রে দিতে পারেন—

হামিদ। বিবিসাহেব, শুধু হুকুম কর’—জান দিয়ে তা তামিল ক’র্ব্ব।

জোহেরা। আমার বিবিসাহেবা চান যে একজন আমির-উল-ওমরাহের সঙ্গে তার মুলাকাৎ হয়।

হামিদ। আমির-উল-ওমারাহের সঙ্গে মুলাকাৎ! সে ত তুচ্ছ কথা! বাদশা’র সঙ্গে হ’লেও হামিদ খাঁ পিছ পা’ হবে না।

জোহেরা। বাঁদীর গোস্তাকী মাফ হয়। হুজুর কার নাম কল্লেন—হামিদ খাঁ—হুজুরই কি হামিদ খাঁ।

হামিদ। হাঁ, বিবি; তোমার গোলাম হোসেন হিম্মৎ হাদিম খাঁ।

জোহেরা। আমিও খোঁজ পেয়েছিলাম যে আপনাকে ধরলে নাকি কাজ হাসিল হবে। বাঁদীর আর্জ্জি মঞ্জুর হবে কি জনাব?

হামিদ। আলবৎ, বাদশা’র সব চাইতে বড় সেনাপতি আমির-উল-মুলুক জুলফিকার খাঁ কুছ পরোয়া নাই বিবি!

(নেপথ্যে—আঁখি ডাহিনা কর’। হুকুমদার হাজির। সেলাম বাতাও)

হামিদ। এমন জলুসের সময় এল কিনা ব্যাটা হোন্দল কুৎকুৎ আসনাই মাটী কর্ত্তে।—বিবি তা হ’লে তুমি এস—কিন্তু আবার কখন কোথায় দেখা হ’বে?

জোহেরা। রাত্তির দুপুর উৎরে গেলে মীনা মসজিদের পেছন দেউরীর কাছে বাঁদী হাজির থাক্‌বে। যদি মেহেরবাণী হয়, যাবেন। বন্দেগি জনাব।

হামিদ। সেলাম, সেলাম বিবিসাহেব—ঠিক হাজির থাক্‌বে।

(জোহেরা একটু হাসিয়া প্রস্থান)

হামিদ। বিবি কাটা কলিজার উপর নিমক ছড়িয়ে হেসে গেল।

(নেপথ্যে জুলফিকার খাঁ—(উচ্চৈঃস্বরে) হাদিম খাঁ)

হামিদ। শালা গিধ্বর! একেবারে আতসতুবরি ছেড়ে ডাক ছাড়্‌গে!—হামিদ খা!

(নেপথ্যে জুলফিকার—হামিদ খাঁ)

হামিদ। হুজুর, হুজুর, বান্দা হাজির।

জুলফিকারের প্রবেশ।

জুলফিকার। হামিদ, আজ এ সময়ে তুমি যে এখানে পাহারায়।

হামিদ। হাঁ জনাব! পাহারাদার বেটারা কেবল ঘুঘুর মত ওড়ে আজ তাই ফাঁদ পেতে ব’সেছি।

জুলফিকার। বেশ করেছ। কিন্তু—(নিম্ন স্বরে) সম্রাটের শেষ ইচ্ছে কি শুনেছ?

হামিদ। ফুরসৎ হয় নি।

জুলফিকার। সম্রাটের ইচ্ছা যে আজীম সিংহাসনে বসে। কিন্তু—

হামিদ। কিন্তু জুলফিকার খাঁ সেটা চান না?

জুলফিকার। হাঁ, রাজ্যের অসংযত শিথিল রশ্মি জুলফিকারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সে তাকে যথেচ্ছ চালাবে আপনার খেয়ালে, কখনও দ্রুত, কখনও শ্লথ,—অবাধ, অপ্রতিহত। যদি আজীম সিংহাসনে বসে—তা হবে না, কারণ, সে বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ন্যায়পরায়ণ। তার মাথা আছে আর আছে প্রাণ। জাঁহান একগুঁয়ে ন্যায়নিষ্ঠ, আবার বিচক্ষণ যোদ্ধা। সেও হতে পারে না।

হামিদ। সুতরাং সম্রাট হবেন জাহান্দার। মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বেন আর জুলফিকার খাঁ সেই ফাঁকে দামামা বাজাবেন।

জুলফিকার। কিন্তু তাতেও আশঙ্কা আছে, হামিদ। ধার্ম্মিক লোক ন্যায়ের পক্ষপাতী। তবে জাহান্দারের একটা দৌর্ব্বল্য আছে। তাঁর চিত্তে দৃঢ়তা নেই। আঘাত পেলে সে নুইয়ে যায়—নদীর স্রোতের মত সে বাঁক পেলেই ঘুরে চলে। এখন চাই সেই আঘাত। নারীর রূপ আর যৌবনের ফাঁদে তাকে বন্দী করে রাখলে জুলফিকারই কাজে সম্রাট হবে। এ ভার তোমারই উপর। যদি পার এক সুবার সুবাদারী।

হামিদ। কিন্তু শাহজাদা আজীম আর জাহান এই ঈদের কোর্ব্বানী হতে রাজি হবেন কেন? সিংহাসন অমি ছেড়ে দেবেন?

জুলফিকার। হামিদ, জুলফিকার জীবনে শুধু একটা জিনিষ শিখেছে—সে রাজনীতি—কুট, বক্র, রূঢ়। তীরের মত সে দ্রুতগতি, তরবারির চেয়ে শুরু তার আঘাত। বিদ্রোহের

দিনে, বিপ্লবের মত, নির্ম্মম হয়ে একটা বজ্রের আঘাতে সে তাদের আশার বিরাট সৌধচূড়ার উপরে ভূমিকম্পের বিপুল কম্পন তুলে দেবে। এক লহমায় সব ধ্বংস, চূর্ণ, দলিত করে ফেল্‌বে, তখন কোথায় আজিম—আর কোথায় জাহান। শুধু কর্ণধার হয়ে দাঁড়াবে এই জুলফিকার—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চাই তোমার সাহায্য। যদি পার আবার বলি—এক্ষুবার সুবাদারী।

হামিদ। খাঁসাহেব, সেলাম। এক কিস্তিতে বাজি মাৎ। সব যোগাড় হবে। আমার জানা এক বিবি আছে—কি তার রূপ—লাখ আমীরের দৌলত তার ও রূপের কাছে তুচ্ছ। কাজার বাদশা'র শির সে চাউনীর নীচে মুচ্ছিত হয়ে যায়, আর তেম্নি মিঠে তার গলা। দুপুর রাতে বিবি যখন ছাদের উপর বসে গজল্ ধরে তখন বুঝ্‌লেন কিনা—

জুলফিকার। বেশ, বেশ, তাকেই যোগাড় কর।

হামিদ। কুছ পরোয়া নেই। রাত দুপুরে মীনা মস্‌জিদের পেছনে আমার অপেক্ষা কর্ব্বেন।

জুলফিকার। আচ্ছা, স্মরণ থাক্‌বে।

(জুলফিকারের প্রস্থান)

হামিদ। নসিব বাবা আমার—লাগ্‌বি ত লাগ্ একেকবারে কোপের মুখে তাক্ মতন।

(পট নিক্ষেপণ।)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত।
ও
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পথের গান।

—:০:—

শূন্য মাঠের পথ ধরি ও কে
গান গেয়ে সাঁজে চলে
তরল মাণিক ঢেলে দিয়ে যায়
ডুবায়ে গরল জলে।
বুঝি নে তাহার স্বভাব কেমন,
জানে না কি ধন করে বিতরণ
মুকুতার মুঠি ছড়াইয়া যায়
জানি নে সে কোন ছলে।

(২)

এনেছে সে সখি সুরের ধারা কি
সারা সুরলোক লুটি'
সামালিয়া হায় রাখিতে পারে না
ছাপায়ে পড়িছে টুটি'।
সত্য কি তার কোনো হুঁস-নাই
একাকী বিজনে করে রোশনাই
ফেরে কুসুমের মেলা বসাইয়া
তরুহীন মরুতলে।

(৩)

বেদনার সাথে এত মধুরতা
কোথায় সে করেছে চুরি
ভালবাসা হায় রেখে দিয়ে যায়
মরম পাষাণ খুঁড়ি'।
কবে সে কখন জোছনার রাতে
কুড়ায়ে পাইবে পথে যেতে যেতে
বিনা সুতে গাঁথা বেদনার হার
আদরে পরিবে গলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:০:—

রাজসাহীর কলেক্টর মিঃ রিড সহৃদয় ব্যক্তি। ইনি নিজে বন্যা প্লাবিত স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রজার দুঃখ ক্লেশ নিবারণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ—রাজসাহীর প্রায় ১২০০ বর্গ মাইল প্লাবিত হইয়াছিল, উহার লোক সংখ্যা প্রায় ৭৪,৪৩০ জন। এক নওগাঁ মহকুমাতেই ২০ জন লোক বন্যায় প্রাণ হারাইয়াছে। ১৪০০ গরু মরিয়াছে; ৭৯৪০০ খানি ঘর পড়িয়াছে। নওগাঁ সবডিভসনে মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরই বেশী—মাটির ঘরগুলি প্রায়ই ভূমিসাৎ হইয়াছে। শস্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—চারি আনা হইবে কি না সন্দেহ।

* * *

বন্যা প্রপীড়িত স্থানগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বিগত ১৫ই নভেম্বর বঙ্গের গভর্ণর লর্ড লিটন সস্ত্রীক আদমদীঘি ষ্টেসনে আগমন করেন। বলা বাহুল্য বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। আদমদীঘির ষ্টেশনমাষ্টার বন্যার ধ্বংশলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে সমস্ত বর্ণনা করিতে বলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারের নবজাত সন্তানটীর মৃত্যু কাহিনী শুনিয়া গভর্ণর-মহিষী বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গভর্ণর ও লেডী লিটন সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীসহ পদব্রজে তালশন গ্রামে প্রবেশ করেন। এই গ্রামে ৫০২ খানি গৃহের মধ্যে মাত্র ১০খানি অবশিষ্ট আছে। গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লাট সাহেব বস্তুতঃই দুঃখিত ও চঞ্চল হইয়াছিলেন, এবং গ্রাম-বাসীদিগকে শান্তনা বাক্যে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে, সহানুভূতিতে প্রজাগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। প্রজাগণের এ মহাদুঃখের আদি কারণ যেটী, সহৃদয় গভর্ণর যদি তাহা নিরাকরণে মনোযোগী হন তাহা হইলেই তাঁহার এই পরিদর্শন পরিভ্রমণ সার্থক হইবে, প্রজা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল স্মরণে রাখিবে—নতুবা নয়ন আড়াল হইলেই অশ্রু শুকায় যদি ছোট বড়র এ দেখা না দেখা তুল্য মূল্য।

* * *

বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে—কোচবিহারের শ্রীশ্রীমহারাণীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। তিনি সমুদ্রযাত্রায় সক্ষম হইলেই শ্রীশ্রীমহারাজ সপরিবারে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীমান্ দ্বিতীয় মহারাজকুমার ও শ্রীমতী কনিষ্ঠা মহারাজকুমারী বর্ত্তমান মাসে কোচবিহারে পৌঁছিয়াছেন।

* * *

বড়ই দুঃখের কথা—কোচবিহার ষ্টেট কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব জুডিসিয়াল মেম্বর প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর এত সত্বর পরলোক

গমন করিলেন। বিগত ৯ই নভেম্বর তারিখ রাঁচীতে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তিনি ১৮৯৬ সনে সব নায়েব আহেলকার রূপে কোচবিহার একৃসিকিউটিভ্ সার্ভিসে প্রবেশ করেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

বাঙ্গলায় একদিন ছিল—যখন চরকার সুতায় মেয়েদের কৃতিত্বের পরীক্ষা হইত। আসামে এখনও বালিকার কর্ম্মকুশলতা বিচারে আঁতের সহিত তাঁতের খবর লওয়া হয়। ছোট বড় সকল অবস্থার স্ত্রী-লোককেই সেখানে তাঁতে পারদর্শিনী হইতে হয়। কোচবিহারেও ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাই ছিল! মেয়ে চরকা কাটিতে না জানিলে বাঙ্গলায় নিন্দা হইত। ব্রাহ্মণ কুমারী মাত্রেই পৈতা কাটিতে শিখিত—এখন শতকরা ৮০ জন পৈতা কাটিতে জানে না।

* * *

রামগোপালপুরের অতি বৃদ্ধা রাণী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চরকার সুতা কাটিয়াছেন। বিগত ৭ই কার্ত্তিক ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন,—তিনি এবয়সেও গৃহকর্ম্ম রীতিমত করিতেন,—সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেন, আহ্নিক পূজায় মগ্ন থাকিতেন অথচ চরকায় সুতা কাটাও কোন দিন বাদ যাইত না। কার্য্যে আন্তরিকতা থাকিলে এমনই হয়!

* * *

বিগত পূজার সময় বিলাতী কাপড় কাট্‌তি কমিয়াছিল, আবার যে সেই! সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১১ নভেম্বর পর্য্যন্ত—

কোরা কাপড়।

	১৯২২ সনে।	১৯২১ সনে।
কলিকাতা—	১৬৩০৮০০০ গজ	৮৩১৩০০০ গজ

বোম্বাই—	৪৫২০০০০ গজ	২২১৯০০০ গজ
মাদ্রাজ—	১৪৩০০০০ গজ	৯০০০০০ গজ

এবং

ধোয়া কাপড়।

কলিকাতা—	৪৯৮৬০০০ গজ	৩৭৭৪০০০ গজ
বোম্বাই—	২২৩৭০০০ গজ	১৫৭৮০০০ গজ
মাদ্রাজ—	১১৬৬০০০ গজ	৯৯৫৮০০০ গজ

আমদানি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বসময়ের মূল্যের হিসাবে বিলাতী কাপড়ের মূল্য শতকরা ৭০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে! অথচ বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি কমে নাই। সখের চরকা অনেক গৃহেই নীরব হইয়াছে। যে কার্য্যে আন্তরিকতা অপেক্ষা হুজুক ও প্রশংসালাভের চেষ্টাই বেশী, তাহার ফল এরূপই হয়। দেশকে এ দুরবস্থা হইতে আবার টানিয়া তুলিবার একমাত্র উপায়—নিদারুণ দারিদ্র, অন্নবস্ত্রের অভাব মোচনের চেষ্টা;—চরকা, তাঁত এবং কৃষির উন্নতি আমাদের উদ্ধারের প্রধান উপায় ও অবলম্বনীয় জানিয়াও উহাদের উন্নতির জন্য শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক অনুরাগ আজও জাগ্রত হয় নাই। সুখের বিষয় নিজেদের অসহায় অবস্থা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন,—খদ্দর প্রভৃতি মোটা কাপড় পরিধান করিবার জন্য অনেকেই প্রস্তুত—এমন কি ব্যগ্র! কিন্তু তাহার উৎপন্নের দিকে চেষ্টা তেমন হইতেছে না। গৃহে গৃহে চরকা চালানের সংকল্প যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না—তাহা একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। সকল অবস্থার লোক যে চিরদিন অন্যকার্য্য ছাড়িয়া, আয়াসবিলাসের, বিশ্রামের আরাম উপভোগ না করিয়া চরকায় অধিকতর আনন্দ লাভ করিবে এ আশা করা যায় না। দুই দিনের জন্য তরুণী ধনীগৃহিণী একার্য্য সখের খাতিরে সম্পাদন করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন—চিরকাল তাঁহার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। এ শিল্পকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে যে অভাবগ্রস্ত—ইহার অনুশীলনে যাহার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইবে—তাহাকে ইহাতে সুশিক্ষিত কর,—তাহারও আয়ের উপায় হ'ক,—সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভাবও পূর্ণ হইবে। দেশের মতি ফিরিয়াছে—পন্থার বিধিমত ব্যবস্থা হউক।

বাঙ্গালী কি সত্য সত্যই জীবন-প্রবাহে নিমজ্জিত, আয়ুহীন হইয়া শেষ হইবে ? তাহার নিজ দেশেও সে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। সর্ব্ব সমস্যার উপরে সেই সমস্যা ! অথচ এ দিকে চেতনা আছে খুব কমেরই। কলিকাতায় বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—কত দ্রুত বাঙ্গালী হটিতেছে। 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশ :—

কলিকাতায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে ও বাহিরের লোকসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। অবাঙ্গালীর সংখ্যা এমন বাড়িতেছে যে কালে কলিকাতায় তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিবে। বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায় বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে।

কলিকাতা, কলিকাতার উপকণ্ঠ ও হাওড়ার অবাঙ্গালীর সংখ্যা দেখিলে আমাদের উক্তি যে সত্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

	কলিকাতা	উপকণ্ঠ	হাওড়া
কলিকাতায় যাহাদের জন্ম	৩,০২,৭৭৬	২১,৫৯৪	৩৯ ২
২৪পরগণা হাওড়ায় জন্ম	৯৯,১২৪	১,০৫,৭১১	৯৯,৫৩৪
বঙ্গের অন্যান্য স্থানে জন্ম	১,৭৫,৬৬৪	২১,০৫৩	২০,৯৬৯
ভারতের অন্য প্রদেশে জন্ম	৩,১৪ ০৩৬	৭১২৫৩	৭৯,১২৩
ভারতের বাহিরে জন্ম	১৪০৫১	৮৭৪	৮৫১

অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কত জন কোন স্থানের লোক তাহা পাঠ করিলে কলিকাতার প্রকৃত অবস্থা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

	কলিকাতা	উপকণ্ঠ	হাওড়া
কলিকাতায় জন্ম	৩[illegible]·৫৭	৯·৬৮	২·০১
২৪ পরগণা ও হাওড়ায় জন্ম	১০·৯২	৪৭·১১	[illegible]৬·৩৬
বঙ্গের অন্যান্য জেলায় জন্ম	১৯·৩৫	১১·১৬	১০·৭৪
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জন্ম	৩৪·৬১	৩১·৭৫	৪৪·[illegible]৬
ভারতের বাহিরে জন্ম	১·৫৫	০·০৯	০·৪৩

কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে গমন করিলে মনে হয়, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী বা গুজরাটের কোন সহরে উপস্থিত হইয়াছি। কলুটোলা অঞ্চলে গেলে মনে হয় দিল্লী সহরে উপনীত হইয়াছি।

কলিকাতার যেসকল পল্লীতে খাস বাঙ্গালীর বাস ছিল, সে সকল অঞ্চলের বাড়ী ঘরও অন্য প্রদেশের লোকেরা অধিকার করিতেছে।

পাটের ব্যবসায়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের লোকেরাই রাজা ছিল। এখন পাটের ব্যবসায় মাড়োয়ারী ও ইউরোপীয়দের হস্তগত হইয়াছে, বাঙ্গালীরা দালাল হইয়াছে। কাঠের ব্যবসায় করিয়া অনেক বাঙ্গালী ধনী হইয়াছিল, এখন ষ্ট্রাণ্ড রোডে গেলে দেখা যায়, মাড়োয়ারী সে ব্যবসায় দখল করিয়াছে, বাঙ্গালীরা কোনরূপে পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিতেছে।

ঠনঠনিয়াতে বাঙ্গালী মুচি চটি জুতা তৈয়ার করিত, এখন তাহা ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে, হিন্দুস্থানীরা ঐ ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইয়াছে।

মাড়োয়ারীরা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, জাহাজ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন, পাটের কল ও কাপড়ের কল চালাইতেছেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট বাঙ্গালী পরাভূত হইয়াছে।

ইংরেজ ব্যবসায়ীর হৌসে আগে বাঙ্গালীরা মুচ্ছুদ্দি ছিল, এখন মাড়োয়ারী ঐ পদ দখল করিয়াছে।

বাঙ্গালী পল্লীর অনেক বাড়ী মাড়োয়ারীই কিনিতেছে, কলিকাতা তার চারিদিকের বাগান বাটীগুলির মালীক মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীরাই হইয়াছে।

রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহাদের মানমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। রাজস্ব কমিটির সভাপদে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইলেন না নিযুক্ত হইলেন মাড়োয়ারী বিড়লা। মাড়োয়ারীরা বেঙ্গলী ও নিউ এম্পায়ারের কর্ত্তা হইয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভা কি মিউনিসপালিটিতে মাড়োয়ারীকে সভ্য নিযুক্ত না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকে।

লেখাপড়ার কথা ভাবিয়া দেখ। আগে প্রায় সবগুলি বিদ্যালয় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইত। এখন মাড়োয়ারী স্কুল হইয়াছে। মাড়োয়ারীরা বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্তও হইয়াছে।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে মাড়োয়ারী কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদের বিরাট হাসপাতাল হয় ও মাড়োয়ারী দাতব্য সমিতি।

ব্যবসায় বাণিজ্যে যেমন, সৎকাজেও তেমনি বাঙ্গালী হটিয়া যাইতেছে। সুতরাং কলিকাতায় বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস ও অন্য প্রদেশবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রতাপ খর্ব্ব হইতেছে, তবু বাঙ্গালীর চৈতন্য হইতেছে না। বাঙ্গালী কর্ত্তার পদ হইতে অবনত হইয়া এখন চাকুরিয়া হইয়াছে, ক্রমে মুটে মজুর হইবে—যদি শীঘ্র তাহার আত্মবোধ না জাগে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম।)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিষয়ক সাধন ভজন প্রণালী কিছু কিছু জানা আবশ্যক। তজ্জন্য বোধহয় এই সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহু প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে ধর্ম্ম সাধনের প্রধানতঃ তিনটি উপায় প্রচলিত ছিল। ইহাদিগকে সাধারণতঃ (১) কর্ম্মযোগ, (২) জ্ঞানযোগ ও (৩) ভক্তিযোগ আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে।

কর্ম্মযোগ—এই কর্ম্মযোগের মধ্যে আবার (১) বৈদিক যাগযজ্ঞাদি (২) পৌরাণিক ব্রতনিয়মাদি এবং (৩) তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি—এই ত্রিবিধ অঙ্গই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গকেও এই কর্ম্মযোগেরই অঙ্গ বলা যায় (গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়)। প্রথম

কর্ম্মযোগের যে ত্রিবিধ অঙ্গ উল্লেখ করা গেল তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিধিমার্গে থাকিয়া যাগযজ্ঞ ব্রতনিয়মাদি পালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করা; চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এমন কি মীমাংসকগণ মনে করেন যে এই কর্ম্মই একমাত্র সাধন, কর্ম্মই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া আপনা হইতে নিবৃত্তি হইয়া যায়। বোধ হয় ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গীতাতে উক্ত হইয়াছে— "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" (৪।৩৪)

সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, ও তৎপর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধা ব্যতীত যাগযজ্ঞাদি কোন কর্ম্মেই কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং ভক্তি এবং জ্ঞান কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিবার সহায়ক। এই মার্গকে প্রবৃত্তি মার্গ বলিলেই ঠিক হয়। প্রাকৃতিক যাবতীয় কার্য্যদ্বারা সুখভোগ করিয়া যখন সেই সুখ আর সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন চিত্ত আপনা হইতেই প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে বিরত হয়। তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়, কারণ তান্ত্রিকেরাও নিবৃত্তিকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। অষ্টাঙ্গযোগমার্গ প্রধানতঃ নিবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত। এই মার্গের সাধকেরা প্রবৃত্তিকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে চান না; ইহা তাঁহাদের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্ট অঙ্গের সাধন হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" (৩।৩৭)
"তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্॥" (৩।৪১)

গীতার এই দুই শ্লোককেই ইঁহারা মূলমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেন।

এই উভয়ের মতের মধ্যেই কতকটা সত্য নিহিত আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রবৃত্তিকে একেবারে প্রশ্রয় দেওয়া আর নিজের মৃত্যু টানিয়া আনা উভয়ই এক। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তিকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়া কেবল নিবৃত্তির উপর খাড়া থাকা যে

কতদূর সম্ভব তাহাও বিবেচ্য। ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্র, পরাশর এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বোধ হয় ভগবান এই উভয়ের সামঞ্জস্যের জন্যই বলিয়াছেন—

"নাত্যশ্নতস্ত যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥" (৬।১৬)
"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" (৬।১৭)

উপরে যে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইল তাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্মগুলিকেই ধরা হইয়াছে; যাগযজ্ঞাদি, এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রতাদি ইহার অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে জীব কোন কালেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।—
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" গীতা—(৩।৫)

পার্থ-সারথির মতে কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ অসম্ভব; আমরাও বলি কর্ম্ম কোন কালেই ত্যাজ্য নহে, কারণ, কর্ম্মই আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতেও আমাদের উন্নতি দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—পূর্ব্ব-তপস্যা ও বর্ত্তমান-পুরুষকার। পূর্ব্ব-তপস্যার উপর এখন আর আমাদের কোন হাত নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পুরুষকার আমাদের করায়ত্ত। পুরুষকার দ্বারা যে দৈবকেও আমরা জয় করিতে পারি তাহার উদাহরণ হিন্দুশাস্ত্রে বিরল নহে। সাবিত্রীসত্যবানের আখ্যায়িকা ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখন কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্য যে বিবিধ উদ্যম এবং চেষ্টা তাহাকেই কর্ম্ম বলে। যদি তাহাই হয় তবে যতদিন আমরা অপূর্ণ ততদিনই আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে, যদিও অবস্থাভেদে এই কর্ম্ম বিবিধ আকার ধারণ করে, এমন কি যে কর্ম্ম এক অবস্থায় কর্ত্তব্য, তাহাই আবার উন্নত অবস্থায় ত্যাজ্য। আমরা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগেও পরে দেখাইতেছি যে কর্ম্ম সেখানেও অপরিহার্য্য, যদিও সে কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি বা ব্রতনিয়মাদি করিবেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হইবে; নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, কখনই মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে না। কর্ম্মফল প্রকৃতির মধ্যেই আবদ্ধ, ভূলোকই হউক আর স্বর্লোকই হউক; সুতরাং কেবল তদ্দ্বারাই প্রকৃতির অতীত সেই পরম পুরুষকে লাভ করা অসম্ভব। যিনি যাহাই করুন না কেন লক্ষ্য "নারায়ণ" হওয়া উচিৎ; তাঁহারই শ্রীচরণে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক যখন যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় এবং মহাপুরুষগণের মতের বিরোধী না হয় সেই কর্ম্মগুলি ধীরভাবে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কারণ—কাম ক্রোধ লোভ বা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের অবনতিই হইয়া থাকে; ঐরূপ কর্ম্ম কখনই তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্ম শাস্ত্রীয় কি না অর্থাৎ সেই যুগের মহাপুরুষগণের অনুমোদিত কি না ইহা বিচার পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিৎ (গীতা ১৬।২১—৪, ত্রিবিধং নরকস্যেদং…… কর্ত্তুমিহার্হসি।)

অতএব আমাদের কর্ম্ম এরূপ ভাবে হওয়া উচিৎ যেন আমাদের কৃত সমস্ত কর্ম্মগুলি শ্রীশ্রীভগবানের পূজাস্বরূপ গৃহীত হয়।—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নম্ সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥"

জ্ঞানযোগ—দ্বিতীয় সাধনমার্গ জ্ঞানযোগ। বহু প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক শাস্ত্রে এই জ্ঞানযোগই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে; মধ্যযুগে ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞানযোগকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনের উপায় বলিয়া গিয়াছেন। (১) নিত্যানিত্য-বিবেক-জ্ঞান (২) ইহামুত্র-ফল-বিরাগ (৩) শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও (৪) মুমুক্ষুত্ব—এই সাধন চতুষ্টয়ই এই জ্ঞানযোগের অন্তর্গত। প্রত্যেক জীবই জন্মকাল হইতে অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করে, সংসারের যাবতীয় পদার্থের সঙ্গেই নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং দেহ, গেহ প্রত্যেক জিনিসেই সে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে। এ অবস্থায় তাহাকে একজন্মবাদী বা শূদ্র বলা যায়। পরে যখন সদ্গুরুর সংস্পর্শে এই অনিত্যের অন্তরালে কোন নিত্য সত্য বস্তুর সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান পায় তখন সে সদ্গুরুর নিকট উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে নিত্যের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং

নিজের নিত্য জন্মে বা অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হয় তখন তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। এই দুই অবস্থায় নিত্যানিত্য-বিবেক-জ্ঞানই তাহার প্রধান সাধন। বলা বাহুল্য যে নিত্য-জ্ঞানের আস্বাদ পাইলেই তাহার ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকের সুখের প্রতি অনাস্থা জন্মে। তখন সে ইহামুত্র-ফল-বিরাগরূপ দ্বিতীয় সাধন প্রণালীতে অগ্রসর হয়। তৎপর শমদমাদির সাধন দ্বারা সে নিত্যের দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার আচরণও সাধারণ লোকের আচরণ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। যে সমস্ত কর্ম্ম নিত্য-সুখের আস্বাদনের বিরোধী সে-গুলিকে তিনি স্বরূপতঃ বর্জ্জন করেন এবং যেগুলি নিত্যের সাধক সেগুলি তিনি আশ্রয় করেন; এবং লোক সংগ্রহের জন্য যদি তিনি কখন কোন কার্য্যও করিতে বাধ্য হন তাহা নিষ্কাম ভাবেই করিয়া থাকেন, কারণ সাধারণ লোক তাঁহারই আচরণ অনুসরণ করিবে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥" (৩।২১)

এই অবস্থায় তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। তৎপর যখন তিনি নিত্যেরই পুরোহিত, নিত্যেরই রক্ষক; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা নিত্যের চিন্তায় ব্যাপৃত, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। যখন তিনি সাধন-পথে এতদূর অগ্রসর হন যে অধিকাংশ সময়ই নিজেকে বাহ্য-জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিয়া সেই নিত্য-সত্য পদার্থে বিলীন করেন তখন সেই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় তিনি বেদ বা ব্রহ্ম। যতদিন প্রাকৃতিক দেহ থাকে ততদিন তিনি জীবন্মুক্ত; প্রাকৃতিক দেহ ধ্বংসের পর নিত্য স্বরূপে অবস্থিতি করেন।

এই সাধন-প্রণালী আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে শ্রদ্ধা কিংবা অনুরাগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না; যথা—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥" গীতা (৪।৩৯)
"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥" গীতা (৪।৪০)

এবং শমদমাদি কর্ম্ম ভিন্ন সিদ্ধিলাভও করা যায় না। সুতরাং যদিও যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম এ প্রণালীতে দরকার নাই সত্য তত্রাচ জ্ঞানের সাধন করিতে হইলে যে কর্ম্মগুলি দরকার

তাহাদের সম্পূর্ণ অপেক্ষা থাকে। অতএব ভক্তি এবং কর্ম্ম ক্রোড়ীভূত জ্ঞানমার্গই জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত।

ভক্তিযোগ—এখন ভক্তিযোগের বিষয় সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। ভক্তিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) বৈধী বা সাধন ভক্তি, (খ) রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মগুলি আচরণ করিয়া যে শ্রীভগবানের ভজন তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য আত্মনিবেদন—শ্রীমৎ প্রহ্লাদোক্ত এই নববিধ সাধনই বৈধভক্তির অন্তর্গত। এবং স্বাভাবিক প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তি পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন বৈদিক যুগে ভক্তির সাধন সম্বন্ধে বড় একটা কিছু শুনা যায় না, এমন কি প্রাচীন শাস্ত্রে ভক্তি কথাটাই পর্য্যন্ত নাই। ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য বলা যায় না। কারণ প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে আত্মাকে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জ্ঞান বা অন্য কোন সাধন প্রণালী দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; ইনি যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহারই নিকট ইঁহার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"—কঠোপনিষৎ ২।২৩

এইটি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আত্মার নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা বা কৃপা সাপেক্ষ। কোন সাধনভজনের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই কৃপাকেই পরবর্ত্তী কালে ভক্তিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। মণ্ডুকোপনিষদেও বলা হইয়াছে—"সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি"; ইহাতে ভক্তির স্বরূপ স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে যাঁহার দেবতা এবং গুরুতে সমান ভক্তি তাঁহারই নিকট তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং ভক্তিকে একেবারে বিদেশ অনুস্যূত অথবা দেশের ভুঁইফোঁড় বলা সমীচীন হইবে না। গীতাতেও একাদশ অধ্যায়

ভগবান বলিয়াছেন যে বেদ, তপস্যা, দান, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা এই রূপ দৃষ্ট হয় না ; কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই আমার এই রূপ ধ্যাত, দৃষ্ট ও অধিগত হইয়া থাকে।

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ (১১।৫৩)
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (১১।৫৪)

বেদোক্ত "নায়মাত্মা" ইত্যাদি বচন এবং গীতার এই দুইশ্লোক একত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যদিও আত্মা স্বাধীন এবং তাঁহার স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা বা কৃপা সাপেক্ষ, তত্রাচ ভক্তের নিকট তিনি প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত তাঁহার অনন্য ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়া থাকেন স্মৃতিতেও বলিয়াছেন "অহং ভক্ত পরাধীনঃ" "সাধবঃ হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্" ইত্যাদি ; গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (১৮।৫৫)

অর্থাৎ "আমি যৎস্বরূপ যৎস্বভাব তাহা নির্গুণ ভক্তিদ্বারাই জীব জানিতে পারেন।" এখন প্রশ্ন হইতেছে এই ভক্তির স্বরূপ কি? জ্ঞান বলিতে বুঝায় "চিদেকরসম্" (ষট্‌সন্দর্ভ) জ্ঞান, চিৎ ও রস শব্দ শ্রুতিতে ব্রহ্ম স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। রস ও চিৎ উভয়ের পরিবর্ত্তে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ স্থলে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য জ্ঞান শব্দটির অর্থ প্রকরণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে বলিতেছেন—"বিদ্যা বেদন পর্য্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধং। একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বম্ পদার্থানুভবরূপম্।" দ্বিতীয়ন্তু অপাঙ্গবীক্ষণবদ্ বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি।" অর্থাৎ জ্ঞান দুই প্রকার বিদ্যা ও বেদন ; একটি নিমেষ শূন্য দর্শনের ন্যায় তত্ত্ব পদার্থানুভবস্বরূপ এবং তৎ পদার্থপরিশুদ্ধিবিজ্ঞানস্বরূপ ; অপরটি অপাঙ্গবীক্ষণ বা কটাক্ষ দর্শনের সদৃশ। প্রথমটি বিদ্যা বা জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি বেদন বা বিচিত্র ভক্তিরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবও

তাঁহার শিক্ষাষ্টকে প্রেমভক্তিকে "বিদ্যাবধূ" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রস বলিতে যেরূপ সকল প্রকার রস বুঝায়—তদ্রূপ জ্ঞান শব্দে বিদ্যা বেদনরূপ উভয় বিধ জ্ঞানই বুঝাইয়া থাকে। ভক্তি জ্ঞান হইতে একবারে বিরোধী পদার্থ নহে। অথর্ব্বশিরসিতাপনী শ্রুতিতে দেখা যায়—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" পুনশ্চ "বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি।" ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানের চরণ দর্শন করাইয়া থাকেন, ভক্তিই ভগবদ্ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। বিজ্ঞানানন্দঘন মূর্ত্তানন্দস্বরূপ ভগবান সচ্চিদনন্দরূপ ভক্তি যোগেই অবস্থিত। স্পষ্ট এস্থলেও ভক্তির সচ্চিদানন্দরূপত্ব উল্লেখ করা হইল। মণ্ডুকোপনিষদের উক্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল দেখা গেল। উপরোক্ত উপনিষদে ভক্তির স্বরূপ আরও স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে যথা—"ভক্তিরস্য ভজনং, তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং"—অর্থাৎ—ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার ফলকামনাশূন্য হইয়া শ্রীভগবানে মনঃকল্পনা বা মনোনিবেশরূপ ভজনকেই ভক্তি বলা হইল। উহাই আবার নৈষ্কর্ম্ম্য—অর্থাৎ মোক্ষের বা সর্ব্বপ্রকার মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। এই লক্ষণটী ঠিক প্রেম ভক্তির লক্ষণ বলা যায় না। নিষ্কাম হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভজনকেই ভক্তি বলা হইল ইহাই বুঝায়। পূজনীয় শাণ্ডিল্য ঋষি ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" এখানে ঈশ্বরে গাঢ় অনুরাগকে ভক্তি শব্দে অভিহিত করা হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত তাপনীশ্রুত্যুক্ত "অমুষ্মিন মনঃকল্পনং" এর সঙ্গে ইহার মিল আছে বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু একটু গাঢ় অনুরাগের আভাস পাওয়া গেল। এই দুইটি একত্র করিলে দেখা যায় কামনা শূন্য হইয়া গাঢ় অনুরাগের সহিত ঈশ্বরের ভজনকে ভক্তি বলা যায়। গীতার ৯।১৪ শ্লোক হইতে পাওয়া যায়—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ় ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

এখানে দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীভগবানের কীর্ত্তন ও যজন এবং সমাহিত চিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনাই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইল। ইহাকে সাধনভক্তি বলা যাইতে পারে। শ্রীমন্নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে বলিতেছেন—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা ; অমৃত রূপাচ।"

এখানে ভক্তির স্বরূপ "প্রীতি" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। যদিও "কস্মৈ" পদে ঈশ্বরকে বুঝায় সত্য তত্রাচ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে "কস্মৈ" পদ প্রয়োগ হেতু ভক্তির স্নিগ্ধত্ব ও সুকোমলত্ব সূচিত হইল। অপরিস্ফুটভাবেই যেন প্রিয়তমের নামটি শ্রুতিগোচর হইল। কিন্তু পূজ্যপাদ দেবর্ষি নারদ তাঁহার পঞ্চরাত্ররহস্যে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন যথা—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে উপাধি সকল পরিত্যাগ করিয়া তৎপ্রাপ্তি অভিলাষহেতু নির্ম্মলভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যে হৃষীকেশ গোবিন্দের সেবা—তাহাই উত্তমা ভক্তি নামে অভিহিত। অতএব ইঁহার মতে শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রগাঢ় প্রীতির সহিত সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবাই ভক্তিপদবাচ্য। এই ভক্তিই অমৃতস্বরূপা। ইহা লাভ করিলে জীব আনন্দিত হয়েন, আত্মারাম হয়েন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ এইরূপ করেন যথা—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
"কৃষ্ণানুভজনমিতি পাঠান্তরং।"

কেহ কেহ এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে করেন যে উক্ত গোস্বামীপাদ ইহার দ্বারা জ্ঞানের সহিত ভক্তির চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। উপরে উক্ত হইয়াছে ভক্তি ও এক প্রকার জ্ঞান বিশেষ; সুতরাং জ্ঞানের সহিত ইহার বিচ্ছেদ অসম্ভব। এখন আমরা এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলাদি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও অনুগতভাবে তাঁহার ভজনকে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবাই অনুভজন শব্দের অর্থ। এই সেবাও করিতে হইলে অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ স্বরূপতঃ ত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্বারা কৃষ্ণেতর বিষয়ে সম্পূর্ণ মমতাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী তৃষ্ণাকে বলবতী রাখিয়া মমতাধিক্য বশতঃ অনুকূলভাবে যে তাঁহার ভজন বা অনুশীলন তাহাই উত্তমা ভক্তি বা প্রেম ভক্তি নামে অভিহিত করা হইল।

যে সমস্ত কর্ম্মের বা জ্ঞানের বিষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান নহেন অথবা যেগুলি তাঁহার নিকট হইতে সাধককে দূরে লইয়া যায় সেইগুলিকে সম্যকরূপে পরিহার পূর্ব্বক ভগবদ্ ভজন করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। এজন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ত্রিবিধ কর্ম্ম স্বরূপতঃ বর্জ্জনীয়; কারণ এই সকল কর্ম্মের লক্ষ্য ঐহিক বা পারত্রিক সুখ। কর্ম্ম মাত্রই ত্যাজ্য বলা হইল না, অতএব এখানে কর্ম্ম বলিতে ভগবানের সেবাত্মক কর্ম্ম বুঝিতে হইবে না। প্রেমভক্তির বিষয় ভগবান এবং আশ্রয় ভক্ত। এজন্য যে জ্ঞান, ভক্তির বা প্রীতির বিষয় হইতে আশ্রয়ের ভেদ রাখে না তাহা নিশ্চিতই বর্জ্জনীয়। পক্ষান্তরে যে জ্ঞান দ্বারা প্রেমাস্পদের স্বরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হয় তাহা পরিহারযোগ্য হইতে পারে না। অতএব এই শ্লোকের "জ্ঞান" পদে অভেদ ব্রহ্ম জ্ঞান বুঝিতে হইবে। জ্ঞান মাত্রই বর্জ্জনীয় বুঝিতে হইবে না। ভগবদ্ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জ্ঞান ভক্তি সাধনে সহায়তাই করে। যথা—

কৃষ্ণাবাপ্তি ফলা ভক্তি রেকান্তাত্রাভিধীয়তে।
জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্ব্বা সা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ ॥
(প্রেমেয় রত্নাবলী)

অর্থাৎ যদি এই ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ব্বিকা হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ ফল প্রকাশিত করে।

এই ভজন অনুকূলভাবেই করিতে হইবে প্রতিকূলভাবে নহে। এজন্য সাধারণ কাম যাহার লক্ষ্য আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি, ক্রোধ বা দ্বেষ এবং ভয় এই ভক্তি সাধনের অত্যন্ত প্রতিকূল বুঝিতে হইবে। যেমন প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত বস্তুর সত্ত্বা পরিবর্ত্তনশীল উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানমার্গের সাধক নিত্যানিত্যবিবেকজ্ঞান প্রভৃতি সাধন চতুষ্টয় দ্বারা এক অখণ্ড চিন্ময় সত্ত্বার অস্তিত্ব জ্ঞানে উপস্থিত হয়েন এবং ঐ তত্ত্বকে "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" বলিয়া উপলব্ধি করেন, পরিশেষে সেই অনন্ত সত্ত্বায় নিজের সত্ত্বাকে বিলীন করিয়া নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। তদ্রূপ এই প্রাকৃতিক জগতে অবিমিশ্রিত সুখের অত্যন্তাভাব দেখিয়া অর্থাৎ সমস্ত সুখই দুঃখের নিত্য সহচর অতএব নশ্বর জ্ঞান করিয়া প্রেমভক্তির সাধক কোন অখণ্ড চিন্ময় নিত্যসুখের আধারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সাধনবলে পরিশেষে

ঐ তত্ত্বকে "জ্ঞানং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি" উপলব্ধি করেন। এই নিত্য সুখের অস্তিত্ব নিত্য সত্ত্বার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পরিণামী জগৎ হইতে আমার সত্ত্বা পৃথক ও নিত্য এই জ্ঞানেই ভক্ত সন্তুষ্ট হয়েন না। তাঁহায় সাধনভজন প্রণালী তাঁহাকে ইহার উপরে লইয়া যায়। তিনি সমগ্র অদ্বয়জ্ঞান বা রসতত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক খুঁটিয়া দেখিতে চাহেন ও আস্বাদ করিতে চাহেন। এজন্য ভক্তির স্বরূপ "অপাঙ্গবীক্ষণ" বলা হইয়াছে। প্রীতিই ভক্তকে শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়া তাঁহার গুহ্যরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখান। এই ভাবে দেখিলে ভক্তিকে সর্ব্বগ্রাসিনী বলা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ তাঁহার উপদেশামৃতে প্রীতির লক্ষণ করিয়াছেন :— দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণং ॥

বলাবাহুল্য গুহ্যভাষণ ও গুহ্যবিষয়ের প্রশ্নই প্রীতির মুখ্য লক্ষণ। এক ভগবান ভিন্ন এই প্রাকৃত জগতে এরূপ প্রিয়তম সঙ্গীর মিলন অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তৃপ্তি অসম্ভব। সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ বিশেষ রূপে বিচার করা হইয়াছে। উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা গেল যে ভক্তি আনন্দস্বরূপা এবং ভগবানকে বশ করিবার অব্যর্থ মন্ত্র। যদি তাহাই হয় ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই স্বরূপ বুঝিতে হইলে চারি প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যথা—(১) প্রাকৃতসত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা। (২) ভগবজ্জ্ঞানানন্দরূপ। (৩) জৈবানন্দরূপা এবং (৪) হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসাররূপা। প্রথমটি হইতেই পারে না কারণ তাহাতে শ্রীভগবানের মায়াবশ্যতা দোষ আপতিত হয়; দ্বিতীয়টিও অসঙ্গত কারণ শ্রীভগবান ভক্তের ভক্তিতেই আনন্দাধিক্য অনুভব করেন ইহাই প্রসিদ্ধ আছে; তৃতীয়টিও অসম্ভব কারণ জীব অতি ক্ষুদ্র তাহার জ্ঞানানন্দও তদ্রূপ, তদ্দ্বারা ভগবানের বশ্যতা সঙ্গত হয় না। অতএব চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য হইতেছে; অর্থাৎ হ্লাদিনী এবং সম্বিতের সারভাগই ভক্তিপদ বাচ্য। এখন এই হ্লাদিনীও সম্বিতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

বৈষ্ণব মতে শ্রীভগবান নিত্যপরাশক্তি যুক্ত। এই শক্তি বলেই তিনি সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশিত হয়েন। এই পরাশক্তি এক হইলেও ইঁহার ত্রিবিধাবৃত্তি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে

উক্ত হইয়াছে তাঁহাতে জ্ঞান বল ক্রিয়ারূপিণী ত্রিবিধাশক্তি নিত্য বিরাজমানা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে— হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ তয্যেকা সর্ব্ব সংশ্রয়ে।

হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনো গুণবর্জ্জিতে ॥

(শ্রুত্যুক্ত বল জ্ঞান ও ক্রিয়া যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বুঝিতে হইবে।)

অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ তোমাতে নাই কারণ তুমি নির্গুণ বা গুণবর্জ্জিত, কিন্তু সর্ব্বাশ্রয় যে তুমি তোমাতে সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী নাম্নী ত্রিবৃত্তিকা একা-শক্তি নিত্য বিরাজমানা। এই ত্রিশক্তির ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জীবগোস্বামী এরূপ করিয়াছেন—সদাত্মা ভগবান যদ্দ্বারা সত্তাবিশিষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং দেশ, কাল, প্রকৃতি ও জীবকে সত্ত্বা প্রদান করেন তাহাকে তাঁহার সন্ধিনী শক্তি বলা হয়। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা তিনি জ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীব সকলকে জ্ঞান বিশিষ্ট করেন তাহাই সম্বিৎ নামে অভিহিত। এইরূপে সেই ভগবান নিজে আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা তিনি আনন্দবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীব সকলকে আনন্দিত করেন তাহাকে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ শ্রেষ্ঠ এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী শ্রেষ্ঠ ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল জ্ঞান ও আনন্দের সারভাগই ভক্তি বা প্রেম। প্রেমের অপর আখ্যা "আনন্দচিন্ময় রস।" প্রেমের আস্বাদনও প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় না থাকিলে হয় না; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ জন্য ভক্তের সহিত ভগবানের মিলনের পূর্ব্বে ইহার প্রকাশ অসম্ভব। যেমন প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে বাৎসল্য প্রেম স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পুত্রের অভাবে ইহা প্রকাশ পায় না ইহাও তদ্রূপ। এজন্য ভগবদ্ভক্তি ঈশ্বরের শক্তি হইয়াও অপরিস্ফুটভাবে তাঁহাতে অবস্থান করেন ইহাই বুঝিতে হইবে। পরম গম্ভীর রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের তাঁহার সহিত মিলিত হইবার প্রবল তৃষ্ণা প্রযুক্ত ক্ষুব্ধ হয়েন, তখন এই প্রেমভক্তি আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের সহিত ভগবানের মিলনকার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে প্রেমের উদ্বোধন ও আস্বাদন জন্য ভগবান ও ভক্ত উভয়ের নিত্যসত্ত্বার আবশ্যক। এজন্য "অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান" পরিত্যক্ত হইল এবং ভক্তির জ্ঞানবিশেষত্বও সিদ্ধ হইল। বেদান্ত সূত্রে উক্ত হইয়াছে— "আ প্রায়ণাৎ তত্রাপি দৃষ্টমিতি।" অর্থাৎ মোক্ষাবস্থাতেও ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য দৃষ্ট হয়। শ্রীশুকদেব

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দানুভবী ভক্তবৃন্দ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যদি ভক্তি হ্লাদিনী-সম্বিৎসারাভূতই হয়েন তাহা হইলে ইহাতে কোন হানি হইতেছে না। বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানকে জানা যায় সত্য কিন্তু ভগবদ্বিষয়ক প্রেম লাভ করা যায় না। কেবল সাধন-ভক্তি দ্বারাই সাধ্য-ভক্তি বা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তি লাভ হয়। শ্রীভগবানের সম্যক্ সেবা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে উহা অনুভব করিতে পারা যায়। এই ভগবৎ সাক্ষাৎকারও একমাত্র অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তির দ্বারা হয়, অন্য কোন সাধনের দ্বারা হয় না। অহৈতুকী অর্থে নিষ্কামা,—অব্যবহিতা, মধুধারাবৎ ব্যবধানরহিতা। এইরূপ ভক্তি লাভ হইলে ভক্ত সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য বা সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি শ্রীভগবান দান করিলেও গ্রহণ করেন না। ভক্ত কেবল শ্রীভগবানের প্রেম সেবা করিয়াই সন্তুষ্ট (শ্রীমদ্ভাগবত)! অতএব শ্রীভগবানে যে প্রীতি তাহার আসন সমস্ত সাধনভজনের উপরে ইহা সিদ্ধ হইল।

এখন স্পষ্টই দেখা গেল যে ভগবৎ অনুসন্ধিৎসুজ্ঞান এবং ভগবৎ সেবাত্মক কর্ম্ম ভক্তিসাধনের অঙ্গ। এইরূপ জ্ঞানও কর্ম্ম-ক্রোড়ীভূত ভক্তিকে ভক্তিযোগ বলা যায়। কর্ম্মযোগকে প্রধানতঃ যেরূপ প্রবৃত্তিমার্গের অন্তর্গত বলা হয়, জ্ঞানযোগকে যেরূপ নিবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত বলা হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগকে পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "নিবৃত্তিকর্ম্মমার্গ" আখ্যা দিয়াছেন। যেমন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দিলে নিবৃত্তিতে পৌঁছান অসম্ভব হইয়া উঠে, পতন অবশ্যম্ভাবী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকেও কেবল সংযমের পথে রাখিলে তাহারাও অবসর বুঝিয়া প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিবৃত্তি-মার্গ-সাধকগণের সাময়িক পতন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা কখনই অপরিহার্য্য নহে—"অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ"। গীতা হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে পার্থ-সারথি এই মতই প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম মাত্রেই এই মতের পরিপোষক। অবশ্য সংযমকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন বাক্যের বেগ, মনের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ যিনি সহ্য করিতে শিখিয়াছেন তিনিই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। তাঁহারই মতে অত্যাহার (অতিবিহারও ইহার অন্তর্গত), প্রজল্প, প্রয়াস (অলসতা), নিয়মাগ্রহ (উচ্চ অঙ্গের অধিকারী হইয়া নিম্ন অঙ্গের সাধনের

প্রতি আগ্রহ) জনসঙ্গ (অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা লম্পটসঙ্গ—এক কথায় সর্ব্ব প্রকার অসৎসঙ্গ) এবং লৌল্য (চিত্তচাঞ্চল্য)—এইগুলি সমস্তই ভক্তিপথের অন্তরায়। পক্ষান্তরে উৎসাহ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ধৈর্য্য, ভক্তির অঙ্গীভূত কর্ম্ম সকল, সদ্বৃত্তি এবং অসৎসঙ্গ স্বরূপতঃ বর্জ্জন, ভক্তিপথের অনুকূল। সুতরাং যাঁহারা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের উপরোক্ত উপদেশাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

দান।

—:০:—

[তুলসীদাস]

প্রকৃতি-বন-ভবনে এল
বসন্ত সে অতিথি
রচিল স্নেহে শুষ্কপাতে
আসন তার প্রকৃতি।
হৃষ্ট তাহে অতিথি বড়
গেল সে আশীর্ব্বাদি গো—
শোভিল সারা বনে নিমেষে
সুপল্লব ভাতি ও।

কহিছে কবি বিভল হয়ে'
মিথ্যা নহে কথা এ
দানের চেয়ে ধর্ম্ম নাহি—
দান যে নহে বৃথা হে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চরকার কথা।

—:০:—

১৯২১ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসে কোচবিহারে বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছে ৭,৮৫,৯৩৪ টাকার, আর দেশী কাপড় আসিয়াছে ১,০১,৯৩০ টাকার। এই সংখ্যা হইতে দেখা যায় কোচবিহারে বিলাতী কাপড়ের চাহিদা এখনো খুব বেশী। কোচবিহারের যে অধিক সংখ্যক লোক বিদেশী কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের স্বদেশের প্রতি প্রেম থাকিলেও তাহা যে গভীর তাহা মনে হয় না। এই সব লোক স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এবং বস্ত্র সমস্যা মীমাংসার তরে সকল রকম আলোচনা ও আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। Sentiment যদি ইঁহাদের প্রবল হইত তাহা হইলে এই চড়কা ও খদ্দর প্রচার আন্দোলনের দিনে, হাজার হাজার দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ইঁহারা বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতেন না। আমার

মনে হয়, এই শ্রেণীর লোক দারিদ্র্যের জন্যই হউক, ব্যক্তিগত বেশী লাভ লোকসানের হিসাব খতিয়ান্ করিয়া চলেন। কাজেই কোচবিহারের বাজারে যে কাপড় সস্তা তাহাই তাঁহারা ক্রয় করেন।

এখন প্রশ্ন এই কি করিলে এই এতগুলি লোক দেশী কাপড় কিনিতে রাজী হইতে পারে? আমার মনে হয়, চলনসই আটপহরা দেশী কাপড় যদি বাজারে বিলাতী কাপড়ের চেয়েও সস্তায় পাওয়া যায়, তাহা হইলেই এই সব লোক দেশী কাপড় কিনিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে। নচেৎ তাহাদের ভাবের ঘরে নাড়া দিয়া কোনও সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেশী আটপহরা কাপড় বিলাতী কাপড়ের চেয়েও সস্তায় দিতে হইলে, দেশী কাপড়ের কলের মালীকদের উচিত অল্প লাভে কাপড় বিক্রয় করা, কিন্তু দেখিতেছি কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না। আমাদের দেশী কলের মালীকেরাও বিদেশী কলওয়ালাদের চেয়ে লাভের জন্য কম লোভী নহেন। এমন অবস্থায় প্রতি সহরে এবং গ্রামে চড়কা ও তাঁত প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। ঘরে চরকায় সূতা কাটিয়া স্থানীয় তাঁতীকে বানি দিয়া যদি কাপড় বুনাইয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে খুব সস্তায় কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। তখন কাপড়ের দাম পড়িবে, তুলার দাম তাঁতীর বানি, অর্থাৎ বড় জোর জোড়া প্রতি ২৸০ দুই টাকা বার আনা। ইহার চেয়েও কমে হয়। এই হিসাবে সূতা কাটনার মজুরর ধরি নাই। কারণ চড়কায় সূতা কাটা হয় অবসর সময়ে। সূতা কাটনার মজুরী যোগ করিলেও ঐ কাপড়ের দাম বিলাতী কাপড়ের চেয়ে কম থাকিবেই। তাহার পর, এখনো যদি প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর এক কোণে চার পাঁচটী কাপাস গাছ রোপণ করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসর হাতে বুনা কাপড়ের দাম আরও কমিয়া যাইবে। কারণ তখন গৃহস্থের সূতা কাটিবার জন্য তুলাও কিনিতে হইবে না। সূতা তো গৃহস্থালীর অবসরে গল্প করিতে করিতে কাটা হইবে। কাজেই কার্য্যতঃ কেবল তাঁতীকে কাপড় বুনিবার বানি দিলেই কাপড় পাওয়া যাইবে।

তখন পাঁচ সিকা সাত সিকা খরচ করিলেই এক জোড়া কাপড় পাওয়া যাইতে পারিবে। এই প্রথা অবলম্বন করিলেও কোচবিহারের লোক যদি হাত পা গুটাইয়া পাবনা, ঢাকা, অথবা নোয়াখালির তাঁতীর বুনা কাপড়ের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে, কোচবিহারের বাজারে দেশী হাতে-বুনা কাপড় বিলাতী কাপড়ের চেয়ে সস্তায় পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরাও যে ভারতে অতি সস্তায় কাপড় যোগাইবার জন্য জোট বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোচবিহারের প্রতি গ্রামে এবং কোচবিহার সহরে চরকা ও তাঁত প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে কোচবিহারবাসী সস্তায় কাপড় পাইতে পারেন। নতুবা অন্য জেলা হইতে হাতে-বুনা কাপড় কোচবিহারে আমদানী করিয়া বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগীতা করা দুঃসাধ্য হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। | পৌষ, ১৩২৯ সাল। | ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

ওপারে।

—:০:—

দেখা হবে কিনা বঁধু হে জানি না
তোমায় আমায় ওপারে
বুকে বাজে ভয় ভুল যদি হয়
অজানা দেশের আঁধারে!
কত অচেনারে করি আপনার
কত কহি কথা কত বেদনার
নয়নে নয়নে না রাখিলে যদি
ভুলে যাই চেনা সবারে
তাই বড় ভয় ভুল যদি হয়
চিনিতে তোমায় ওপারে!

তবে কিগো কথা কহিব না হেথা
অচেনা পথিকে পথিকে ?
পথে দেখা হলে চেয়ে যাব চলে
বাসিব না ভাল সাথিকে ?
পথ পাশে বসি কব দু'টি কথা
ঢেলে যাব নিতি প্রেম ব্যকুলতা
প্রাণের মাধুরী বাড়াব গো তায়
জ্বালাব প্রেমের জ্যোতিকে
পথে বসে হেথা কয়ে যাব কথা
বেসে যাব ভাল পথিকে !

ও পারের তীর ভরা কালো নীর
চির আঁধারের আড়ালে
ও পারের বাঁশী ডাকিলে গো আসি
ফিরে পাব বুকে হারালে !
কত ভালবাসা পেয়েছি তোমার
নেমে গেছে কত হৃদয়ের ভার
মোরে লয়ে কত সকট রথে
দুর্গম পথে দাঁড়ালে
এত বিনিময় ভুল কিগো হয়
চির আঁধারেরও আড়লে !

শ্রীঅজয়কুমার বসু।

দার্জ্জিলিং উকপণ্ঠে।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ডাকবাংলোর সম্মুখে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলাম। বাংলোটি বেশ শান্ত নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত, এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যও বড় মনোরম। বাংলো হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত কার্শিয়াং টাউনটির ঘর বাড়ীগুলি ও পাহাড়ের গায় গায় রেল লাইনটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, যেন একখানি সুচিত্রিত মনোরম ছবি !

প্রায় সাড়ে আটটার সময় খাসমহালের "মণ্ডল" "কারবারীকে" সঙ্গে লইয়া বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগের হিসাবাদি পরিদর্শন জন্য ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলাম।

এদেশে গ্রামের প্রধান মাতব্বর ব্যক্তির হস্তেই খাসমহালের আদায় তহশিলের "(মালগুজারি)" ভার ন্যস্ত থাকে, এবং অনেক বিষয়েই সরকারকে মণ্ডলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাধারণতঃ বিশেষ কোন কারণ বা অপরাধ ব্যতীত মণ্ডল পরিবর্ত্তন করা হয় না, এক মণ্ডলের বংশধরগণই পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক বা ততোধিক গ্রামের মণ্ডলগিরি করিয়া থাকে। আপন আপন সুবিধা ও সাহায্যের নিমিত্ত প্রত্যেক মণ্ডল নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে ও নিজ দায়িত্বে এক এক জন "কারবারী" নিযুক্ত করে, এবং তাহারাই মণ্ডলদিগের প্রতিনিধিরূপে মহাল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করে।

বৈকালে খাসমহালের দিকে বেড়াইতে গেলাম, ফিরিবার পথে দেখিতে পাইলাম এক দল লোক ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা প্রভৃতি বাজাইয়া চড়াই পথে উঠিয়া আসিতেছে, তৎপশ্চাতে একটি বাঁশে কাপড় বাঁধিয়া এক ব্যক্তিকে "বাঁদর ঝুলান" করিয়া চারিজন লোকে বহিয়া আনিতেছে, এবং তৎপার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে আসিতেছে। সর্ব্ব পশ্চাতে আরও কতকগুলি লোক ইহাদিগকে অনুগমন করিতেছিল। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ব্যাপার কি কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম গ্রামে সেদিন

একটি বিবাহ ছিল এবং ইহারাই সেই বিবাহের বর ও বরযাত্রী। বর বেচারীর "বাঁদর ঝোলা" অবস্থা দেখিয়া হাসিও পাইতেছিল দুঃখও হইতেছিল। অন্য অবস্থায় কেহ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে স্বীকৃত হইত কি না জানি না, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বরটি বোধ হয় শুধু আশু-স্ত্রীলাভের আশায় বুক বাঁধিয়া নিতান্ত গোবেচারীর মত উর্দ্ধমুখে হস্তপদ বিস্তার করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। অশ্বারোহণে যিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন তিনি বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এদেশে চড়াই, উৎড়াই পথে একমাত্র অশ্বব্যতীত অপর কোন যানবাহনাদির সুবিধা নাই, সুতরাং বরের ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না; আমি আরও অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি লোকে রুগ্ন অথবা অশক্ত স্ত্রী পুরুষকে কুলীর পিঠে করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়।

ইতিমধ্যে একটি লোক আসিয়া আমাকে বিবাহ দেখিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল এবং তখনই তাহার সঙ্গে বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। আমি পূর্ব্ব হইতেই এরূপ একটি সুযোগ খুঁজিতেছিলাম সুতরাং মৌখিক সামান্য একটু ওজর আপত্তি দেখাইয়া অবিলম্বে তাহার অনুসরণ করিলাম।

বর ও বরযাত্রিগণ বিবাহবাটীতে পঁহুছিবা মাত্রই এক ব্যক্তি একখানি থালায় করিয়া কিছু দধি ও চাউল লইয়া সম্মুখদিকে ছিটাইতে লাগিল, এবং গৃহস্বামী সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাটীর অঙ্গনে লইয়া বসাইলেন।

তৎপরে বরকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়ে স্বপক্ষীয় কয়েক জন সগোত্রকে লইয়া একজন ব্রাহ্মণের সমক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে কি কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। "দুধওয়ালী" অর্থাৎ কনের মাতার প্রার্থিত মত অর্থ বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি বাগ্‌দান করেন এবং বরের অঙ্গুলিতে "সাই মুন্দ্রি" অর্থাৎ বাগ্‌দানের নিদর্শন স্বরূপ একটি অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া থাকেন। বরের হস্তে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া কনের পিতা কহিতে লাগিলেন "আজ হইতে আমার কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এখন হইতে সে তোমার, যদি কখনও পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতে তাহার চাল চলনে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ হয় তাহা হইলে তুমি তাহাকে মাটীর হাঁড়ি যেমন লোকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে সেইরূপ করিয়া খণ্ডখণ্ড করিও।"

বাগ্‌দানই পাহাড়িয়াগণের হিসাবে প্রকৃত বিবাহ। বাগ্‌দানান্তে বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া কনের পিতা ও তাঁহার আত্মীয় আত্মীয়াগণ একে একে তাহার পদ ধৌত করিয়া দেন। ইহাদিগের সংস্কার ইহাতে বিশেষ পুণ্য অর্জ্জন হয় এবং এ নিমিত্ত সকলেই উপবাসী থাকিয়া "গোড় ধোয়ানি" ব্যাপার সমাধা হইলে পর আহার করিয়া থাকেন। বরের সম্মুখে একটি বৃহৎ তাম্রপাত্র ও অপর একটি জলপূর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তাম্র পাত্র রক্ষিত হয়। বরের পদধৌত জল বৃহৎ পাত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, দান স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ অপর পাত্রটির মধ্যে রক্ষা করা হয়। এই দানের "অর্থ" বরের পিতার প্রাপ্য সুতরাং তিনিই ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই রাত্রিতে কনের পিতা বরপক্ষকে একটি ভোজ প্রদান করেন, কিন্তু এই প্রীতি ভোজে বরের পিতাকেও নিজ গৃহ হইতে আনীত কিঞ্চিৎ দধি ও কলা নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হয়।

বিবাহের সময় নিরূপণ জন্য একটি "পোলা" অর্থাৎ ঘড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ছোট একটি তাম্রপাত্র একটি জলপূর্ণ বৃহৎ তাম্র পাত্রের মধ্যে ভাসিতে ছিল, ছিদ্রপথে জলপূর্ণ হইয়া ছোট পাত্রটি যখন ডুবিয়া যাইবে তখন বিবাহের সময় উপস্থিত হইবে। যোল লগ্নে বিবাহের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পাহাড়িয়াগণ তিথি নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে মানিয়া চলে, এবং কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে অথবা এমন কি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে হইলেও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সময় নিরূপণ না করিয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি হিসাব অনুসারে সময় নিরূপণ ও লগ্ন নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় তাহা বুঝিতে পারি না, অন্ততঃ এ দেশে দার্জ্জিলিংএ নক্ষত্র বিদ্যা বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের (Astrology ও Astronomy) কোনরূপ চর্চ্চা আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক আমাদের দেশে যেমন অনেক স্থলে কুল গুরু ও কুল পুরোহিতের দোহাই দিয়া কত নিরক্ষর গুরু পুরোহিত-পুত্র শিষ্য যজমান রক্ষা করিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করিতেছেন, ইহাও ঠিক সেই প্রকার হইবে।

"ষোল লগণ্" ঠিক বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু ঘড়িটির অবস্থা হইতে অনুমান করিয়া লইলাম যে শেষ রাত্রির পূর্ব্বে লগ্ন হইতেই পারে না, সুতরাং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাংগোতে ফিরিয়া আসিলাম।

পাহাড়িয়াদিগের "রীত" (বিবাহ বিধি) দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল জন্মিয়াছিল, সুতরাং সমস্ত রাত্রি একরূপ বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিবাহ বাটীতে যাইয়া হাজির হইলাম। সকলে আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, গৃহস্বামী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে চা পান করাইবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন। শাদা পোষাক পরিয়া বর উড়ানি দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া অগ্নির সম্মুখে বসিয়াছিল, লাল রংয়ের তিন প্রস্থ পোষাক পরিয়া পাত্রীও বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। তিন-প্রস্থ পোষাক পরাইবার তাৎপর্য্য কি তাহার সন্তোষ জনক উত্তর কেহই আমাকে দিতে পারিলেন না। চারি কোণে চারি জন ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিতে ছিলেন। বরকে কোন মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না, সে বেশ শুদ্ধ শান্ত সুবোধ বালকের মত চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। কয়েক মিনিট পরেই ব্রাহ্মণগণ সিঁদূর পরাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই বিবাহ মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। "সিঁদূর হাল্লার" সময় নাকি কন্যার পক্ষের কাহাকেও সিঁদূর পরান দেখিতে নাই।

সিঁদূর পরান অন্তে "ফেরা" অগ্নি প্রদক্ষিণ ও "অঞ্চল গাঠঠ" আঁচলে গিরে দেওয়া হইল। ইহাদের বিবাহ বিধি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকাংশেই হিন্দু বিবাহ বিধির অনুরূপ, তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে কোন কোন স্থলে অল্প বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। হোম যজ্ঞ ইত্যাদি শেষ হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিদায়ের পালা—সে এক বিষম ব্যাপার। যাহা হউক, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর উভয় পক্ষে একটি রফা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে সকলে আহার করিতে বসিলেন, এবং ভোজনান্তে বরযাত্রিগণ বরকন্যা লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুর্খালিদিগের সামাজিক প্রথা অনুসারে তথায় একরাত্রি বাস করিয়া বরকন্যাকে পরদিনই যে কোন উপায়ে হউক কন্যার বাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

আমাদের দেশে বরযাত্রিগণের অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাকে বিশেষ ভাবিত হইতে হয় কারণ বরযাত্রিগণ স্বভাবতঃই অতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল এবং এমন কি অনেক স্থলে চিরকালের জন্যও উভয় পক্ষের মধ্যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু পাহাড়ে বর পক্ষকেই বরাবর ভদ্র ও বিশেষ নম্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে এ দেশে কন্যার পিতাকে আমাদের দেশের দুরদৃষ্ট কন্যার পিতাগণের মত কন্যার জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতে হয় না। পুত্রকন্যার বয়স সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই ইহারা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া বিবাহের "লগ্ন" স্থির করেন। পুত্রের ষোল বৎসর কি আঠার বৎসর যে বয়সে বিবাহ লগ্ন উপস্থিত হয় তাহার তিন কি চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের পিতা পুত্রের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে বহির্গত হন। পাত্রীর অনুসন্ধান করিয়া পুত্রের পিতা ব্রাহ্মণ ছেত্রী জাতীয় হইলে "দধি ও সুপারী" ও ঠাকুর, খাস, মংগর, গুরুং প্রভৃতি জাতীয় হইলে "দধি ও জাঁর নামক মদ্য" মাংগ্‌নির নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গে লইয়া কন্যার পিতার বাটীতে প্রার্থীরূপে আসিয়া উপস্থিত হন্।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কন্যার পিতার সম্মুখে রক্ষা করিয়া তিনি পুত্রের জন্য পাত্রী যাচ্ঞা করেন। প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করা না করা কন্যার পিতার ইচ্ছা খেয়ালের উপর নির্ভর করে তবে ঘর, বরও বরপক্ষের কুলমর্য্যাদাদি কন্যার পিতার মনোমত হইলে, এবং উভয়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে একপন্থী হইলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা থাকে না। কন্যার পিতার অভিপ্রায় হইলে এবং কোনরূপ অপ্রতিকূল প্রতিবন্ধক না থাকিলে তিনি কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন্। পরে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাত্র পাত্রীর "লগ্‌ণ" মিলাইয়া "লগ্‌ণ" অনুকূল হইলে বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয়। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে বরের বাটীতে ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হোম করিতে থাকেন, হোম অন্তে বর বরযাত্রীগণ একত্র পান ভোজন করিয়া এরূপ সময়ে যাত্রা করেন যেন "যন্তি" (marriage party) অপরাহ্নেই বিবাহ বাটীতে পৌঁছিতে পারে।

ঐদিন রাত্রিতে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে "বাগ্‌দান" ও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাগ্‌দান করিলে সে সম্বন্ধ ভঙ্গ করা সমাজের চক্ষে বড়ই দূষণীয় ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত

হয়। এ নিমিত্তই বোধহয় আজকাল আমাদের দেশের অনুকরণে অথবা এরূপ প্রথার প্রচলন সমীচীন বোধ হওয়াতে বিবাহ রাত্রিতেই "বাগ্‌দান" ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে যেমন পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইলে পরে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশে পাত্রী দেখা বা দেখান প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। পাত্রী সুশ্রী কি কুৎসিত, খঞ্জ কি অন্ধ ইহা কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বরের পিতার দেখিবার অধিকার নাই, তবে এ দেশে স্ত্রী অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকা নিবন্ধনই সকলেই সকলের বাড়ীর মেয়েছেলেকে হাটে বাজারে বা পথে ঘাটে কোন সময় অবশ্যই দেখিতে পাইয়া থাকেন। বিবাহ রাত্রিতে বরের পক্ষ হইতে পাত্রীকে গহনা ও বস্ত্রাদি দিতে হয়।

ইহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারেই বরের পিতাকে কনের পিতার ইচ্ছানুসারে চলিতে হয় এবং কোন বিষয়েই তাঁহার নিজের কোন স্বাধীন মত নাই। বিধবার আর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে না, কিন্তু বিধবা স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অপর কোন পুরুষের পরিবারভুক্ত হইয়া তাহার সহিত স্বামীস্ত্রীরূপে বস্‌বাস করিতে পারে। এ নিমিত্ত পাহাড়ে এমন অনেক স্ত্রীপুরুষ দেখা যায় যাহাদের পিতা একজাতি ও মাতা অন্য জাতি যথা—ছেত্রী, মাতা মংগরণী, অথবা পিতা নেওয়ার মাতা ছৈত্রীণী। আমাদের দেশে এইরূপ পিতামাতার সংমিশ্রণে উদ্ভূত সন্তানগুলিকে আমরা "জারজ" বলিয়া ঘৃণা করি, এবং সমাজের চক্ষেও "জারজের" স্থান অতি নিম্নে। কিন্তু পাহাড়ে ইহাদিগকে কেহই ঘৃণার চক্ষে দেখে না কারণ তাহারা বলে যে পিতামাতার পাপের জন্য নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশু চির অভিশপ্ত জীবন যাপন করিবে ইহা কখনই ন্যায়ের বিধান হইতে পারে না। এইরূপ "থর" সন্তানের বিবাহ "থর" এর সহিতই হইয়া থাকে।

পাহাড়িয়াগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভাগ রহিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, তবে ব্রাহ্মণ ছৈত্রী ও সংগর গুরুং ঠাকুর খাস প্রভৃতি গুর্খালিগণের বিবাহ প্রথা একই প্রকার। সুনুয়ার, কামী (লোহার) সরকী (মুচি) প্রভৃতি জাতিরও সামাজিক আচার ব্যবহার অনেকাংশেই গুর্খালিগণের অনুরূপ। কামী, সুরকী ইহারা নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত, এবং ব্রাহ্মণ ছৈত্রী ও গুর্খালিগণ ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

গুর্খালিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে অপর একটি প্রথা প্রচলিত আছে। যে বৎসরে যুবকের "বিবাহ লগ্ন" থাকে তৎপূর্ব্বে যদি কোন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যায় তাহা হইলে উত্তম, অন্যথায় যুবক নিজেই পাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়, এবং কোন যুবতীকে নানা কৌশলে তাহার মন হরণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসে। সুকীয়া-পোখরি হাটে সেদিন এরূপ একটি প্রেমিক সম্পতির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।
মংগরগণ নিজেরা যে বংশে বিবাহ করে সে বংশের কোন যুবকের সহিত তাহারা কন্যা বিবাহ দিতে পারে না, কিন্তু গুরুংদিগের মধ্যে এরূপ স্থলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোনরূপ আপত্তি দেখা যায় না। তবে কি মংগর কি গুরুং—ইহারা নিজেরা যে বংশের সন্তান সে বংশে কেহই কন্যা দান করে না।

গুরুং জাতির মধ্যে "চার্‌জাত" ও "শোল্‌হাজাত" নামে দুইটী শ্রেণী বিভাগ আছে এবং এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ কন্যা আদান প্রদান চলিতে পারে না। "শোল্‌হাজাত" গুরুংগণ অপেক্ষা "চারজাত" গুরুংগণ আভিজাত্য ও বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ এবং নেপালের সামাজিক নিয়ম অনুসারে "শোল্‌হাজাত" "চারজাতকে" সর্ব্বদাই সম্মান প্রদর্শন করিবে।

গুরুংগণের মধ্যে "গ্যালে" শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চারজাত গুরুংগণ রাজকুমারীর গর্ভ-সম্ভুত বলিয়া গ্যালেগণের সমান কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে বাটীতে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম তাহারা জাতিতে গুরুং এবং "শোল্‌হাজাত" শ্রেণীভুক্ত। কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে ভদ্রবেশধারী একটি যুবক ছিলেন, তিনি কোন একটি চাবাগানে "ছোটবাবুর" কাজ করেন। বাবুটিকে বেশ মোটামুটি শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া গুর্খালিগণের সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিলাম। "চারজাত" ও শোল্‌হাজাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে এক সময়ে নেপালের "ঠাকুরে" বংশীয় জনৈক রাজা গ্যালে বংশীয় কোন এক রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। গ্যালে রাজ নিজ কন্যার পরিবর্ত্তে অপর একটি সুন্দরী যুবতীকে "ঠাকুরে" রাজের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সুন্দরীকে রাজ-

কন্যাজ্ঞানে বিধিমত বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। কিছুকাল পরে গ্যালে রাজের চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িলে "ঠাকুরে" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গ্যালে রাজে নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে অবিলম্বে যদি তিনি গ্যালে রাজকুমারীকে তাঁহার হস্তে সম না করেন তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ইহাতে গ্যালে ভীত হইয়া ঠাকুররাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ঠাকুর রাজের ঔরসে এই রাজক গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহাদেরই বংশধরগণ "চারজাত" গুরুং খ্যাত। লামাগণের নির্দ্দেশ অনুসারে দাসীমাতার গর্ভজাত সন্তানগণ "শো নামে অভিহিত হয় এবং তাহারা চিরদিনই "চারজাতের" নিকট হীনত করিয়া চলে।

গুরুং দিগের মধ্যে "তুতীয়া" "প্লোনিয়া" প্রভৃতি আরও কয়েকটি শাখা শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মধ্যে কোনরূপ বিশেষ পার্থক্য নাই।

নেপালে গুরুংগণের বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে লামাগণই—পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যত্র ব্রাহ্মণের দ্বারাই সকল প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্ম করান হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে মর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশেষ কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই।

ভদ্রলোকটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর অধিক কালক্ষেপ না করিয়া সত্বর বাংলোতে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

বৃন্দাবন।

'রাধা' 'রাধা—বলে' হেথা
বাঁশীতে বাজিত ফুঁক্,
কালিন্দীরি কালো-জলে
ভাসিত সে চাঁদমুখ!
নাচিত লহরীগুলি,
কদম শিহরি' ঢুলি'
ঝরণে সুবাসে তীরে
ঢালিত কত না সুখ।

বাজে কি তেমনি ধারা
নুপুর এ বনময়?
আজো কি হৃদয়-চোরা
বাঁশীতেই কথা কয়?
এসেছি দেখিতে আজি
সে মধুর লীলারাজি
স্মরিয়া সে প্রেম মনে
ভুখারীর বাড়ে ভুখ

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

মোগল-সন্ধ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাংলা। আজীমের প্রাসাদ নিকটস্থ নদীতীর।

আজীম ও রুস্তমদিল খাঁ দণ্ডায়মান।

আজীম। কি সুন্দর এই বাংলা দেশ! মাথার উপরে সুনীল অনন্ত আকাশ শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে ভরে উঠেছে। দূরে সুন্দরীর বসনাঞ্চলের মত হিল্লোলিত সবুজ ধানের ক্ষেতগুলি পুলকে নেচে উঠেছে। নৃত্যনিপুনা নর্ত্তকীর যৌবন চঞ্চল-চরণ-পাতে পরিপূর্ণা নদীগুলি কোথায় যেন ছুটে চলেচে। রুস্তম, শ্রাবণের ধারা শেষ হয়ে গেছে—চেয়ে দেখ শরতের তুলির কোমল স্পর্শ মাঠে মাঠে গাছের চূড়ায় কি মোহন স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। এই সেই ভাগীরথী—ভারতের আঁখি-বিগলিত করুণাশ্রুর অনন্ত উৎস—মা, দেখেছি—সুখের দিনে তোমার বুক সন্তানের সুখে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে, উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আবার শুনেছি—দুঃখের অমানিশায় তোমার পারে দাঁড়িয়ে নিরাশ-হৃদয়ে ক্ষীণ আশার পদ সঞ্চারের মত মৃদু, অতি মৃদু তোমার করুণ ব্যথিত সঙ্গীতের সুর। এত সহানুভূতি, এত স্নেহ নিয়ে তুমি জগতে এসেছ! তাই তুমি হিন্দুর মা, তুমি আমাদের ভারতবাসী মুসলমানেরও মা। মা! আজ তোমার নীরবতা এত অধিক কেন?

(দূরে প্রেমদেবের গান ও শিবিরের দিকে অগ্রসর।)

রুস্তম! দূর থেকে কার যেন সঙ্গীত ভেসে আসছে, না?

রুস্তম। হাঁ, শাহজাদা।

(প্রেমদেবের প্রবেশ)

(গান।)

এমহা মানব তীর্থ ক্ষেত্রে
আজি কি গাহিব গান।
গৌরবময় উজল অতীত
আজি যে হেথায় ম্লান॥

যেথা একদিন জাহ্নবী তীরে
ভাসি অবিরল প্রেমাশ্রু নীরে।
বিভল নিমাই বহাল বঙ্গে
প্রেমের পূর্ণ বান॥

যেথা নীরব দেউল তলে
বাশুলী করুণা ফলে।
ভক্তি বিভল চণ্ডীদাস
তুলিল মোহন তান॥

অস্ত যদিও গৌরব দিন
দুখ বিভাবরী হইবে বিলীন।
আসিবে আবার শৌর্য্য বীর্য্য
যশ ও ঋদ্ধি জ্ঞান॥

হোমানল শিখা উঠিবে জ্বলিয়া
বন্ধন পাশ যাইবে টুটিয়া।
মুক্তির বাণী ঘোষিবে আবার
জাগাতে সুপ্ত প্রাণ॥

আজীম। কি সুন্দর ভাব, আর কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! সন্ন্যাসী তোমাদের কি সবই সুন্দর।

প্রেমদেব। হাঁ, সাহজাদা, আমার মায়ের এত রূপ—কিন্তু যে হাসির আলোকে একদিন মার মুখ সমুজ্জল ছিল, সে হাসি অনেক দিন নিবে গেছে। এই রূপ দিয়েই মা তার ভাঙ্গা হৃদয়ের ব্যথাটা আপনাদের দৃষ্টি হ'তে লুকিয়ে রেখেছেন। এই রূপ দূর হোয়ে যাক্, উষর মরুভূমিতে দেশ পরিণত হোক, দুঃখ নেই; কিন্তু আমি চাই মার মুখে হাসি দেখ্‌তে, সেই হাসি—যে হাসি ফুটে উঠে প্রভাতের আলোর মত সন্তানের সফলতার গৌরবে। অনেক দিন হতে নিবে গেছে সেই হাসি, ঘোর আঁধার, বিচ্ছেদহীন, শান্ত, স্থির চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে।

আজীম। আজ এই জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে, সন্ন্যাসী তোমার এই নিরাশার সুর বেসুরা বাজ্‌ছে।

প্রেমদেব। সে বাজবেই শাহজাদা। আপনারা দেখছেন শুধু বাইরের রূপটাকে। যে দৃষ্টিতে ভেতরের ছবিটাও দেখতে পাওয়া যায় সে দৃষ্টিত আপনাদের নেই তবে অন্তরের ব্যাথাটা কি ক'রে বুঝবেন? এই সাত কোটী সন্তান বঙ্গমাতার দুঃখ দৈন্যের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে চলেছে। এমন শুভদিন কি আর হবে যেদিন আমরা একাল-নিদ্রা হতে জেগে উঠ্‌ব। এক নূতন উৎসব-সঙ্গীতে আমাদের জাতীয় জীবনের নবীন প্রভাত উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

আজীম। বুঝেছি সন্ন্যাসী, তোমার দুঃখ কত গভীর! দেশকে তুমি বড়ই ভালবাস, দেশের দুঃখ তোমার প্রাণে বড়ই বেজেছে। মহান তুমি—তোমায় নমস্কার।

প্রেমদেব। নমস্কার, শাহজাদা।

(প্রেমদেবের প্রস্থান)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। খোদাবন্দ, বাদশার পত্র নিয়ে দিল্লী হ'তে দূত এসেছে।

আজীম। যাও, রুস্তম, শীঘ্র পত্রখানা এখানে নিয়ে এস।

(রুস্তমের প্রস্থান)

আজীম। অনেকদিন হতে দিল্লীর কোন খবরই পাইনি।

(রুস্তমের প্রবেশ।)

(রুস্তমের আজীমের হস্তে প্রদান)

রুস্তম। কি শাহজাদা! খবর কি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে আপনার মুখখানা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল?

আজীম। রুস্তম, পিতা মৃত্যু শয্যায় পড়ে। আমাকে আজই রওনা হতে হবে। তুমি সব প্রস্তুত কর।

(রুস্তমের হস্তে পত্রদান)

আজীম। হায়! পিতার স্নেহ-সিক্ত মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব কি?

রুস্তম। (পাঠ করিয়া) শাহজাদা! আনন্দ কর্ব্ব না দুঃখ কর্ব্ব কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। একদিকে সম্রাট বাহাদুরশা'র মরণাপন্ন অবস্থা আর অন্য দিকে আপনার বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার সম্ভাবনা দুটা সংবাদই এক সঙ্গে এসেছে। আমার কিন্তু আনন্দের ভাগটাই বেশী।

আজীম। রুস্তম, চুপ কর।

রুস্তম। শাহজাদা, অধীনের গোস্তাকী মাফ্ কর্ব্বেন।

আজীম। তুমি শীঘ্র যাও রওনা হবার উদ্‌যোগ কর গিয়ে।

রুস্তম। (একটু অপেক্ষা করিয়া)—কিন্তু—একটা কথা ভেবে দেখুন।

আজীম। কি কথা?

রুস্তম। আমি ভাবছি বাদশা' খোদা না করেন আপনি যদি দিল্লীতে পৌছবার পূর্ব্বেই ....তবে কি ভয়ঙ্কর একটা বিশৃঙ্খলাই বাধবে, তাই সহায়সম্বলহীন হয়ে ছুটে যাওয়া এখন কতটা সঙ্গত বিবেচনা কর্ব্বেন।

আজীম। কিন্তু ভেবে দেখ রুস্তম, পিতা বোধহয় আকুল নয়নে পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন কখনও আশায়, কখনও দুরাশায়, বেদনায় তাঁর সমস্ত হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর আমি এখানে রাজ্য পাবার আশায় প্রস্তুত হতে থাকব! এই কি পুত্রের কর্ত্তব্য হবে?

রুস্তম। আপনার পিতামহ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের কথা মনে করুন, তবেই বুঝতে পার্ব্বেন আমার আশঙ্কা একেবারে মিথ্যা নাও হতে পারে। শুধু কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর্ত্তে বল্‌ছি আমার সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে আর পাঁচ হাজার যোগাড় কর্ত্তে যতটা সময় শুধু সে'কয়টা দিন।

আজীম। তোমার পরামর্শই নিলুম। শীঘ্র আয়োজন কর।

রুস্তম। বাংলায় সৈন্য সংগ্রহ এখনও অসম্ভব হয়ে পড়েনি। অস্ত্র চালনায় অনভ্যস্ত হলেও অনেক যুদ্ধে দেখেছি, বাঙ্গালী দুষ্কর কার্য্যগুলি কৌশলে অনায়াসে সাধন করেছে।

আজীম। দেখ, রুস্তম, আমার মন বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। শীঘ্র কাজ শেষ কর্ব্বার চেষ্টা কর দিল্লীর দিকে শুধু আমি আর তুমি যাব।

সিয়ারকে বাংলায় রেখে যাব বিশ্বস্ত হোসেন তাকে রক্ষা করবে।

রুস্তম। হাঁ, সেই ভাল শাহজাদা।

আজীম। যাও, আয়োজন কর, তিন দিনের বেশী অপেক্ষা কর্ত্তে পারব না।

(কুর্নিশ করিয়া রুস্তমের প্রস্থান)

(পটক্ষেপন)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মেবার, জয়সমুদ্রের তীরস্থ রাজপ্রাসাদ।

রাণা অমরসিংহ, মহারাজ অজিতসিংহ ও অম্বরাধিপতি জয়সিংহ।

অমরসিংহ। মহারাজ অজিতসিংহ, অম্বরাধিপতি জয়সিংহ, আপনাদের মত পূজ্য অতিথি পেয়ে আজ নিজকে কৃতার্থ মনে করেছি।

অজিতসিংহ। আমরাও মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করে ততোধিক কৃতার্থ।

অমরসিংহ। হাঁ, অনেক দিন পরেই দেখা হল। সেই রাজপুতদ্রোহী ঔরঙ্গজেব বাদশা'র হাত হ'তে রাজপুত জাতির স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই জয়সমুদ্রের তীরেই "ত্রিবলাত্মিকা সন্ধি" স্বাক্ষরের জন্য সকলে মিলিত হয়েছিলাম।

জয়সিংহ। এবার কি উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিলেন মহারাণা?

অমরসিংহ। এবারের উদ্দেশ্য অন্য রকমের। সুধু আত্মরক্ষা নয়—চাই এখন আত্ম প্রতিষ্ঠা। শুন্‌তে পেলাম সম্রাট বাহাদুরশা'র শেষ সময় এসে পড়েছে। অন্য বারের মত এবারেও বোধহয় কলুষিত ভ্রাতৃযুদ্ধে দেশ আলোড়িত হয়ে উঠ্‌বে।

অজিতসিংহ। এতে কোন সন্দেহই নেই মহারাণা! এ নিশ্চয়ই ঘট্‌বে।

অমরসিংহ। সত্য, মারবাররাজ! এ বড় আশ্চর্য্যের কথা কিন্তু। মোগল শাহজাদাদের দেহে—পিতৃ রক্তের অংশটা বোধ করি বড় কম আর বড়ই তরল। কি বলেন অম্বররাজ?

জয়সিংহ। হাঁ, ঠিক্ তাই মহারাণা।

অমরসিংহ। যে কথা বল্‌ছিলাম বাহাদুরশার জীবন অবসান প্রায়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনও একেবারে সুনিশ্চিত। বাহাদুর বাদশা' যদি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরে না এসে আগে আস্‌তেন, তবে ভারতে মুসলমানের অবসান এত দ্রুত, এত শীঘ্র ঘট্‌তে পারত না।

অজিতসিংহ, জয়সিংহ, এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর একটা হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তুল্‌বার কল্পনাটা আপনাদের কেমন মনে হয়। মেবার শক্তির সঙ্গে মারবার আর অম্বরের শক্তির সংমিশ্রণ হলে আমার হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন একেবারে মিথ্যা হবে না। এ বিষয়ের পরামর্শের জন্যই আজ আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছি।

অজিতসিংহ। মহারাণা! আপনার সঙ্কল্প মহৎ হলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ দুরাশা মাত্র। এ ভারতে এখন হিন্দু মুসলমান এ দুটো জাত প্রবল। যে ভারত যোড়া হিন্দু সাম্রাজ্য গড়বার কল্পনা আপনি কচ্ছেন তার প্রজা এই হিন্দুও হবে মুসলমানও হবে। অধিকাংশ প্রজার শুভ ইচ্ছা বা সহানুভূতির উপর রাজ্যের কল্যাণ আর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মোগলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হিন্দুরা সুযোগ দেখে মুসলমানকে নিগ্রহ কর্ত্তে কখনও ছাড়বে না। এখনও ভেবে দেখুন আপনার সাম্রাজ্য কি অর্দ্ধ ভারত মুসলমানের সহানুভূতি আকর্ষণ কর্ত্তে পারবে? কখনও না। তা'হলে সেও এই মোগল সাম্রাজ্যের মত আতস বাজীর খেলা খেলে কোন অসীম শূন্যে মিশে যাবে।

অমরসিংহ। তবে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বাহাদুর শা' ছিলেন রাজপুত-মাতার সন্তান, সম্রাট শাহজাহানের মত হিন্দুহিতৈষী, এখন যিনি সম্রাট হবেন, তিনি যদি হিন্দুবিদ্বেষী হন, তা'হলে কি উপায় হবে বিবেচনা করেছেন কি?

অজিতসিংহ। এ ভারতে এখন স্থায়ীরূপে একটা সুশাসিত, সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে হলে হিন্দু ও মুসলমানকে একত্রিত করে একটা আদর্শ জাতি গঠন কর্ত্তে হবে। যে সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, সে মুসলমানেরও নয় হিন্দুরও নয়, সে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই একযোগে।

অমরসিংহ। তার জন্য আপনি কি কর্ত্তে চান?

অজিতসিংহ। এই বাহাদুর বাদশা'রই মত একজন সুবুদ্ধি সম্পন্ন শাহজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন কর্ত্তে হবে।

জয়সিংহ। মহারাজ, আমি কিন্তু মোগলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখতে চাই না। মোগল কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, উপকার কর্‌লে পুরস্কার পাবেন গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে কিম্বা হলাহলে।

অমরসিংহ। না, অম্বররাজ অজিতসিংহ যে কথা বল্‌ছেন তাই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্চে। তবে আর এক কথা আমাদের আবার যুদ্ধে নাম্‌তে হবে। সে যুদ্ধ যদি ভীষণ হয়—যদি প্রচণ্ড শক্তি মারাট্টা আমাদের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে মহারাজ!

অজিতসিংহ। তাতে ভীত হবেন না, রাজপুত বিক্রমের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে এমন সৈন্য এখনও ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয় নি।

অমরসিংহ। ভীত হই নি অজিতসিংহ; যুদ্ধটা ভীষণ হলে আমাদের বলক্ষয় যথেষ্টই হবে সে কথাই ভাবছি, যাহোক্ আপনি বোধ হয় এখন দিল্লী যাচ্ছেন?

অজিতসিংহ। হাঁ, আমি এখন সেখানেই যাব। বাহাদুর শা'র মৃত্যুর পর অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে একবার বুঝে আসা দরকার।

অমরসিংহ। বেশ, তাই ভাল। তারপর অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কি বলেন মহারাজ জয়সিংহ?

জয়সিংহ। আমারও সেই মত।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—রাজপ্রাসাদ, জাহান্দার কক্ষ। জাহান্দার ও জুলফিকার।

জাহান্দার। আজীমের কোন খবর পেয়েছেন?

জুলফিকার। না, কোন খবরই পাইনি। খোদা করুন বাদশা' যেন এযাত্রা রক্ষা পান।

জাহান্দার। সে আশা একেবারেই নেই!

জুলফিকার। এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? শাহজাদা, বাদশা' কি তার মতের কোন পরিবর্ত্তন করেছেন?

জাহান্দার। জানি না, সেনাপতি! আর আমার জান্‌বার কোন দরকারও নেই। আমার অধিকার আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

জুলফিকার। যে দিল্লীর সিংহাসন আপনার পূর্ব্বপুরুষ বাবর বাদশা' অসীম বীরত্ব আর অধ্যবসায়ের বলে জয় করেছিলেন তাকে আপনি মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলেন কি ক'রে ভেবে অবাক হচ্ছি। আপনার স্বার্থত্যাগ অতি আশ্চর্য্য।

জাহান্দার। সেনাপতি, এ'ত আমার ত্যাগ নয়। যারা ঐশ্বর্য্যকে ধর্ম্মের চাইতে বড় মনে করে—যারা সুখভোগকে জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে জানে, তাদের পক্ষে এ একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ—কিন্তু আমার কাছে নয়।

জুলফিকার। শাহজাদা, ধর্ম্মাচরণ আর রাজ্য শাসন এ দুটো কাজ কি একই সঙ্গে চল্‌তে পারে না? মহাত্মা আকবর মোগল-সম্রাট-শ্রেষ্ঠ ছিলেন—পরোপকারী ছিলেন, অশেষ গুণ তাঁর চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছিল। তাই বলে, তিনি রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত ছিলেন এ কথা তাঁর পরম শত্রুতেও বল্‌তে পারে না।

জাহান্দার। সেনাপতি, সকলেই কি আর আকবর বাদশা'। তিনি ছিলেন এ মোগল বংশের সব চাইতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিস্মৃতির আঁধারে কত বাদশা'র কত সুলতানের জ্যোতিঃটুকু ডুবে গেছে, ডুবে যাবে, কিন্তু এ নক্ষত্রটী চিরকাল জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌বে।

জুলফিকার। এ কথা সত্য যে সকলেই আর আকবর বাদশা' হতে পারে না। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি তাঁরই বংশধর। তিনি যেটা সম্পূর্ণ পেরেছেন, তাঁর পথ অনুসরণ কর্‌লে, যে আপনি অন্ততঃ কতকটা সফল হবেন এ আশাটা বেশী কি? ভেবে দেখুন শাহজাদা এখনও সময় আছে।

জাহান্দার। না জুলফিকার খাঁ! আমার ভাব্‌বার কিছুই নেই। পিতার কাছে শপথ করেছি—তুচ্ছ সিংহাসনের জন্য প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌তে পার্‌ব না।

জুলফিকার। ক্ষমা করুন, শাহজাদা, এ সিংহাসন আপনারই প্রাপ্য কিন্তু বাদশাহ স্নেহে অন্ধ হোয়ে আপনার দাবীটাকে কতকগুলি কল্পিত আপত্তির জোরে অগ্রাহ্য করে দিয়ে যাচ্ছেন কিনা আজীমকে! আপনার দিকে অবিচার করা হয়নি কি শাহজাদা?

জাহান্দার। সে চিন্তা আমার; আপনার নয়, সেনাপতি! যদি কোন দিন অনুতাপে নিরাশায় হৃদয় অধীর হোয়ে উঠে, সে আমিই সহ্য করব, আপনি নন্ সেনাপতি।

জুলফিকার। সে খুবই ঠিক কথা—শাহজাদা। সংসারে দু'এক জন আপনার মঙ্গল কামনা করে থাকে, এটা কি আপনি অসম্ভব মনে করেন?

জাহান্দার। না, সেনাপতি।

জুলফিকার। তবে আমিও তারই একজন—সে জন্যই এত করে বলছিলাম।

জাহান্দার। অপ্রিয় কথা বলেছি, অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার জন্য আপনার স্নেহ কত বেশী তা' আমি জানি সেনাপতি। এখন পিতার কাছে যাচ্ছি। আজীমের খবর পেলে জানাবেন।

জুলফিকার। যে আজ্ঞে; মিনতি করি। একবার নির্জ্জনে বসে আমার কথা ভেবে দেখ্‌বেন।

(জুলফিকার ও জাহান্দারের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দিল্লী—লালকুমারীর কক্ষ। লালকুমারী।

লালকুমারী। জোহেরা!

(নেপথ্যে—হুজুরাইন)

(গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে জোহেরার প্রবেশ)

লালকুমারী। সুর সাধার সময় এখনও আসেনি জোহেরা। রাত্তির দুপুর হ'তে চল্‌ল, এইবার খবর কর, দেখ কত দূর।

জোহেরা। (গীত)

কত দূরে কত নূরে বঁধু কত দূরে
নিশীথে বাজায় বাঁশী যমুনা কিনারে
মোহন সুরে।

লালকুমারী। গানের বাণ এখন তূণে বন্দি ক'রে শুধু ভ্রু দুখানি ধনুর ভঙ্গিমায় বাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়। ব্যাকুল হয়ে তাঁরা যদি বাহু বাড়িয়ে দেয় তবে বু... আড়াল করে নিয়ে আসবি—তারপর গান।—যা—

জোহেরা। (গীত)

তবে যাক মিলিয়ে সে এ কাল আঁখির পাশে
যদি বঁধু মৃদু হাসে গান হয়ে বেজে আসে
মণি নূপুরে॥
রুণুনু, ঝুণুনু, ঝুণু মণি নূপুরে সখি
মণি নূপুরে॥

লালকুমারী। তাজা গোটা একটা প্রাণের স্পন্দন চলেছে কোথায়! সোজা সরল জীবনে, না তার সশঙ্ক শঙ্কটময় গতিতে? আমি চল্‌তে চাই। আমাকে উঠ্‌তে হবে। জীবনে আমার চরম সাফল্য নাইবা এল—আসুক শুধু নিশিদিন এই ঘাতপ্রতিঘাত এই দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ। হয়রাণ হতে হ'বে কিন্তু তবুও লড়্‌ব। জীবনের এইখানেই পদা—যুক্তি কিছু না থাকতে পারে কিন্তু ছন্দ আছে। সেই অজানার নিরুদ্দেশ সন্ধানে বেরিয়েছি। সেই ছন্দের অনুসন্ধান ক'রেই ঈরাণ থেকে দিল্লীতে এসেছি—রূপের ব্যবসার কর্ত্তে—চমৎকার এ কারবার! মণির মালা একটুখানি দুলিয়ে তোলা, বিলোল চোখের একটী মাত্র কটাক্ষ—বাস্‌। একি তাজ্জব! শাসকের হাতে দণ্ড নেই, মন্ত্রণাদাতার মস্তিষ্কে বুদ্ধি নেই, রক্ষকের শক্তি লোপ হ'য়ে গিয়েছে, সম্রাটের দেহরক্ষী সৈনিকের হাতের তরবারী খসে পড়্‌ল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা নীল হরফে নূতন ক'রে লেখা হ'য়ে যাচ্ছে,—বাহবা! চমৎকার—অপূর্ব্ব! ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে—এই বিপ্লবের ফাঁকে মণিমালিনীর শত ক্ষত ব্যথায় জর্জ্জরিত বক্ষের উপর দিয়ে আমার ভাগ্যান্বেষণের বিজয়-রথ আজ নির্ম্মমের মতই আমি চালিয়ে নিয়ে যাব—শ্লথ অশ্বরশ্মি অবাধে ছেড়ে দিয়ে—রূপের বৈদ্যুতিক কশা তার পৃষ্ঠের উপর উদ্যত রেখে।

(জোহেরার প্রবেশ)

খবর কি বাঁদী?

জোহেরা। আমীর সাহেব, হুজরাইন আর....................

(জুলফিকার ও হামিদ খাঁর প্রবেশ)

হামিদ। আর মন্‌সবদার হোসেন হিম্মৎ হামিদ খাঁ।

লালকুমারী। (সেলাম করিয়া) আসুন খাঁ সাহেব। সেলাম। (জুলফিকার খাঁকে কুর্ণিশ করিয়া) বন্দেগি জনাব! তসরীফ রাখতে মরজি হোক।

হামিদ। ইয়ে দৌলত খানামে! আরে ইয়ে তোফা! খাঁ সাহেব দেখছেন, মুখের ওপর রংয়ের কদর মতিমস্‌জিদের মতন জেল্‌লা দিচ্ছে—রূপের জলুসে চমক লেগে যাবে।

লালকুমারী। জোহেরা! তুই খাঁসাহেবকে তোষাখানায় বসিয়ে একটু সরবৎ দে। আমি ততক্ষণ জনাব আলিকে কাওয়া করি। এতদূরের পথ পায়ে হেঁটে এসেছেন।

হামিদ। আর ঠাণ্ডা বানাতে হবে না বিবি। সরবৎ কি সিরাজীর কিছু দরকার নেই। যা দেখলুম! ওগো, একবার মুখের দিকে তাকিয়েই একদম ঠাণ্ডা—তা আমিও আর উনিও—তবে মুখে বল্‌তে ওঁর সরম হচ্ছে—রাশভারি পয়গম্বর গোছের লোক কি না!

জোহেরা। সে খুব ঠিক কথা সাহেব। কিন্তু বাঁদীকে কি ভুলে গেলেন? এই চোখের কোণে এই ভরা বুকের উপর কি একটুও নেশা জমা নেই? ছিঃ, ভুলে গেলেন সব, এমন বেইমান!

হামিদ। আরে ছি. ছি, বিবি সাহেব—হুকুম হ'লে তোমার সঙ্গে আসনাই জমাতে এ গোলাম রাজি আছে কিন্তু—এ বিবি তোমার বিবিজান!

জোহেরা। চলুন, ওর সঙ্গে খাতের হবে—আগে একটু ঠাণ্ডা হন।

হামিদ। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা বিবি।

লালকুমারী। জনাবের বহুৎ মেহেরবাণী যে বাঁদীর আর্জ্জি মঞ্জুর করেছেন। আপনার পয়জারের ধূলো নিয়ে বাঁদী আজ ধন্য হয়ে গেল। কিন্তু জনাব আলি এ দানের মর্য্যাদা করবার যে আমার কিছুই নেই।

জুলফিকার। তোমার এমন রূপ,—এমন যৌবন—আর কি চাই!

লালকুমারী। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ জনাব! লালসার বিলাসীর কাছে এর দাম। আপনার মত আমীর মুসাফেরের সেবা কি এই রূপ দিয়ে করা যায়!

জুলফিকার। এ রূপে বাদশারও চলে মুসাফেরেরও চলে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখের কোণায় ঐ কুটিল দৃষ্টিটীর মধ্যে কি যেন একটা উচ্চাশার বাণী স্পষ্ট করে লেখা র'য়েছে—সে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে তুমি ভাগ্যেরই সন্ধানে বেরিয়েছ।

লালকুমারী। চতুর আপনি সত্যি কথাই প'ড়েছেন। কিন্তু সব কসবীর চোখেই—জনাব—ঐ একই কথা লেখা থাকে। আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নে সুখ-মরীচিকার পেছনে তারা ছুটে আসে—গৃহ, ধর্ম্ম, স্বজন, সব ছেড়ে, রূপের প্রলোভন দেখিয়ে বিশ্বজয় কর্ত্তে। তবে আমার সে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আর একটা বিশেষত্ব কি হোল জনাব?

জুলফিকার। না, সাধারণ সকলের মত সোজা উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, সহজ, সরল ব্যগ্রতায় যে তোমার দৃষ্টির মধ্যে ঐ তীব্র স্পন্দন তাড়িতের মত চকিতে কিন্তু পলকে পলকে কেঁপে উঠছে—তা নয়। তুমি চাও ঢের বেশী একটা অসম্ভব—একটা কল্পনার অতীত—উচ্চ কিছু একটা অভ্রংলিহ; যা চাও তাকে তোমার পেতেই হবে—তা' তোমার চাই-ই। কেমন, নয় কি? বল, সত্য ক'রে; আমাকে লুকাবার চেষ্টা বৃথা।

লালকুমারী। আপনার চতুর বুদ্ধির কাছে কৌশল নিষ্ফল। হাঁ, আমি জীবনটা আমার ভাগ্যের একান্ত লক্ষ্যেই একটানা ছুটিয়ে নিয়ে চলেছি। কোথায়—কতদূরে—কোনখানে এর শেষ—

জুলফিকার। জান না? কোন ভাগ্যান্বেষী তা' জানে না। কিন্তু কতখানি শক্তি আছে তোমার—তা জান ত? কতদূর ছুটতে পারবে, হিসেব কষে দেখেছ?

লালকুমারী। দেখেছি সেনাপতি, দরকার হলে চিরকাল আমি এই ভাগ্যেরই পিছনে ছুটবো। অনেক বাধা পথে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেই শত উন্নত প্রাচীরের প্রসারিত বিশাল বক্ষ পঞ্জরের প্রতিটা পাষাণ গ্রন্থি আমার নব যৌবনের জ্বালাময় অগ্নি কাণ্ডে বিস্ফোরকের মত শতমুখ শক্তিতে বিচূর্ণিত করে সব বাঁধা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলে আমি বরাবর চল্‌বো, সম্মুখে জীবনের সন্ধানে। শুধু চাই একজন আভাষে বলে দিক এই গতিটার শেষ লক্ষ্যটা আমার কি!

জুলফিকার। এত বড় একটা প্রাণের স্পন্দন যার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ফুটে উঠ্‌তে পারে, দিল্লীর সিংহাসন চাওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়।

লালকুমারী। দিল্লীর সিংহাসন! যে কথা আমার মর্ম্মের মাঝখানে প্রতিধ্বনি তুলে চীৎকার করে ফিরছে। না—এ আমার স্পর্দ্ধা—অন্যায় স্পর্দ্ধা। সমাজ পরিত্যক্তা, ঘৃণ্যতা, নিঃসহায়া এক রূপসী হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিরাট সম্রাজ্যের সিংহাসনের আশা করে—এযে অসম্ভব খাঁ সাহেব, উন্মাদের পরিকল্পনা; আমি দিল্লীর সম্রাজ্ঞী! স্বপ্নের কথা! কিছু সম্ভাবনা নেই তার—একটা বিরাট উপহাস!

জুলফিকার। উপহাস নয়। কিন্তু জানি একটা কিছু কর্ত্তে হ'বে। অতি কঠিন! একটা নিস্তরঙ্গ, স্থির, স্বচ্ছ, সরল, সলিল প্রবাহ তোমার বসনাঞ্চলে বেঁধে রাখা চাই। পার্‌বে? (একটু থামিয়া) হাঁ, তুমি পার্‌বে, ঠিক পারবে। নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ সমুদ্রের ওপর তুফান তুলে দেবার মত শক্তি তোমার আছে।

লালকুমারী। তা আছে, খাঁ সাহেব। নইলে বৃথায় কি এ চোখকে চাতুরিময় ছলনায় পড়া পড়তে শিখিয়েছিলাম। তবে এই বক্ষের পরিপুষ্ট উন্নত রঙ্গভূমির উপর পরিপূর্ণ যৌবনের লীলা শিহরণ, সুর গুঞ্জনের মত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কাঁপিয়ে তুলে মুগ্ধ বিলাসীর অন্তরে লালসার ঘন আকুলতার জ্বালায় জাগিয়ে তোল্‌বার সাধনা কেন করেছিলাম? এই নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশ, পেলব, নিটোল বাহুর নীচে দোদুল গুচ্ছে এলিয়ে দিয়ে, মনিবক্ষের ওপর স্খলিত শাড়ীর শিথিল অঞ্চলখানি অন্তরের উচ্ছসিত আবেগ বেগে কাঁপিয়ে তুলে—সোহাগে বিলোলিত বাহু দু'খানি, লালস রভসে প্রসারিত করে যখন বল্‌ব—ওগো আমার যৌবন বনের বিকশিত কুঞ্জ বীথিকার ব্যাকুলিত পাপিয়া! ওগো মনোমত দয়িত আমার, এই যে এই বিতত মধুর বক্ষের মাঝে নব প্রণয়ের সুললিত বাঁধন দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখব, প্রস্ফুট গোলাপ দলের পরিস্ফুট রক্তিমায় ফুলের মত ফুটে ওঠা ঠোঁট দু'খানি মিলন-সঙ্গমে উন্মু আকুল অধরের সহস্র রক্তের নির্ঝর ব্যাকুল রক্ত ধারায় ঝরে পড়ে সকল পিপাসা যখন মিটিয়ে দেবে তখনো কি—তখনো সে অন্ধ হয়ে এসে বন্দী হবে না এই হৃদয়ের কারাগারে?

জুলফিকার। হবে, হবে। হাঁ তুমি পার্ব্বে। কিন্তু কা'কে চাইবে জান?

লালকুমারী। কাকে চাইব?

জুলফিকার। দিল্লীর সিংহাসন এবার জাহান্দারের। কোন সুযোগে হাত ধরে নিয়ে জাহান্দারকে সিংহাসনে তুলে দিতে হবে। বুঝলে, পার্ব্বে?

লালকুমারী। পারবো, কিন্তু একবার দেখা চাই।

জুলফিকার। হাঁ, তার ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে। সন্ধ্যার নমাজের সময় মতি-মসজিদে তার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হ'তে পারে যা ক'রবার হামিদই তোমায় সব ব'লে দেবে। রাত্রি অনেক হ'ল আমি আসি—জেনো কিন্তু কৃতকার্য্য হলে এ মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী তুমিই।

লালকুমারী। আসুন জনাব, বন্দেগি। বাঁদী আপনার দয়ায় চিরদিনের মত বাধিত রইল। (কুর্নিশ)

জুলফিকার। একি উন্মাদনা! আমার চোখে মুখে কে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটিয়ে দিয়েছে। আজ—এতদিন পরে—আমার আঁধার জগতে একটু আলো জ্বলে উঠেচে। এখন শুধু আমায় ছুটতে হবে। জানি নে কোথায় এর শেষ—

(লালকুমারীর প্রস্থান)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

চার্ব্বাক দর্শন।

——:০:——

চার্ব্বাক দর্শন সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে। মহাজনগণ এই দর্শনটি সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এবার 'পরিচারিকার' পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত করিব।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় দর্শনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—চার্ব্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতবর্ষীয় অন্যান্য সমস্ত দর্শনই ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে জড়িত; এবং চার্ব্বাক ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিকগণ 'ধর্ম্মের জন্যই দর্শন' এই তথ্য মানিয়া চলিয়াছেন। এই জন্য চার্ব্বাক-দর্শনের রূপ হইয়াছে এক স্বতন্ত্র রকমের। আর অবশিষ্ট দর্শনগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য থাকা স্বত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যথেষ্ট সাম্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল এবং কর্ম্মভোগবাদ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চার্ব্বাক ব্যতীত ব্রাহ্মণ্য দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের একমত। চার্ব্বাক দর্শনের সুখবাদ অন্যান্য ভারতবর্ষীয় দর্শনের দুঃখবাদের সহিত তুলনা করিলে চার্ব্বাকের বিশিষ্টতা আরও ফুটিয়া উঠে।

চার্ব্বাক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন কহিয়াছেন—চার্ব্বাক নাস্তিকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য কারণ চার্ব্বাক বেদবাক্যে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী, দেহাতিরিক্ত আত্মায় অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। বৌদ্ধ ও আর্হতেরা (জৈন) জন্মান্তর স্বীকার করিয়াও বেদবাক্য অবিশ্বাস করেন। এই জন্য তাঁহারা নাস্তিক। কারণ যাঁহারা বেদবাক্যে শ্রদ্ধা করেন না ও (and) জন্মান্তরে আস্থা প্রদর্শন করেন না তাঁহারাই ভারতে নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হয়। তথাপি হিন্দুর পুরাণ বলেন দেবগুরু বৃহস্পতিই চার্ব্বাক শরীর পরিগ্রহ করিয়া লৌকায়তিক দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন; আবার স্বয়ং বিষ্ণু বুদ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-মাতার সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং ঋষভদেব হইয়া আর্হত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যে টীকা দিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—একের স্থানমাত্রে যে দ্বিতীয় অবস্থান করে, সেই ব্যাপ্য; যেমন বহ্নির ব্যাপ্য ধূম। বহ্নি জন্য বাষ্পের নাম ধূম; সুতরাং বহ্নি ভিন্ন ধূম থাকিতে পারে না। আর ব্যাপ্যের স্থানে যে থাকে তাহার নাম ব্যাপক। এ স্থলে মাত্রপদ দেওয়া হইল না, কারণ ব্যাপ্য যে স্থলে থাকে ব্যাপক সে স্থলেতে থাকে অন্যত্রও থাকে। এই ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের নিয়ত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে। অনুমাতা (অর্থাৎ যিনি অনুমান করেন) এইরূপ ব্যাপ্য দর্শনে ব্যাপ্তির স্মরণ করে; পরে ব্যাপকের উপলব্ধি করে। অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্যকে হেতু করিয়া ব্যাপকের সাধন করা হয়। এই জন্য ব্যাপ্য হেতু ও ব্যাপক সাধ্য। ব্যাপ্যের অবস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানের নাম পরামর্শ। যাহাতে অনুমান করা যায় তাহার নাম পক্ষ। যথা 'পর্ব্বতে বহ্নি আছে কারণ ধূম দেখা যাইতেছে। এই পর্ব্বত পক্ষ।' ভারতবর্ষীয় দর্শন বুঝিতে গেলে ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, হেতু, পরামর্শ, পক্ষ, সাধ্য ও সাধন এই কয়েকটি শব্দের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝা উচিত।

চার্ব্বাক দর্শনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"পুরাণকার মহারাজ বেণের যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, চার্ব্বাকেরও সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাই। মহারাজ বেণ, যেমন বৈদিক ধর্ম্মের উপরে খড়্গহস্ত হইলেন; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী ও আত্মায় অবিশ্বাসী হইলেন;—চার্ব্বাকের মতবাদেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। মহারাজ বেণ রাজশাসনে ঘোষণা করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছিলেন ও বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হয় চার্ব্বাক বেণের উপদেষ্টা বা সভাপণ্ডিত ছিলেন, নয় বুদ্ধদেবের মত শিষ্যদিগের নিকট নিজের মতবাদ মুখে মুখে প্রচার করিয়াছিলেন। পরে মহারাজ অশোকের ন্যায় মহারাজ বেণও সেই মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বেণ কৃষিবিদ্যা প্রবর্ত্তক ও প্রচারক মহারাজ পৃথুর পিতা। এই বেণ ও পৃথুর নাম সুপ্রাচীন মনুসংহিতায় পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মহারাজ বেণের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি, চার্ব্বাকের মুখে তাহাই শুনিতেছি। ইহার দ্বারা পাঠক-পাঠিকা অনুমান করিতে পারেন চার্ব্বাকের মতবাদ কত প্রাচীন। (ভারতবর্ষ, ১৩২৩, ম ৮০:-৫)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় সাংখ্যের পুরুষ ও নাস্তিকবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশে নাস্তিক-দর্শন যে কতকালের দর্শন তাহার কোন ঠিকানাই হয় না। উপনিষদে ও পুরাণে শুনা যায় দেবগুরু বৃহস্পতি (অথবা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) অসুরদিগের ইহপরকাল নষ্ট করিবার জন্য, নষ্টামি করিয়া এই দর্শন অতি প্রাচীন কালে জগতে প্রচার করেন। এই জন্য নাস্তিক দর্শনের অপর নাম বার্হস্পত্য দর্শন। চার্ব্বাক এই বার্হস্পত্য দর্শনের প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। এই চার্ব্বাক যে কে এবং কোন সময়ের লোক তাহার কোনই ঠিকানা হয় না। মহাভারতে দুর্য্যোধনের বন্ধু চার্ব্বাক বলিয়া এক রাক্ষসের নাম পাওয়া যায় (শান্তি পর্ব্ব ৩৯ অধ্যায়)। কিন্তু সেই চার্ব্বাকই যে দার্শনিক চার্ব্বাক তাহা ঠিক বলা যায় না। চার্ব্বাকের মত সমস্ত লোকেরই আয়ত্ত বলিয়া চার্ব্বাক মতকে লোকায়ত মতও বলা হইয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ চাণক্য তিনটি মাত্র প্রাচীন দর্শনের নাম করিয়াছেন—যোগ, সাংখ্য ও লোকায়ত দর্শন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে নাস্তিক দর্শন নিতান্ত অল্প দিনের দর্শন নহে। (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৬, ১ম, ৩৪৮)।

খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবি প্রতিমা নাটকে রাবণের মুখে এই কথা বলিয়াছেন—

ভোঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্মি সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রং মেধাতিথেঃ ন্যায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বার্হস্পত্য দর্শনের কথা ভাস কবি জানিতেন। কৌটিল্য বা চাণক্য ভাসের পূর্ব্বে আন্বীক্ষকীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কহিয়াছেন সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী। আর এই আন্বীক্ষকী কৌটিল্য মতে চতুর্ব্বিধ বিদ্যার এক বিদ্যা। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুমান করেন কৌটিল্যের সময়ে বা দৃষ্টিতে ন্যায় এবং বৈশেষিক সম্ভবতঃ লোকায়ত দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ত্রয়ী নামক অপর একটী বিদ্যার অন্তর্গত ছিল বেদান্ত ও মীমাংসা। সেই জন্যই বোধ হয় কৌটিল্য, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত দর্শনের নাম করিয়া, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিকের নাম করেন নাই।

রামায়ণকার আন্বীক্ষকী দর্শনকে বিদ্যা বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধিমান্বীক্ষকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে। রাম ভরতকে সতর্ক করিয়া কহিতেছেন—কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবতে। (প্রবাসী ১৩২২—ভারতীয় দর্শন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।)

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় তাঁহার "বার্হস্পত্য-সূত্রম্" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"লোকায়ত বা চার্ব্বাক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এক বৃহস্পতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। অর্থ ও রাজনীতির প্রণেতা আর-এক বৃহস্পতির পরিচয় কৌটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ চার্ব্বাক দর্শনের প্রণেতা ও রাজনৈতিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বৃহস্পতির মতের উল্লেখ আছে। সুতরাং কৌটিল্যের পূর্ব্বে, রাজনীতিক্ষেত্রে, বৃহস্পতি যে আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কৌটিল্য বার্হস্পত্য পদ্ধতির মত উদ্ধৃত করিয়া, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। * ** ** কৌটিল্য শুক্র ও বৃহস্পতিকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।" গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজনৈতিক বৃহস্পতি বিরচিত একখানি পুস্তক ও তাহার টীকার সংবাদও ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। "বার্হস্পত্য-সূত্রটীকা" নামে একটি পুঁথি Oppest সাহেব তাহার তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (vol I, No. 6061)। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুঁথিটির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। বার্হস্পত্য-সূত্রের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; একখানি বিলাতের Royal Asiatic Societyর সংগ্রহে আছে (Winternitz ; Catalogue, No. 160 (3) P. 219); দ্বিতীয় খানি মান্দ্রাজে Government Oriental Libraryতে আছে। Royal Asiatic Societyর পুঁথিটিতে দেবগিরির যাদব রাজগণের উল্লেখ আছে। এই প্রমাণের বলে Thomas সাহেব পুঁথিটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে চাহেন। কিন্তু সাহেব এ কথাও বলিয়াছেন যে এই অংশ এবং শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণব গণের তীর্থক্ষেত্রাদির বিবরণের অংশ প্রক্ষিপ্ত ধরিলে, পুঁথিটি যে বহু প্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" Madras Government Oriental Libraryতে প্রাপ্ত পুস্তকখানির পরিচয় ও কিয়দংশ শ্লোক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন।—"পুঁথিটি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১০টী সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭০টী, তৃতীয়ে ১৪৭টী, চতুর্থে ৫০টী, পঞ্চমে ৩০টী এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪টী সূত্র আছে।" কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে কয়টী শ্লোক তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন

তাহা হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে এই বার্হস্পত্য-সূত্রম-এর বৃহস্পতি আর দার্শনিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কিছুতেই দার্শনিক বৃহস্পতি লিখিতে পারেন না :—

১। নিত্যকর্ম ন ত্যজেৎ ॥

২। যদা বেদোক্ত কর্ম্মজ্ঞানং শিবং বিষ্ণুং
শ্রেয়মপি পরিত্যাজ্য সর্ব্বং শূন্যমিতি
বদন্তি তদা বৌদ্ধাভিধান পাষণ্ডী ॥

৩। মোক্ষপূর্ব্বান্ দ্বারং ত্রয়ম্ ॥
শাক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ শৈব্যা ॥
মহাপথবৎ বৈষ্ণবম্ ॥

৪। ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ দোষদুষ্টমপি ॥

৫। বিপরীতং ন বেদ বীর্য্য দর্পেণ ॥
(ভারতী ১৩২৫, পৃঃ ৭৬৩—৭৭৪)

চার্ব্বাকের বেদ ব্রাহ্মণ মোক্ষ ও নিত্য কর্ম্মের উপর যতখানি শ্রদ্ধা তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

হতাশ্বাস।

—:*:—

এ জীবন? কিছু নহে কিছু নহে ভাই,
শুধু ধূলা, শুধু বালি, এক মুঠি ছাই,
কিছু নহে আর
প্রদীপের ক্ষীণ শিখা ঝটিকার রাতে
নিমেষে নিভিয়া বায়ু প্রবাহ আঘাতে
নিবিড় আঁধার!
কি তাহার আদি আর কোথা তার শেষ
লুকায় অনাদি কালে ফেলিতে নিমেষ
রহস্য আলয়,
দিয়েছিল কত শোভা আলোর কিরণ
জগতের ইতিহাস আছে কি এমন
বুকে গেঁথে লয়?
তবে এত ভালবাসা? তবে এত মায়া?
দেখিয়া শিখেছি শুধু দুদিনের ছায়া
ভেবে মরা ভুল
কে কবে জীবন-পথে সাথী করে লয়
পথিক-নিবাসে এ যে ক্ষণ পরিচয়
রাতে ফোটা ফুল!
এই আছে এই নেই মানব জীবন
তারপর কি আঁধার নিবিড় গহন
সীমারেখা নেই,
পথের পথিক এ যে শ্রান্ত কলেবর
বালি দিয়ে বাঁধিয়াছে পথে খেলাঘর
জীবন কি এই?

বিশ্বাস।

—ঃ❀ঃ—

বলো না বলো না আর মানব জীবন এই
আগাগোড়া মিছে সব স্বপন সম
একটি আশার বাণী সোণার তরীর মত
এ আঁধার সাগরে ভাসাও
ডুবিতে বসেছে যে গো অতল বারিধি তলে
নিরাশা উছলজল নিবিড়তম
আশার উজল তটে রবির কিরণ লেখা
সে ললাটে বারেক ছোঁয়াও।

একবার বল সবে মিছে নয় মিছে নয়
মিছে নয় আমাদের জীবন খেলা
এ ভাঙ্গা গড়ার মাঝে চলিতেছে যে বিধান
তুমি আমি কি বুঝিব তায়,
কোথায় পড়িছে ডাক্ অকালে ভাঙ্গিছে তাই
হেথাকার জীবনের হাটের মেলা
কোন্ জগতের পার কোন্ গগনের ধার
সেই লোক না জানি কোথায়!

তবু বল সেও আছে সেও আছে কোনখানে
জানা না জানার পারে আছে সে তবু
অসীমের কোলে কোলে সাঁজের ও তারাগুলি
কনক বীণায় গাহে গান
মনের সীমানা যদি ধরিতে না পারে তারে
জ্ঞানের মহিমা যদি না জানে কভু
তবু আছে সে জগত এ জগত নহে শেষ
এ জীবনে নহে অবসান!

বল শুধু বল বল আরো আলো, আরো গান,
আরো প্রাণ বাজে সেথা দিবস নিশি
সে ধরণী আরো শ্যাম সে বাতাস আরো মধু
সে আকাশ আরো বড় নীল
জনম মরণ সেথা বুকে বুকে দুটি ভাই
ইহকাল পরকাল যুগলে মিশি
রচিয়াছে সেই মহা অনাদি মাধুরী ভরা
সেথাকার অনন্ত নিখিল!

এত যে অচেনা মুখ এত যে অজানা প্রাণ
তারি মাঝে দু'চারিটি প্রাণের মণি
বুকে বুকে চেপে ধরে হাতে হাতে বেঁধে তবু
চোখে চোখে হারাবার ভয়
এত প্রেম ভালবাসা দরশ-পরশ-ঘেরা
হারানিধি-খুঁজে-পাওয়া-রতনখনি
এ পারে ও পারে যেথা অপারে মিশেছে আসি
বল সেথা হবে তা অক্ষয়!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

মরণ আড়াল।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একা—আবার অন্ধকারে,—একা! আবার সেই প্রশ্ন—এখন যাই কোথা? কি করিয়া এ হেয় বেশ পরিবর্ত্তন করি! এতক্ষণ সহৃদয় যুবকটির সঙ্গ-সাহচার্য্যে আত্ম-অবস্থা অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। মানুষ ইচ্ছা না করিলেও অজ্ঞাতে পরের উপর কতখানি নির্ভর করে, পরস্পরে সাহায্যভিক্ষারী হয়! কিন্তু এ জেল-ফেরৎয়ার কয়েদীকে কে সাহায্য করিবে! দশের সুখ-সমৃদ্ধি-সহায়ক সমাজ; পরোক্ষে আত্ম-সুখের-পরিতৃপ্তি পরিপুষ্টির জন্যই তাহার গঠন, তাহাতেই তাহার গৌরব! আর কয়েদী সমাজদ্রোহী—সাধারণের সেই সুখ শান্তির অন্তরায়,—অন্ততঃ লোকের তেমনি বিশ্বাস,—আশা তবে আর আমার কি আছে! মনুষ্য সমাজ আমার জন্য নয়! এমন কি পাপ করিয়াছিলাম বিধাতা! যাহার জন্য এ নিদারুণ শাস্তি! সমাজের পাপের বিরুদ্ধে একদিন দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলাম—তাই কি আমার প্রতি সমাজের এই ভীষণ প্রতিশোধ—বিধাতাও তাহার সহায়! মনটা আবার দমিয়া গেল! ভবিষ্যৎ যাহার এমন ঘন ঘটাচ্ছন্ন, তাহার কি একপদ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয়,—না কোন ফন্দীসন্ধি মনে আসে? সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলাম। নির্জ্জন প্রান্তর, ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। একটু সাড়া শব্দ নাই। কি ভীষণ, ভয়াবহ স্তব্ধতা, কুত্রাপি একটি জীবনের চিহ্নমাত্র নাই! প্রাণহীন, প্রাণীহীন প্রান্তর—আমি তাহাতে একা! আমার মর্ম্মের বেদনা অন্যে বুঝিবে না! মনে হইতেছিল—ভূমে লুটাইয়া পড়ি! শেষ হইয়া যাক এ জীবন! বসিয়া পড়িলাম। সাধ হইতেছিল নিজকে নিজ নখে চিরিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলি, মানুষ হইয়া যদি মানুষের অধিকার না পাইলাম তবে আর জীবনের আবশ্যক!

শৃগালের প্রাহরিক চীৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া ফল! নিজের নিচেষ্ট ভাব অসহ্য হইয়া পড়িল! এই জন্যই কি শত বিপদ মাথায় করিয়া জেল হইতে পলায়ন করিয়াছি! যুবক সত্যই বলিয়াছেন—মানুষ মানুষই, ভেড়া নয়,—জীবনটাকে

স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিবার জন্য মানুষের জন্ম হয় নাই—নিজের স্থান তাহাকে নিজে করিয়া লইতে হইবে!

উঠিয়া দাঁড়াইলাম! যত বিলম্ব ততই বিপদ! গোঁসাইগঞ্জের দিকে চলিলাম, বড় রাস্তা ধরিয়া নহে, নদীর ধারে ধারে—দো-পায়া পথে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা বাগান বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকায় আঁধারেও ছায়ার মত সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। বাড়ীটা সহর হইতে কিছু দূরে, আশে পাশে অন্য বাড়ী নাই। ভাবিলাম—আর অগ্রসর হওয়া নয়—এই বাড়ীতেই চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিসের চেষ্টা? কয়েদী জীবনের যেটা প্রধান অপবাদ, সেই চৌর্য্য আজ আমার একমাত্র অবলম্বনীয়—নিরুপদ্রবে এ হেয় বেশ পরিবর্ত্তনের অন্য উপায় আর কি আছে!

সম্মুখেই ফটক—উন্মুক্ত। স্থানটি জনমানবহীন। সুযোগ বটে! ধীরে ধীরে অতি সাবধানে বাড়ীর হাতার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। মধ্যস্থলে তাহার একটি নাতিবৃহৎ পাকা-বাড়ী। চতুর্দ্দিকে অনেকখানি খোলা যায়গা। ধারে ধারে গাছপালা, ফলফুলের গাছ বোধ হয়। সেই দিকে যাওয়াই নিরাপদ ও নিজেকে গাছের মধ্যে লুকায়িত রাখিয়া বাড়ীখানির অন্ধিসন্ধি যতটুকু জানা যায়,—সেই চেষ্টা চাই আগে।

সত্যই সেটা ফুল-বাগান। সারি সারি কেয়ারী, ফুলের গাছ; মধ্য দিয়া সব রাস্তা। একটা রাস্তা ধরিয়া নিঃশব্দে গুটি গুটি চলিলাম। পার্শ্বেই একটা লতা-বিতান। অন্ধকারে তাহা একটা মন্দিরের মত দেখাইতেছিল। তাহার নিকটস্থ হইতেই মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছিল। আশ্চর্য্য! এ অন্ধকারে এমন স্থানে ইহারা কাহারা!

যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া লতা-বিতানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। একটি বামা-কণ্ঠ অনুচ্চ, ধীর সংযত স্বরে বলিতেছে—"না—ভাই, ক্ষমা কর,—যা' হবার নয়, সে প্রস্তাবে ফল কি! এ-ভোগ আমাকে ভুগ্‌তেই হবে!"

যুবক কণ্ঠ উত্তর দিল—"ভুগ্‌তে হবে কেন? কিসে তুমি ওর অধীন? ইচ্ছা কর্‌লেইত তুমি এক মুহূর্ত্ত এ সকল ঝঞ্ঝাট—শেষ করে দিতে পার!"

এঁ ! একি ! কাহার কণ্ঠস্বর এ ! এ যে আমার সেই সদ্য পরিচিত, সহৃদয়, সাহায্যকারী সাইক্লিষ্ট বন্ধুবরের স্বর ! সে এমন অবস্থায় এখানে ! বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া আরও নিকটে সরিয়া দাঁড়াইলাম। যুবতী উত্তর দিলেন—"যত সোজা মনে কর্‌ছ অতুল দা, ব্যাপারটা বাস্তবিক তত সোজা নয়। বাবা, ডাক্তারকে বুঝেও ঠিক বুঝ্‌তে পারেন নি, ওকে আমার হিতৈষী ভেবে, আমাকে ওর অধীন করে গেছেন,—এখন সকলের চোখে আমার ও একমাত্র অভিভাবক,—ওর হাত হতে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়।"

যুবক বলিলেন "অভিভাবকই বটে ! অভিভাবক মশাই, তাঁর কর্ত্তব্য যথেষ্ট পালন করছেন ; অনেক হয়েছে—আর কেন ! লোকটার প্রকৃত পরিচয় সংসারকে জানান এমনি কি অসম্ভব ব্যাপার !"

যুবতী বলিলেন "সম্ভব অসম্ভবের কথা নয় অতুল দা। তুমি, আমায় অত বেশী স্নেহ কর বলে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ভাই, আমি যদি এখন ওর অভিভাবকত্ব ঘুচাতে চাই, ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ? লোকে দুষবে আমাকেই। মুখে যে যাই বলুন—মেয়েদের উপর আমাদের দেশের লোকের যতটুকু আস্থা, যে সহানুভূতি—তাতে বিচার বিবেচনা করে' মেয়েদের সম্বন্ধে যে কেউ মন্তব্য প্রকাশ করবে—সে আশা বৃথা ! বিশেষতঃ ব্রাহ্মের বয়স্থা মেয়ে,—লোকগুলো যেন একটা কিছু রটাতে পারলেই বাঁচে !"

অতুল একটু উত্তেজিত হইয়াই উত্তর দিলেন "ঐ লোক লোক করেই ত সব জাহান্নমে যেতে বসেছে ! আচার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় নিজে কে কতখানি হিঁদু,—সেটা একবারে চিন্তার মধ্যে না এনেই অবাধে ওই অনাচারী, নামে-হিঁদুগুলো,—যাঁরা অন্ততঃ ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিতে নারাজ, স্পষ্টাপষ্টি নিজেদের উদারপন্থী বলে জানিয়েছেন তাঁদের সৎসাহসিকতাকে প্রশংসার চক্ষে না দেখে তাঁদের নিন্দে করেই কৃতার্থ হবে ! মূর্খগুলো,—হৃদয়হীন পাষণ্ডের দল, গতানুগতিক পথে চোখমুদে চলাকেই জীবনের সার বলে মেনেছে,—এত দিনের অব্যবহারে ওদের মনের চাবিটায় এমন মরচে ধরে গেছে যে ভুলেও বোধ হয় ওদের মনে হয় না—ওদের নিজের আবার একটা মূল্য আছে ! না—ওদের বুঝবার শক্তি আছে—মানুষ কি দুঃখে—কতখানি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে—আপনার পথ আপনি দেখে ! আপন ভাবে চলতে চায় !"

যুবতী যেন হাস্য মুখে তরল ভাবেই বলিলেন "লোক কি করে না করে—সেটার আলোচনায় ত এখন কোন ফল হচ্ছে না অতুলদা,—দশের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে ফলটা যে তার এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি ভাল দাঁড়াবে না সেটা ত বুঝ্‌ছ।"

অতুল বলিলেন "বুঝ্‌তে বুঝ্‌তেই ত দিন গেল বোন ! কবে এ বোঝার শেষ হবে ! একজন দিব্বি আরামে সমাজে গণ্য মান্য সেজে মনের সুখে অন্যের উপর অত্যাচার করে যাবে—মাতব্বরী ফলাবে—আর উৎপীড়িত মাথা তুল্‌তে চাইলেই অপরাধ ! পড়ে পড়ে মার খাওয়াই কি এ দেশের ধাত হয়ে গেছে। ও স্বভাবটাকে যার যত ইচ্ছে ধন্য ধন্য করতে হয় করুক—আমি ত ওতে বাহবা দেবার এমন কিছু দেখ্‌তে পাইনে ! বুঝ্‌ছি যেখানে অন্যায় অত্যাচার করছে—তার প্রতিকারের চেষ্টা করব না ! কেন ? কিসের জন্যে নিজকে এত হেয় করে কৃতদাসের মত নির্জ্জিত হয়েও গর্ব্বিত মনে করবো—তাই যদি হ'ত তবে পোষা কুকুর আমাদের সব চাইতে উচ্চ আদর্শ ! মানুষের আদর্শ সেটা কিছুতেই হ'তে পারে না,—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অধীনতায় নয়, পরের ইঙ্গিতে চলা ফেরায় নয়, ভালমন্দ বিচারে তার মনুষ্যত্ব। বিপদ ওতে আছে বলেই কি ও-পথে চল্‌তে মানা ! বরং বল—চলতেই হবে তাকে ওই বিপদের মাঝ দিয়ে—তাতেই তার অস্তিত্ব—সেই রকম লোককেই আমি বলি মানুষ ! এই আজ এখানে আসবার পথে একটা জেল পলাতক কয়েদীর সঙ্গে দেখা। বেচারী নয় নয়টা বছর জেলের পীড়ন নীরবে সহ্য করেছিল কিন্তু একটা মাস আর তার সইল না ! খালাস হ'ত সে আর একমাস পরে কিন্তু নয় বছরে সে যা বুঝ্‌তে পারে নি তাই তাতে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে শেষটায় তার মনকে অস্থির করে তুলেছিল সেইটাই। সে অন্য দশজন কয়েদীর মত ভাবত জেল'ত শাস্তি পাবারি যায়গা,—তাই তার যত অত্যাচার সহ্য হ'ত কিন্তু যখনি এতদিন তার মনে জাগল—কেন এ শাস্তির বিধান ? শাস্তি ত বিপদগামীকে সুপথে আনবার জন্যেই,—তা ত জেলে খুবই হয়, তবে কেন—কোন অধিকারে জেলে ওরা এমন শাস্তি দেবে ? গায়ের জোরে প্রবল করবে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ! মানুষ সইবে বিধির কোন্ বিধানে ! অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার জেল তখন,—সে অসমসাহসে জেলে 'লঙ্কাকাণ্ড' করে সেই রাতেই পলাতক ! লোকে বল্‌বে লোকটা কি ভয়ানক ! জেল কয়েদীর পক্ষে যেটা অস্বাভাবিক, পড়ে পড়ে মার না

খেয়ে পলায়ন—অবশেষে খালাস হবার একমাস পূর্ব্বে নির্ব্বোধটায় হল কিনা তাতেই কুমতি! আমি কিন্তু দশের মতকে দূর হতে নমস্কার করে ওইটাকে মেনে নিয়েছি—ওর গুণের মত গুণ। স্বভাবের ওর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছে ও এতদিনে! আমি তাই ওকে কাছে আমার পাশে যায়গা দিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করিনি—ওকে বন্ধু বলতে গর্ব্বই হয়েছে! চলিত প্রথাকে মান্য না করে যে মানুষের অবমাননাকে আমাল দেয়নি সে মনুষ্য সত্তার সন্ধান পেয়েছে—কয়েদী হ'ক সে মানুষ! কয়েদীকে পলায়নের সাহায্য করে আমিও আইনের চোখে অপরাধী হয়েছি—এমন অপরাধ যেন জীবনে নিত্য ঘটে।”

যুবক একটু থামিয়া আবার আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন “কোথাকার কে কোন্ কয়েদী তার জন্যেও প্রাণ কেঁদে ওঠে, আর তুমি—কত আপনার, আমার বাল্যের সঙ্গিনী, নিজের বোনের অধিক—তোমার উপর ও করবে এমন অত্যাচার, তা আমি কিছুতেই সইব না—সইব না—ইচ্ছা হয় এখনি তোমায় এখান হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে যাই। কেবল তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—আমি কিছু করবার কে!”

অলকা বলিলেন “করবার তুমি কে—আর না কে—সে তুমিও জান—আমিও জানি! সে কথায় কাজ কি ভাই! অধৈর্য্য হয়ে হবে কি বল? এ দিন আর চিরদিন থাকবে না, এ এখন আমাকে সইতেই হবে!”

যুবক বলিলেন “ভাল! যদি তাই ভাল বুঝে থাক ভাল! কিন্তু শোন বলছি অলকা! একদিন এমন সময় আসবে যখন তোমাকে বুঝতে হবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে সুফল ফলে না কখনো! স্বার্থ নিয়ে যেখানে কথা সেখানে কি ডাক্তার অত সহজে তোমায় পরিত্রাণ দেবে? আজ যাকে বিদ্রোহ ভাব মনে করে অত সঙ্কুচিত হচ্ছ, সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় পৌঁছে সে দিন তোমাকে এ সঙ্কোচ ছিন্ন মলিন অশুচী বস্ত্রের মত ঘৃণায় দূরে ফেলে দিয়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে! সে কিন্তু সব বিফল! অসময়ে মরিয়ার বৃথা চেষ্টা; যে মানের ভয়ে আজ অধীনতাকেও শ্রেয় বলে ভাবছে সেই মান সম্ভ্রমই তখন রক্ষা পারে কি না সন্দেহ! আমার আর জানতে বাকী নেই অলকা,—আমি বেশ বুঝেছি এখনে তোমার মঙ্গল নেই বোন!”

অলকা কাতরকণ্ঠে বলিলেন—‘জানি অতুলদা, তুমি আমায় কত ভালবাস, আমার জন্যে তোমার কত ভাবনা! কিন্তু দাদা, বাবা যা করে গেছেন—আমি তার বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াই!”

অতুল বলিলেন—“ভাল, বোন, তাঁর একটা ভুল হয়েছিল বলেই, তার ফলাফল জেনে শুনেও কি সেই ভুলটা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে? থাকতে হয় তুমি থাক! আমি কিন্তু তা পারবো না—তোমাকে যতদূর সম্ভব না জড়িয়ে আজ আমাকে নিজের গরজেই ডাক্তারের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করতেই হবে! তুমি যা জান না—আমি তা জেনেছি,—আমি আর এর প্রশ্রয় দিতে পারবো না, আর বাধা হয়ো না অলকা!”

অলকার কোন উত্তর শুনা গেল না। যুবকযুবতী লতা-বিতান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন! আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ আবার কি রহস্য! কে এ অলকা? যুবক ইহার কে? কে সে অত্যাচারী ডাক্তার? জেলের বাহিরে,—স্বাধীন সামাজিক জীবনেও দেখি সেই সমস্যা—দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার! স্বাধীনতা তবে কি স্বপ্ন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

একবার মনে হইল,—না, এ বাড়ীতে আর নয়—এখনি এ স্থান পরিত্যাগ করি। হঠাৎ যদি ধরা পড়ি, আমার সহৃদয় সাইক্লিষ্ট বন্ধু তাহা হইলে কি ভাবিবেন! আমি যাহাই হই, অন্যে আমাকে যত হেয়ই মনে করুক, কিন্তু যিনি আমাকে যে কারণেই হ'ক, মানুষের গণ্ডীতে স্থান দিয়াছেন তাঁহার সমক্ষে নিজের হীনতা প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসে তাঁহার আঘাত দিতে পারিব না! সে স্থান পরিত্যাগই শ্রেয়।

প্রাণ পলায়নপর হইলেও মন কিন্তু তাহাতে সায় দিল না। মনটা রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল,—শ্রেয় অশ্রেয়ের বিচার বিবেচনা তাহার ছিল না। মনে হইতেছিল—সোজাসুজি গিয়া বন্ধুকে অকপটে সমস্ত জিজ্ঞাসা করি! হায়! সে সুযোগ, সে শক্তি আমার যে নাই! প্রাণে তাঁহার জন্য যথেষ্ট বন্ধুত্ব প্রীতি সঞ্জিবীত হইলেও তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার আমার কোথা?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আরও ঘণ্টাখানেক সেই স্থানে কাটাইয়া দিলাম। কোন সাড়াশব্দ নাই,—বাড়ীখানাতে জনপ্রাণী নাই যেন—অথচ বুঝিতেছি বাড়ীখানি জনহীন নহে—রহস্যময় এ ভবন!

সহসা একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। একখানি মটরকার বৈদ্যুতিক আলোকে বাড়ীর একাংশ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাষিত করিয়া ফটকের বাহির হইয়া গেল। আরোহী সম্বন্ধে কিছুই অনুমান বা অনুধাবন করিতে পারিলাম না,—উজ্জ্বল আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারে আরোহীর আসন। কারের আলোকে দেখিলাম—দালানের দক্ষিণ দিকে একটা গাড়ী-বারণ্ডা। সম্মুখটা তাহার পুষ্পিত লতায় আচ্ছাদিত,—সুবিন্যস্ত ভাবে সজ্জিত। সৌখীন লোকের গৃহ বটে। কিন্তু গৃহে আলোক নাই কেন? অধিবাসীবর্গই বা কোথায়? হয় ত সকলেই নিশিথ রাত্রে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত অথবা সকলেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বাগানবাড়ী,—সৌখীন প্রাণের আমোদ প্রমোদের স্থান,—গৃহস্বামী খুব সম্ভব ইয়ার বন্ধু সঙ্গে করিয়া বসন্তের হাওয়ার মত এক দিনের জন্য প্রমোদভবনে দেখা দিয়াছিল—আবার সদলবলে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। তাহা হইলেই হইয়াছে! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর আশা নাই! পরিধের বস্ত্র যে আমার না হইলেই নয়! স্থায়ী বাসিন্দা না থাকিলে এখানে বস্ত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? মনে হইল, অন্য কোন স্থানে চলিয়া যাই কিন্তু লোকালয়ে, ঘন-বসতিতে বিপদ অধিক,—এ গৃহে কি কোন ভৃত্যও থাকে না,—তাহার বস্ত্র পাইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট!

ধীরে ধীরে অট্টালিকার সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। কোথায়ও কেহ নাই। দরজা জানালাগুলি সমস্তই রুদ্ধ! গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিলাম—গৃহ প্রবেশের সুযোগ নাই।

ভাবিতেছি কি করি,—হঠাৎ আয়নায় প্রতিফলিত আলোকের ন্যায়,—এক ঝলক আলোক আমার সম্মুখ দিয়া নাচিয়া গেল! চাহিয়া দেখি একটা জানালার শার্শি দিয়া গৃহাভ্যন্তরের দীপরশ্মি বাহিরে, ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। আলোকের গতিতে অনুমান করিলাম, দীপধারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রুত গতিতে কোথায়ও চলিয়াছে। একটা থামের পার্শ্বে আত্ম-গোপন করিলাম। ঝাড়া আধঘণ্টা আর কোন সাড়া শব্দ নাই! সহসা আবার সেই আলোক রশ্মি। এবারে ধীরে ধীরে অন্তর্হৃত হইয়া গেল, আলোকধারী বোধহয় ফিরিয়া গেল। কোন লোকের ছায়াও দৃষ্টিগোচর হইল না,—আলোক সুদূর কোন অভ্যন্তর-কক্ষ হইতে সুবৃহৎ দরজার মধ্যে দিয়া আসিয়া শার্শিতে পড়িতেছিল। সেই আলোকে, অস্পষ্টরূপে হইলেও দেখিতে পাইতাম,—আমার সম্মুখের কক্ষটি শূন্য,—তাহার

একটা পাশের প্রকাণ্ড দরজাটি খোলা,—তাহার ভিতর দিয়া অপর কক্ষের আসবাবপত্র দেখা গেল,—আল্‌না বা আর বা কিসে কাপড় চোপড় ঝুলান আছে যেন!

আর কিছুকাল তথায় সেই ভাবে অপেক্ষা করিয়া, সংকল্প স্থির করিলাম। পায়ের নীচেই রাস্তায়-পাতা কঙ্কর, পাথরের খোয়া—তাহার একখানা তুলিয়া লইয়া জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। আবার সেই ভয়াবহ নীরবতা! অন্যের যাহাতে ত্রাস—আমার তাহাতে আনন্দ—সুযোগ! অতি সন্তর্পণে পাথরের আঘাতে কাচ ভাঙ্গিয় সেই শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমার তখন কি ভীষণ অবস্থা! সমস্ত দেহটা তখন আমার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে; শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নাই যেন—কণ্ঠ-নালী শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে,—চুরির উদ্দেশ্যে এ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ আমার জীবনে এই প্রথম! কখন বা ধরা পড়ি!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যতদূর সম্ভব সাবধানে অপর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছি! আবার যদি সেই আলোকধারী দেখা দেয়। দিলই বা সে ত এ কক্ষে আসে না।

এক পা—দুই পা—তিন পা! এটা কি! টেবিল! পার্শ্বে ফিরিতেই চেয়ার—মরণ আর কি—পদে পদে বাধা! শব্দ হইলেই গিয়াছি! হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—টেবিলের উপরে কিছু নাই তাহার উপর দিয়া—টেবিল পার হইলেই হয়ত কাপড়ের আল্‌না! টেবিলের উপরে উঠিতেছি—একি! কি ভয়ানক! কি একটা মাথায় ঠেকিল! এঁ! মানুষের পায়ের মত,—শক্ত—হিম—এমন ভাবে ঝুলান কেন! মরা! গলায় দড়ি—ফাঁসী লটকাইয়া কি কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে! কি বিপদ! এ কি হইল! ভয়ে আমার চেতনা লোপ পায় বুঝি! টেবিল হইতে নামিতে চেষ্টা করিলাম! একখানা চেয়ার সশব্দে উল্টাইয়া পড়িল! তাহার পর কি হইল জানিনা—কেবল মনে হইতেছিল—আমাকে মহা অন্ধকার গ্রাস করিতেছে, অতল তিমির সাগরে ডুবিতেছি—আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে সেই আত্মঘাতী প্রেত!

কাহার কর স্পর্শে যেন জাগ্রত হইলাম,—চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখি সম্মুখে ঝুলিতেছে সেই জীবনহীন দেহ—আমারই পার্শ্বে আলোক হস্তে একজন ভদ্রলোক। চেহারা তাহার যেমন রুক্ষ, দৃষ্টিও তাহার তেমনি ভয়ানক—আমার দিকে কুটিল কটাক্ষে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; চৈতন্য অপেক্ষা অচৈতন্যই আমার তখন প্রেয়!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা।

—:o:—

হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়েই এমন অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, দেশাচার বশতঃ যাঁহাদের ধারণা হইয়া আছে যে, শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষত বেদাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা এবং ওঙ্কার উচ্চারণাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। আমি জানি যে অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাদি পঠনপাঠনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন না। বর্ত্তমানে অনেকেই স্ত্রীকন্যাদিগকে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ীতে পত্রলেখা প্রভৃতি নিতান্ত অপরিহার্য্য কার্য্যে যতটুকু, আবশ্যক ততটুকুই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় মদীয় বন্ধুবর কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সামান্য সামান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যাপন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর উভয়েরই ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রের নিষেধ ভাবিয়া তিনি তাঁহার সহধর্ম্মচারিণীকে উপনিষদাদি শিক্ষা দিতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর আমার সহিত আলোচনায় যখন বুঝিলেন যে স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, বরঞ্চ শাস্ত্রসম্মত, তখন তিনি সহস্র লোকাপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের বংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশ; সেই বংশে ব্রাহ্মণোচিত উদারতা যথেষ্ট আছে, তাই তাঁহাকে জ্ঞাতিবিরোধ এবং তদানুষঙ্গিক লোকাপবাদও সহ্য করিতে হয় নাই।

শাস্ত্রাদি আলোচনা যতদূর করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীলোককে বেদাদি পঠনপাঠনের, সুতরাং উচ্চশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। আদি শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। কন্যা যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রযত্ন করেন, তবে তিনি যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পতি লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে যে ইন্দ্রিয়সংযমের সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষত বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতিস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুত পৃথক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং" (পট ৪, কং ১৫) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিত ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্টী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদিগের যখন ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা ছিল না, তখন বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনের কার্য্যে যে তাঁহাদিগের কোনও বাধা ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাই গোভিলগৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিয়াছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ অধ্যয়ন না করিয়া হোম করিতে সক্ষম হয় না।" ১ গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্রপাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোভিল দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞবিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে, গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই যজ্ঞের পূর্ব্বদিবসে উপবাস করিতে হয়, (নির্জলা উপবাস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস-দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত (যথা, ব্রহ্মাহ বা ইদমেকমগ্র আসীৎ ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায়

১ পুরুষার্থপ্রকাশ গ্রন্থে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত—"পত্নীমধ্যাপয়েৎ কস্মাৎ পত্নী জুহুয়াদিতি বচনাৎ নহি খল্বনধীত্য শক্নোতি পত্নী হোতুমিতি।" পৃঃ ৬৭

যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে; গৃহের নাপিতানী পরিচারিকা প্রভৃতিকেও অবস্থাবিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে তৎসমুদায়, বিশেষত বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই—শ্রৌতসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" [২] ইহার উপর অন্য স্পষ্টতর কোন প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। আজও সেই অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহকালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যখন দেখি যে, স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কোন কোন নবীন আচার্য্য উপরোক্ত সরল মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "বেদ" শব্দের অর্থে "কুশ" অর্থ করিয়া বলিয়াছেন যে কন্যার হস্তে কুশ অর্পণ করিয়া পাঠ করাইবে। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে এই শেষোক্ত অর্থ কেমন যেন একটু অসঙ্গত বলিয়া কি বোধ হয় না?

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও পক্ষে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে, বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে (জায়াপতি) নিজাভিমুখ

২ বেদং পত্নৈ্য প্রদায় বাচয়েৎ।

করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।" [৩] ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা সামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই মতের সপক্ষে গোভিল যে একরথী ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পরাশর স্মৃতির মাধবভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে-সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। [৪] ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহকালে যে-সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে ভাষ্যকারদিগের মতামতের জ্বালায় এত সম্প্রদায়ের এবং এত বিবাদকলহের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটী নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সম্বাদ। এই দুইটী সম্বাদ এত প্রচলিত যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করি না। যাই হৌক, আমরা বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের যেরূপ শিক্ষার এবং যে সকল অবস্থায় স্বাধীনতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারে মনের স্বাভাবিক গতি

৩ প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ * * * বাচয়েৎ প্রমে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি।

৪ "দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"

অনুসারেই হউক, বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুখশান্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

এইবারে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আভাস দিয়া আসিয়াছি যে মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার বিধিনিষেধ কিছুই দেখা যায় না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, মনু তাহার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু মনুসংহিতা যে সকল উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তির বৃদ্ধি হইতে পারে সেই সকলের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতা হইবার অপেক্ষা পতিসেবা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যে গৃহের সুখশান্তির অধিকতর অনুকূল, মহর্ষি মনু তাহা বুঝিয়া তাহারই জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥ ২ অ, ৬৭

স্ত্রীলোকদিগের সহিত বৈবাহিক বিধি বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যারূপে স্মৃত হয়। এই শ্লোক হইতেই কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে মনু স্ত্রীলোকের উপনয়ন নিষেধ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন। ৫ এই শ্লোকটী আমাদের যেন কতকটা অর্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের বোধ হয়, মনুর মতে গুরুকুলে বাস করিয়া একটা লোকদেখান ব্রহ্মচর্য্যের ভাব অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিসেবাতেই বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তির সম্যক্ চর্চ্চা এবং বিশেষ কঠোর পরীক্ষা হয়—পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হয়। মনু স্ত্রীজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন "গৃহকর্ম্মে নিপুণ থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং ব্যয় করিবার সময় মুক্তহস্ত হইবেন।" অন্যান্য সংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিককালে

৫ মনুসংহিতার ভাষ্যকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার নিষেধজ্ঞাপক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

যেরূপ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা প্রথা ছিল, তাহাও যে মনুর সময়ে অনুপযোগী ও অপ্রচলিত বোধ হইয়াছিল তাহা নহে; মনুর সময়েও এই প্রথা সম্পূর্ণই প্রচলিত ছিল। তবে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকে জাতকর্ম্ম অবধি উপনয়ন ও কেশান্ত পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৬ আমরা যখন দেখিতেছি যে গৃহ্যসূত্রাদি বৈদিক গ্রন্থে স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার অমন্ত্রক করিবার বিধি নাই ৭ এবং বিষ্ণুসংহিতার ন্যায় প্রাচীন সংহিতাতেও মাত্র চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত বৈদিক বিধির অনুসরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ৮ তখন মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকটী বেদবিরুদ্ধ এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। মনুসংহিতায় যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, একথা অতি পক্ষপাতী, নিতান্ত orthodox লোকদিগেরও স্বীকার করিতে হইবে। মনুসংহিতার অতি প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বয়ং নবম অধ্যায়ের একটী শ্লোককে ৯ অমানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং সুতরাং আমাদিগকেও মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাহা হৌক, যদি বা উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলেও আমরা সেই

৬ অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ২অ, ৬৬

৭ গোভিলগৃহ্যসূত্রে কন্যার চূড়াকার্য্য অমন্ত্রক করিবার বিধি দেখা যায়। ৪প্র, ৯অ, ২২-২৪

৮ এইখানে বিষ্ণুসংহিতায় একটু কৌশল দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুঋষি চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বর্ণন করিয়া বলিলেন "এতা এব ক্রিয়া স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের এই কার্য্যগুলিমাত্র (এব নিশ্চয়ার্থে; এতা এব অর্থাৎ এইগুলিই) অমন্ত্রক অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পরেই তিনিই স্ত্রীলোকের বিবাহ বিষয়ে বলিলেন "তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিবাহ সমন্ত্রক। ইহার পরে তিনি পুনরায় সাধারণভাবে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন প্রভৃতির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৯ ৯অ, ৯৩

শ্লোকের প্রমাণেই জানিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতার সময়েও সমন্ত্রকই হউক অথবা অমন্ত্রকই হউক, স্ত্রীলোকের উপনয়ন প্রথা এবং সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতও অবলম্বনীয় ছিল। কেবল একমাত্র অত্রি সংহিতায় দেখি যে, স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন প্রভৃতি পাতিত্যজনক। হইতে পারে যে অত্রির মত এইরূপ ছিল; হয়তো তিনি কোন বিশেষ কারণে ঐরূপ মত স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিরুদ্ধে, ঐ মতকে সর্ব্বগ্রাহ্য বলিয়া ধরিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না।

সংহিতাগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি পুরাণের মধ্যে অবগাহন করি, সেখানেও দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। সকলেই জানেন বোধ হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি আপামর সাধারণের সহজবোধগম্য নহে বলিয়া ব্যাসদেব অতি বিদ্বান্ হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেদাদিশাস্ত্রসমূহের মধ্যস্থিত নানাবিধ শিক্ষনীয় বিষয় সকল এই মহাভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গল্পচ্ছলে শিক্ষার সুগম পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই; কিন্তু ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদীচরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিকস্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ব্বা শিবা নাম ব্রাহ্মী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনকরাজকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র মহাভারতের স্ত্রী-চরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু অতি বিদুষী হইবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম্ম সুনিপুণ ভাবে সম্পাদন করা যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরম ধর্ম্মজনক, তাহা ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যদি গৃহকে শ্রীমান্ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্ম-নিপুণা হইতে হইবে। মহাভারতের সময়েও বোধ হয় যে লোকেরা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার

বিরোধী ছিলেন না, তবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার দিকেই সর্ব্বসাধারণের স্বভাবতই অধিক আগ্রহ ছিল দৃষ্ট হয়।

আমরা বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সকলেতেই স্ত্রীশিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সাধারণ অধিকার আছে, এবং দু'একটি স্মৃতি ভিন্ন বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই সেই সকল অধিকার বিলুপ্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, বরঞ্চ সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও সেই অব্যক্ত অধিকার সুব্যক্ত হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অব্যক্ত অধিকারকে সুব্যক্ত করিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকেও যে ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছেন, কন্যাকে তদপেক্ষা এতটুকু ন্যূন করিয়া দিতে উপদেশ দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে "পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিখাইবে। বিংশতি বৎসরাধিক বয়স্ক পুত্র-দিগকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে।"* ইহার পরেই সেই স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় যে তন্ত্রের কিছু পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাই তন্ত্রকারগণ তাহার সপক্ষে এই অনুশাসন করিয়া দিলেন। তন্ত্রের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন হউক বা নাই হউক, নানা কারণে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবাদির কারণে, স্ত্রীশিক্ষার যে অপ্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষের কথা আলোচনা করিবার কালে দেখিতে পাইব। তৎপূর্ব্বে আমরা দেখিয়া লই যে ব্যাকরণ প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হই। পাণিনি কৃত ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যে আছে "কাশকৃৎস্নি কর্ত্তৃক প্রোক্ত মীমাংসাকে কাশকৃৎস্নী বলা যায় এবং যে ব্রাহ্মণী তাহা অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী বলা যায়।" আর "যে স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া লোকে অধ্যয়ন করে, তাহাকে উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া বলা যায়।" হেমাদ্রিকৃত

চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে আছে "কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করেন তিনি পতি তথা পিতৃ উভয় কুলেরই কল্যাণদায়িকা হয়েন। উপযুক্তা কন্যাকে বিদ্বান বরের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ও ইহাই পুরাতন ঋষিদিগের মত। যাবৎ কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ পিতা সেই কন্যার বিবাহ দিবেক না।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতায় নারীর স্থান।

(সঙ্কলন)

আজকাল আমাদের মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে "বর্ত্তমান সমাজে নারীর স্থান কোথায় এবং কি হওয়া উচিত—" এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে এবং উক্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য যত প্রকার মত সম্ভব ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইতেছে। এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মিমাংসা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও এ সকল আলোচনার যে একটা সার্থকতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যথার্থ মিমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ইহারা সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করিয়া থাকে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আশা করি আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা সম্পূর্ণ বিফল ও অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

প্রাচীন বিদেশীয় সভাতার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা সেই সময়ের নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হই। সকল সভ্যতারই প্রারম্ভ কাল হইতে পূর্ণ পরিণতির অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত ধারাটীকে তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে—আদিযুগ, মধ্যযুগ ও শেষযুগ। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই তিন যুগেই কোন বিশেষ দেশের বা সভ্যতার রাষ্ট্র এবং সমাজ স্বীয় আদর্শ প্রাপণের পথে অগ্রসর হয়। পরিবর্ত্তন ও বিকাশ যখন

সকল সমাজ সঙ্ঘেরই নিয়ম, সভ্যতার যুগত্রয়ে নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন তখনখুবই স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ—ব্যবিলনীয় সভ্যতার কথা। ব্যবিলনীয় সভ্যতার আদিযুগে ব্যবিলনীয় নারী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে এবং স্বামী ও ভ্রাতার সঙ্গে সমান অধিকারে অধিকারিণী ছিল। মধ্যযুগে নারীর অধিকারের সীমা কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ করা হইলেও—শেষ যুগে (Neo Babylonian Age) সে তাহার পূর্ব্ব অধিকারে আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মিশরের ইতিহাসেও নারীর অবস্থা শেষভাগেই সর্ব্বপেক্ষা উন্নত ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী মিশর সভ্যতার ইতিহাত নারীজাতির বিজয়ের ইতিহাস। সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে নারী ও পুরুষ তুল্য গণ্য হইত। Amelineau নামে একজন লেখক বলিয়াছেন—"It is the glory of Egyptian morality to have been the first to expsess the Dignity to Woman." অর্থাৎ মিশরজাতির নৈতিককতার সম্বন্ধে এ একটী বিশেষ গৌরবের বিষয় যে নারীর মর্য্যাদা এখানেই সর্ব্বপ্রথমে ঘোষিত হইয়াছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর বিবাহজাত "সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা" মিশরে এক অজ্ঞাত বস্তু। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধয়িত্রী দীর্ঘকালস্থায়িনী এই দুই সভ্যতার সমাজ ক্ষেত্রে নারীর উন্নত অবস্থা নারীজাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার।

তারপর ইহুদী-জাতির কথা। পুরুষের দাসীত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নারী কি উপায়ে আপনাকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিল ইহুদীর ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা তাহাই জানিতে পারি। উক্ত সভ্যতার প্রথম অবস্থায় স্বামী বিনাকারণে আপনার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত। ঐ সমাজ, পুরুষের এ অধিকার "পিতৃতন্ত্র" (Patriarchy) শাসনলব্ধ নহে,—ইহা বিবাহজাত প্রভুত্বেরই ফল। কিছুকাল পরে যখন নারীজাতি সমাজে আপনাকে একটু প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল তখন পুরুষের এই স্ত্রী পরিত্যাগের অধিকার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল এবং ইহার চিহ্ন ইহুদীর ধর্ম্মগ্রন্থের এক অধ্যায়ে Book of Denteronomyতে আমরা দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় ১০২৫ সনে পুরুষের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া সমাজে এমন অবস্থা আসিয়াছিল যে বৈধ কারণ ব্যতীত কিম্বা স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন স্বামীর পক্ষে পত্নীত্যাগ কখনও সম্ভব হইত না। এবং এতৎসঙ্গে স্ত্রীরও

একটী অধিকার জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার নিজকে পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বামীকে বাধ্য করিতে পারিত। এই ভাবে ইহুদী আইন প্রণেতারা তাহাদের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার সীমা ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

আরব সমাজেও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার বাড়িয়া চলিয়াছিল। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মেদিনার নিয়মানুযায়ী স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পাইবার দাবী কিছুই ছিল না, থাকিলেও তাহা অত্যন্ত সামান্য ছিল। কিন্তু কোরাণ এই নিয়মটীর পরিবর্ত্তন সাধন করে এবং নারীর অবস্থা উন্নত করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

রোমক সভ্যতার আদিযুগে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা সবিশেষ জানি না। যে সময় হইতে রোমকের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের উপর প্রথম আলোক রেখা বিচ্ছুরিত হইল সে সময়ে "পিতৃতন্ত্র"—(Patriarchy) রোমসমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এই পিতৃতন্ত্রের নিয়মানুসারে নারী জাতির উপর যে এক কঠোর বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা অনেকটা 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' এই অপ্রিয় কথাটির মত। পিতৃতন্ত্র-শাসিত সমাজের নিয়ম এই যে নারী বিবাহের পূর্ব্বে পিতার অধীন ও বিবাহের পরে সম্পূর্ণ স্বামীর বশ্য থাকিবে। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোমক সভ্যতারও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ হইতেছিল এবং রোমক আইনও অতি বিস্ময়জনকরূপে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল। নারীর অবস্থার উৎকর্ষসাধন রোমক আইনের এক গৌরবময় দান। রোমক সাধারণতন্ত্রের শেষ ভাগে নারী পুরুষের তুল্য অধিকার লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালেও Antonious এর সময়ে আইন প্রণেতারা নারী ও পুরুষের তুল্য অধিকার ন্যায়ের একটি প্রধান স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। Hobhouse বলিয়াছেন "The Roman matron of the Empire was more fully the own mistress than the married woman of any earlier civilisation, with the possible exception of a certain period of Egyptian history, and it must be added than the wife of any later civilisation down to our own generation."

Juvenal ও Tacitus এর বিদ্রূপাত্মক রচনার উপর নির্ভর করিয়া—অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে রোমক রমণীরা স্বাধীন হইয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছিল এবং নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবনযাপন করিতেছিল। বিদ্রূপাত্মক রচনার মধ্যে কোন

সভ্যতার যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। Hobhouse তাহার morals in Evolution গ্রন্থে বলিয়াছেন যে পূর্ণস্বাধীনতা ভোগ কালে রোমক নারীরা স্বামীর সহচরী, পরামর্শদাত্রী সখী-রূপে যথোচিতভাবে বিরাজ করিতেন—সমাজে যখন তাহাদিগকে পুরুষের বশবর্ত্তিনী হইয়া কালাতিপাত করিতে হইয়াছে তখন তাহারা যেমন ছিলেন স্বাধীনতার সময়েও তাহারা তদ্রূপ ছিলেন। স্বাধীনতা তাহাদিগের মধ্যে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা বা সংযমহীনতা আনয়ন করে নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

অশ্রুকণা !*

এখনো বহিছে অশ্রুধার
হিত-হারা চিত-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত শোকের পাথার!
এ কি শুনি পুনরপি বিধির নির্ম্মম অত্যাচার,
লিখনে লেখনী পঙ্গু, বর্ণনায় ভাষা মানে হার!
বচনে আড়ষ্ট কণ্ঠ, শ্রবণে শ্রবণে পড়ে বাজ,
'ইহধামে নৃপ-চন্দ্র জিত-ইন্দ্র নাহি আর আজ!'
সুনীতি-অঞ্চল-নিধি, ইন্দিরার ফুল্ল-ইন্দিবর,
মেঘমুক্ত অংশুমান্ অর্দ্ধ পথে হ'ল হীনকর!

* কোচবিহারাধিপতি মহারাজা স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের পরলোক গমন উপলক্ষে বিরচিত।

হর্ষবিষাদের এ কি নিষ্করুণ সুকঠোর ছল,
জন্মোৎসবে শোক-যাত্রা,—সুধা-হ্রদে তীব্র হলাহল!
মুহ্যমান রাজ্যবাসী চারিধারে শুধু হাহাকার,
কোন্ পাপে এত তাপ পুনঃ পুনঃ সহিছে বিহার!
কোন্ দোষে হে শাম্ভব! অকালে সকল পরিহরি,
পার্থিব ঐশ্বর্য্য শিরে ঘৃণাভরে পদাঘাত করি,
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত-নিধি মিশাইলে গিয়া সুরলোকে,
অন্ধজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া চিরশোকে!

* * *

বাক্যে নহ 'নৃপমণি',—লুব্ধ চাটুকার প্রিয়ভাষ,
মর্ত্ত্যের উপাধি ধরি' করিব না তব পরিহাস!
অনেকে চিনেছে তোমা—অনেকেই বুঝিয়াছে মনে,
সত্য মিথ্যা একবার দেখ আসি আপন নয়নে।
সর্ব্বসাধারণ আজি সভায় ডাকিছে একবার,
পথের বালক কাঁদে কোলে তব উঠিতে আবার!
নিজে এসে দাও দান,—সেই অন্ধ যাচে পুনরায়,
ঋণমুক্ত করে দাও অধমর্ণ করে হায় হায়!
অই যে অনাথা কাঁদে তব শীতবস্ত্র গায় দিয়া,
ভুখারী ভিখারী তব কাঁদে ভিক্ষাপাত্র করে নিয়া!
উৎসব-প্রাঙ্গণে ডাকে—উৎসাহের পূর্ণ অবতার!
ব্যসনে—বিষাদনেত্র প্রত্যক্ষ আশীষ দেবতার!

লোক-হিত-ব্রতকল্পে অফুরন্ত হৃদয়ের বল
সহসা লুকালে কোথা, হে কৌশলি এ কোন্ কৌশল!
স্বার্থলোভে রাজ্যবাসী বিরক্ত করিছে অনিবার,
তাই কি হয়েছে রোষ?—ক্ষম দোষ, এস একবার!

* * *

দেখে যাও শোক-যাত্রা, মসীময়ী বিহার নগরী,
গগন তপন ম্লান শোক-চিহ্ন মেঘবাস পরি'!
শ্রেণীবদ্ধ দাঁড়াইয়া অন্ত্য-ভূমি তরঙ্গিণীকূলে,
অবশ অমাত্যবর্গ শোক ভাষে ভাসি শোকাকূলে।
স্মৃতি-সূত্র আকর্ষিয়া এক দিকে টানে আপামর,
আর হস্ত ধরি ভূপে সমাদরে ডাকিছে শঙ্কর।
দক্ষিণে 'নৃপেন্দ্র' পিতা সৌম্যকান্তি প্রফুল্ল আনন,
অগ্রজ 'রাজেন্দ্র' বামে পারিজাত ভূষা সুশোভন!
পশ্চাতে অনুজ 'হিত' স্ফীত বক্ষ ভ্রাতৃসমাগমে!
চারিধারে দেববালা পুষ্পমালা বরিষে সম্ভ্রমে!
বৃথা আশা!—কার শিরে আশীষ কুসুম বরষিয়া,
ক্রমে ক্রমে দেবজ্যোতিঃ দিব্য পথে গেল মিশাইয়া!
সম্মুখে উন্মুক্ত শূল,—জ্বলিয়া উঠিল হেনকালে
শঙ্করের রক্ত-নেত্র প্রতীচীর পাণ্ডুর কপালে।
কি তীব্র বিষম জ্বালা! দগ্ধীভূত হৃদি-অন্তস্তল,
অশ্রুকণা বরষণে শত বর্ষে হবে না শীতল

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

শোক সংবাদ।

—:+:—

কি মহাশোকে আজ কোচবিহারবাসী অভিভূত! আমরা বিগত মাসে যখন শ্রীশ্রীমহারাণী মহোদয়ার কথঞ্চিৎ সুস্থ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া কত আশায় লিখিয়াছিলাম, মহারাজ সত্বরই মহারাণীসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিল, যে অচিরে এরাজ্যে অকস্মাৎ এরূপ কঠিন কুলীশাঘাত হইবে!—এ রাজ্যের অধিবাসীবর্গকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করিয়া আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয়, প্রজাবৎসল মহামনা মহারাজ এত সত্বর অকালে মহাপ্রস্থান করিবেন! আজও যাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি মানস-নয়নে স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান, তাঁহার এ আকস্মিক অন্তর্ধান কি অসহনীয়, কি মর্ম্মন্তুদ! মহারাজের অভাবে আজ কোচবিহার রাজ্যময় যে হৃদি-বিদারক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—রাজপরিবার, প্রকৃতিপুঞ্জ, কর্ম্মচারীবৃন্দ, সমস্ত অধিবাসী, ধনী নির্ধন, দীন দুঃখী শত সহস্র প্রাণ এক মহাপ্রাণের মহাপ্রস্থানে আজ আত্মীয় বিয়োগজনিত শোকাপেক্ষা তীব্র মর্ম্মবেদনায় যে ভাবে আত্মহারা—মুহ্যমান, তাহা হইতেই অনুমেয় মহারাজ সকলের কত প্রিয় ছিলেন। যেই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাকেই তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি এরূপ নিরহঙ্কার ছিলেন, তাঁহার ব্যবহার এমন মধুর ছিল যে লোকে তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা অপেক্ষা আত্মীয় বলিয়াই অধিক ভালবাসিত। তিনি ধনী ও নির্ধনকে একই চক্ষে দেখিতেন, একই ভাবে স্নেহসমাদর করিতেন—তাই তাঁহার অভাব এরূপ তীব্রভাবে সকলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে!

মহারাজের বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৬ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন—সেই ২০শে ডিসেম্বরই দেহত্যাগ করিলেন! একে একে তিনটি ভ্রাতা, পিতা নৃপতিশ্রেষ্ঠ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের সহিত মিলিত হইলেন। সে যেন কল্যকার ঘটনা—মহারাজ রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ এই নয় বৎসর পূর্ব্বে, হিতেন্দ্র নারায়ণ দুই বৎসর পূর্ব্বে কি মহাশোকে সর্ব্বজনকে নিমজ্জিত করিয়া অকালে চলিয়া গেলেন—সে ক্ষত শুষ্ক না হইতেই আবার এই অসহ্য আঘাত!

মাতা মহারাজমাতা, মহারাণী, পিতৃহারা শিশু মহারাজকুমার মহারাজকুমারীগণ, ভ্রাতৃহারা নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ কি করিয়া এই মর্ম্মান্তিক শোক সহ্য করিবেন—রাজ্যবাসী যে শোকে অধীর, আত্মহারা—সে শোকে রাজপরিবারের সান্ত্বনাজনক প্রবোধ বাক্য আর কি আছে!—কেবল সেই সর্ব্বশোকসন্তাপহারীর কৃপাই ভরসা—তিনি সমস্ত শোকার্ত্ত প্রাণকে রক্ষা করুন।

নিয়তি।

—:০:—

(টুর্গেনিভ হইতে)

আমি একলাটি এক মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল, কে যেন ধীরে ধীরে—অতি সাবধানে আমার পিছু পিছু আসছে। ঘুরেই দেখি—এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা। ধূসর কম্বলে তার সারা গা ঢাকা, শুধু মুখখানা দেখা যাচ্ছে।

উঃ, কি ভীষণ চেহারা! গায়ের চামড়া তার কুঞ্চিত,—রংটা একেবারে ফ্যাকাসে হলদে হয়ে গেছে,—নাকটা অসম্ভব রকমের তীক্ষ্ণ,—দাঁতের চিহ্নও নেই! আমি তার কাছে এগুতেই সে কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি কে? [illegible] চাও? ভিক্ষুক? ভিক্ষা নেবে?' বুড়ী একটা কথায়ও জবাব দিল না। আমি [illegible]কে লোয়াতেই দেখি, তার চোখ দুটি একটা স্বচ্ছ আবরণ—না চামড়া দিয়ে ঢাকা। [illegible] কোন পাখীরও এমনি আবরণ দেখেছি। এ দিয়ে তারা আলোর ঝলক্ থেকে চোখ দুটিকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু বৃদ্ধার এই আবরণ মোটেই নড়ে না,—চোখও যে মেলে না! আমি ভাব্‌লুম—এ অন্ধ!

আবার জিজ্ঞেস করলুম—'তুমি কি ভিক্ষা নেবে? আমার পিছু লয়েছ কেন?' পূর্ব্বের মত এবারেও সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না,—কেবল একটু কেঁপে উঠ্‌ল।

আমি আবার আমার নিজের পথে চল্লুম। এবারও আমার পেছনে তেমনি সাবধানী—চোরা-পা ফেলার শব্দ শুন্‌তে পেলুম।—'আবার সেই বুড়ী!'

আমি নিজ মনেই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—'সে আমার অনুসরণ করছে কেন? অন্ধ কিনা, তাই বুঝি আমার পা ফেলার শব্দ শুনে চল্‌ছে,—ভরসা যে এইভাবে সে লোকালয়ে যেতে পারবে! ও, তাই হবে!'

কিন্তু কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা এসে আমাকে ঘিরে ফেল্‌ল ! আমার মনে হতে লাগ্‌ল, সে শুধু আমার পিছু নেয়নি,—আমাকে যেন তার খুসী মত ডানে-বাঁয়ে ঘুরাচ্ছে,—আমি অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও কলের পুতুলের মত তার আদেশ মেনে চল্‌ছি !

আমি আবার চল্‌তে সুরু কর্‌লুম। কিছু দূর যেতেই দেখি, পথের মাঝখানে এক বিরাট কালো গর্ত্ত। অম্‌নি আমার মগজে জেগে উঠ্‌ল—'এ যেন কবর! বুড়ী আমাকে এ দিকেই টেনে আন্‌ছে!' আমি তাড়াতাড়ি পিছে সরে পড়লুম। বুড়ী আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হাঁ তাই ত, সে যে দেখ্‌তে পারে! পাখী যেমন শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেম্‌নি করে সে তার বড় বড় হিংসা ভরা চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল! আবার মুহূর্ত্ত পরেই দেখি—চোখ নিশ্চল! এ কি ধাঁধায় পড়লুম!

'এ বুড়ী কি তবে আমার নিয়তি! নিয়তি?—যার হাত থেকে কারুরই মুক্তি নেই!'

আমি পাগলের মত ও-পথ ছেড়ে আর একদিকে ছুট্‌লুম। খুব দ্রুত ছুট্‌লুম............ তবু সেই সন্তর্পিত পদ-শব্দ আমার পিছু-পিছু ছুটে আস্‌ছে! আমার [illegible]নেও দেখি আবার কালো গর্ত্ত! আবার আর এক পথে ছুট্‌লুম............তেম্‌নি পদ-[illegible] আমার পিছনে এবং তেমনি অন্ধকার গুহা আমার সমুখে! যে দিকেই যাচ্ছি সে দিকেই [illegible]! উপায় নেই—উপায় নেই!

'থাক, আমি তোমায় ফাঁকি দেব,—কোথাও যাচ্ছি না,'—এই বলে তক্ষুণি সেখানে বসে পড়লুম। আমার বোধ হল যেন সেই বুড়ী আমার দু'হাত পিছনে চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে! তার পর দেখি, কি একটা অন্ধকার ভেসে ভেসে আমার দিকে আস্‌ছে!

ভগবান্‌! যেদিকে তাকাই সেদিকেই যে এ বুড়ী!

মুক্তি নেই—মুক্তি নেই—এ যে আমার নিয়তি, এর হাত থেকে সেই জীবনে মুক্তি নেই!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:০:—

মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজের বয়স ৮ম বর্ষ—তিনি বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বর,—নব নৃপতি শ্রীশ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন—মঙ্গলময় পিতা তাঁহার সর্ব্ব-মঙ্গল বিধান করুন।

* * * *

বিলাত হইতে কোচবিহারের নব ভূপতি শ্রীশ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সহ মাতা শ্রীশ্রীমহারাণী বিগত ১ই জানুয়ারী রওনা হইয়াছেন, ফেব্রুয়ারীর প্রথমে তাঁহাদের স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কথা। রাজ্যেশ্বরের শুভাগমনে এ মহাশোকে সান্ত্বনার আশায়,—কোচবিহারবাসী রাজদর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া আছে! মঙ্গলময় রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করুন।

* * * *

চতুর্দ্দিক হইতে শোক-সংবাদে আমাদিগকে আরও অধীর করিয়াছে। অল্পকাল মধ্যেই অনেক স্বনামধন্য মহাত্মা লোকান্তরিত হইয়াছেন।

বিগত ২৫শে পৌষ সোমবার সুপ্রসিদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে সত্যনাথের জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২য় পুত্র এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ছিলেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভারতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান। তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের বিভিন্ন জেলাতে ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও দায়রা জজরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি সুযশা; 'ভারতীতে' তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সংস্কৃতে তাঁহার অগাধ বিদ্যা ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকার সম্পাদকত্বও

করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "তত্ত্ববোধিনী" অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। নানা ভাষায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিগণের উক্তি তিনি এমন মনোরম মধুর ও যথোপযুক্ত ভাব সমন্বয়ে আবৃত্তি করিতেন যে তাহার তুলনা ছিলনা। সত্যেন্দ্র প্রকৃতই সুপণ্ডিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অনেক গুণ ছিল। দানে, সামাজিকতায় এবং চরিত্রের মহত্ত্বে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসংগুপ্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র চারি ভ্রাতা। পূর্ণচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের ন্যায় 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিত লিখিতেন। তাঁহার উপন্যাস 'শৈশব-সহচরী' ও 'মধুমতী' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন,—দীর্ঘকাল কর্ম্মের পর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরশান্তির দেশে কর্ম্মী মহাঅবসর গ্রহণ করিয়াছেন—দীর্ঘ বিরহের পর তিনি আজ ভ্রাতৃগণ সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয় সুখী হইয়াছেন এই আমাদের সান্ত্বনা।

বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও সঙ্কলনকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিগত ১৯শে পৌষ লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবুর একাধিক গ্রন্থে পরলোক-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তিনি আজ পরলোকের প্রত্যক্ষদর্শী—সেই চিরশান্তি নিকেতনে তিনি সুখী হউন।

'বেহার চিত্র' প্রভৃতি প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু উদীয়মান লেখক—তাঁহার নিকট বঙ্গসাহিত্য অনেক আশা করিয়াছিলেন,—সমস্তই ফুরাইল! ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

আমরা আরও মৃত্যু বিভীষিকায় ভীত হইয়াছি, চতুর্দ্দিকে এ কি প্রাণ নাশ!

● ● ● ●

এতদিন পরে চৌরীচৌরার হাঙ্গামার বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। এই মামলায় মোট দুইশত আটাশ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ছয় জন বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই জেলে মরিয়া রাজদণ্ডের হাত এড়াইয়াছে। আর একজন এমনই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, যে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, শোনা যায় শেষোক্ত লোকটীর বাঁচিবার আশা খুবই কম। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে একশত বাহাত্তর জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই বিচারের কথা পড়িয়া সমগ্র ভারত শিহরিয়া উঠিয়াছে। বিচারের নামে ১৭২ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শুনিয়াই প্রাণ আতঙ্কে অস্থির হয়। স্বীকার করি চৌরীচৌরায় হত্যাকাণ্ড অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল, ভারতের সকলেই সমস্বরে উহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু উহার বিচারের ফল—১৭২ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাণে একটা পৈশাচিক দৃশ্য জাগ্রত করে না কি? লোক-শিক্ষার কি উপায়ান্তর নাই? একত্রে এতগুলি নরের হত্যা সংবাদে মহাপ্রাণ যে আপনি আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে! প্রাণের বদলে প্রাণদণ্ড,—আবহমানকাল আদর্শ দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। দণ্ড সংশোধনের—নাশ না করিয়া,—সংস্কারই জগতের নিয়ম।

● ● ● ●

সম্প্রতি শুনা যাইতেছে আগ্রা, মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ মুসলমান-রাজপুত নাকি হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। মুসলমান-রাজপুতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ছিল হিন্দু। মুসলমানের প্রতাপের সময়ে তাহারা মুসলমানের আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের জাতিপাত হয়, কিন্তু মনে প্রাণে তাহারা মুসলমান হয় নাই, তাহারা হিন্দু সমাজভুক্ত হইতেই প্রয়াসী; কেবল অলঙ্ঘ্য অচলায়তন হিন্দুর সংস্কার প্রাচীর তাহাদিগকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছরূপে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে—হিন্দুর রক্তের সন্তান হিন্দুর মাঝে ফিরিতে পারে নাই। পুরাদস্তুর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করায় মুসলমানের নিকটও তাহারা সমাদর ও সম্মান লাভ করিতে পারে নাই। সমাজে এই রাজপুতগণকে হীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে সম্প্রতি ইহারাই আবার নাকি হিন্দু সমাজে স্থান লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে! হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থা যে জন্যই হ'ক, যতটুকু উদারতা হিন্দু সমাজে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে দেখা দিয়াছে—তাহাতে রাজপুতগণের আশান্বিত হইবার কথা! যে সমাজে সোডা লেমোনেড আকারে মুসলমানের জল স্বচ্ছন্দে

চলিতেছে, বিস্কুট ও পাউরুটি আকারে মুসলমানের অন্ন অবাধে প্রকাশ্যে বারো আনায় গ্রহণ করিতেছে, যে সমাজের একাংশ এমন কি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ও কতিপয় ধর্ম্মসভা পর্য্যন্ত যে সকল হিন্দু মোপলাদের অত্যাচারে মুসলমানের অন্ন গ্রহণে বাধ্য হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণের পাঁতি দিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, সে সমাজের নিকট হইতে এই মুসলমান-রাজপুতগণও উদারতার আশা করিবে না কেন! যদি সত্যসত্যই ইহারা হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, কেবল সংস্কারের খাতিরে, এই পতিত সন্তানগণকে দূরে না রাখিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লওয়া এই ধ্বংসমুখ হিন্দুসমাজের উচিত। তাহা না করিয়া গোঁড়ামীকে হিন্দুত্ব ভ্রমে আমাদের সেকালের মনু-পরাশরের বিধি-নিষেধে সমাজ যদি ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে সাহসী না হন, তাহা হইলে শাস্ত্র হইতে সঙ্কীর্ণ সংস্কারকেই অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে! শাস্ত্রে পতিতের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া পুনর্গ্রহণের পাঁতির অভাব নাই। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি ব্যাধি জাতিকে যে কতখানি দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সমাজ একবার ভাবিয়া দেখুন। হিন্দুর জন্মের হার যেমন কমিতেছে মৃত্যুর হারও তেমনি বাড়িয়া উঠিতেছে। অথচ যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমাজের লোক বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, সে সব ব্যবস্থাও সমাজের একাংশের উদারতার অভাবে এবং সঙ্কীর্ণতার জন্য সমাজ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সমাজকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে—আমাদের সমাজপতিদের এ সুযোগ ত্যাগ করা ঠিক হইবে কি?

* * * *

বিলাতীবস্ত্র আমদানী—

১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিলাতী বস্ত্র আমদানীর হিসাব।

কোরা কাপড়

	এই বৎসর	গত বৎসর
কলিকাতা	১৯৪৯০০০০ গজ	১৪২৮০০০০ গজ
বোম্বাই	১২৩৯০০০ ,,	২৩৬৭০০০ ,,
মাদ্রাজ	৮৩৩০০০ ,,	৪৫১০০০ ,,

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	৫৫৭৫০০০ গজ	৬১৫৭০০০ গজ
বোম্বাই	৮৭৯০০০ ,,	১৫৭০০০০ ,,
মাদ্রাজ	৮৩১০০০ ,,	৪৫১০০০ ,,

গ্রন্থ-সমালোচনা।

—:o:—

বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজরামকৃষ্ণ বিরচিত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী,—বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ঢাকা ওয়ারি প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ আনা।

সত্যনারায়ণের সেবাব্রত অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসমাজে প্রচলিত, এমন কি মুসলমান সমাজেও ইহা প্রসার লাভ করিয়াছে। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা পাঁচালী বঙ্গের অনেক ভক্ত কবি ছন্দে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন,—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার অন্যতম ও একখানি সুলিখিত পাঁচালী। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রবাবু গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভজার বাঁশী। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। মিঃ ইউ রায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

এ যুগের শিশুদিগের সৌভাগ্য যে তাহাদের আনন্দ ও শিক্ষার জন্য বঙ্গের অনেক কৃতীসন্তান লেখনী ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামসদয় বাবু জেলার কলেক্টররূপে বঙ্গের বহুদিনসঞ্চিত বহুল আবর্জ্জনা বিদূরিত করিবার জন্য যেরূপ ভাবে অদম্য চেষ্টা করিয়া স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তেমনি বঙ্গের ভবিষ্যত আশা বালকবালিকা-

গণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ রসের সঞ্চারে তাহাদিগকে সবল সুস্থ পুষ্ট করিয়া মূল সংশোধনের প্রত্যাশী হওয়ায় বঙ্গের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। ভজার বাঁশীর গানের সুরে এমন একটা স্বাভাবিক সরল প্রবাহ তিনি দান করিতে পারিয়াছেন, যাহাতে করিয়া কবিতাগুলিতে ছন্দের হিসাবে ত্রুটী থাকিলেও, একমাত্র সুরের দোলায়, ঝঙ্কারের তালে শিশুদের প্রাণে ছড়াগুলি আনন্দের তুফান তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

"চসমা-চোখে খেলু দরজি সেলাই করে থাসা
ডালে বসে' দাঁড়কাকটা দেখ্‌ছিল তামাসা!

•• •• ••

বাঁকা ধনুক দিয়ে খেলু টেয়চা ছোঁড়ে বাণ
কাক পালাল, হায় বেচারি গাধার গেল প্রাণ!"

যে চালাক সে নিজের পথ নিজে দেখে,—বোকাই সংসারে মরে,—যার কাজ তার সাজে—দরজির হাতে ধনুকর উঠিলে ফলে হয় তারই ক্ষতি—আর মরণ গাধার!

বইখানিতে ছবি অনেক; প্রত্যেকখানি ছবিই প্রসিদ্ধ শিল্পীর অঙ্কিত। সুন্দর। ছবি, ছাপা কাগজের হিসাবে বইয়ের মূল্য অধিক না হইলেও, বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিয়া পুস্তকের মূল্য কিছু কমাইলে অর্থসচ্ছল গ্রন্থকার "বাংলার ঘরে ঘরে ছোট ছেলে-মেয়েদের হাসির রোল" সহজেই উঠাইয়া 'সার্থক' হইতে পারিতেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। } মাঘ, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

দিশারী।

—:•:—

পথে পথে পথহারা ফিরিব কি আমি
যতদিন হবে না গো হে জীবনস্বামী
তোমার অমল প্রেমোদয়?
সাঁঝের পথের পরে,
গৃহ কাজ শেষ করে
শূন্য থালি রিক্ত করে
আছি দিন যামী
পথ কি দেখায়ে দিবে হে হৃদয়স্বামী,
জীবন করিতে হেমময়?

(২)

চরণ জড়ায়ে আসে অজানা এ পথে,
আঁধার না মোছে ধীরে রজনীর সাথে
বেদনা বাড়ায়ে আজি মোর।
পথ সেথা নাহি জানা,
কোথায় তোমার থানা,
একটি জ্বলিছে তারা
এ আঁধার রাতে,
জমিয়া উঠিবে শুধু তারি সাথে সাথে
বেদনা-করুণ আঁখি লোর।

(৩)

আঁধার মরণে আলো উঠিবে ফুটিয়া,
অরুণের রাঙ্গা আভা পড়িবে টুটিয়া
চরণ কমলে তব আসি
সে নব কিরণে মোর
ভাঙ্গিবে কি ঘুমঘোর ?
কমলের দলে প্রাণ
রবে কি ফুটিয়া
সফল হবে কি রাঙ্গা চরণে লুটিয়া
জীবন মথিত অশ্রুরাশি ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

——:o:——

পাহাড়িয়াগণের বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার আগ্রহাতিশয্যে প্রভাতে গাত্রোত্থানকালে "অন্নপূর্ণ" নাম স্মরণ করিতে বোধহয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম নতুবা আহারে বসিয়া এরূপভাবে শুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ অদৃষ্ট ঘটিবে কেন! পাহাড়ে আইসা অবধি পাহাড়িয়া "বাজে" পাচক ব্রাহ্মণগুলির নোংরা পোষাক ও নোংরা অভ্যাস লক্ষ্য করিয়া "ইক্‌মিক্ কুকারে" স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম কিন্তু অদ্য প্রভাতে অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই বাহিরে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া অধমতারণ বাবুকে কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলাম। তিনি শুধু খিচুরি ও তরকারী রন্ধন করিয়া তাহাতে এত অধিক মাত্রায় 'খরসানী' কাঁচা লঙ্কা ও রসুন পেঁয়াজ প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে সেই অভূতপূর্ব্ব অমৃতের কিঞ্চিন্মাত্রও গলাধঃকরণ করিতে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ। বাংলার অপর কক্ষে আমার একজন পরিচিত বন্ধু সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমার বিড়ম্বনা দেখিয়া আমাকে তাঁহার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষুধায় উদরটা দাউ দাউ করিতেছিল সুতরাং বন্ধুবরের সহৃদয় নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানেও আর এক নূতন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার পাচক নাকি 'রৈসী' ব্রাহ্মণ! আমার বিরলদন্ত 'বাজে' তাঁহার দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া কহিলেন "ও ত রৈসী বামন, ওর হাতে বানান ডাল ভাত আমাদের সংগর গুরুং প্রভৃতি গুর্খালিরাও খায় না, আপনি খাবেন কি করে? ইহা শুনিয়া বন্ধুটি কহিলেন "তুমি বাবা ওর চেয়ে কুলীন কিসে? আর ওই বা নিকৃষ্ট কিসে ছুকনেই ত এক অবতার!"

ওত্তরে সে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "হুজুর আমি ত উপাধ্যায়ের ছোঁড়া, আমার বানান ভাত ডাইল কে না খাবে, আর ও ত রৈসী, বিধবা বামনির পেটে উহাদের জন্ম।

আমাদের দেশে আমরা যেগুলকে "কেশেল" ব্রাহ্মণ বলি রৈসীগণও ঠিক সেই সম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষিত করিলেও সমাজে ইহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন বলিয়া বিবেচিত।

বন্ধুটি আমার উদারপন্থী, সুতরাং তাঁহার সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমের নিকটে ব্রাহ্মণ, বাবুর্চ্চিতে কোনরূপ ভেদাভেদ নাই, কিন্তু উপাধ্যায় বংশাবতংসের শ্রীমুখাৎ এ সংবাদ অবগত হইয়া আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। বাল্যকাল হইতে পুনাশ্লোক পিতার ধর্ম্মশীলতা ও শুচিতা চক্ষের সমক্ষে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি এবং যদিও নিজ জীবনকে সে পবিত্র ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারি নাই তথাপিও অজ্ঞাতে যে সমস্ত সংস্কারগুলি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সে-গুলিকে স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করিতে অন্তর স্বতঃই বিমুখ হয়, সুতরাং ঋষিকল্প পিতার পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সামান্য শারীরিক ক্লেশের জন্য আজন্ম সংস্কার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদৌ মন সরিতে ছিল না। আমার এইরূপ ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া বন্ধু কহিলেন "আপনার prejudice আছে তা হলে ত আপনি between Scilla and Charybdis"! তাঁহার মন্তব্য শ্রবণ করিয়া আমি উত্তর করিলাম "ঠিক্ যে তাই তা নয়, তবে অন্ততঃ between two horns of a logical dilema। ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্রাশাস্ত্র কিছু বুঝি না, তবে আমার কতগুলি সংস্কার আছে সেগুলি আমি নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে সামান্য কারণে অমান্য করিতে চাহি না। আমার এই ধারণা যে সুক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের দূরদর্শীতা বলে হিন্দুসন্তান-গণের ভাবী মঙ্গলের নিমিত্তই এই সকল কঠোর বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা যৎসামান্য পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া সেই সকল মহাপুরুষের বাক্য হেলায় লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছি, ফলে স্বাস্থ্য শ্রী হারাইয়া আমরা আজ এক ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইয়াছি। বৈদেশিক আচার নীতির কোনটি আমাদের দেশকালোপযোগী হইবে কোনটি নহে ইহা সম্যক বিচার না করিয়াই আমরা তাহার হুবহু অনুকরণ প্রয়াসী হইয়াছি এবং বৈদেশিক ভোগবিলাসিতার মোহে Lotus Eater দিগের মত সকল বিস্মৃত হইয়া মজিয়া আছি। আমাদের এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে আমরা যে দুর্দ্দশার কোন সীমায় উপনীত হইয়াছি ইহাও বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই এবং এ নিমিত্তই আমরা স্বাবলম্বন-হীন চিরঅকর্ম্মণ্য ছায়াবাজীর পুতুলে পরিণত হইয়া দিক্‌হারা পথিকের মত শুধু হায় হায় করিতেছি।

বন্ধু বাধা দিয়া কহিলেন "আর হায় হায়-এ কাজ নাই, যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে আমি সেরূপ ব্যবস্থাই করিয়া দিতেছি। বেশ, একমাত্র ডাল ভাত ব্যতীত অপর সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি সকল পাহাড়িয়াগণ, এমন কি বিবাহিত মগের গুরুং গণও সকলের

সহিত একত্রে পান ভোজন করিতে আপত্তি করে না সুতরাং আপনি যখন দেশাচারের প্রতি পক্ষপাতি তখন আপনাকে কিছু হালুয়া লুচি প্রস্তুত করিয়া দিক্—ইহাতে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তির কারণ হইবে না!" তাঁহার বিধান মত সে বেলা ঐরূপ ভাবে জলযোগ করিয়া কাটাইয়া দেওয়া গেল, রাত্রিতে কুকারে পোলাও প্রস্তুত করিয়া উভয়ে নানা হাসি গল্প করিতে করিতে মহানন্দে ভোজন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে চা পান অন্তে বন্ধু দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন কিন্তু আমার কাজকর্ম্ম শেষ না হওয়ায় আমি তাঁহার সহযাত্রী হইতে পারিলাম না। প্রবাসে নিঃসঙ্গ নিরানন্দ দিনগুলি কাটাইবার মত কোন কিছুই মিরিকে ছিল না। চা বাগানের সাহেবদিগের খেলার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ঘেরা সুন্দর একটি টেনিস্ প্রাঙ্গন ছিল বটে কিন্তু কোন দিন কোন চা-কর প্রভুকে তথায় পদার্পণ করিতে দেখি নাই।

কোনরূপে সময় অতিবাহিত করিবার জন্য আকাশ একটু পরিষ্কার দেখিলেই মিরিকের আশপাশে বেড়াইতে বাহির হইতাম। একদিন বৈকালে পাণিঘাটা রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে সৌরিণী পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলাম। পাহাড়ে দেশ হিসাবে সৌরিণী একখানি গ্রাম; ক্ষুদ্র একটি বাজারের উপর সামান্য কয়েকখানি মুদি ও মাড়োয়ারী দোকান, ইহা হইতেই নিকটবর্ত্তী চা বাগানের কুলীদিগের সকল প্রকার অভাব মোচন হইয়া থাকে। ফিরিবার কালে চড়াই পথে একটু কষ্ট বোধ হইতেছিল, এদিকে রাস্তার দু'ধারের ঘন বনের মধ্যে সন্ধ্যার আঁধারও বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে ছিল। একস্থানে একটি ব্যাঘ্র ধরা ফাঁদ দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম, পাহাড়ের উপর মাকাই ফসলের সময় একমাত্র ভল্লুকেরই উপদ্রব হয় জানি কিন্তু শার্দ্দুল প্রবর যে তরাই প্রদেশের নিবিড় জঙ্গল ত্যাগ করিয়া শৈল বিহারেও মাঝে মাঝে আগমন করিয়া থাকেন এ ধারণা আমার আদৌ ছিল না। পথের যে অংশে কালীখোলা ও শ্বেতীখোলা নামক দু'টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে সেই স্থানেই বনটি আরও ঘন ও অধিক বিস্তৃত, সুতরাং জল জঙ্গল উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ব্যাঘ্রভীতি বিশেষ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই নির্ব্বিঘ্নে বাংলোতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

তদবধি প্রত্যহই শুধু লাসমহালের দিকে বেড়াইতে যাইতাম, মাঝে মাঝে পথের ধারে দাঁড়াইয়া "বস্তির" বালকবালিকাগণের খেলা দেখিতাম।

একদিন ক্রীড়ারত কতকগুলি বালকবালিকা আমাকে দেখিয়া "সেলাম সাহেব" "সেলাম সাহেব" বলিতে বলিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদের ছিন্ন মলিন বেশ দেখিয়া প্রত্যেককে একটি একটি পয়সা দিয়া তাহাদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম "পয়সা দিয়ে কি করবে?" তদুত্তরে তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল "সিগারেট খাব।"

বাস্তবিকই আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই ইহারা সিগারেটের এত প্রিয় যে অনেক সময় একটি মাত্র সিগারেট্ বক্‌সিস্ দিয়া ইহাদিগের দ্বারা যে কোন কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। কি শিশু, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই জামার পকেটে একটি করিয়া খোঁচা মার্কা সিগারেট্ প্যাকেট্ ও একটি দিয়াশলাইএর বাক্স সদাসর্ব্বদা মজুত থাকে, মনিবের হস্ত হইতে একটি সিগারেট্ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে ইহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়।

তারপর দিন ভ্রমণে বাহির হইলে আবার "সেলাম সাহেব, বক্‌সিস্" বলিয়া অনেকগুলি বালকবালিকা আমাকে ঘিরিয়া লইল সুতরাং পূর্ব্বকার দিনের মত কাহাকেও নিরাশ না করিয়া সকলকেই খুসী করিয়া বিদায় করিলাম। ইহার ফলে ব্যাপার এরূপ ঘটিল যে বস্তির বালকবালিকাগণ প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময়ে আমার আগমন প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা বিধান করিলাম, যখন তাহারা "সেলামকো বক্‌সিস্" বলিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকিত তখন আমি কয়েকটি মাত্র পয়সা লইয়া দলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিতাম। তখন তাহারা ঐ পয়সা কুড়াইবার জন্য মারামারি ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিত আর আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতাম। একদিন এরূপ ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তির ফলে দুইটি বালকবালিকার মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটি বালিকা একটী পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছিল কিন্তু একটি দশম বর্ষীয় বালক হঠাৎ তাহার হস্ত হইতে পয়সাটি কাড়িয়া লইয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইল। ক্রুদ্ধা বালিকা কয়েকবার বালককে ধরিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া

"তামাঙ্গ্‌কো জাত মরা গো—খাঙ্ক" বলিয়া বালককে গালি দিতে লাগিল এবং ক্রোধে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল।

কৌতুক দেখিতে দেখিতে এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বালিকার শোক অপনোদন জন্য তাহার হস্তে একটি সিকি প্রদান করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বাংলোয় আসিয়া দেখি একজন এতদ্দেশীয় ফটোগ্রাফার আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা যে আমার একখানি ছবি তুলেন। ছবি উঠান কার্য্যে তিনি কতদূর পারদর্শী তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে কয়েকখানি ছবি দেখিতে দিলেন। একখানি ছবির মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত বালক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা বালিকাটির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বালিকাটি বিশেষ বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বসিয়া আছে এবং পার্শ্বে পরিবারবর্গের অন্যান্য স্ত্রী পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ছবিখানি দেখিয়া ফটোগ্রাফার মহাশয়কে পয়সা কুড়ান ব্যাপার লইয়া বালকের সহিত বালিকার মারামারির কথা বলিলাম এবং কোন উপলক্ষে এরূপ বেশ-ভূষা করিয়া বালিকার ছবি উঠান হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন যে এটি বালিকার বিবাহ দিনের তোলা ছবি এবং প্রায় আট মাস পূর্ব্বে গত অগ্রহায়ণ মাসে উঠান হইয়াছে।

বিবাহ দিনের ছবির মধ্যে বরকে দেখিতে না পাইয়া বরের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিলাম, তদুত্তরে তিনি মৃদু হাস্য করিয়া ছবির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র একটি পদার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে "এই দেখুন বর, এই বিল্বফলের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়াছে।"

এই অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া বিশেষ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কি মশায়! বেল ফলের সঙ্গে বিয়ে হয় এ ত কখন শুনি নাই। ব্যাপার কি বলুন, ত?

তখন তিনি কহিলেন যে বালিকাটি নেওয়ার জাতীয়া, এবং নেওয়ারগণের জাতীয় প্রথা অনুসারে বিল্ব ফলটির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। নেওয়ার পিতামাতা মনে করেন যে অনূঢ়া কন্যা পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে তাঁহাদের দেহে পাপস্পর্শ করিবে এবং এ নিমিত্তই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপে তাহার উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করিয়া

দেন। পরে কন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সুবিধামত (প্রায় স্থলেই কন্যার পছন্দমত) কোন উপযুক্ত যুবকের করে কন্যার্পণ করা হয়। বিল্বফলটিকে গৃহদেবতার মত গৃহের কোণে সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়. কিন্তু কিছু কাল পরেই ফলটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন না। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে ফলের কখন মৃত্যু হয় না বলিয়া নেওয়ার রমণী চিরায়তি থাকে এবং এই সংস্কার অনুসারে এক স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

ফটোগ্রাফার মহাশয়ের ছবিগুলি দেখিয়া যতটা না হউক তাঁহার গল্প শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম সুতরাং সানন্দে ছবি তোলার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

সোমবার দিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কার্শিয়াং যাত্রা করিলাম, ফটোগ্রাফারটিও আমার সহানুগমন করিলেন। পথের মধ্যে পছন্দমত কোন স্থান অথবা বালাসন নদীর ফেণিল জলস্রোতের পারে বসিয়া ছবি উঠান হইবে স্থির করিয়াছিলাম।

উৎরাই পথে অশ্বারোহণে গমন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ দৈবক্রমে কখনও অশ্বের পদস্খলন হইলে অশ্ব ও আরোহী কাহারও চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইবে না শুধু সুদূর নিম্নে কুষ্মাণ্ড আকারে পরিণত দুটি মাংসপিণ্ড মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে! এ নিমিত্ত উভয়েই পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে সহিসেরা অশ্বের লাগাম ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল। পথ মোটেই দুর্গম বা বন্ধুর ছিল না সুতরাং দুজনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে মিরিক খাসমহালের মধ্য দিয়া অতি সহজভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া চলিলাম। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত একটি সরু নালা দিয়া ক্ষুদ্র জলস্রোত নিম্ন দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। এ দেশের অনেক স্থানেই জলাভাব, এ নিমিত্ত পাহাড়িয়াগণ এরূপ এক একটি প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের মুখে সছিদ্র বংশখণ্ড বসাইয়া উহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত এক একটি বস্তির দিকে চালিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা যেন এ পাষাণের দেশকে বিশেষ পর্য্যালোচনার পর এরূপ উচ্চ নীচ ও শীতপ্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নচেৎ দারুণ জলাভাব বশতঃ এদেশবাসীর যে কি ভীষণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন স্থলে একই স্থান হইতে বিভিন্ন বস্তি বা বাটীর দিকে জলস্রোত চালিত করিবার নিমিত্ত শাখা লাইন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। একই সময়ে দুইটি বিপরীত দিকে জলের গতি চালনা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া প্রয়োজন বোধে কোন ব্যক্তি আসিয়া ঐ বিশেষ শাখাটিকে মূল প্রবাহের সহিত সংযোজিত করিয়া দেয় এবং আবার প্রয়োজন সাধিত হইলে উক্ত শাখা লাইনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল প্রবাহের বংশখণ্ডটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখে। আবশ্যক বোধ করিলে কখন কখন ইহারা সছিদ্র বংশখণ্ড সাহায্যে সরকারী রাস্তা ভেদ করিয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে জলের গতি চালিত করে।

কোন কোন স্থলে এরূপ ভাবে জল প্রবাহের আংশিক গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া কোথাও বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পিপা কোথাও বা ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্চার সহিত ঐ জলস্রোতের সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পিপা বা চৌবাচ্চার (Closed Tank) মুখে একটি ছিপি আছে, যখন যাহার প্রয়োজন হয় তখন সে এই ছিপি ঘুরাইয়া জল বাহির করিয়া লইয়া থাকে। মাঝে মাঝে এরূপ এক একটি চৌবাচ্চার পার্শ্বে অশ্ব বা গো প্রভৃতি পশুদিগের জলপানের নিমিত্ত ইষ্টকনির্ম্মিত পানপাত্রের ব্যবস্থা আছে।

এ দেশে এরূপ এক একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে লোকে বিশেষ পুণ্যের কার্য্য বলিয়া মনে করে এনিমিত্ত কেহ যৎসামান্য অর্থশালী হইলেই নিজ নাম ও সাকিন প্রভৃতি খোদিত করিয়া এক একটি জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। সাধারণ ভাষায় পাহাড়িয়ারা ইহাকে "ধরমকো কূপ" বলে, কোন কোন স্থলে এরূপ দু' একটি কূপ নির্ম্মাতার ভাস্কর বিদ্যার পরিচায়ক নানারূপ অঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায়।

বহু উচ্চে অথবা বহু নিম্নে অবস্থিত বস্তি হইতে জলার্থী স্ত্রী পুরুষ এই সকল স্থানে আসিয়া জল সংগ্রহ করে, এবং "নামলো" সাহায্যে জলপূর্ণ পাত্রগুলিকে পিঠে ফেলিয়া অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যায়।

বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে অধিকাংশ স্থলেই এরূপ জলাভাব ঘটে যে এক কলসী জল সংগ্রহ করিতে জলার্থীকে অধীর ভাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

স্নান করিতে ইহারা মোটেই অভ্যস্ত নহে এবং অবগাহন স্নান কাহাকে বলে তাহা ইহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্ত্রীলোকেরা সদা সর্ব্বদাই হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করে এবং মাঝে

মাঝে বক্ষের উপর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া স্নান করে। পুরুষেরাও ঐরূপ ভাবে স্নান করিয়া থাকে। এই সকল কারণে ইহাদিগের দেহ হইতে কেমন এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয় এবং পোষাকে শাদা শাদা শূঁয়া পোকা দৃষ্ট হয়। তিন চারিদিন পোষাকগুলি অধৌত থাকিলে আমাদের গঞ্জি সার্ট প্রভৃতিতেও শূঁয়া পোকার অস্তিত্ব অনুভূত হইত এবং তাহার দংশনে আমরা অস্থির হইয়া উঠিতাম, কিন্তু পাহাড়িয়াগণ বহুকাল পর্য্যন্ত একই পোষাক পরিধান করিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারিত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না।

যাহা হউক পাহাড়িয়াগণের জল লইবার Engineering কৌশল দেখিতে দেখিতে মাকই ও মারুয়া ক্ষেতের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছিলাম। মাকই (ভুট্টা) ইহাদের প্রধান খাদ্য, এই মাকইকে ইহারা পোড়াইয়া, ভাজিয়া এবং গুঁড়া করিয়া নানা প্রকারে ব্যবহার করে, মারুয়াগুলি দেখিতে সর্ষপের মত ইহাদ্বারা শুধু পচুই মদ্য প্রস্তুত হয়।

ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ছোট ছোট খড়ের ঘরগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। দেওয়ালে ঝুলান মানচিত্রে গ্রামগুলি যেমন উচ্চ নীচে অবস্থিত পাহাড়ের গায় ঘর বাড়ীগুলিও তেমনি উচ্চ নীচ করিয়া নির্ম্মিত, কোনটির লতাপাতা দিয়া বেড়া দেওয়া কোনটির বা তাহার উপর মাটির লেপ দেওয়া। কেহ কেহ বা ঐ মাটীর লেপের উপর নানারূপ আল্পনা দিয়া কেহ বা "খুক্রী" আঁকিয়া রাখিয়াছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যেমন ধনুর্ব্বাণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ইহাদিগের আদিপুরুষও বোধ হয় খুক্রী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষের কটিদেশে পুলিশের (কনেষ্টবল) টুপিতে ও কোমরে, শার্টের বোতামে, ছবিতে আল্পনায় খুক্রী।

যতই নীচের দিকে নামিতেছিলাম ততই গ্রীষ্ম বোধ হইতেছিল, যখন নামসু আসিয়া পৌছিলাম তখন পশমী পোষাক গায় রাখা অসহ্য হইয়া উঠিল।

নামসু, বালাসন নদীর সমতল উপত্যকা ভূমিতে মিরিক ও কার্শিয়াং উভয় স্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল নিম্নে অবস্থিত। নামসুর ন্যায় ধুতুরিয়া পুলবাজার, শিংলা, প্রভৃতি স্থান নদীর উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত, এই সকল স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইলেও ম্যালেরিয়া বীজাণুর আবাস ভূমি।

পার্ব্বত্য প্রদেশে মফঃস্বল যাতায়াত এই সকল কারণে স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। একদিনের মধ্যেই অতিমাত্রা শীত হইতে অত্যন্ত গ্রীষ্মে এবং তদ্বিপরীত এবম্প্রকার temperature এর পরিবর্ত্তন শরীরের পক্ষে কখনও হিতকর হইতে পারে না। এই সকল উপত্যকা ভূমিতে উপনীত হইলে স্বভাবতঃই তৃষ্ণা বোধ হয় কিন্তু ঐ সময় তৃষ্ণা দমন না করিয়া জলপান করিলে হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

নামসু স্থানটি এককালে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দু'টি চা দোকান ও একটি পচুই মদ্যের দোকান ব্যতীত ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সহরে কি মফঃস্বলে, কি জনহীন অরণ্যে কি দুর্গম পার্ব্বত্য পথের ধারে এক একখানি চা দোকান আঁধারের আলো নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অসময়ের বন্ধুর মত শ্রান্ত পথিককে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সকল সময়ে উন্মুক্ত রহিয়াছে। সঙ্গের আর্দ্দালিরা অতি বন্ধুর সঙ্কীর্ণ "চারবকটা" Short cuto দিয়া অনেক অগ্রেই চা দোকানে পৌঁছিয়া চা পান করিতেছিল। আমি অশ্বটিকে তাহাদের নিকটে রাখিয়া ছবি তুলিতে বালাসন নদীর দিকে চলিয়া গেলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

জাগরণী।

—:*:—

অন্ধকারার বন্ধ অর্গল্ রুধ্‌বে কি তোর পথ,
চল্‌রে ছুটে আলোর পানে পুর্‌বে মনোরথ।
নাইবা এল পথের সাথী,
নাইবা ঘরে জ্বলল বাতি,
কাজ কিরে আয়, থাক্ না পড়ে উঠ্‌লো যে ঐ রব
"আঁধার সায়র পারে আজি আলোর মহোৎসব॥"

নিকষ ঘন গহন-কাল রুদ্র ভয়ঙ্কর,
ঝড়ের দোলায় দুলয়ে জটা নাচ্‌বে দিগম্বর ;
বিজলী মেয়ে সর্ব্বনাশী ;
হাস্‌বে মুহু অট্ট-হাসি ;
নিখিলবিশ্ব কাঁপায়ে গুরু ডাক্‌বে ভীষণ দেয়া
অই অতলের অথই বুকে দিস্‌রে তবু খেয়া !

সুপ্তি মৌন নিশীথ রাতির করুণ হাহাকার ;
কি সে বেদন জাগায়ে তুলে বক্ষে বারংবার ;
অঝর ধারে নয়নধারা
ঝরচে কেন বাঁধন-হারা,
অফুট্‌ কোন তরুণ হিয়ার গোপন ভালবাসা
দলচে নিতি চরণতলে হায়রে সর্ব্বনাশা !

মৃত্যু-রূপী ঐ সে ভয়াল করাল কালোছায়া,
সে যে শুধুই ক্ষণিক মোহের স্বপন-ঘেরা মায়া ;
ভয় কিরে তায়, বাঁধন টুটে
চল্‌রে তবু, চল্‌রে ছুটে,
আনন্দেরি ঝরণা সেথায় ঝর্‌চে মধুর রবে,
আঁধার পারে সেই সে দেশে আলোর মহোৎসবে !

শ্রীসরোজ কুমার সেন ।

মোগল-সন্ধ্যা ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—মন্ত্রণাকক্ষ (রাজপ্রাসাদ) কাল—প্রভাত । জাহান্দার, জাহান, জুলফিকার, চিন্‌কালিচ্‌, অজিতসিংহ, রাজসিংহ সকলেই উপবিষ্ট ।

অজিতসিংহ । শাহজাদা জাহান্দার, শাহজাদা জাহান, আপনাদের সাম্‌নে অনেক কর্ত্তব্য র'য়েছে—শোক ক'রবার সময় যথেষ্ট পাবেন কিন্তু কর্ত্তব্য করবার ঠিক সময়টা চলে গেলে তা করা আর না করা এক হয়ে পড়ে । পুরুষের জীবনে কর্ত্তব্যই সকলের বড় ; হৃদয়ের বেদনা, মনের দুঃখ, চোখের জল—সব মিথ্যা । কঠোর কর্ত্তব্যই একমাত্র সত্য ।

জাহান্দার । পিতা চলে গেছেন—সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য যেন বিরাট্‌ শূন্যতায় পীড়িত হয়ে উঠেছে এ শূন্যতা আজ কি দিয়ে পূর্ণ হবে ? মারবার রাজ ! নিজের হৃদয়ের মাঝে তাকিয়ে দেখ্‌ছি সেখানে সে একই দৃশ্য ।

জাহান । পিতার শেষ সময়টা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে—সেই কাতর চাহনী, দীর্ঘশ্বাস—মনে হচ্ছিল আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে তিনি যেন যেতে চাচ্ছেন না—সে দৃশ্য মনে হ'লে চোখ জলে ভরে ওঠে ।

চিন্‌কালিচ্‌ । জাহান, শান্ত হও, মহারাজ অজিতসিংহ যে কথা বলেছেন সে কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ ক'রে স্থির হও ।

মহারাজ কি শুনেছেন যে সম্রাট বাহাদুর শা শাহজাদা আজিমকে এই ময়ূর সিংহাসন দিয়ে গেছেন ।

অজিতসিংহ । হাঁ, শুনেছি বৈকি, কিন্তু জানি না এ খবর কতদূর সত্য ।

জাহান্দার। অবিশ্বাস ক'রবার কোনই কারণ নেই। সত্যই পিতা আজীমকে মোগল সম্রাট ক'রে গেছেন।

অজিতসিংহ। শাহজাদা—বাদশা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু বাদশা' বুদ্ধিমান হয়েও এত বড় একটা ভুল করে বসলেন ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি।

জুলফিকার। কি ভুল মহারাজ ?

অজিতসিংহ। এতদিন ধরে যে নিয়মটা চলে আস্‌ছে, তাকে অবহেলা করাটা কি ভাল হয়েছে ?

রাজসিংহ। মারবার রাজ ! আপনি কোন্ নিয়মটাকে এতদিন ধরে চলে আস্‌ছে বল্‌ছেন ? এ নিয়মের মর্য্যাদা যে তার পালনের চেয়ে ভঙ্গের দ্বারাই বেশী রক্ষিত হয়েছে। সম্রাট সাজাহান হ'তে সম্রাট বাহাদুর পর্য্যন্ত কেহই জন্মগত অধিকারের জোরে সিংহাসন পান নি—পেয়েছিলেন কেবল কৌশলে আর তরবারির জোরে।

অজিতসিংহ। তবু একটা নিয়ম যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হবে। সে থাকৃতে আর সিংহাসনে কারও কোন অধিকার নেই।

চিন্‌কালিচ্‌। সেনাপতি জুলফিকার ! তোমার কি মত ?

জুলফিকার। খাঁ সাহেব ! এতদিন ত ভাব্‌বার কোনই অবসর পাইনি আজ বাইরে এসে জগৎটাকে দেখে মনে হচ্চে যে কি যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। দুটো জিনিষ আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে একদিকে সম্রাটের মৃত্যুকালের শেষ আদেশ আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যের মঙ্গল।

জাহান্দার। সেনাপতি ! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি, পিতার কাছে শপথ ক'রেছি যে বাদশা' পদ আমি নেব না—এ সিংহাসনের জন্য গৃহ যুদ্ধ বাঁধবে আর তাতে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল ঘটবে। আপনি যদি এই ভীত হ'য়ে থাকেন, তা' হলে বল্‌ছি যে আমার দিক হ'তে আপনাদের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আমার কথায় যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তবে আমি আজই দিল্লী ত্যাগ করে যাচ্ছি।

জুলফিকার। শাহজাদা, আপনার কথায়ই আমাদের যথেষ্ঠ বিশ্বাস আছে। আমি অন্য ভাবে একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করছি।

জাহান্দার। আর কি ভাবে হ'তে পারে, বলুন।

জুলফিকার। মহারাজ অজিতসিংহ, সেনাপতি রাজসিংহ, আপনারা দুঃখিত হ'বেন না। যে কথাটা বল্‌তে যাচ্ছি, সে কথাটা আপনাদের—হিন্দুদের কাছে বড়ই অপ্রিয় বলে মনে হবে। যে জন্য শাহজাদা দ্বারা সেই সময়ের মুসলমানদের চোখে একটা মুসলমান সাম্রাজ্যের বাদশা' হবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিলেন, ঠিক সেই কারণেই শাহজাদা আজিম আজ সম্রাট হবার অযোগ্য।

অজিতসিংহ। সেনাপতি জুলফিকার ! আপনার কথাটা সোজা করে বল্লে এই বোধ হয় দাঁড়াবে যে—কারণ শাহজাদা আজিম হিন্দু ও মুসলমানকে সমচক্ষে দেখে থাকেন সে' জন্যই তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার অনুপযুক্ত।

জুলফিকার। হাঁ, মহারাজ ঠিক্ তাই।

অজিতসিংহ! তবে বাহাদুর বাদশা'কে ভুল করবার অপরাধে বৃথাই অপরাধী করছিলাম। বাদশা' তা হ'লে ঠিকই করেছেন।

জুলফিকার। হাঁ আপনাদের স্বার্থের পক্ষে সবই ঠিক বল্‌তে হবে সন্দেহ নাই।

অজিতসিংহ॥ জুলফিকার খাঁ, আমি শুধু হিন্দুর স্বার্থের দিকে চেয়ে একে ঠিক্ বল্‌ছি না, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই একেই বাঞ্ছনীয় মনে করি। হিন্দুর মঙ্গলে মুসলমানের মঙ্গল আর মুসলমানের মঙ্গলে হিন্দুর মঙ্গল একথা কখনই ভুলবেন না। এ দুই জাতি দীর্ঘ চার পাঁচ বৎসর কাল একদেশে এক আকাশের তলে বাস করে একই অন্নেই পরিপুষ্ট হয়ে আজও যে এ তত্ত্বটা বুঝ্‌তে পারলেন্ না, এ বড়ই দুখের কথা, সেনাপতি। যে দিন হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক হয়ে গিয়ে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলে একই প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশমাতার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কর্ত্তে পারবে—সেদিন যে নূতন জাতির উদ্ভব হবে তারা হবে জগতে দুর্ব্বার মহাত্মা আকবর বাদশা' এটী বুঝেছিলেন, আর সেই আদর্শ জাতিগঠনে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাদশা' ঔরঙ্গজেব সেই নির্ব্বাপিত বিরোধ বহ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেছেন। আর আজ আপনাদের মত কূট রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতিরা তার ইন্ধন যোগাচ্ছেন। মনে রাখবেন আগুন যখন জ্বেলেছেন যে দিন এই সাম্রাজ্যটা পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে সে দিন বেশী দূরে নয়।

চিন্‌কালিচ্‌। মহারাজ, হিন্দু মুসলমানের যে বিরোধ সেত ধর্ম্মের বিরোধ। এর জন্য কেবল মুসলমানকেই দোষী করবেন না হিন্দু ও সমান দায়ী।

অজিতসিংহ। হাঁ, দোষ উভয়েরই। ধর্ম্মের স্থান অন্তরেই, তার প্রতিষ্ঠা তার সাধনে, বাইরে কর্ম্মজগতে তাকে টেনে আনবার জনাই এ ভয়ানক অনর্থ ঘটেছে।

জাহান্দার। মহারাজ, আমি বেশী বুঝি নাই, আমি শুধু জানি যে মুসলমানের ভাব আর কর্ম্ম সমস্তটাই হচ্ছে তার ধর্ম্ম। সেনাপতি জুলফিকার আপনি ঠিকই বলেছেন, আজিম সিংহাসনে বস্‌লে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের গৌরবের হানি হবে। একটা সাম্রাজ্য বড় না একটা ধর্ম্ম বড়? আমার মনে হচ্চে জাহানই সম্রাট হবার উপযুক্ত।

অজিত সিংহ। শাহজাদা, জাহান্দার, এ সংসারে কেউ বা গড়ে কেউবা ভাঙ্গে। বাবর বাদশা' যাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনারা তাকে ভাঙ্গতে সুরু করেছেন। যা হক রাজপুত জাতটা চিরকালই মোগলের মঙ্গল কামনা করে থাকে; তাই বাদশা'দের অসন্তুষ্টির ভয় না করে সকল সময়ই সত্য কথাটা বলে যায়। শাহজাদা, আমার মত এই বাহাদুর বাদশা'র আদেশ অনুসারে শাহজাদা, আজিমই আজ হতে নূতন মোগল সম্রাট। আমি আর কা'কেও সম্রাট বলে মান্‌তে রাজি নই। চিন্‌কালিচ্‌ খাঁ! আমার এই শেষ কথা।

চিন্‌কালিচ্‌। মহারাজ, আমারও সেই মত। আজ যদি বাদশাহের আদেশ অগ্রাহ্য করি তবে ঐ যে নিভৃত শয্যা যেখানে জীবনের উন্মত্ততার ক্লান্তির পর মানুষ একটু শান্তি পায় সেই শয্যা তার কণ্টকময় হয়ে উঠ্‌বে। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তাঁর সেই আজিমের জন্য আকুল প্রতীক্ষা, নিরাশার বেদনাহত দৃষ্টি, কিছুই আমি ভুল্‌তে পারছি না।

জাহান্দার। খাঁ সাহেব, আমি জানতুম যে আপনার মত খাঁটী একজন মুসলমান মোগল সাম্রাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই। আমার সে বিশ্বাস আজ ভেঙ্গে গেছে, আপনি কিনা শুধু একটা ভাবের জন্য ধর্ম্মকে অবহেলা কর্ত্তে যাচ্ছে? সেনাপতি জুলফিকার! প্রচার করে দিন আজ হতে জাহান দিল্লীর সম্রাট। মহারাজ! আপনার যদি বাধা দেবার ইচ্ছা থাকে বাধা দেবেন তাকে আমরা একটুও ভীত নই।

অজিতসিংহ। শাহজাদা, অজিতসিংহ চিরদিনই সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। এ শিক্ষা সে রাজপুতানার গৌরব বীর দুর্গাদাসের নিকট হতে সে পেয়েছে। প্রস্তুত থাক্‌বেন সেনাপতি, জুলফিকার! এসো রাজসিংহ কাজ শেষ হয়ে গেছে।

জুলফিকার। মহারাজ, মিমাংসা না হতেই চলে যাচ্ছেন.........

অজিতসিংহ। সেনাপতি, রাজনীতিতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি, আমার বুঝতে কিছুই বাকী নেই। আপনার কি অভিসন্ধি সেও বলে পারি।

জহান্দার। শুনেছিলাম রাজপুত জাত রাজভক্ত কিন্তু এখন দেখ্‌ছি রাজপুত শ্রেষ্ঠ অজিতসিংহই বিশ্বাসঘাতক।

অজিতসিংহ। খবরদার শাহজাদা, মিথ্যা অপরাধে অপরাধী ক'রবেন না। রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক অজিতসিংহ নয়—সে আপনারা। ছিঃ—এসো রাজসিংহ।

(অজিতসিংহের এবং রাজসিংহের প্রস্থান)

চিন্‌কালিচ্‌। যা ভেবেছিলুম, তাই হলো—বাদশা ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেকের পুনরাভিণয় এবার চোখের সামনে দেখ্‌তে হল।

তুমিই না জুল্‌ফকার বাদশার মৃত্যু শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তার শেষ ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করবার জন্য শপথ গ্রহণ করেছিলে? আর আমি কিনা তার প্রতিবাদ করেছিলাম।

জুলফিকার বয়স অনেক হয়েছে, এ পৃথিবীটাকে এতদিন দেখে দেখে এর উপর একটা ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, কি হিংসা, কি দ্বেষ, কি লোভ, কি অহঙ্কার পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নরকের আগুণ জ্বেলে দিয়েছে। আমিও বিদায় হই, এ অভিনয়ে আর খেলা খেল্‌বার সাধ নেই।

(চিন্‌কালিচের প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—লালকুমারীর বাটীর নিম্ন তলস্থ কক্ষ।

জোহেরা

জোহেরা। লালবিবির চাহনির ফাঁদে কি আট্‌কানোই আট্‌কেছে মন্‌সবদার! এখন ঘুরে ঘুরে এসেই বরাবর ঐ ওপরটাতে। আবার আমাকেও সাহেব যেন এড়িয়ে চল্‌তে চান্‌।

আজ বড় স্ফূর্ত্তি জেগেছে প্রাণে কাজ প্রায় হাসিল। মনসবদারের সঙ্গে একচোট্ বাহার খেল্‌তেই হবে। জৌলস ওর সঙ্গে বেশ জমে—বেড়ে মস্‌গুল রকম। আর ঠিক্ সেই রকমই আমার এই পিয়ারের ছোক্‌রা নোকর—মুজাহের।

"মুজাহের!"

বিবিসাহেব! (বলিয়া ছোক্‌রা মুজাহেরের প্রবেশ)

জোহেরা। মন্‌সবদার হামিদ খাঁ এসেছেন?

মুজাহের। বিবিসাহেব!

জোহেরা। ফিরতি পথে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তেই আমার খবর দিবি।

মুজাহের। বহুৎ আচ্ছা (গমনোন্মুখ)

জোহেরা। এইও উল্লুক চল্লি যে?

মুজাহের। (ফিরিয়া) খাড়া হায় হুজুর।

জোহেরা। খাড়া হায়? পা বাড়িয়ে বাইরের দিকে যাওয়া মানে খাড়া হায়? তুই খাড়া হায়, গাধা!—

মুজাহের। —কুত্তা, ঘোড়া, গিধ্বর, উঠ।

জোহেরা। আমি? আমায় গাল দিচ্ছিস্ তুই? মনিবকে গালাগাল?

মুজাহের। (কাঁদ কাঁদ সুরে) অ্যাঁ—হ্যাঁ তোমায় বুঝি আমি গালাগাল করছি? আমি বান্দা গোলাম।

জোহেরা। কিস্‌কা গোলাম?

মুজাহের। হাতকা গোলাম, পাওকা গোলাম, কাপ্‌ড়াকা গোলাম, চুমকি চুনটিয়া উস্‌মে পাড়্‌কা গোলাম বান্দা গোলাম!

জোহেরা। থাম্, থাম্। হিন্দি, উর্দ্দু, পার্শী নানা ভাষার তালবে—এলেম্, বেটা মৌলবী আর কি! এরপর হয়তো বলে ফেল্‌বি,—দিল্‌কা গোলাম, জান্‌কা গোলাম।

মুজাহের। (জোহেরার মুখে হাত দিয়া) ছোঃ ছোঃ বিবি—কভি নেই, কভি নেই।

জোহেরা। ঠিক্ বাৎ?

মুজাহের। বহুৎ ঠিক্।

জোহেরা। কেয়া পাকড়্‌কে ঠিক্।

মুজাহের। কান্ পাকড়্‌কে ঠিক্।

জোহেরা। বাস! এইবার যা, ওস্তাদজীকে সেলাম দে সৎ হ'বে।

মোজাহের। বহুৎ খুব আচ্ছা।

জোহেরা। আর বাজ্‌নাটা নিয়ে আসবি!

মোজাহের। মেরা ছোটকী?

জোহেরা। হাঁ, তোমারা ছোটকী? যো—এইসা বাজতা হায় হারামজাদ।

(ইতি মাথায় চাঁটী)

মোজাহের। নেহি, নেহি, হুজুর। ওস্তাদজীকে—নান্‌কী।

জোহেরা। তুহারা গাল পর যো বাজ্‌তা—ঠুনকী—এইসি লক্ষ্ণৌই ঠুংরী। উল্লুক কাঁহাকার! (গালে চটাচট্ প্রহার।)

মোজাহের। নেহি, নেহি বড়ি বিবি সাহেবানা বড়কী উ ঠন্‌ঠনিয়া কাঠ্‌কী!

জোহেরা। হুঁ ঠিক্ যো তুরন্ত নেউ টেগা।

মুজাহের। শ-দকে আচ্ছা লেকিন বহুৎ হয়রানি, উ বুঢ্‌ঢেকা কান্‌মে বাতে মালুম নেই আতা।

(প্রস্থান)

জোহেরা! দেখ্‌ছি, আজ মন্‌সবদারকে! মোজাহেরের মতই ঠিক নাচাবো। (ওস্তাদজী, পেছনে তব্‌লা লইয়া মুজাহেরের প্রবেশ)

জোহেরা। সেলাম, ওস্তাদজী, তবিয়ৎ সরিফ?

ওস্তাদজী। সেলাম—সেলাম বিবি, সরিফ!

মুজাহের। (ওস্তাদজীর সাম্‌নে তবলা রাখিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে বাজাইতে হইবে।)

(প্রস্থান)

ওস্তাদজী। হুঁ, হুঁ, হুঁশো বাচ্চে! (জোহেরার দিকে তাকাইয়া) এক্‌ঠো গজল্?

জোহেরা। উস্‌মে উম্‌দে।

ওস্তাদজী। উস্‌মে উম্‌ছে! হ্যা—হ্যা—হ্যা (হাস্য ভঙ্গীতে) উস্‌মে উম্‌ছে; বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। (নেপথ্যে) বিবি সাহেব! মন্‌সবদার।

জোহেরা। আচ্ছা, হুঁ, (গুণ গুণ করিয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া গাহিল)

(গীত)

মেরে নয়না নজর তেরি মানা
ছোড়ি গইবে হামারা সো নাগরিয়া
বুতা দে তেরি রোস্‌নি—তামাম্ শোধ হুয়া জান্‌
হামকা পিয়ার-ঘরমে উন্‌কে মজা লুটা—হো বেইমান

(গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হামিদ প্রবেশ করিয়া)

বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, বিবি, এক্‌দম মিঠা সরবতি!

ওস্তাদজী। হাম আভি যাতা হাম্। সেলাম সাব, বিবি সেলাম!

(প্রস্থান)

(জোহেরা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোন্মুখ)

হামিদ। মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে কেন বিবি? আরে আম, আমি ফিরে দাঁড়াও।

(জোহেরা মুখ ফিরাইয়া একবার কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গী করিল।)

হামিদ। ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও, বিবি, আঁখি ভরে দেখি।

জোহেরা। ঝুটাবাদ, বেইমান। (সরোষে)

হামিদ! ঝুটাবাদ! কভি নেই।

জোহেরা। আলবৎ। আমায় কি তুমি চাও? তোমার নজর এখন দোস্‌রা মুখের উপর। আমার তামাম্ শোধ।

হামিদ। ঝুটাবাদ, ঝুটাবাদ বিবি! দুনিয়া ছুটী হলেও তামাম্ শোধ হবে না।

জোহেরা। ফের, দোস্‌রা ঘরে দস্তি জমাচ্ছ আবার।

হামিদ। আহা! বিবি। মন্‌সবদার আমরা তুরুকসোয়ার, ঘোড়ি ঘোড়া একসঙ্গে কায়ছা করি। পিয়ার আমি তোমারই—ওঁর পায়জার।

জোহেরা। শেষে এইসা পায়জার হাঁকবে যে ঐ জুল্‌ফির লোড়া উপরে যাবে সাহেব।

হামিদ। হাঁকবে? ওঃ মেরা নসীব।

জোহেরা। নসীব তোমরা?—বদমাস্. দম্‌বাজ। তোম্ আভি চলা যাও—হাম্ নেহি মাঙ্‌তা হ্যায়, বিল্‌কুল্ তুঁহারা ছল্‌বল—লেকিন্—

(গীত।)

(মেরা যৌবন) ঘুমাদে ঘুমাদেরে, বেইমান
তু ছিন্ লিয়া মেরা নয়না, তু লুট লিয়া মেরা জান্
দোস্‌রা তেরি, দিল্ পিয়ারী, আজিরে বেইমান্
টুট্ গয়ি মেরে কলিজা, হো, হো, জান্ হয়রাণ
যো গয়ি উ নেহি লৌটেগা, যৌবন গেয়া তামান্
আখিয়া কাজর রহি বাকী নেহি পাঁচরাণ ॥

হামিদ। ওহো, বিবি, বিবি—এই কলিজা পেতে দিচ্ছি—কাটারী বসিয়ে দাও। বহুৎ গোস্তাকী হয়েছে; মাপ কর, মাপ কর গোলামকে, আজ হ'তে আমি তোমারি—দিন্ ভর, রাত ভর, মাহিনা ভর, বরষ ভর আর উমের ভর। আর কি চাই?

জোহেরা। নাকে খৎ?

হামিদ। খৎ, খৎ নাকে খৎ।

জোহেরা। তা'হলে দাও এখানে খৎ।

(হামিদ নাকে খৎ দিল।)

জোহেরা। আচ্ছা, চল মতি মস্‌জিদে। বিবিকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব দেখিয়ে দেবে।

হামিদ। চল্।

জোহেরা। কিছু মনে ক'র না সাহেব।

হামিদ। আরে ছোঃ ছোঃ।

(সকলের প্রস্থান)

পটনিক্ষেপ।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাতীরস্থ শিবির।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্যগণের গান।

ছিল গো যেদিন গগন ধরণী আলোক আকুল করা
ফাগুন যামিনী দখিন বাতাস স্নিগ্ধ গন্ধ ভরা
আজো, আজো তাই, শুধু কাছে নাই, নয়নে স্বপন দিয়া
(ওসে) আমার পরাণ প্রিয়া, সে মোর অল্প বয়সী প্রিয়া ॥
বিফল শয়নে ব্যাকুল নয়নে সারা নিশি জেগে একা
পিপাসা কাতর ব্যাকুল অধর দূরে প্রিয় নাহি দেখা
এলো কেশরাশি নীরব বাঁশরী পরশ অধীর হিয়া
(কোরাস) আমার পরাণ প্রিয়া, সে মোর অল্প বয়সী প্রিয়া।
খসিয়া লুটিছে বুকের বসন ভেঙ্গে গেছে অভিমান
আঁকে নাই গালে কুঙ্কুম রেখা, কণ্ঠে নীরব গান
তবু যে বাতাস ফেলে যায় শ্বাস কুন্তলে দোলা দিয়া
(কোরাস) আমার পরাণ—প্রিয়া, যে মোর অল্প বয়সী প্রিয়া ॥

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

(রুস্তম ও আজীমের প্রবেশ।)

আজীম। রুস্তম, এ কারা গাচ্ছিল?

রুস্তম। আমাদের ছাউনীর বাঙ্গালীসৈন্য।

আজীম। হাঁ, নিশ্চয়ই বাঙ্গালীসৈন্য—এত আনন্দ এত প্রাণ কার আর আছে? আনন্দ তার বর্ষাকালের নদীগুলির মত দুকূল ছাপিয়ে বয়ে যায় আর প্রাণ তার সরল উদার মুক্ত আকাশের মত অবাধ।

ঐ শুন কি মধুর কণ্ঠ গঙ্গার কূলে কূলে প্রতিধ্বনি তুলে দূরে নিঝুম গ্রামগুলির উপর মিলিয়ে যাচ্ছে। আজ যুদ্ধ কর্ত্তে এসেও প্রাণে ভয় নেই—কেমন নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক। রুস্তম, কালিদাস পড়েছ?

রুস্তম। কে সে, কাফের? আমি কাফেরের কোন বই পড়ি না।

আজীম। সব জায়গায় একই কথা, খালি কাফের.—কাফের,—কাফের আর যবন,—যবন,—যবন। এ দুটো কথা মন থেকে মুছে ফেলে দাও। রুস্তম! কালিদাস একজন মহাকবি ছিলেন। তাঁর মেঘদূত এক অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের খনি। আজ এই সৈনিকদের সুরে সেই বিরহের ব্যথা ফুটে উঠেছে। "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘ-বিদুরিত অম্বরের নীচে বসে যেমনটা কিনা মনে হয়েছিল "কান্তবিরহবিধুর যক্ষের মনে।"

রুস্তম। শাহজাদা, আমাদের আজই এ স্থান ছেড়ে যেতে হবে।

আজীম। দিল্লী হ'তে কোন খবরই ত পাচ্ছি না। পিতা বেঁচে আছেন, না সব শেষ হ'য়ে কিছুই জানি না। যদি বেঁচে থাকেন, তবে কি তিনি পুত্রের এ ব্যবহার ক্ষমা করবেন? কখন না?

রুস্তম। কোন অপরাধে শাহজাদা?

আজীম। তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়ে আর আমি—আমি সিংহাসনের আশায় সৈন্য জুটিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি, একি সামান্য অপরাধ রুস্তম?

রুস্তম। সে ঠিক্ বটে, কিন্তু যদি তিনি এ বংশের রীতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইর কথা স্মরণ করেন, তবে তাঁকে ক্ষমা কর্ত্তেই হবে।

আজীম। অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! সাম্‌নে একটা মিশ্‌মিশে কাল পর্দ্দা ঝুল্‌ছে—ওর অন্তরালে, কি হচ্ছে কারু জান্‌বার উপায় নেই। আঁধারে পা' ফেলে ফেলে চল্‌ছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। বাইরে হোসেন আলিখাঁ অপেক্ষা কর্‌ছেন।

আজীম। তাকে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

আজীম। হোসেন, তোমাকে একটা গুরুতর কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি—আশা আছে তুমি এ ভারটা বহন কর্ত্তে পার্‌বে।

হোসেন। শাহজাদা, কাজ যতই কঠিন হউক না কেন, এ অধীন সব কর্ব্বে শপথ কর্‌ছে।

আজীম। আমি জানি হোসেন, তোমায় শপথ কর্ত্তে হবে না, যার কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে তাকে শপথের বাঁধনে বাঁধতে চাই না। রুস্তম, সিয়ারকে নিয়ে এস।

(রুস্তমের প্রস্থান)

হোসেন, সব কথা শুনেছ বোধ হয়? আমি দিল্লী যাচ্ছি—সিয়ারকে তোমার কাছে রেখে যেতে হবে। দিল্লীতে পৌঁছবার পক্ষেও যুদ্ধ বাঁধতে পারে—তাই তাকে আর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। জানি না কি হবে!

(সিয়ার ও রুস্তমের প্রবেশ)

এসো সিয়ার কাছে এস, রুস্তম, তোমাকে বেশী বলা অনাবশ্যক মনে করি।

হোসেন। শাহজাদা, আপনার কোনই চিন্তা নাই। আপনার দয়াতেই হোসেন আজ বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তা—এ কথা সে কখনও ভুল্‌বে না, আজ হতে সিয়ারের সব ভারই আমি নিলুম।

সিয়ার। পিতা, শুন্‌ছি, আপনি নাকি দিল্লী যাবেন? আমিও যাব।

আজীম। না সিয়ার, তোমায় বাঙ্‌লাতেই থাকতে হবে।

সিয়ার। আবার আপনার কবে দেখা পাব?

আজীম। শিগ্‌গিরই পাবে, এসো হোসেন, এই নাও।

(হোসেনেরজানু পাতিয়া উপবেশন; তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আজীমের পাদস্পর্শ করে সিয়ারের হস্তধারণ।)

আজীম। এখন যাও, হোসেন।

(সিয়ার এবং হোসেনের প্রস্থান)

আজ একটু নিশ্চিন্ত হলুম। রুস্তম, কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার স্বরতো কেঁপে উঠ্‌ছিল না।

চোখের জল অনেক কষ্টে থামিয়ে রেখেছি। সিয়ার ত এমন কিছু বোঝে নাই যে তার সঙ্গে আমার আর দেখা নাও হতে পারে। রুস্তম, তুমি বোধ হয় ভাব্‌ছে আমি এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি কেন?

রুস্তম। না শাহজাদা একটুও আশ্চর্য্য হইনি। আপনার হৃদয় যে এত স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ তা' আমি জানি।

আজিম। শিশুকাল হতে মাতৃহীন সন্তান, এই বিশ বচ্ছর ধরে যে আমিই তার পিতামাতার দুটো স্থানই অধিকার ক'রে ছিলাম।

চল রুস্তম যাত্রার উদ্যোগ করা যাক্। শিবির যে একবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু গঙ্গার অস্ফুট কল্লোল একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। সৈনিকেরা সব সুষুপ্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। রুস্তম, এখনই কি এদের এ শান্তিটুকু ভাঙ্গতে হবে?

রুস্তম। হাঁ শাহাজাদা।

আজিম। এটুকু তাদের ভোগ কর্ত্তে দেও। ব্যথা বেদনা মার হাতের মত কোমল স্পর্শে কোথায় দূর হয়ে যায়। কুস্বপ্নের ঘোরে এ শান্তি যাদের নষ্ট হয় তারা বড়ই দুর্ভাগা।

(সকলের প্রস্থান)

পটনিক্ষেপন।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গীত।

[রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া]

জানে না কেউ জানে না।
কচি কোমল ক্ষুদ্র বুকে, কেন জাগে বেদনা।
নির্ভাবনার হাসি-মুখে, খেল্‌ত যে জন শান্তি সুখে,
কে জানে হায়, কোন কুচক্রের নিমেষে ছলনা!—
হঠাৎ ব্যথা বাজ্‌ল বুকে, করুণ বিষাদ জাগ্‌ল চোখে,
ঘনিয়ে এল নেশার ঝোঁকে, প্রাণের যাতনা!
হাসির কথা, দারুণ ব্যথা, (চুপ্‌ চুপ্‌) শুন্‌তে সে মানা!!

স্বরলিপি।

—:o:—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আশোওয়ারি মিশ্র—খেম্‌টা।

II ৷ ৷ সা | {ঋা ঋা -পা I র্সা -া ণা | দা পা -া |
০ ০ জা নে না ০ কে উ জা নে না ০

| ৷ ৷ ঋা | পা দা -পা I জ্ঞা -মা জ্ঞা | (ঋা সঋা সা)} |
০ ০ জা নে না ০ কে উ জা নে না০ 'জা'

| ঋা সা -া | {৷ ৷ সা | ঋা ঋা পপা I ণা -া ণণা |
নে না ০ ০ ০ ক চি কো মল্ ফু ০ ল

| ধা ণা -া | ৷ ৷ র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্ঋা র্সর্সা I ণা -র্সা ণণা |
বু কে ০ ০ ০ ক চি কো মল্ ফু ০ ল

| দা পা -া | ৷ ৷ মা | পা দা পা I জ্ঞা -া মা |
বু কে ০ ০ ০ কে ম জা গে যে ০ ন

| পা -া -া | ৷ ৷ জ্ঞা | মা পা মা I জ্ঞা -া ঋা |
না ০ ০ ০ ০ কে ম জা গে যে ০ ন

| (সা -া সা)} | সা -া -া | ৷ ৷ সা II
ঝ ০ 'ক' ন না ০ ০ ০ 'জা'

II -া -া জ্ঞজ্ঞা | {মা দা ণণা I র্সা র্সা র্সা | সা -া -া |
০ ০ নির্ ভা ব নায় হা সি মু খে ০ ০

| ৷ ৷ র্সর্সা | র্ঋা ণা র্সর্সা I দা ণা দা | পা -া -া |
০ ০ নির্ ভা ব নায় হা সি মু খে ০ ০

| ৷ ৷ পপা | দা মা পপা I জ্ঞা -মা জ্ঞা | ঋা সা -া |
০ ০ খেল্ ত বে জন্ শা ন্ তি সু খে ০

| ৷ ৷ সা | ঋা ণ্‌া সসা I সা -মা মা | মা মা -া |
০ ০ কে জা নে হায় কে ০ জা নে হা য়

| ৷ ৷ দা | দা মা দদা I দণা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
০ ০ কে জা নে হায় কে০ ০ জা নে হা য়

| র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া I ণা দা দপা | -মা জ্ঞা মদা |
কো ন্ কু হ কে য্ নি যে যে০ ব্ হ ল০

| (পা -া জ্ঞজ্ঞা)} | পা -া সা II
না ০ 'নির্' না ০ 'জা'

II ৷ ৷ মা | {মমা দা দা I ণা -া ণা | র্সা র্সা -া |
০ ০ হ ঠাং ব্য থা বা জ্ ল বু কে ০

| ৷ ৷ র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্জ্ঞা র্সা র্ঋা I ণা -র্সা ণা | দা পা -া |
০ ০ হ ঠাং ব্য থা বা জ্ ল বু কে ০

০ ১ ২ ৩

| । । পা | দদা মা পপা I জ্ঞা -। জ্ঞা | ঋা সা -। |

০ ০ ক রুণ্ বি ষাদ্ জা গ্ ল চো খে ০

০ ১* ২´ ৩

| । । সসা | রা মা মা I মা পা পা | দা দা -। |

০ ০ ঘনি য়ে এ ল ঘ নি য়ে এ ল ০

০ ১ ২´ ৩

| । । দদা | ণা ণা র্সা I র্সা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা -। |

০ ০ ঘনি য়ে এ ল ঘ নি য়ে এ ল ০

০ ১ * ২´ ৩

| । । র্সা | র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I দা দা -। | ণা -র্জ্ঞা র্ঋা |

০ ০ নে শার্ ঝোঁ কে প্রা নে র্ ষা ০ ত

০ ১ ২´ ৩

| (র্সা -। মা)} | র্সা -। সা | {রা মা -পা I সা -। ণা |

না ০ 'হু' না ০ জা নে না ০ কে উ জা

৩ ০ ০ ১

| দা পা -। | (। । সা)} | । । র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্জ্ঞা র্ঋা সা I

নে না ০ ০ ০ 'জা' ০ ০ হা সির্ ক থা

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্সা -ণা | দা পা -। | । । মা | পপা মা পা I

দা রু ণ্ ব্য থা ০ ০ ০ হা সির্ ক থা

২´ ৩ ০ ১

I র্জ্ঞা মা -জ্ঞা | ঋা সা -। | র্সা -। সর্সা | । র্সা -। I

দা রু ণ্ ব্য থা ০ চু প্ চুপ্ ০ চু প্

২´ ৩ ০ ১

I মা -। মা | পর্দা -ণর্সা র্সা | র্সা -। -। | । । । I

শু ন্ তে সে০ ০০ মা না ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I ণা -। ণ | পা -ণা দা | পা -। -। | । মা মা I

শু ন্ তে সে ০ মা না ০ ০ ০ ও গো

২´ ৩ ০ ১

I মা -। মা | জ্ঞা -। ঋা | সা -। -। | । । । I

শু ন্ তে সে ০ মা না ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I ণা -। সসা | । জ্ঞা -। | মা -। মা | পা -ণা দা I

চু প্ চুপ্ ০ চু প্ শু ন্ তে সে ০ মা

২´ ৩ ০

I পা -। -। | -। -। -। | । । সা II II

না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 'জা'

☞ দ্রষ্টব্য। স্বরলিপিতে তারা * চিহ্নিত সুরাক্ষরগুলি স্বাভাবিক (Natural) সুরে উচ্চারিত হইবে।

ভেরী।

এখন অশ্রুতগান "ভেরী" এই সুপ্ত, নৈরাশ্য বিজড়িত অবসাদ-সিন্ধুর নিথর কল্লোলহীনা ও স্ফূর্তিহীনা প্রবাহ থেকে সেই অনন্তশায়ী পুরুষের রচা অনন্তশয্যাজাত গুরু গম্ভীর স্বরে প্রতি কর্ণ-রন্ধ্রে ধ্বনিত হয়ে উঠবে আশার লালিমামণ্ডিত অনুভূতি নিয়ে। এই অনুভূতিই বহু দিনের তামস্রা নিশির ঘনীভূত কালিমা মুছে দিয়ে প্রাণে হিরণ্ময়ী প্রতিমার দীপ্ত ছবির ভাব-প্রবাহে সমুজ্জ্বল চন্দ্রক স্নাত বিরাট আকাশ পথে দিশারীর মত নূতন মতবাদে প্রাণ স্পন্দন করে তুলবে। তখন ভেরীর নূতন গম্ভীর ধ্বনি থাকিয়া-থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া যে

রোমাঞ্চকারী বাদানিনাদ তুলবে তাহার পরিণাম, তাহার সুসংবদ্ধ তালের উত্থান ও পতনের গতি হবে অবিশ্রাম ও অশ্রুতপূর্ব্ব। তখন জাগরণের মুক্তি-অমৃত সকলে প্রাণভরে পান করবে। তাহাতে মানব যে চির-সত্য-সুন্দর বিশ্বছবির অপূর্ব্ব দীপ্তির আভাস পাবে, তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে উদামশীলতার নব স্ফুরণে। এ সেই পরম পুরুষের অবদান। ভেরী বাজবেই, তীব্রস্বরে ও গুরুগম্ভীর স্বরে বাজাবে। হৃদয়ের প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহুদিনের সেই পরম পবিত্র সনাতনী ভাব মাহাত্ম্য আবার এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত হবে। এ প্রলয়ের বলিদান—পুরোহিত তার স্বয়ং প্রলয়কর্ত্তা। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, মান ও অভিমান, জাতি-বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাশব শক্তিপুঞ্জের বলি হবে তখন, যখন প্রলয়ের শিব ভাবস্তিমিত নেত্রে মাতাল হয়ে নূতন প্রেম বিলাইবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসবে প্রত্যেক মানবের হৃদয় পদ্মে নূতন দেবীত্ব গড়ে তুলবে বলে। এ ভেরীর বাদন থামে না; এ বাদনের তান লয় সুর খনিয়া খনিয়া হৃদয় যন্ত্রে যে গম্ভীর শব্দে পুরিয়ে রেখেছে তার সীমাও পরিমাণ সাধারণ মানব-বুদ্ধি-জাত কোন মাপকাঠী মাপিতে পারে না, তাহা চির নূতন—অফুরন্ত—অসীম। তাই তার একটা অতীতের উজ্জ্বল ছবি আমরা দেখিতে পাই বাঙ্গলার নবদ্বীপে। তখন ভেরী সাত্ত্বিক ভাবে নূতন প্রেমে বুঁদ হয়ে আপনি ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ন'দের কানায় কানায় প্রেমোন্মত্ত গোরার ভাব-তরণীতে নূতন প্রেম সলিলের যে অবিরত ঢেউ লেগেছিল তাহার মহিমা এই দেশমাতৃকা আজও সাদরে বুকে ধারণ করে রয়েছে। সে সে গোরার অনন্ত জীব প্রেম অতীব গূঢ় কিন্তু অতীব আনন্দ উৎপাদক ও নূতনের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। আবার ভেরী উদাত্ত স্বরে প্রাণ আকুল করে ধ্বনিত হয়ে উঠবে এবার বলবে জয় গুরু মহারাজকী জয়। পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর, জঙ্গম নীরবে যেন কাহার অদর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্চ্ছে। বেজে উঠো ভেরী চির-সত্য-প্রেম গদগদ স্বরে দাও ভাই ঐ বিরহ-দগ্ধ হৃদয়ে তোমার গুরু মহারাজকী জয় শুনিয়ে দাও ওরা নূতন প্রাণে জীবনীশক্তি পেয়ে বেঁচে উঠুক। এবার ভেরীর গান প্রত্যেক দেশভাইকে শেখাবে।"

"ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্ণা শূনৃতে নার্জ্জনেব চ।
বশীকুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া।"

এইবার ভেরীর শেষগান ভেসে আসবে সেই পরম দয়িতের হৃদয় কন্দর হইতে নূতন

জাতীয়ত্বের রাঙ্তায় সকলের প্রাণের আবেগকে সাত্ত্বিকতায় মুড়িয়ে দেবে নূতন প্রাণ স্পন্দনে। এবার ভেরীর বাদনে আমাদের পেতে হবে তিন শক্তি। প্রথম—আত্ম শক্তির স্ফুরণ, দ্বিতীয়—স্বরাজাম, তৃতীয়—প্রেম। এই ত্রয়ীর মিলনে জাতির যে বনিয়াদ তৈরী হবে তাহার পরিণাম হবে দৃঢ় অটুট। যেমন লোক-মান্য তিলক ছিলেন একজন মহাতেজা, আত্মশক্তির স্ফুরণ তাঁহার তেজের সামনে সকলের ব্যক্তিত্ব নত হয়েছিল। ভারতমাতা তখনই তাই ললাটে এই "তিলক" পরে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের এ ভীষণ পরীক্ষার সময়ে সে তিলক কালের নির্ম্মম নিশ্বাসে তিরোহিত। যাউক তাতে ক্ষতি নাই, এবার ভেরী বেজেছে স্বারাজাম ও প্রেম নিয়ে। উত্থান হবেই হবে। উদ্দাম ও অনন্ত প্রলয় পয়োধিজলে নূতন কর্ম্মের পোত ফিরে আসবে তখন নবীন নীলিমায় কর্ম্মের আগাধ থৈ থৈ উৎসাহ-সিন্ধু নবতেজে উথলিয়া উঠিবে। তখন অকাম স্নিগ্ধ শেফালীর মত ভেরীর গান প্রত্যেক মানবহৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বায় ভরে তুলবে। ভেরীও সঘনে বেজে উঠবে।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥

দাসী।

—•—

স্তব্ধ যখন পুরী আঁধার রাতে
রাজা তাহার এল বাসর ঘরে,
সোণার খাটে দুধের বিছানাতে
রাণী তখন ঘুমায় অকাতরে।
রাজা তারে তবুও কহে ডাকি
'আর কত ঘুম আর কত ঘুম বাকি?'

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সে-ডাক নাহি পশে রাণীর কানে—
অলস ঘুমে জড়িত আঁখি দুটি ;
আলোর ডাকে নিশার অবসানে
চিত্ত-কমল উঠ্‌ল না তার ফুটি।
বিশ্ব তাহার রইল অন্ধকার,
চলিল রাজা খুলিয়া গৃহদ্বার।

স্তব্ধ যখন পুরী ঘুমের ঘোরে
প্রভু তাহার এল আঙিনাতে,
মলিন-তনু জাগিয়া আপন ঘরে
রাজ-বালা সে কাটায় সারারাতে।
প্রভু তারে সুধায় ডাকি ডাকি
'আর কত কাল আর কত কাল বাকি ?'
সে-ডাক নাহি চিনিল রাজবালা,
ভয়ে তাহার পাণ্ডু হ'ল গাল ;
দিবা শেষের তরল আঁধার-ঢালা
সন্ধ্যা আসি ফেলে মায়ার জাল ;
বিশ্ব তাহার রৈল হাহাকার,
চলিল প্রভু ছাড়িয়া গৃহদ্বার।

স্তব্ধ যখন পুরী উষার মুখে
বঁধু তাহার এল সে রাজ পথে,
ধ্যান মগন বসিয়া নিঝুমে
প্রিয়া তখন শান্ত মহান্ ব্রতে।
বঁধু তারে হাসিয়া কহে ডাকি,
'আর কত ধ্যান আর কত ধ্যান বাকি ?'

সে-ডাকে তারে আকুল করে আজ,
'কে তুমি গো' সুধায় বঁধু হাসি—
বাঁশীর ডাকে কোথায় রহে লাজ—
'কুলকুলের দাসী তোমার দাসী।'
বঁধুর বাহু বাঁধিল দেহ তার,
আলোর রথ ছাড়িল পুরদ্বার !

শ্রীসরসীকান্ত দত্ত।

"শীতের রাতে।"

—:০:—

সারা দিনটা মেঘে ঢাকা, কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে ; মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। মার্চ্চ মাসের প্রথমে কন্‌কনে উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সে দিনটা আমার বেশ মনে পড়ে ; সারাদিন ঘরে বন্ধ থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনটা বাহিরে আসিবার জন্য কেন জানি বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরের প্রকৃতির গুরু গম্ভীর মূর্ত্তিতেও আমার সান্ধ্যভ্রমণের বাধা সৃষ্টি করিতে পারিল না। ওভার-কোট চাপাইয়া জুতা মোজা আঁটিয়া আসিয়া আলোক মালায় সজ্জিত সহরের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে দু'চার জন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের নিকট হইতে আমার এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহার জন্য যে তিরস্কার লাভ করি নাই এমন নয়। হাত দুইটী কোটের লম্বা পকেটে ঢুকাইয়া দিয়া দ্রুত-পদে রেল লাইনের রাস্তা বাহিয়া বস্তির দিকে হাঁটিতে লাগিলাম—সঙ্গে কেহই ছিল না—আমি একা। দু' মাইল রাস্তা পার হইয়া আসিয়া দেখি, অন্ধকার বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; সেখানে সহরের বৈদ্যুতিক আলো নাই। রাস্তার দু পাশে স্থানীয় পাহাড়ী মুটে মজুর কুলীদের ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ী ; ভিতর হইতে প্রদীপের আলো দেখা যাইতেছে। আর সমস্তই কুয়াশা

আর ঘন অন্ধকারে আবৃত। এক স্থানে রেল লাইনের ধারে আট, দশটী ভুটিয়া আগুন জ্বালিয়া বসিয়া দিনের উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছে। আমি, অতি সন্তর্পনে ভয়ে ভয়ে এই ভারি দলটী বাঁচাইয়া কিছু দূরে গিয়া পাহাড়ের একটী বেঁকের মোড়ে উঁচু পাথরের ঘেরের উপর বসিয়া নিস্তব্ধ রজনীতে ঝরণার কুলু-কুলু স্বর শুনিতে লাগিলাম; সম্মুখে দূরে বহু দূরে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে আলোক মালায় সজ্জিত দারজিলিং সহরটী কুয়াসার ভিতর দিয়া কি চমৎকার দেখাইতেছে! অনেক্ষণ বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য উপভোগান্তে যখন বাড়ীর মুখে ফিরিলাম তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, হাত পা ঠাণ্ডায় আর চলে না।

অন্ধকারে রেল লাইনের রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে যখন প্রায় ভুটিয়াদের একটী বস্তির ধারে আসিয়াছি এমন সময় রাস্তায় পাশে কি যেন আমার পায়ে ঠেকিল, দাঁড়াইলাম পকেট হইতে দেশলাইটী বাহির করিয়া জ্বালিবার চেষ্টা করিলাম, তিন চারিবার ব্যর্থ হইয়া অনেক কষ্টে কাঠিটী জ্বালিয়া যাহা দেখিলাম তাহা কতকটা ভয়াবহ এবং হৃদয়বিদারকও বটে। একটী পাহাড়ী বৃদ্ধ রাস্তার পার্শ্বে পাথরের গায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া শতছিন্ন অতি মলিন বস্ত্রে আপন অঙ্গ মুড়িয়া পড়িয়া আছে। ভিতর হইতে শীতে কাতর জরাজীর্ণ বৃদ্ধটী গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে; প্রথমে ভাবিলাম, হয় ত মাতাল, মদের নেশায় পড়িয়া গিয়া তার এই দুর্দ্দশা গায়ে হাত দিতে বা ডাকিতে সেই নির্জ্জন লোকালয় শূন্য পথের মাঝে সাহস হইল না।

একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া একস্থানে পাইন গাছের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য কি ভাবিতেছি, এমন সময় মনে হইল যেন সে উঠিয়া বসিল, দেশলাই ধরাইয়া নিকটে গিয়া ডাক দিতে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা ছোট্ট কপালের নীচে বড় বড় দুটী অলস্ত চোখ মেলিয়া আমর দিকে অর্থহীন নিরাশা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

দেখিয়া মনে হইল না ত যে এ মদের নেশা। পথপার্শ্বের স্তুপিকৃত শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিবার চেষ্টা করিলাম, পাতা ভিজা ছিল বলিয়া আগুন জ্বলিল না। বুড়াকে নানান্ প্রশ্ন করিলাম, তাহার উত্তর নাই, কেবল অর্থহীন ছল ছল নেত্রে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মনে বড়ই কষ্ট হইল। এই শীতের দুর্দ্দান্ত রাত্রি বরফ পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সমস্ত হিমালয় শ্বেত আবরণে আচ্ছন্ন, বেচারী নিঃসহায় পথের পথিক বৃদ্ধ জীবনে শেষে এই ভাবেই পারের খেয়ার পাড়ি দেবে। যদি সে কোথায়ও এতটুকু আশ্রয় না পায় তবে আজিই তাহার মরণ নিশ্চিত। বুড়াকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিলাম, আমার কথায় যেন তাহার কোনই মনোযোগ নাই। কেবল এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। তাহার এই দু'টী অদৃষ্ট পূর্ব্ব চোখের দৃষ্টি যেন আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার হৃদয়ের করুণ কাহিনী গাঁথিয়া দিতেছে। শত-দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় যেন এই দু'টী চোখের ভিতর দিয়া বাহিরে আপনাকে সম্পূর্ণ ধরিয়া আনিয়াছে।

অনেক কষ্টে তাহাকে আমার সঙ্গে আনিলাম, মুখে কথা নাই; উদ্দেশ্যহীন ভাবে পাগলের মত পথ চলিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া তাহাকে পাশের একটী ছোট্ট ঘরে থাকিবার মত স্থান করিয়া দিলাম সে তথায় আসিয়াই ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল—জিজ্ঞাসা করিলাম "চা খাবি।" কোনও উত্তর নাই। কেবল সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বেদনাময় স্থির দৃষ্টিতে বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। চাকরটাকে বলিয়া চা করাইয়া দিলাম। ক্ষুধার পীড়নে ঢক্ ঢক্ করিয়া ২।৩ গ্লাস চা নিঃশেষ করিল। মনে মনে ভাবিলাম লোকটা পাগল না হইলে এরূপ উদাসীন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক ত দেখা যায় না, নিশ্চয়ই পাগল কিন্তু তাহার মধ্যে পাগলামির কোনও প্রকার চাঞ্চল্য আমার চোখে ত ধরা পড়ে নাই। চা খাইয়া যখন অনেকটা সুস্থ হইল তখন আমি কৌতুহল নিবারণার্থে তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম কিন্তু সে অল্প প্রশ্নেরই জবাব দিল, তাহাতে আমার মনের সন্দেহ বাড়িল, বৈ কমিল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার সংসারে কেউ আছে" বলিল "না"—তোমার বাড়ী? কেবল মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। মুখে কথা ফুটিল না। আমি তাহাকে বলিলাম "তুমি আমার বাড়ী থাকিবে? এখানে কাজ কর্ম্ম কর;" তাহাতে তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু সেই দুঃখ-ভার-পীড়িত বলি চিহ্নিত গণ্ডদেশ সিক্ত করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বুঝিলাম আমার সহিত বাক্যালাপ তাহার বিস্মৃত প্রায় সুখের দিনের স্মৃতি মনের কোণে জাগাইয়া দিতেছে। সে ছিন্ন বস্ত্রের এক কোণ দিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু যে রকম আছি এই রকমই আমায় থাক্‌তে দিন্, জগতে দুঃখের স্বাদ নিয়ে মরতে যেন পারি; আমার সব গেছে, আজ এক এই পাহাড়ের বুকে সবুজ ঘাসে মুখ লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি। শীত গ্রীষ্ম সব সয়ে গেছে—আমায় বিদায় দিন। তাহার মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা শুনিয়া আমার মন ভয়ে, বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল।

অবাক্ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম কি যে দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সে মুখের বর্ণ আকৃতি, চোখে শত-দুঃখের ইন্ধনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা আজিও আমার চোখের সম্মুখে ভাসমান।

সে দিন দুর্য্যোগের রাত্রে কোনও মতে তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়া, মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব চিন্তা লইয়া বিছানায় শয়ন করিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি কাচের সাসির ভেতর দিয়া আলো আসিয়া ঘরের মেঝের, লুটাইয়া পড়িয়াছে। গত রাত্রের সমস্ত কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। দূর পাহাড়ের সবুজ গায়ে ধোঁয়ার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ মালা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর নীচের নীচের রাস্তার স্থানে স্থানে বরফ জমিয়া আছে। জানালা খুলিতেই হু হু করিয়া জল কণা ভরা বাতাসের ঢেউ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। গত রাত্রের কথা মনে পড়ায় তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেলাম—পাশের ঘরের ভেজান দরজা খুলিয়া দেখি—ঘর শূন্য—মনে নানা সন্দেহ আসিয়া জুটিল। চাকরটীকে ডাকিয়া তুলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই কি জানিস এই লোকটা কখন চলে গেছে।" সে বলিল "বাবু আমি কিছুই টের পাই নি।" বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সদর দরজা ভেজান রহিয়াছে; বাগানের গেটটী বন্ধই আছে। ঘরে ফিরিয়া বিছানায় বসিয়া নানা কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছি। এমন সময় চাকরটী ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে অতি মলিন, তৈলাক্ত কাগজে জড়ান, সযত্নে রক্ষিত একটী ছোট্ট রূপার কানের দুল পাইয়াছে। কাগজের গায়ে ভুটিয়া অক্ষরে কি জানি কি লেখা। পড়িতে পারিলাম না। মুড়িয়া নিজের ডেস্কের কোণে রাখিয়া দিলাম। ভাবিলাম বুড়ার খোঁজ করিয়া তাহার জিনিষ তাহার হাতে ফিরাইয়া দিব। কিন্তু আজিও তাহার কোনও সন্ধান মিলে নাই। আজ কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনও সেটী দেওয়া হয় নাই। বোধ হয় সে তা'র কোন নিকটতম প্রাণাপেক্ষা প্রিয় লোকের স্মৃতি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকু বুকে ধারণ করিয়া গভীর মন কষ্টের মধ্যেও বেদনার ঘাত প্রতিঘাত সহিয়াও বাঁচিয়াছিল। আজ, আমার ঘরে সেই 'স্মৃতি'টুকু তুলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে জগৎ সমুদ্রে গা ভাসাইয়াছে। এইটুকুর প্রতি যখনই আমার চোখ পড়ে তখনই সমস্ত জীবনটী যেন কি গম্ভীরতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বৃদ্ধের হৃদয়ের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা রাশি যেন রূপোর কানের

দুল হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়ে তাহার জীবনের সুরের প্রতিধ্বনি বাজিয়ে তোলে; কি জানি কেন তাহার অজ্ঞাত দুঃখেও আমার মনটা ক্ষণেকের জন্য ভারাক্রান্ত হইয়া আসে।

শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার।

অজ্ঞাতে।

—ঃ০ঃ—

আমার ফুলের কুঁড়ি ফুট্‌ল কোথায়
কেউ কিরে তার খবর জানে
মধুর তাহার গন্ধটুকু
আসছে আমার গোপন প্রাণে!
দুঃখ নিশি কখন কেটে
পাপড়ি যে তার পড়্‌ল ফেটে গো
গন্ধকোষে গন্ধ তাহার
ভরল সোহাগ আলোর টানে!
চিত্ত আমার নিত্য বিভোর।
উঠল ভরে বুকের দাওয়া
প্রাণের মাঝে উতল হ'ল
গন্ধ আকুল ভোরের হাওয়া!
আমার ফুলে তোমার হাসি
পড়্‌ছে লুটে পুলক রাশি গো
পাগল হ'ল হৃদয় আমার
অমৃতরূপ সোহাগ পানে!

১১ই মাঘ।

কথিকা।

—ঃ৹ঃ—

বহুকালের আগের কথা, গান্ধার-রাজচক্রাধিপ তাঁর কন্যা অপর্ণবা, তাঁরি কাহিনী।

রাজকুমারীর দেহের উপর দিয়ে ষোলটা বসন্ত বয়ে গিয়েছে। ষোল ষোলটা বসন্ত তারি—নিবিড় সোহাগ—সেই সোহাগের স্পর্শ রাজকুমারীর সারা দেহে। মাথায় চুল নয় ত যেন একরাশ চিক্-চিক্-করা কাকপক্ষ, একেবারে হাঁটুর নীচে এসে পড়েছে—চোক নয় ত যেন দুইটী পদ্মের পাঁপড়ি একেবারে কান পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—চোখের তারা নয় ত যেন আষাঢ়ের মেঘ তাতে লুকোনো চক্-চক্-করা বিদ্যুৎ—বাহু নয় ত যেন মৃণাল—হাত নয় ত যেন সেই মৃণাল প্রান্তে ফোটা রক্ত পদ্ম। গণ্ড গ্রীবা বক্ষ কটি জঙ্ঘা চরণ সব ষোল ষোলটা বসন্তের নির্ভুল আদরে গড়ে উঠেছে। ষোলটা ফাগুণের আগুণ দিয়ে রাজকুমারীর সারা দেহ ঘেরা।

রাজমহিষী রাজাকে বল্‌লেন—মহারাজ কন্যাকে পাত্রস্থ কর্‌তে হবে।

গান্ধার-কুমারী স্বয়ম্বরা হবেন। দেশ-বিদেশে রাজাদের কাছে আমন্ত্রণ গেল। কাশী কাঞ্চি কোশল—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ—মৎস্য মগধ মিথিলা—চেদী চোল চালুক্য শতরাজ্য থেকে শত নৃপতি স্বয়ম্বর সভায় এসে বস্‌লেন। তাঁদের দেহের জ্যোতিতে অলঙ্কারের দ্যুতি চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। কত মণি মুক্তা মানিক্য, কত চুনি পান্না মোতি। তাঁদের মাথায় মুকুট কর্ণে কুণ্ডল গলে মণিহার চন্দনরেখা। শত নৃপতি যেন শত ইন্দ্রতুল্য।

সালঙ্কারা রাজকুমারী মালা হাতে স্বয়ম্বর সভায় এসে দাঁড়ালেন রাজ-কুমারীকে দেখে শত নৃপতি মোহিত হ'য়ে গেলেন। কেউ কেউ আসনে প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন।

দ্বারপালিকার মুখে রাজাদের পরিচয় চলতে লাগল। ইনি কাশীরাজ, দেহে নবীন জ্ঞানে প্রবীন; দানে কর্ণ সমান—ইনি বঙ্গাধিপ, শৌর্য্যে সিংহ করুণায় সিন্ধুসম—ইনি চেদী স্বয়ং কুবের যাঁর ধনভাণ্ডার রক্ষা করেন। এম্‌নি এম্‌নি পরিচয় দিয়ে দ্বারপালিকা রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে লাগল এক এক রাজার সামনে রাজকুমারী মালা হাতে দাঁড়ান আর সে আর সে রাজার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,, চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে—তারপর রাজকুমারী যখন সেখান থেকে সরে যান তখন যেন তাঁর মুখমণ্ডলে কে মসী ঢেলে দেয়, অঙ্গের রত্নরাজি যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে—তাঁর হেট মাথা বক্ষের উপর লুটিয়ে পড়ে।

এম্‌নি করে' রাজকুমারী শতেক নৃপতিকে অতিক্রম কর্‌লেন কিন্তু কারো কণ্ঠেই তাঁর হাতের মালা পড়ল না।

উজ্জ্বল দেব-সভা-তূল্য স্বয়ম্বর-সভা যেন সন্ধ্যার স্পর্শে ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাজপুরীর আনন্দভাব যেন নিবিড় আঁধারে ঢেকে গেল।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে গিয়ে আপন কক্ষে অর্গল বদ্ধ করলেন। শত নৃপতি অবনত মস্তকে যাঁর যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

রাজা চক্রাধিপের বক্ষে রাজমহিষীর অন্তরে একটা ক্রন্দন-রোল নিবিড় হ'য়ে উঠল।

রাজকুমারীর নির্জ্জন কক্ষে বিধাতাপুরুষ আবির্ভূত হলেন। বললেন—রাজকুমারী, তোমার মনস্তুষ্টির জন্যে আমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত নৃপতিকে একত্র করলেম কিন্তু সেই শত নৃপতির মধ্যে তুমি তোমার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেলে না! কি চাই তোমার?

রাজকুমারী কম্বুকণ্ঠ উন্নত ক'রে বললেন—মহান্! নারীর সার্থকতা কি কেবল পুরুষের গলগ্রহ হওয়ায়? ওর চাইতে মহত্তর কি আর কিছু নারীর জীবনে নেই?

বিধাতাপুরুষ জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই তোমার?

রাজকুমারী বললেন—চাই আমি স্বাধীন জীবন।

বিধাতাপুরুষ জিজ্ঞেস করলেন—মূল্য দিতে পারবে?

রাজকুমারী আগ্রহান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—যে মূল্য হোক্ না আমি দিতে প্রস্তুত।

বিধাতাপুরুষ একটু হাসলেন—বললেন—আচ্ছা।

(২)

রাজমহিষী স্বপ্ন দেখলেন। এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এসে তাঁকে বলছেন—গান্ধার রাজ-মহিষি, রাজকুমারী অপর্ণবা সামান্যা নয়। তাকে পুত্রবৎ পালন করবে।

তারপর দিন রাজমহিষী স্বপ্নের কথা রাজাকে জানালেন। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞেস করলেন। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ দৈব স্বপ্ন অনুসারে কাজ করাই কর্ত্তব্য—নইলে কে জানে কোন্ অমঙ্গল ঘটবে। দৈব কি কাজের ভিতর দিয়ে কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে চায় তা আমরা মানুষ হয়ে কি বুঝব?

সেই দিন থেকে রাজকুমারীকে শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে শাস্ত্রগুরু ও শস্ত্রাচার্য্য নিযুক্ত হলেন।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে রাজকুমারী শাস্ত্র ও শস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করলেন।

রাজকুমারী যখন শাস্ত্র পাঠে বসেন তখন মনে হয় যেন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত। রাজকুমারী যখন অসি চালনা করেন—ধনুতে তীর যোজনা করেন তখন মনে হয় এ ত গান্ধার-রাজকুমারী নয় এ গান্ধার-রাজকুমার। রাজকুমারী যখন কর্ণে কুণ্ডল পরে মাথায় শিরস্ত্রাণ দিয়ে দেহ কবচাবৃত ক'রে—তাঁর পৃষ্ঠে তূণ, হাতে শূল, কটিবদ্ধ কৃপাণ নিয়ে তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে মৃগয়ায় যান তখন মনে হয় যেন শচীনন্দন জয়ন্ত।

এমনি করে বছর দুই কেটে গেল রাজকুমারী অপর্ণবার মনে ধীরে ধীরে একটা অস্বস্তি জেগে উঠতে লাগল। কি এ অস্বস্তি? কিসের জন্য এ অস্বস্তি? কি চাই রাজকুমারীর? রাজকুমারীর ধর' ধরি' করেও ধরতে পারে না। কেবল অস্বস্তি বেড়েই চলে।

দিনের পর দিন কাটে। বর্ষা আসে মেঘের ডমরু বাজিয়ে—শরৎ আসে সোনায় আলোয় আকাশ ছেয়ে—হেমন্ত আসে তার সন্ধ্যা কালের করুণ সুর নিয়ে তার পাকা ধানের গন্ধ ছড়িয়ে—শীত আসে তার কুজ্ঝটিকা-ঘেরা রহস্য নিয়ে—বসন্ত আসে তার নব জীবনের গান নিয়ে তার সবুজ প্রাণের চঞ্চলতা নিয়ে, তার ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, রূপের নেশা নিয়ে। রাজকুমারীর অস্বস্তি কেবল বেড়েই চলে।

শাস্ত্রগুরু এসে চলে যায়, শস্ত্রাচার্য্য এসে ফিরে যায়, মৃগয়ার অশ্ব যেমনকার সাজান' তেমনি থাকে। রাজকুমারীর শাস্ত্র পাঠাও ভাল লাগেনা, শস্ত্র চালনাতেও প্রবৃত্তি হয় না, মৃগয়াতেও তৃপ্তি মেলে না। রাজকুমারীর যেন কি হয়েছে অথচ নিজেও জানে না যে কি!

একদিন রাজকুমারী স্বপ্ন দেখেন এই বিরাট সংসার কেবল একটা প্রকাণ্ড মায়ের মেলা। প্রত্যেক মায়ের কোলে এক একটী সুকুমার শিশু। মা ও শিশুর চোখে কি যেন একটা অত্যাশ্চর্য্য সুখের অঞ্জন টানা। কি একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে শিশু ও মায়ের জীবনের বন্ধন-গ্রন্থি। রাজকুমারী স্বপ্নের অর্থ কিছুই বুঝতে পারেন না। তাঁর অন্তরে কে যেন এক চিরজাগ্রত দেবীর মর্ম্মতল একটা ক্রন্দনরোলে হু হু করে ওঠে। শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও শস্ত্রচালনায় যে দেবীর পূজা সমাপ্ত হয় নি! রাজকুমারীর অস্বস্তি আরও বেড়ে ওঠে।

এক এক দিন রাজকুমারী স্বপ্ন দেখেন যে, নন্দন-কাননে একটা বিরাট শিশুদের হাট লেগেছে—লক্ষ লক্ষ শিশু-সব, প্রত্যেক শিশুর পাশে এক একজন নারী। নারীর সমস্ত অন্তর যেন সেই শিশু পুলক স্পর্শে পুলকিত—শিশুর কল-কণ্ঠ শিশুর কল-হাসি, শিশুর সুকুমার স্পর্শের মধ্যে যেন নারী-অন্তরের অন্তম রহস্য গোপন হয়ে ছিল। নারী-অন্তরের সমস্ত বেদনা মথিত করে' সমস্ত অমৃত মন্থন করে' যেন নবীন উষার সোনালী আলোরেখার মতো জীবন নিয়ে জেগে উঠেছে তরুণ সুকুমার শিশু। নারী-অন্তরের সমস্ত সুখ ও আনন্দ যেন শিশু মূর্ত্তিতে শরীরী হয়ে উঠেছে। রাজকুমারীর অন্তরের অস্বস্তি অকূল হয়ে ওঠে।

এমনি করে' দিন যায়। ধীরে ধীরে রাজকুমারীর সখিরা জান্‌ল—তারপর সখীদের কাছ থেকে রাজমহিষী জানলেন, রাজমহিষীর কাছ থেকে রাজা শুনলেন। রাজকুমারী যে স্বয়ম্বরা হবেন।

রাজা খুসী হলেন। মন্ত্রীকে স্বয়ম্বরসভার আয়োজন করতে বললেন। দেশ বিদেশের রাজারা আমন্ত্রিত হলেন।

(৩)

সুসজ্জিত স্বয়ম্বর সভা। মনোহর সুনীল চন্দ্রাতপ মণি মুক্তা খচিত—চারিদিকে স্বর্ণ সূত্রের ঝালর ঝুলে পড়েছে—দিকে দিকে পুষ্পমাল্য পল্লবগুচ্ছ—দিকে দিকে নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত আলেখ্য। অর্জ্জুনের মৎস্য-চক্র ভেদ, রামের হরধনু ভঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ এমনি সব কত কত ছবি। স্বয়ম্বর সভায় এক শত রত্নাসন। সেই শত রত্নাসনে আবার শত নৃপতি এসে বসলেন।

সালঙ্কারা রাজকুমারী মালা হাতে দ্বারপালিকার সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় এসে দাঁড়ালেন।

কে এ? কে এ কুমারী? এই কি গান্ধার-রাজকুমারী অপর্ণবা? সে মরালনিন্দিত গতি কই? সে রাজহংসীসদৃশ গ্রীবা-ভঙ্গী কই? সে মৃণালসদৃশ বাহু কই? করে সে রক্তপদ্ম কই? অধরপুটে সে কমলস্পর্শ কই? গণ্ডে সে রমণীয়তা কই? বক্ষে সে তরঙ্গ ভঙ্গ কই? কই কই? সে মন্মথমনোহারিণী লাবণ্যছটা কই? এই কি গান্ধার রাজকুমারী অপর্ণবা? অসম্ভব।

রাজকুমারী এসে দাঁড়ালেন ঋজু তাঁর দেহযষ্টি, চলনে তাঁর পুরুষ দৃঢ় পাদক্ষেপ, গণ্ডে তাঁর পুরুষ-সুলভ কঠোরতা, দৃষ্টিতে তাঁর অসঙ্কোচ দুর্দ্দমনীয়তা, বাহুতে তাঁর সবল মাংসপেশী—রাজকুমারী মালা ধরে আছেন যেন অসি আকর্ষণ করছেন। এই কি গান্ধার রাজকুমারী অপর্ণবা? শত নৃপতি পরস্পরের মুখ খাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

অবশেষে বিদর্ভরাজ আসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। গান্ধার-রাজকে সম্বোধন করে' বললেন—মহারাজ এই কুমারী কে?

গম্ভীর কণ্ঠে গান্ধার-রাজ উত্তর করলেন—মহারাজ এই কুমারী গান্ধার-রাজনন্দিনী অপর্ণবা।

শত নৃপতি আসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। শত নৃপতি এক বাক্যে বলে' উঠলেন—গান্ধার-রাজ, এই কুমারীর পাণি-গ্রহণ করতে আমরা অপারগ—আমাদের মার্জ্জনা করবেন আর যুদ্ধার্থেও আমরা অপ্রস্তুত নই।

শত নৃপতি স্বয়ম্বর সভা ত্যাগ করে' যাঁর যাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে গিয়ে আপন কক্ষে অর্গল বদ্ধ করে' আকুল হয়ে কক্ষতলে লুটিয়া পড়লেন।

একটা নীরব মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনরোল রাজপুরীর কক্ষে কক্ষে মহলে মহলে ফিরতে লাগল।

দিবা অবসান হল'। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এলো—। সারা রাজপুরী মৃত্যুর মত নিঝুম। সেদিন আর ঘরে ঘরে দীপ জ্বলল না—নহবতে নহবতে রোশনচৌকির সুর ফুটল না—দেবালয়ে আরতির শঙ্খ কাঁসর বাজল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। রাজকুমারীর কক্ষে বিধাতা পুরুষ আবির্ভূত হলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—মহান্! নারী-জীবনের এ কি অপমান!

বিধাতাপুরুষ উত্তর করলেন—নারি! পুরুষের জীবনে মুগ্ধ হয়েছিলে—পুরুষের জীবন আকাঙ্ক্ষা করেছিলে—এই তার মূল্য।

রুদ্ধকণ্ঠে রাজকুমারী জিজ্ঞসা করলেন—প্রভু নারীর কি মুক্তি কোন দিনই নেই—নারী কি কোনদিনই স্বাধীন হবে না?

বিধাতাপুরুষ একটু হাসলেন—তার পর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন—রাজকুমারী এই ব্রহ্মাণ্ডে স্বাধীন কে? সব নিয়মে বাঁধা—আমি পর্য্যন্ত।

বিজলী। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হৃদয়-বিলাস।

—:০:—

হৃদয় আমার বিহগের প্রায়
সুরের সরসে সন্তরে,
নব নব সুরে গান ধরে!
অন্ধকারের অতল গুহায়
চায় না থাকিতে বদ্ধ,
খাঁচার আদরে কাজ নাই তার
যেথা নাই রূপ গন্ধ।
আপনার সুখে কল্পনা-পাখে
সে যে ঘোরে সব অন্তরে;
মরুভূর বুকে নন্দন রচে
কোন্ সে যাদুর মন্তরে!
হৃদয় আমার কুসুমের মত
সুরভির রস পান করি—
মধুচাক রচে বুক ভরি!

সবারে যে টানে আপনার পানে
প্রীতির অচ্ছেদ্য-বন্ধনে,
যার কেহ নাই তারে দেয় ঠাঁই
আপন পরাণ নন্দনে।
সৌরভ-সুধা বিলাইয়া সবে
বেদনা-গরল আনে হরি';
করি মধুময় সকল হৃদয়—
রিক্ততা নিজে লয় বরি!
হৃদয় আমার প্রেম বিহ্বল,
তটিনীর মত গান গেয়ে—
আপন ছন্দে যায় বেয়ে!
কত অচেনায় করে পরিচয়,
কত স্মৃতি হৃদে সঞ্চরি;
হারাণো গানের সন্ধান আনে,
পাহাড়ের বুক দেয় ভরি!
বিরহীর শ্বাসে বিগলিয়া পড়ে,
শীতল পরশ দেয় ছেয়ে;—
অজানা অসীম শান্তির খোঁজে
আকুল আবেগে যায় ধেয়ে!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বক্তব্য।*

—ঃ*ঃ—

শক্তির অপচয়—

বাসগৃহে অগ্নি সংযোগে আলোক উত্তাপের এ ব্যবস্থা অপেক্ষা ঘোর অমানিশার অন্ধকারও ছিল যে শতগুণে প্রেয়! জীবন প্রাণ ধন সম্পত্তি সমস্তই অগ্নিমুখে আহুতি দিয়া এ নিদারুণ আলোকের প্রার্থনা কে করিয়াছিল! এই অন্ধকারবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের কি অন্য পথ ছিল না! কে চায় তোমার ও সর্ব্ববিধ্বংসী আলোক!

তস্কর যে,—প্রতিবাসীর শত্রু যে তাহার চাটুকারিতায়,—উৎসাহ বাক্যে নিজকে এ দুষ্কার্য্যের জন্য হয়ত গর্ব্বিত মনে করিতে পার—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অভিশাপ হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারিবে না কিছুতেই—দুঃখ দূরীকরণের নামে যে মহাদুঃখের সৃজন করিয়াছে—তাহা নিরাকরণ হওয়া কি সহজ! দেশটা ও-আগুনে ছারখার হইয়া গেল—শ্মশানে পরিণত হইল,—গৃহহীন করিল অধিবাসীকে! অনন্ত যন্ত্রণার কারণ হইয়াও অভিলাষ তোমার,—অধিবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ!

না—না অধিবাসীর আশীর্ব্বাদ তোমার অভিষ্ট নহে—তুমি চাও তাহাদের বিত্ত,—রক্ত—শক্তি। শক্তিহীন তোমার পূজায় আত্মনিয়োগে হইবে বাধ্য—সেই তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাহা কি পূর্ণ হইবার!

মনে করিতেছ—কেন সে সাধ তোমার পূর্ণ হইবে না—কত শত শত বিপন্ন তোমার চরণে লুটাইতেছে—তোমার কৃপা ভিক্ষা করিতেছে—"তুমিই প্রভু,—অনুগ্রহপ্রার্থীকে কৃতার্থ কর!"

কিন্তু ওটা কি তাহাদের হৃদয়ের কথা; ও-কথা শুনিয়া আহ্লাদে, কৃতকার্য্যের আত্মপ্রসাদে আত্মহারা হইতেছ কেন,—ভাল করিয়া ও-স্তুতি বাক্য লক্ষ্য কর—স্বরটা তার

* 'বক্তব্যে'র মতামত বক্তার,—সুতরাং দায়ী তিনি। পঃ সঃ।

তলাইয়া বুঝ—উহার মধ্যে কতখানি তীব্র বিষ লুক্কায়িত আছে,—সুযোগ পাইলে এখনি সে তোমাকে হলাহলে জর্জ্জরিত করিবে !

স্বভাবকে উপেক্ষা করা কি এতই সহজ—প্রকৃতিকে কে উল্টাইতে পারে,—অত্যাচার করিয়া লাভ করিবে শান্তি—এও কি হয় !

শত উদাহরণ সম্মুখে তোমার—একবার চাহিয়া দেখ,—তার পরিণাম কি ! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে ঐ লেখা—শক্তির অপপ্রয়োগে কি ফল !

শুদ্ধ সত্য স্বরূপের অবমাননা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাও,—সে যে মাতৃহত্যা,—গর্ব্বান্ধ হইয়া ভাবিতেছ বাহুবলে হৃদয়ের দাবি মুছিয়া ফেলিবে ! সে কি কেহ পারিয়াছে ! অনেক ভুল করিয়াছ, ভোগাইয়াছও অনেক ; বন্ধু ফিরিয়া এস,—কুটীলতা পরিত্যাগ কর, কোল দাও, শান্তি উৎসারিত হউক ! রক্ষা কর—রক্ষা কর !' নীচের দিকে ফিরিয়া চাও—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিও না আর ; এত দিনেও কি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, শূদ্রকে বাদ দিতে গিয়া তুমিও যে বঞ্চিত হইতেছ। ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর তুমি,—দরিদ্রের যেমন আশ্রয় তুমি, দরিদ্রও তেমনি তোমার আশ্রয় ; কৃষককে তুচ্ছ করিয়া, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতকে উপেক্ষা করিয়া ভারতের আজ এ দশা,—কি অচিন্ত্য অবনতি। এরূপ অধঃপতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও কি—সমদুঃখের সহানুভূতির একতায় উদ্ভব হইবে না। শিক্ষার নামে, সভ্যতার নামে এ নরমেধ যজ্ঞ কয় দিন চালাইবে ! গৃহদাহী আলোকের অন্ধ গৌরবে সুপ্ত জনসাধারণকে তাচ্ছিল্য করিয়া বলিবে 'অজ্ঞ ওরা. অন্ধকারের জীব ওরা, উহাদের মরণ মঙ্গল !'

আমাদের মৃত্যুই যদি তোমার প্রার্থিত হয় তবে কেন উপকারী সাজিবার ও-ভান, ও-কপটতায় কি ফল ! তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। মেকি আর চলে কয় দিন ? ধরা পড়িয়াছ—সাবধান হও, স্বার্থের নামে সর্ব্বনাশ করিও না নিজের ও অন্যের ! ত্যাগ বিনে অর্জ্জন হইয়াছে কোথা ?—

সুখী হইতে চাও যদি ত্যাগে হও সার্থক—দানে তোমার প্রাণ পুষ্ট হউক—সংহারমূর্ত্তিতে অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না কোন ক্রমেই।

সাম্যে বৈষম্য।

তবুও বলিবে সংহারমূর্ত্তি, উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে ত্যাগ নীতির অভাব ! এই যে গদ্যে পদ্যে, কথাবার্ত্তায়, গল্পগুজবে, (সমাজে ঠিক না হ'ক) দৈনন্দিন জীবনে একাকার-বাদ খরতেজে প্রচারিত হইতেছে ইহা নহে কি ত্যাগের নিদর্শন, নহে কি সাম্যবাদের জীবন্ত উদাহরণ ! জাতির গর্ব্ব, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ত এখন বদ্ধ কেবল সামাজিক ব্যাপারে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের প্রশ্ন কেবল পূজার মন্দিরে, সেকেলে দিদিমার নিকট—পল্লীর অন্ধকার কোণে ও-সংকীর্ণতা। আলোক উজ্জ্বল সভ্যতার যুগে কে মান্য করে ও জাতির পাঁতি—তবু বলিতে চাও—শিক্ষিত অনুদার ! উপদেশক রূপে নিন্দুকের অভিনয়ে কি ফল বল ! পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া ঈর্ষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তাচ্ছিল্য করিতে শিক্ষিতের গুণকে দোষের কালিমায় ম্লান করিতে চাও যদি সে অন্য কথা কিন্তু আজ আর এ স্বদেশীর যুগে, সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বলিতে পারিবে না—শিক্ষিতের নিকট তুমি উপেক্ষিত,—সে তোমায় রাখিতে চায় দূরে !

* * *

কে বলে রাখিতে চায় দূরে ! শত ধন্যবাদ তোমাকে তোমার সাম্যনীতির জন্য। কিন্তু এ সাম্য তোমার কিসের জন্য ? কাহার সুখের প্রয়াসে ! হে শিক্ষিত ! সে সুখ তোমার না আমার ? না উভয়ের ?

অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থই কর—আর কৃষকের জন্যই কর পাঠশালা—সর্ব্ব অনুষ্ঠানেই যে সাম্যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য—ওগুলি সত্যই এক মহা প্রাণের উক্তির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি,—কিন্তু তোমার নিকট উক্তি মাত্র ! মুক্তির পথ—ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য আমি—আমি ত উহাতে সন্ধান পাই না। জানি না আমি অন্য দেশের ভেদাভেদের কথা, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের কি ব্যবহার—কিন্তু সোনার বাঙ্গলায় আমার তখনই বরং ছিল ও জাতিভেদেও সাম্য, শান্তি—এ সাম্যবাদেই এখনি বাজিতেছে বৈষম্য। পল্লীর প্রাণের নিন্দা,—ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা বিধবার অপবাদ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শুচিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া মনে করিতেছ এক সঙ্গে খাইয়া ছুঁইয়াই হইয়াছ তোমরা তাহাদের অপেক্ষা উদার ! মিথ্যা কথা ! পল্লীর সন্তান হইয়াও

লক্ষ্য কর নাই কভু পল্লীর প্রাণ—ঐ জাতি বৈষম্যের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে কি প্রাণে প্রাণে গভীর মিলন! অযথা উচ্চ ও নীচ জাতিতে যখন তখন স্পর্শেই কি সাম্য? একে উচ্ছিষ্ট দিয়া, অন্যে তাহা গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট বলিয়াই কি বৈষম্য,—সে উচ্ছিষ্ট, দাতার চক্ষে নহে কদন্ন, গ্রহীতার নিকট নহে সামান্য—সে যে স্নেহের দান—পরস্পরের মধ্যে প্রেম স্নেহ বিনিময়ের উপকরণ—সম্বন্ধ স্থাপনের পথ। এক পরিবারের ছোট বড় তাহারা—সে নহে বৈষম্য,—সাম্য তাহার অস্থিমজ্জায়—কেবল সাজ সজ্জায়—বাহ্যিক ভাবে নয় সাম্য—হাড়ে হাড়ে!

আর ঐ সে মেথর বাবুর্চির পাচিত অন্নে সাম্য—সাম্যের প্রকৃতি—মূলনীতি তাহাতে কতটুকু? মনীব চাকরের ভাবে তাহা যেখানে জর্জ্জরিত সেখানে তিষ্ঠিতে পারে কি সাম্য—ত্যাগ? ত্যাগ নহে—স্থূল স্বার্থের যোগ শুধে! সমতা তথায় কোথা? বাবুর্চি নহে যে ভ্রাতা, সে পূরাদস্তুর ভৃত্য,—হুজুরের মজুর। পল্লীর অস্পৃশ্য কেরামত চাচা,—নিধু (চণ্ডাল) দাদা, হাড়নী মাসীর মিষ্টত্ব তথায় কোথায়? সর্ব্বজাতির সমন্বয় হোটেলে নয়,—প্রাণে। হাঁ—নদীয়াচাঁদের মত হাড়ি ডোম চণ্ডালে—পতিতে পুতাত্মায় একাকার করিয়া প্রেমের বন্যা বহাইতে পার যদি এস—হাড়ির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ করিয়া মুখে মুখে তুলিয়া দাও—প্রাণে প্রাণে খেলুক সখ্যতার বন্যা—সে বন্যার বান ডাকে যে প্রাণে—সেখানে নিয়ম করিয়া রিজালিউসান বলে বহাইতে হয় না সাম্য,—প্লাবিত হয় কেমন করিয়া,—দেখিয়াছে তাহা একদিন জগত,—যবন হরিদাসে—জগাই মাধাইএ! প্রেমোদয় না হইলে—সাম্য বৈষম্য অভেদ—পালিটিক্যাল সাম্যকে বঙ্গ করিবে দূর হইতে নমস্কার,—সাম্যের নামে বৈষম্যের বৃদ্ধিতে আর আবশ্যক। অনুভূতিহীন সহানুভূতির প্রসার যত না হয় ততই মঙ্গল!

—সেবক।

মরণ আড়াল।

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিকৃত কর্কশ কণ্ঠে ভদ্রলোকটি বলিলেন—"নরকে কি আর যায়গা ছিল না—যত আপদ জুট্‌ছ এসে এখানে! জেলের পোষাক ছাড়্‌বারও অবসর হয় নি—সেটুকু তর্ সয় নি—জেল থেকে বেরুতে না বেরুতে আবার চেষ্টা দেখ্‌তে আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ করা হয়েছে।"

নিরুপায়! পলায়নের আর পথ নাই। হাতে হাতে যখন ধরা পড়িয়াছি, তখন কাকুতি মিনতি করিয়া ইহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি ভাল, নতুবা আবার সেই নরক,—জেল! সাহসে মন বাঁধিয়া বলিলাম—"সত্যিই নরকেও আমার জায়গা নেই,—দেখ্‌তেই পাচ্ছেন—জেল হতে পালিয়েছি আমি; কম কষ্টে এ বিপদে ইচ্ছে করে ঝাঁপ দেই নি! এখন রাখ্‌তে হলেও আপনি, মারতে হলেও আপনি!—আবার যদি সেই জেলে পাঠান—তা হলে—তা হলে—ওঃ তারা আর আমায় আস্ত রাখ্‌বে না—তার চাইতে আপনি না হয় কেটে আমায় দু'খানা করে ফেলুন,—সকল যন্ত্রনার অবসান হ'ক।"

তিনি ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—"খুব সোজা পথটা ত দেখিয়ে দিলে যা হোক,—তা না হলে জেলের কয়েদী,—বলেছ বেশ—তোমায় কেটে ফাঁসী কাঠে ঝোলাটা খুব সুখের হবে বৈ কি, সে চেষ্টাটা না হয় পরে দেখা যাবে,—এখন আমার জানা দরকার কোন জেল হতে মহাশয়ের আগমন?—কাগজে যে পড়্‌ছিলেম—নসীপুর জেলে অগ্নিকাণ্ড করে' একটা পুরানো কয়েদী পলাতক, তিনি কি আপনি?"

উত্তর করিলাম "আজ্ঞা হাঁ—তবে লঙ্কাকাণ্ডটা আমার কৃতিত্বে নয়!"

তিনি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "স্বাগত! আপনাকে নিয়ে এত তোলপাড়—আর আপনি এখানে; ভাগ্যবান আমি,—আপনার জন্য দুইশো টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে,—ধরে দিলেই হাতে হাতে পাওনা। মনে হচ্ছিল—আপদ আপনি—ভাল ভাল—উঠে বসুন—দু'শো টাকার তোড়া আপনি!"

তাঁহার কথা শুনিয়া একদম দমিয়া গেলাম ; হা অদৃষ্ট, এ কি হইল ! বলিলাম "মরাকে আর মেরে ফল কি ! দয়া করুন, রক্ষা করুন,—কত দু'শো টাকা আপনার আস্‌ছে যাচ্ছে,—এমন বাড়ী ঘর আপনার,—টাকার কাঙাল নন নিশ্চয় আপ্‌নি—আমার স্বাধীনতা দিলে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন—কয়েদী আমি সত্যি—চোর ডাকাত নই আমি—অদৃষ্টের তাড়নায় জেল কয়েদী—অনেক ভুগেছি, পালিয়েও নিরাপদ হই নি—আবার জেলে যেতে হয় যদি—তা হলে আর বাঁচতে হবে না—কচলে কচলে মারবে—তার চাইতে, সত্যই বল্‌ছি—আমায় এখনি মেরে ফেলে সব যন্ত্রণার শেষ করুন,—দোহাই আপনার—জেলে আমায় পাঠাবেন না।"

তিনি কোনও উত্তর না দিয়া কেবল মাত্র অতি গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করিলেন "হুঁ !" বুঝিলাম না, আমার কাতর উক্তি নিমজ্জিতের নিরাশ প্রাণের করুণ ভিক্ষার অতি করুণ সুর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল কি না,—সে বদন মণ্ডল এমন একটা কদর্য্য নিষ্করুণ কুঞ্চিত কর্কশভাবে মলিন যে তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রতিফলিত হইবার নহে ! তাঁহার শ্যেনবৎ বক্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন সৃষ্টির বাহিরের, তাহার ভাব উদ্ধার করা আমার সাধ্যের অতীত ! আমি আবার বলিলাম,—আমার কণ্ঠস্বর আমার নিকটেই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল,—হৃদয় নিরাশায় নিমজ্জমুখী হইয়া যেন বলিয়া উঠিল—কার কাছে আশা কর দয়া, এ যে পিশাচ—বল প্রয়োগে পাও যদি অব্যাহতি। না—সে কি হয় ! আবার বলিলাম—'দয়া করুন ! চুরি করতে আপনার ঘরে ঢুকি নাই,—নিরুপায় হয়েই এ ভাবে চোরের মতন এ পোষাক বদ্‌লাতে এসেছি, নৈলে যে আমার পলায়েও রক্ষা নেই—আমায় সেই ভিক্ষা দিন—এ হেয় বেশ হতে আমায় অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন,—আমি প্রতিজ্ঞা করছি এখনি এ বাড়ী—এ সহর—ত্যাগ করে যাব, আমায় আর কোন দিন দেখ্‌তে পাবেন না—দূরে অতি দূর দেশে চলে যাব—সৎভাবে জীবন যাপন করব—ভগবানের শপথ—আমি চোর নই—চুরি করব না জীবনে,—রক্ষা করুন—জীবন দিন,—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন !"

কতুকাল তিনি নীরবে কাটাইয়া বলিলেন "ভাল কথা। আমার মঙ্গল করবার আগে তোমার মঙ্গল করাই দেখ্‌ছি ভগবানের অভিপ্রেত হয়েছে—ভাল তাই হ'ক—আপদেই হ'ক আপদ শান্তি—যা বলি তুমি যদি তাতে রাজি হও তা হলে এবারের মত বেঁচে যেতে পার

বটে,—আমারও একটু সুবিধে হয় ! ভগবান করবেন আমার মঙ্গল সে ভগবানের আজও জন্ম হয় নি—যত রাজ্যের আপদ এনে জোটাচ্ছেন—দেখ্‌ছ না কি—ঝুলছে ওটা কি ! অন্য যায়গায় স্থান হ'ল না ঝুলে পড়্‌ল এসে আমার বাড়ীতে,—লোকে ভাব্‌বে কি,—বেটা একবার সেটাও ভেবে দেখ্‌লে না !"

এতক্ষণ নিজের মহা বিপদে আত্মহারা হইয়া পারিপার্শ্বিক জগতকে বিস্মৃত হইয়া ছিলাম, অন্য কথা আমার স্মরণে ছিল না, দৃষ্টি ছিল না কোন দিকে। তাঁহার উক্তিতে আবার মনে পড়িল সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা। চাহিয়া দেখি—সম্মুখেই আমার, শবটা ঝুলিতেছে। দিব্য, পরিপাটী পোষাক পরিচ্ছদ পরা একটি যুবকের দেহ ! লম্বা চওড়ায় আমারি মত, আমাদেরি বয়সী ! কেন সে এ কার্য্য করিল ! কি ভীষণ পরিণাম ! ভাবিতেই শরীর শিহরিয়া উঠে !

ভদ্রলোকটি আমাকে চিন্তার অবসর না দিয়া বলিলেন "অমন ফ্যাল ফ্যাল করে হাবার মত চাচ্ছ কেন ! এতে ভাববার গণবার কি আছে ! এ দিক না হয় ওদিক, আবার জেলে যেতেই যদি ইচ্ছা থাকে স্পষ্ট বল—এখনি তার ব্যবস্থা করছি,—নয়—যা বলি সুবোধ বালকের মত শোন, সম্পূর্ণ ভাবে আমাকে নির্ভর করতে রাজি হও যদি তোমার সুখ স্বাধীনতা পেতে কোনই বাধা হবে না। বল এখন কি চাও,—জেল না সুখ স্বাধীনতা ?"

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলাম "কি চাই তা ত প্রথম হতেই বলছি ; চাই আপনার দয়া, জেলে আবার আমাকে আর না যেতে হয়,—আবার জেল !

তিনি বলিলেন "তবে যা বল্‌ব বিনা ওজরে করতে রাজি হলে ! বেশ, বেশ, বুদ্ধিমান ছোকরা। তুমি ঠিক বুঝেছ—আমি তোমায় এমন কিছু করতে বলবো না—যেটা তোমার পক্ষে অসম্ভব বা কষ্টকর বরং তোমার সুখেরি হবে, ভাল ভাবে আমার কথা মত চল্‌তে পার যদি, তুমি হবে,—ঠিক বলছি,—আমার ডান হাত,—সমস্ত বিষয়ে দেখ্‌ব আমি তোমাকে নিজের ছেলের মত !"

আমি বলিলাম "বলুন আমায় কি করতে হবে,—আদেশ করুন,—আমি প্রস্তুত !"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তুমি পারবে,—তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি পারবে,—আমি লোক চিন্‌তে কাঁচা নই, সবার আগে জেলের পোষাকটার পরিবর্ত্তন দরকার,—সেটা আমার

ঘরের কাপড় চোপড়েও হ'তে পারবে কিন্তু শুধু তাতে কাজ হাসিল হচ্ছে না,—এ ছুই ত ওই ঝুল্‌ছেন যিনি—তাঁর ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তোমার এই জেলের জাঙ্গিয়ায় তার উপায় করব!—হতভাগা, এমনি এখানে এসে প্রাণ দেয় নি—সব প্রেম ব্যাধি! আমার এখানে একটি মেয়ে আছে,—আমার বন্ধুর কন্যা,—বালিকার মা নেই,—বন্ধুর মরবার সময় তাকে আমায় সঁপে দিয়ে গেছেন—সেই হতে আমি তাকে নিজের কন্যার মত পালন করে আস্‌ছি। এই হতভাগা ছিল ওদের প্রতিবেশী—মেয়েটার সঙ্গে ছোট বেলা হ'তে জানা শুনা,—সেই সূত্রে ওর এখানে যাতায়াত,—এদিকে মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল,—আমি ঐ আত্মীয়বান্ধবহীন হতভাগার হাতে মেয়ে দিতে বরাবর আপত্তি করে আস্‌ছি,—আজ আবার নিজে সেই প্রস্তাব করতে এসেছিল,—অনেক বুঝিয়ে বল্লেম—চোরা কি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী,—কত কাকুতি মিনতি করলে, তাতেও যখন ফল হলো না—রেগে মেগে আমায় গাল মন্দ দিতেও ছাড়ল না! বিদায় করে দিলুম,—স্পষ্ট বলে দিলেম—আর যেন ও এ বাড়ীতে না আসে! দেখ, তারিই এই ফল,—গলায় রসি দিয়ে আমারি ঘরে ঝুলে বসে আছে! মরেও অপকার করতে ছাড়বে না,—কি মুস্কিল,—পেজেমি আর কাকে বলে! মনের ইচ্ছা—মরি সেও ভাল—তবু লোকে আমার নিন্দা অপবাদ করুক,—বয়স্থা মেয়ে ঘরে—এ ঘরে ওর এমন ভাবে মৃত্যু এ কথা রাষ্ট্র হলে কি আর কারু কাছে মুখ দেখান যাবে? ভাগ্যিস্ মেয়েটাকে সময় মত অন্যত্র পাঠিয়েছিলেম—নৈলে ভাব ত এখন কি দশা হ'ত!"

দর্পণে প্রতিবিম্বের মত আমার সম্মুখে সমস্তই স্পষ্ট হইয়া উঠিল! তবে কি এ আমারি সেই সাইক্লিষ্ট বন্ধু! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাঁর সরস বাক্য—উদাম—ঔদার্য্যে মন প্রাণ আমার প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁরই এই দশা! এতক্ষণ মৃতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সত্যই তিনি! অমন নিদারুণ মৃত্যু এখনও তাঁহার মুখের মাধুর্য্য সদাপ্রফুল্লভাব মলিন করিতে পারে নাই! প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল—অজ্ঞাতে যেন বলিয়া ফেলিলাম—"একি মৃত্যু তোমার—কে জান্‌ত এভাবে তোমার শেষ!"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তুমি ওকে চিন্‌তে নাকি?"

আমি আত্ম সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, "চিন্‌ব আর কি ক'রে! জেল কয়েদীর কি বাহিরের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পথ আছে! লোকটার এ ভীষণ পরিণাম দেখে কত কথাই মনে হয়!"

তিনি বলিলেন "ঠিক! ঠিক! সাধ করে লোকে এমন কাজ করে!—আত্মহত্যার মত পাপ আর নাই,—হতভাগা পাপী—পাপের আত্মহত্যায় আর অন্য যন্ত্রণা পেলে না!"

একটু থামিয়া আমার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন "বুঝ্‌ছই ত ব্যাপারটা কি ভয়ানক—কি লজ্জা! দশের কাছে আমার যে নাম যশঃ—একথা প্রকাশ পেলে—তার কতখানি হানি হবে,—লোকের সুনাম গেলে আর থাকে কি,—সত্যিই তোমায় বল্‌ছি,—ছেলের মত আপনার জন ভেবে নিজের কথা আর গোপন করব না,—এ অপযশ হতে আমাকে তোমায় উদ্ধার করতে হবে,—শপথ কর,—এ কথা কোথাও প্রকাশ করবে না—আমিও প্রতিজ্ঞা করছি,—তুমি যে কয়েদী একথা জিহ্বা হতে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হবে না—তোমার সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব,—এ দুর্নাম হতে রক্ষা কর আমায়!"

মনে হইল, এই আর সেই কি এক ব্যক্তি,—ইহার মুখে এমন কাতর উক্তি শুনিবার আশা করি নাই। ভাবিলাম—মানীর মান এমনই অমূল্য বস্তু বটে। বলিলাম—"এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

তিনি তাড়াতাড়ি অন্য ঘর হইতে জামা কাপড় আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—চট্‌পট্ পরে নাও,—আর দেরী করা চল্‌বে না—অনেক কাজ, জেলের মরাটাকে জেলের পোষাক পরাতে হবে, ওকে তোমার নামে চালাতে হবে—জেলের কয়েদী এখানে এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে এটাতে অবিশ্বাস করবার মত কিছু হবে না,—যাকে ধরতে চারদিকে লোক ছুটেছে জেলায় জেলায় হুলিয়া হয়েছে অনুপায় হয়ে আত্মহত্যা করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়! এক লোক কত হাঙ্গামা? তাতে গোল হবে না; তুমি আর ও একবয়েসী, লম্বায়ও প্রায় সমান সমান—আমি সব ঠিক করে নিতে পারব। আমি ডাক্তার ওর এ ভাবে মৃত্যু প্রমাণ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। হবে ভাল—এক ঢেলে দুপাখী মারা যাবে, একবার তোমার মরা নাম বেরিয়ে গেলে আর পলাতক বলে তোমার কোন আপদ থাকবে না, আমিও দুর্নাম হতে রক্ষা পাব। কি বল?"

বলিব আমার মাথা আর মুণ্ড। তখন তাহার উচ্ছায় আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমার অন্য উপায় ছিলনা। বন্ধুকে জেলের হেয় পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহিরের একটা বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া দিলাম। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝাইবার নয়—বার বার মনে হইতেছিল—বন্ধু! প্রিয়তম সখা—জন্ম জন্মের পরম আত্মীয় ছিলে তুমি! এ বিপদের প্রথমেই সাহায্য করিয়াছ তুমি—হেয় কয়েদী বলে ঘৃণা কর নাই—কত যত্নে পাশে স্থান দিয়েছিলে—আর জীবনের পরপারে গিয়েও আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে রেখেছ, জীবনে মরণে হে বন্ধু—কি দিয়া তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো! আত্মহত্যার অপরাধ যতই গুরুতর হ'ক,—ঔদার্য্যের মাহাত্ম্যে তুমি তা হতে মুক্ত হবে নিশ্চয়,—কি নিদারুণ দুঃখেই আজ তুমি প্রাণ দিয়াছ—মহাদুঃখহর শিব তোমায় শান্তি দিন—তাঁর নিকট এ দীনের,—এ কৃতজ্ঞের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতায় নারীর স্থান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রোমক সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থা যে প্রকার ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গেই রোমক সভ্যতার প্রভাব ইউরোপ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। রোমক সভ্যতার বিশিষ্ট দান রোমের আইন ইউরোপের প্রায় সকল দেশেরই আইনের সংগঠন ও প্রনয়ণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। অতএব ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে রোম-আইন-সঙ্গত নারীর স্বাধীনতার আদর্শও তৎপরবর্ত্তী কালের সভ্যতা ও সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু যদি সেই সময়ের ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হয় তবে দেখা যায় যে আমাদের অনুমান যথার্থ হয় নাই।

Teutonic জাতির প্রবল সমাজনীতির-সংঘর্ষে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের প্রতিকূল প্রভাবে রোম সভ্যতার নারী স্বাধীনতার আদর্শ ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ক্রয় বিক্রয়ের উপর Teutonic জাতির বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও এই দূষ্য প্রথা নারীর অবস্থার অবনতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহে তাহা হইলেও নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে এই প্রথারই কুফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। Teutonic জাতি যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া খ্যাত। সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও নারীজনোচিত কর্ত্তব্যগুলির প্রতি বিশ্রদ্ধা আসিয়াছিল এবং প্রেমের সাধনা এক তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম অবস্থায় নারীর অবস্থার উন্নতি সাধনের পক্ষে অনুকূল ছিল বটে কিন্তু যখন ইহা এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও দলবদ্ধ ধর্ম্মসমাজে পরিবর্ত্তিত হইল তখন ইহার সন্ন্যাসের আদর্শ ইহাকে ঘোর শত্রুরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিল এবং সেই সময়ে নারীকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হইত। এমন কি ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে নারী শয়তানের অংশ। Anselm এর মত স্থিরবুদ্ধি ও সুধী জন পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন যে "Femina fax est satanae."

প্রাচীন ফরাসী জাতির মধ্যে পুরুষের এক পত্নী গ্রহণ প্রচলিত থাকিলেও নারী কখনও স্বাধীন ছিল না। সে নিজের ইচ্ছানুসারে কখনও কোন জিনিষ ক্রয় বিক্রয় করিতে কিম্বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না—সকল বিষয়েই তাহাকে প্রভুর বা স্বামীর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হইত। স্বামী বিবাহের দিন তাহাকে পণ্যদ্রব্যরূপে মূল্য দিয়া ক্রয় করিত এবং বিবাহের পরের দিন স্ত্রী বিনিময়ে তাহাকে কিছু উপহার প্রদান করিত। ইহাই ছিল তাহাদের রীতি। ফরাসী আইনে একটী বিধানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যে যদি কেহ স্বীয় অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অপর কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইত এবং উক্ত কার্য্য জনিত অপরাধকে Offence against property পর্য্যায় ভুক্ত করা হইত। জার্ম্মান দেশেও স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে পারিত এমন কি একাদশ শতাব্দীতেও স্ত্রী বিক্রয়ের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যদিও সে সময়ে ইহা আইনানুমোদিত ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রথম অবস্থায় নারী ও পুরুষের সামানীতির অনুকূল ছিল। কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মসমাজে সন্ন্যাস-ব্রত প্রচলিত হইলে পর যখন ইহা Teutonic আচার ও প্রথার সঙ্গে সম্মিলিত হইল তখন নারীর অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কঠোর মত প্রচারিত হইয়াছিল। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে নারীর স্থান যে পুরুষের অনেক নিম্নে তাহা কতকগুলি নিয়ম ও বিধি দ্বারা সুস্পষ্ট করা হইয়াছিল। ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার জন্য পুরুষের এক নিয়ম ও নারীর অপর নিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছিল এমন কি অনেক ধর্ম্মমন্দিরে নারীর প্রবেশের অধিকার মাত্রও ছিল না।

Donaldson তাহার "Woman" নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "I may define man as a male human being and woman being.........what the early christians did was to strike the "male" out of the definition of man and human being out of the definition of woman." নারীর সম্বন্ধে খ্রীষ্টের আদি ধর্ম্ম-সমাজ যে এই প্রকার গর্হিত ও অপমানজনক ধারণা পোষণ করিত ইহা বড় বড় পাণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। Meyrick লিখিয়াছেন যে "We cannot but notice even in the greatest of the christian fathers a lamentably low estimate of man." অর্থাৎ নারীর সম্বন্ধে অত্যন্ত নিম্ন ধারণা এমন কি প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকের মধ্যেও দৃষ্ট হইত।

মহাত্মা St Augustine ও নারীকে সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। তাঁহার মতে বিবাহের স্বার্থকতা সংসাধিত হয় কেবলমাত্র অপত্যোৎপাদন দ্বারা। নারী ও পুরুষের সাহচর্য্য, সহানুভূতি ও প্রেমে যে উভয়েরই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পরিপোষক হইতে পারে এ ধারণা তখন সমাজে জাগরূক হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম নারীর অবস্থার কতটুকু উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহা অবধারন করিবার জন্য নারী গ্রন্থকার Lily Braun লিখিয়াছেন যে মহাপ্রাণ যীশু সমাজে নারী ও পুরুষের যৌনপবিত্রতা রক্ষার সমান উপযোগিতা সম্বন্ধে একটুমাত্র ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। যখন এক ব্যভিচারিণী যীশুর সমক্ষে বিচারের জন্য আনীত হইয়াছিল তিনি সমাগত পুরুষদিগকে বলিয়াছিলেন—"Let him who is without Sin amongst you cast the first stone." Lily Braun বলেন যে

খৃষ্টধর্ম্ম নারী ও পুরুষের সাম্যবাদের দিক হইতে শুধু এটুকু করিয়াই থাক্ত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা বেশী আর সে কিছুই করে নাই। তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলিয়াছেন—"Christianity which women accepted as a deliverance with so much enthusiasm and died for as martyrs, has not fulfilled their hope." অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মকে নারীজাতি তাহাদের মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল সত্য এবং অনেক নারী ইহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছে কিন্তু ইহা নারীর সকল আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:o:—

বিগত ২৬শে মাঘ, শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী যে কেবল কোচবিহারের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহা নহে, সে দিবসের স্মৃতি চির-জাগরূক থাকিবে কোচবিহারবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে। নারীর জীবনসর্ব্বস্ব পতিকে বিদেশে অকালে বিসর্জ্জন দিয়া সদ্য বিধবা যৌবনে যোগিনী মাতা মহারাণী,—সে দিন পিতৃহারা সুকুমার মহারাজা ও মহারাজকুমারী সহ, স্বামীর লীলাভূমি বেহারে প্রত্যাবৃত হওয়ায়, মুক্তাত্মা মহারাজার পুণ্যস্মৃতিতে সর্ব্বজনকে যে তীব্র শোকে অভিভূত করিয়াছিল, প্রকৃতিপুঞ্জের, কর্ম্মচারীবৃন্দের অতিপ্রিয় নয়নানন্দকারী মহারাজের সুখ-সুপ্ত দেহের পরিবর্ত্তে তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মসম্ভার, সেই সঙ্গে আনীত হওয়ায় আশাহত প্রাণে শোকের যে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, তাহার বিলোপ সাধন করা কালের সাধ্য নাই। মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না—আমাদের মহারাজ এত সত্বর মহাপ্রস্থান করিয়াছেন! তিন মাসও অতীত হয় নাই, তিনি বিদেশে—বিলাতে গমন করেন; তাঁহার মধুর ব্যবহার, স্নেহ, অনুগ্রহ, কার্য্যকলাপ এখনও অধিবাসীবর্গের হৃদয়ে এমন জ্বলন্ত ভাবে

জাগ্রত,—রাজভক্তের প্রাণে যে স্থানের যেটী, তেমনি ভাবে সেইটি সজ্জিত,—প্রিয়জনের গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রসে সেগুলি আজও আমোদিত, বিভূষিত,—সমস্তই সেই ভাবে বিদ্যমান, অন্তর্হিত কেবল তিনি। অসহ্য অকস্মাৎ এই তিরোধান! মুক্তের অদৃশ্য স্নেহকরস্পর্শে, অনুভূতির আবেশে হৃদয়মন বিভোর অথচ তিনি দূরে, অতিদূরে,—পরপারে! তাঁহারই এই দেহাবশেষ! তবে কি তিনি নাই,—স্মরণে আসতেই কি নিদারুণ শোকে হৃদয় শতধা করিয়া দেয়! এইরূপ ভগ্ন প্রাণে শত শত শোকার্ত্ত সেদিন ষ্টেশনে সমাগত হইয়াছিল। অগণিত জনসমাগম অথচ কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলেই কাতর প্রাণে ভস্মাধারবাহী স্পেশাল ট্রেণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া, সকলেই মহারাজের শেষচিহ্ন দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব! সে ভস্মাধার দর্শনে অনার্দ্র ছিল কম নয়নই,—উপস্থিত অনেক ইংরাজ, পরদেশী পর্য্যন্ত অশ্রু প্লাবনে গণ্ড অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—সমবেত জনসাধারণের তৎকালীন মনভাব জমাট হইয়া এমনই মর্ম্মস্পর্শী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল! শোক-যাত্রার পুরভাগে রাজকীয় ব্যাণ্ডের ঐক্যতানিক বাদ্য রহিয়া রহিয়া শবানুগমনের হৃদয়বিদারী সুর নিক্কনে মনপ্রাণে বহিয়া আনিতেছিল শ্মশান-বৈরাগ্য—মহা ঔদাস্য! নব ভূপতি,—অতি সুকুমার শিশু আজ পিতৃহীন,—পিতৃব্যসহ নগ্নপদে পদব্রজে চলিয়াছেন,—পশ্চাতে তাঁহাদের পাট-হস্তী পৃষ্ঠে রাজোচিত আসনে মহারাজের ভস্মাধার! অসংখ্য জনসংঙ্ঘ নীরবে ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিতেছিল—সর্ব্বশেষে সংকীর্ত্তন,—শোক গাথায় হরিনাম মুখরিত করিয়া মহারাজার মুক্ত আত্মার কল্যাণ কামনায় হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা উৎসারিত হইতেছিল।

প্রশস্ত ময়দানে বৃহৎ পটমণ্ডপে রক্ষিত হইয়াছিল ভস্মাধার। কি আগ্রহে ভক্তিনত হৃদয়ে কোচবিহারবাসী দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রিয় মহারাজের শেষস্মৃতি ভস্মাবশেষ দর্শনে, তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ব্যাকুল হইয়াছিল, মুক্তের সহিত সংবদ্ধ হইবার আশায়, তাঁহার আত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যে সর্ব্বক্ষণ হরিণাম কীর্ত্তনে ব্যগ্র হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন কেহ তাঁহার কাছছাড়া হইতে চাহিতে ছিল না,—ভস্মাধার ঘেরিয়া সান্নিধ্য কল্প না করিয়া সকলে ভস্মাধার তাঁহার বারবার, পরিক্রমণ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই, প্রিয়ের বিরহ সকলকে এরূপই আকুল অভিভূত করিয়াছিল।

* * *

সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে পুনঃ ভস্মাধার গঙ্গাপ্রবাহে সমর্পিত হইবার উদ্দেশ্যে কাশীতে প্রেরিত হয়। কাশীই এই রাজবংশের মহাশ্মশান,—ইঁহার দেহাবশেষও সেই মহাশ্মশানে পূর্ব্বপুরুষসহ মিলিত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জ্ঞাতিগণ স্কন্ধে ভস্মাধার রেলষ্টেশনে নীত হয়—তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাম কীর্ত্তনের বিরাম ছিল না। সময় উপস্থিত,—রেলশকট মহারাজের শেষচিহ্ন বক্ষে লইয়া প্রস্থানোমুখ। মহারাণী যে ভস্ম—স্বামীর পার্থিব রজঃ—এ কয়দিন যাহা তিনি 'তাঁহার' বলিয়া গভীর আকর্ষণে আঁকড়িয়াছিলেন তাহাও বিলুপ্ত হইতে চলিল, তিনি স্বামীর সেই শেষচিহ্ন জন্মের শেষ দর্শন স্পর্শনের জন্য ষ্টেশনের কিয়ৎদূরে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী তথায় থামান হইল,—দর্শকের মনে মহা অতৃপ্তি হাহাকার উত্থিত করিয়া শকট অন্তর্হিত হইল, মহারাণীর তৎকালের মনের অবস্থা কল্পনা করিয়া জনসঙ্ঘ কাতরকণ্ঠে বার বার হরিধ্বনি করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে প্রয়াস পাইলেও নয়নের অশ্রু মিলাইল না—প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল। সে দৃশ্য কি হৃদিস্পর্শী!

* * *

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মহারাজের শ্রাদ্ধ—দানসাগর। রাজামহারাজার শ্রাদ্ধাদি যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন হয় সেরূপ ভাবেই সমস্ত এ ক্ষেত্রেও সম্পন্ন হইয়াছে। হস্তী, অশ্ব, গো, রৌপ্যকলস, রৌপ্যাধার, মহামূল্য কৌষিকবস্ত্র, শাল প্রভৃতি যথাশাস্ত্র উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। শিশু মহারাজা স্বয়ং এ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। (ইতিপূর্ব্বে এ সকল কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারাই সম্পন্ন করান হইত।) মহারাজের পিতৃব্য মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বক্ষণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সস্নেহ বাহুবেষ্টন বদ্ধ করিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ করিতে দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছিল। শিশু ক্লান্ত হইলেও প্রত্যেকটি দান উৎসর্গ যথাযথ সম্পন্ন করিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন নাই। অমঙ্গলের আবরণেও মঙ্গল অটুট ভাবে রক্ষা করেন যিনি—সেই শিবসুন্দর, শিশু-মহারাজকে জীবনে এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ সহিষ্ণু করিয়া দীর্ঘায়ু দানে কোচবিহারকে পুনঃ রামরাজ্যে পরিণত করুন—এই প্রার্থনা।

* * *

শোকার্ত্তা মাতা মহারাণীর এই মনকষ্টের সময়ে মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনাস্বরূপ ইন্দোরাধিপতি হোলকারের ভগিনী শ্রীযুক্তা সীতা দেবী মহারাণীর সহিত কোচবিহারে আগমন করিয়া বিশেষ ভাবে কোচবিহারবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি অতি বুদ্ধিমতী বিদুষী, শাস্ত্রজ্ঞা; শতমুখে সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহার সাহচর্য্যে শোক সন্তপ্তা মহারাণী প্রাণে শান্তিধারা বর্ষিত হউক!

'যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।'

বহু বাক্ বিতণ্ডার পর বঙ্গনারীকে অবশেষে নির্ব্বাচন অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে তাহার ব্যবস্থা করা হইল,—তাঁহারা এখন সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন। এ ব্যবস্থায় সকলে সুখী বা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন বলা যায় না; নারীর অধিকার দান ব্যাপারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাক্ বিতণ্ডায় তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। সভ্যগণের মধ্যে অর্দ্ধেক ছিলেন সপক্ষে অর্দ্ধেক বিপক্ষে, সভাপতি কটন সাহেব—তাঁহার ভোট নারীর পক্ষে দিয়া তাঁহার জাতীয় গৌরবের সহিত নারীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বঙ্গের জন সংখ্যার অর্দ্ধাধিক নারী, তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিলে, তাঁহারা পদে পদে উপেক্ষিতা হইলে, সমাজের কখনই মঙ্গল নাই, দক্ষিণ হস্তের গৌরব রক্ষা করিতে বাম হস্তের শক্তি একবারে অস্বীকার করিলে সমাজ দেহ সম্পূর্ণ অচল না হইলেও ক্রমেই যে ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য হইবে—তাহা সকলেই জানেন—কিন্তু অনেক জানিয়াও বুঝিতে চান না—সেটা কেবল আপনাদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার খাতিরে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। অতি দুঃখের বিষয়, আইন কানুন করিয়া, বাহিরের প্রভাবে, চাপ দিয়া ইহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া লইতে হয়, নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া আত্ম শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে ইহারা অপারগ। এইটি সমাজের প্রধান ব্যধি। প্রতিপদেই চাই পরের সাহায্য! আত্ম নির্ভরের ভাব যত দিন বঙ্গের উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততদিন এ সকল নির্ব্বাচন, অনির্ব্বাচন অধিকার স্বাধিকার প্রায় তুলাফল প্রসব করিবে! প্রথমে মহামতি রিপণের আমলে যখন পুরুষ এই স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভ করেন, তখন বঙ্গের যেরূপ উন্নতির আশায় সকলে

উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা তাহার কণিকা মাত্রও লাভ করিতে পারি নাই। 'বঙ্গে' উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব নাই, কিন্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে অসদুপায় উপস্থিত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, অভিলষিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই অনেক সৎকর্ম্মেই পরস্পরের সহায়তা সহানুভূতির অভাবে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে! বঙ্গের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যেই এই অবস্থা! মৌখিক উদারতার ত কথা হয় না—প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে কার্য্যক্ষেত্রে, তখন কেবল তুমুল বাকবিতণ্ডারই সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত—তাঁহাদের অর্দ্ধাঅর্দ্ধি নির্ব্বাচনের বিরোধী ইহাতে কি সূচিত হয়? হয় নারীর নির্ব্বাচন অধিকার দানের সময় আসে নাই নয়, শিক্ষিত লোকেরও অর্দ্ধেক অনুদার। সমাজের যেখানে এ অবস্থা সেখানে বড় বেশী আশা করিতে সাহস হয় না। পুরুষের বারো আনা যেখানে অশিক্ষিত, উপেক্ষিত, নারীর চৌদ্দ আনা যেখানে আত্মজ্ঞান বর্জ্জিত সে দেশে প্রথমে তাহাদের উন্নতির প্রকৃত ব্যবস্থা না হইলে দেশের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত!

এ অবস্থায় কতিপয় শিক্ষিতা নারীর হস্তে যদি শাসন সংরক্ষণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কোন অচিন্ত্য বিধানে প্রদত্ত হইত তাহা হইলেও দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত না,—আইন বলে প্রাণ জাগেনা—প্রাণ জাগ্রত না হইলে মনুষ্যত্বের অনুভূতি না হইলে, স্বাস্থ্যাদির জ্ঞান আপনার মধ্যে জাগ্রত না হইলে শক্তিপ্রয়োগে কোন সুফল লাভের আশা নাই। আইন অর্থেই পরের শক্তিপ্রয়োগ।

দেশের আত্মশক্তি জাগ্রত হউক। মাতৃশক্তি সর্ব্ব শক্তির মূলে, সন্তানের শিক্ষার আদি স্থান মাতা, সম্বল মাতা, তাঁহারা বুদ্ধি বিদ্যায় অনন্ত শক্তিতে অতুল প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হইলে—গৃহে গৃহে শক্তির সঞ্চারের ব্যবস্থা হইলে বঙ্গ স্বর্গে পরিণত হইবে।

মাতৃ জাতির অধিকার প্রসারে আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি আত্মহারা হই নাই—অনন্ত দায়িত্ব লইয়া যাঁহাদের জীবন—তাঁহাদের পক্ষে নির্ব্বাচন অধিকার বড় বেশী নয়,—সন্তানের আত্মরক্ষা—সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণে তাঁহাদের উপযুক্ত হইতে হইবে যে!

বঙ্গ ছারখার হইতে বসিয়াছে। যে অনুপাতে বঙ্গের মৃত্যু হার ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে,—এরূপ চলিলে বঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে—আর কত দিন! সে খোঁজ বাঙ্গলার কয়জন রাখেন? সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণীতে প্রকাশ—১৯২১ সনে হাজারকরা জন্মহার ২৮ মৃত্যুহার ৩০·১ অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা ২টী বেশী। বুঝুন ব্যাপার! এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু ১৮২০৯ টি কোন কোন জিলায় হাজারটির মধ্যে সাত শত শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশের মৃত্যুর কারণ ধনুষ্টঙ্কার বা প্রেতে পাওয়া ব্যাধি! এই ব্যাধির মূল কারণই আমাদের অজ্ঞতা—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত কম যে অনেক স্থলেই এই পীড়াকে ব্যাধি না বলিয়া শিশুকে ভুতে পাওয়া মনে করা হয় ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বঙ্গে আশা—বালকবালিকা অকালে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়! সুতিকাগারের অতি কুব্যবস্থা,—অশিক্ষিতা গ্রাম্যধাত্রীর অজ্ঞতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব—নানা প্রকার কুসংস্কার শিশুর অকাল মরণ ঘটাইয়া বঙ্গকে জনহীন করিতে বসিয়াছে। এদিকে দৃষ্টি না দিয়া বাহ্যিক উন্নতির চেষ্টায় কি ফল,—উদার নৈতিকগণই বুঝুন—কেবল বক্তৃতা,—কথা কাটাকাটি! মাতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য অনন্ত অফুরন্ত স্নেহ নিত্য বিরাজিত,—নারীজাতি শিশুর মঙ্গলের জন্য স্বভাবে সদা উন্মুখ—যাহাতে তাঁহাদের শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, যাহাতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে মাতৃত্ব গৌরবে উন্নত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে হওয়া আবশ্যক,—নতুবা শ্মশানে আর সখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠায় ফল কি!

বিধাতার বিধানে যাহারা এক—তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টিতে ফল নাই। অধিকার সাধিকারে ফল পরে হইবে—এখন চাই সাহচর্য্য,—নতুবা মৃত্যু নিশ্চয়! বঙ্গের এ মৃত্যুর কারণ কেবল অশিক্ষিতা মাতাও নয় ধাত্রীও নয়—আর শত সহস্র হেতুতে এ মৃত্যু বরণ! যে দেশের লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, পথ্য নাই,—জীবনে যাহারা মৃত্যুবৎ,—অহরহ যাহারা রোগে ভোগে—ম্যালেরিয়া,—প্লেগ বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিত্যহ অর্দ্ধাশন অনসন,—তাহাকে আর—রক্ষা করিবে কে! বাহিরের বাবুগিরী—কাঁচার বহর কমাইয়া নিজের দেশের বস্তুতে তুষ্ট হইতে না পারিলে—দেশের শিল্পী, দেশের অজ্ঞ কৃষককে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিয়া নিজের ও পরের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান না হইলে মৃত্যু এ জাতির অনিবার্য্য।

জন্ম অভিশপ্তা।

(সাহিত্য-ভারতী—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী প্রণীত।)

আজকাল উপন্যাসের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহার মধ্যে ভাবের বা শিক্ষার ছড়াছড়ি সেরূপ নাই। অলীক গল্প সমাহারকেই এখন আমরা সাদরে উপন্যাস বলিয়া বরণ করিয়া লই। নীতিশিক্ষা বিশিষ্ট বিষয় সমষ্টি হইতে হাস্যপরিহাসপূর্ণ নীতিবিহীন বিষয়গুলিই এখন সাধারণের প্রীতির সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। নীতিবিহীন গল্প বা উপন্যাসকে সৎসাহিত্য বলা যাইতে পারে না বা তাহার দ্বারা সাহিত্য সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। একদিকে পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখা সাহিত্যিকের যেমন প্রয়োজন অন্যদিকে তাহাদের মনোবৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন ও শিক্ষাদান বিষয়েও লেখক লেখিকাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিৎ।

যে পুস্তক পাঠে পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জন ও শিক্ষালাভ হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত মূল্যবান।

শিক্ষালাভ প্রধানতঃ দুইদিক্ দিয়া হইয়া থাকে। এক হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া আর এক দুঃখ দারিদ্র্যাদির মধ্যদিয়া। এই উভয় পথের শেষোক্তটীতেই আশুফল লাভ হইয়া থাকে।

হাস্যপরিহাসের ভিতর দিয়া অভাব, অভিযোগ, সুখ, দুঃখের বিবরণ যতটা জ্ঞাত হওয়া ক্রন্দনের ভিতর দিয়া তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করা যায়। মানুষ যখন আঘাত পায় তখনই সে বুঝিতে পারে আঘাতের যন্ত্রণা কত তীব্র।

"জন্ম অভিশপ্তার" অশ্রুধারার মধ্য দিয়া আজ সেই শিক্ষার বিকাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গললনাগণের নির্য্যাতন চিত্র লেখিকা যেরূপ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। আমার মনে হয় এই অশ্রুই "জন্ম অভিশপ্তা"র শ্রেষ্ঠ মূল্য।

পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার কাহিনী পরিস্ফুট হইয়াছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পুরুষ প্রকৃতই আজ নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারে অকুণ্ঠিত। কিন্তু সংযমের মূর্ত্তি, রমণী, আজও তার নারীত্ব তার ধর্ম্ম, তার উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া যায় নাই, লেখিকা জন্ম অভিশপ্তায় তাহা প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই ঘটনা—এই কাহিনী বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। ভারত একদিকে যেমন নারীত্বের খনি অন্যদিকে তেমনি বহু পশুরও আবাস স্থল। পল্লীর কোলে পলে পলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কত শত সহস্র রমণী পতির অন্যায় অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়াও পতি পূজায় পরাঙ্মুখ হন নাই ভারতে এ ঘটনার অভাব নাই। জন্ম অভিশপ্তায় তিনটী উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। একটী হীন পথাবলম্বী নীচমনা পুরুষের; একটী সতী সাধ্বী পবিত্র হৃদয়া সরলা রমণীর আর একটী সরলা গুরুভক্তি পরায়ণা বালিকার। এই তিনটী চরিত্রের প্রথম চরিত্রটী ঘৃণার্হ এবং শেষোক্ত চরিত্রদ্বয় আদর্শ স্থানীয় ও পূজার্হ।

"একদিকে পাপ পথচারী পুরুষের নির্ম্মম অত্যাচার আর একদিকে পতিব্রতা রমণীর অপূর্ব্ব আত্ম সংযম, অটল আত্মনিষ্ঠা অপূর্ব্ব আত্মজ্ঞান—অতুলনীয় সারল্য। প্রকৃতই ভারতে আজ এমন দিন আসিয়াছে যেদিনে আমরা শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি নারীর সম্মান ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহাদের উপর অন্যায় অত্যাচারে সঙ্কুচিত নই। গ্রন্থ কর্ত্রী "জন্ম অভিশপ্তা"র অশ্রুধারার মধ্য দিয়া আজ পুরুষকে পুরুষের ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর নারীকে? নারীকে তাহার উজ্জ্বল চিত্রের মাধুর্য্য, মূল্য, দেখাইয়া দিয়াছেন।

ভারতের শত সহস্র দুরবস্থাগ্রস্থ পরিবারের উৎপীড়ন কাহিনী আজ জন্ম অভিশপ্তার প্রত্যেক বিন্দু অশ্রুজলের মধ্যে প্রতিভাত। লেখিকা আজ এই উপন্যাসের অশ্রুধারার মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন—পুরুষ নারীর সারল্যমণ্ডিত পবিত্র জীবনকে কিরূপ বিপন্ন করিয়া তুলে।

আজ আমরা নারীর প্রতি এমনই অত্যাচার করিতেছি। এতদিন পরে লেখিকার জন্ম অভিশপ্তা পুরুষ সমাজকে অনুতপ্ত করিয়া যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হইলে নারীর দুঃখে বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ও কেবল নারীর দুঃখ মোচনের চেষ্টাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়

জগদ্ধাত্রী দেবী স্বামীর কত অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। কোনদিন বিরক্তির ভাব তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। শত অত্যাচার শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তিনি স্বামীকে কুপথ হইতে বিরত করিবার জন্য নীরব পন্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। এইখানেই তাঁহার নারীত্ব এইখানেই তাঁহার পতিপ্রাণতা। আর নারীর সহস্র অনুরোধেও যখন পুরুষ তাহার ভ্রম, তাহার অন্যায় বুঝিতে চেষ্টা করেনা সেই খানেই তাহার পশুত্বের চিত্র ফুটিয়া উঠে।

যে কল্পনার আশ্রয় লইয়া লেখিকা মনুষ্য সমাজের নরপশুদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও সফলকাম হইয়াছেন সেই কল্পনা কল্পনা বলিয়া আমার মনে হয়না। অনেক নির্য্যাতিত রমণীর আত্ম-সংযম, নারিত্ব এখনও ভারতকে সতী সাবিত্রীর দেশ বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। লেখিকাকে তাঁহার জন্ম অভিশপ্তার মূল্যস্বরূপ এই হেয় হতভাগের এক ফোঁটা অশ্রুজল উপহার দিতেছি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

মজ্জমান।

অলস দেহ শক্তি নাহি আর মুঠায়,
ভাসতে নারি আর যে ধরি ঘাস কুটায়।
এসো ভবপারের নেয়ে
এসো অভয় তরী বেয়ে
বাঁচাও বাঁচাও যাই যে ডুবে
লহরে শরীর লুটায়

(২)

ব্যাকুলতায় ধরি হে যায় সেই ডোবে
মরণ হাসে, মরছি হে মনঃক্ষোভে।
শিথিল দেহ অলস প্রাণে
চেতাও চরণ পরশ দানে
পাষাণ যাতে মানুষ করে
কাঁটাতে কুসুম ফুটায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গোঁড়ামি।

—:০:—

ধর্ম্মে সমাজে ও রাজনীতিতে সকল দেশেই এক শ্রেণীর মানুষের আচরণে এমন একটা বিশেষ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা অন্ধ সংস্কারের রূপান্তর মাত্র এবং যাহার সহিত যুক্তির কোনই সম্পর্ক নাই। এই মনোভাবটিকে আমরা গোঁড়ামি বলিয়া থাকি। মানব-মন সাধারণতঃ নানা সংস্কারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা এবং এই প্রাচীর ভেদ করিয়া নূতন কোন ভাবের মনোমধ্যে প্রবেশ প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সংস্কার মাত্রই যে খারাপ তাহা বলিতেছি না। তবে যখন মানুষ তাহার বদ্ধমূল সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নবভাব গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে তখন যে তাহার জ্ঞান বা সত্যলাভের পথে একটা ঘোর অন্তরায় উপস্থিত হয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার প্রকৃত মানসিক ও নৈতিক উন্নতিও হইতে পারে না। তাই, এই সংস্কারমূলক গোঁড়ামির প্রাচীর একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা সম্ভব না হইলেও তাহার মধ্যে ছিদ্র করিতে হইবে যাহাতে বাহিরের আলোক মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। মানুষের মনে যে যে কারণ হইতে মিথ্যা প্রশ্রয় লাভ করিতে পারে সেগুলিকে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ বেকন idols নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই idol গুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া না ফেলিলে যে সত্য দেবতার সন্ধান মিলিবে না এই কথা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জগতে যখনই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া নূতন জ্ঞান, সত্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনই তাঁহাকে মানুষের এই গোঁড়ামির সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং যতদিন না তিনি মানবমনের পুঞ্জীভূত অন্ধ-সংস্কারগুলি দূর করিতে পারিয়াছেন ততদিন প্রায়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর হাতে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে। শিক্ষিত পাঠকের নিকট উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপে চিরকাল নূতন জ্ঞান ও ধর্ম্মকে নির্য্যাতনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া মানুষের চিন্তারাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সেখানে জ্ঞান সম্বন্ধে গোঁড়ামির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে। এখন আর কোন রোজার বেকনকে শয়তানের সহচর বলিয়া উৎপীড়িত হইতে হয় না, কিংবা

কোন গ্যালিলিওকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া জ্ঞানপ্রচাররূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের গোঁড়ামি কতকটা শিথিল হইলেও এখনও বিলক্ষণ প্রবল রহিয়াছে। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিকল্প টল্‌ষ্টয় খ্রীষ্টধর্ম্মের সমস্ত অনুশাসনগুলি dogmas সম্পূর্ণরূপে মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এই মত তিনি স্বীয় রচনাবলীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে Excommunicate করা হইয়াছিল, এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পবিত্র দেহ গীর্জ্জাপ্রাঙ্গনে সমাহিত হইবার অধিকার পায় নাই। এতদিন পরে রুষিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই ঘোর অন্যায়ের প্রতিবিধান করিয়াছে। তাঁহার দেহ উত্তোলিত করিয়া মহাসম্মানে চার্চের মধ্যে সমাহিত করা হইয়াছে। ফ্রান্সেও এই ব্যাপার দেখি। সেখানে আনাতোল ফ্রাঁন্স আজ ভল্‌টেয়ারের ন্যায় নির্ভীকভাবে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার Revolt of Angels প্রভৃতি পুস্তক যিনি পড়িয়াছেন তিনিই ইহা অবগত আছেন। তাঁহার এই অপরাধের জন্য ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তিনিও Excommunicated হইয়াছেন, এবং তাঁহার পুস্তকগুলি পাপ ও অধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া প্রকাশ্যে পোড়ানো হইয়াছে।

আমাদের দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বড় বেশী উৎপীড়িত হয় নাই। কিন্তু এখানে আর এক ক্ষেত্রে—সমাজে—অতিরিক্ত গোঁড়ামি প্রকাশ পাইয়াছে; এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতি বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়াছে। কোন্ এক আদিম যুগে গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে জাতিভেদমূলক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ‘বর্ণ’ শব্দ হইতেই বুঝিতে পারা যায় তখন জাতিতে জাতিতে প্রকৃত পার্থক্য খুব বেশী ছিল। সুতরাং তখন জাতিভেদ এখনকার মত একটা অর্থহীন ভেদনীতি মাত্র ছিল না। তথাপি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহে এবং পরশুরামের ক্ষত্রিয় দ্বেষে পরস্পরের মধ্যে একটা বিলক্ষণ বিরোধের ভাব সূচিত হয়। তখনকার জাতিভেদ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাই যে অসবর্ণ বিবাহ সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এরূপ বিবাহ নিন্দিত হইত না, এবং অসবর্ণ পিতামাতার সন্তান পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত। ক্ষত্রিয় শান্তনু ও যযাতি যথাক্রমে ধীবরকন্যা সত্যবতী ও ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণ জরৎকারু অনার্য্য বাসুকীর ভগ্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় জাতিভেদ ছিল না। দ্রৌপদীর

স্বয়ম্বরে পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। সীতার স্বয়ম্বরে রাক্ষসরাজ রাবণ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই কথাগুলি আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করিবার সময় অসিয়াছে। আধুনিক হিন্দুসমাজে একদিকে যেমন জাতিতে জাতিতে গুণকর্ম্মগত পার্থক্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অপরদিকে তেমনই আবার এই মিথ্যা পার্থক্যকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া বিবাহাদিতে তাহা চিরস্থায়ী করিবার একটা বিপুল চেষ্টা হিন্দুর জাতিতে বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ গৌর অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বিষয়ক যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে যে কত প্রতিবাদসভা হইতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই। এই সকল সনাতন পন্থী হিন্দু ধুরন্ধরগণ মনে করেন যে জাতিভেদ নামক সুপ্রথাটির গায়ে যদি একটুও আঁচড় লাগে তাহা হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ রসাতলে যাইবে। অন্ধসংস্কারের দাস জগতে আর এমন কোথাও আছে কি? আমরা মুখে বলি যে আমরা শাস্ত্র মানিয়া চলি, এবং যখনই কোন সংস্কারের কথা উঠে, তখনই শাস্ত্রের প্রমাণ লইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিই বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা মানি একটিমাত্র শক্তিকে, তাহা হইতেছে লোকাচার। এই লোকাচারের সঙ্গে যুক্তি খাটে না, তর্ক চলে না। ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যকে এই লোকাচার পদদলিত করিতেছে, সনাতন ধ্বজাধারীগণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। দেশের প্রকৃত মঙ্গল কিসে সেদিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই, চারিদিকে যে কদাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা নাই, আছে কেবল অভ্রভেদী গোঁড়ামির প্রাচীর তুলিয়া সকল প্রকার নূতন ভাবের বন্যা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

হিন্দুর গোঁড়ামি খুব বেশী উৎকট ভাবে প্রকাশ পায় তাহার ছুৎমার্গ নামক সনাতন মার্গের বিধিনিষেধ গুলিতে। স্বামী বিবেকানন্দ বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম এখন আর বেদে নাই, বেদান্তে নাই উপনিষদে নাই, গীতায় নাই, আছে শুধু তাহার ভাতের হাঁড়িতে। পানভোজনে পদে পদে জাতি ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে যাহারা নিরন্তর নিম্নজাতি ও বিধর্ম্মীর স্পর্শ এড়াইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত তাহাদের মন কত অনুদার, তাহাদের প্রীতির গণ্ডী কত সঙ্কীর্ণ তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান কি ভয়ানক অসত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারে। তথাকথিত উচ্চজাতিগণের মধ্যের সামাজিক বা ব্যক্তিগত ক্রিয়া কলাপে এই সাধারণ

নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিবেন না, তা' সে দু'জনের মধ্যে যতই কেন বন্ধুত্ব থাকুক না এবং কায়স্থটি যতই কেন আদর্শ পুরুষ হউন না। কিন্তু এক অতি কদাচারী, ঘোর দুশ্চরিত্র পৈতাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ যদি রাঁধিয়া দেয় তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণেরই সে অন্ন আহার করিতে আপত্তি নাই। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্য বলিয়া যে সকল জাতি সমাজে কোণ ঠেসা হইয়া রহিয়াছে তাহাদের কথা ভাবিলেও আমাদের এই সুপবিত্র, সনাতন হিন্দুধর্ম্মটির মাহাত্ম্য বেশ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের বক্ষ হইতে দূর করিতে না পারিলে আমাদের স্বরাজ লাভের আশা সুদূরপরাহত! মহাত্মাজীর এই শিক্ষা স্বত্ত্বেও কি একজনও গোঁড়া হিন্দু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন?

স্ত্রীজাতির প্রতি আচরণেও আমরা যে এই চিরাগত অন্ধসংস্কারেরই দাসত্ব করিয়া আসিতেছি তাহা আর চোখে আঙুল দিয়া কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। নারীজাতি নাকি এতই অসার, তাহাদের চরিত্র নাকি এতই দুর্ব্বল যে ঘরের মধ্যে তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া না রাখিলে তাহারা ভ্রষ্টা হইয়া যাইবে। এই অর্গলবদ্ধ সতীত্বের মূল্য যে কতটুকু তাহা এই সনাতনপন্থী হিন্দুরাই বলিতে পারেন। আবার তাহারাই এই হিন্দু নারীকে জগতের মধ্যে আদর্শস্থানীয়া বলিয়া দেবী নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যের এই চমৎকার সামঞ্জস্যের দিকে যদি কেহ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইলে তখনই তাঁহারা যুক্তিটা একটু বদ্‌লাইয়া লইয়া বলিয়া থাকেন, 'হিন্দুনারী ত দেবী বটেই। তাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে? তবে কি না, পুরুষগুলা বড় বদ্, তাদের কলুষ দৃষ্টির অন্তরালে নারীদের রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।' আসল কথা যে তাহা নহে, হিন্দু সমাজের মনের ভাব যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা নারীর প্রতি প্রযুক্ত দুর্দ্দম বিধিনিষেধ গুলি হইতেই প্রমাণিত হয়। নির্জ্জলা একাদশী ও আমিষাহার পরিত্যাগ না করিলে বিধবা নাকি তাহার প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারিবে না। তথাপি, তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার কথা যদি কেহ বলে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। তখনই বিধবাকে আবার দেবীর পাদপীঠে উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইতে থাকে, 'এই দেখ আমাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী, তপঃক্লিষ্টা, মহিমময়ী নারী! তোমরা কিনা এই দেবীকে আবার

ভোগলালসার পথে টানিয়া আনিতে চাও! ধিক্ তোমাদের।' কিন্তু এই ধিক্কার যে প্রকৃত পক্ষে তাহাদেরই প্রাপ্য তাহা যদি গোঁড়ারা উপলব্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত।

হিন্দু জাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি দশবৎসরে লোক গণনায় ইহার সত্যতা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই অধঃপতনের গতিরোধ হইতে পারে শুধু আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের ঐকান্তিক চেষ্টায়। কারণ তাহা হইলে আমাদের সামাজিক অন্যায়, অসত্য ও অধর্ম্মগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইয়া উঠিব, যুক্তিহীন বিচার আর গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিবে না, অনিষ্টকর কুপ্রথাগুলির অচিরে উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর হইবে, এবং যাহা সাময়িক বা যুগবিশেষোপযোগী তাহাকে সনাতন আখ্যা দিয়া, যাহা চিরন্তন ও দেশকাল নিরপেক্ষ তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া হিন্দুত্বের অবমাননা করিব না। ভগবান যেন আমাদের এই মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের শক্তি দান করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মতি-মস্‌জিদস্থ দেউরীর পার্শ্ব।

জোহেরা ও লালকুমারী।

লালকুমারী। এই খানেইত ঠিক, জোহেরা।

জোহেরা। এই খানেই বিবি। এই যে এই কোণায় দাগ দিয়ে রেখে সাম্‌নে ঐখানে রুমাল ফেলে নিশানা রেখেছি।

লালকুমারী। কিন্তু শাহজাদা আস্‌বেন ত ঠিক।

জোহেরা। আসবেন, আসবেন বিবি, সবুর করো। এত অধীর হলে কেন?

লালকুমারী। এত অধীর হলুম কেন? জোহেরা নিরাশার বেদনা এসে মাঝে মাঝে হৃদয়টাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে যায়, বুক ফেটে কান্নার সুর বেরিয়ে পড়ে। গান গাইতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ি প্রাণের সাড়া পাই না। নৃত্যের মাঝে পা আর চল্‌তে চায় না—নুপুরের ঝঙ্কার হঠাৎ থেমে যায়—মনে হয় বৃথাই এ গান,—বৃথাই এ নৃত্য; এ-রূপ মিথ্যা, এ যৌবন মিথ্যা, যে রূপের পায় বাদশা'র কোহিনুর শোভিত পা লুটিয়ে পড়ে না, যে যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গে একটা বাদশা' তলিয়ে যায় না, সে রূপ বা যৌবনের কদর কি? কই এখনও ত এলেন না, তোরা কি আমায় নিয়ে সকলে খেলা করচিস, জোহেরা।

(হঠাৎ) ঐ যে জোহেরা। এই কি শাহজাদা জাহান্দার! এত রূপ! এত কান্তি।

জোহেরা। (দেখিবার অভিনয় করে) হাঁ, হাঁ বিবি ঠিক হ'য়ে দাঁড়াও। একটুখানি সাম্‌নে ঝুঁকে ঘাড়টা বেঁকিয়ে এইখানে দাঁড়াও—যেন চোখে চোখে দেখা হয়।

(জোহেরা ও লালকুমারীর প্রস্থান।)

জাহান্দার। একি স্বপ্ন, না মায়া! কি দেখলাম—কে এই হুরী? শরতের নির্ভাঁজ নীল আকাশে লঘু, স্বচ্ছ, শুভ্র মেঘখণ্ডের মত তড়িত পদে দিগন্তরালে এক নিমেষেই উধাও হ'য়ে গেল—বসন্তের বাতাসের মত আমার সমস্ত প্রাণ আবেশে ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

এত রূপ কখনও ত আমার চোখে পড়ে নাই; এ যে প্রভাতের অরুণাচলে উষার মত সুন্দর—প্রশান্তসাগর বক্ষে জোছ্‌না বিকাশের মত দীপ্ত; ফাল্গুনের কুঙ্কুম-রাগ-রঞ্জিত পরিপূর্ণ ধরার মত আপনাতে আপনি পূর্ণ ও উচ্ছলিত।

পিতার কাছে দিল্লির সিংহাসনকে তুচ্ছ বলেছি—কৈ এ রমণীকে আর তুচ্ছ বল্‌তে পারছি না। রূপে কি এতই নেশা... ....তাইত......মস্‌জিদে এসেছি নমাজ পড়্‌তে, একেবারে ওকথা ভুলে গেছি। ছিঃ, জাহান্দার এক ডুবে দশহাত জলের তলে নেবে পড়েছে?

(জাহান্দারের প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—নাসিরুদ্দিনের দরগা। কাল—অপরাহ্ন।

ফকীর নসিরুদ্দিন উপবিষ্ট।

লালকুমারী ও জোহেরা।

ফকীর নসিরুদ্দিন। মা, তোমার মঙ্গল হোক্, সকল কামনা পূর্ণ হোক্।

লালকুমারী। (চমকিত হ'য়ে) আমার সকল কামনাই কি পূর্ণ হবে ফকীরসাহেব?

ফকীর। খোদার কৃপায় তোমার সকল অভিলাষ, সকল বাসনা সার্থক হবে। মা দিল্লিশ্বরী হওয়াও যদি তোমার কামনা হয় তবে তুমি তাই হবে। আমার কথা মিথ্যা হবার নয়।

লালকুমারী। একি শুনলুম ফকীর সাহেব, আপনার কথা মিথ্যা হবার নয় তবুও কেমন যেন একটা আশঙ্কা, কেমন একটা ভয় হচ্ছে, যে কথা আজ আমি শুনলেম্ এ যেন জাগরণে শুনিনি—কে যেন স্বপ্নের মাঝে বীণায় তারে ঘা দিয়ে মিথ্যা ঝঙ্কারের সৃষ্টি করেছে।

ফকীর। মা, শান্ত হও, মন স্থির কর।

(জাহান্দারের প্রবেশ)

কে, শাহজাদা জাহান্দার?

জহান্দার। হাঁ—আচ্ছা বলুন দেখি, ধর্ম্ম বড় না সাম্রাজ্য বড়। একদিকে—ধর্ম্ম অপর দিকে এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য—যদি এ দুটোর ভেতর কোন একটীর মঙ্গল বেছে নিতে হয় তবে কোন্‌টাকে নিতে হবে খাঁ সাহেব?

নসিরুদ্দিন। এ প্রশ্নের মীমাংসা বড়ই কঠিন—কোন পথ শ্রেয় তা নির্দ্ধারণ করা বড়ই শক্ত।

জাহান্দার। পিতা মৃত্যুকালে আজীমকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে চান, এতে আমার কোনই ক্ষোভ নেই, কিন্তু একটা চিন্তা। আজীমের কাছে মুসলমান আর কাফেরে কোন তফাৎ নাই—সে সিংহাসনে বস্‌লে পর মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল হলেও হতে পারে বটে কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষতি যথেষ্টই হবে।

ফকীর। শাহজাদা! তুমি ভুল বুঝেছ সকল ধর্ম্মেরই মূলের কথা এক। তোমার নিজের ধর্ম্মকেই ভালবাস্‌লে অন্যের ধর্ম্মটাকে যে ঘৃণা কর্ত্তে হবে এর কোন কারণই নেই; আর তাতে কোরে নিজের ধর্ম্মটার ত কোন গৌরবই বাড়বে না, বরং ধর্ম্মের চিরন্তন সত্তাটাকেই অবমাননা করা হবে। সমদর্শী হতে পারলে সাম্রাজ্যের মঙ্গল, ধর্ম্মের গৌরব দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

জাহান্দার। (একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া) শীঘ্রই দিল্লী ছেড়ে চলে যাব। কোথায় যাব এখনও কিছু ঠিক্ করিনি। খোদার এই বিস্তৃত আকাশের তলে কত জায়গা পড়ে আছে, আমার কি কোথাও একটু স্থান হবে না, ফকীর সাহেব!

ফকীর। জাহান্দার, খোদা সকলকেই কৃপা ক'রে থাকেন। বোধহয় তুমি একটু স্থির হতে পেরেছ, মা। এঁকে চেন, মা? ইনি শাহজাদা জাহান্দার।

লাল্‌কুমারী। হাঁ, চিনি।

ফকীর। মা উচ্চাশা উন্নতির মূল হলেও তাতে প্রাণে শান্তি আসে না। শাহজাদা জাহান্দার, যদি সম্রাট হবার জন্য লালায়িত হত তবে আজ তাঁর হৃদয়ে কি বিপ্লবই বেধে যেত প্রাণে কি তুমুল ঝড়ই উঠ্‌ত। দেখ কি শান্তিতে আজ তাঁর প্রাণ পূর্ণ। সন্ধ্যা হয়ে এল ঐ দিনের আলো সূর্য্যাস্তের লোহিতরাগ ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে কি মধুর সন্ধ্যা, জগতের প্রাণে শান্তি ও মাধুর্য্য শতধারে ঢেলে দিক্। আমি মস্‌জিদে যাই।

(ফকীর সাহেবের প্রস্থান)

জাহান্দার। তুমি কি দিল্লীর সেই প্রসিদ্ধ বাইজী লালকুমারী যার সঙ্গীতে দিল্লী মুখরিত, যার রূপের আলোতে নগর আলোকিত?

লাল্‌কুমারী। কেন মিথ্যা প্রশংসার লজ্জা দিচ্ছেন শাহজাদা?

জাহান্দার। এ মিথ্যা প্রশংসা নয় লাল্‌কুমারী, এ তোমার যথার্থ পাওনা, আজ তোমায় দেখে বুঝেছি, কেন রূপে এত নেশা, কেন মানুষ এর জন্য পাগল হয়ে ছুটোছুটী করে বেড়ায়?

লাল্‌কুমারী। আপনি কেন দিল্লী ত্যাগ করে যাবেন?

জাহান্দার। সে কি তুমি বুঝ্‌বে? আমার সব বাঁধন একেবারে ছিঁড়ে গেছে—সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে চলেছি—আমায় তুমি বুঝ্‌বে না।

লাল্‌কুমারী। শাহজাদা, বাইরে হতে সকল জীবনই সুখের বলে মনে হয়, মাঠের ভেতর সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা-গাছগুলি দূর হতে চোখেই পড়ে না। সত্যি, বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে চলেছি, শাহজাদা—কিন্তু তৃষ্ণায় গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে জলটুকুও পাইনি। শাহজাদা, শুধু আপনি বল্‌বেন না আমার কিসের দুঃখ। কতদিন বাতায়ন পথে যেন কার প্রতিক্ষায় কাটিয়েছি—কতনিশি ফুলশয্যা আমার জাগরণে কণ্টক শয্যা হয়েছে—তারপর—একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে অতিথি আমার আস্‌ল হৃদয় দুয়ারে আঘাত করে সুপ্তির জড়িমা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁরি জন্যে পাতা অসনখানি জুড়ে বস্‌ল। কে সে অতিথি অ জ আমায় আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। শাহজাদা, দিল্লী ছেড়ে যাবার আগে এ দাসীর কুটীরে একবার দেখা দেবেন।

জাহান্দার। বেশ, তাই হবে লাল্‌কুমারী।

লাল্‌কুমারী। এ দয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

(জাহান্দারের প্রস্থান)

(জোহেরার প্রবেশ)

জোহেরা। কেমন, তোর আশা ত মিট্‌ল! এখন আমায় কি পুরস্কার দিবি বল্।

লাল্‌কুমারী। আজ তুই যা' চাইবি তাই তোকে দেব।

জোহেরা। আমি আর কিছু চাইনে—চিরকাল মনে রাখিস্ তবেই হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ, কাল—রাত্রি।

জুলফিকার ও হামিদের উভয়ের উভয় দিক হইতে প্রবেশ।

হামিদ। (প্রবেশ করিয়া) বন্দেগী জনাবালী!

জুলফিকার। কি, হামিদ! খবর কি?

হামিদ। খবর আর নূতন কিছু নেই—এদিকে কাজ ত প্রায় হাসিল।

জুলফিকার। সে কি?

হামিদ। হাঁ, কাজ একরকম হাসিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—এখন শুধু তীরে বসে ঢেউ গোণা—তবে জনাব! আমার পাওনাটা—ঐ যে যা বলেছিলেন (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) তা ভোলেন নি ত?

জুলফিকার। না হামিদ—ভুলি নি—জুলফিকার যা প্রতিজ্ঞা করে তা জীবনে কখনও ভোলে না। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির এখনও ঢের দেরী, এ কেবল জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক। যে দিন এ অভিনয় শেষ হয়ে যাবে (একটু কাছে আসিয়া নীম্নস্বরে) যে দিন শাহজাদা জাহান্দার দিল্লীর বাদশা হবেন...

হামিদ। (নিম্ন স্বরে) নামে বাদশা হবেন কিন্তু কার্য্যতঃ হবেন আপনি।

জুলফিকার। সে দিন বুঝলে, হামিদ্! তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা' পূরণ করব এক সুবার সুবাদার তুমি নিশ্চয়ই হবে।

হামিদ। কেয়াবাৎ, আর চাই কি?—আচ্ছা খাঁ সাহেব! নাটকের প্রথম অঙ্ক হতে শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই কি এক শৃঙ্খলের মত পরস্পর সুসমঞ্জস ভাবে গ্রথিত হয়?

জুলফিকার। হাঁ ঠিক তাই।

হামিদ। তবে আর চিন্তা কি যদি প্রথম অঙ্কেই হালটা শক্ত করে ধরে তার গতি যথাযথ নির্দ্দেশ করতে পারা যায় তবে—

জুলফিকার। হাঁ বুঝেছি, তুমি একটু ভুল করলে—একই প্রারম্ভের পরিণতি বিভিন্ন হ'তে পারে; সেই বিভিন্ন পরিণতি বিচিত্র অভিনব পথে সম্প্রাবিত হয়। হামিদ! এ জীবন-নাট্যের-গ্রন্থকার তুমি, তুমি এ'কে নূতন ঘটনার সৃষ্টি করে' যে ভাবে নিয়ে যাবে এ ঠিক সে ভাবেই শেষ হবে।

হামিদ। আমি খাঁ সাহেব! না আপনি?

জুলফিকার। আমিও আছি তবে তোমার সাহায্য ভিন্ন......

হামিদ। আপনার কোনও চিন্তা নাই জনাবালী—সে বাইজী যেমন রূপবতী তেমনই চতুর—তাতে আবার পূর্ব্ব হতেই সে উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তিনী।

জুলফিকার। হঁা। তার স্বার্থ দৃষ্টিই এই অভীষ্ট সাধনের সহায় হবে—(একটু চিন্তিত ভাবে)—কিন্তু……

হামিদ। কিন্তু, কি জনাব!

জুলফিকার। প্রথম দিনের পরিচয়েই বুঝেছি সে বাইজী কত বড় উচ্চাভিলাষিনী বুদ্ধিমতী।

হামিদ। সেও আমাদের পক্ষে সুবিধারই কথা তাতে আবার কিন্তু কেন?

জুলফিকার। আপাততঃ তাই, কিন্তু ভবিষ্যতে কি, জানি না—যদি তার উচ্চাভিলাষ একটা সম্রাটকে পদানত করেই ক্ষান্ত না হয়—যদি সে সাম্রাজ্ঞীর বিলাসিতায় তুষ্ট না হয়ে—নুরজাহানের মত—সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে।

হামিদ। অসম্ভব সামান্য একটা কসবী, শুধু বসনভূষণেও বিলাস সম্ভোগের যার তৃপ্তি……

জুলফিকার। তুমি তাকে বোঝনি, হামিদ!—যা হ'ক পরের ব্যবস্থা পরে হবে—এবার তোমায় যুদ্ধে যেতে হতে পারে।

হামিদ। (একটু চমকিত ভাবে) যুদ্ধে—?

জুলফিকার। এমন চমকে উঠ্‌লে যে?

হামিদ। এত বড় সুসংবাদটা আপনি হঠাৎ বলে ফেল্লেন কিনা।

জুলফিকার। (ঈষৎ হেসে) সুসংবাদ না দুঃসংবাদ, হামিদ!

হামিদ। তা যাই হ'ক কথাটা শুনেই মনে হল যেন একখানা খোলা তলোয়ার আমার চোখের সামনে ঘুরে গেল। কোথায় যেতে হবে?

জুলফিকার। বাংলার দিকে—শাহজাদা আজিম দশ সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তাকে বাধা দিতে হবে।

হামিদ। দশ হাজার বাঙ্গালী সৈন্য—পুরুষ সৈন্য নিশ্চয়।

জুলফিকার। সে আবার কি হামিদ!—অবগুণ্ঠনবতী, অন্তঃপুরিরতা বঙ্গনারীর সঙ্গে বোধ হয় তোমার কোনও পরিচয় নেই।

হামিদ। খুব আছে জনাবলী—আছে বলেই ত শাহজাদা আজীমকে দোষ দিচ্ছি—যদি দশহাজার বাঙ্গালী সৈন্য না নিয়ে এসে তিনি একশতজন বাঙ্গালী রমণীকে নিয়ে আসতেন তবে বিপক্ষ মোগল সৈন্যদের মধ্যে এক মহামরক উপস্থিত হত—সেই একশত নারীর দু'শত নয়ন হতে মুহুর্মুহু যে বিদ্যুৎবর্ষণ হত তা' অনলস্রাবী সহস্রাধিক কামানের চাইতেও দুর্বার হয়ে উঠত, শাণিত কুঠারের সামনে তরুণ গাছগুলির মত মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে ধারাশায়ী হ'ত।

জুলফিকার। বাংলাকে যখন তোমার এত ভয় তখন ঐ বাংলাতেই তোমাকে সুবাদার হতে হবে।

হামিদ। বাঃ, আমিও তাই চাই জনাব, প্রতিদিনে তবে সহস্রবার করে মরব আর সহস্রবার বাঁচব কি সুন্দর জীবন—প্রতিদিনই যেন একটা নূতন কবিতা।—আচ্ছা, যুদ্ধে যাওয়ার কথাটাই বল্লেন যুদ্ধ করতেও কি হবে—

জুলফিকার। হাঁ, নিশ্চয়:—

হামিদ। তবে একটা বড় রকমের ক্ষোভ থেকে যাবে—যদি যুদ্ধ করতেই হয় তবে ঐ কাপুরুষগুলোর সঙ্গে না করে বীর রাজপুতের সঙ্গে করলেই ভাল হ'ত, খরচ করে যে বিদ্যাটা শেখা হয়েছে তার ব্যবহার কিনা ঐ কাপুরুষগুলোকে কেটে করতে হবে।

জুলফিকার। হামিদ! বুদ্ধি থাকলে তলোয়ার একটীবার না ঘুরিয়েও যুদ্ধ জয় করা যায়—।

হামিদ। বেশ সে বুদ্ধিটাই শিখিয়ে দিন না কেন? যারা বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই আঁৎকে উঠবে তাদের কাছে বীরত্ব দেখান আর উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে দেওয়া একই কথা।

জুলফিকার। গিয়ে রুস্তম খাঁকে হাত করতে চেষ্টা করবে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা মূল্য আছে—সে মূল্যটা দিতে পারলেই তাকে কেনা যায়—বুঝলে

হামিদ। হাঁ বুঝেছি, আর বলতে হবে না—এ ছোট বিদ্যাই আপনার কাছ থেকে শেখা তার মধ্যে প্রথমটা তলোয়ার ঘোরানো আর দ্বিতীয়টা এই বহুমূল্য রণ-কৌশল—তরোয়ালে মরচে পড়ে গেছে বটে মগজে ত পড়ে—নি।

(জাহান্দার ও জাহানের প্রবেশ)

জুলফিকার। এই যে বন্দগী শাহজাদা

জাহান্দার। সেনাপতি নগরে ঘোষণা করে দিন জাহান দিল্লীর সম্রাট! নাগরিকেরা আজ রাত্রি দীপমালায় তাহাদের গৃহ সুশোভিত করুক আর কাল সন্ধ্যার সময় প্রতি মসজিদে মসজিদে নমাজ হবে।

জুলফিকার। প্রথম প্রচার কাজটা এখন স্থগিত রাখতে হবে, শাহজাদা

জাহান্দার। কেন, জুলফিকর খাঁ।

জুলফিকার। শাহজাদা আজিম যে সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছেন—আমাদের কর্ত্তব্য তাকে বাধা দেওয়া।

জাহান। ঠিক বলেছেন, সেনাপতি। প্রচার কার্য্য এখন স্থগিত রাখতে হবে। সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলুন—আমিই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব।

জুলফিকার। হামিদ, তুমি যাও—আমার আদেশ মত—দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হও।

হামিদ। যে আজ্ঞে— (কুর্ণিশ ও প্রস্থান)

জাহান্দার। বেশ হামিদ খাঁকে সঙ্গে করে জাহান তুমিই যাও। এ দিকে আমি তোমার অভিষেকের জন্য সব প্রস্তুত রাখব। জাহান, যুদ্ধই নিশ্চিত—ভাইএ ভাইএ যুদ্ধ—দুর্ব্বলতা ছাড়তেই হবে, ধর্ম্মই সব চাইতে বড়—তুমি ইসলাম ধর্ম্মের জন্যে যুদ্ধে যাও স্নেহ ভালবাসা, প্রীতি—সব বলি দিতে হবে—সাবধান মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সব নষ্ট করো না

(জাহানার ও জুলফিকারের প্রস্থান)

জাহান। আমি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি'—না, আমি শুধু জগতে একটা জিনিষ জানি সে আমার প্রেম। লয়লা! আমার প্রেমের উপহার ঐ—মোগোল সম্রাজ্য—তোমার জন্য যুদ্ধে জয় আনতে চলেছি।

জাহান। (স্বগত)—ধর্ম্ম! আমি কি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি? আমি শুধু জগতে একটা জিনিষ জানি সে আমার প্রেম। লয়লা! আমার প্রেমের উপহার—ঐ—মোগল সম্রাজ্য তোমার জন্য যুদ্ধে জয় করে আনতে চলেছি। সাগরের মত—অসীম, আকাশের মত অনন্ত আমর এই প্রেম—তার উপহার মোগল সম্রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়—তবু—।

পটনিক্ষেপ।

সপ্তম দৃশ্য।

লয়লা। কি জোৎস্নাই আজ উঠছে—সমস্ত আকাশ আলোর প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে তারাগুলি ডুবে কোথায় অতল হয়ে পড়ছে। সিয়ার বল্‌ছিল, বাঙ্‌লায় গিয়ে সে কেমন দেশ জানাবে—এতদিন হোয়ে গেল, কৈ সেত কিছু লিখ্‌ল না—হ্যাঁ সে আবার লিখ্‌বে শুনেছি ওদেশের মেয়েদের বিদ্যুৎ ভরা চোখের পানে তাকালে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় না—বুঝেছি তাই হবে—এরি মধ্যে ভুলে যাওয়া! সিয়ার, সিয়ার, যদি ভুলেই যাবে, তবে কেন তোমার প্রেমের নিঃশ্বাসে আমার উন্মুখ যৌবন মালঞ্চের সকল ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছিলে? তবে কেন তোমার বিভল নয়ন কিরণ স্পর্শে আমার সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করে, তাতে সাগরের জোয়ার বইয়ে দিলে? তুমি আমায় ভুলেছ, আমি কিন্তু তোমায় ভুল্‌বনা—তোমার সেই ভালবাসার স্মৃতির বাঁধন হতে মুক্তি আমি চাই না। জন্ম জন্ম ঐ রূপের আশা-ভরা সোহাগ—হাসিমাখা স্বপ্নের আলোয় ডুবে থাকি—সপ্নই এখন আমার সব, সে স্বপ্নেই কেন আমি বিভোর থাকিনা? —গান গাইতে বড় সাধ হচ্ছে, মানুষ সুখের দিনেও গায় আবার দুঃখের দিনেও গায়—আমার মনে হয়—গান দুঃখেরই ঠিক্ সাথী,—সুখের নয়।

(গীত)

গোপন ধীর চরণে এস অন্তরে মম
এস আলোক রথে বাতায়ন পথে নিলাজী জোৎস্না সম
আমার নীরব নিশীত রাতে
স্বপনে এস গো আঁখির পাতে
কুঙ্কুম এঁকে চুম্বন পাশে
অন্তরে মম ॥
এস গো বিরহে ভুবন ভরিয়া, নগ্ন অঙ্গ লহ আবরিয়া
এস কঙ্কন কনে যমুনা পুলিনে মনোরম এস মম।

(ধীরে ধীরে জাহানের প্রবেশ)

লয়লা। কে জাহান?

জাহান। হাঁ আমি লয়লা।

লয়লা। এসো, এতক্ষণ বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গান শুন্‌ছিলে?

জাহান। হাঁ শুন্‌ছিলাম, কোন অপরাধ হয়েছে কি?

লয়লা। হয়েছে বৈ কি? তুমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে আমার গান শুনেছ।

জাহান। চোর ত যেমন চুপি চুপি আসে তেম্‌নি চুপি চুপি চলে যায়—আমার মতন কি নিজের ইচ্ছায় ধরা দিতে আসে?

লয়লা। সে ত আরও ভাল। তুমি তবে চোর নও—তুমি ডাকাত!—এত রাত্তিরে যে এসেছ?

জাহান। দেখা করতে এসেছি, আমি দিন কয়েকের জন্য, দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছি।

লয়লা। কোথায় যাচ্ছ?

জাহান। বাঙ্‌লায়।

লয়লা। (একটু চমকিত হয়ে) বাঙ্‌লায়?

জাহান। (একটু হেসে হেসে) কেন বাঙ্‌লার নাম শুনে অমন চম্‌কে উঠ্‌লে যে? সে কি খুব বেশী দূরে লয়লা?

(লয়লার নীরবে অবস্থান)

আজ নগরে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, এ ক'দিনের সঞ্চিত গাঢ় অন্ধকার দূর করে দিয়ে, নগরী আবার দীপমালার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এত দিনের পর অনুমতি পেয়ে নাগরিকেরা আজ নিশি-উৎসবে উন্মত্ত। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, রূপের তরল-তরঙ্গে, সুরের তীব্র নেশায় লোকগুলি একেবারে দিশেহারা—পাগল। জগতের বীণার তারকে যেন কৌতুক দেখ্‌বার জন্য এক সুরে বেঁধে দিয়ে গেছে আনন্দের উল্লাসের সুর। সমস্ত জগতময় আজ একি বিদ্রূপের উৎসব।—লয়লা, শুধু তোমার গানেই আমি আজ আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পেয়েছি—তীব্র অথচ মধুর পাপিয়ার সুরের শেষ উচ্ছ্বাসটুকুর মত বুক যাওয়া আকুল মর্ম্মান্তিক বেদনাময় তোমার গান।

লয়লা। জাহান, আমারও একথা মনে হচ্ছিল—ঐ দেখ অন্তরের দুঃখটাকে উপহাস ক'রে জোছ্‌না কেমন হাস্‌ছে।

জাহান। লয়লা, কি বেদনা আজ তোমায় অধীর করেছে?

লয়লা। (একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া) সব কথাই কি সকলকে বলা যায়, জাহান—তোমার মনের কথা কি সকলকে বলে বেড়াও?

জাহান। জগতে আর সকলকে তুমি যে চোখে দেখ আমাকেও কি সে ভাবেই—একটুও বিশেষ নেই? লয়লা, এত কঠোর কথা তুমি এত শান্তভাবে যে বল্‌তে পার সে আমি ভাব্‌তেও পারি না।

লয়লা। জাহান ক্ষমা করো।!

জাহান। ক্ষমা করবো কাকে—তুমি যে আমার সকল ক্ষমার অনেক উর্দ্ধে। আজ এই সুনীল আকাশতলে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে—জীবনের সব চেয়ে পবিত্র আমার সব চাইতে গৌরের কথাগুলি বল্‌বার আর কোন শুভক্ষণ পাব কিনা জানিনা—দাঁড়িয়ে শোনো।

লয়লা। জাহান, একি পাগলের মত বক্‌ছ, আমি জানি তোমায় বল্‌তে হবে না।

জাহান। তুমি কতটুকু জান লয়লা!—

লয়লা। তবে আমি চললাম।

জাহান। ক্ষমা করো লয়লা, তোমায় যেতে হবেনা—আমিই যাচ্ছি—চাঁদের আলো আমায় মাতাল ক'রেছে।

(প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপন)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হোলি।

—:o:—

যত রাখাল বালক খেল্‌চে হোলি
ফুল্ল-মনে,—
দেখ ছুটল সেথা দাম বসুদাম
সংগোপনে !
ওগো ! সবার দেহ আবীর-রাঙা,
জড়িত-বচন পুলক-ভাঙা ;
মরি ! কালিন্দী ঐ লাল হ'ল গো
বৃন্দাবনে !
যত কিশোর প্রাণের ঝঙ্কারে আজ
ব্রজাঙ্গনে !
দেখ ললিতা ঐ ছুট্‌ল লয়ে
ফাগের থারি,—
ওগো সুবল দেছে রাইএর অঙ্গে
রঙের ঝারি !
আহা ! বিশাখা ঐ পড়্‌ল লুটে,
পিচকারী নে' শ্যাম যে ছুটে ;
মরি ! লাল হ'ল আজ গোঠের ধূলি
বৃন্দাবনে !
একি নূতন রসে মাত্‌ল সবাই
ব্রজাঙ্গনে !!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

স্বরলিপি।

—:o:—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।]

বাহার—কাওয়ালী।

স্থায়ী।

০ ১ ২´
মা মা II {মা পা পা পা | পধা পা মজ্ঞা জ্ঞা I মা ণধা -া না |
য ত রা খাল্ বা লক্ খেল্ চে হো লি ফু ল্ল ০ ম

৩ ৩ ০
| (র্সা -া মা মা)} | র্সা -া র্সা -া | {র্রা র্রা র্রা র্রা |
নে ০ 'য ত' নে ০ দে খ্ ছুট্ ল সে থা

১ ২´ ৩
| র্সা না র্সা র্সা I মা মাঃ -পঃ মা | (মা -া র্সা -না)} |
দাম্ বা সু দাম্ সং গো ০ প নে ০ 'দে খ্'

৩
| মা -া মা মা II
নে ০ "য ত"

অন্তরা।

০ ১ ২´
ধা ধা II {না না -া মা | র্সা -া -া -া I র্রা র্রা -া র্সনা |
ও গো স বা র্ দে হ ০ ০ ০ আ বী র্ রা০

৩ ০ ১
| র্সা -া -া -া | ণা ণা -া -া | ধা ধা -া -ণা I
ঙা ০ ০ ০ জ ড়ি ০ ত্ ব চ ০ ন

২´ ৩ ৩

I ধা না -া না | (র্সা -া ধা ধা)} | র্সা -া র্সা না |

পু ল কৃ ভা ঙা ০ 'ও গো' ঙা ০ ম রি

০ ১ ২´

| {র্সমা -মর্জ্ঞা র্মা -া | র্রা র্সা না র্সা I মা ণধা -া না |

কালি ন্দী অ ই লাল্ হ ল গো বৃ ন্দা ০ ব

৩ ৩ ০

| (র্সা -া র্সা না)} | র্সা -া র্সা না | {র্সা র্সা া ধা |

নে ০ 'ম রি' নে ০ য ত কি শোর্ ০ প্রা

১ ২´ ৩

| ণা পা মজ্ঞা মা I মা ণধা -া না | (র্সা -া র্সা না)} |

ণের্ ঝং কারে আজ্ ব্র জা ঙ্ গ নে ০ 'য ত'

৩

| র্সা -া মা মা II

নে ০ "য ত"

সঞ্চারী।

০ ১ ২´

সা -া II {মা মা মা মা | মা পা মা জ্ঞা I মা ণধা না -া |

দে থ্ ল লি তা ঐ ছুট্ ল ল য়ে ফা গের্ থা ০

৩ ৩ ০

| (র্সা -া সা -া)} | র্সা -া র্সা না | {র্সা র্রা র্রা র্রা |

রি ০ 'দে খ্' রি ০ ও গো সু বল্ দে ছে

১ ২´ ৩

| র্সা ণা ধা ণা I মা ণধা ধা -না | (র্সা -া র্সা না)} |

রাই এর্ অঙ্ গে ফা গের্ ঝা ০ রি ০ 'ও গো'

৩

| র্সা -া |

রি ০

আভোগ।

৩ ০ ১ ২´

ধা ধা | {না না র্সা র্সা | র্রা র্সা না র্সা I পা র্সা না র্সা |

আ হা বি শা খা ঐ পড়্ ল লু টে পিচ্ কা রী নে'

৩ ০ ১

| র্রা র্রা র্সনা র্সা | র্সা র্মা র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্মা র্রা র্সা I

শ্যাম্ যে ছু০ টে লাল্ হ ল আজ গো ঠের্ ধূ লি

২´ ৩

I মা ণধা -া না | (র্সা -া ধা ধা)} | র্সা -া র্সা না |

বৃ ন্দা ০ ব নে ০ 'আ হা' নে ০ ম রি

০ ১ ২´

| {র্সা র্মা র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্মা র্রা র্সা I মা ণধা -া না |

লাল্ হ ল আজ গো ঠের্ ধূ লি বৃ ন্দা ০ ব

৩ ৩ ০

| (র্সা -া র্সা না)} | র্সা -া র্সা না | {র্সা র্রা র্রা র্রা |

নে ০ 'ম রি' নে ০ এ কি নূ তন্ র সে

১ ২´ ৩

| র্সা না র্সা র্সা I পা ণধা -া না | (র্সা -া র্সা না)} |

মাত্ ল স বাই ব্র জা ঙ্ গ নে ০ 'এ কি'

৩

| র্সা -া মা মা II II

নে ০ "য ত"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ-দর্শন।

চার্ব্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের সাদৃশ্য যে যথেষ্ট সে কথা সকলেই জানেন। চার্ব্বাক ঈশ্বর মানেন না, বৌদ্ধ-দর্শনও ঈশ্বর মানে না। চার্ব্বাক আত্মা মানেন না, বৌদ্ধ-দর্শনও আত্মা মানে না। চার্ব্বাক জন্মান্তর মানেন না, বৌদ্ধ-দর্শন কর্ম্মান্তর মানে বটে কিন্তু জন্মান্তর দ্বারা চার্ব্বাক যাহা বুঝেন তাহা মানে না। বেদের উপর চার্ব্বাকের যেমন আস্থা নাই বৌদ্ধ দর্শনেরও তেমনই আস্থা নাই। ইহা হইতে যদি কেউ বলেন যে চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেব একই ব্যক্তি তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণ তাঁহার যুক্তির অসারতা দেখাইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবেন না, কারণ যুক্তিটির মধ্যে হেতু অর্থাৎ Middle termটি সমগ্র ভাবে (distri buted) লওয়া হয় নাই। যদি কেউ বলেন—

পাখীদের পা আছে।
মানুষেরও পা আছে॥
তাই মানুষ (হয়) পাখী ॥।

তাহা হইলে যে দোষ হইবে উপরোক্ত প্রমাণ বলে চার্ব্বাককে বুদ্ধ কিম্বা বুদ্ধকে চার্ব্বাক বলিলেও সেই দোষ হইবে। ঐতিহাসিকদের পক্ষ হইতেও আপত্তি হইবে যথেষ্ট। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও বিষয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। তিনি চার্ব্বাক হইলে নিশ্চয়ই চার্ব্বাক নামটা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে কাহাকেও বলিতে শুনা যাইত। আর তিনি যদি চার্ব্বাকের শিষ্যও হইতেন তাহা হইলেও গুরুর নামটা দুই একবার তিনি নিশ্চয়ই করিতেন। কিন্তু তাহাও বোধ হয় তিনি করেন নাই।

কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় বুদ্ধদেব চার্ব্বাক না হইলেও তিনি যে চার্ব্বাকের নিকট যথেষ্ট ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ করা অনুচিত। ধরিয়া লওয়া যাক্ বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের মত গ্রহণ করিয়া সেই মতটিকে অনেকটা বিশুদ্ধ করিয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহা হইলেই তিনি চার্ব্বাকের নাম করিতে যাইবেন কেন? তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম প্রচার, দর্শন প্রচার ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের নিকট চার্ব্বাকের অখ্যাতি এত বেশী ছিল যে

তিনি যদি চার্ব্বাকের নাম করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে বসিতেন তাহা হইলে একটি শিষ্যও বোধ হয় শুনিতেও আসিত না। আর যদি শিষ্য প্রশিষ্যদের নিকট কোনও ক্রমে যদি বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের নাম করিয়াও থাকেন তাহা হইলে যে তাঁহারা সেই অখ্যাতি-সম্পন্ন চার্ব্বাকের নাম বুদ্ধদেবের কথার সঙ্গে লিখিয়া রাখিবে বা বাঁচাইয়া রাখিবে ইহা সন্দেহজনক। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় ভক্ত শিষ্যগণ গুরু ও নেতার অখ্যাতিজনক কার্য্য ও কথা চাপা দিয়া ভাল কথা ও কার্য্যটুকুই প্রকাশ করেন। আরও দেখি প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার মনের কুবাসনা ও তাহার কুকার্য্য যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া আপনার ভাল কথা, কার্য্য ও দিকটা লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যায় না যে চার্ব্বাকের নিকট বুদ্ধদেব ঋণী নন, কিম্বা চার্ব্বাকের মতের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন না কিম্বা চার্ব্বাকের কথা তিনি কখনও শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে বলেন নাই।

চার্ব্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের যথার্থ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য চার্ব্বাক দর্শনের পরই বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত চার্ব্বাক দর্শনের কতখানি সাদৃশ্য তাহাই এখন একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কোন রকম প্রমাণ বলে বুদ্ধদেব ভগবানের বিশ্বাস খণ্ডন করিয়াছেন। দীঘ নিকায় অন্তর্গত তেবিজ্জ সূত্তে দেখিতে পাই বুদ্ধদেব বসেথকে কহিতেছেন—এমন কি কেউ আছেন যিনি ব্রহ্ম কোথায় থাকেন, কোথা হইতে তাঁহার জন্ম কিম্বা কোথা হইতে তিনি আসেন বা কোথায় তিনি যান—এই সকল কথা জানেন? যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেউ কিছু দেখেন নাই বা শুনেন নাই তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদের উক্তি একবারেই মিথ্যা। সুতরাং ব্রহ্ম অসিদ্ধ।

এখানে বুদ্ধ দেব প্রত্যক্ষবাদ মানিয়া লইয়াছেন। অনুমান প্রভৃতি প্রকারন্তরে অস্বীকার করিয়াছেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বা কেউ প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং ভগবান নাই। সেইরূপ যাহাকে দেখি নাই, যার কথা শুনি নাই বা যার বংশ পরিচয় ইত্যাদি জানি না তাহাকে যেমন ভালবাসা যায় না—তাহার সহিত মিলন যেমন অসম্ভব তেমনই ভগবানের

সঙ্গে মিলনও অসম্ভব—ভগবানের সহিত ভালবাসা বা প্রেম হওয়াও অসম্ভব। চার্ব্বাকও ভগবানের অনস্তিত্ব ঠিক এই ভাবেই প্রমাণ করেন।

মজ্ঝিমা নিকায় অন্তর্গত শুভাশুভ সুত্তে দেখিতে পাই এই সমস্ত চিন্তা বা প্রশ্ন দূষণীয়, আমার জন্মের পশ্চাতে যে অতীত বিস্তৃত রহিয়াছে সেই অতীত কালে আমি কি বাঁচিয়া ছিলাম না? যদি বাঁচিয়াই থাকি তবে কি হইয়াই বা বাঁচিয়া ছিলাম? কোন অবস্থাতেই বা ছিলাম? সুখেই ছিলাম না দুঃখে ছিলাম? কেনই বা আমার ঐরকম অবস্থা হইয়াছিল? মৃত্যুর পরেও কি আমি বাঁচিয়া থাকিব? বাঁচিয়া থাকিলে সুখেই থাকিব না দুঃখে থাকিব? কিসের জন্যই বা আমার ঐরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে?

বুদ্ধ দেব বলিবেন এই সকল প্রশ্ন ভ্রান্তিপূর্ণ কারণ আত্মাই নাই তার আবার জন্মান্তর থাকিবে কি করিয়া? যদি বলি "আত্মা নাই" জানেন কি করিয়া? তিনি বলিবেন—এ পর্য্যন্ত কেউ আত্মাকে দেখিয়াছে কি যে আত্মাকে স্বীকার করিব সুতরাং আত্মা ও জন্মান্তর প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং তাহারা অসত্য। চার্ব্বাক যুক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের মতের এখানে কোন প্রভেদ নাই। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহার অস্তিত্ব চার্ব্বাকও মানেন না বুদ্ধদেবও মানেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৌদ্ধদর্শন ও চার্ব্বাক দর্শন একই প্রকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধবাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—যে হেতুর সহিত ব্যাপ্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমরা পাইতে পারি তাহা বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে একত্ব ও কার্য্য কারণত্বের যে কোনটী অবলম্বন করিয়া ব্যভিচার রহিত (exceptionless) অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাওয়া যায়। যথা—অগ্নির সহিত ধূমের কার্য্য কারণত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, কারণ (১) অগ্নির পূর্ব্বে ধূম দেখিতে পাওয়া যায় না; অর্থাৎ যখনই ধূম দেখি না কেন তখনই একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব তাহার পূর্ব্বে অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অগ্নি ও ধূমের সহিত অনুবর্ত্তিতা বা Succession রহিয়াছে। (২) দ্বিতীয়তঃ যখনই আমরা অগ্নি দেখি তখনই আমরা ধূম দেখিতে পাই, অর্থাৎ এমন কোনও অগ্নি নাই যাহার সহিত ধূম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অগ্নির সহিত ধূমের যে অনুবর্ত্তিতা তাহা ব্যাভিচার রহিত বা invariable. (৩) তৃতীয়তঃ যখন ধূম আর দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ ধূম যখন থাকে না তখন অগ্নিও দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৌদ্ধ নানা কারণবাদ অর্থাৎ Plurality of causes একেবারেই মানেন না। ধূম কেবলমাত্র অগ্নিদ্বারাই হইতে পারে অন্য কিছু দ্বারা হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ কার্য্য কারণত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে কারণ বর্ত্তমান থাকিলেই কার্য্য হইবে, সুতরাং এই কার্য্যকে ঘটাইতে কারণকে অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিতে হয় না। বিড়ালটি যখন গৃহে প্রবেশ করে তাহার লেজটিও যেমন বিড়ালটির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনই কারণটি উপস্থিত হইলেই কার্য্য ঘটিয়া পড়ে। সুতরাং বৌদ্ধগণ কারণের unconditionality বা অনন্য-পরতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল ইউরোপীয় ন্যায় শাস্ত্রে (Logic) কার্য্য কারণত্বের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাহাই প্রকারান্তরে দিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধগণ আরও বলেন যে একত্বের বলে আমরা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাইতে পারি। যথা, শিশুগাছ (হয়) একটা গাছ। যেখানেই আমরা শিশুগাছ দেখি না কেন সেখানেই আমরা একটি বৃক্ষ দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশুগাছের সহিত বৃক্ষত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ ব্যাভিচাররহিত। বৌদ্ধগণ আরও বলিতে পারিতেন ত্রিভুজের মধ্যস্থিত তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান কিম্বা ২+২=৪ সকল অবস্থাতেই সত্য।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এই সকল যুক্তি যে বুদ্ধদেব নিজে প্রদর্শন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। পালি পিটকে এই সকল যুক্তি পাওয়া যায় কি না তাহা সুধীগণ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবেন। আমার ধারণা এই যে এই সকল যুক্তি বৌদ্ধগণ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ব্রাহ্মণ্য দর্শনের সহিত লড়াই করিতে নামিয়া নিজ নিজ মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি করিয়া তথাগতের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। পালি পিটক পড়িলে খুব স্পষ্ট ভাবেই চোখে পড়ে বুদ্ধদেব এক প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ ব্যবহার করেন নাই বা মানেন নাই।

এ সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এ সমস্ত যুক্তির যুক্তিসঙ্গত উত্তর যে চার্ব্বাক দিতে না পারেন তাহা নহে। চার্ব্বাক বলিবেন কার্য্য কারণত্ব ও একত্ব যতখানি প্রত্যক্ষ করি ততখানিই সত্য বলিয়া মানি। এবং এই প্রত্যক্ষ যদি অনুমিত কার্য্য কারণত্বের ও

একত্বের পশ্চাতে না থাকিত তবে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম না। ধূম ও অগ্নির কার্য্য কারণত্ব যদি না দেখিতাম তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণত্ব সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম না। যদি শিশুকে গাছ বলিয়া প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একত্ব মানিতাম না। সুতরাং আমরা কোথায় কার্য্য কারণত্ব বা একত্ব মানিব? যেখানে আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিব। হিউম প্রভৃতি বৈদেশিক দার্শনিকের ন্যায় চার্ব্বাকও যে অনেক সারবান যুক্তি দেখাইতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রমাণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ও চার্ব্বাকের একমত।

আমরা দেখিয়াছি চার্ব্বাক আত্মা বলিয়া কিছুই মানেন না। বুদ্ধদেবও আত্মা বলিয়া কিছুই মানেন না। জন্মান্তর সম্বন্ধেও চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেবের একমত। আত্মাই যদি না রহিল জন্মান্তরই বা কেমন করিয়া সমর্থন করা যায়? সুতরাং ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে দেহই আত্মা হইয়া পড়ে আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাস শেষ হইয়া যায়। এইখানে বুদ্ধদেব একটু অগ্রসর হইয়া বলেন—সকলই ধ্বংস হইয়া যায় বটে কিন্তু কর্ম্ম রহিয়া যায়। যাহারা আমার মৃত্যুর সময় বাঁচিয়া থাকিবে এবং যাহারা ভবিষ্যতে জন্মিবে তাহারা এই কর্ম্মের সু ও কু, এই উভয়বিধ ফলই ভোগ করিবে। Rhys Davids বলেন "There is no transmigration of Souls in Gotama's teaching. His real theory is a transfer of karma. * * * *. In no case is there any future life in the Christian sense. At a man's death, nothing survives but the effect of his actions; and the good that he has done, though it lives after him, will redound, not to his own benefit as we would call it, but to the benefit of generations yet unborn, between himself and whom there will be no consciousness of idintity in any shape or way." (Hibbert Lectures, 108-109) অর্থাৎ বুদ্ধদেব কখনও জন্মান্তর বাদ শিক্ষা দেন নাই। তিনি দিয়াছেন কর্ম্মান্তর বাদ। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে ভাবে ভবিষ্যৎ জীবন বা ঐহিক জীবনের পর পারত্রিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন সে ভাবের ভবিষ্যৎ জীবন বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ মতে মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তাহার

সুকর্ম্মের ফল যদিও তাহার মৃত্যুর পর রহিয়া যায় তথাপি নিজে সে কর্ম্মফল দ্বারা উপকৃত হয় না। ভবিষ্যতে যাহারা জন্মিবে তাহারাই ঐ কর্ম্মফল ভোগ করিবে। কিন্তু ইহাদের সহিত সেই মৃত ব্যক্তির কোন প্রকারের একত্ব থাকিবেনা। এবং উহাদের মনে কোনরূপ একত্ব জ্ঞানও থাকিবে না। সুতরাং বুঝা গেল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গেল। যে কর্ম্মটুকু রহিল তাহার উপর মৃতব্যক্তির কোনই অধিকার রহিল না। চার্ব্বাক এই জটীল কর্ম্মান্তর বাদের অবতারণা করিয়া সহজ ভাবে বলিয়াছেন দেহই আত্মা আর দেহ ধ্বংশের পর কিছুই থাকে না। মনে করুন একটি লোক ঘর বাড়ী টাকা পয়সা রাখিয়া জীবন শেষ করিল তখন এই সকল ঘরবাড়ী ইত্যাদি চার্ব্বাকের মতে কে ভোগ করিবে? চার্ব্বাক নিশ্চয়ই বলিবেন পুত্র পৌত্রাদি এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মিবে। দুষ্ট ব্যাধি গ্রস্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার ব্যাধির ফল কে ভোগ করিবে? চার্ব্বাক নিশ্চয়ই বলিবেন তাহার স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মিবে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে মৃত্যুর কিছু না থাকা বিশ্বাস করিলে এই কর্ম্মান্তরবাদ মানিতে হয়। কারণ এই কর্ম্মান্তর চিরদিনই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি।

উপনিষদের মূল সূত্র যেমন আত্মবাদ বৌদ্ধ দর্শনের মূল সূত্রও তেমনই অনাত্মবাদ। উপনিষদ জরা ও মৃত্যু রহিত পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত আত্মাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধ দর্শন তেমনই পরিবর্ত্তনশীল ঘটনানিচয়কেই কেবলমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। রিস ডেভিড (Rhys Davids) উপনিষদ ও বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"It (Buddhism) swept away from the field of vision the whole of the great soul theory which had hitherto so completely filled and dominated the mind of the superstitious and of the thoughtful alike. (Hibbrt Lectures, 1881, P. 29). অর্থাৎ যে আত্মবাদ কুসংস্কারসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের মনপ্রাণ এতকাল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং যে আত্মবাদ দ্বারা তাহাদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইত সেই আত্মবাদকে বৌদ্ধদর্শন জ্ঞানরাজ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছিল। অর্হৎ হইতে গেলে যে দুইটি বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হয় তাহা নিত্যবাদ ও

আত্মবাদ। "• • the very first of the Sangyojanas, the fetters which the disciple has to break on the way to Arhatship is also the doctrine of individuality (Atto-vada)"—Hibbert Lertures, 1881, p. 208. অর্হত্বকামী শিষ্যকে অনিচ্ছন্ন এবং অনাত্মসন্ন হইতে হয় অর্থাৎ নিত্যতায় অবিশ্বাসী এবং আত্মায় অবিশ্বাসী হইতে হয়। সুতরাং বুঝা গেল চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেবের আত্মা সম্বন্ধে একই মত।

আত্মা সম্বন্ধে চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গিয়াছেন বুদ্ধদেবও তাহাই বলেন। দীঘনিকায় অন্তর্গত তেবিজ্জ সূত্তে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—"Just as, when a string of blind men are clinging one to the other, neither can the formost see, nor can the hindermost see—just even so, methinks, Vasettha, is the talk of the Brahmans, versed though they are in the three Vedas, but blind talks. The first sees not, neither does his teacher see, nor does his pupil. The talk, then of these Brahmans, versed in the three Vedas, turns out to be ridiculous, mere words, a vain and empty things." (H. L. Page. 59.)

একদল অন্ধ যখন পরস্পর ধরাধরি করিয়া চলিতে থাকে তখন যেমন সর্ব্বাগ্রের ব্যক্তিটি দেখিতে পায় না, মধ্যস্থিত ব্যক্তিটিও দেখে না এবং সর্ব্বপশ্চাতের ব্যক্তিটিও যেমন দেখে না তদ্রূপ, হে বাসেথ্থ, তিন বেদে (অথর্ব্ব বেদ তখন বেদ বলিয়া গণ্য হইত না) অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উক্তি অন্ধবাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথম ব্রাহ্মণটিও কিছু জানে না, তাহার শিক্ষকও কিছু জানে না, তাহার শিষ্যও কিছু জানে না। সুতরাং ত্রিবেদ অভিজ্ঞ এই সকল ব্রাহ্মণের উক্তি হাস্যকর, সারশূন্য এবং মূল্য বিহীন বাক্যসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বৈদিক যাগ যজ্ঞ উপাসনা মন্ত্র ইত্যাদির যে কোন মূল্য নাই বুদ্ধদেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। রাপ্তি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া যদি শত সহস্র বার কাকুতি মিনতি করিয়া বলা যায়—"হে রাপ্তি, তোমার অপর তীরকে এপারে লইয়া আস", তবুও অপর তীর এপারে চলিয়া আসিবে না। তেমনই, ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, মহিদ্ধি ও যমকে বৈদিক ছন্দে বৈদিক যজ্ঞ করিয়া, শত সহস্র প্রকারে তাহাদের যশোগান করিয়া আহ্বান

করিলে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া চাহিবেন না। বুদ্ধদেব বলে, যদি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁহারা যেন যাগ যজ্ঞ মন্ত্র তন্ত্র উপাসনা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং অপকর্ম্ম অর্থাৎ পাপ ও অন্যায় পরিত্যাগ করেন।

বুদ্ধদেব আরও বলেন যে ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মের মিলন অসম্ভব। ব্রাহ্মণদের পত্নী ও সম্পত্তি থাকে, অথচ, ব্রহ্মের ঐ সকল কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণ ক্রোধ, দ্বেষ, পাপ ও ইন্দ্রিয় বশীভূত অথচ ব্রহ্ম ক্রোধ, দ্বেষ ও ইন্দ্রিয় শূন্য। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মের মিলন একেবারেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাঁহারা সদ্ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে থাকেন তাঁহারা দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হন। সেই জন্য বুদ্ধদেব তেবিজ্জ সূত্তে বলিয়াছেন,—"Therefore is it that the threefold wisdom of the Brahmans, wise in the Vedas, is called a waterless desert, their theefold wisdom is called a pathless jungle, their threefold wisdom is called their destruction"—H. L. 1881—P. 63. অর্থাৎ বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ত্রৈমুখী বুদ্ধি জলহীন মরুর ন্যায় এবং পথশূন্য অরণ্যের ন্যায়, এবং তাহার ফল তাহাদের ধ্বংস।

সুতরাং বুঝা গেল চার্ব্বাকের মত বুদ্ধদেবও বেদ অগ্রাহ্য এবং বেদ অসত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

জাতিবর্ণ সম্বন্ধেও বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের সহিত এক মত। চার্ব্বাকের মত বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানেন না। মজ্ঝিমা নিকায় অন্তর্গত অস্মলায়ান সূত্তে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অপনোদন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণ অন্যান্য জাতীয় রমণীগণের ন্যায় প্রসব বেদনা ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণা একই ভাবে ভোগ করেন। ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ যেমন অন্যান্য জাতীয় গাত্রবর্ণ অপেক্ষা গৌর তদ্রূপ বর্ণবিভিন্নতা আফ্‌গানীস্থানে ও ব্যাকট্রিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে দাসও সময় সময় প্রভু হইয়া পড়ে আবার প্রভুও দাস হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল দেশে দাস চিরকাল দাস-ই রহিয়া যায় না, আর প্রভুও চিরকাল প্রভু-ই রহিয়া যায় না। ঐ সকল দেশে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করি এই ভারতবর্ষেও তাহাই প্রত্যক্ষ করিব কেন? সুতরাং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সত্য নহে। বুদ্ধদেব

আরও বলেন যদি কোনও শূদ্র, বৈশ্য অথবা ক্ষত্রিয় নরহত্যা করে, চুরি করে, মিথ্যা কথা কহে, মিথ্যা দুর্নাম রটায় ও দুর্নীতি পরায়ন হয় তাব মৃত্যুর পর সে দুঃখ-কষ্ট-পূর্ণ অবস্থা লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, আর ব্রাহ্মণ যদি এই সকল অপকর্ম্ম করে তবে তাহাকেও দুঃখ কষ্টপূর্ণ অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। [এখানে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কথা বলিতেছেন।] তাহা যদি হইল তবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কোথায়? ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র একই ভাবে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইতে ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে একই ভাবে সমর্থ হয়। বুদ্ধদেব আরও বলেন যে অশ্ব ও গর্দ্দভের মিলনে খচ্চর জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এই খচ্চর অশ্ব ও গর্দ্দভ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু, ব্রাহ্মণের সহিত অপর জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের মিলনে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান পিতা মাতার প্রকৃতি বিশিষ্টই হয় বিভিন্ন প্রকারের হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায় ব্রাহ্মণ অপর কোন জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ নহে।

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধদেব বুঝাইয়াছেন যে সকল জাতিই সমান। জন্ম কিম্বা বর্ণের জন্য কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। সদ্ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা, বিশুদ্ধ স্বভাব দ্বারা এবং কুঅভ্যাস ও কু-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে।

সুতরাং বুঝা গেল বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের মতই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানেন না।

আত্মাই যদি না রহিল, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি জীবনের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল তখন স্বর্গ নরক কবির কল্পনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মৃত্যুর পর আত্মা যেখানে সুখ-ভোগ করে তাহাই স্বর্গ, আর মৃত্যুর পর আত্মা যেখানে দুঃখ বা শাস্তি ভোগ করে তাহাই নরক। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদী, সুতরাং তাঁহার স্বর্গ নরকে বিশ্বাস নাই। স্বর্গ নরক বলিতে যাহা কিছু তাহা বৌদ্ধ মতে ইহসংসারে অর্থাৎ এক জন্মেই আমরা ভোগ করি। স্বর্গকামী ব্যক্তিদিগকে বুদ্ধ বলেন—Very good; you want to go to heaven. It is really a mistake. Arahatship is better than heaven, and the Arahats are above all gods. But still, if you cannot comprehend that, then at least understand that the only way to heaven is not ritual, but righteousness. (Hibbert Lectures—P. 104).

অর্থাৎ তুমি স্বর্গে যেতে চাও—বেশ ভাল কথা। তবে, সত্য করে বলতে গেলে এটা তোমার ভ্রম অর্হত্ব স্বর্গের চেয়ে ভাল, অর্হতেরা দেবতাদের উপরে। তবে তুমি যদি তা' বুঝতে না পার, তবে মনে রেখো যে স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সদ্ধর্ম্ম আচরণ। যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি করে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব।—এই হইল প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের উক্তি। অর্ব্বাচিন বৌদ্ধ ধর্ম্মে আমরা স্বর্গ নরক ও জন্মান্তরের কথা এত শুনি যে আমাদের মনে হয় অর্ব্বাচিন বৌদ্ধগণ এই সকল বিশ্বাস করিতেন।

চার্ব্বাক মত ও বৌদ্ধ মতের এতখানি সাদৃশ্য থাকা সত্বেও বুদ্ধকে চার্ব্বাকপন্থী বলিতে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করিবেন। বুদ্ধই চার্ব্বাক আর চার্ব্বাকই বুদ্ধ একথা বলিলে অনেকেই খড়্গহস্ত হইবেন। কুণ্ঠা বোধ করিবার ও খড়্গহস্ত হইবার কারণও আছে। কারণ, আমরা জানি চার্ব্বাক ইন্দ্রিয় সুখবাদ প্রচার করিয়াছেন আর বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ বাদ বা অর্হত্ব বাদ ও সদ্ধর্ম্মাচরণবাদ প্রচার করিয়াছেন। চার্ব্বাক মতে সুখ সম্ভোগই মানবজীবনের ধর্ম্ম আর বুদ্ধদেবের মতে সদাচরণই মানবধর্ম্ম। চার্ব্বাক সুখ বলিতে ইন্দ্রিয় সুখ বুঝেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া তৃষ্ণার বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ইচ্ছা করেন যদি কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক এই বিভিন্নতাটুকুর অনস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মত উপায় প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে বুদ্ধদেবই যে চার্ব্বাক কিম্বা চার্ব্বাকপন্থী তাহা সাব্যস্ত করা কতকটা সম্ভবপর হয়। গুরু শিষ্য পার্থক্য থাকা আশ্চর্য্য নয়। প্লেটো আরিষ্টটলেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং হইতে পারে বুদ্ধদেব চার্ব্বাকমত গ্রহণ করিয়া সেই মতকে অনেকটা সংশোধিত করিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়া ছিলেন। ইয়োরোপীয় নীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে আমরা ইন্দ্রিয়জাত সুখবাদ ও বিশুদ্ধ সুখবাদ দেখিতে পাই। চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেব সম্ভবত ঐ প্রকার দুইটী সুখবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে বৌদ্ধমতকে বিশুদ্ধ সুখবাদ বলিতে অনেক আপত্তি করিতে পারেন। তাঁহারা যদি ভাবিয়া দেখেন যে বুদ্ধদেবের মূল অভিপ্রায় মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা তাহা হইলে আর সে সন্দেহ থাকিবে না। দুঃখ দূর হইলে মানুষের যে অবস্থা আসিয়া দাঁড়ায় তাহাকে সুখের অবস্থা বলা যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থায় দুঃখশূন্য অবস্থার নাম সুখ-পূর্ণ অবস্থা। এতখানি মানিলে যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে চাহেন তাঁহাকে সুখবাদী বলা অসঙ্গত হয় না। সুতরাং বুদ্ধদেবও সুখবাদী চার্ব্বাকও সুখবাদী। তবে বুদ্ধদেবের সুখ-কল্পনা

চার্ব্বাকের সুখ কল্পনা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। আজ এইখানে এ প্রবন্ধের শেষ করিলাম। সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বুদ্ধদেবকে চার্ব্বাকপন্থী বলা সঙ্গত কিনা। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা যেন বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখেন বুদ্ধদেবই চার্ব্বাক কিনা।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

আঁখি।

—:0:—

কে বলে রে আঁখি? ও যে মনের দর্পণ,
ঐ দুটি কালো তারা ও যে অমৃতের ধারা
অসীমে সসীমে বাঁধে সেতুর মতন!
হাসি? সে ত মণি হয়ে ওরই বুকে দোলে
ও কালো অতল থির সুধার সাগর-নীর
পূজার কমল ফোটে ওরই কোলে কোলে!
করুণার ছবি ও যে ব্যথিত-শরণ
অনুরাগ রাখানিতে কে আছে এ অবনীতে
প্রেমের জনম ও যে প্রেমের মরণ!

কে বলে রে আঁখি? ও যে রূপের সাগর
কবি ওরই ধ্যানে ভুলি চিত্রকর টানে তুলি
প্রেমিক সে জানে ও যে সুধাসরোবর!
কোথা বা সীমানা ওর কোথা ওর কূল
রূপের পিপাসী যারা খুঁজে খুঁজে দিশাহারা
মাটির প্রতিমা পরে স্বরগের ফুল!

ও যে ভাষাহারা কথা কহে নিরন্তর
অভিধান কোন্ ছার জ্ঞানী সে যে মানে হার
গুণী সে অবাক্ শুনি সঙ্গীত অমর!

কে বলে রে আঁখি? ও যে ইন্দ্রিয়ের রবি
অন্ধ এই অন্ধকূপে দুইটি দুয়ার রূপে
দেখাইছে অন্তরের আনন্দের ছবি!
ও যে বহুরূপী শুধু নহে ত নয়ন
দয়া প্রেম স্নেহ ক্ষমা গোপনে করিছে জমা
স্বরগের ফুলগুলি করিয়া চয়ন!
চিন্ময় স্বরূপে ও যে দিতে জানে কায়া
অনন্তের প্রেম পানে ডুবিতে মজিতে প্রাণে
ধ্যানে ও আঁকিতে জানে অনন্তের ছায়া!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নদীতে নামিয়া বহু 'বাছাবাছি'র পর পছন্দমত একটি স্থান খুঁজিয়া পাইলাম। স্থানটিতে বালাসনের খর জলস্রোত প্রকাণ্ড এক শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবৃহৎ ঘুর্ণিপাকের সৃষ্টি করিয়াছিল, চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম অথচ গাম্ভীর্য্যময়। কিছুদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ মদন থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া "নৃসিংহাবতার" film এর কোন ছবিতে এরূপ এক জলস্রোত মধ্যবর্ত্তী শিলাখণ্ডে তপস্যারত বালক প্রহ্লাদকে আসীন

দেখিয়াছিলাম। স্থানটি দেখিয়া এরূপ প্রীত হইয়াছিলাম যে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও শিলাখণ্ডের উপরে গিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। "বেশ হইয়াছে বলিয়া," ফটোগ্রাফার বাবু Focus করিতে যাইয়া হতাশভাবে কহিয়া উঠিলেন "বাদলে বিগারেও"—সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি উপর হইতে জমাট্ বাঁধা কুয়াসা আসিয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতেছে। শ্রাবণ মাসে ছবি তুলিতে যাওয়াই মূর্খতার কার্য্য বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া উভয়েই ক্ষুণ্ণমনে হইয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

নামসু হইতে কার্শিয়াং চড়াই পথে ছয় মাইল মাত্র কিন্তু নামসুর নিম্নে বালাসন নদীর উপরে পারাপারের জন্য "ফাড়কে" বাঁশের যে একটি অস্থায়ী পুল ছিল সেটী স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে শিংবালী পুল হইয়া ঘুরাপথে যাত্রা করিতে হইল। সঙ্গের লোকজনদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতদূর ঘুরিতে অসম্মত হইয়া ঐ স্থানেই নদী পার হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, কিন্তু আমি কোন ক্রমেই তাহাদিগের এরূপ দুঃসাহসিক প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ বর্ষাকালে পার্ব্বত্যনদীগুলির স্রোতবেগ এত প্রবল প্রখর হয় যে পদব্রজে সামান্য একটি ক্ষুদ্র জলস্রোতও পার হওয়া বিপজ্জনক। পর্ব্বতশীর্ষে বারিবর্ষণ হওয়ায় মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই উপর হইতে কর্দ্দমাক্ত জলস্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া প্রস্তরময় সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া ভীষণ বেগে নিম্নদিকে ধাবিত হয়। নদীর তৎকালে কি প্রচণ্ড মূর্ত্তি ও গভীর গর্জ্জন! স্বতঃই হৃদয়ে ত্রাস ভীতির সঞ্চার করে। সে জন্যই সঙ্গীগণকে সেই মূঢ়জনোচিত কল্পনা ত্যাগ করিয়া আমাদের অনুগমন করিতে উপদেশ দিলাম।

মারমা চা বাগানের মধ্য দিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বুংকুং-বস্তিতে আসিয়া পঁহুছিলাম। বস্তির মধ্য দিয়া একটি সরু অপরিসর (এক পায়ে রাস্তা) পথ দিয়া কোন ক্রমে অশ্বারোহণে পুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; পথের উভয় পার্শ্বস্থ বড় এলাচি গাছগুলি দেহস্পর্শ করিতেছিল। বড় এলাচি গাছের সহিত শটী গাছের বিশেষ সাদৃশ্য আছে তবে এলাচি গাছগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা, গাছের পাতাগুলি ঈষৎ কৃষ্ণাভ সবুজ এবং ডাঁটাগুলি কালচে লাল, গাছের গোড়ায় অঙ্কুরের মত লাল লাল বড় এলাচিগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহযুক্ত ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁত্‌ সেঁতে জমিতে বড়

এলাচির আবাদ হয়। পূর্ব্বে এলাচির আবাদ খুব লাভজনক ছিল—এলাচির জমির খাজনাও অন্যান্য জমির অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজস্ব বেশী অথচ বাজার মন্দা বলিয়া চাষারা আর পূর্ব্বের মত এলাচি আবাদের জন্য যত্ন ও শ্রম স্বীকার করে না, ফলে এলাচির আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাজারে নূতন এলাচি দেখা দিলেই মাড়োয়ারী "বাবুগণ" এক্ষযোগে প্রচুর পরিমাণ এলাচি ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখেন, পরে উহা ত্রিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে কলিকাতায় চালান দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকেন।

এলাচি ক্ষেতের কিঞ্চিৎ দূরে নদীর যে অংশে উভয় পার সমান উচ্চ এবং বিস্তার অতি অল্প সেই স্থানে যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত স্থূল লৌহরজ্জু সাহায্যে নদীর উপরে একটি লৌহ সেতু (Iron suspension bridge) অতি দক্ষতার সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ষাভিন্ন অন্যান্য সময়ে লোকজন কোথাও হাঁটিয়া কোথাও বা অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত করিয়া নদী পারাপার হইয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে ঐরূপ ভাবে পারাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া সরকার হইতে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী ও ঝরণার উপরে এরূপ ঝুলান লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সিংবালী পুল পার হইয়া আমবুটিয়া ও কয়েকটি চাবাগানের মধ্য দিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর সম্মুখে পাংখাবাড়ী রোডে আসিয়া উঠিলাম। সাহেবের বাংলোর পশ্চাদ্ভাগে উন্মুক্ত তরাইএর মনোরম দৃশ্য, বামে দক্ষিণে মুক্ত প্রান্তর, সম্মুখ দিকে কার্শিয়াং টাউনটি বেশ স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীটির পশ্চাদ্দিক্ দেখিলে মনে হয় যেন কেহ তরাইএর সমতলক্ষেত্র হইতে একটি দেওয়াল গাঁথিয়া তুলিয়া বাড়ীখানিকে সুন্দর ভাবে তাহার উপর বসাইয়া দিয়াছে. চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও সত্যসত্যই অতীব নয়নমনমুগ্ধকর। সাহেবদিগের গোরস্থান, কাছারী ক্লাব ঘর, গির্জ্জা প্রভৃতি দেখিতে রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ৩নং ঊর্দ্ধগামী যাত্রী গাড়ীখানি আসিবার বিলম্ব আছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ ও চা পান করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম এমন সময় জনৈক বন্ধু আমাকে দেখিতে পাইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর আগ্রহাতিশয্যে সেদিনকার মত দার্জ্জিলিং যাত্রা স্থগিত রাখিয়া তথায় রাত্রিবাস করিতে স্বীকৃত হইলাম। হিলকার্টরোড

হইতে পুলিষ আউট্‌পোষ্টের পিছন দিক দিয়া একটি বাঁধা রাস্তা চড়াই পথে "ডাওহিল" পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই প্যাটার্‌সন্‌ রোডের বামপার্শ্বে কাকিনা রাজবাটীর বিপরীত দিকে সুন্দর একখানা দোতালা বাড়ী ভাড়া লইয়া বন্ধু বাস করিতেছিলেন। বাড়ীর দোতালার বারান্দা হইতে উত্তরদিকে ঘুম পাহাড় হইতে সুদূর টামলিং, পশ্চিমে সুকীয়া পোখরি মিরিক পাহাড়ও তন্নিম্নে অবস্থিত সমতল তরাইএর দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। বাটীখানির চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি ভুটীয়া ও লিম্বুরাই প্রভৃতি জাতীয় লোকের বাস।

ইহার মধ্যে জনৈক লিম্বুজাতীয় ব্যক্তির গৃহ সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ বংশ দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার গায় মন্ত্র লেখা একখানি বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দিয়া ২।৩ জন গেরুয়া আলখেল্লাধারী মুণ্ডিত মস্তক পুরোহিত গ্রহশান্তি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বংশ দণ্ডটির নিকটে রেকাবীতে করিয়া কিঞ্চিৎ মাংস ও কয়েক বোতল মদ্য রক্ষা করিয়া গৃহ-স্বামিনী পুত্র কন্যার সহিত উত্তমবেশে সজ্জিত হইয়া বসিয়াছিল এবং পুরোহিতগণের সহিত মাঝে মাঝে বংশ দণ্ডটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ললাটে ভূমিস্পর্শ করতঃ প্রণাম করিতেছিল। পুরোহিত-গণ কখন "নমাজ" পড়ার মত উঠা বসা করিতেছিলেন কখন বা ঝাঁজ ও গম্ভীর আওয়াজ যুক্ত ঢাক বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন।

দীর্ঘ পথশ্রমের পর রাত্রিতে একটু শান্তিতে নিদ্রা সুখ উপভোগ করিব আশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ গ্রহশান্তি ব্যাপার নিশা সমাগমে এরূপ গুরুতর রূপ ধারণ করিল যে ঘন ঘন মন্ত্রোচ্চারণ ঝাঁজের তীব্র "ঝাঁন্‌ ঝান্‌" আওয়াজ এবং ঢাকের গম্ভীর "ধুম্‌ ধুম্‌" শব্দে কার সাধ্য চক্ষু মুদ্রিত করে! প্রাতে চা-পান কালে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা ভাই, তুমি এখানে থাক কি করে, এরূপ ঘন ঘন গ্রহশান্তি কি লেগেই রয়েছে আর কি?"

তদুত্তরে তিনি হাসিয়া কহিলেন "সারা রাত্রি ঘুমুতে পার নি বুঝি! প্রথম প্রথম আমারও বড় বিরক্তি বোধ হ'ত কিন্তু এখন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছি আর আগের মত তেমন অসুবিধা বোধ করি না। বেশী ঘন ঘন অবশ্য হয় না, কিন্তু কা'রও ব্যারাম পীড়া হ'লে তখন এক নাগাড়ে প্রায় দু'তিন দিন পর্য্যন্ত এ দিক্‌দারি সহ্য ক'রতে হয়। এদের পুরোত এই "বিজুয়া" গুলো এমনি বারমাস লোকের বাড়ী বাড়ী যেয়ে নেচে গান শুনিয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, কিন্তু কারও ব্যারাম পীড়া হ'লে তখন ভারী মাতব্বরের মত এসে ভূত তাড়াতে বসে যায়—

দে'খ্‌ছ না পূজার ঘটা কি? আবার যেমনি দেবতা, তেমনি পূজারী, দু'য়ের কেউ অসন্তুষ্ট হলেই বিপদ। এদের বিশ্বাস যে "বিজুয়া" যদি বাড়ী থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায় বা কোন কারণে কুপিত হ'য়ে শাপ দেয় তা'হলেই গৃহস্বামীর ভিটের ঘুঘু চ'ড়্‌বে। সুতরাং এরাও একপ্রকার অপদেবতা বিশেষ। এদের পুরো'তও আবার "বইদাং, ফেদাং, দামি, বিজু" প্রভৃতি অনেক রকমের আছে, কেউ বা ভূত ঝেড়ে ব্যাম সারায়, কেউ বা মন্ত্র পড়ে, গণা পড়া করে, ভূত আনিয়ে আশীর্ব্বাদ করায় কেউ বা ভূত চালান দেয়, কেউ বা ভূত নামায়। যা কিছু অশুভ ঘটে সমস্তই এরা দুষ্ট যোনির কার্য্য অথবা কোন দেবতা বিশেষের ক্রোধজনিত মনে করে, এবং এ জন্যই কথায় কথায় এরূপ গ্রহশান্তির ব্যবস্থা। আমাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ ঠাকুররা আগের কালে যজ্ঞান্ন খেয়েই কাল কাটাতেন একটা বিশেষ কোন পেশা ছিল না, পরে ভবিষ্যতের সংস্থান জন্য এই যত সব "চুণ্ডোই পুজা, কুলোই পুজা, পঞ্চমী চতুর্দ্দশী" প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে সকল ব্যাপারেই ঠাকুরদের প্রাপ্তি, এও বোধ হয় ঠিক তাই কেবল পেশাহীন লামাগণের উপজীবিকার সংস্থান জন্য পদে পদে আপদ শান্তির ব্যবস্থা। আমি উত্তর করিলাম যে তবু ত এই রকম বিশ্বাস থাকার জন্য লোকগুলো গ্রহশান্তি আপদ শান্তি ক'রেই মনে মনে কতটা শান্তি বোধ করে হয়ত অনেক সময় মনের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাম পীড়াও ভাল হয়ে যায়। "Mesmerism" ক'রে ব্যারাম সারায় একথা যদি বিশ্বাস কর তবে এটাও ত এক রকম Mesmerism! আর নাস্তিক হওয়ার চেয়ে আস্তিক হওয়া ভাল, কারণ আস্তিক নৌকার নঙ্গরের মত একটা কিছু ধরে থাকে এবং আপদে বিপদে সে সেই আশ্রয়ের আশায় নাস্তিকের মত এলিয়ে পড়ে না। নাস্তিকের পরিণাম বড়ই শোচনীয় কারণ তার কাছে "Life a nothing god a nothing" জীবনটাও কিছুনা, ঈশ্বরও কিছু না, পরে সে নিজেও একটা "কিছু না"তে পরিণত হয়ে এই সংসার সমুদ্রে শুধু হাবু ডুবু খেতে থাকে When these drive the distracted human unit to make of himself a nothing, temporary insanity covers up his plunge into the infinite with an untruthful pleasantness", আবার হয় ত মরণের তীরে দাঁড়িয়ে চঞ্চল ব্যাকুল চিত্তে বলে উঠে "Oh God! if there is any, God, bless my Soul, if there is any Soul" সারাটা জীবন তর্ক করে সকল উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে

সে কর্ণধারবিহীন তরণীর মত একবার এদিক ওদিক করতে থাকে কিন্তু কোন দিকই তার ভাগ্যে হয় না। বিশ্বাস ভিন্ন ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া, অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ,,। এরা যা হয় একটা বিশ্বাস নিয়ে আছে, সেই বিশ্বাসের বলে মনে করে যে এ গ্রহ শান্তি করলে এ দুঃখ সারে, ও ভূত পুজা করলে বিপদ কাটে। "সকল দর্শনকারেরই মতে সংসার দুঃখের আলয় এবং সকল দর্শনই দুঃখবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।" যখন ইহাতে দুঃখ দূরের ব্যবস্থা আছে তখন এদের ভুতুড়ে শাস্ত্রটাকে একটা দর্শন মনে করলে আপত্তি কি—"নিঃশ্রেয়সম্ আত্যান্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ?" তবে একথা স্বীকার করি যে এদের প্রণালী ঠিক সত্য নির্ণয়ের প্রণালী নহে এবং এরা ভ্রান্ত পথে চল্‌ছ, কিন্তু তাই বলে সব ছেড়ে ছুঁড়ে না দিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে ঘুরলে কোন না কোন সময়ে এরা আলোচনা ও চর্চ্চার ফলে সত্য পথ খুঁজে পাবে।" বন্ধু হাসিয়া কহিলেন "তা হলে সত্য পথ কাকে বলে? তোমার মতে যেটা সত্য পথ, অন্যে হয়ত সেটা সত্য পথ স্বীকার করবে না, আবার তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রদর্শিত পথটাকে উড়িয়ে দেবে! সুতরাং কোনটাকে সত্য পথ বলবে "কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুং পুরুষং পুরুষমতি বৈরূপ্যাৎ,,।

আমি বলিলাম "তা ভাল কথা, কোনটা ঠিক তারই যদি ঠিক না থাকে, তবে যার যা আছে তার তাই নিয়ে থাকা ভাল এরটা খারাপ তারটা খারাপ এও বলা অনুচিত। গীতায় আছে স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ। সকলেরই এই মহাবাক্য মেনে চলা উচিত।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

পণপ্রথা।

১

কোথা থেকে পড়ল্ কখন
শনির এ বিষদৃষ্টি,—
শ্যামল দেশের বুকটা জুড়ে
ঝরে আগুন-বৃষ্টি।
রাহু যে আজ শ্বাসে শ্বাসে
তুলুচে চাঁদে আপন-গ্রাসে,
রুদ্রেরি কি জ্বল্‌ল নয়ন
করতে বিলোপ সৃষ্টি ?

২

নিশ্বাসে যার মানুষ মরে
সে গাছ মেলে পাতা;
আকাশ ব্যেপে পাপের সৌধ
উঠায় জোরে মাথা।
দিতে কোমল-প্রাণে ব্যথা
কে গড়েছে এ পণ প্রথা,
সমাজ-স্বর্গে এনেছে কে
নরকজ্বালার রিষ্টি ?

শ্রীচণ্ডী চরণ মিত্র।

ও-পারের মেয়ে।

—:o:—

ছেলে বেলা থেকে আমি ঐ রকম। যেখানে বসে পড়তাম সেইখানে আমার সারা দুপুরটি কেটে সন্ধ্যা হয়ে আসতো; মাথার সুঁথি গাছের গোড়ায় রাঙা চোখে ঢুলে পড়তো, তবু আমার সাড় ভাঙতো না। মা বকতেন, বাবা পড়ার জন্যে মেরে মেরে হাড় কালি করতেন, স্কুলে যমদূতের দোসর মাষ্টারের দল আমার সোজা করবার আশায় কোন শাস্তিই বাকি রাখে নি। ঘরে ভয়, বাইরে ভয়, তাড়না লাঞ্ছনার অবধি নেই। তবু কি আমার এ রোগ গেল ?

তোমরা সংসার কর, গণ্ডগোল কর, ছুটোছুটি হাসি কান্নায় কতই না সুখ পাও। আমিও তা কিছু কিছু পাই, আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ; আমারও তো মন-পাখী ডানা মেলে সুখের সন্ধানে উড়ে যায়, ভাব-সমুদ্দুর হৃদয়-আকাশে আশার ভানু দেখে ফুলে ফেঁপে উথলে ওঠে, প্রাণ-যমুনা আকুল টানে উজান বয়। কিন্তু তোমাদের মত আমার একটা জগৎ নিয়েই তো কারবার নয়। একটা নিয়ে তোমরা উদ্বাস্ত, আমার যে কতগুলো ?

তবে শোন। শুনলে তো তোমরা বলবে এ আমার কল্পনা, এ আমার পাগল খেয়ালের দিবা স্বপ্ন। কিন্তু সজ্ঞানে জাগা চোখে দিনের পর দিন যা দেখি, আমার অন্তর সোপান দিয়ে নেমে এসে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় যারা এমন করে আমার আপন সে মিথ্যে তা' বলি কি করে ? তোমার তারা, মায়ের আদর কি মিথ্যে ? তোমার বিয়ের দিনের সানাই রসনচৌকী লোক লস্কর কি মিথ্যে ? আমার খোকার মরা মুখ, তাই বুকে করে আমার আফিস করা, কি মিথ্যে ? তোমার কোলজোড়া মাণিক, তার আধ আধ বুলি, সে কি মিথ্যে ?

(২)

আমার সে জগৎও যে ঠিক এমনি সত্যিকার দেখা জিনিস, এর চেয়েও, বে উজ্জ্বল, প্রকট সহজ, জাগ্রত। সে সৃষ্টি এলে এ সবুজ ঘাসপালা এ আকাশ বাতাস কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে যায়, সূর্য্যির এত প্রখর আলো গ্রহণের মরা আলোর মত ম্যাড় ম্যাড় করে। সে জগৎ

এলে এরই কোলে সেটা হয় সত্যি, এটা হয় স্বপ্ন; অথবা সেটা হয় এর কোমল তরল খাঁটি ভাবরূপ, এটা হয় তার মোটা স্থূল মলিন অসহজ বিকৃতি।

তবে গোড়া থেকে বলি। খোকা আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে প্রথম প্রথম শুধু আলসে আনমনে বসে থাকতাম; আমার কি জানি কেন শুধু শুধু চোখের পাতা জুড়ে ঘুম আসতো। সে কিন্তু এ রকম ঘুম নয়; এ ঘুম ভারী, সে যেন খুব হালকা; এ ঘুম অজ্ঞান, সে খুব সজ্ঞান; এ ঘুম দৃষ্টি হয় আধভোলা ঝাপসা ভাঙা ভাঙা অবুঝের ঘোর, সে ঘুমে দৃষ্টি হয় জাগা দেখার চেয়েও হাজারগুণ সতেজ স্পষ্ট, নিখুঁৎ ও জ্ঞানময়।

এই সৃষ্টিজোড়া ঘুম যতই ঘুমাই ততই আমার মন বুদ্ধি দেহ প্রাণ যেন খুব একটা বিরাট ফাঁকার মাঝে ছাড়া পায়। সে কি সুখ, কি মুক্তি, কি বেপরোয়া সাঁতার; কোনও দিকে কুল নাই এমনতর জোছনায় মাঝে তরী খুলে পাল তুলে ভেসে পড়লে যেমনটি হয় এ যেন সেই রকম। এখানে যেন আনন্দ যাত্রার শ্রান্তি নেই, পাওয়ার শেষ নাই, এখানকার সাধ যেন তৃপ্তির কোলের খোকা, এখানকার মিলন যেন গোঁজার বুকের মাণিক।

একদিন আমার কপাল ফেটে একটা চোখ বেরুলো। সত্যিকার চোখ নয় কিন্তু তবু একটা অপলক চাহনি অন্তরের নিবিড় থেকে আর কোথাকার নিবিড়ে যার পরিপূর্ণ দেখা, আনন্দের পরশে যার সাথে বস্তুর মর্ম্মভরা পরিচয়, কি এক একাত্ম রস-মাধুরীতে যা' দিয়ে সব কিছু আস্বাদন করা। সেই চোখের জোর ভরে সেই থেকে দিন নেই রাত নেই, আমার এই নতুন জগৎগুলি আসা যাওয়া করে।

সে জগতে শুধু আলো আর আলো, ছন্দ আর ছন্দ, রূপ আর রূপ। সেখানকার যা কিছু সব যেন নবনীর মত নরম ঘন থলো থলো চাঁদের কিরণে গড়া, বড়ই পরশ-নিবিড়। কোনো জগতে আবার যেন সবই সোনালী রোদের গড়া তবু কতই স্নিগ্ধ, কতই কোমল, কতই লাবণ্যময়। সেখানে যে সব রঙ খেলে যায় তার নাম মানুষের ভাষায় নেই, সে রঙের সবুজ নীল রক্ত পীত আভা মন্ত্রের শক্তি ধরে, স্পর্শে হৃদের জীবনের ঢেউ কোথা হতে দুলে দুলে তোমার মাঝে উথলে আসে।

একদিন একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল, সে সেই সোণালী কিরণের দেশের মানুষ। দেখে মনে হ'লো জগতের সব লাবণী তার মাঝে থৈ থৈ করছে, পরণের কাপড়ে পাটেপাটে তার

বিদ্যুৎ ঘুমাচ্ছে, নড়তে চড়তে তার অঙ্গ থেকে আমার সত্তার মাঝে ঝলকে ঝলকে রসের শিহর আসছে।

ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে কোন সত্যের কল্প লোকের এই ছবি আসে আসে ফিরে যায়। তার উদয়েও আমার মন প্রাণ চিত্তের কোনোখানে যখনি ঢেউ ওঠে, কামনা দোলে, ক্ষুধা জাগে, তখনি এ রসমধুর কল্পলোকের দুয়ার পড়ে যায়, আমরা চোখে আবার এই মোটা দুনিয়া সত্যি হয়ে ওঠে।

চেয়ে না দেখলে এ মেয়ে মন প্রাণ সমস্ত জ্ঞান জুড়ে জেগে থাকে, নিখুঁৎ হতে নিখুঁৎ হয়, নিকট হতে নিকটে আসে। আবার ভাল করে দেখবার আঁকুপাঁকু এলে এ মেয়ে বিদ্যুৎ চমকে সরে যায়। এ বুঝি মৃণ্ময়ী নারীর চিন্ময়ী ধাম, আমার পুরুষত্বের চরম শুদ্ধির গঙ্গা, পরম শান্তের বুঝি এ সার্থক অকাম পুতলী।

শিব যখন ধ্যানমগ্ন তখন এই বুঝি তার পার্ব্বতী; কাম যখন শিবকোপে ভস্মশেষ তখন এই বুঝি তার রতি; নারায়ণ যখন শেষনাগের কোলে অনন্ত শয্যায় চিরবিশ্রামে তখন এই বুঝি তাঁর বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

সে মেয়ে যখন সার্থক সফল স্বপ্নের মত আমার নয়নপথে ভেসে ওঠে তখন তার চাহনীতে স্ফুরে জগতের যত ভাষার অর্থ, এপর্য্যন্ত যে কেউ আদর করে যাকেই যা বলে সে যেন এক পলকে সে সবই আমার বলে যায়। সে দাঁড়ায় এসে আমার যেন বুকের পদ্মদলের মাঝে অন্তরতম হয়ে বিশ্বের সকল রকম মিলনকে মধুরতায় পরাজিত করে। সে কণ্ঠস্বরে সেই জগতের সোনালী আকাশ মুখর করে তুলে কত যে গীতের রাগিণী, কত যে যন্ত্রের সুর, কত বাতাসের সর্ সর্ নদীর ছলছল রহস্য।

কিন্তু এমন করে পেয়েও তাকে আজও আমার পাওয়া হয় নি। এ জগতে এবং সেজগতে যতখানি ব্যবধান ও দূরত্ব তার মাঝে আমার মাঝেও ততখানি দূরত্ব। এ জগত যখন দিব্য সুরে সুরে বেঁধে সেই জগতে হবে তখনই সে আমার হবে। এখনও সে এলে আমি আর আমাতে থাকি নে, রিম ঝিম আনন্দের লহরে দুলতে দুলতে সে আসে নেমে আর আমি যাই উঠে। সে আমার মুক্তির দেবতা, মর্ত্ত্য ও বৈকুণ্ঠের মাঝের স্বর্ণসেতু, আমার ভগবানের রূপ নেবার ডাক।

যখন উদয়াচলে ঢল ঢল কাঁচা সোণার নব ভানুর মত এই শান্ত অকাম জগত আমার চেতনায় দুলে তখন আমি যেন তার সাথে চড়া তারে সুর বেঁধে যাই। চার পাশে অনেক দিনের চেনা এই বাড়ী ঘর কেয়াবন পুকুর ঘাট পোয়াল গাদা লাউ মাচা যেন তাদের প্রকৃতি বদলাতে বদলাতে ঐ অন্তর সুরে সুর বেঁধে জমাট হয়ে আসে সারা সংসার মনে হয় কি এক রসঘন একাত্মতায় অন্তরঙ্গ, সব কিছু হয় যেন ঐ অনুপমা মেয়ের হাতছানি, তার তনুসাগরের রস-তরঙ্গ। ওপর থেকে গম্ভীর গম্ভীর শান্ত বিপুল স্বরে ভেসে আসে, "তোমার মাঝে ময়লা মাটি সব যখন ধুয়ে যাবে তখন এই ঊর্দ্ধের সত্তা নীচে এসে তোমারি পায়ের তলে দাঁড়াবে; তুমি হবে সে কল্যাণলোকের শিব, সে আনন্দধামের পুরুষোত্তম।"

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

প্রকৃতির গান।

:—:

(এমার্সন্)

রাত্রি দিবস সমীরস্তর অন্তরীক্ষ ব্যোম
সকলি আমার—এ অনাদিকাল উজ্জ্বল রবি সোম।
সৌর কিরণে লুকাইয়া থাকি, গানের সুরেতে মূক,
ঊর্ম্মিগর্ভে উপধা বিছায়ে লভি সুপ্তির সুখ।
গণনায় শেষ হয় না আমার সংখ্যা অঙ্ক রাশি—
পারে না পূরিতে আমার নিলয় কোন' জাতি অধিবাসী।
জীবনোৎসের উজ্জ্বল কূলে আছি আমি চিরদিন
আমিই আবার প্রলয় প্লাবনে করে দি' সকলি লীন;

যুগ যুগ ধরি এ মানব জাতি হ'তে চুনি' কত ফুল
গেঁথে দিই আমি মালা অপূর্ব্ব শোভায় অসমতুল ;
হাজার হাজার নিদাঘে আমার যে ফল পক্ব হয়
কখন কখন ধরণীর জীব পায় তার পরিচয়।
অতীত লিখেছি পাষাণের বুকে অগ্নির অক্ষরে—
প্রবাল-দ্বীপেতে প্রাসাদ আমার ভস্মভিত্তি 'পরে।
উল্কা ও গ্রহমণ্ডল হ'তে আহরিয়া উপাদান
পুরাণোরে ল'য়ে নূতন করিয়া গড়ি এ পৃথিবীখান।

একদা দেবতা ছিল উদাসীন তারাফুলহারে সাজি
সরীসৃপের মতন খর্ব্ব বলহীন দেখিয়াছি ;
কাল আর স্থান আমিন্, করিছে আদেশের অবধান
সাগর শুকায়ে, বেলা-পলি লয়ে গড়িছে কত না প্রাণ ;
আসে মাঝে মাঝে আমার পুত্র, ঠাঁরে না সে কারো বাসে
ইন্দ্রধনুতে পথ দেখি চলে, অস্ত-তপনে হাসে!
আমার আলোক চিরপ্রোজ্জ্বল—যে আলোকে গ্রহ ঘুরে,
পুত্র আমার সবার উচ্চে, গ্রহমণ্ডলচূড়ে।
সময়ের স্রোত বহে সদা মোর, ঘুমায় না কভু বায়ু
অরুণের রথ থামিবে না কভু, কমিবে না কারু আয়ু।
চিরদিন কত র'ব সজ্জিত ? তাই ত' ক্ষণিক এত
ইন্দ্রধনু ও তুষার, পর্ণ, প্রপাত, বর্ণ যত।
এত বহু জাতি, বিপুল মেদিনী লয়েও একাকী আমি—
সকল সুষমা সঙ্গীত এবে বিস্বাদ বিনা স্বামী!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

তাঁর তরে মোর এত আয়োজন, সৃষ্টিও মোর তাই,
হাজার হাজার আসে তাঁর দূত—শুধু তাঁর দেখা নাই।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানা।

সেদিন একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। কারখানাটি ঢাকা সহর হইতে ১০ মাইল দূরে ধলেশ্বরী নদীর তীরে রাজফুলবাড়ীয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। কারখানা বলিলে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে বিরাট অট্টালিকা প্রচুর মজুর জটিল কলকব্জার ইত্যাদির কথা মনে জাগিয়া উঠে এখানে তাহার কিছুই নাই। একজন ধনী লোকের বাহির বাড়ীতে একখানা সাধারণ টীনের ঘরের মধ্যে কারখানায় সকল কাজ হয়। বাহিরের জাঁকজমক কিছুই নাই।

এখানে মহেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত ৩টী কলে কাজ হইতেছে। কলগুলি খুব সাদাসিধা ধরণের—কোনও জটিলতা নাই। দিয়াশলাইর বাক্স ও কাঠি কলেই কাটা হয়। কল চালাইতে হয় হাতে। ১৫।১৬ বৎসর বয়সের বালকগণই সকল কাজ করিতেছে। কল বিগড়াইলে স্থানীয় লোহার মিস্ত্রীই তাহা মেরামত করিতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এই কারখানায় বাক্সের জন্য স্থানীয় কদম কাঠ ও কাঠির জন্য দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে। দেবদারু কাঠ মানিকগঞ্জের দিক হইতে আনিতে হয়। কাঠির জন্য স্থানীয় কাঠের জোগান না হওয়াতে এই কারখানার মালিক একটু অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

কাঠিতে প্যারাফিন্ ও বারুদ লাগানো, বাক্সে কাঠি ভরা এবং বাক্সে লেবেল লাগানো ইত্যাদি অন্যান্য সকল কাজই হাতে করা হয়। কারখানায় প্রায় ১৮ জন বালক ও যুবক কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ মাসিক মাহিনা লইয়া কাজ করে এবং কেহ কেহ কাজের উপরি মজুরী পায়। সকল জাতের লোকই পাশাপাশি কাজ করিতেছে।

পল্লীগ্রামে তজ্জন্য কোন আপত্তি উঠে নাই। বাক্সের লেবেল লাগানোর কাজ কারখানার চারিদিকের গৃহস্থের বিধবাগণই করিয়া থাকেন। শুনিলাম এক এক জন বিধবা এই লেবেল লাগানোর কাজ করিয়া মাসে প্রায় ৫. পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করেন। এই নূতন কুটীর শিল্পের সৃষ্টিতে পল্লীগ্রামের বেকার সমস্যার কথঞ্চিত মীমাংসা হইয়াছে। গৃহস্থালীর আসরে গল্প করিতে করিতে যে অর্থোপার্জ্জন করা চলে তাহা অন্ততঃ এই গ্রামের ললনাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই কারখানায় তৈয়ারী দিয়াশলাই একটী এক পয়সা অথবা ডজন তিন আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বাজারে বিদেশী দিয়াশলাই ৩টী দু'পয়সায় বিক্রয় হয়। এখানকার দিয়াশলাই দেখিতেও বেশ সুন্দর এবং জ্বলেও ভাল। তবে ম্যানেজার বলিলেন যে তাঁহারা এখনো দিয়াশলাই সম্পূর্ণ Damp Proof করিতে পারেন নাই। এই দিয়াশলাই রাত্রে ৩।৪ ঘণ্টা বাহিরে হিমের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার জ্বলিবার ক্ষমতা নষ্ট হয় না, কিন্তু বর্ষাকালে একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারখানার কর্ম্মকর্ত্তাগণ দিয়াশলাইয়ের উপরের লেবেলটী সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর করিবার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

বিদেশী দিয়াশলাই আমাদের সকল বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আমাদিগের নিকট সংরক্ষণের সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমরা হেলায় তাহা হারাইয়াছি। জাপান সেই সুবর্ণ সুযোগে ভারতের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে। এক দিয়াশলাই আমদানির বহর দেখিলেই বুঝা যায় আমরা কতদূর পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। গত কয়েক বৎসরে এক বাঙ্গলা দেশেই কত টাকার দিয়াশলাই আমদানি হইয়াছে তাহা একবার দেখুন—

১৯১০—১১	খৃষ্টাব্দে	২২,৬৭,৮২৯	টাকার
১৯১১—১২	"	২৬,২৯,৬১৫	"
১৯১২—১৩	"	২৮,৩০,৭৯০	"
১৯১৩—১৪	"	২৮,২৩,১৩২	"
১৯১৪—১৫	"	৩০,১০,৮৯০	"

১৯১৫—১৬	"	৩৭,৮৮,৭৯০	"
১৯১৬—১৭	"	৫৫,৪৮,৮৬	"
১৯১৭—১৮	"	৬১,১১,০৯৭	"
১৯১৮—১৯	"	৪৮,৭৩,১৭৬	"
১৯১৯—২০	"	৪৭,৮২,৮৮৯	"

এই যে জলের মত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে ইহার শতাংশের এক অংশও যদি নবপ্রতিষ্ঠিত দিয়াশলাইএর কারখানাগুলির জন্য দেশে থাকিয়া যায় তাহা হইলে ইহাদের সৃষ্টির স্বার্থকতা আছে স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

মরণ আড়াল।

—:*:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক রাত্রে আমাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তথাপি ভোর হইতে না হইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনটা কেমন অশান্ত, আতঙ্কিত হইয়াছিল, নিদ্রায় কেবল দেখিয়াছি স্বপ্ন, কত কি ভয়াবহ দৃশ্য! মন হইতে কিছুতেই দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না একটা দ্বিধাভাব একটা আশঙ্কা! সত্যই কি আবার আমার এজীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে! সেও কি কখনও সম্ভব? জীবনের সকল আশা, মনুষ্যোচিত সকল আকাঙ্ক্ষাই যে বিধাতার এক দিনের নির্ম্মম তাড়নে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্গঠন যে এক প্রকার অসম্ভব! সে যে আশা নয়—দুরাশা! হউক দুরাশা, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আমাকে আবার জীবন-নদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে,—হউক দুর্ব্বার বিপদ সঙ্কুল সে নদ-প্রবাহ—তাহাই হইবে আমার দুঃসহ সৃষ্টি ছাড়া জীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্র—ভাসিয়া যাই

সেও ভাল—মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে যদি সেও সুখের—এ দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন অপেক্ষা! আর যে পারি না। পরপদলেহী, পরাধীন জীবন একবারে অসহ্য,—মানাবাআয় স্বাধীন মনোভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কি করিয়া আর আত্মজ্ঞানহীন পরমুখাপেক্ষী পশুর মত পরের অঙ্গুলী হেলনে চলাফেরা করা যায়! যদি তাহাই হইবে তবে জেল হইতে কেন পলায়ন করিয়াছি—নব জীবনই যদি লাভ না করিতে পারিলাম তবে জেল আর বাহিরে তফাৎ রহিল কি! বিপদ পদে পদে—আত্মপ্রকাশের আমার উপায় নাই,—স্বাধীনতা প্রকাশ্যে বরণ করিয়া পাইবার আমার পথ নাই,—জেল আমার জীবনকে, অধীন জাতির মত এমনি ভাবে বঞ্চিত বিদলিত করিয়াছে,—বিধাতারও ন্যায্য অধিকার, মানুষের মানুষ হইবার প্রবৃত্তিকেও প্রাণ দিতে আমি অপারগ,—সে চেষ্টাও আমার পক্ষে নাকি দোষাবহ—অপরাধের!

এত দিন অপরাধীর জীবন-যাপন করিয়াছি তখন আবার নব অপরাধ করিবার জন্য প্রাণ মন মাতিয়া উঠিয়াছে—অপরাধ নয় ত কি! জীবনের উদ্দামবেগ সমাজের শৃঙ্খলে—নিয়মের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে না পারা ত সকলের চক্ষেই যে মহা অপরাধ—সেই মহা অপরাধ করিবার জন্যই আমার হৃদয়ের রক্ত টক্‌বক্‌ করিয়া তখন ফুটিতেছিল—যে দৃশ্য গত রাত্রে দেখিয়াছি,—অমন ভাবে বন্ধুর অকাল মৃত্যু—আত্মহত্যা—সে ব্যাধির মূল কোথায় আমাকে দেখিতেই হইবে—সে পাপাঙ্কুর উন্মুলিত করিতে হইবে,—সমাজের একটি কলঙ্ক বীজও বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইলে বুঝিব—এ অধম জীবন কিয়ৎ পরিমাণে সর্থক।

ভবিষ্যতের কথা পরে, বর্ত্তমানের চিন্তা আমাকে তখন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। প্রভাত ত হইয়া আসিল,—আর একটু পরেই কি একটা গণ্ডগোল এ বাড়ীতে বাধিয়া যাইবে। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইবে কে জানে। কে বলিতে পারে প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইবে না—বরং সেই আশঙ্কাই ষোল আনা! জেল কয়েদীর অপঘাত মৃত্যু এত সহজে মিটমাট হইবার নয়,—গলায় রশি বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িলেই তাহার পশুজন্ম ঘুঁচিবার নয়,—কত পরখ পরীক্ষা, প্রমাণ পরিচয়ে প্রেতের পিণ্ডিচট্‌কাইয়া যদি তার উদ্ধার হয়—সে উদ্ধার অনায়াসলভ্য নয় আদবেই,—মৃতের ব্যক্তিত্বে কোন প্রকারে কাহারও একটু সন্দেহ হইলেই আমার মহা বিপদ—ডাক্তারের সকল কৌশল পণ্ড—বৃথা আমার এ মরণ আড়াল! হায়, হায়,—ইহা অপেক্ষা বরং এ বাড়ী হইতে পলায়ন করাও ছিল ভাল! কথাটা মনে

উঠিতেই শয্যাত্যাগ করিয়া যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই সেই উদ্যান—সেই লতাবিতান—এই না এই রাত্রেই তাহারা দুইজনে কত স্নেহভরে ঐখানে কত কথাই বলিয়াছে—এখন কোথায় তাহারা?—তাহাদের একজনের প্রাণহীন দেহ ওই উদ্যানেরই এক বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে,—সেই উপকারী বন্ধুকে হেয় কয়েদীর বেশ নিজে হাতে পরাইয়া আমি না নিজে নিরাপদ হইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বারো ঘণ্টা এখনও অতীত হয় নাই! যে অন্যকে স্বেচ্ছায় আশ্রয় দিয়া তাহাকে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছিল, কার্য্যে তাহার কত উৎসাহ কত তেজ—তাহারই এই পরিণাম—আমি ত বিপদে ডুবিয়া আছি আমার আর ভরসা কোথায়! আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম—আর তথায় দাঁড়াইতে পারিলাম না,—ছুটিয়া শয্যাকক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলাম। দেখি আমার শূন্য শয্যাপার্শ্বে ডাক্তার দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ভাল—এই যে তুমি,—শয্যা শূন্য দেখিয়া একবার আমার মনে হয়েছিল—তুমি বুঝি উড়েছ—পিঁজরে-কাটা পাখী কি না—সে সন্দেহটা আপনি আসে! আবার ভাবলেম—না—সে কি এতই বেকুব হবে—এত সুযোগ সুবিধে পায়ে ঠেলে চলে যাবে—সে ছেলে সে নয়, সত্তিই দেখ্‌ছি তাই আমার মনের মত ছেলেটি তুমি! ভাল, রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?" নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন "আমি নিশ্চয় বলতে পারি কালকার দুর্ঘটনা তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারে নি—বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুর্ঘটনাগুলোকে জাগ্রত হয়ে দুঃস্বপ্নের মত মন হতে তখনি মুছে ফেলে দিতে দেরী করে না—যেটা পরের—যে ঘটনাটুকুর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বপ্নের নিলের মত অলীক—তার আলোচনায় ফল! পরের বিষয়ে মাথা ঘামানোর চাইতে নিজের চরকায় ততক্ষণ তৈল দিলে অনেক উপকার,—সত্যি নয় কি?"

আমি কথায় কোন উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলাম।

বৃদ্ধ বলিল—"এক দিনে চুল পাকে নি—অনেক দেখেছি,—অনেক ঠেকেছি—ঠেকে শিখতেও হয়েছে অনেক। বুড়োর কথা মত ক'টা দিন চলে দেখ ত বাপু, তোমার ভাল না মন্দ হয়। বুঝতেই ত পারছ তোমাকে বাঁচাতে যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চাইছি

সেটা বড় সহজ নয়, কিন্তু সাবধানে আমরা চলি যদি এমন কিছু কঠিনও নয়—কেবল চাই দেখে শুনে ভেবে চিন্তে বুঝে চলা। যা বলি ঠিক তেমনি ভাবে চল ত বাপু—বিপদ তোমার শ'হাত দূরেও দেখা দিতে পারবে না, কেমন ?"

বিনীত ভাবে বলিলাম—"সে ত বলেছিই আপনিই আমার এখন একমাত্র নির্ভর !"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"একথা যেন মনে সর্ব্বদা থাকে বাপু ! আজ হতে তুমি আমার সহকারী—নাম তোমার নবকুমার গুপ্ত। কি নাম ছিল তোমার ?"

উত্তর করিলাম—"বিনোদ সেন।"

ডাক্তার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"অনুমান কি আমার মিথ্যা হয়, বৈদ্য না হ'লে কি এত বুদ্ধি ! ভাল ভাল মিলেছে ভাল—বিধাতাই যোটান !—বৈদ্যে বৈদ্যে মিলবে ভাল—এক জাত আমরা—বেশ বেশ ! নবকুমার ভুলে যাও, এই মুহূর্ত্ত হতে তুমি ছিলে কে—নাম তোমার কি ; তুমি বিনোদ নও—নবকুমার—ডাক্তার আর, গুপ্তের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী—বুঝলে,—মনে থাকবে ত—ভুললেই বিপদ।"

ইনিই তবে সুপ্রসিদ্ধ আর, গুপ্ত—যাঁহার এত নাম—বিধাতার কাণ্ড দেখ—আমি হইতে চলিয়াছি তাঁহারই সহকারী।

মনের ভাব চাপিয়া বলিলাম—"বিলক্ষণ ! আমি ভুলব ? নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনব ! আমি কি বুঝছি নে কি অসীম বিপদ সাগরে আমি ডুবে আছি—এ হতে উদ্ধার হতে পারি যদি আপনার কৃপায়।"

তিনি আমার বাক্যে খুসি হইয়া বলিলেন—"ঠিক ঠিক ! হাঙ্গামাটা ত কম নয়, তা ভয় করো না বাপু—দশের উপর আমার যতটা প্রতিপত্তি—তাতে আমার পক্ষে এটা তেমন কিছু বড় কাজ নয়—তবু হওয়া চাই পূর্ব্ব হতেই সাবধান—সাবধানের মার নাই, বুঝলে ?"

বলিলাম "যে আজ্ঞা !"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন "আজ্ঞা করবার অনেক আছে, অনেক কথা তোমায় বলবার আছে, শুনতে হবেও অনেক—বলতে গেলে তোমাতে আমাতে পরিচয়ই হয় নি—আমাদের কারও পূর্ব্বজীবন কারও কাছে অজ্ঞাত থাকলে চলবে না, তোমাকে এক্ষুণি এ বাড়ী পরিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। লাসটা নিয়ে হৈচৈ হবে না কম—সে সময় এ বাড়ীতে তোমার অস্তিত্ব

কোন রকমে প্রকাশ পেলে আর কি কিছু চাপা থাকবে—এ সময় দূরে থাকা ঠিক নয় কি ? সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছি, চটপট এক পেয়ালা চা আর কিছু খেয়ে নাও, সব প্রস্তুত—খুব সকালে পার—বুঝেছ—এই আঁধার থাকতে থাকতে খুব গোপনে সম্ভব এ বাড়ী তোমাকে ত্যাগ করতে হবে—বুঝেছ—মনে কিছু কর না—বুঝছ ত তুমি সবই—তোমারি ভালর জন্যেই আমার এত করা !—প্রস্তুত হও তা হলে—কোন কষ্ট হবে না তোমার, সেটাও আমার বাড়ী তুমি আমার এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী সেই বলেই সেখানে প্রকাশ থাকবে—তোমার কি কোন অসুবিধে অনাদর হতে পারে ? বলবে তুমি—কলকাতা হতে নিযুক্ত হয়ে এসেছ—খবরদার এ বাড়ীর এ সকল কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। বেশী কথার মধ্যে যেও না—এর পর তোমায় আমি সমস্তই সমঝে দেব—তখন বুঝবে তোমায় আমি কি ভাবে—কতদূর আপনার লোক ভেবে কি পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি ; আর সময় নাই—তাড়াতাড়ি—খুব তাড়াতাড়ি !"

এখানকার পরিণামটা জানিবার জন্যে মনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য থাকিলেও এ সকল হাঙ্গামা হইতে দূরে পলায়ন করিতে আমিও কম ব্যগ্র হইয়াছিলাম না, কে বলিতে পারে কিসে কি হয়—আমাদের সাক্ষাৎ পাইলে লকল চালিবে না নিশ্চয় ! বলিলাম—"যা বলবেন তাতেই আমি রাজি—আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনি—আপনি জ্ঞানী, আপনার কথামত চলব না ? না চললে যে আমারি পদে পদে বিপদ—তা কি আমি বুঝি নে ? আমি প্রস্তুত—যেখানে বলবেন সেখানেই যাব !"

"ভাল কথা—গাড়ী প্রস্তুত ; এক্ষুণি তাতে উঠে পড় গিয়ে, খাবার ওতেই দিয়েছি—এক পেয়ালা চা খাবার সময়টুকু পর্য্যন্ত থাকা আর এখানে চলবে না—ফর্সা হয়ে এল,—গোপনে খুব সাবধানে সব সমাধা করতে হবে—এস তা হলে !"

তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন—'মনে থাকে যেন নবকুমার তুমি নবকুমার ভিন্ন অন্য নও,—আমার এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরী তুমি,—এত দিন কলকাতায় কোথাও কাজ করছিলে,—সেথা হতে নিযুক্ত হয়ে আমার এখানে এসেছ। এই ভাবে সেখানে সব কথা সাবধানে চালাবে,—বুঝেছ ! বুদ্ধিমান ছোকরা তুমি, তোমায় আর বেশী কি বলব, খুব সাবধানে কেউ কিছু বুঝতে না পারে

কথাকটা বার বার মনে করে মনে গেঁথে ফেল—কেমন নবকুমার? ভুলবে না মিষ্টার-গুপ্ত—পুরানাম ব্যবহারের দরকার নেই, মিষ্টার-গুপ্ত—এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী অব ডকটর আর, গুপ্ত!

তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অমন সময়েও আমার হাসি পাইল। আমি বলিলাম—'এটা আমি বুঝব না কেন—এ সব প্রকাশ হলে বিপদ আমারি বেশী,—আপনি আমার জন্য এত করছেন—আর আপনার উপদেশ ভুলব আমি—সমস্তই আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেছে।'

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "সেইত চাই। তুমি পারবে—তুমি পারবে আমার এই বিপুল কারবার রক্ষা করতে,—আমি অপাত্রে কার্য্য ভার দেই নি।"

মনে মনে বলিলাম—তা বুঝিব পরে এখন চাই আমার পরিত্রাণ—এ ক্ষেত্রে হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন। মোটরে উঠিয়া বসিলাম। ডাক্তার নিজকে নোয়াইয়া আমার কানের নিকট মুখ লইয়া অতি নিম্ন স্বরে বলিলেন "জানি তুমি ঠিক চল্‌বে তবু বলি খুব সাবধানে বুঝে শুনে চল্‌বে। কটা দিনত আর দেখা হবে না—এ সব মিটুতে হয় ত সপ্তাহ খানেক কেটে যাবে,—নিজের বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌বে—সেই তোমার পরীক্ষা! বুঝলে।"

একটু থামিয়া,—একবার এদিক ওদিক সন্দেহ-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া, স্বরটা আরও নামাইয়া বলিলেন—"আরেক কথা—একটা বিষয়—বুঝলে—তোমায় বরাবর সহ্য করতে হবে—সেটা আমার সেক্রেটারীর মেজাজ,—লোক সে মন্দ নয়—মনটা তার বেশ ভাল কিন্তু ছেলে বেলায় ওর মা মারা যান—তাই—একটু খোব মেজাজী—সেটা তোমায় সইতে হবে নবকুমার—সে ত নাম মাত্র সেক্রেটারী—করতে হবে ত সমস্তই তোমাকেই,—বুঝলে—তোমায় তাকে মানিয়ে নিতে হবে—সে শুধু আমার সেক্রেটারী নয়—ছেলে—একটা কাজে আবদ্ধ রাখ্‌তে তাকে—

এত কথা কেন—আমার বুঝতে আর বাকী রইল না,—আমি তাঁহার কথা শেষ হইতে অবসর না দিয়াই বলিলাম "আপনার ছেলে যিনি—তিনি হবেন আমার মাননীয় বন্ধু—আপনার ছেলে—তাকে আমি মেনে চলব না—তাই হলে কি করতেম!"

এবারে তিনি সত্যই আত্মহারা হইয়া গোপন-অগোপনীয় বিস্মরণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বড় খুসী হলেম—বড় ভাল ছেলে তুমি—জানি তুমি অবস্থা মত ব্যবস্থা করতে পারবে।

আবার স্বর নিম্নে আনিয়া বলিলেন "তবুও বলে দেওয়া ভাল, সাবধানের মার নাই নবকুমার!

তাঁহার ইঙ্গিতে সোফার তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। আবার কোন্ অজ্ঞাত দেশে ছুটিয়া চলিলাম। জীবনটাই তাই, বর্ত্তমানের পর মুহূর্ত্তের সহিত যাহার পরিচয়ের পথ নাই, তাহা লইয়া আবার কত ভাবনা—অদৃশ্য-অদৃষ্টের সীমা কোথা?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রায় পাঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলাম একটি নির্জ্জন মনোরম উপবনে। গাড়ী থামিল—কানন-কুটীর দ্বারে। ফটক-স্তম্ভের গাত্রে শ্বেত-প্রস্তর ফলকে সাজান ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে—"কানন-কুটীর।" সোফার হর্ণের শব্দ করিতেই একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল। গাড়ী প্রবেশ করিল—অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ধনুকের মত একটা লাল টক্ টকে রাস্তা দিয়া, উভয় পার্শ্বে তার গোলাপবীথি,—সম্মুখেই কানন-কুটীর,—সুন্দর ছোটখাট একখানি দালান—আকাশের নীলের মত তার রং,—পশ্চাতে সবুজ বৃক্ষের সারি—পটে আঁকা ছবির মত। ডাক্তার সৌখিন বটে! এমন সুন্দর সুন্দর তাঁর বাড়ী,—এমন নির্জ্জন স্থানে কেবল আরাম বিরামের সুখের জন্য কম টাকা ঢালেন নাই ত!

গাড়ী থামিবা মাত্র জনৈক প্রৌঢ়া আসিয়া আমাকে বলিলেন "আসুন। রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় নি ত?" সোফারের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভোরে ভোরেই তা হলে তোমরা রওনা হয়েছিলে—সবে সাড়ে সাতটা হয়েছে—ওঁর তা হলে চাটা খাওয়া হয় নি!"

আমি বলিলাম—"বাকি নেই কিছু, ডাক্তার সাহেবের বন্দোবস্তে কিছু বাদ যাবার যো নেই—ওরি মাঝেই......"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"জানি ওঁর ধরণ ধারণ। নেমে আসুন,—রাস্তার যে অবস্থা—জার্কিং ত কম নয়—বিশ্রাম করুন।"

কথাগুলি তিনি এমন সহজ ভাবে বলিলেন—তাহা শুনিয়া কে বলিবে আমাদের সেই প্রথম পরিচয়,—যেন কতকালের জানাশুনা,—তিনি আমার সম্বন্ধে এমন ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন—আমি যে তাঁহাকে জানি না সে ভাবটা প্রকাশ করিতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হইল, পরিচয় প্রশ্নের সুযোগ ঘটিল না! তাঁহার ব্যবহারের ভিতর একটুকুও অসামঞ্জস্য না থাকিলেও আমার মনে বারবার হইতেছিল এ আবার কি রহস্য—কি করিয়া আমার কথা ইঁহার জানা

সম্ভব! ডাক্তারের সঙ্গে সবে গেল-রাত্রে আমার দেখা, ভোরে ত রওনা হইয়াছি, টেলিগ্রাফের তারও নিকটে নাই,—ডাক্তার চিঠি লিখিয়া আমার সম্বন্ধে ইঁহাকে কিছু জানান একবারে অসম্ভব—সময়ের জন্যই যে তাহা অসম্ভব অথচ ইঁহার ব্যবহারে আমি নিজে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না ইঁহার সহিত আমার এই মাত্র পরিচয়! তবে কি ইনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত কেহ? না নিশ্চয় নয়—খুব ঘনিষ্ট স্নেহশীলা আত্মীয়া ব্যতীত, আমার পূর্ব্ব অবস্থা জানিয়া কে আমাকে আদর যত্ন করিবে! সে ভাবের কোন কথাই ত ইনি বলেন নাই,—ইনি তবে কে—ইঁহার বোধ হয় বসুধৈব কুটুম্বকং।

দিনটা আরামে কাটিয়া গেল! স্থানটির অবস্থান অতি মনোরম—একটা উপদ্বীপ। গঙ্গার একটা ক্ষীণ শাখা উহার তিনটী দিক বেষ্টন করিয়া গিয়াছে,—জল তখন ছিল না বলিলেই হয়—তাহাই তরতর করিয়া বহিতেছে! লোক জনের বাসও খুব কম, মাত্র কয়েক ঘর সাঁওতাল প্রজা, ডাক্তারের কতকটা জমী চাষ আবাদ করে। আর প্রকাণ্ড একটা আম বাগান—লাভের সম্পত্তি—শুনিয়াছি পরে এই বাগান হইতেই ডাক্তারের বার্ষিক আয় চার পাঁচ হাজার টাকা—সময়ে আমাকে বুঝিতে হইয়াছে ডাক্তার কেবল আরামের হিসাবে জীবনে কমই ব্যয় করিয়াছেন, তাঁর বিলাসও একটা আয়ের পথ।

রওনা হইবার পূর্ব্বে ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন—তাহা হইতে মনে হইয়াছিল এখানে আসিয়া তাঁহার পুত্র—আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী—না—সেই খোবমেজাজী মণিবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। একে একে দুইটা দিন অতীত হইল—তিনি কেন সেই প্রৌঢ়া ব্যতীত অন্য প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলিল না। প্রৌঢ়ার কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিলাম তিনি ডাক্তার পরিবারের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত,—তবে ইনি তাঁর কোন আত্মীয়া কি না ধরিতে পারিলাম না—পারিবারিক সাধারণ গল্প-কথা ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষর কথা ইনি কমই বলেন—তাতেই ঠিক কিছু বুঝিবার উপায় নাই—সে সকল তথ্য জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও আমার নাই—পাছে ধরা পড়ি।

অলকার কথা জানিবার জন্য সময় সময় বড় ইচ্ছা হইত—ইনি নিশ্চয়ই তাহার সম্বন্ধে অনেক জানেন! আহা! বেচারী, সে বোধ হয় জানে না তাহার বাল্যবন্ধুটীর কি দশা ঘটিয়াছে! হয় ত অলকার জন্যই অভিমানে, কে জানে কি জন্য, অতুলের সে পরিণাম।

অতুলের মত অমন সহৃদয় বন্ধু হারানো জীবনের প্রধান দুর্ভাগ্য—কি সুন্দর লোক ছিল সে—এক দণ্ডে পরকে আপনার করিতে অমন কম লোকেই পারে।

মনে শত চিন্তা,—সে নির্জ্জনবাস যেন ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল,—প্রৌঢ়ার যত্নে যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলেও—মন আমার পড়িয়াছিল গোঁসাইগঞ্জে—কিবা হইল! কোনই সংবাদ নাই—পাইবার আশাও নাই, কে লিখিবে? কি লিখিবে? ওসব কি লেখার! তাহাই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেই আর একা একা ঘুরিয়া বেড়াই। কাজ হইয়াছে ভাল ইহাও আবার আর এক জেলে পরিণত হইবে কি! মানুষের মন কি চায়!

সেদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে—বেড়াইয়া "কানন কুটীরে" ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইবার পথে অস্ফুট মনুষ্যকণ্ঠে শুনিতে পাইলাম। আবার ইহারা কাহারা? অন্ধকারে লোক চিনিবার উপায় ছিল না—কণ্ঠস্বরও বুঝা যায় না,—নিম্নস্বরে সাবধানীয় কথাবার্ত্তা। এখানে তবে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে!

নিশ্চল ভাবে একটা থাম ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম; অনেকক্ষণ সেই ভাবে অতিবাহিত হইল। অবশেষে তাহাদের স্বর বাক্যব্যপদেশে একটু স্পষ্ট হইয়া আসিল। তাঁহাদের একজন বলিল "এত করেও সমস্ত পণ্ড হয়ে যায় বুঝি মজা! এতগুলোর চোখে ধুলো দিলাম—আর কিনা ও অবশেষে এসে উপস্থিত; ওকে কি ঠকান সহজ! আমি স্বীকার না করলেও ধরে ফেলেছে বোধ হয়। তখনি আমার কানে কানে বল্লে—'এই বুঝি তোমার কয়েদী—এযে অতুল! কয়েদীর পোষাক পেলে কোথা? বিনোদটা শেষে তোমার ওখানে এসেছিল নাকি? তোমার সঙ্গে কি তার পূর্ব্বে জানাশোনা ছিল?' আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও রাজচন্দ্র কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—তখন বলতে বাধ্য হলেম, ভায়া, এই কি এ সব প্রশ্নের সময়? দিন দিন তুমি বুড়ো হয়ে ছারে পাচ্ছ! তবে সে চুপ করলো—হয় ত রাতে এসে বিরক্ত করতো, তাই পালিয়ে এসেছি।"

বুঝিতে আর বাকী রহিল না—বক্তা স্বয়ং ডাক্তার। কে সে রাজচন্দ্র—আমার মরণ-আড়াল যে ধরিয়া ফেলিয়াছে! আমার আজীবনের শনি, এ দুর্দ্দশার মূল যে—সেই মহাক্রুর রাজচন্দ্র সেন নয় ত? তাহা হইলেই হইয়াছে—স্বয়ং দেবতারও সাধ্য নাই তাহা হইলে

আমাকে রক্ষা করে। রাজচন্দ্র নয় ত সে পিশাচরাজ—চন্দ্র নয় সে চন্দ্রের রাহু—উঃ কি ভয়ানক—সেই রাজচন্দ্র! দাঁড়াইবার শক্তি হারাইলাম, মস্তকে কেবল সুচিবৎ বিদ্ধ হইতেছিল—রাজচন্দ্র,—চণ্ডাল রাজচন্দ্র—আমাকে জেলে দিবার প্রধান নেতা রাজচন্দ্র—আবার তাহারই উদয়! আমার আর আশা নাই, সমস্ত গেল—শেষ! সজ্ঞা লোপ পায় বুঝি—জগত জীবন অন্তর বাহির—আমার সমস্তই অন্ধকার।

শ্রী—

জয় জগন্নাথ।

—ঃ—

(গান)

জয় জগন্নাথ জগতের নাথ
জগন্ময় হোক্ তোমারই জয়,
সচ্চিদানন্দাকারে মানব-রতন বেদীপরে,
বিরাজিত তুমি ত্রিভুবন ময়।
লয়ে ভক্ত বলরাম, (ধর্ম্ম) সুভদ্রা বিধান,
এই যে আছ ভগবান একত্রয়,
ঐ ত্রিরূপ একাধারে হৃদয় রথোপরে
হেরিলে জীবন মুক্তি লাভ হয়।
শ্রীক্ষেত্র তোমার বিশ্ব চরাচর
শ্রীমন্দির পাপী মানব হৃদয়,
তব শ্রীপুরীতে মানব জাতিতে জাতিতে
ভেদাভেদ কিছুই নাহি যে রয়।

সেথা আনন্দ বাজারে যত নারী নরে,
পরস্পরে প্রেম অন্নবিলায়,
ওযে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মহাপ্রেম গলে,
উচ্ছিষ্টকেও কত মিষ্ট বলে খায়।
তাই বিমান ভূধর বিশাল সাগর,
ভক্ত জড় জীব সনে গায় তব জয়, (সদা)
ধন্য তব নাম গাই অবিরাম
হয়ে ব্রহ্মানন্দে নিত্য প্রমত্ত হৃদয়।

দীন সেবক
শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

২৫শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ইংরাজী ১০ই মার্চ্চ, শুভ অষ্টমী বাসরে কোচবিহারের নবভূপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের শুভ অভিষেক উৎসব মহা সমারোহ যথাশাস্ত্র বৈদিক অনুশাসনে, রাজধানীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গে বহুকাল এরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই,—সমারোহের হিসাবে নহে,—অনুষ্ঠানের বিধিনিয়মে এ উৎসবের অভিনবত্ব! প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে একে ত এরূপ উৎসবের অবসরই এ বিজিত বঙ্গে অতি দুর্লভ। স্বাধীন নৃপতি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সিংহাসনারোহন-অভিষেক নিষ্প্রয়োজন—বঙ্গে এরূপ নৃপতির সংখ্যা অতি অল্প—যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও অভিষেক-কার্য্য হিন্দু অনুশাসন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় নাই বহুকাল। ইংরাজ প্রভাবে নবাবী কায়দায় এত দিন অভিষেক পর্ব্ব 'গদি আরোহন পর্ব্বেই' পর্য্যবসিত হইয়াছে,—পুরাকালের হিন্দু নৃপতির যথার্থ অভিষেক আয়োজন বঙ্গ প্রত্যক্ষ করে নাই স্মরণাতীত কাল হইতে। আমাদের মহামনা মহারাণী, জননী

গ্রহনান্তর দরবার ভঙ্গ হইল। যেভাবে পাটহস্তী পৃষ্ঠে মহারাজ দরবারে শুভাগমন করিয়াছিলেন তদ্রূপ ভাবেই পুনঃ রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজের জয়ধ্বনী সহকারে সভাভঙ্গ হইল।

* * *

বিগত ১লা মার্চ কোচবিহার সেবিকা ভাণ্ডারের সম্বৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা তাঁহার একখণ্ড কার্য্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। দুস্থ বঙ্গভূমী বাঙ্গলায় কতশত পরিবার নিত্য অনশনে অর্দ্ধাশনে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কোনক্রমে কাল যাপন করিতেছে। বিশেষতঃ বাঙ্গলার বিধবাদের অবস্থা অনেক স্থলে অতীব শোচনীয়। তাঁহাদের অনেকেই ভাল অবস্থা হইতে স্বামী বিয়োগে এমন নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হন যে তাঁহাদের পারিবারিক সম্মানের দিকে তাকাইয়া ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না, উপরন্তু আত্মীয় স্বজন সংসারে নিতান্ত হেয় ও অপমানজনক জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাচ্য দেশের মত এদেশে মহিলাগণের শিক্ষাবল এমন নহে যে তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজের অন্নের সংস্থান করিতে পারেন। দেশের অবস্থা এমন শোচনীয়,—যদিও বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বাবলম্বী হইতে প্রয়াসী হ'ন তাহা হইলে প্রশংসিতা না হইয়া দশের নিকট নিন্দিতা ও স্থল বিশেষে লাঞ্ছিতা হ'ন, তাঁহাদের শিল্পোৎপন্ন বস্তু বিক্রয়ের জন্য কোনই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয় না বরং অন্যে, এমন কি নিজের আত্মীয়গণ পর্য্যন্ত পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া বাধা প্রদান করিতেও পশ্চাদপদ হ'ন না। এই সকল দুঃখিনীগণের দুঃখের যথাসাধ্য লাঘব করিবার জন্য সেবিকা ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা। যদি কোন স্বাবলম্বী দুঃস্থা শিল্প সম্ভার বিক্রয়ের সুবিধা করিতে না পারিয়া থাকেন ভাণ্ডারের সম্পাদিকাকে তাহা জানাইলে তিনি তাঁহার শিল্পাদি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে যত্নবতী হইবেন। সহৃদয়া কর্ম্মপ্রাণা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ভাণ্ডারের সম্পাদিকা রূপে এবং তাঁহার উদ্ভাবিত মহিলা সমিতির আয় প্রভৃতির দ্বারা এই ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রকৃতই বহু দুঃস্থের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন সম্পাদিকা বাৎসরিক কার্য্য বিবরণীর নিবেদনে বলিয়াছেন—

"কার্য্যক্ষেত্র আমাদের বেড়ে গেছে কত, সামনে পড়ে আছে অনন্ত, তারই অভিমুখে চলছি, শক্তিও ত চাই সেই অনুপাতে। সেই শক্তি সংগ্রহের জন্য আবার ডাক দিচ্ছি, ও মা বুকে

বুকে যে স্নেহবৎসলা সন্তানজননী ঘুমিয়ে আছ একবার জাগ মা জাগ! ও মা অন্নপূর্ণা তুমি অন্নদানে পরাঙ্মুখ নও ত কখন, তোমার ঘরে দীনদুঃখীর চিরঅন্নসত্র খোলা, ও মা জগদ্ধাত্রী তুমি জগৎকে প্রসব কর্‌ছ, পালন কর্‌ছ, স্নেহময়ী মা হয়ে বক্ষে ধারণ করে আছ, ও মা শক্তিস্বরূপিণী তুমি অবলা নও, অক্ষমা নও, সর্ব্বশক্তির আধাররূপিণী লোকলক্ষ্মী মা তুমি, তুমি একবার জাগ নারীর বুকে বুকে, একবার সাড়া দাও ত দেখি।"

যাঁর কাজ তিনি করাবেন, করাচ্ছেনও তাই, তাঁর দীনদুঃখী অসহায়া অনাথা কন্যাদের ভার আজ তাঁর উপযুক্ত সন্তানদের হাতে নিজে তুলে দিয়েছেন। এ কাজ ত যার তার নয়, এ যে মার কাজ, যিনি আমার মা তোমার মা ঐ দুঃখিনী বোনগুলির মা। তাই এ কাজ ত কাজ নয়, এ যে কাজের ছুটী, সংসারের স্বার্থের বেদনাক্লিষ্ট বন্ধন থেকে এ যে অহরহ পরিত্রাণ, এ যে মুক্তি, এ যে সংসারের গরলের মাঝে আনন্দ ও অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ! এই কর্ম্ম-সাগরে প্রতিদিন অবগাহন করে যেন আমরা নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হতে থাকি আমরণকাল।

"শুনেছি তোমারি নাম
অনাথ আতুর জন
এসেছে তোমারি দ্বারে
শূন্য ফেরে না যেন। "

এ সকল কার্য্য একের নহে। দশের সহানুভূতি প্রাপ্ত না হইলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাণরক্ষা হইবার নয়। আশা করি সহৃদয় মহোদয় মহোদয়াগণ এই সেবিকাভাণ্ডারকে যথাশক্তি পুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইবেন। নর সেবাই নারায়ণ সেবা। নর নারায়ণের সেবাকল্পে যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছুক তিনি অনুগ্রহ করিয়া 'সম্পাদিকা সেবিকাভাণ্ডার কোচবিহার' এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শুদ্ধি পত্র।

—※—

'পরিচারিকা'র সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বরলিপিতে কতকগুল ভুল, নীচের 'শুদ্ধ' ও 'পরিত্যাজ্য' স্তম্ভদ্বয়ের অনুযায়ী, সংশোধন করিয়া রাখিলে বাধিতা হইব ঃ—

পৃষ্ঠা।	সারিকা।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পরিত্যাজ্য।
১৬২	১	{	—	{
"	১	১ রা নে	১ রা নে	—
"	২	৩ (রা সঋা সা) } | নে না০ 'জা'	—	৩ (রা সঋা সা) } | নে না০ 'জা'
"	৩	{	—	{
"	৩	ণ্ণা দ্র	ণ্ণা দ্র	—
"	৪	ণ্ণা দ্র	ণ্ণা দ্র	—
"	৭	৩ | (সা –া সা) } না ০ 'ক'	—	৩ | (সা –া সা) } না ০ 'ক'

"	৭	৩ সা –া ন না	৩ সা –া না ০	—
১৬৩	১	০ II–া	০ II–া	—
"	১	৩ | সা খে	৩ | র্সা খে	—
"	২	১ | ঋা ভা	১ | ঋা	—
"	৮	০ II া ০	০ II া ০	—
"	৯	১ | জ্জর্জ্জা ঠ	১ | জ্জর্জ্জা ঠাং	—
"	৯	০ র্রা I থা	র্রা I থা	—
১৬৪	১	I২	I২´	—
"	৪	০ র্রা ঝোঁ	র্রা ঝোঁ	—

,,	৫	১ র্সা না	০ র্সা না	—
,,	৫	২´ {রা নে	১॰ রা নে	—
,,	৫	৩ Iসা কে	২´ Iর্সা কে	—
,,	৬	(। । সা) } ০ ০ 'জ্বা'	—	(। । সা) } ০ ০ 'জ্বা'
,,	৮	২´ র্জ্ঝা দা	২´ জ্ঝা দা	—
,,	৯	০ সা না	০ র্সা না	—

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } চৈত্র, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

বসন্তে পল্লীশ্রী।

শাখায় শাখায় ঐ
ফুলগুলি লাল্‌চে,—
মরি মরি কি সুষমা
চৌদিকে ঢাল্‌চে!

উপরে ফুটেচে যত
নীচেও বিছানো তত,—
জ্বলে, উপরে হাজার বাতি
নীচে পাতা গাল্‌চে!

ধরণীর এক কোণে
ছোটোখাটো পল্লী,
তিলে তিলে কি মাধুরী
বুকে আজ ধর্‌লি !
দেখি যত মনে হয়,—
তুই এ ধরার নয়
আহা, অমরার ছবিখানি
ভরা মায়াজাল যে !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বুদ্ধদেবের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম।*

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

পুণ্যভূমি এই অঙ্গদেশ একাধারে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান। রামায়ণের রোমপাদ, মহাভারতের কর্ণদেবের বিশাল রাজ্য এই অঙ্গভূমি—কত শত মুণি-ঋষির সাধনার ক্ষেত্র তাহা কে বলিতে পারে ? অদূরে শৈলমালার অন্তরালে বিভিন্ন-স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, জৈনগণের দ্বাদশ তীর্থধার বসুপূজ্যের জন্মস্থান, অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী নিকটেই, সুলতানগঞ্জে জহ্নুমুনির আশ্রম, মোদ অথবা মৌদ্গল্য ঋষির আশ্রম মোদ-গিরি, মুদ্গ-গিরি—বর্ত্তমান মুঙ্গের;—দূরে মন্দার পর্ব্বত।

করুণার অবতার শাক্যসিংহ গৌতমের পবিত্র চরণরেণুস্পর্শে এই বিহার প্রদেশের প্রত্যেক ভূমিভাগ শুচীকৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। কখনো তিনি সুদূর শ্রাবস্তিতে উপাসকশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে, কখনো রাজগৃহের বেণুবনারামে। কখনো গৃধ্রকুট পর্ব্বতের—সানুদেশে, কখনো গয়াশীর্ষে,

* [illegible] সারস্বত সম্মিলনে পঠিত।

কখনও অচিরবতী নদীর উপকূলে সুমধুর-স্বরে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন। হয়তো আমরা আজ যে স্থলে সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা তাঁহার এবং তদনুচর পঞ্চশত ভিক্ষুর পদরজ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া ছিল—কে জানে এই জামালপুরের উপর দিয়া তিনি চম্পা গিয়াছিলেন কি না ? পালি সাহিত্য পাঠে অবগত হই—'ভগবা চম্পায়ং বিহরতি গগ্‌গরায় পোক্‌খরণিয়া তীরে (বিমানবত্থু অট্ঠ—কথা)...মহতা ভিক্‌খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং চম্পানগরং প্রবিসিত্বা···ইত্যাদি—অর্থাৎ চম্পারাজমহিষী—গর্গরাদেবী প্রতিষ্ঠিত শতদল কমল প্রফুল্ল সরোবরের তীরে তিনি বাস করিতেছিলেন—বহুভিক্‌খু পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাপাত্রহস্তে পিণ্ডপাতের নিমিত্ত চম্পানগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সংযুক্ত নিকায়ে পাঠ করি যে এই চম্পানগরে পাঁচশত ভিকখু, সাতশত উপাসক সাতশত উপাসিকা এবং সহস্র সহস্র দেবগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। 'চম্পেয্য জাতকে পাঠ করি যে চম্পানদীর উপকূলে অঙ্গাধিপতি চম্পা রাজের সহিত মগধরাজের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। মগধরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরাভব-লাঞ্ছিত জীবন বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত দুইকূলপ্লাবী চম্পানদীতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নদীর অভ্যন্তরে এক নাগরাজ মণিমাণিক রচিত প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। নাগরাজ মগধরাজকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন ইত্যাদি। পরযুগে দেখিতে পাই জামালপুরের অনতিদূরে কাজরা নামক স্থান এক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের তীর্থভূমি ছিল। Beal's Budhist Records of Western Countries. নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে ইহার উল্লেখ পাই। ইহার পূর্ব্বনাম কুজাগৃহ ছিল, পরে অপভ্রংশে কজুঘির কাজরী কাজরায় পরিণত হইয়াছে। এখনও তৎসন্নিকটে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন কলহ গ্রাম বর্ত্তমান কলহ গাঁওয়ের অনতিদূরে। পাথর ঘাটা নামক স্থান সুবিখ্যাত শিলাসংগম বা বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় অনেকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে, এবং এক কালের বৌদ্ধ তক্ষণ শিল্পের পরিচয়,—এই স্থানে প্রাপ্ত বুদ্ধ, মৈত্রেয় এবং অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্ত—হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে—এই বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডিত্যরশ্মিতে বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহার ছয়টা দ্বার ছিল; সুবিখ্যাত ছয় জন পণ্ডিতের দ্বারা তাহা রক্ষিত হইত। তাঁহাদিগকে বিচারে পরাজিত না করিয়া কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

স্মরিতে পারিতেন না। আজ সে গৌরব কোথায়? হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পবিত্র তীর্থভূমির পুরাতন স্মৃতিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। সেই বৌদ্ধ দিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলিবার—সুযোগ আপনারা দিয়াছেন,—তাহাতে আমি সম্মানিত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

বৌদ্ধ রতনত্রয়ের বন্দনা করিয়া আমি বুদ্ধদেবের জীবনী, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ—এই কয়টা বিষয় বলিতে প্রয়াস পাইব।

মহাকারুণিকং নাথং হ্রেয্যসাগর পার গুং।
বন্দে নিপুণগম্ভীরং বিচিত্রনয় দেসনং ॥
বিজ্জাচরণসম্পন্না যেন নিস্যন্তি লোকতো।
বন্দে তং উত্তমং ধম্মং সম্মা সম্বুদ্ধ পূজিতং ॥
শিলাদিগুণ সম্পন্নো ঠিত মগ্‌গফলেসু যো।
বন্দে অরিসসঙ্ঘং তং পুঞ্‌ঞক্খেত্তং অনুত্তরং ॥

সকলেই অবগত আছেন যে গৌতম কপিলাবস্তু নগরে খৃ পূঃ ৫৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধগয়ায় অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে তিনি সম্যক বোধি লাভ করেন, তাহার পর তিনি 'বুদ্ধ' হন। তাঁহার পূর্ব্বে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' (অর্থাৎ 'ভাবী' বুদ্ধ) ছিলেন। শাক্যমুনি, সিদ্ধার্থ ও তথাগত নামেও পরিচিত হইতেন। তিনি যখন তুষিত স্বর্গে বিরাজ করিতেছিলেন তখন দেবগণ মানবের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে জম্বুদ্বীপে (ভারতে) মধ্যদেশে তিনি আবির্ভূত হইবেন। শুদ্ধোধন হইবেন তাঁহার পিতা, মায়াদেবী অথবা মহামায়া হইবেন তাঁহার মাতা—কিন্তু সাত দিনের ভিতরেই, মায়াদেবী লোকান্তরিত হইবেন। তিনি তুষিত স্বর্গ ত্যাগ করিলেন। মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন বোধিসত্ত্ব শ্বেতবর্ণ বারণ হইয়া রজতপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া রজতবর্ণ শুন্ডে পদ্ম ধারণ করিয়া তাঁহার শয্যাবারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া যেন কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্বপ্ন শুদ্ধোদনের নিকট নিবেদিত হইলে তিনি নৈমিত্তিকগণকে আহ্বান করিয়া তাহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, বালক জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি হয় রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন নতুবা আগার

পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইবেন। লুম্বিনি উদ্যানে শালশাখা গ্রহণ করিয়া মায়াদেবী প্রসব করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রসূত হইলেন। চতুর্দ্দিকপালগণ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তাঁহার অঙ্গে দ্বাত্রিংশৎ মহাব্যঞ্জন (লক্ষণ) এবং বহু অনুব্যঞ্জন পরিলক্ষিত হইল। বালক জন্মগ্রহণ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"আমি এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"—সেই সময়েই তাঁহার স্ত্রী যশোধরা, তাঁহার ঘোটক কণ্ঠক; তাঁহার সারথি ছন্দ, তাঁহার ক্রীড়ার সাথী কালুদায়িন এবং প্রিয় শিষ্য আনন্দ জন্মগ্রহণ করিলেন। ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল; ঋষি অসিত বলিলেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শুদ্ধোধন চিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—বালক কি হইবে, রাজচক্রবর্ত্তী না সন্ন্যাসী? ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে বালক 'চতুর্নিমিত্ত' দর্শন করিয়া গৃহত্যাগ করিবে। সেই চতুর্নিমিত্ত (১) পলিতকেশ বৃদ্ধ, (২) রোগী (৩) শবদেহ (৪) সন্ন্যাসী, এই চারিটা দৃশ্য যাহাতে বালকের নয়নগোচর না হয় সেই প্রযত্ন তিনি করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্যে তাঁহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। একদিন শুদ্ধোধন উৎসব উপলক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন, ধাত্রীরা উৎসব দেখিতে গিয়াছিল—সেই অবকাশে বালক জম্বুবৃক্ষের নিম্নে পদ্মাসনে বসিয়া প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বৃক্ষের ছায়া স্থির হইয়া রহিল।

ক্রমে কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের দুহিতা যশোধরার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। শুদ্ধোদন নিরন্তর প্রযত্ন করিতে রহিলেন যেন ভবিষ্যদ্বাণী কথিত চতুর্নিমিত্ত তিনি দেখিতে না পান। আমোদ প্রমোদের নানা ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সব চেষ্টা সব প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। দেবতাগণ কৌশলে তাঁহাকে সেই চতুর্নিমিত্ত দর্শন করাইলেন। গৌতম প্রথম তিন নিমিত্ত দর্শন করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া তাহাদের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসীরূপ চতুর্থ নিমিত্ত দেখিয়া তাঁহার মন শান্ত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ত্রিবিধ দুঃখ অতিক্রম করিবেন। অতএব তিনি গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিলেন। এদিকে শুদ্ধোদন তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত "সর্ব্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিতা নৃত্যগীতে সুশিক্ষিতা দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী

কামিনীগণকে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইল। নিদান কথায় লিখিত আছে—'বোধিসত্ত্ব ঘুমাইয়া পড়িলে কামিনীগণ বলিলেন—যাঁহার জন্য এত নৃত্যগীতের আয়োজন তিনিই যদি ঘুমাইলেন—তখন আমরাই বা জাগিয়া থাকি কেন? তখন তাঁহারাও ঘুমাইতে লাগিল ইহার একটা বীভৎস ছবি দেওয়া হইয়াছে।--বোধিসত্তো পবুজি্ঝত্বা সয়ন পিট্ঠে পল্লঙ্কেন নিসিন্নো অদ্দস তা ইত্থিয়ো তুরিয়ভণ্ডানি অবথরিত্বা নিদ্দায়ন্তিয়ো একচ্চা পগ্ঘরিত খেলা লালকিলিন্নগত্তা একচ্চা দন্তে খাদন্তিয়ো একচ্চা কাকচ্ছন্তিয়ো একচ্চা বিপ্পলন্তিয়ো একচ্চা বিকটমুখা একচ্চা অপগতবত্থা পাকটবীভচ্ছ-সম্বাধট্ঠানা—ইহার ভাবার্থ এই যে বোধিসত্ব প্রবুদ্ধ হইয়া—পালঙ্কে—আসীন হইয়া দেখিলেন সেই কামিনীগণ বাদ্যযন্ত্রগুলি নামাইয়া ঘুমাইতেছেন কোথাও লালানির্গত হইয়া গাত্র অভি-সিঞ্চিত করিতেছে, কোথাও তাঁহারা দন্ত কিড়মিড়ি করিতেছেন, কোথাও প্রলাপ বকিতেছেন, কোথাও অপগতবস্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন কোথাও বা বীভৎসভাব প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মনে হইল এ যেন শ্মশান। তিনি বলিলেন আজই মহাভিনিষ্ক্রমণ করা উচিত। তখনই সারথি ছন্নকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। তখন একবার পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। অতি সন্তর্পণে রাহুলমাতার গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে গন্ধতৈল প্রদীপ জ্বলিতেছে। রাহুলমাতা মল্লিকাদি পুষ্পাবিকীর্ণ শয্যায় পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া নিদ্রায় মগ্ন।—বোধিসত্ব গৃহদ্বারে পদস্থাপন করিয়াই সে দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলেন—"দেবীর হস্ত অপনয়ন করিয়া যদি পুত্রকে গ্রহণ করি তবে তিনি উঠিয়া পড়িবেন—আমার গমনের অন্তরায় উপস্থিত হইবে।" নিঃশব্দে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। বড়ই মর্ম্মস্পর্শী সে দৃশ্য।

সেই রাত্রিতেই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। দেবতাগণ-অশ্বখুর তুলিয়া ধরাতে পদশব্দ শ্রুত হইল না। সুপ্তনগর সুপ্তই রহিয়া গেল। মার গৌতমকে রাজ্যলোভ দেখাইয়াও তাঁহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। অনোমা নদীর অপর তীরে তিনি সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ছন্নকে দিলেন। অতঃপর তরবারির দ্বারা কেশ ছেদন করিয়া স্বর্গের দিকে উষ্ণীষ ছুড়িয়া দিলেন। দেবতাগণ তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে লইয়া গিয়া তাহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঘটিকার নামক এক দেব দূত লুব্ধকের বেশে তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহার বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় বস্ত্রাদি তাঁহাকে দিলেন। তাহার পর রাজগৃহ

অভিমুখে চলিলেন। মগধরাজ বিম্বিসারের রাজ্যার্পণ প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিয়া গয়ার সন্নিহিত উরুবিল্ব নামক গ্রামে আসিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। ছয়বৎসর কাল কঠোরতা অবলম্বন করিবার পর তাঁহার ধারণা হইল এই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করা যায় না। আবার তিনি পরিব্রাজক জীবন গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পাঁচ জন সঙ্গী বীতশ্রদ্ধ হইয়া সারনাথ মৃগদাবে চলিয়া গেলেন ক্রমে গৌতম নৈরঞ্জনা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সুজাতার নিবেদিত পরমান্ন ভোজন করিয়া স্বর্ণপাত্র নদীতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"যদি আমি বুদ্ধ হই তবে ইহা উজান বহিয়া চলুক।" পাত্র উজান চলিল।

সন্ধ্যার সময় বোধগয়ার অশ্বত্থ বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই দ্রুমের নিম্নে সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া—ইহার নাম বোধিদ্রুম হইয়াছিল। স্বোত্তিক নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে আট গোছা ঘাসের বোঝা লইয়া পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন —দ্রুমের নিম্নে তৃণাস্তরণে আমি উপবেশন করিলাম। আমার গাত্র, স্নায়ু, অস্থি যদি ক্ষয় হইয়াও যায়, শোণিত যদিও শুকাইয়া যায়, তথাপি সম্বোধি লাভ করিবার পূর্ব্বে এই আসন ত্যাগ করিব না।" এই দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য মার বোধিসত্ত্বকে নানা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, বিকট মূর্ত্তি দৈত্যগণ আসিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। মারের প্ররোচনায় প্রভঞ্জন প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। তাঁহার উপর শৈলখণ্ড ও অস্ত্র-শস্ত্রের বৃষ্টি হইতে লগিল, জ্বলন্ত অঙ্গার আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে সকলই সুকোমল প্রসূণে পরিণত হইয়া পড়িল। মারের আক্রমণে দেহরক্ষী দেবতাগণও ভয়ে পলাইয়া গেলন। তখন তিনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে সাক্ষী করিলেন। এই মুদ্রাকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা কহে।—পৃথিবী তাহার উত্তরে এরূপ ভীষণ শব্দ করিলেন, যে স্বরে ভীত হইয়া মার সৈন্যগণ পলায়ন করিল। দেবতা ও নাগগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিজয়গীতি গাহিলেন।—তাঁহার শত্রু পরাভূত হইবার পর রাত্রে তিনি সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। প্রথম যামে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; দ্বিতীয় যামে বর্ত্তমান জীবনের জ্ঞান উদ্ভাসিত হইল, তৃতীয় যামে নিদান অথবা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা প্রতিভাত হইল, চতুর্থ যামে উষার আলোকে তিনি সকল বস্তুরই জ্ঞান লাভ করিলেন।

সম্বোধি লাভের পর তিনি সাত সপ্তাহ উপবাস করেন। প্রথমে বোধিদ্রুমের নিম্নে উপবাস করিয়া সমগ্র অভিধর্ম্ম পিটক আবৃত্তি করেন তাহার পর অজপালের ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিম্নে ধ্যানরত হন। তখন রতি, তৃষ্ণা ও মোহ নামক মার কন্যাগণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার নিষ্ফল প্রযত্ন করে। তাহার পর মুচলিন্দ বৃক্ষের তলে ধ্যাননিমগ্ন হইলে নাগরাজ মুচলিন্দ স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বৃষ্টির প্রকোপ হইতে রক্ষা করেন। শেষে রাজায়তনের দ্রুমের নিম্নে ধ্যানরত হন, ধ্যানভঙ্গে তপুস্স এবং ভল্লুক নামক দুইজন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে যবের পিষ্ঠক ও মধু নিবেদন করেন,—চতুর্ম্মহারাজিক (অর্থাৎ চতুর্দিকপাল) চারিটা ভিক্ষাপাত্র তাঁহাব সম্মুখে ধরিলে তিনি ইচ্ছা করিলেন—চারিটা ভিক্ষাপাত্র এক হইয়া যায়। তাহাই হইল; তাহাতেই—তিনি শ্রেষ্ঠীপ্রদত্ত প্রথম পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলেন। শ্রেষ্টিদুইজন তাঁহার প্রথম উপাসক (গৃহস্থ থাকিয়া ও বুদ্ধদেবের পূজক) হইলেন।

তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অজপালের ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিম্নে নিষিন্ন হইয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন যে ধর্ম্ম তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা গভীর ও দুর্ব্বোধ। সাধারণে কি ইহা বুঝিতে পারিবে? না অযথা সময় নষ্ট হইবে? তখন ব্রহ্মা এবং অন্ত দেবতাগণ আসিয়া—মানবের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গী পঞ্চবর্গীর সন্ন্যাসীর সন্ধানে বারানসীর সন্নিহিত 'ইসিপত্তন মৃগদাবে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রথম 'ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন' করিলেন অর্থাৎ প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সেই পঞ্চ সন্ন্যাসী নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এইরূপে সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

গৌতম ২৯ বৎসর বয়সে মহাভিনিস্ক্রমণ এবং ৩৫ বৎসর বয়সে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতে ৮০ বৎসরে তাঁহার পরিনির্ব্বানকাল পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে ধর্ম্মের অববাদ করিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিতেন; কিন্তু দীক্ষিতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ভিক্ষুগণের উপর দীক্ষার ভার অর্পিত হইল। পূর্ব্বে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই চলিত, এখন হইতে সঙ্ঘেরও শরণ লইতে হইল।

বস্সাবাস :—বর্ষায় সময় পর্য্যটনের সুবিধা হইত না, অতএব তিন মাস কাল বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুগণ সঙ্ঘারামে থাকিতেন।

পবারণা :—বর্ষার পর পুনরায় বাহির হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার প্রথম দীক্ষিতের মধ্যে কাশ্যপ নামধারী ভ্রাতাত্রয়, উরুবিল্বের অগ্নি উপাসকগণ এবং জটিলগণ। তিনি কয়টী Miracle দেখাইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে—আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজগৃহে সারীপুত্র ও মৌদলল্লায়ণকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

তাৎকালীন নৃপতিগণ—যথা কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, মগধাধিপতি বিম্বিসার এবং তৎপুত্র অজাতশত্রু—তাঁহার নিকটে আসিয়া ধর্ম্ম কথা শুনিতেন। তাঁহারা সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে আরাম, কুঞ্জ এবং নানাবিধ অন্য দান নিবেদন করিয়াছিলেন। নৃপতি ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত ও অনেক দান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠীকুলপতি অনাথপিণ্ডিক যত স্বর্ণ-মুদ্রাভূমির উপর আস্তৃত করা যায় তত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া জেবন ক্রয় করিয়া সঙ্ঘে দান করিয়াছিলেন। বৈশালীর বারবণিতা আম্রপালী (অম্বপালি) তাঁহার আম্রবন সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। সম্বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব রাজগৃহে প্রথম আসিলে রাজা বিম্বিসার তাহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ বেণুবন তাঁহাকে দান করেন। এই বেণুবনে বুদ্ধদেব প্রায়ই থাকিতেন। এইখানে তাঁহার খুল্লতাতের সন্তান দেবদত্ত তিন তিনবার তাঁহার প্রাণবধের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সম্বোধিলাভের পর দ্বিতীয় বৎসর তিনি শুদ্ধোদনের প্রার্থনায় কপিলবস্তু আগমন করেন। তিনি নগরের বহির্ভাগে একটী কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতাপুত্রের কে কাহাকে প্রথমে বন্দনা করিবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে আকাশমার্গে আসীন হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তখন পিতা,—পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন ও ন্যগ্রোধারাম দান করেন। এই সময়ে তিনি তাহার প্রিয়শিষ্য আনন্দ, তাহার শত্রু দেবদত্ত এবং অনুরুদ্ধ ভদ্দিয় প্রভৃতি অন্যান্য শাক্যগণকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

এই সময়ে একটি করুণ ঘটনা ঘটে। যশোধরা রাহুলকে পিতৃসকাশে উপসম্পদা গ্রহণের নিমিত্ত পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন—"বৎস, গিয়া বল, হে ভিক্ষু, আমি পিতৃ-সম্পদের অধিকারী, আমার অধিকার লইতে আসিয়াছি। বুদ্ধদেব রাহুলের আগ্রহ দেখিয়া সারীপুত্রকে আদেশ দিলেন :—"হে সারীপুত্র, রাহুলের সঙ্ঘ প্রবেশের অনুমতি দিতেছি।"

শত বিমল কুসুম সজ্জিত সুষমা মণ্ডিত রাহুলের দেহে আজ অগণিত গ্রন্থিযুক্ত মলিন চীরবাস, ভ্রমরকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম অপগত হইয়াছে; নবোদ্গত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কোমলারুণ করপল্লবে সন্ন্যাসীর পিণ্ডপাত গ্রহণ জন্য ভিক্ষাপাত্র রহিয়াছে। হায়, হায় কপিলবস্তু রাজ্যের গৌরবমণি বালার্ককান্তি ভাবী উত্তরাধিকারীর কি এই বেশ? এ হৃদয়-বিদারী দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ শুদ্ধোধনের মর্ম্মন্তুদ যাতনা উপস্থিত হইল—নয়ন হইতে অজস্রধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বিষশল্যদিগ্ধ হৃদয়ের যাতনায় অস্থির শুদ্ধোদন পুত্রসমীপে আসিয়া কহিলেন—"গৌতম, তুমি একি করিলে?" তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিলেন যে, অতঃপর যেন কোনও সন্তান পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে না পারে। সেই অবধি যে কোন বালক পিতামাতার অনুমতি লয় নাই, অথবা যাহার বয়স বিংশতি বৎসর হয় নাই তাহাকে উপসম্পদা দিতে বুদ্ধদেব নিষেধ করিয়াছিলেন—"যো পণ ভিক্‌খুজানং উনবীশতিবস্‌সং পুগ্‌গলং উপসম্পাদেয্য, সো চ পুগ্‌গলো অনুপসম্পন্নো তেচ ভিক্‌খু গারয্‌হা।"

যে ছয়জন "অঞ্ঞতিত্থিয়"গণের অর্থাৎ—ধর্ম্মাবলম্বীগণের নায়কের সহিত তাঁহার প্রায়ই বিচার বিতর্ক হইত তাঁহাদের নাম—পূরণ কশ্যপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেশ কম্বলিন, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত তাঁহাদের গর্ব্ব চুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে একটি আশ্চর্য্য miracle দেখান। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকবলয়কে সংযোযিত করিয়া আকাশমার্গে এক বৃহৎ পথ রচনা করেন, এবং তাহার উপর আরোহণ করিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ হইতে জলস্রোত প্রবাহিত করেন এবং নিম্নার্দ্ধ হইতে অগ্নিবর্ষণ করেন। এই অবস্থায় মহান জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দেন।

ইহার পরই তিনি শিষ্যগণকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে আগমন করেন। তথায় মাতা মায়াদেবী এবং দেবতাগণের নিকট অভিধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। তিন মাস অতীত হইলে তিনি আবার মর্ত্ত্যভূমে ফিরিয়া আসেন। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিবার নিমিত্ত তিনটী সোপান শ্রেণী রচিত হয় মধ্য ভাগেরটা বৈদূর্য্য মণির, দক্ষিণ ভাগেরটা সুবর্ণের, এবং বাম ভাগেরটা স্ফটিকের রচিত। তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণে ব্রহ্মা এবং বামে ইন্দ্র উক্ত সোপান শ্রেণী দিয়া সঙ্কাস্য নামক স্থানে মর্ত্ত্যভূমে অবতরণ করেন।

অশীতি বৎসর বয়সে তিনি পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করেন। মহাপরিনিব্বান সুত্রে লিখিত আছে যে পাবানগরবাসী চুন্দ নামক একজন কর্ম্মকার প্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণে তাঁহার পীড়া হয়। কুশীনারের অভিমুখে যাইবার পথে পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে মল্লগণের কুঞ্জে যুগল শাল তরুর মধ্যে রচিত শয্যায় তিনি 'সিংহ শয়নে' শায়িত হন। অন্তিম কালে প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং সম্মিলিত ভিকখুগণকে তিনি শেষ ধর্ম্মের কথা শুনাইলেন এবং সঙ্ঘের নিয়ম পালনের অনুজ্ঞা দিলেন। পরিব্রাজক সুভদ্রকে তিনি এই সময় দীক্ষিত করেন—ইনিই তাঁহার শেষ শিষ্য। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাহারও বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বিষয় কোনও সন্দেহ আছে কি না এবং নাই বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে অন্তিম বিদায় দিলেন। তাঁহার শেষ কথা—"হন্দ দানি ভিক্‌খবে আমন্তয়ামি বো: বয়ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।" (অর্থাৎ—সকল সংস্কারই বা যাবতীয় বস্তু ধ্বংসপ্রবণ, অতএব প্রমোক্ষের নিমিত্ত অপ্রমত্ত হইয়া যত্ন কর।")

তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সময়ে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিলেন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র বিলাপ করিলেন। শক্রা একটা গাথা উচ্চারণ করিলেন—

অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয়ধম্মিনো।
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং উপসমো সুখো॥

অর্থাৎ—সংস্কার সমূহ (যাবতীয় বস্তু) অনিত্য, তাহাদের ধর্ম্ম উদয় ও ব্যয়; উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ইহাদের উপশমই সুখ।

এই শ্লোকটী—কাষায় পরিধারী সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুগণের মুখে নিরন্তর ধ্বনিত হয়।

ছয় দিন ধরিয়া মল্লগণ বাদ্যসমারোহ করিয়া বুদ্ধ দেবের শব দেহ পূজা করিলেন। সপ্তম দিবসে আট জন সামন্ত দ্বারা বাহিত হইয়া শবদেহ নগরের বাহিরে মকুট বন্ধন নামক মন্দিরে নীত হইল। পরে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ডে জড়িত হইয়া লৌহনির্ম্মিত শবাধারে রক্ষিত হইয়া চিতায় স্থাপিত হইল। শিষ্য কাশ্যপ আসিতেই চিতা আপনিই জ্বলিয়া উঠিল, অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হইয়া চিতা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

মল্লগণ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রক্ষা করিল। মগধরাজ অজাত শত্রু, বৈশালির লিচ্ছবিগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকাপ্পর বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঘদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ এবং পাশর মল্লগণ দেহাবশেষের অংশ প্রার্থনা করিলেন। কুশিনগরের মল্লগণ তাহা দিতে না চাহিলে ভীষণ যুদ্ধের উপক্রম হইল। দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ সে বিবাদ মিটাইয়া দিতে দেহাবশেষ আট বিভাগে বিভক্ত করিলেন : এই দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইল। কথিত আছে যে পরবর্ত্তী কালে সম্রাট অশোক এই সকল স্তূপ খনন করিয়া দেহাবশেষ বাহির করিয়া লইয়া স্বয়ং তাহার উপর চুরাশী হাজার—স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কেবল রামগ্রামের স্তূপ নাগগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে তিনি তাহা হইতে দেহাবশেষ লইতে পারেন নাই।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

ফুলশয্যা।

—:০:—

ফুলশেয তুমি পাতিয়াছ বঁধু ?
কাজ নাই প্রিয়, কাজ নাই
অঙ্গে আমার ফুলের ভূষণ
সাজ নাই !
এ তনু কোথা সে কমলের দল
বুকে কোথা আশা, প্রাণে কোথা বল
প্রথম-তরুণ-প্রেমের মিলন-
লাজ নাই;
ফুলশেয তুমি পেতেছ বন্ধু
কাজ নাই প্রিয়, কাজ নাই !

তবে কি এমন জ্যোছনা-হসিত
মিলন-রজনী হবে শেষ ?
দুটি বুকে শুধু কাঁদিয়া মরিবে
প্রেমাবেশ ?
বিফলে যাবে কি পূজা-আয়োজন ?
কাঁদিয়া পোহাবে রজনী এমন ?
বিরহ শয়নে বক্ষে লুটাবে
কালোকেশ ?
তবে কি বিফলে জ্যোছনা বিধুর
মিলন-রজনী হবে শেষ ?

কি বলিব বঁধু মিলন-সাজের
সন্ধ্যা গিয়াছে সে কখন,
—আর ত নাচে না, আর ত হাসে না
ভাঙ্গা মন !
আঁখিতে কাজল দিতে কাঁপে হাত,
উছলিয়া ওঠে বুকের প্রপাত
শিথিল কাঁচলি বাঁধনের তলে
সারাক্ষণ।
কি বলিব বঁধু বাসক-সাজের
গিয়েছে সন্ধ্যা সুলগন !

তোমার আঁখির ঐ প্রেমালোক
মোর প্রাণে সে যে কথা কয়,
ও-পারের তীর বড় কাছে যেন
মনে হয় !
সন্ধ্যাতারার ঐ আলোশিখা
ও-পারের ভালে আছে যেন লিখা
তোমার প্রেমের আলিঙ্গনের
বরাভয়
তোমার আঁখির তারায় আলোক
মোর প্রাণে যেন কথা কয় ।

ফুলদল তুমি পেতেছ বন্ধু ?
পেতে রাখ প্রিয় ফুলদল.
ও-পারে ফুটিবে মিলন-রাতের
এ কমল !
সে যে বড় মিঠে, সে যে বড় মধু
শুধু দুটি প্রাণ, শুধু দুটি বঁধু
আর যাহা কিছু ডুবিবে গভীর
রসাতল,
ফুলশেষ ফুলে ঢেকে রাখ বঁধু
পেতে রাখ প্রিয় ফুলদল।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাতঃকালটা শুধু শুধু নীরস বিষয়ে তর্ক করিয়া মাটি করা অপেক্ষা একটু বেড়াইয়া আসা ভাল বিবেচনা করিয়া উভয়েই বর্ষাতি গায় দিয়া ডাওহিলের দিকে বেড়াইতে চলিলাম। অনেকেই প্রাতভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, কেহ বা একক্, কেহ কেহ বা সস্ত্রীকও আসিয়াছিলেন। আবার যাঁহারা দুর্ব্বল অথবা রুগ্ন তাঁহারা ভূটিয়ার কাঁধে ডাণ্ডিতে চড়িয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ডাওহিল কার্শিয়াং হইতে প্রায় দুই মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত, এবং পথটি বড়ই বন্ধুর, এতটা পথ চড়াই উঠিতে বড়ই ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। পুরুষেরা সকলেই ন্যূনাধিক ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বেদসিক্ত রক্তিম বদন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে তাঁহারাও বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়া যেরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন তদ্দর্শনে আমার শারীরিক ক্লান্তি লজ্জায় দূরে পলায়ন করিয়াছিল।

পথের দুধারে মাঝে মাঝে দু' একটি বড় বড় বাড়ী, সবগুলিই প্রায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা বসন্তের পাখীর মত শৈলবিহারে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ষাসমাগমে সকলেই সমতল প্রদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনঃ এই সকল বাড়ীতে লোক সমাগম হইবে, তাঁহারাও আবার নবেম্বরের প্রথমেই চলিয়া যাইবেন। এইরূপে বাড়ীগুলি বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল শূন্য পড়িয়া থাকে; কিন্তু অপর ছয় মাসের ভাড়া হইতেই গৃহস্বামীগণ সংবৎসরের ট্যাক্স্ ও ভাড়া ইত্যাদি পোষাইয়া লন। কি দার্জ্জিলিং কি কার্শিয়াং, পাহাড়ে যাঁহার একখানি বাড়ী আছে তিনি কুলীন পুত্রের পিতা অপেক্ষাও অধিক দুরাকাঙ্খী। কেহ বাড়ীভাড়া করিতে গেলে তাঁহারা সহজে কাহাকেও শেষ কথা দেন না, শুধু নানা কথা বলিয়া গ্রাহককে হাতে রাখিয়া ঘুরাইতে থাকেন, অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে

এইরূপ দরদস্তরও দালালির ফলে অনেক বাড়ী কোন কোন season এ ভাড়াই হয় না।

যতই ডাওহিলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম ততই চতুর্দ্দিকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা দেখিতে পাইতেছিলাম এবং ঠাণ্ডাও বেশী অনুভূত হইতেছিল। শীতকালে নাকি এ স্থান প্রায় সদা সর্ব্বদা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকে, এবং রাত্রি কালে সময় সময় তুষার পাতও হয়। পাহাড়ের শীতে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া তখন এখানে বাস করা বড়ই সুকঠিন হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে দুরন্ত শীতের জন্য হাত পায়ের আঙ্গুল ফুলিয়া যায় এবং বড়ই কষ্টপ্রদ chilblain চুলকানি উপস্থিত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই ডাওহিল আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাওহিলে বন বিভাগের ডেপুটী কন্‌সারভেটারের আফিস, ফরেষ্টারগণের ট্রেনিং স্কুলে আছে, এক কথাতে বলিতে গেলে এখানে বন-বিভাগের বড় রকম একটা আড্ডা। একটি পুলিশ আউট পোষ্ট, ও টেলিগ্রাফ্ আফিস ও দু এক খানা দোকানও আছে। আর ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়া বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয় আছে। স্কুলগৃহ, ছাত্রাবাস ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গৃহ ও ক্রীড়া প্রাঙ্গন প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যেন ডাওয়াহিলে এক অমরাবতী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষার্থিগণের শিক্ষা ও সুখ সুবিধার প্রতি গবর্ণমেণ্টের যেরূপ যত্নচেষ্টা ও সতর্কদৃষ্টি রহিয়াছে সমগ্র বঙ্গ দেশের অন্য কোন অনুষ্ঠানের Institutionএর জন্য ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও আছে কিনা সন্দেহ।

ডাওহিলের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় পশ্চাদিক হইতে কে যেন পৃষ্ঠদেশে সজোরে চপটাঘাত করিল, ফিরিয়া দেখি আমারই পুরাতন এক বাল্য-বন্ধু। বহুদিনের পর হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎকার হওয়ায় তিনি আমাদিগের উভয়কে একরূপ গ্রেপ্তার করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার বাসাতেই আমাদের উভয়ের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন হইয়াছিল।

আমাদিগের তত্ত্ব তল্লাস করিবার জন্য তাঁহার আর্দ্দালিকে রাখিয়া তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। এক থাকী পোষাকধারী পাহাড়িয়া যুবক বীরপদক্ষেপে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল

তাহার ক্ষৌরমুণ্ডিত মস্তক, ভ্রূ ও মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং কৌতূহল দমনে অসমর্থ হইয়া তাহাকে এরূপ ভাবে ক্ষৌর করাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে বেচারী নিতান্ত বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল যে সম্প্রতি তাহার ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, বহু পূর্ব্বেই মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় খাস ছৈত্রীগণের সামাজিক নীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে তাহাকে কেশ ভ্রূ সকলই মুণ্ডন করিতে হইয়াছে, অন্যথায় শুধু মস্তক মুণ্ডন করিলেই চলিত।

খাস ছৈত্রী কাহাকে কহে জিজ্ঞাসা করিলে সে শুধু "ছৈত্রী হো, ছৈত্রী হো" করিতে লাগিল, কিন্তু ছৈত্রী কি এবং যদি ক্ষত্রিয় হয় তাহা হইলে "ছৈত্রী" বলিবার তাৎপর্য্য কি ভাবিতে লাগিলাম। বন্ধুবর বাহিরে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিতান্ত বিজ্ঞের মত একটা গুরুতর রকমের ভণিতা করিয়া কহিলেন যে "ছৈত্রীর" ইতিহাস জানিতে হইলে প্রথমে খাস জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। খাস জাতির ঐতিহাসিক যুগ সঠিক নির্ণয় করা বড়ই কঠিন, তবে এরূপ অনুমান হয় যে গজনীর সম্রাট্ সুলতান মাহমুদ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণকালে যে সকল হিন্দু আপন আপন ধর্ম্ম ও মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত নেপালের আরণ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত পার্ব্বত্য-সুন্দরীগণের সংমিশ্রণে যে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহারাই "খাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। "খাস" শব্দ বোধ হয় খস্‌সু শব্দ হইতে উৎপন্ন, খস্‌সু অর্থে মৃত্যু হওয়া, পতন হওয়া, সুতরাং মনে হয় যে যাহারা এই সকল নবাগত মার্জ্জিতরুচি বৈদেশিকগণের রূপগুণের মোহ আকর্ষণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহারাই এ নূতন জাতিটীকে অবজ্ঞা সূচক "খাস্ বা পতিত" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

ইহাতে সুন্দরীগণ মনঃক্ষুন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রণয়পাত্রীগণের সন্তোষ বিধানার্থ তাহাদিগের গর্ভসম্ভূত সন্তানগণকে এবং যে সকল পার্ব্বত্যবীর তাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "জনই উপনীত"গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। এ নিমিত্ত আমরা আজকাল একই জাতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলিকে "জনই" ধারণ করিতে দেখি ও কতকগুলিকে দেখি না।

৩

আবার, ব্রাহ্মণগণের ঔরসে হীন জাতীয়া পার্ব্বত্য রমণীর গর্ভে, অথবা ক্ষত্রীয় পিতার ঔরসে খাস মাতার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা শুধু "ক্ষত্রিয়" পদবী মাত্র গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্যার জং বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে কতকগুলি এই শ্রেণীর খাস আপনাদিগকে "ছেত্রী" বলিয়া খ্যাত করে, এবং সেই অবধি ছৈত্রী হওয়া একটি ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ছৈত্রী বলিয়া কোন জাতির অস্তিত্ব নেপালে কখনও ছিল না।

ছৈত্রী উপাখ্যান সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই নানী আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছিল যে আহার্য্য প্রস্তুত, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনজনে যাইয়া আহার করিতে বসিলাম। আহারের আয়োজনের ত্রুটী ছিল না, কেবল একমাত্র মৎস্যের অভাবই পরিলক্ষিত হইল।

মৎস্যাদি কার্শিয়াং হইতে আনাইয়া লইতে হয়, কিন্তু কার্শিয়াংএ যে যৎসামান্য মৎস্য আমদানি হয়, তাহাতে স্থানীয় লোকেরই অভাব সম্পূরণ হয় না। যাঁহারা ষ্টেশন মৎস্যের ঝুড়ি দোকানে পৌছিবার সময় দৈবক্রমে উপস্থিত থাকেন তাঁহাদিগের ভাগ্যেই মৎস্যের ব্যঞ্জন ভোজন ঘটে, অন্যের পক্ষে মোটেই নহে। অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও কার্শিয়াং হইতে রবিবার হাটের দিন আবশ্যক মত ক্রয় করিয়া আনিতে হয় নচেৎ হাটবার ব্যতীত শাক সব্‌জী বা তরকারি কোন দ্রব্যের অনাটন ঘটিলে তাহা মিলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে দার্জ্জিলিংএ বিশেষ সুবিধা কারণ শনিবার হইতেই হাটের জন্য অনেক জিনিষ আসিতে থাকে এবং রবিবার দিন শাক সব্‌জী তরকারি ও পেঁপে আনারস ভৃতি ফলও প্রচুর পরিমাণে হাটে আমদানি হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্যদিনেও "ষ্টলে" সকল প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য সদা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। কিন্তু কার্শিয়াংএ হাটের দিনেও যাহা আমদানি হয় তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং মূল্যও দার্জ্জিলিং অপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ এই যে কার্শিয়াংএর চতুর্দ্দিকে শুধু চা বাগান, কৃষিদ্রব্যোৎপন্নোপযোগী জমি আদৌ নাই, কিন্তু সদর মহকুমায় বহু খাসমহাল থাকায় সকল প্রকার দ্রব্যাদির প্রচুর আবাদ হয়।

আমরা যখন আহার করিতেছিলাম তখন বাহিরে বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের দেশের চেয়ে পাহাড়ে দেশের বৃষ্টির বেশ একটু বিশেষত্ব আছে লক্ষ্য করিলাম।

নর্ত্তকীরা যেমন নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায়, আবার পরমূহুর্ত্তেই ঝুনুর ঝুনুর শব্দে সমস্ত মঞ্চটি কাঁপাইয়া নাচিয়া উঠে, বৃষ্টিও তেমনি মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তকালের জন্য বিরাম থাকিয়া আবার পরক্ষণেই ভীষণ ঝুপ ঝাপ্ শব্দে টীনের ছাদটি প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্বিগুণ বেগে পতিত হইতেছিল।

আহারান্তে জানালার ধারে ইজি চেয়ারে বসিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতেছিলাম, আহারটিও বেশ গুরুতর রকমের হইয়াছিল সুতরাং বাহিরের ঠাণ্ডায়ও বৃষ্টির শব্দে অল্পক্ষণ মধ্যেই জড়তা আসিয়া শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সত্বর বৃষ্টি থামার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া একটু নিদ্রাসুখ উপভোগ জন্য শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সবেমাত্র একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে এমন সময় কার্শিয়াং হইতে এক জরুরী চিঠি লইয়া বৃদ্ধ উপাধ্যায় আসিয়া সংবাদ দিল যে আজই দার্জ্জিলিং পৌছিতে হইবে। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই পরাধীন চাকরী-জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং বন্ধুপত্নী "এমন ঝড় জলে যাবেন কি করে, এর মধ্যে শিয়াল কুকুরও ত বের হয় না" ইত্যাদি বলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। সহৃদয়া বন্ধুপত্নীর কথা শুনিয়া রূপসনাতনের গল্পের ধীবর পত্নীর উক্তি "ও কুকুর নয়, হয়ত কোন রাজকর্ম্মচারী হবে, নইলে এ দুর্য্যোগে কি আর কেউ বের হয়" মনে পড়িল।

যে দিন হইতে সাধ করিয়া দাসখতে নাম লিখাইয়াছি সে দিন হইতেই জানি যে নিকৃষ্ট সারমেয় কুকুরের জীবনে যেটুকু স্বাধীনতা আছে, পরাধীন দাসত্ব জীবনে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। সুতরাং কৃত কর্ম্মের ফল—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

যেরূপই হউক না কেন তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে জানিয়া সকলের স্নেহের বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

পিছন্ হইতে নানী কহিয়া উঠিল "বাটো তো ছিপ্‌লো ভয়ো আরো, কছো হিড়নু" সত্য সত্যই পথ বড়ই পিছল্ হইয়াছিল, কিন্তু স্বভাবসরল পার্ব্বত্য বালিকার মধুর সহানুভূতিসূচক

বাক্য আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়া সকল পথকষ্ট ভুলাইয়া দিয়াছিল—

"The echo of the Voice enwrought
A human sweetuess with the thought"

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

নিবেদন।

—:০:—

জানি না কবিতা ছন্দ লীলায়
রচিতে অর্ঘ্যভাঁর,
এ যে জীবনের বেদনার রাশি,
অশ্রু-মুকুতা-হার।
ফোটেনি যে ফুল মরম-কুঞ্জে,
যে কথা লুকানো বুকে;
যে হাসি আমার হারায়েছে হায়
পাঁজরবিদারী দুখে;—
তারি ইতিহাস লেখনীর মুখে
মরম শোনিতে আঁকা;
ব্যাথা বেদনার কণ্টকমালা
নয়ন সলিলে মাখা।
লিখি নাই কভু যশোবাসনায়
নিজ মনে গাহি গান;
আপনার আঁখি আপনি মুছাই;
কোথা পাব প্রতিদান?

আর কেহ যাহা চাহিবে না ফিরে
তুমি তুলে নিবে তাই;
এই ত আমার গরব কেবল;
তবু সদা গান গাই।

শ্রীআশুতোষ রায়।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লালকুমারীর বাসভবন, সুসজ্জিত কক্ষে আসনোপরি উপবিষ্ট জাহান্দার।
লালকুমারী দণ্ডায়মান।

জাহান্দার। আমায় কেন ডেকেছিলে, লালকুমারি?

লালকুমারী। (ভান করিয়া) আমি ভুলে গিয়েছি, কেন আপনাকে আসতে বলেছিলাম। শাহজাদা, সে দিন আমায় দেখে আপনি বুঝেছেন, কেন রূপে এত নেশা! আজ আমার দিকে চেয়ে সত্যি করে বলুন, আমি কি বাস্তবিকই সুন্দরী।

জাহান্দার। লালকুমারী! তুমি সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী। যে দিন তোমায় আমি প্রথম দেখেছিলাম কি এক অসহ্য আনন্দের পুলক আমার মন প্রাণ ভরে দিয়েছিল। আমি কি দেখেছিলাম—এক মুহূর্ত্তে প্রভাতের ও সন্ধ্যার উন্মত্ত বর্ণোচ্ছাস, বসন্তের তরলিত মাধুরীর অপূর্ব্ব তরঙ্গ লীলা, ক্ষিপ্র, চঞ্চল অথচ পূর্ণ আর শরতের জ্যোৎস্না রজনীর নির্ঝর প্রবহণ। হিমাচল শিখরের তুষারের অঙ্গে বিচ্ছুরিত দীপ্ত কিরণের মত, নীরব রজনীতে বীণার তারে ঝঙ্কৃত সঙ্গীতের মত কে তুমি নারী আমার জীবন-পাত্র সুখমদিরায় পূর্ণ করে তুলেছিলে—

লাল্‌কুমারী, সত্যিই বল্‌ছি নারীর এত রূপ, এত যৌবন,—পূর্ণ নিটোল উজ্জ্বল আর কখনও আমার চোখে পড়েনি।

লালকুমারী। শাহজাদা, তবে আমি সত্যই সুন্দরী! আপনার ঐ বিহ্বল আরক্ত চক্ষু কখনও মিথ্যে বলে নি। জোহেরা, দর্পণখানা নিয়ে আয় না। আজ নিজকে একবার ভাল করে দেখ্‌তে হবে। কতদিন কত প্রশংসায় আমার এ কুটীরখানি মুখরিত হয়ে উঠছে কিন্তু মিথ্যা, ঘোর মিথ্যা বলে তাকে পায়ে ঠেলে দূর করে দিয়েছি। কিন্তু আপনার একথা আজ সত্য বলে মনে হচ্ছে কেন? না—আমি সব চাইতে সুন্দরী।

(জোহেরার প্রবেশ ও দর্পণ স্থাপন করিয়া প্রস্থান।)

(লালকুমারী দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া।)

আজ আমার রূপসায়রে কি জোয়ারই এসেছে—এই যে উজ্জ্বল চকিত চঞ্চল আঁখি দুটী বিদ্যুতের লীলাভূমি, এই যে আরক্ত তৃষা ব্যাকুলিত অধরযুগল প্রথম প্রেমের অরুণ স্পর্শে এই যে মোহন, শোভন, দীর্ঘলতায়িত বাহু, উচ্ছ্বলিত যৌবনের কুসুম নিগড়,—শাহজাদা, কত নিশিদিন আমি বসে আছি, আমার যৌবন বীথি নূতন পাতায় নূতন ফুলে সাজিয়ে, কবে আমার হিয়ার নিভৃত কক্ষে, আমার হৃদিকুঞ্জের কাঞ্চন ছায়ায়—মিলনের বাঁশী বাজিয়ে অতিথি এসে বস্‌বে! আজ তুমি এসেছ; এস বাঞ্ছিত এস; এত সুন্দর আমি কার জন্যে? এ রূপ তোমার জন্যে, শাহজাদা, তনু মন সবই তোমায় দিয়েছি, এসো, বল একবার, এসব তোমারি।

জাহান্দার। লাল্‌কুমারী, চোখে তোমার একি দীপ্তি, কণ্ঠে তোমার একি আকুলতা, দেহে তোমার একি শিহরণ, তুমি কি বলছ?

লালকুমারী। আমি আবার কি বল্‌ব, শাহজাদা, এ দীপ্তি এ আকুলতা তুমি যে জাগিয়েছ, আজ তাকে অবহেলা কেন?

জাহান্দার। আমি তোমায় অবহেলা করছি না লালকুমারি। ভেবে দেখ সত্যি করে ভেবে দেখ এ ব্যাকুলতা তোমার চিরদিনের কি না; না এ শুধু ক্ষণিকের, আজ এসেছে, একূল ওকূল ভাসিয়ে, কাল চলে যাবে পঞ্জরের কুটীল কঙ্কাল রেখা এঁকে দিয়ে স্মৃতির শুষ্ক কঠিন বেলাভূমিতে—যদি তাই হয় তবে সব ভুলে যাও।

লালকুমারী। শাহজাদা, সব ভুলে যাব,—কাকে ভুলে যাব! আমার এত সাধের সুখ-স্বপ্ন কেন ভেঙ্গে দিয়ে যাব। জানিনা এ আমার চিরদিনের না ক্ষণিকের। যদি ক্ষণিকেরই, যদি জীবন শেষ হবার পূর্ব্বেই এ তৃষ্ণা মিটে যায় তাতেই বা কি ক্ষতি। যে দিন আজকের এই প্রকাণ্ড সত্যটা মিথ্যা হয়ে যাবে, সে দিন বুঝ্‌ব জীবনের সাঁজ এসে পড়েছে। এই যে দেখ্‌ছ (জহর খচিত আংটী দেখাইয়া) আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে—অন্ধকার আস্‌বে অন্তহীন নিস্তরঙ্গ গাঢ় নীল.........।

জাহান্দার। লাল্‌কুমারী, তুমি আমার সব গুলিয়ে দিলে—তোমার বিপুল রূপের পসরা নিয়ে, আমার এই অতৃপ্ত আঁখির হাটে কেন বেসাতি নিয়ে, বস্‌লে? তোমার কামনার দীর্ঘ শ্বাসে আমার শান্ত, স্থির জীবন-সাগর কেন ফেনিল উচ্ছ্বাস মগ্ন করে তুলে? ফিরে দাঁড়াও—তোমায় আবার দেখ্‌ব। একরূপ! লালকুমারী, তোমার ও-রূপ আর কিসের বিনিময়ে বিক্রি করবে? বল......শিগ্‌গির বল......তোমায় আমি কিন্‌ব।

লালকুমারী। শাহজাদা, তোমাকে ত আমি সবই দান করেছি।

জাহান্দার। এতকাল রূপের ব্যবসা করে এসেছ; কত আমীর কত ওমারাহ অর্থ দিয়ে তোমার ঐ রূপ ঐ দেহটাকে কিনেছে; আজকের কেনা বেচায় তোমার কি আপত্তি হতে পারে লাল্‌কুমারী? আমি তোমার সব চাইতে বেশী মূল্য দেব।

লাল্‌কুমারী। মিছে কথা শাহজাদা।—মিছে কথা। শুধু হাসি শুধু চাউনী বিক্রয় করেছি, এ দেহ এখনও কেহ কিন্‌তে পারেনি।

জাহান্দার। হাঁ, বিশ্বাস করি লালকুমারী, কিন্তু তোমায় আমি সব চাইতে বেশী মূল্য দেব। আমার সব সম্পত্তি তোমার জন্য ত্যাগ করব। কেন করব? জান? তোমায় ঐ বিশ্ব আকাঙ্খিত রূপ পেতে হলে বড় কিছু একটা ত্যাগ করা চাই ই.........অর্থ সে ত... ঝুঁটো। এক দিন সাম্রাজ্য সম্পদ প্রেম সৌন্দর্য্য সব ধর্ম্মের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আজ আমার সেই একান্ত ধ্যান তোমায় রূপের জন্য ত্যাগ করব,—দেখি এ সাধনা ভোগের পূজা আমায় কোথায় নিয়ে যায়। লালকুমারী, আজ হতে আমি তোমার আর তুমিও আমার।

(মালা হস্তে জোহেরার প্রবেশ)

(গীত)

জোহেরা। সুন্দর নব বসন্ত অন্তরে তোমার
ক্লান্ত নয়নে মুছে ফেল ছল ছল জল ভার
ফাগুনের ফাগে রাঙ্গা উত্তরীয়, রেণু রাশি পরে বিছাইয়া দিও,
যৌবন কুঞ্জে পরাণপ্রিয়, এলো সখি খোল দ্বার
এস সুললিত, এস গো দয়িত কানন বীথি পিক কুহরিত
আন গন্ধবরণ রূপ সঙ্গীত পর গলে যুথি হার ॥

পটনিক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মারবার রাজপ্রসাদ কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন।

মহারাজ অজিত সিংহ ও রাণী দুর্গাবতী দণ্ডায়মান।

দুর্গাবতী। মহারাজ, শুনতে পেলাম তুমি আবার যুদ্ধে যাচ্ছ, সারা জীবন এত যুদ্ধ করেও তোমার সাধ মিটল না, এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু।

অজিত সিংহ। দুর্গাবতী, তুমি না রাজপুত কন্যা, আর রাজপুতের স্ত্রী! স্বামীর বীরত্ব গৌরবে তুমি যে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করবে, তুমি কি রাজপুত-নারীর মর্য্যাদা ভুলে গেছ, রাণী?

দুর্গাবতী। রাজপুত নারীর মর্য্যাদা দুর্গাবতী ভোলে নি, মহারাজ। স্বামীর বীরত্বের জন্যই সে নিজকে এই রাজপুতনার মধ্যে সব চাইতে গরবিণী ও সৌভাগ্যবতী মনে করে। কিন্তু যে দিন হতে রাজপুত বীরগণ নিজের মাথার মুকুট স্বাধীনতা-রত্ন মোগল বাদশাহের অনুগ্রহ বিনিময়ে বিক্রয় করেছে আর মোগলের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আত্মসম্মান ও আত্ম শৌর্য্যকে বলি দিয়েছে—সে দিন হতে স্বামীর বীরত্ব রাজপুত নারীর কাছে একটা ভয়ের জিনিষ, একটা কলঙ্কের পসরা। এবার কার পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছো—মোগলের?

অজিতসিংহ। এ যুদ্ধে দু পক্ষই মোগল। আমি যাচ্ছি শাহজাদা আজীমের পক্ষ হয়ে। বাহাদুর বাদশার মৃত্যু হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় পুত্র আজিমকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন। জ্যেষ্ঠ জাহান্দার আর কনিষ্ঠ জাহান এক পক্ষ হয়ে তাকে সাম্রাজ্য হতে বঞ্চিত করবার জন্য আয়োজন করেছে। তাকে সাহায্য করতে আজ তাই রাজসিংহকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমিও শীঘ্র রওনা হব।

দুর্গাবতী। যাই হোক, তুমি তবে মোগলকেই সাহায্য করতে যাচ্ছ,—আচ্ছা, তোমার কি স্বার্থ এতে আছে?

অজিতসিংহ। আমার নিজের দিক্ হতে দেখতে গেলে স্বার্থ এতে আমার কিছুই নেই।

দুর্গাবতী। তবে?

অজিতসিংহ। দুর্গাবতি, জগতে সকল কাজই কি স্বার্থের দিক্ চেয়ে কর্ত্তে হবে?

দুর্গাবতী। তা বৈ কি?

অজিতসিংহ। এ তোমার অজিতসিংহের সহধর্ম্মিণীর মত কথা হল না দুর্গাবতি ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা হতে জগতে কোন বড় কাজই সম্পন্ন হয়নি। আমি চাই হিন্দু মুসলমানকে একত্র করে একটা বড় জাতির সৃষ্টি কর্ত্তে। দৃঢ় দেশাত্ম-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নব জাতিকে ধর্ম্মের বিভিন্নতা কিম্বা মতের বৈষম্য কিছুই একটুও নড়াতে পারবে না। শাহজাদা আজিম হিন্দু বিদ্বেষী নন্ তাই তাঁকেই আমি সম্রাট পদে স্থাপিত করতে চাচ্ছি। এই উপায়ে দুই জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হবে আর মোগল সাম্রাজ্যও এত সত্বর ধ্বংস হবে না।

দুর্গাবতী। মোগল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তোমার এত চেষ্টা। ভুলে গেছ সেদিনের কথা—এত ভুলও মানুষের হয়! তোমার স্বর্গগত পিতা যশোবন্ত সিংহকে এই মোগলবংশের সম্রাট ঔরঙ্গজেব কি করে হত্যা করেছিলেন—ভুলে গেছ মহাত্মা দুর্গাদাস তোমায় কত যত্নে কত চেষ্টায় সেই পিশাচের গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। মোগল তোমার কি করেছে? ঐ চেয়ে দেখ ধ্বংসের কি অবিরাম দৃশ্যই তোমার চোখের সামনে প্রসারিত। মোগলের অত্যাচারে রাজপুতনা আজ শ্মশান। জনারের ক্ষেতগুলি মোগলের দেওয়া আগুনে ভস্ম হয়ে গেছে। স্বর্ণ শীর্ষ মন্দিরগুলি যারা প্রভাতের আলোকে স্বর্ণ শিখার

মত দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত তারা চূর্ণ হয়ে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশে গেছে—আর সেখানে স্থাপিত হয়েছে মোগলের নাট্যশালার আর প্রমোদভবন। সব ভুলে গেছ, নাথ, তুমি সেই যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিতসিংহ আজ মোগল সাম্রাজ্যটাকে ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা কর্‌তে যাচ্ছ ?

অজিতসিংহ। কিছুই ভুলিনি। যদি পিশাচ ঔরঙ্গজেব এখন বেঁচে থাক্‌ত তবে সেই প্রতিশোধ গ্রহণ না করে কখনও ছারতুম না। কিন্তু আজ ত সেই প্রবৃত্তি আমার মনে জাগ্‌তে পারে না। প্রতিহিংসা—এটা জঘন্য মনোবৃত্তি। এই প্রতিহিংসা সাধনের জন্যেই জয়চাঁদ মুসলমানকে ডায়ক্তে আহ্বান করে দেশের গলায় পরাধীনতায় শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য যদি হিন্দু মুসলমানের হিংসাটাকে নূতন করে উস্‌কিয়ে জ্বালিয়ে তুলি তবে আমাদের উভয়কেই দুর্ব্বল দেখে ভারতের বাইয়ে থেকে মুসলমানেরই মত আর এক নূতন জাতির সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য আগমন একবারেই বিচিত্র নয়। জেনে শুনে দেশের পায় এত বড় একটা কঠোর নিগড় পরাতে পার্‌ব না, দুর্গাবতি।

দুর্গাবতী। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার উপর নির্ভর করে আজকের এই দাসবৃত্তিটাই ভাল! মহারাজ এ তোমার কাপুরুষের ছলনা মাত্র।

অজিতসিংহ। দুর্গাবতি! কি নিষ্ঠুর আঘাতে তুমি আমার সুখ স্বপ্নের সৌধটাকে এখন নির্ম্মম হয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছ—এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ মন নিয়ে তুমি আমার সহধর্ম্মিণিত্বের দাবি কর? যেদিন তোমায় আমি এই উন্মুক্ত বক্ষে স্থান দিয়ে মারবার-রাজলক্ষ্মী করে এই গৃহে বরণ করে এনেছিলেম এখন বুঝেছি সেদিন সুখের নয় পরম দুঃখের,—আমি কি ভেবেছিলাম আর আমার কি হয়েছে. দিনের পর দিন নিশার বেদনায় হৃদয় মুসড়ে যাচ্ছে। দুর্গাবতী, এ দুঃখ শুধু আমার নয়। তোমার মুখ দেখেও বুঝ্‌তে পারছি কি অসহ্য ব্যথা তোমার অন্তরের মাঝে বাসা করে বসেছে। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনের আগুন নিভে যাক্। আদর্শের মিলনে আমাদের মিলন নূতন করে সংঘটিত হক।

(পটনিক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—শিবির। সময় রাত্রি। জাহান ও হামিদ খাঁ।

জাহান। হামিদ, কাল প্রভাতেই যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌তে হবে, শুন্‌লাম মহারাজ অজিতসিংহ যুদ্ধে আস্‌ছেন। রাজপুত সৈন্য পৌঁছবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ করে ফেল্‌তে হবে—তা না হলে জয় পরাজয় একটা বিষম অদৃষ্টের কথা হয়ে দাঁড়াবে।

হামিদ। শাহজাদা, কিসের ভয়? মহারাজ অজিতসিং টিং যেই আসুক হামিদ কাউকেও ভয় পায় না।

জাহান। রাজপুত জাতি যুদ্ধ করতে জানে, প্রাণের মমতা একবারেই রাখে না। এত বড়াই কর্‌ছো—দেখো আবার কাজের সময় পেছিয়ে পোর না।

হামিদ। শাহজাদা, আমি সেনাপতি জুলফিকার খাঁর সঙ্গে অনেক যুদ্ধ জয় করেছি—দু' একটা বড় রকমের কৌশলও যে না শিখেছি তা' মনে কর্ব্বেন না—তলোয়ার খেলা না খেলেও হাতিয়ার একটা বার মাত্র না ঘুরিয়েও যুদ্ধ জয় করা যায়,—বুঝ্‌লেন?

জাহান। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কি রকম হামিদ?

হামিদ। আপনারা কি করে জান্‌বেন বলুন, এতে অভিজ্ঞতা চাই, মাথা পাকান চাই।

জাহান। আরে বলেই ফেল না।

হামিদ। এই ধরুন, শাহজাদা আজীম আছেন আর সঙ্গে রয়েছে সেনাপতি রুস্তমদিল্ খাঁ

জাহান। বেশ, তার পর।

হামিদ। শাহজাদা আজীম রুস্তকে খুব বিশ্বাস করেন, আর রুস্তমের উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে বেশ সোফা কোরাণ আর কাফেরদের সেই কি কেতাব গুলো.....নামও জানিনে ছাই......নিয়ে দিন গুজরাচ্ছেন। বেশ এখন যুদ্ধ করার অর্থ হ'ল সেনাপতি রুস্তমটাকে জয় করা।

জাহান। তারপর।

হামিদ। তারপর খুব সোজা পথ—রুস্তমটাকে হাত কর্‌তে পার্লেই হয়। জুলফিকার খাঁ বলছেন..........................।

জাহান। জুলফিকার ব'লছে?

হামিদ। না, না জুলফিকার ঠিক্ এ-এ এই কথা বলেনি, তবে যেন বলেছিল যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা মূল্য আছে—কারো কম আর কারো বেশী। সেটা দিতে পার্‌লে একেবারে কিস্তিমাৎ। রুস্তম যদি একবার ঘুরে বসে তবেই আজীমকে সিংহাসন পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে একেবারে সটান পয়ে-আকার দিতে হবে।

জাহান। হামিদ খাঁ, চুপকর, সয়তানের মত বিড়্ বিড়্ করে একি বক্‌ছ জানো না এ ভাইএ ভাইএ যুদ্ধ—তোমার ঐ ঘৃণিত কৌশলের স্থান এ নয়।

হামিদ। শাহজাদা, যেখানে যে উপায় অবলম্বন কর্‌লে সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয় সেখানে সেইটাই যে প্রকৃষ্ট কৌশল।

জাহান। এ নীতি তোমার হতে পারে… ………,হামিদ,………কিন্তু আমার নয়। পিশাচ, বিশ্বাসঘাতক তুমি আমায় নীতি শিক্ষা দিতে এসেছ?……এ যুদ্ধে তোমার কোনই প্রয়োজন নেই, তুমি এখনই আমার শিবির ত্যাগ করে যাও। হামিদ, তোমার ঐ ঘৃণিত উপায়ে সিংহাসন লাভ কর্ব্বার চাইতে—এই যে দেখ্‌ছ ধূধূ কর্চ্ছে মাঠ ওখানে কাল যদি আমার চির-শয্যা হয়, তা হ'লে আমি সহস্রগুণে সুখী হব।

হামিদ। কেন রাগ কর্চ্ছেন, শাহজাদা? আমি শুধু সেনাপতি জুলফিকার খাঁ যা বলেছেন তাই বল্‌ছি।

জাহান। হামিদ, সংসারে সবাই জুলফিকার নয়। জুলফিকারও আছে জাহানও আছে। আজ এ যুদ্ধে তোমাকে আমার উপদেশ মত চল্‌তে হবে। যদি তুমি স্বীকৃত হও তবে থাক, নইলে তোমায় আমার প্রয়োজন নেই।

হামিদ। হাঁ শাহজাদা।

জাহান। দুঃখিত হয়োনা, হামিদ—আমি কাপুরুষতাকে ভয়ানক ঘৃণা করি। তাই তোমার সেই কাপুরুষতাটাকে দেখ্‌তে পেয়ে জ্বলে উঠেছিলাম।

হামিদ। শাহজাদা, জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ কার্য্যে অতিবাহিত করেছি—কেবল জান্‌তাম যুদ্ধ জয়—ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় কিছু কোনদিন ভেবে দেখিনি। যাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি তাদের মধ্যেও কোন মহত্ত্ব আমার চোখে পড়েনি।

জাহান। আমি সব বুঝেছি—কুচক্রী, হীন, কাপুরুষ জুলফিকারের কাছ থেকে তুমি এ শিক্ষা পেয়েছ। জুলফিকারের সঙ্গে আমি একবার মাত্র দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে গিয়াছিলেম—দেখ্‌লাম মোগলের প্রধান সেনাপতি যত বড় বীর তার চাইতে বেশী কাপুরুষ। ক্রোধে, ক্ষোভে যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে এলাম—পিতাকে বলে ছিলাম জুলফিকার খাঁ কাপুরুষ, তাকে বরখাস্ত করুন; পিতা হেসে বল্লেন, এ কাপুরুষতাও কিনা একটা রণকৌশল বা রাজনীতি। কি প্রকাণ্ড ভুল! হামিদ, সত্যপালনে বরং ভেঙ্গে যাওয়া ভাল তবু মিথ্যাকে আশ্রয় করে বড় হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা। যাও হামিদ, কাল প্রভাতেই আক্রমণের উদ্যোগ কর, আমি সৈন্যের অবস্থান, মানচিত্রের সাহায্যে ঠিক করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাও।

হামিদ। আদাব, শাহজাদা।

(সকলের প্রস্থান।)

পট নিক্ষেপণ।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাবক্ষে আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা।

প্রেমদেব।

(গীত)

প্রেমদেব। বাইছে কে ঐ শেষ খেয়ারি তরিখানি
চিরদিন কাহার বীণায় এমনি শোনায় ওপারের ঐ মধুর বাণী
সে যে আকাশ নীলে অসীম ছেয়ে
প্রাণে অসীম হয়ে,
আপনি এসে ডাক দিয়ে নেয়
কোন সুদূরে কি জানি?
সন্ধ্যা এলে আঁধার হয়ে
দীপটি সেথায় জ্বলে,
কোলে ডেকে ঘুমিয়ে দেয়
খেলা ধুলোর সব গ্লানি।

(বলে) ওই পারেরি ওই অজানায়
ভ্রাণে বাতাস ভরা,
চারিদিকে তার সুরে রূপে
চির নবীন জীবনখানি।
মরণ সেথায় মরে আছে
এই খেয়ারি ঐ পারে,
এম্নি মরণ মর্ত্তে পেলে,
জীবন জনম ধন্য মানি॥

সাঁঝের আঁধার পৃথিবীর বুকে ঐ নেমে এসেছে, আমাদের জীবন নদীর পারেও একদিন এ রকম একটা কঙ্কাল ছায়া এসে পড়বে সে আমাদের জীবনের শেষ! মৃত্যু চিরশান্তিময়—মৃত্যু জগতের নিয়ম কিন্তু কোন মরণ আমাদের বরণীয়? এই হৃদয়ের স্পন্দন, এই সুখদুঃখের নিয়ত উচ্ছাস চিরকালের মত থেমে যাওয়ার পূর্ব্বে একটা মহৎ ব্রত শেষ করবার জন্যে জীবনপণ সেই কি আমাদের শ্রেয় নয়? ঐ মহৎ ব্রত হল আমাদের মায়ের মুখে সেই প্রশান্তির হাসি ফুটিয়ে তোলা। মা তোর ঐ কালিমা কি কল্লে দূর হবে একবার বলে দে মা? একবার বলে দে কি করলে অতীতের সরল সহজ জীবনধারা অমৃতে পূর্ণ হয়ে এ বাংলার গৃহে গৃহে হাসির প্লাবন এনে দেবে? দুঃখ-দৈন্য-জর্জ্জরিত বাঙলার সন্তান একবার জাগো, গৌরবময় অতীতকে ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করো, তাতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, দেশমাতার লক্ষ লক্ষ নয়নে দরবিগলিত ধারায় তোমার জন্য শোকাশ্রুর উষ্ণ প্রস্রবণ ঝর্ ঝর্ করে ঝরবে।

(তিন জন সেবাব্রতচারীর প্রবেশ)

১ম সেবাব্রতচারী। কি গুরুদেব কেন ডেকেছেন?

প্রেমদেব। হ্যাঁ তোমাদের ডেকেছি সম্মুখে তোমাদের একটা বড় কর্ত্তব্য এসে পড়েছে। আর্ত্তের সেবাকে তোমরা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছ। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের একটা সুযোগ আজ তোমরা পাবে। বাঙ্গালী সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে! যুদ্ধে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য আজই তোমাদের আমার সঙ্গে রওনা হতে হবে। সকলে প্রস্তুত হও।

২য় সেবাব্রতচারী। যে আজ্ঞে, গুরুদেব!

(প্রমদের গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপ)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।
ও
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী নাম তৃতীয় বল্লীর আভাসে!

—:০:—

কোন্ এক বসন্ত প্রভাতে,
গিরীন্দ্র শিখর চূড়ে হিমমুক্ত রবিকর পাতে,
চির শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনে,
বন্দনা জাগিয়াছিল ঝঙ্কৃত সামবেদ গানে!
অতুলন অরূপ রতন!
বৈতালিক কলস্বরে গায়, গায় দখিন পবন
প্রভাতের আরক্ত আভাসে,
তরুশিরে, ফুলদলে কি বিচিত্র বরণ বিকাশে!
বর্ণে, গন্ধে, গানে উছলিত,
অপূর্ব্ব এ ফুলবনে ফুলশর চির পরাজিত!

লুব্ধ কাম সঙ্গোপনে ফিরে !
আজন্ম তপস্বী কোথা, পলকের মনোজ্ঞ বিকারে,
উর্ব্বশী অঞ্চল তল চায় !
লাজরক্ত দিনমণি, ফুলদল সরমে শুকায়,
লীলাময় লীলা ওঠে ফুটি !
সৃষ্টির সরোজ সম, শকুন্তলা মেলে আঁখি দুটী !
কামনার পঙ্কিল পল্বলে !
দীর্ঘালস মগ্ন ঋষি, চাহে ফিরে আলোক হিল্লোলে !
নমিত সে দীর্ঘ জটাভার !
জননী গৌরব তলে,—মাতৃমূর্ত্তি হীন গণিকার !
নহে অন্ধ বিলাসের খেলা !
মাতৃত্ব তুলসীদলে নয় আর, নহে অবহেলা !
প্রনমি ফিরিয়া চলে ঋষি !
স'রে গেছে তপোবন,—স্খলিত সে পূণ্যালোক রাশি,
কার কত যুগান্ত অর্জ্জিত !
পবিত্র অগ্নিনালয়, শূণ্য আজি ম্লান লজ্জাহত,
সুপবিত্র ঋষির আশ্রমে !
ওই যে কল্লোল বহে ভেদি কার গোপন মরমে,
প্রিয়তম পরশ আকুলা !
নবোঢ়ার মত ধরা ;—এলায়িত কুসুমকুন্তলা,—
নবজাত কিশলয় সাজে !
অমর জীবনাকাঙ্ক্ষা জাগে কার মরমের মাঝে !

অরূপ, অসীম, নিরাকার !
মাণিক্যের আভাসম কার চোখে জ্যোতি জাগে তাঁর ?
বরুণের শ্রীচরণ ছায় !
তরুণ কুমার ভৃগু, কোন্ ধন সকাতরে চায় ?
তৃষাতুর কি সে অভিলাষ ?
চপল তরুণ চিত,—চাহে কিগো নারী বাহু পাশ ?
আপনারে শৃঙ্খলিত করি,
চুম্বন মদিরা পিয়ে, অবসান দিবা বিভাবরী ?
নহে, নহে উদার নয়ন
হেরি দীর্ঘ যাত্রাপথ, পাথেয় যে করিছে স্মরণ,
অপূর্ণ, তৃষিত হিয়া মাঝে !
দীন সে ভিখারী নিত্য, কি বৈভব সকাতরে যাচে !
বিরহিণী রমণীর প্রায়,
প্রিয়তম কান্ত পদে আপনাকে বিকাইতে চায় !
কিন্তু কই কোথা সেই ধন ?
দাও পিতা ব্রহ্মজ্ঞান এ পিপাসা কর নিবারণ !
বরুণের মহান্ বচন !
নির্দ্দেশিল পঞ্চদ্বার অন্ন, প্রাণ, চক্ষু শ্রোত্র মন,
লহ খুঁজে বাঞ্ছিত বল্লভ !
ইন্দ্রিয় অগম্য তিনি অনির্দ্দেশ্য অনন্ত পল্লব !
তপস্যান্তে বুঝিলা বারুণী !
অন্ন প্রাণ, জীবাধার, অন্নই কি সেই দিনমণি ?

পুরিল না, পুরিল না প্রাণ !
কই পিতা দাও মোরে,—দাও সেই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান !
সংশয়াকুলিত মোর মন !
দেখ বৎস, খুঁজে দেখ, মন তিনি দেখাবার ধন !
সুদীর্ঘ সাধন অবশেষে !
ভাবে ঋষি প্রাণ ব্রহ্ম, নহে নহে প্রাণ কহে হেসে !
আবার, আবার কর তপ !
হৃদয় মন্দিরে তুমি নিজে কর দেবতা আরোপ !
দেখে নাও কি তব বাঞ্ছিত !
মন কি বিজ্ঞান ব্রহ্ম ? নহে, নহে, পূর্ণ নহে চিত !
কর বৎস কর অন্বেষণ।
আনন্দে ভরিল হিয়া, ভুমানন্দে ভরিল ভুবন !
এ যে তৃপ্তি অনির্ব্বচনীয় !
সৎ, চিৎ আনন্দ রূপ, তৃষিতের প্রাণাধিক প্রিয় !
ভার্গবীয় সুধা উচ্ছ্বসিত !
বুঝেছি আনন্দ তিনি, প্রাণ মন জ্ঞানেরও অতীত !

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মভাব।

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চিষ্টার গার্ডিয়ান নামক সংবাদপত্রের একজন বিশেষ সংবাদ-দাতা লখনৌ হইতে সেই সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"সাধারণ একটা বিশ্বাস এই যে ইয়োরোপের লোক অপেক্ষা ভারতবাসী অধিকতর ধর্ম্মভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক এবং আত্মবাদী এবং ইয়োরোপীয়ের মত তত জড়বাদী নহে। এই বিশ্বাসটা কি প্রকৃত ? আমি এই প্রশ্নটা ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শিক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং ছাত্র ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মুখে ধর্ম্মভাব এবং মনোভাবের কথা শুনিয়া আমার নিজের একটা ধারণা গঠন করিয়াছি। একজন বহুদর্শী ভারতীয় শিক্ষক যিনি ভারতীয়দিগকে এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইয়োরোপীয়দিগকে জানেন তিনি এতৎসম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন সেই মতটা আমিও গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার সিদ্ধান্তটা এইরূপ ; পূর্ব্বদেশেই কি পশ্চিমদেশেই কি আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ প্রবল ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব উভয় এই বিরল। ইংরেজ বালক অপেক্ষা ভারতীয় বালক অধিকতর ভাবগ্রাহী (Impressionable) and ভাবুক (Emotional). ভারতীয় বালককে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা মনে করাইয়া কোন কথা বলিলে সে সেই কথা মন দিয়া শুনিয়া থাকে কিন্তু ইয়োরোপীয় বালক সেরূপ কথায় বড় মন দেয় না। আরও একটা কথা এই যে আর্থিক অবস্থা এবং জলবায়ুর অবস্থায় ফলে ভারতবাসীর জীবনী শক্তি অল্প এবং সে জীবনকে তেমন দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতে পারে না। আত্মরক্ষার Instinct (সহজাত জ্ঞান) ও তাহার দুর্ব্বল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে অবস্থাকে অতিক্রম করিবার অধ্যবসায় তাহার অল্প এবং কোন অজ্ঞাত শক্তির ইচ্ছায় নির্ভর করিতেই সে ইচ্ছুক। সেইজন্য ধর্ম্মভাবাপন্ন, ধ্যান করা তাহার পক্ষে সহজ। অন্য পক্ষে ভারতের ছাত্র অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া গুরুভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। বাইশ বৎসর বয়স্ক ইংরেজ বালকের মনে যে সকল ভাব উদিত হয় সেই সকল ভাব ভাবিয়া দেখিবার সময় তাহার আছে। সেই বয়সে

ভারতবাসীর দুই তিনটী সন্তান হয় সুতরাং তাহার সমস্ত চিন্তা এবং প্রচেষ্টা তাহার পরিবারের ভরণ পোষণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেই নিয়োজিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সে সর্ব্বাপেক্ষা অতি অধিক পরিমাণে জড়বাদী। ইহাতে তাহাকে বিশেষ দোষী মনে করা যাইতে পারে না।'

"গান্ধীর শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিয়াও আমি ভারতীয় যুবকদিগের একমাত্র ধর্ম্মভাব এই দেখিয়াছি যে স্বদেশের জন্য এবং স্বজাতির জন্য আত্মত্যাগ করা তাহাদের ইচ্ছা। এই ভাবটা একরূপ সাধারণ এবং যথেষ্ট প্রবল। প্রমাণ শত শত রাজনৈতিক কারাবাসী এবং আকালীগণ।"

"কখন কখন আমি এমন মধ্য বয়স্ক ও বৃদ্ধদিগকে দেখিয়াছি যাহারা জীবনের অনেক সময় ধর্ম্মভাবের ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া থাকে। "ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ", "নিজের ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরে নিমজ্জিত করা", "ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব এমন কি যাহা কষ্টকর এবং অপ্রীতিকর তাহাতে তাঁহার ব্যাপিত্ব এই সকল কথা দ্বারাই তাহারা তাহাদের ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কখন কখন আমার মনে এরূপ ভাবও উদিত হইয়াছে যে এই সকল লোক মনে করে যে পেটেন্ট ঔষধের মত তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদিগকে এই নশ্বর জগতের দুঃখ কষ্টের সুতীব্র অনুভব হইতে রক্ষা করে।

"পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাব আবার আর এক প্রকারের। কিন্তু সেই ধর্ম্মভাব কি রোমান কাথোলিক ইয়োরোপের পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাব অপেক্ষা অধিক? আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। আইরিশ কৃষকের ধর্ম্মভাবের শক্তি ও দুর্ব্বলতায় বিষয় আপনারা অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে অবগত আছেন। আমি এমন দুই একটা সংবাদ বলিতেছি যাহা হইতে ভারতীয় পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাবের প্রকার ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রথমে ইহার কুৎসিত দিক্‌টাই দেখা যাউক।

দেবতাকে জুতা মারা।

"দুই বৎসর গত হইল একজন ভারতীয় পল্লীগ্রামবাসী একজন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আনীত হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে সে এমন একটা কাজ করিয়াছে তাহাতে তাহার প্রতিবেশীদিগের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেটের

রায় হইতে দেখা যায় যে লোকটা গ্রামের মন্দির হইতে সেই দেবীমূর্ত্তিকে টানিয়া প্রকাশ্য পথে লইয়া দেবীর মাথায় কয়েক ঘা জুতা মারে। বিচারকের সহানুভূতিটা বিবাদীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। বিবাদী প্রমাণ করিল যে সে দেবীর পরম ভক্ত ছিল—তাঁহার পূজায় সে বহু ব্যয়ও করিত। দেবীর পক্ষ হইতে এমন কোন কথা বলা হয় নাই যাহা হইতে এরূপ প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি তাঁহার পূজায় কোন ত্রুটি করিয়াছে। কিন্তু এত ভক্তি সত্ত্বেও বিবাদীর অল্পদিনের মধ্যে ধৈর্য্যচ্যুতিকারক গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল। একমাসের মধ্যে তাহার লাঙ্গলবাহী গরু দুইটা, তাহার স্ত্রী এবং পুত্র মরিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনা তাহার অপরাধের গুরুত্বটাকে ক্ষীণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং দেবীর প্রতি তাহার ক্রোধ স্বাভাবিক এবং মার্জ্জনীয়। অন্য পক্ষে তাহার কার্য্য দ্বারা যে তাহার প্রতিবেশীরা তাহাদের ধর্ম্মভাবে বড় আঘাত পাইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আদালত যদি এরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে লোকটা তাহার ব্যক্তিগত বৈর সাধন করিয়া কোন অপরাধ করে নাই তাহা হইলে সেই নির্দ্ধারণও বিপজ্জনক হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আদালত তাহার প্রতি এক মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ করিলেন।

"এখন আমরা গ্রাম্য ধর্ম্মভাবের চিত্তাকর্ষক দিক্‌টার প্রতি দৃষ্টি করিব। দুই জন কুলি পরস্পর কথা কহিতে কহিতে বাজারে যাইতেছিল। প্রথম ব্যক্তি তাহার প্রভুর কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিয়াছিল—কিরূপে তাহার পরিশ্রমের ফলেই তাঁহার ক্ষেত্রে প্রভূত শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতেছিল। সে তাহার কার্য্যের জন্য প্রভুর নিকট হইতে যৎসামান্য পুরস্কার পাইয়াছিল বা পাইবে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দুঃখ করিতেছিল। প্রথম ব্যক্তি তাহা শুনিয়া বলিল 'তাহাতে কি আসে যায়? আমি সর্ব্বদাই সরল ভাবে এবং বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করিয়া থাকি, ঈশ্বর আমাকে অবশ্যই একদিন পুরস্কার দিবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কর্ত্তৃপক্ষ এই আলাপটা শুনিয়াছিলেন এবং আমাকে পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাব কিরূপ তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছিলেন। এই আখ্যানের উপরে আমি নিম্নলিখিত আখ্যানটী জুড়িয়া দিতে পারিয়াছিলাম। কিছুদিন গত হইল আমি একটী ব্রাহ্মণের,—পেনশন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া এক জন ব্রাহ্মণ উকীলের নিকট হইতে এই উত্তর পাইলাম যে তিনি ভালই আছেন তাঁহার তিনটী পুত্রই ভাল কাজ পাইয়াছে। তিনি সৎপথে থাকিয়া

সরকারের চাকরী করিয়া ও পদোন্নতি লাভ করিলেন না এজন্ত ঈশ্বর তাঁহাকে তিনটী সুসন্তান দিয়াছেন।

"আবার সে দিন আমি এক জন পুরাতন-তন্ত্রের পল্লীবাসী হিন্দু জমিদারের সহিত একজন দ্বিভাষীর সাহায্যে আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি ভূমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার কারণ কি? তিনি প্রথমে বলিলেন সংসারে পাপের বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া। তিনি আর একটা কারণের কথা বলিলেন। যে কারণে এই যে নগরে ইন্ধনের মূল্য বাড়িয়াছে। ইহার ফলে লোকের গবাদির বিষ্ঠা মাটিতে ফেলিয়া না দিয়া শুকাইয়া তাহা ইন্ধনরূপ নগরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেছে। তাহার আবার সেই বিষ্ঠার সহিত মাটি মিশাইয়া থাকে। এরূপ পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী।

"ভারতবাসীর মোটামুটি ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে আমি এই মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। গ্রামে, ধর্ম্মের অর্থ পুরস্কার ও দণ্ড। কথন কথন ইহা যেন একটা চুক্তি। শিক্ষিত বৃদ্ধগণ বিবেচনা করেন যে ধর্ম্মের অর্থ Philosophic resignation (অর্থাৎ যাহা ঘটে বিনা প্রতিকারের চেষ্টায় বা বিনা প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করা) অথবা উদ্বেগ নিবারণের উপায় (Prevention of warry). জাতীয়তা-বাদী যুবকদের বিবেচনায় ধর্ম্মভাবের অর্থ দেশের জন্য আত্মত্যাগ। দেশের মঙ্গলটা যে কি এবং কিরূপে সেই মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহা তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া বিশেষ সাবধানে গবেষনা করা প্রয়োজন মনে করেন না।"

প্রকৃত ধর্ম্মভাব কি তদ্বিষয়ে বারান্তরে সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ভারতের দুর্ভাগ্য।

—:০:—

ভারতভূমি জগতের জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মতত্ত্বের আদি জননী। প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্ ঋষি মহোদয়গণ বলেন, বহু পুণ্য ফলে লোকে এই পবিত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

ভারতবাসী এক সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে সমগ্র ভূমণ্ডলের শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় ও বুদ্ধিবিপাকে অদ্য সর্ব্ববিধ অধোগতি প্রাপ্ত। বস্তুতঃ বুদ্ধিবল উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির বুদ্ধি কস্মিন কালেও উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না। পরন্তু এতদ্দেশে রাজসিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এতদ্দেশবাসীর চিন্তাস্রোত রাজসিক ভাবাপন্ন, বুদ্ধিবৃত্তি মোহাভিভূত, আত্মাভিমান ও আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ায় স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি তাহাদের ভক্তি হ্রাস হইয়াছে। নূতন শিক্ষাও সভ্যতার মোহময় জালে আবদ্ধ হইয়া ভারতবাসিগণ এক্ষণে দেশের অনেক পুরাতন উৎকৃষ্ট প্রথা বর্ব্বরোচিত ও পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য বিবেচনা করিতেছে।

প্রাচীন রীতিনীতি ও শাস্ত্রবিধির প্রতি অবহেলা করিয়া পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে সমুচিত যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সকলই স্বপ্ন-প্রধান হইয়া উঠিতেছে।

সাধারণ দলাদলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, উহা বর্ত্তমানেও আছে, পূর্ব্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কোন্ সংসার গার্হস্থ্য কলহ পরিশূন্য? কোন্ সমাজে দলাদলি নাই? কোন্ সভায় স্বাধীন মতাবলম্বী সদস্যেরা নির্ব্বিরোধ? এমন যে সুসভ্য সুসংযত বৃটিশ পার্লামেন্ট তাহাতেও সদস্যদিগের মধ্যে অসম্প্রীতির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এমন কি সুসভ্য সুশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে সময়ে সময়ে বাক্যালাপ বন্ধ হয়। ঈদৃশ অবস্থায়ও তাঁহারা

তাঁহাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে সকলে একমত। কিন্তু এতদ্দেশীয় দলাদলি ভীষণ বিভীষিকাময়, উহা দ্বারা জাতীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতি ব্যাপারে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্ম্মের অবস্থিতির অভাবে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে না। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত নাই।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বর্ত্তমান উন্নতির মূল। তদ্ধেতু আমরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছি। কিন্তু আমরা এবম্বিধ মোহান্ধ যে, ইংরেজী গ্রন্থে বিজ্ঞান বিদ্যার আভাস পাইয়াই আত্মহারা হইয়াছি। এতজ্জন্য সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিকতা প্রকাশে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কার সমূহকেও বিজ্ঞানবিরোধী ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছি। পরন্তু বিজ্ঞান বিদ্যার সহিত প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের অদ্যাপি যে আদৌ পরিচয় হয় নাই; তাহা আমরা সম্যক বুঝিতে পারিতেছি না। এতদ্দেশে বিজ্ঞানবিদ্যা পুস্তকগতা রহিয়াছে। উহাদ্বারা আমাদের বুদ্ধি বা চিত্তের কোনও সংস্কার হয় নাই এবং দেশের উপভোগ্য শিল্পজাত বস্তু সংবর্দ্ধিত অথবা স্বল্প মূল্য হইয়া উঠে নাই। অধিক কি, আমাদের ছাত্রেরা অদ্যাপি জাপানী ছাত্রদিগের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদিগকে বলিতে শিখে নাই; "Please, Sir, We don't want to read American and European history any more, we want to read how balloons are made." সুদীর্ঘ কালের ইংরেজ সংসর্গ ও ইংরেজী শিক্ষার পরও আমাদিগের মধ্যে যে বিজ্ঞান-প্রীতির সঞ্চার হয় নাই; জাপানীদিগের মধ্যে ত্রিংশৎ বৎসরে সে বিজ্ঞান প্রীতি অভূতপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য জাপানী শিল্পপণ্যে ভারতীয় বিপণী শ্রেণী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কিরূপ অন্তঃসার শূন্য তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অথচ এই শূন্য গর্ভ শিক্ষার মোহে আমরা অভিভূত হইয়া প্রাচ্য সুনীতি সদাচার ও আত্মদৃষ্টি হারাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মহোপকারক অংশ অস্মদ্দেশে প্রচারিত হয় নাই, যে অংশ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা অহেতুক সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিতেছি। সেই বিপ্লবের আবর্ত্তনে পড়িয়া আমাদের কর্ম্মশক্তি বহু পরিমাণে জড়ীভূত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিশ্লেষণ কার্য্যে বিশেষ পটু; জগতে ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য

আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ। পক্ষান্তরে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান—এই বৈচিত্র্যময় জগতে চর্ম্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান পার্থক্যের বিনাশ পুরঃসর বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার মধ্যস্থিত নিগূঢ় ঐক্যসূত্র অধিকার পূর্ব্বক ঋজুকুটিল নানাপথে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হওয়াই প্রাচ্য-বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং তজ্জন্য সকল বিরোধের মধ্যে নির্ব্বিবাদে কেমন একটি—সামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিতা হয় না। বিশ্ব সংসারকে মায়া ও মোহ বলিয়া উড়াইয়া দেই; আবার সমগ্র বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিনা, তরুলতাগুল্ম হইতে সর্ব্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল ইচ্ছার বিকাশ অনুভব করিয়া প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া ইতর বস্তুর পূজা নিস্ফল বলিয়া বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাষাণ খণ্ডে নৈবিদ্য নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমানভাবে অন্তরে স্থান দিয়া থাকি। ব্রহ্মকে নির্গুণও বলি, আবার সগুণ জানিয়া পূজাও করি। যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমরা উভয়কে আত্মসাৎ করিয়া লই। যে সমস্ত বড় বড় ধর্ম্মতত্ব পাশ্চাত্য সংস্কারকেরা অধুনা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করাইতেছেন। যেমন, জাতি উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বর এক এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা,—সে সমস্তই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নূতন কথা নহে। সামান্য কুটীরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিবে ধর্ম্মের নিকট জাতি নাই, সকলই সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের সৃষ্টি; এবং সেই মহামহান্ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বঘটে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়যে তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি? সেও বলিবে ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণ করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে সর্ব্ব-সমক্ষে আপনার অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ডকে পূজা করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার মহত্ব অস্বীকার করিবে না। এবং সর্ব্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া চিত্ত সমগ্র বহির্জ্জগৎকে অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে। এই বিরোধগ্রাসিতাই হিন্দুধর্ম্মের জীবন। নানা বিরোধের, মধ্যে এক চিরন্তন ঐক্যের আবিষ্কারই অদ্বৈতবাদের প্রধান শিক্ষা।

এই শিক্ষা ভক্তির প্রতিকূল নহে। এই মহোদার শিক্ষা যত প্রচারিত হইবে ততই তুচ্ছ বিরোধে উপেক্ষা ও জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হইবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে একনাথ, রামদাস ও তুকারাম প্রভৃতি সাধু পুরুষদিগের চেষ্টায় দেশে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়ায় বর্ণভেদময় মহারাষ্ট্র সমাজে অসাধারণ একতা ও একাগ্রতার সঞ্চার হইয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অদ্বৈতবাদের বলেই শক-যান-হুন-পল্লবাদি বহিঃশত্রুর ও বৌদ্ধ চার্ব্বাক নানক কবীর পন্থী প্রভৃতি অন্তঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে অদ্বৈতবাদের মহোদারতা আমরা এখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি না। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির বিরোধপ্রবণতা ক্রমে আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহকর মায়ায় অভিভূত হইয়া আমরা দেশের সুখ সৌভাগ্য ও অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার ভাবনা পরিহার পুরঃসর শুধু মসীজীবী হইয়া নিতান্ত হীনদশায় জীবন যাপন করিতেছি।

ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্টত্ব পাশ্চাত্য ভূখণ্ডজাত ম্যাকস্‌মূলার, ম্যাক্‌ডোনেল, কাওয়েল্‌—কোলব্রুক্‌ জোনস্‌ ও প্রিন্সেপ প্রভৃতি মহা মণীষীগণ—শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীগণ জাতীয় সভ্যতাকে অবজ্ঞা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে কেরাণী রূপধারণ করতঃ দিন দিন অধিকতর গৌরব বোধ করিতেছে। অভিনব শিক্ষার প্রভাবে এখন আর ভারতে প্রাচীন কালের ন্যায় সুপণ্ডিত, তত্ত্ববিদ্‌ রাজনীতিবিদ্‌, সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা প্রণেতা ও ব্রহ্মবাদী ঋষি উপজাত হয় না। একমাত্র মসীজীবীর সংখ্যাই দৈনন্দিন বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিতেছে। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান লোপ হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাই ভারতীয় দুর্ভাগ্যের নিদান। *

৺শশীপ্রভা দেবী।

* লেখিকা স্বর্গগতা—সুতরাং তাঁহার মতামত ও তাষায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার মতকে নারীর একাংশের মতরূপে প্রকাশিত হইল। পঃ সঃ।

নারী-প্রচেষ্টা।

—:০:—

মেয়েদের মুক্তির কোন কথা হইতেই তাহারা ছাড়া পাইলে কি অন্যায় করিতে পারে তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কত যে ভাল হইতে পারে, সে কথা তেমন শোনা যায় না কেন? প্রত্যেক মানুষই যখন আপনার রুচি, শক্তি ও প্রয়োজনানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে, তখন তাহার সুযোগ পাইলে মন্দলোকে মন্দকাজ করিতে পারে বলিয়া ভাললোকে ভালকাজও করিতে পাইবে না? আর মানবাত্মার এই প্রথম স্বাভাবিক অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে চাপা দেওয়া যখন অন্যায় ও পাপ—তখন কতকগুলি অযোগ্য লোকের কোন মতে মন্দকাজে অসামর্থ্যই কি তাহার মূল্যে বজায় রাখিতে হইবে? এই নীতি পৃথিবীর অন্য সকল বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে ইহার দশাটা কেমন হইত? "৯৯ জন দোষী খালাস পাওয়াও ভাল, তথাপি নির্দ্দোষ একজনও যেন শাস্তি না পায়"—ইহাইত বর্ত্তমান বিচার-ব্যবস্থার মূলনীতি। তাহার পর একটু ছাড়া পাইতে না পাইতেই চারিদিক হইতে সমালোচনার বাণ বর্ষণ হইতে থাকিলে মেয়েরা আত্মোপলব্ধির সুযোগ ও সময়ই বা পাইবেন কি করিয়া? ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়া আপনাকে চিনিয়া লইতে না পারিলে মানুষ কখনো মানুষ হইতে পারে না। মেয়েদের বেলা কি সকল সনাতন সত্যই বদলাইয়া যাইবে?

তাহার পর মেয়েদের সহিত পুরুষদেয় এখনকার অবস্থার তুলনা চলে কি? তাঁহাদের ক্ষেত্রে শাসনবন্ধন যতই শিথিল হউক, পুরুষেরা বরাবর আপনাদের সুবিধা মত একতরফা নৈতিক আদর্শের সৃষ্টি করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়া আসিতেছেন, মেয়েদের তাহার শতাংশের একাংশও করা কখনই সম্ভব নয়। এতদিন মেয়েদের সম্পূর্ণ বাদ দিয় তাঁহারা সব করিয়াছেন—মেয়েরা ত আর তাঁহাদের বাদ দিতেছেন না, নিজেদের অংশের বাবী করিতেছেন মাত্র। আর তাঁহাদেয় ঐ রকম ব্যবস্থার ফলে মেয়েরা সম্পূর্ণ নিরপরাধে যে সকল অকথ্য যন্ত্রণা এতদিন সহিয়া আসিতেছেন, মেয়েদের সহস্রশাসন-শৈথিল্যেও তাঁহাদের

সেরূপ সহিতে হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ২।১টী অপ্রীতিকর ঘটনা যদিই হয়, নারীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারিলে তাঁহার সনাতন বিশেষত্ব সকল ক্ষেত্রে নৈতিক বিশুদ্ধির হাওয়া প্রবলতরই করিবে। সুতরাং নারীকে মানুষ হইবার সুযোগ দিতে না দিতেই ঐ সকল ঘটনা বাড়াইয়া ঢাকঢোল সহকারে প্রচার করিয়া তাহাও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা না করাই উচিত বিশেষতঃ নারী যখন তাহাদের হাতের গড়া (তাহার জন্য যতই চেষ্টা হউক!) নহেন, তখন নারীর উপর কথায় কথায় হস্তক্ষেপের অধিকারও যখন পুরুষের নাই, তখন তাহাকে তাহার আপনার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখে প্রথমে নিজেকে বুঝিতেই সুযোগ দেওয়াই উচিত।

তাহার পর এত যে বিপদের ভয় তাহাই বা কেন? প্রধানতঃ অপর পক্ষের জন্যই নয় কি? তাঁহারা যদি মেয়েদের অনভিজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতার সুযোগে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষা ও সাহায্যদানে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই ত সব সহজ, শোভন ও নিরাপদ হইয়া উঠিতে পারে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে যাহারা মেয়েদের ঐরূপে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদেরই ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

এমন কি মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার ও উপার্জ্জনের সুবিধা হইলেই অনেকে divorce ইত্যাদি প্রচলিত করিতে হইবে বলিয়া ভয় পাইয়া যান। ঐ সকল প্রচলিত হওয়া উচিত কি অনুচিত তাহা একটী স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু মেয়েদের খাওয়া পরার সংস্থানের সম্ভাবনা মাত্রেই যদি ঐ কথা মনে হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কি ধরা পড়ে? তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থাটাই আরও পরিষ্কার রূপে চোখে পড়িয়া যায় না কি? অর্থাৎ ঐ কারণগুলি সবই রহিয়াছে,—কেবল খাওয়া পরার পর্য্যন্ত কোন উপায় না থকাতেই তাঁহাদের সকল রকম অপমান, নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও পড়িয়া থাকিতে হয়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাহারই জন্যও তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে সুবিধা ও অধিকার পাওয়া একান্ত আবশ্যক দেখা যাইতেছে।

তাহার পর বর্ব্বর যুগের সংস্কারের উপর সভ্যতার চাকচিক্য মিশ্রিত হইয়া যে সকল মিথ্যা ও বাহিরের দৃষ্টিতে মধুর বলিয়া প্রতীয়মান আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলানুসন্ধান করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। ইহাতে যদি আমাদের বড়ই পরিচিত ও প্রিয় ২।৪টী

কবিত্বপূর্ণ ভাবাদর্শের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। অসভ্যাবস্থায় মানুষ সরল বিশ্বাসেও যাহা করে, সভ্য নরনারীর কাছে তাহা হস্যাস্পদ। সভ্যতার উন্নতির সহিত মানুষের ভাব ও আদর্শ ক্রমেই বিশুদ্ধতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সকল প্রকার মন্দের মধ্যেই কিছু ভালও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার দোহাই দিয়া অথবা মোহে অধীর না হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে যাহা গ্রহণ করা হইতেছে তাহা পূর্ণ ও নির্ম্মলতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না ইহাই দেখিতে হইবে। আগের আদর্শগুলির মধ্যেও যদি সনাতন সত্য কিছু থাকে, তাহাও লোপ পাইতে পারে না, অন্য বা পূর্ণতর বেশে দেখা দিবে মাত্র। বাস্তবিক্ সত্যকে ভয় করিলে মঙ্গল নাই, তাহা যদি বিনাশও করে, তবু তাহাই আমাদের বরণীয়। উহা আমাদের ঘরকন্নার মাপে গঠিত না হওয়ায় রাষ্ট্রে ও সমাজে স্থান দিতে চিরাভ্যস্ত সুখ, ও আরামের সময়ে সময়ে কিছু ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব, বিশেষতঃ অহেতুক দৃষ্টি-পীড়ার কারণ ত হইতেই পারে। তবে বিনাশ সত্যের ধর্ম্ম নয়, বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সমাজ ব্যবস্থায় অনেক মিথ্যার জাল জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠায় উহার ঐ রূপটাই আমাদের কাছে প্রথমে প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু যতই সত্যের অভিমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায় ততই তাহার মধ্যে সত্যের প্রকাশ সহজ হইয়া আসে। ইহাতেও নানা নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু সত্যের রোধ তাহার প্রতিবিধান নয়। নদীতে বান আসার সম্ভাবনা থাকিলেও মূল প্রস্রবণই বন্ধ করিয়া দেওয়া তাহার প্রতিকার বলিয়া গণ্য হয় না।

মেয়েরা অনেক কাজ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের তাহা হইতে আটকাইয়া রাখার জন্য যে আইনকানুন করা হয়, তাহার কোন অর্থ আছে কি?—তাঁহাদের ত কেহ দয়া করিয়া কিছু করিতে বলে না, তাঁহারা যে কাজ করিতে পারেন না, তাহা ত বাধা না থাকিলেও পারিবেন না,—সুতরাং তাহার জন্য আইন গড়িয়া রাখার আবশ্যকতা কি?

অনেকে বলেন পারিলেও অনেক অনেক কাজ তাঁহাদের করা উচিত নয়। কিন্তু পাপ ও অন্যায় ভিন্ন মানুষের কোন্ কাজ "করা উচিত নয়"—তাহার কোন একটী নিয়ম সকলের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। কারণ সকলের পক্ষে "উচিত" এক নয়, ও হইতে পারে না। প্রত্যেকের শক্তি, প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার "উচিত" ঠিক করিতে হয়।

কেবল পাপ ও অন্যায়ের কথা যে স্বতন্ত্র, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। তাহাই কেবল কাহারও কোন সময়েই "উচিত" এমন কি প্রয়োজনীয়ও হইতে পারে না।

তাহার পর পুরুষেরা মেয়েদের কিছুই ছাড়িয়াও দিবেন না,—সাহায্যও করিবেন না,—অথচ তাঁহারা আপনারা কিছু করিতে গেলেও ঘরে বাহিরে অসন্তোষ, অপ্রেম, বিরুদ্ধতার প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! তাঁহাদের কিছু করিতে গেলে ঘরকন্নার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজের কড়ায় কড়ায় হিসাব বুঝাইয়া দিয়াও নিস্তার নাই।—বাধা দিবেন,—অথচ তাঁহারা নিজে কিছু করিতে গেলেও তাহা দুর্দ্দান্তভা, রমনীজনোচিত ব্যবহারের অভাব বলিয়া আখ্যা পাইবে;—এমন কি তাঁহারা যে নারীই নহেন তাহার প্রমাণও সিদ্ধান্ত হইয়া যাইতে পারে। অনেকে আবার তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা অন্যায় বলেন না, কিম্বা অন্য মেয়েদের তাহার জন্য চেষ্টা করিতে দেখিলেই হয় ত প্রশংসাই করেন,—কিন্তু বাড়ীর কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলেই জ্ঞানহারা হইয়া যান। মেয়েরা যখন আকাশ হইতে পড়েন নাই, বা সেখানেই বাস করেন না, তখন তাঁহাদের ঘর হইতেই ত সব করিতে হইবে এবং বাহিরও হইতে হইবে! তাহা না হইলে তাঁহারা কেমন করিয়া আপনাদের মুক্ত করিতে পারেন, তাহার একটী রাজপথের সন্ধান পুরুষেরাই বলিয়া দিন।

বাস্তবিক মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করিতে তাঁহাদের সাহায্য পাইলেও মেয়েদেরও অনেকের বহুদিন জীবন উৎসর্গ করা আবশ্যক জানিয়াও প্রত্যেকে যদি বাড়ীর মেয়েদের তাহার চেষ্টায় বাধা দেন, তাহা হইলে ঐ সকল কাজ করিবে কে? কেবল কুমারী বা বিধবারাই ঐ কাজ করিবেন বলিয়া যদি ধরা হয়, তাহা হইলেও বলিতে হয়, কুমারী থাকার সুযোগই ত তাঁহাদের দেওয়া হয় না। বিবাহিতার মত জগৎ সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভও তাঁহাদের হওয়া কঠিন। আর মেয়েদের কোন কাজের কথাতেই যে ভয় সর্ব্বাগ্রে সকলের মনে জাগিয়া থাকে তাহার আশঙ্কাও তাঁহাদের সম্বন্ধে আর সকলের অপেক্ষা স্বভাবতই একটু বেশী থাকার সম্ভাবনা। তারপর তাঁহাদেরও কি কিছু করিতে দেওয়া হয়?

বিধবাদের সম্বন্ধেও বলা যায়, তাঁহারা অনেক বিষয়ে মুক্ত হইলেও তাঁহাদের "বৈধব্য-যন্ত্রণা" নামক পৃথিবীর অন্য সকল স্থানে অজ্ঞাত বিষম ব্যাপারটী, যে বিরাট আকারে তাঁহাদের গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নাগপাশের বন্ধন হইতে উদ্ধার না হইতে পারিলে

তাঁহাদের কোন কাজ রীতিমত করিয়া উঠা বড় সহজ হয় না। তাহার পর তাঁহাদের অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান আবশ্যকীয় জিনিষগুলিরই অভাব থাকায় তাহা সংগ্রহের চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকিতে হয়, এবং অনেক সময়ে তাহারই জন্য দিবারাত্রি পশুর মত খাটিয়া অত্তিহীন জীবন কাটাইতে হয়। সে অবস্থায় অবশ্য ওরূপ কোন কাজ বা তাহার উপযুক্ত শিক্ষা কিছুই সম্ভব নয়। তবে সৌভাগ্যশালীরা ভার লইতে ও ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলে ইঁহাদের দ্বারা অনেক কাজ করাইতে ও ইঁহাদের মানুষ করিয়া তুলিতেও পারেন বটে;—কিন্তু তাহাতেও সৌভাগ্যশালীদেরই আগে নামার প্রয়োজন প্রতিপন্ন হইতেছে। তারপর ইঁহাদের পক্ষেও কুমারীদের সম্বন্ধের যে আতঙ্কটীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কিছু খাটে।

কিন্তু কোন কাজ কেবল বিশেষ এক অবস্থার লোকে মাত্র করিতে পারিবে এই নিয়মের প্রধান আপত্তি এই যে, কুমারী বা বিধবা হইলেই কাহারও ঐ বিষয়ে যোগ্যতা বা প্রেরণা গজাইয়া উঠিতে পারে না।—এদিকে সধবার মধ্যেও আবার তাহা থাকা আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং পারিবারিক বিশেষ কোন অনতিক্রম্য বাধা না থাকিলে, কেন যে তাঁহাদের দেশের ও দশের কোন কাজে বাধা থাকিবে বোঝা কঠিন। ঐরূপ বাধা থাকিলেও ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকিলে নিজেদের কর্ত্তব্য, নিজেরা বুঝিয়া করিবার সুযোগ ও অধিকারই বা কাহারও থাকিবে না কেন? সকল বিষয়ে এমন শিশুর মত আগলাইয়া রাখার অর্থ কি? শিশুদেরও ত আগলান অপেক্ষা ছাড়িয়া দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযুক্ততা দিন দিন প্রমাণিত হইতেছে। তাহার পর যাঁহারা বয়স্কা ও নানারকম বাধামুক্ত তাঁহাদের বিষয়ও কিছু বলিতে যাওয়াই বহুল্য,—তাঁহাদের এ বিষয়ে যোগ্যতমের মধ্যেই পরিগণিত করা উচিত নয় কি? না, তখন তাঁহাদের শরীর, মন যতই ক্লিষ্ট হউক, পৃথিবীর পাপতাপ যতই প্রবল হউক, তথাপি অতি তুচ্ছ ও অধিকাংশস্থলে অনাবশ্যক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি লইয়াই মাত্র চিরকাল কাটাইতে হইবে? জগতের উদার ক্ষেত্রে যদি তাঁহাদের কিছু করিবার বা দিবার থাকে, তাহার জন্য চেষ্টা করারও অধিকার থাকিবে না? আগেকার গৃহিনীরা এ সময় তীর্থযাত্রা, পূজা ব্রত ইত্যাদি করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইতেন কিন্তু এখনকার নবযুগের পূজার আরতি ঘণ্টাধ্বনি যাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে আসিয়া পৌঁচিয়াছে,

তাঁহাদের তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে, বাধা দিতে এত প্রয়াস কেন ?—তখনও কি তাঁহাদের ঘরের কাজে নূন হইতে চূণ খসিবার যো নাই ? ঐরকম চাপিতে চেষ্টা না করিলে তাঁহার আপনার শক্তি, সামর্থ, সুবিধা অনুসারে তাহার ব্যবস্থা ঠিকমতই করিতে পারেন ! কিন্তু তাহা না হইয়া "ঘরের কাজের" দাবী আমরণ সর্ব্বগ্রাস করিবার চেষ্টা চলিলে তাঁহাদের তাহাতে বৈরাগ্য আসাই ত একান্ত স্বাভাবিক। আর "ঘরের কাজ" বলিয়া লাল মার্কায় চিহ্নিত সব কাজগুলি সকল নারীর সমস্ত জীবনের কাজ কিনা তাহাতেও সন্দেহ করিবার আছে।

সধবারা স্বামীর সহিত ঐসকল কাজ করিবেন বলিলেও বলা যায়, তাহা যদি সত্যই সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাপেক্ষা সুখের বিষয় কি হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা হওয়া সম্ভব কি ? পত্নীর যে বিষয়ে অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা আছে, স্বামীর তাহাতে তাহা না থাকিতে পারে, তাঁহার সময় না থাকাও খুবই সম্ভব বিশেষতঃ মেয়েদের উন্নতির প্রয়াস অনেক স্বামীরই রুচিকর না হওয়ার সম্ভাবনা ; কিন্তু তাই বলিয়াই কি উহারা ইচ্ছা ও সামর্থ থাকিলেও ঐ সকল কাজের চেষ্টা করিবেন না ? এ বিষয়ে যথার্থ অনুরাগ ও অন্তর হইতে বেদনাবোধ যাঁহাদের জাগিয়াছে ও সেজন্য জীবন উৎসর্গ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, এরূপ নারীর সংখ্যা কোন দেশেই সুলভ নয়, আমাদের দেশের কথা ত বলাই বাহুল্য। সুতরাং কাহারও তাহা থাকিলে অসন্তোষ, অপ্রেম ও বিরুদ্ধভাব না আনিয়া অন্ততঃ তাঁহাদের নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করিবার সুবিধাটুকু দেওয়াও একান্তই উচিত নয় কি ? এই সকল জীবনের প্রধান কাজ বলিয়া লইলে বা তাহার জন্য চেষ্টা করিলেই যে একেবারে সন্ন্যাসিনীই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন উচ্চতর বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেই কাহারও সাধারণ মানব ধর্ম্ম ও জীবনের সার পদার্থ, ভালবাসার আকাঙ্খা বা তাহা দিবার যোগ্যতা থাকে না এমন নয়। বিশেষতঃ এরূপ নারীরা বুদ্ধি ও হৃদয় বৃত্তিতে বিশেষ সমৃদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহাদের মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইলে তাহা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা লোপ পাইবে। ভালবাসার প্রস্রবণও তাঁহাদের ভিতর নির্ম্মলতর ও উচ্চশ্রেণীর হওয়াই সম্ভব বলিয়া পত্নীত্বেও তাঁহাদের কোনই অযোগ্যতা থাকিতে পারে না। কিন্তু উহার প্রচলিত ধারণা ও দাবীই যদি তাহার একমাত্র আদর্শ বলিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের তাহার মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে না। কিন্তু কথায় যত বাড়াম

হস্তক, তাঁহাদের খেলার পুতুল, অধিকৃত বস্তু ও গৃহদাসী মাত্র ভাবে না দেখিয়া যথার্থ যদি জীবন-সঙ্গিনী বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে সধারণ নারীদের অপেক্ষা ইঁহাদের মধ্যে তৃপ্তি লাভের সম্ভাবন বেশীই থাকিবে। তবে যাঁহারা সংসারে সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কেবল ঐ সব কাজেই জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য সতন্ত্র ;—সুবিধা পাইলে তাঁহারা আপনা হইতেই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইবেন না।

গৃহকর্ম্মের বিরুদ্ধে বলিতে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাতে বিদ্বেষের কিছুই নাই, এবং প্রচলিত আদর্শের গৃহকর্ম্ম-পরায়ণা সুশীলা নারীদের মধ্যেও শ্রদ্ধা করিবার অনেক জিনিষই আছে ! কিন্তু তাহাই যে নারীর একমাত্র বা চরম আদর্শ নয় চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বারবারই বলিতে বাধ্য হইতে হয়। বুদ্ধিমতী, মহৎহৃদয়া নারীরা কেহই যে গৃহকর্ম্ম বা তাহার পরিদর্শন করিবেন না এমনও নয়; অধিকাংশস্থলেই বরং তাহা আপনা হইতেই অধিকতর নিপুণতার সহিত করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অসংখ্য প্রকার বৈচিত্র্য ও শক্তি, প্রবৃত্তির তারতম্য থাকিতে পারে, সুতরাং সকলকে একদলে ফেলিয়া বিচার করা অসঙ্গত। মাতা ও পত্নীর মুখ্যকর্ত্তব্যগুলি করিতেছেন কিনা ও আপনাদের জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করেন, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের বিচার করা উচিত। মাতা ও পত্নীর উপযুক্ত স্নেহ, প্রেম, মঙ্গলাকাঙ্খা থাকিলেই হইল, নতুবা একটী গুরুতর বা বিশেষ কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিলেও কাহাকেও সকল সময়ে, সকল বিষয়ে প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া দোষ দিতে থাকা কি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা নয় ? পুরুষেরা কোন একটী গুরুতর বা বিশেষ কর্ত্তব্যের ভার লইলে কি করিয়া থাকেন ? তাঁহাদের ঐরূপ কাজের, ফলে তাঁহাদের পত্নী ও সন্তানদের দারিদ্র্য ইত্যাদিতে অনেক সময়ে কি পর্য্যন্ত না কষ্ট পাইতে হয়,—মেয়েদের অবশ্য পতিপুত্রদের ঐরূপ কষ্ট দিয়া কেহ কিছু করিতে বলে না, এবং তাহার সম্ভাবনাও নাই ! তবু তাঁহাদের বেলা এত বিরুদ্ধতা কেন ?

বাস্তবিক গার্হস্থ্য জীবনের রক্ষার মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়াও যাহাতে মেয়েরা সকল রকম কাজ ও বিদ্যার সাধনা ইত্যাদি করিতে পারেন, গৃহস্থালীর ব্যবস্থাও আদর্শ সেইভাবে গঠিত করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে যে সকল মেয়েদেরই সুবিধা হইবে এমন নয়, গৃহের হাওয়া বাতাসও উচ্চ ও বিশুদ্ধতর হইতে পারিবে।

নতুবা যাঁহারই কোন উচ্চ চিন্তার দুঃসাহস আছে, তাঁহাকেই যদি সংসারের বাহিরে একঘরে হইয়া থাকিতে হয়, তাহা তাঁহার বা সমাজের কাহারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। তবে ব্যক্তিবিশেষের কথা যে স্বতন্ত্র তাহা আগেই বলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে বিলাতের দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সেখানকার নারী-প্রচেষ্টায় পুরুষেরা গোঁয়ারের মত বাধা না দিলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা নিবারিত হইতে পারিত। এইরূপ সংঘর্ষে অনেক সময় আত্মনির্ভরতা ও আত্মোপলব্ধি বাড়াইতে পারে বটে,—কিন্তু তাহার সহিত দুই পক্ষের আতিশয্য ঈর্ষা দ্বেষ, গোলমালের সৃষ্টি এবং উন্নতিও যে কেবল অনর্থক কিছুদিন পিছাইয়া রাখা হয়, ইহাও মনে রাখা উচিত। সুতরাং যুগধর্ম্মের গতি যে আটকাইবার নয়, ইহাই মনে রাখিয়া নতশিরে তাহার বিকাশে সাহায্য করাই বুদ্ধিমান নরনারীর কর্ত্তব্য। পুরুষেরা মেয়েদের সাহায্যে অগ্রসর হইলে মেয়েদেরও তাঁহাদের দিকে দেখিবার বেশী সম্ভাবনা। নতুবা এতদিনের অন্যায়, অত্যাচারের পর এখনও চাপিবার চেষ্টা করিলে সহস্র গালি দিলেও তাঁহাদের প্রতি মেয়েদের সদ্ভাব ও বিশ্বাস ক্রমেই হারাইতে হইবে মাত্র। ইহাতে কতকগুলি ভীরু আরামপ্রিয়, স্থূলদৃষ্টি বা চতুর নারীও তাঁহাদের পক্ষে জুটিতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের লইয়া তাঁহারাও তৃপ্ত হইতে পারিবেন না। কোন শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকেরাই যে সে শ্রেণীর সর্ব্বোত্তমের মধ্যে নয়, ইহা বোধ করি আর বলিবার অপেক্ষা করে না।—সুতরাং সহস্র চাটুবাদ ও তোষামোদেও ইঁহারা প্রভুপক্ষের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। এদিকে মেয়েদের মধ্যের উৎকৃষ্টভাগও বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাদের প্রকৃতির অনেক শ্রেষ্ঠগুণের প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করিয়া উঠিতে পারেন না। এমন কি আপনাদের দলের বাজেলোকগুলির যে সব আতিশয্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহারা নিজেরাই দমন করিতেন, সেগুলিতে মন দেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না, আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন স্থলে তাহা সমর্থন পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়। বিশেষতঃ সত্যের প্রকাশের জন্য দুঃখলাভ যদি আবশ্যক হয়, পাশ্চাত্য নারীদের আত্মোৎসর্গের ফলে সমস্ত জগতের নারীগণই তাহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সত্যে

আর তাঁহাদের কোনই দ্বিধা বা সংশয় নাই, এখন পশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা এবং প্রাচ্য-সদ্‌গুণগুলির দ্বারা তাহার যেটুকু অসম্পূর্ণতা আছে তাহাও পূরণ করিয়া লওয়া যে তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে, জগতের এই বিশেষ আহ্বান প্রাচ্য-নারীগণের মর্ম্মে মর্ম্মে জাগিয়াছে। সুতরাং ইহার গতিরোধের চেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

'বিজলী' বঙ্গনারী।

নারীর সাহস।

—:-:*:-:—

দেশের ঘোর দুর্দিনে, আজ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের বাণী স্মরণ হচ্ছে; তাঁরা যা বলে গেছেন, যদিও আজকাল তা সেকেলে "কুসংস্কার" নামে অভিহিত হচ্ছে। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিঠে; তাই আজ কাঙ্গালের কথাই বারংবার মনে হচ্ছে। যারা চোকে বিলাতী ঠুলি বেঁধে, কাণে তুলো দিয়েছেন তাদের কথা অবশ্য জানি না! কিন্তু আমার মত যারা কাঙ্গালিনী, তাদের যে সেই পুরোণো কথা মনে হবেই তাতে আর ভুল নাই।

আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহেরা বলে গেছেন, "সাহসই লক্ষ্মী; দুঃখ ও বিপদে পড়েও সাহস হারিও না।" কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সাহসটাকেই সর্ব্বাগ্রে হারিয়ে বসে আছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, সংযম ও ন্যায়পরায়ণতাকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি। পুরুষদের ত কথাই নাই "জল উঁচু" ও জল নীচুর দলের প্রায় পোনর আনাই। উচিত বলবার, অপ্রিয় সত্য বলবার সাহসটুকুও নেই তাদের। অন্তরে অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলক্ষণ আছে; কারণ বিধাতাপুরুষ বিবেক নামক একটা জিনিষ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন, যার জোরে অন্যায়কে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের বীর পুরুষগণের বীরত্বে এই বিবেকটাও ধামা চাপা হয়ে থাকে, দংশন করবার সুযোগই পায় না। তাদের শারীরিক শক্তি সাহসের পলাশীক্ষেত্রেই সমাধি হয়েছে। গায়ের জোরই জোর নয়, মনের বল না থাকলে। তোমাদের যে, তারই অভাব। তোমাদের

মানসিক বল কোথায়, তার দৃঢ়তা কোথায়? তোমাদের ধৈর্য্য সংযম কোথায়, তবে তোমাদের সাহস কোথায় ভাই?

বড়ই দুঃখে বলতে হচ্ছে, নারীদের অবনতি ততোঽধিক। কেন বোন, আমরা এত ভীত হব! এই সাহস হারাবার জন্য কেউ ত আমাদের মারধর করেনি। তবে কেন, আমরা অবলা নামধারিণী। জোঁক শুয়া পোকা দেখে দৌড়তে কে আমাদের উপদেশ দিয়েছিল? নিজের সাহস নিজে কেন হারাও! তুমি নারী, তোমার অসীম সাহস, অসাধারণ সংযম থাকা কর্ত্তব্য। তুমি নিপীড়িতা হয়ে, নিগৃহিতা হয়ে পীড়ন ও নিগ্রহ সহ্য করে করে শুধু নিজের সম্মান, নিজের সাহস হারাচ্ছ। পুরুষ যতই কেন বলুকনা, "নারী দেবী, আমরা নারীকে সম্মান করি" কিন্তু সংসার ঘেঁটে দেখ, উপলব্ধি হয়, আমরা কেন দেবী। তাই বলছি বোন, বিপুল সাহসে বুক বেঁধে প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হও। নিজেকে রক্ষা কর। সুপ্ত সিংহীনি জেগে উঠুক। ন্যায়ের জ্বলন্ত অনলে, অন্যায়কে আহুতি দেও, তোমার শিরায় শিরায় ন্যায়পরায়ণতার রক্ত বহিতে থাকুক নিজ গৌরবে গৌরবময়ী হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত কর। গান্ধী-জননীর মত বীরজননী হও।

পরপদলেহনের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে, শিশু পালনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ সেবায় কেন আত্মনিয়োগ করব না? কিন্তু কেহ অধিকার চাইতে গেলেই, অলসতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, স্বাবলম্বী হতে হবে। স্বামীর উপার্জ্জনের দিকে শকুনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থেকো না। এতেই পতি দেবতারা ভাবেন পতি বিনে গতি নেই, প্রেমের দিক থেকে না হলেও অন্ততঃ পেটের দিক দিয়ে। এবং এই জন্যই দেবতার তাচ্ছিল্য দৃষ্টি তোমাদের উপর। তাই বলছি তোমার নারীত্বের অবমাননা করিও না। ক্রীত দাসীর মত জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। পুরুষরা মুখে যতই বলুক না কেন কার্য্যে কিন্তু তাদের অন্য ভাব। অনেক রকমে তার পরিচয় পেয়েছি।

অথচ সবাই স্বাধীনতাকামী! আমাদের সভাতে বসিয়া থাকিলে আমরা যে অবলা সেই অবলাই থেকে যাব। ওঠ, লুপ্ত সাহস ফিরিয়ে আন, আমাদের জাগরণ সুদূরপরাহত নয়, যদি আমরা কায়মনোবাক্যে তাহাই চাই।

'জনশক্তি' মিসেস্ জেড্, রহিম চৌধুরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:০:—

শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা।

ইঞ্চকেপ কমিটি সরকারের অভাব মোচনকল্পে নারশিক্ষয়িত্রীর ও ইন্‌স্পেকট্রেদের সংখ্যা কমাইতে উপদেশ দিয়াছেন। শিক্ষাই মানব জীবনের সার্থকতার মূলে। এদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিলে মানুষকে খর্ব্বের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে।

"সমস্ত সভ্য দেশেই জাতীয় শিক্ষা বলিতে আমরা এই বুঝি যে জাতীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী জাতীয়ত্বের পরিপোষক শিক্ষা, শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইলেও স্থান, কাল, পাত্রভেদে পথও বিভিন্ন। অভিজ্ঞ ও যোগ্য ভারতবাসীর দ্বারা ভারতবাসীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছিত হইলে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাও যোগ্য স্ত্রীলোকের দ্বারা নিয়মিত হওয়াই স্বাভাবিক; ইহার বিরুদ্ধাচরণ অস্বাভাবিক, ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। বালিকাগণের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অনুধাবন করতঃ তাহাদের শিক্ষা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুফল লাভ করিতে হইলে মহিলাগণকেই উপযুক্ত শিক্ষাদাত্রীরূপে গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু কালক্রমে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুকোমলমতি বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বিধানও শিক্ষয়িত্রীগণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে এক পক্ষে যেমন শিক্ষাবিভাগের ব্যয়স্বল্পতা অবশ্যম্ভাবী পক্ষান্তরে বালকবালিকাগণের কোমল বৃত্তি নিচয় শিক্ষয়িত্রীদের হস্তে অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিবে ইহা বলাই বাহুল্য, সভ্যদেশের কার্য্যপ্রণালী এই ধারণারই পরিপোষক ও এই সত্যেরই প্রবর্ত্তক; ভারতবর্ষেও মহীয়সী মহিলা স্বনাম ধন্য। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে সহৃদয় সহৃদয়া নরনারীগণ দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে নারীর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই নারীর উচ্চাকাঙ্খারূপ অবাধ ও স্বাভাবিক সরল অধিকারের সার্থকতা সাধন করা কতদূর সমীচীন ও উদারতার পরিচায়ক। তাহা সুধী ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য।

অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় বালকবালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা মহিলাগণের হস্তে ন্যস্ত হইলে, মহিলাগণ সুমাতা, সুগৃহিণী, সমাজের কার্য্যে সহধর্ম্মিণী ও পুরুষ পুরুষোচিত কর্ম্মতৎপরতায় কর্ম্মঠ হইয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বা উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিলেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরিত্রে কর্ম্মে, বিশ্বজগতের সম্মুখে স্বীয় স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেই জাতীয় মঙ্গলের সূচনা হইবে, নতুবা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিতে হইবে।”

নারী পুলিস।

“কলিকাতার ইংরেজেরা তাঁহাদের আমাদের পাহারা দিবার জন্য নারী-পুলিস চাহিতেছেন। কিন্তু আমাদের পাহারা অপেক্ষা আরও অনেক গুরুতর কাজের জন্যও তাহারা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এখন মেয়েরা বাহিরে যাইতেছেন এবং ক্রমেই আরও যাইবেন কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষেরা এখনও তাহাতে অভ্যস্ত না হওয়ায় তাঁহাদের যে রকম সভ্যতার জ্ঞানমাত্রের অভাবের পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের রক্ষার জন্যই নারী পুলিসের আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের মেয়েরা বাহিরে গেলেও পুরুষের সঙ্গে তেমন করিয়া কথা কহিতে এখনও পারেন না, আর পুরুষ পুলিসেরাও সংস্কারবশে ভাল চোখে দেখে না ও সহজে তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হয় না। মেয়েরাও লজ্জাবশে এবং তাহাদের ভাব দেখিয়া তাহাদের সাহায্যে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। নারী পুলিস হইলে অনেক দুষ্ট লোকের শিক্ষা হইতে পারে। মেয়েরাও একটু সম্ভ্রম স্বাচ্ছন্দ্যের এই প্রাথমিক অধিকারটুকু উপভোগ করিতে পারেন, এটুকু তাঁহাদের একান্তই ন্যায্য দাবী। তাঁহারাও যখন দেশে বাস করেন, তাঁহাদের মানসম্ভ্রম রক্ষার ভার লওয়া রাষ্ট্রের একটী মুখ্য কর্ত্তব্য। অন্য সকল ক্ষেত্রেই দুষ্টের দমন করিয়া শিষ্টেরা যাহাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা বহুদিন হইয়াছে, মেয়েদের ক্ষেত্রেই কেবল দুষ্ট পুরুষদিগকে ছাড়িয়া দিয়া এতদিন তাঁহাদেরই বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এখন যখন এই জ্ঞানটী জাগ্রত হইয়াছে, আর পুরাতন ভ্রান্ত ব্যবস্থা লইয়া চলিতে পারে না।

তাহার পর স্কুলের মেয়েদের রক্ষার জন্যও ইহার বড়ই প্রয়োজন। এখন স্কুল হইতে গাড়ী পাঠাইয়া বাড়ী বাড়ী মেয়ে সংগ্রহের যে রীতি আছে, তাহাতে তাহাদের স্কুলের সময়ের অনেক আগেই স্নানহার সারিতে হয় এবং খাওয়ার পরই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে অনেকে একত্রবদ্ধ অবস্থায় চাপাচাপি করিয়া স্কুলে আসিতে হয়। এদিকে তাহাতে তাহাদের ছুটীর পর অনেকক্ষণ সেই অভুক্ত থাকিতে হয়। আসার সময় যে কারণে সকালে আসিতে হয়, যাওয়ার সময় অবার ঠিক সেইকারণেই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিতেও অত্যন্ত দেরী হয়। এই সবই মেয়েদের পক্ষে একান্ত স্বাস্থ্যহানিকর। তাহাপেক্ষা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া একজন শিক্ষয়িত্রী বা কোন বয়স্ক মহিলার সহিত হাঁটিয়া আসা সকল বিষয়েই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে যে খাওয়াতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাহাতে স্বাস্থ্যলাভ হইতে পারে। এই ভাবে মেয়েদের আসার জন্য দূরের স্থলে ট্রামেও বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা যাইতে পারে। মেয়েদের গাড়ীতে আসার যে সকল বিবরণ আমাদের কাণে আসিয়াছে, তাহাতে ইহা তাহাপেক্ষা নিরাপদও হইবে। এই সব সময়ে নারী পুলিস অনেক কাজে লাগিতে পারে। মেয়েদের পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি, বাড়ীর কেহ না কেহ সেই সময় আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে যাতায়াত অনেকেই করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অবশ্য কন্যা ভগিনী-দের সহজে সঙ্গে করিয়া আনা নেওয়া করিতে পারেন।

শিশুরক্ষাতেও নারী পুলিসের দ্বারা অধিকতর সুফল পাওয়ার আশা করা যায়। আজকালকার সহস্র রকম যানবাহনপূর্ণ বিপদসঙ্কুল রাস্তায় কত শিশু ও ছোট ছোট বালকবালিকা যে অরক্ষিত ভাবে বাহির হয়, তাহাতে বিপদ কম ঘটে না। তাহার পর প্রতারিত, পথ ভ্রান্ত বালিকা ও নারীদের রক্ষার জন্য তাহারা যে কত আবশ্যক তাহা ত বলাই যায় না। অনেক বিপদ অত্যাচার ইহাতে নিবারিত হইতে পারে। মেয়েদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটী নূতন যুগ ইহাতে খুলিবার সম্ভাবনা। সব যদি এখনই না হয়, যতটা সম্ভব যে সব স্থানে আবশ্যক, তাহা দেখিয়াই প্রথমে ইহার ব্যবস্থা করা উচিত।

বঙ্গনারী।

* * *

মেমদের জন্য মেয়ে পুলিসের আবশ্যক নাই,—আবশ্যক আমাদের জন্য! কেন? কারণ মেমরা আত্মরক্ষায় পটু,—সবল সাহেব তাহাদের পশ্চাতে আছে—একথা অত্যাচারীর

মনে সর্ব্বদা জাগ্রত ;—একটি মেম অপমানিতা হইলে সমগ্র ইংরেজ সমাজ তাহার প্রতীকারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে—অত্যাচারীর শাস্তি না হইলে কিছুতেই তাঁহারা ক্ষান্ত হয় না—এ কথা আততায়ীর জানিতে বাকী নাই,—তাহার ফলে মেমের দিকে তাহারা তাকাইতেও ভীত। আর অসহায়া আমাদের সে সাহস নাই,—বঙ্গনারীরও সেই অবস্থা,—সম্মুখে নারী নিগ্রহ হইতে দেখিলেও সহজে কেহ সাহায্যে অগ্রসর হইতে চায় না;—একবার একটি অসহায়া নারীকে রেল ষ্টেশনে দুর্বৃত্ত রেল-কর্ম্মচারীর কুচক্র হইতে রক্ষা করিতে এ সত্য অনুভব করিয়াছি,—উপস্থিত ভদ্র আখ্যাধারী নর-পশুরা সে কার্য্যে সাহায্য করা ত দূরের কথা,—যুবতীর সাহায্যে অগ্রসর হওয়ায় প্রকাশ্যে অশ্লীল বিদ্রুপে বিদ্ধ করিয়া ইতরামী করিতে ছাড়েন নাই! দেশের লোকের মনের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে মেয়ে পুলিস পেছনে বাঁধিয়া কি ফল? সে আরও উপসর্গ বৃদ্ধি করা! মেয়ে পুলিস হইবে কাহারা? উচ্চ শ্রেণীর নারী এ কার্য্যে স্বীকৃতা হইবেন না নিশ্চয়ই,—যাঁহারা এ বিষয় নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের নীতিজ্ঞান পরিস্ফুট নয়,—সে অবস্থায় নারী পুলিস কুলোকের কুকার্য্য সাধনের যন্ত্র হইয়া যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি না করে! বঙ্গের পুলিস বিভাগে ঘুসের প্রভাব কাহারও অজ্ঞাত নাই,—আবার তারই দ্বিতীয় সংস্করণে আবশ্যক? বরং মেয়েরা আত্মীয় বন্ধুর সহিত আবশ্যকমত বাহির হইয়া বাহিরের সহিত পরিচিত হউন,—নিজে সপ্রতিভ সাহসী হউন,—আত্মীয় পুরুষ ভয়ে জুজু না হইয়া অত্যাচারের প্রতিকারপরায়ণ হউন,—ভদ্র সমাজ সর্ব্বদা অন্যের সাহায্যে প্রস্তুত হউন—আদালতে সাক্ষী দিবার ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন—নিরালায় লুকাইয়া নিরাপদ হইবার প্রবৃত্তি যতদিন আমাদের মধ্যে হইতে দূর না হইতেছে ততদিন কোন প্রকার অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা লাভের আশা বৃথা। পদে পদে অত্যাচার! চলা ফেরায় রেলে, আদালতে সকল স্থানে আমরা গাঁঠের কড়ি দিয়াও হাঁটিয়া পার হই,—আমাদেরই পয়সায় পুষ্ট,—সাধারণের টাকায় প্রভু হইয়া আমাদিগকে অপমান করে—আমরা তাহাদের প্রতাপ নীরবে সহ্য করি—ইহাতে তাহাদের বৃদ্ধি হইবে না কেন! বস্তাগাদা হইয়া তৃতীয় শ্রেণী বা মধ্যম শ্রেণীর রেল গাড়ীতে অনেক শিক্ষিত মহাশয়কে দুরন্ত মনের ক্ষোভে বলিতে শুনিয়াছি,—কাগজে লিখিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া ইহার প্রতীকার না করিলেই নয় কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রেলে অবস্থান পর্য্যন্ত,—বাড়ী গিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত! কার কার জন্য চেষ্টা,—আমাদের এরূপ উদ্যমের পুরস্কার যে অশেষ কষ্ট হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি! মনটা হওয়া চাই—আত্মরক্ষায় তৎপর নতুবা পুলিস পাহারা আমাদের আরও করিবে কাপুরুষ!

এ তথা কথিত সভ্যতার যুগে সুখ সচ্ছন্দতার ত সীমা নাই। ট্যাক্সে ট্যাক্সে দেশটা শেষ হইতে চলিল, পুরুষ পুলিসের ব্যয় ভার বহনেই আমরা আসি যাই করিতেছি,—আবার ইহার উপর মেয়ে পুলিস! যে দেশের লোকের অন্ন বস্ত্রের এরূপ অভাব, সে দেশে ব্যয় বাহুল্যের কথা—সর্ব্ব প্রথমে চিন্তা করিবার!

লবণের ট্যাক্স।

মোটা ভাত মোটা কাপড়,—তাহারও সংস্থান হয় না আর এ দেশে,—প্রাণ ও লজ্জা রক্ষা হয় না। কেবল লবণকে সম্বল করিয়া এ দেশের আট আনা লোক অর্দ্ধাশনে কোন ক্রমে শরীর রক্ষা করে। দেহ রক্ষার শেষ উপায়, অন্ন গ্রহণের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ও প্রধান উপকরণ,—লবণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল তবে আর থাকিল কি! এই যদি সভ্য জগতের ব্যবস্থা হয়, অসভ্যতা আমার চিরশ্রেয়, প্রাণ বাঁচিলে না অন্য কথা,—এবারে অভাবে সরকার এ করিলেন কি? প্রজা শেষ হইয়া গেলে কর আদায় হইবে কাহার নিকট হইতে,—এ হইয়াছে প্রাণ মারার ব্যবস্থা। ইহার প্রতীকারের জন্য দেশময় আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। ধনি! নিজে চড়া দরে লবণ কিনিতে পায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না,—যাইয়া দেখ তোমার কৃষক প্রতিবাসীর প্রতি,—তাহার মৃত্যু ঘটিলে তোমার স্বার্থ কিছুতেই রক্ষা হইতে পারে না,—অন্নের ব্যবস্থা যে তাহাদের হাতে—সে যদি অন্নহীন হয় অন্ন যোগাইবে কি ভুতে!

সরকারের আয়ের হানি হয় বলিয়া লবণ প্রস্তুত করা আইন বিরুদ্ধ সুতরাং অভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া দেশের লোক এ অপরাধে অপরাধী হইতেছে নিত্য,—সাময়িক পত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। সঞ্জীবনী সংবাদ দিয়াছেন—

বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা মহকুমার অধীন মৃজাকালু গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া ছিল। নিমক বিভাগের ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু সে

সংবাদ পাইয়া মৃজাকান্দুগ্রামে উপনীত হন। লবণপ্রস্তুতকারীদিগকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করাতে তাহারা হেমবাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে আক্রমণ করে। তখন গুলি চালাইবার হুকুম দেওয়া হয়, ৩জন খুন হইয়াছে, নিমক বিভাগের অনেক লোক গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যশোহর কনফারেন্সে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছিল যে লবণকর বৃদ্ধি করা হইয়াছে সেই হেতুতে আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়া লবণ প্রস্তুত আইনের বিধি অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ঐ নির্দ্ধারণের ফলেই মৃজাকুলের লোকেরা আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিতেছেন তাঁহারা বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ রাখেন না। অগ্নির উত্তাপে লোনা জল শুষ্ক করিয়া লবণ হয়, বাকরগঞ্জের সমুদ্রতীরের অধিবাসীরা সহজেই তাহাতে প্রলুব্ধ হয়। এখন ব্যাপার বুঝুন।

মরণ আড়াল।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কি করিয়া বুঝাইব বল, আমার সে সময়ের মনের অবস্থা! মানুষ বাঁচিতে চায় ভবিষ্যতের সুখের আশায়, অতীত জীবনের স্মৃতি যদি হয় তাহার সুখের। আমার জীবনে সুখ বলিবার আর কি ছিল! অতীত,—সে ত অতি ভয়ানক। ভবিষ্যত,—সে আরও ভীষণ! পাপ রাজচন্দ্র যখন আমার সন্ধান পাইয়াছে, ভবিষ্যত আমার আর কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। ইহা আমার ভীতি, বুদ্ধিভ্রষ্ট মস্তিষ্কের কল্পনা নহে,—অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা,—পরীক্ষিত সত্য। ওগো, যদিও আমি অতি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন, তবুও আমি, তোমাদের দশের মতই সংসারে সুখী ছিলাম; নিকট আত্মীয় না থাকিলেও সুহৃদয় বন্ধুর আমার অভাব ছিল না। পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না সত্য, কিন্তু পিতার সময়ের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী

নরহরি দা পিতৃস্থানীয় ছিলেন; মাতা ছিলেন না,—নিভার মাতাই ছিলেন আমার মাতার অধিক, তাঁহার স্নেহ আদরে কোন দিনই বুঝিতে পারি নাই আমি মাতৃহীন! নিভা আমার ছিল যে কি তাহা, আজ, এতদিন পরেও বুঝাইতে পারিব না। সহৃদয়া সহোদরা ভগিনী বল, সখী বল, সখা বল, সর্ব্বদার সঙ্গিনী বল,—সবই ছিল সে আমার! আনন্দ—আনন্দ হাসি-খেলা-সুখে লুটোপুটি! দুটিতে একমনে, একপ্রাণে মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটানই ছিল সে সময়ের কাজ। আমার সকল কার্য্যেই ছিল নিভা,—নিভার সকল কার্য্যেই ছিলাম আমি। সে পড়িত, আমি পড়া বলিয়া দিতাম; আমি পড়িতাম, তাহাতে তাহার ছিল কত উৎসাহ; পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পুরস্কার পাইয়াছি আমি, আমা' অপেক্ষা তাহাতে আনন্দ পাইত সে অনেক বেশী! বড় ভাল লাগিত তাহাকে আমায়; সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েটি,—কেমন বুদ্ধি, কোন বিষয় বুঝাইলে কত সহজে সে সেটাকে ধরিতে পারিত—তাহাকে পড়াইতে, বুঝাইতে কত আনন্দ! পরিশ্রমীও সে কম ছিল না, বাড়ীর কাজ কর্ম্মে কখনও তাহার আলস্য দেখি নাই। কেমন সহজ সরলভাবে অবলীলাক্রমে ঘড়ির কাঁটার মত সে সংসারের কাজ যথাসময়ে করিয়া যাইত, অথচ আমোদ আহ্লাদের শেষ ছিল না। নিভার নাম স্মরণে আসিবা মাত্র আমার প্রাণ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে,—আমি যে তার গুণের অন্ত পাই না গো!

অদৃষ্টের কি পরিহাস! অবশেষে সেই নিভাই কিনা হইয়াছিল আমার সকল যন্ত্রণার নিমিত্ত! তাহাকে,—সংসারের আমার প্রিয়তম বস্তুকে,—সেই পবিত্র নির্ম্মল স্নেহময়ীকে উপলক্ষ্য করিয়াই দুরন্ত শনি আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল,—আমার কাল হইয়াছিল,—নিভার প্রতি আমার অগাধ অনুরাগ, প্রেম—স্নেহ—না ভালবাসা—কি যে সে আকর্ষণ,—কি নামে বুঝাইব—তাহাই আমার জীবন পথের অন্তরায়। পাপ রাজচন্দ্র যখন লালসার তাড়নায় নিভার জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল আমি কি তখন নীরব থাকিতে পারি? সংসারের আর শত অত্যাচার সহ্য হইত কিন্তু নিভার প্রতি অবিচার যে আমার ছিল অসহ্য,—আমি প্রাণ পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম রাজচন্দ্রের বিরুদ্ধে! আশা ছিল সৎকার্য্যে ভগবান সহায়—ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছিল ভগবান ক্রুর সংসার, বক্র সমাজের অনেক দূরে,—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর বন্ধু হইতে পারেন তিনি—সংসারে তাঁহার

বিচার আদালতেরই মত—সমস্তই সাজান-সাক্ষীর মারফতে—তাহাও এত বিলম্বিত, হাজতের প্রভাত পরিস্কার হইতেই জীবন আলোক নির্ব্বাপিত হয় প্রায়! আস্তিক নাস্তিকের বাদ-প্রতিবাদ আলোচনায় কখনই আগ্রহ প্রকাশ করি নাই; শক্তিও নাই, তর্কে ভক্তিও নাই,—জীবনে যাহা সহিতে হইতেছে, তাহার পরিণাম যদি জীবনপাতই হয়—তবে আর আমার সৎ থাকিবার ইচ্ছায় ফল কি! আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াও কি বলিতে দোষ—এই যে এত অত্যাচারেও আজীবন যেটীকে সু বলিয়া জানিয়াছি তাহাই অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাহার পুরস্কার কি এই! বলিবে হয় ত বিবেচনার অভাবে জীবন-গতিতে কোথায় কোন ভুল করিয়াছ,—অজ্ঞাত অপরাধ, তাহারই এই ফল! সেই জন্য এই অনন্ত কষ্ট—অসহ্য যন্ত্রণা! দয়াময় তবে কিসে তুমি ভগবান? তোমা হইতে বড় বলিয়া মানি আমার জীবন, তাকেই ব্যর্থ করিয়া দেয় যে, তাহাকে কি আখ্যা দেব? থাক্,—যে দেশে শক্তি হইতে ভক্তির স্তুতি বেশী,—ভক্তি হইতে ভয়েরই যেখানে প্রাবল্য—দৈত্যদানার ভয়ে শিবানীর পূজা, সে দেশে থাক, আর ওকথা তুলিয়া কাজ নাই! একটি নয়, দুটি নয়, দশ দশটা বৎসর নরক যন্ত্রণা দিয়াও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হইল না? আরও আছে তাড়নার আবশ্যক,—জীবনটাকে নূতন করিয়া যেই ধরিতে যাইতেছি অমনি আনিয়া জুটাইলে সেই পাপ রাজচন্দ্র! ইহাতে কি করিতে ইচ্ছা হয় বল? প্রাণ কি করিতে চায়? মনে হয় না কি এ জগতটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলি ধূলি করিয়া একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেই—দূর হয়ে থাক সকল ভাল মন্দ—মরিয়া নিজেও মরি,—পড়িয়া পড়িয়া মার খাইয়া তোমাদের ও ভালমানুষিবীর সাধটা, মৌখিক নীতিবাদের প্রচার, প্রসারটা বেশ করিয়া মিটাইয়া দেই—তবে না মিটে গায়ের জ্বালা! কি করিয়া আজ আমি এ অবস্থায় হইতে পারি তোমাদের নীতিবোধের সুবোধ ছাত্র, অহিংসার অবতার—মন হইতে দূর করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব---কি অত্যাচার অবিচারটাই গিয়াছে এ জীবনটার উপর দিয়া! খুটিনাটী করিয়া সে সকল দফায় দফায় স্মরণ হয় না সত্য,—স্মরণ হইলেও মন আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে কিন্তু—কিন্তু সেই অত্যাচার,—নির্দ্দোষের প্রতি অযথা পীড়ন—এ বক্ষে যে একটা গভীর কালিমা রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, তাহা কি কোন কালে অপসারিত হইবার? আমি কি করিয়া সে সকল বিস্মৃত হইব—আজ যে নূতন হইয়া মনে পড়িতেছে সমস্তই! কি অত্যাচারটাই না করিয়াছে রাজচন্দ্র, তার স্ত্রীর

উপর আর বিধবা কন্যার উপর—সংসারটা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়াও তাহার পাপ-স্পৃহার পরিতৃপ্তি হইল না! সহ্য করে যে কতদূর সে সহিতে পারে—তার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাই বুঝি লক্ষ্য এ সমাজের,—সাধ্বী রমণী অযত্নে অচিকিৎসায় অকালে প্রাণ দিলেন যক্ষ্মায়। প্রতিবাসী সব আমরা,—রাজচন্দ্রের স্ত্রীর অবস্থা শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গেলাম—তাঁহাকে দেখিতে, শুশ্রূষা করিবার আশায়,—ভদ্রপরিবারের কড়া নিয়মে নিজের ব্যবহার ঢাকিবার জন্যই বুঝি—সেবার অধিকার দেওয়া ত হইলই না বরং মন্তব্য হইল 'যত সব কলেজের বয়াটে ছেলে আড়ম্বরের একটা সুবিধে পেলে হয়—সে দিনকার একরত্তি ছেলে সে কিনা আসে আমায় ভালমন্দ শিখাতে!' অবাক! সকলের প্রাণ সকলের বুঝিবার ক্ষমতা নাই,—তুচ্ছ হইতে পারি তাচ্ছিল্য লাভের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না একবারেরই—স্পষ্টই মুখের উপর শুনিয়াদিলাম; সেই আমার শনি সঞ্চারের আদি পর্ব্ব! উদ্ধত যুবক আমরা,—তখন থোরাই কেয়ার করিতাম, রাজচন্দ্রের ও বাস্তুঘুঘুর আস্ফালনকে। সেইখানেই হয়ত তার শেষও হইয়া যাইত কিন্তু যখন শুনিলাম স্ত্রী বিয়োগের পর একটা মাস অতীত না হইতেই, রাজচন্দ্র আবার তাহার শূন্য গৃহ নিভার দ্বারা পূর্ণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তখন রাগে ঘৃণায় পিত্তটা জ্বলিয়া গেল। কি ধৃষ্টতা! নিভাকে বিবাহ করিবে ঐ দুর্বৃত্ত,—পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ! এখনও ওর বিবাহের সাধ! সে সাধ ওর আমাকে বিধিমতে মিটাতে হবে! অস্থির হইয়া নিভার মাতার নিকট চলিলাম,—কোন প্রাণে, কন্যার জননী হইয়া তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন! রাজচন্দ্রের সহিত বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা স্বহস্তে তাহাকে বিষ দেওয়াও যে সুখের! প্রতিবাসী হইয়াও জানেন না কি তিনি, কি অত্যাচারে রাজচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে?—হত্যা নিশ্চয়ই হত্যা—অত যন্ত্রণা দিয়া তিলে তিলে একজনের জীবনের সমস্ত আশা আনন্দকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া মরণের মুখে ঠেলিয়া দেওয়াকে হত্যা বলিব না ত কি বলিব? আর সেই হত্যাকারী হইবে নিভার স্বামী! অসহ্য! আজ মনে পড়ে না সমস্ত কথা—মনে পড়ে শুধু সেই সময়ের আমার মনের প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা-বাতের তুমুল গর্জ্জন,—অধীর অস্থির তখন আমি,—ডাল ভাঙ্গে কি মূল ছিঁড়ে সে চিন্তার অবসর তখন ছিল না—কেবল উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে—প্রবল বাত্যায় হৃদয় মন দেহ আন্দোলিত হইতেছিল—আমি অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া ঝড়ের মত উপস্থিত হইয়াছিলাম নিভাদের গৃহ দ্বারে! নিভার মাতা ও

রাজচন্দ্রে কি কথাবার্ত্তা চলিতেছিল—বোধহয় রাজচন্দ্র তাহার প্রচুর অর্থের মোহে মাতৃহৃদয় জয় করিতে সগাস্যে বাক্যজাল বিস্তার করিয়াছিল! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল,—শুধু অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলাম না, বাহ্যিক ব্যবহারেও সংযত হইতে পারিলাম না,—রাজচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—'মুমূর্ষ' রোগীর শুশ্রূষার জন্য যার বাড়ীতে লোকে প্রবেশ অধিকার পায় না সে কোন্ নীতি বলে পরের গৃহে প্রবেশ করে!" রাজচন্দ্র রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল—"আমায় জিজ্ঞেস করবার আগে তোমার নিজের এখানে আসবার কি অধিকার ভেবে দেখ না কেন? তোমার এ রকম স্বভাবে এঁদের যথেষ্ট উপকার করেছ! পরের শুশ্রূষা করে বেড়ান হয় বদমাস কোথাকার! এ বাড়ীতে আর ও বুজরুকী খাট্‌ছে না!"

আমার স্বভাবের উপর কটাক্ষ! বুদ্ধি হারাইলাম,—চিরকালের গোঁয়ার আমি—বাক্য ব্যয় না করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে এক হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে রাজচন্দ্রের বাম হস্ত ধরিয়া ফেলিলাম, দক্ষিণ হস্তে তাহার গরদান পাকড়াইয়া একদম দাঁড়করাইয়া দাওয়া হইতে নামাইয়া দিলাম, বলিলাম "এখন সোজা পথ দেখ—বদমাস এক স্ত্রীকে হত্যা করে সুখ হয় নি!"

নিভার মা "কি করিস্, কি করিস্—মেরে ফেল্লি যে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করিবার প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমার ন্যায় বলিষ্ঠ যুবকের সহিত অর্দ্ধ-বৃদ্ধের সাক্ষাৎ-দ্বন্দযুদ্ধের কি পরিণাম, ক্রূর বুদ্ধি রাজচন্দ্র বোধহয় বেশ বুঝিত,—সে দিরুক্তি না করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। পলায়নপর কাপুরুষের অন্তর্ধ্যানে আমার ক্রোধ ধ্বংস করিতে চাহিল নিভার মাতাকে। আত্মসম্বরণ করিলাম—তিনি যে মাতা! বলিলাম "মাসীমা, কি করে বলুন ত ঐ পিশাচটার হাতে মেয়ে দিতে চান—জানেন না কি ওর স্বভাব?"

মাতা একটু দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিলেন—"কি করতে আর বলিস বাপু; ঘরে যার যোল বছরের মেয়ে তার আবার কি ভাল মন্দ ভাববার উপায় আছে? যেখানে যাই সেখানেই চাই টাকা, হাজারের কম কোন দরিদ্রের মেয়ে নিতে চায় না,—গরীব বিধবা আমি,—খাওয়া পরার উপায় নাই—তোর গুণে কোন মতে দিন কাটাচ্ছি—টাকা দিয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে পারি আমি? রাজচন্দ্র বিনা টাকায় মেয়ে নিতে চাচ্ছে—মানুষ ও যেমন হ'ক—হাতে টাকা যে

আছে যথেষ্ট, সকলেই জানে—ওর সঙ্গে হলে নিভার মোটা ভাত কাপড়ের কষ্ট হবে না—এর চাইতে আমার মত দরিদ্র আর কি ভাল আশা করতে পারে!"

হায়, মোটা ভাত কাপড়! ইহার সংস্থানের জন্যই বাঙ্গলার কন্যার বিবাহ,—প্রেমহীন পরিণয়—মেয়ে মূল্যহীন,—মাতা হিতাহিত জ্ঞানহীন পাষাণ! উত্তর নাই আমার। সমাজের এই ব্যবস্থা—শির নত করিয়া গ্রহণ করিতে সকলেই বাধ্য। হৃদপিণ্ড তাহাতে শতছিন্ন হইয়া ছিন্নমস্তার মত আত্মরক্তে স্নাত হক সেও শ্রেয়, তথাপি সমাজের মান্য রাখিতে হইবে অক্ষুণ্ণ! যে সমাজে এমন বৃদ্ধের সহিত মাতা নিজে কন্যার বিবাহ দানে উদ্যত,—সমাজের বিবাহ-ব্রত রক্ষা করিয়া মান রক্ষায় শোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে চান, সেখানে মনুষ্যত্বের অধিকার,—প্রাণধর্ম্মের বিচারের স্থান বহু পশ্চাতে! স্বহস্তে পিশাচের পদে কন্যাকে বলি দেওয়া ব্যতীত সেখানে কি আর আশা করা যায়? সে সমাজের আবার জীবন লইয়া কথা!

মাতার বাক্য শ্রবণে একেবারে দমিয়া গিয়াছিলাম,—তাঁহার উক্তি আমার উদ্যত ফণাকে প্রবল পদাঘাতে ধরালুণ্ঠিত, নিষ্পেষিত করিয়া দিল। সমাজের কি কদাচার অথচ অপ্রতিহত কুচিত্র আমার মানস পটে উদিত হইয়া জীবনটাকে দুর্ব্বহ ঘৃণ্য রূপে প্রতিভাত করিল! সমাজ রাক্ষসীর বেদীর সমক্ষে যুপবদ্ধ নিভা,—কি অসহায় তাহার মাতা,—ভক্তিতে না ত্রাসে কন্যা বলি দিতে প্রস্তুত—স্নেহময়ী হইয়া আজ পাষাণীর প্রসাদ লাভেচ্ছায় পাষাণী! বুঝাইব কাহাকে? কে মাতা? কন্যা কে?: আমি কে? বাক্য সরিল না,—প্রস্থানোন্মুখ হইলাম,—মনে কেবল বাজিতেছিল নিভার মাতার বাক্য কয়টি,---অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তাহা আমার পাষাণ হৃদয়ে,—আজও তা ভুলিতে পারি নাই,—বহু কথা স্মৃতিতে সমাধিলাভ করিয়াছে কিন্তু আজও সেই মহা কষ্টের মহাদাম মাতৃবক্ষের তপ্ত রক্তে লিখিত অক্ষর অবিকৃত জ্বলন্ত আছে এ হৃদয়ে!

নিভা ছিল পাশেই কোথাও;—সে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে রোজকারই মত সহজভাবে বলিল—"বিনোদদা তুমি অত উতলা হয়েছ কেন! মিছে কেন ভাব্‌ছ দাদা, সকলি ভগবানের হাত—মার যেখানে মত হয়েছে সেখানে আর বাধা হয়ো না,—উনি একটু নিশ্চিন্ত হ'ন!"

অবাক্! মেয়েটা বলে কি! আপনার ভালমন্দ শুভাশুভ চিন্তা করিয়া দেখিবার শক্তিটুকুও কি উহার নাই? বঙ্গের স্ত্রীজাতীর এমনি অধঃপতন ঘটিয়াছে!

অন্যদিন হইলে নিভার কথার উত্তর দিতাম-- সেদিন কোন কথা মনে আসিল না—কেবল মনে হইতেছিল—ইহাদের অতল তলে ডুবিয়া যাইবারই অবস্থা—যাক, তাই ডুবিয়া যাক্—শক্তি নাই কাহারো ইহাদিগকে রক্ষা করিবার—পুরুষ স্ত্রী, কন্যা সকলেই যেখানে তুরপনেয় সমাজ-কলঙ্ককে গৌরব-চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে ব্যগ্র, সেখানে আর মঙ্গল কোথা? মরণই সেখানে মঙ্গল—এ পাপ অভিনয়ের পরিসমাপ্তি!

নিভার হস্ত সরাইয়া দিয়া পাগলের মত গৃহে কিরিলাম। নরহরিদার চক্ষু প্রতারিত হইবার নয়,—সে আমার চেহারা দেখিয়া প্রশ্ন করিল্ "কি,—চেহারা এমন লাগ্‌ছে যে অসুখ বিসুখ হয়নি ত?"

বলিলাম "অসুখ ত সকলেরই—শুনেছ না নিভার সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিয়ে।"

নরহরিদা বলিল "না দিয়ে আর করে কি বল—নিভার মার যে অবস্থা!"

আবার সেই কথা! সকলেরই এক সুর। বলিলাম "বল কি নরহরিদা—তাই বলে কি অমন পিশাচ বুড়োটার হাতে মেয়ে দিতে হবে? কি করে ওর স্ত্রীর প্রাণটা গেছে তুমিও এরই মধ্যে ভুলে গেলে নরহরিদা!"

নরহরিদা উদাসভাবে বলিল "কিছুই ভুলিনি ভাই! মনে রেখেও বা ফল কি? সবই অদৃষ্ট!"

"অদৃষ্ট! রাখ তোমার অদৃষ্ট—আমি দেখব তোমার অদৃষ্টই কেমন! এ বিয়ে কিছুতেই আমি হতে দেব না!"

নরহরিদা সেবারে হাসিয়া কেলিল, বলিল—"বেশ ত ভাই, বিয়েটা তুমিই কর না!"

বুড়ার উপর রাগও হইল, হাসিও পাইল—বুড়টা অবশেষে ভাবিল কিনা, নিভাকে হাত করিবার জন্যই আমার এত! সে ইচ্ছাই যদি আমার অন্তরে থাকিত,—নিভার লাভ আমার পক্ষে এমন কি কঠিন ছিল! যে অর্থে রাজচন্দ্র মাতার মনকে বশ করিয়াছে, আমারও সে অর্থের অভাব নাই,—বয়সে, দৈহিক সৌন্দর্য্যে ও বিদ্যায় আমি রাজচন্দ্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন? রাজচন্দ্র যে ক্ষেত্রে যোগ্য বর রূপে বিবেচিত, আমি তথায় অবশ্য প্রার্থনীয়, কিন্তু

নিভাকে আমি কোন প্রাণে করিব গৃহিণী,--আমার হৃদি গঙ্গার পূর্ণ প্রবাহে পাহাড়ের প্রাকার অবরোধের সৃষ্টি করিব! বাঙ্গলার স্বামী স্ত্রী দুটিতে বড় মিল মিশ—একটা সংসারে দুইটী কর্ত্তাকর্ত্রী তাহারা এক সন্তানের মাতাপিতা—স্নেহের বাঁধনে উভয়ে বাঁধা, বেশ শান্তির, শৃঙ্খলার, স্নিগ্ধ সুন্দর শান্ত চিত্র,—বাঁধা পথে চলিতে বেশ,—বড় আয়াসের, অনায়াসের চলা ফেরা বেশ সুবিধা কিন্তু জীবনের অভাব কোথায় তাহাতে?—পূর্ণতোয়া প্রেম প্রবাহিণীর উদ্দাম গতি কোথায় তাহাতে—উচ্ছলিত তরঙ্গ ভঙ্গের কল্লোল, উত্তরোল, ভাঙ্গন, গঠন—ক্রিয়ার চাঞ্চল্য বঙ্গদম্পতির জীবনে কোথায়? সে স্ত্রী—আমি পতি,—সম্বন্ধের বন্ধনে আমি তাহার প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনে বাধা, সেও আমার অনুগমনে বাধ্য—বাধ্যবাধকতার সীমায় জীবনের লীলা, প্রেমের পরীক্ষা! তুচ্ছ,—তুচ্ছ,—প্রেমের অতি তুচ্ছ আদর্শ! তাহাতে আমার মন ভরিবে না—সে কেন হইতে যাইবে নিয়মের বাঁধনে আমার বাধা,—গতানুগতিক সংসারের আদর্শে আমি তুষিব তাহাকে? তাহার নাম তার প্রতি আমার আকর্ষণ? অতি দীন ছবি হইবে যে সেটা আমার হৃদয়ের! নিভার জন্য আমার এ প্রাণ-ছেঁড়া আকর্ষণ,—তাহাকে সুখী করিবার জন্য অগাধ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত তুলিবার সাধ,—পৃথবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পদামে তাহাকে দেবীর সাজে সজ্জিত করিবার কল্পনা আমার, তাহা হইলে বৃথা হইয়া যাইবে—দুইটী দাম্পত্য জীবন একটা পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ হইয়া চিররুদ্ধ সীমাবদ্ধ পল্বলের মত কোন দুরন্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রতাপে শুষ্ক হইবার ভয়ে বিক্ষোভিত বক্ষে কাল কটাইবে। না তাহা আমি পারিব না—আমি কল্পনা করিতে পারি নাই কখন নিভাতে আমাতে বিবাহ—নিভা যে আমার প্রভাতের স্বাধীন হিল্লোল—তাহার অবরোধ আমার দ্বারা অসম্ভব! 'কেন অসম্ভব? অবরোধ আমি না করি—এ অবরোধের দেশে অন্যে যে তাহার অবরোধ ঘটাইবে নিশ্চয়—তবে বঞ্চিত হইয়া আমার লাভ,—নিভারইবা তাহাতে স্বার্থকতা কি? বরং অন্যের হস্তে পড়িলে তার অধীনতা—আবিল্য অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা!' মনের এ যুক্তি হৃদয় গ্রহণ করিতে রাজী নয়,—অন্যে অন্যায় করে করুক, বঞ্চিত হইব কেন? আর বঞ্চিত হইই যদি বঞ্চনা করিব কেন? সংসারের হিসাবেও সে যাহাতে সুখী হয় সেই আমার কাম্য!

বৃদ্ধকে আমার মনের ভাব বুঝাইবার নয়—তাহ'তে তাহার সংস্কারবদ্ধ মনে কেবল সংশয় জন্মাইবে বৈত নয়। বলিলাম "নরহরিদা এও তোমার ঐ সেই অদৃষ্ট! এ অদৃষ্টে বিবাহ লেখা নেই! ওটায় আমার মন উঠে না—যে কুলীন বংশে বৃদ্ধ বয়সেও দশটা পাণিগ্রহণ করার রীতি, সে বংশে জন্মেও আমার একটায়ও অরুচি, বংশের কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!"

সে দিনের অবস্থার কথা স্মরণে আসিলে আজও সুখদুঃখে হাসি পায়। নরহরিদা কিছুতেই বুঝিতে চাহিতেছিল না—বিবাহে আমার কেন আপত্তি,—যেখানে আমি নিভাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়, সুখের সংসার পত্তন হয়, সেখানেও আমি তাতে বিমুখ কেন!

যা'ক সে কথা, তখন চেষ্টাই হইল আমার রাজচন্দ্রের হস্ত হইতে নিভাকে রক্ষা করা—তাহার মানে তাহাকে অন্যত্র সৎপাত্রে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা। সেই চেষ্টাই করিয়া ছিলাম. অনেক কথা কাটাকাটির পর আমারই সতীর্থ,—সেও সেবারে বি-এ, দিয়াছিল—পরেশকে নিভার বর মনোনীত করিলাম। পরেশ, নরহরিদার দূরসম্পর্কীয় এক ভাগিনেয়ের পুত্র, পরেশ মেধাবী, পরিশ্রমী—কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থা অতি সাধারণ—মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থানই তাহার উপযুক্ত চাকুরী না মিলিলে অচল! তাহার ব্যবস্থা করিলাম—আমার অত অর্থের প্রয়োজন? আমার অর্দ্ধসম্পত্তির মালিক পরেশের ভাবি অর্দ্ধাঙ্গিনী নিভাননীকে করিবার কৃতসঙ্কল্প হইয়া—পরেশের সহিত নিভার বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। কোন পক্ষে অমত হইবার কথা নয়—কেবল নরহরিদা খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল!

সমস্ত ঠিক্—কনেকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য পরেশের পিতা পরেশ সহ একদিন উপস্থিত হইলেন। নিভা কি অপচ্ছন্দের পাত্রী!—উভয় পক্ষেই মহা খুসী! ঠিক সেই সময়েই গগনের কোণে কাল মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল কে জানিত! সেই রাত্রে পরেশ ও তাহার পিতা এই অধমের আলয়ে অতিথি! গল্পগুজোবে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, রাত দুপুরের অনেক পরে শয়ন করিয়াছি, সহসা বিষম চীৎকারে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বনাশ!—খুন—খুন—পরেশকে কে খুন করিয়াছে! এঁ্যা—এ কি হইল!—আমি এ কি করিলাম!—কেন ওর অপমৃত্যু ঘটাইতে এখানে আনয়ন করিয়াছিলাম! উহার পরিবর্ত্তে আমাকে খুন করিল না কেন! এ পরিতাপ রাখিব কোথায়?

নরহরিদা আমার কক্ষে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ও ওসব বলে কি?—ছেলেটার এখনও প্রাণ আছে—গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে বলে কিনা—বিনোদ আমার প্রাণ নিল। যে হত্যাকারী আমার বক্ষে ছোরা মারিয়াছে সে দম্ভ করিয়া বলিয়া গেল 'নিভাকে এখন মনের সুখে বিবাহ কর!—বিনোদকে বঞ্চিত করে বিয়ে কর্‌বি নিভাকে!"

এ কি কথা! মুমূর্ষের কক্ষে তদ্দণ্ডেই উপস্থিত হইলাম। তখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! তাহার পিতা আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"রাক্ষস্, মনে যদি এই ছিল—তবে কেন…… "

আমি তাহার সে হৃদিবিদারক ধ্বনি সহ্য করিতে পারিলাম না, নিজ কক্ষে পলাইয়া আসিলাম—সেই হইল আমার কাল!

নরহত্যার অপরাধে আমি হইলাম অভিযুক্ত!—সে ভোগের কাহিনী স্মরণে আর আবশ্যক! আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগের ত্রুটী একটুকুও দেখিলাম না—কোথা হইতে অজস্র সাক্ষী দেখা দিতে লাগিল—সকলেই সত্য পাঠান্তে নিগূঢ় সত্য তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আদালতকে সত্য সন্ধানে সাহায্য করিল। বৃদ্ধ নরহরিদার অশ্রু আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। জামিনে খালাস হওয়া অপেক্ষা হাজতই আমার সে অবস্থায় ছিল শ্লাঘ্য—নীরবে সমস্তই সহ্য করিতাম। সংসারের, সমাজের, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারের নিত্য নূতন পরিচয় পাইয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কাহারও কিছু প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, 'আমি হত্যা করি নাই,'—ব্যতীত অন্য কাহারও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমার ঘৃণা বোধ হইত। এ জঘন্য পাপ নরকে বাস করা অপেক্ষা ফাঁসীও আমার মনে হইতেছিল কাম্য। ফাঁসী হইল না—আমার জেল হইল নয় বৎসরের! সেই দিন আদালতে রাজচন্দ্রকে দেখিলাম—ঈর্ষা পরিতৃপ্তির বিকট লাস্যে তাহার ললাট রেখাঙ্কিত,—নয়নে কুটিল হাস্য—লোলুপ রাক্ষসের ন্যায় আমার দিকে চাহিতেছিল। তাহার নয়নে নয়ন পড়িতেই,—আমার মনে আর সন্দেহ রহিল না—আমার এ সকলের মূলে ঐ পিশাচ! দ্বিতীয়বার আর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ক্রন্দনরত নরহরিদাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম "বৃথা আর চোখের জল ফেল্‌ছ কেন নরহরিদা? তুমি না বলেছিলে সবই অদৃষ্ট! আমার এ অদৃষ্ট! নৈলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়েও খুনী বলে জেলে যাব কেন! কেঁদনা দাদা, কাঁদলে কাজ হবে না—তোমায়

অনেক এখন একাই করতে হবে—নিভা রইল, তুমি রইলে—নিভাকে রাজচন্দ্রের হাত হতে রক্ষা করতে পারবে কি না জানি না—আমি নিশ্চয় জেনেছি রাজচন্দ্রই আমার এ দশার মূলে—যা হয় হবে—নিভা যেন অভাবে কষ্ট না পায়, তোমার নিজের জন্যে খরচ করতে কার্পণ্য করোনা নরহরিদা। বেঁচে থাকি যদি, বেঁচে থাক যদি—এ দিন এমন থাকবে না—আমি এখনও বিশ্বাস করি—এ শুধু শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয় নরহরিদা—এ পরীক্ষা—আমি যদি মনে প্রাণে নির্দ্দোষ—নিরপরাধী হই—পরিণামে আমার জয় হবে নিশ্চয় !"

প্রহরী আর অপেক্ষা করিতে দিল না? বৃদ্ধের চক্ষের জল উপেক্ষা করিয়া জেলে চলিলাম!—বলিয়াছি সে কি স্থান—কি ভীষণ জীবন্ত নরক সে জেল,—সে জেলও আমার তখন স্বর্গ বলিয়া মনে হইয়াছিল,—পুণ্যের আবরণে সেখানে এমন ঘোর পাপ বিরাজিত নয়—সেখানে সমস্ত একাকার—জাত মান—যাহার সমস্তই গিয়াছে—তাহার পক্ষে জগতের সহিত সম্পর্কহীন, জাতকুল নাশা জেলের জীবনে কিসের বিতৃষ্ণা !

সমাজে, মানুষে বিশ্বাস হারাইয়া—ঘৃণায় দুঃখ ক্ষোভে মনের তখনকার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—তাহার বলেই সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম জেলকে! হেয়তম জীবনই হইয়াছিল সে সময় আমার বরণীয় কিন্তু কেন আবার অগ্নিকাণ্ডের সহিত আমার জীবনে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল,—জীবন নদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অস্থির হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিলাম—ফল তাহার হইল কি! আশা কোথা? কি শুনিলাম, এই সন্ধার অন্ধকারে,—রাজচন্দ্র আজও জীবিত! আজও সে আমার রন্ধ্রগত শনি! আমার পশ্চাতে আজও লাগিয়া আছে, আমার সর্ব্ব দুঃখের মূল—সেই পিশাচ দুর্দ্দান্ত শত্রু রাজচন্দ্র!

শ্রী—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩৩০ সাল। { ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বর্ষ-বোধন।

—:-※-:—

এল রে বর্ষ এল
বোশেখী ঝঞ্ঝাবায়ে,
দোলায়ে শুক্‌নো শাখা
ফাগুনের কুঞ্জছায়ে!
চোখে তা'র চপল হাসি,
হাতে তা'র খেলার বাঁশী,
গমনে চমকে জাগে
নাচনের ছন্দ পায়ে!

ওরে কোন্ কিশোর এল
জননীর বক্ষহারা ?
এল কে তরুণ টুটি'
জড়িমার অন্ধকারা ?
বিজয়ার বিজন সাঁঝে
বোধনের শঙ্খ বাজে !
চলে ওই মরণ ছাপি'
জীবনের মুক্তধারা !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

জাহান্দার, লাল্কুমারী।

জাহান্দার। ইম্‌তিয়াজ, কুহকিনী, তুমি আমার এ কী করেছ? আমার চোখের কোণে কী স্বপ্নের অঞ্জন তুমি পরিয়ে দিয়েছ? আকাশে, বাতাসে কে যেন রক্তফাগের রাশ ছড়িয়ে দিয়েছে—কত লক্ষ কামনার আকুল শ্বাস ফুলের গন্ধটুকু অধরে নিয়ে মিলনের রাত্রির অনুরাগের রক্তে রাঙা করে তুলেছে। এ কোন কুহক মন্ত্রে ঘুমন্ত পুরীর অসাড় প্রাণ আজ

হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল—রুদ্ধ সৌন্দর্য্য নির্ঝরের কারা স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে জগতের মাঝে আপনাকে সে এমন ভাবে বিলিয়ে দিল? বল ইম্‌তিয়াজ, একি আমার চোখের ভুল?

লাল্কুমারী। শাহজাদা, এ ভুল নয় চির সত্য। এ যদি ভুল হয় সমস্ত জীবনটাই একটা ভুলের খেলা—কাল নিশিথের মিলন স্পর্শে আমার এ দেহবীণার প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার উঠেছিল, তার শেষ রেশটুকু যে এখনও কেঁপে কেঁপে আমার পা' হতে মাথা পর্য্যন্ত অসহ্য পুলকের স্পন্দন তুল্‌ছে—এ কি ভুল হতে পারে?

জাহান্দার। তাইত, কাকে ভুল বল্‌ছি—তবে তোমায়ও ভুল বল্‌তে হয় ইম্‌তিয়াজ তবে ঐ আকাশের নীলিমাটুকুও একটা মোহ, তবে বসন্তের মদির সৌন্দর্য্য একটা স্বপ্ন, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা, কামনা একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা।

লাল্কুমারী। সাহজাদা, তুমি না আমায় কিন্‌তে চেয়েছিলে?

জাহান্দার। হাঁ, তোমার ও-রূপের একটা মূল্য আমি দিতে চেয়েছিলাম।

লাল্কুমারী। কেন শাহজাদা?

জাহান্দার। কেন? আজ ওকথা শুন্‌লে তোমার লজ্জার অবধি থাক্‌বে না ইম্‌তিয়াজ। বসন্তে লতায় পুষ্পাগমের মত যৌবন যেদিন হতে তার রূপের সম্ভারে তোমার ঐ দেহটাকে সাজিয়ে তুলেছিল সেদিন হতে আজ অবধি, মনে করে দেখ কতজন তোমার ঐ রূপ দেখে ভুলেছে—সবাই তোমাকে কিছু না কিছু অর্থ দিয়ে গেছে, তাই আমিও তোমায় সব চাইতে বহুমূল্য জিনিষ দিতে চেয়েছিলাম।

লাল্কুমারী। হাঁ, ঠিক্ বলেছ শাহজাদা—এ দুনিয়ার সঙ্গে আমার শুধু বেচা কেনায় সম্বন্ধ। আমার এ রূপের দর কত হতে পারে সে যাচাই আজ আমায় কর্ত্তে হবে শাহজাদা, শুনলুম তুমি নাকি দিল্লীর সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছ?

জাহান্দার। হাঁ।

লাল্কুমারী। কেন ত্যাগ কর্লে?

জাহান্দার। পিতার কাছে শপথ করেছি।

লাল্‌কুমারী। শপথ করেছ? অন্যায় করেছ। যে সিংহাসন তুমি মিথ্যা শপথে ত্যাগ করেছ, আজ আমি বল্‌ছি আমার এ রূপের মূল্য সেই সিংহাসন।

জাহান্দার। ইম্‌তিয়াজ, আজ তুমি একী বল্‌ছ?

লাল্‌কুমারী। আমি নির্ম্মম শাহজাদা—প্রেম জানিনা ভালবাসা জানিনা। বাইজী আমি চিরকাল এ রূপের হাটে ব্যবসা ফেঁদে বসেছি। আজ আমায় দেখ্‌তে হবে এ রূপের মূল্য কত! ঐ যে যমুনা পারে যে সুন্দরীর স্মৃতিটাকে চিরন্তন কর্ব্বার জন্য মর্ম্মর গঠিত তাজমহল নির্ম্মিত হয়েছে তাঁর রূপের সঙ্গে আমার রূপটার পাল্লা চলে কি না আজ আমায় দেখ্‌তে হবে। আমার রূপের মূল্য ঐ ময়ূর সিংহাসন। দিতে পার্ব্বে?

জাহান্দার। নারি! একী তামাসা!........খেলিয়ে নেবার অসীম শক্তি নিয়ে তোমরা জগতে এসেছ তাই নিষ্ঠুর ভাবে সকলকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ......এক নিমেষে আমার এই আলোর জগৎটাকে একেবারে কালি মাখিয়ে কালো করে দিলে? আমার সুখ-স্বপ্নের হাওয়ায় ওড়া রঙীন বসনখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিলে—ইম্‌তিয়াজ্‌ সত্যিই কি প্রেম নেই?—না এ তোমার অভিমান।

লালকুমারী। এ আমার অভিমান নয়। অভিমান করা আর যাদের সাজে সাজুক, আমাদের সাজে না—তুমি আমায় কিন্‌তে এসেছ, কিন্‌তে পার্ব্বে?

জাহান্দার। তোমার এত অহঙ্কার! ব'ল আমায় কি কর্ত্তে হবে। তোমার কি চাই? জাহান্দার আজ তোমায় সত্যই মূল্য নিয়ে কিন্‌বে। প্রেমের বন্ধনের মূল্য তোমরা কি বুঝ্‌বে?......তাই অর্থের বাঁধনে আজ তোমায় বাঁধব। বল কি মূল্য তোমার চাই?

লাল্‌কুমারী। ঠিক্‌ বুঝেছ, শাহজাদা। অর্থই আমাদের সব......আমায় কেন্‌বার মূল্য তোমাকে মোগল সাম্রাজ্যের বাদশা' হতে হবে।

জাহান্দার। তার চাইতে বল' তোমার বেগম হবার ইচ্ছাটা পূর্ণ কর্ত্তে হবে—তাই নয় কি?

লাল্‌কুমারী। হাঁ শাহজাদা, আমি বেগম হতে চাই।

জাহান্দার। ইম্‌তিয়াজ, তোমার জন্য জীবনের আদর্শ ত্যাগ করেছি—আজ তোমার জন্য পিতার কাছে যে শপথ করেছিলাম সে শপথটাও ভাঙ্গব। ভাই জাহান এসে যখন শুন্‌বে যে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে আমি সিংহাসন অধিকার করে বসেছি, তখন সে নিশ্চয়ই ভাববে যে এ আগে হতেই ভেবে ঠিক্‌ করা ছিল। ইম্‌তিয়াজ, আজ হতে তুমি দিল্লীর সম্রাজ্ঞী।

লালকুমারী। থাক্‌ শাহজাদা এ ধর্ম্মহীনা সামান্য একটা নারীর জন্য তুমি কেন এত ত্যাগ কর্ত্তে যাচ্ছ?

জাহান্দার। তোমায় যে আমার চাই-ই ইম্‌তিয়াজ, আজ নিজকে একেবাড়ে ছেড়ে দিয়েছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা আমায় নিয়ে যাও—এ জগতের আলো ছেড়ে ওই মৃত্যুর আঁধার ভরা কূপের মধ্যেও তোমার সঙ্গে যেতে আমার একটুও দ্বিধা হবে না। ইম্‌তিয়াজ, ইম্‌তিয়াজ—তুমি আমার।

লাল্‌কুমারী। হাঁ, আমি তোমারি, সম্রাট।

(পটনিক্ষেপ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—শিবির।

আজীম ও রুস্তমর্দিল।

রুস্তম। শাহজাদা, কাল শেষ রাত্রে খবর পেয়েছি, শাহজাদা জাহান ও হামিদ অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিকটেই আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

আজীম। জাহান সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করছে! রুস্তম, তবে কি পিতা জীবিত নেই? বল রুস্তম, বল, পিতার সম্বন্ধে কিছু শুনেচ কি? আমায় লুকাচ্ছ কেন?

রুস্তম। না শাহজাদা, কিছুই নেই।

আজীম। আর বৃথা আশা। রুস্তম মিথ্যা সাম্রাজ্যের আশায়, মিথ্যা সিংহাসনের লোভে সৈন্য সংগ্রহ করবার জন্য অপেক্ষা করে পিতার শেষ সময়টাকে দেখ্‌তে পেলাম না। না কষ্ট যে আমার চির-জীবন থাক্‌বে।

রুস্তম। শাহজাদা, ও পরামর্শ আপনাকে আমিই দিয়েছিলাম সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এত হতাশ হয়ে পড়লেন কেন এত কেবল মাত্র সন্দেহ।

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজসিংহ। শাহজাদা, মাড়বারাধিপতি অজিতসিংহ আপনার সাহায্যের জন্য দশ সহস্র সৈন্য সহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তিনিও শীঘ্রই রওনা হবেন। এই যে তিনি পত্র দিয়েছেন।

আজিম। (পত্রখানা পাঠ করিয়া) সেনাপতি রাজসিংহ, এ অনুগ্রহের জন্য মহারাজ অজিতসিংহ আর আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সেনাপতি দিল্লীর কোনও খবর জানেন কি?

রাজসিংহ। কেন আপনি কি কোন খবরই পান নি?

আজিম। না রাজসিংহ, পিতা মৃত্যুশয্যায় পড়ে আমার জন্য পথেরদিকে তাকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন—এ খবর আমি পেয়েছি যখন আমি বাঙলায় ছিলাম। তারপর আর কোন খবর পাই নি। বলুন, পিতা জীবিত আছেন কিনা?

রাজসিংহ। শাহজাদা, এ দুনিয়ার কেহই চিরদিনের জন্য আসে নি, তা জেনেও প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে আমাদের মন অধীর হয়ে পড়ে, প্রবোধ মানে না তাই আপনাকে আমি কোনও সান্ত্বনার কথা বলতে পারব না, বড়ই দুঃসংবাদ, শাহজাদা, বাহাদুর বাদশা স্বর্গে।

রাজসিংহ। চলে গেছেন।

আজিম। পিতা নেই রুস্তম। (কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রুমালের দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া তরবারির উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান।) রুস্তম, আর চেয়ে দেখছ কি? সব শেষ হয়ে গেছে,—এই রইল আমার তরবারি—আমি যুদ্ধ করব না। সেনাপতি রাজসিংহ, আপনি ফিরে যান।

রাজসিংহ। একটু স্থির হোন, শাহজাদা। আমি দিল্লীতে শুনেছি যে আপনার পিতা সম্রাট বাহাদুর শা' আপনাকেই সিংহাসন দিয়ে গেছেন কিন্তু জাহান্দার ও জাহান একত্র হয়ে আপনাকে বঞ্চিত করবার চেষ্টায় আছে!

[গুড়ুম, গুড়ুম কামান গর্জ্জন]

ঐ যে জাহান বোধহয় আক্রমণের জন্য সৈন্য নিয়ে এসে পড়েছে।

রুস্তম। শাহজাদা, আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

(রুস্তমের প্রস্থান)

(আবার কামান গর্জ্জন)

রাজসিংহ। শোক করবার সময় নেই; শাহজাদা, শান্ত হোন—দেরী কর্ব্বেন না এখনি এসে পড়বে।

(রুস্তমের প্রবেশ)

রুস্তন। হাঁ সেনাপতি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। শাহজাদা জাহান অসংখ্য মোগল সৈন্য নিয়ে কামান দাগ্‌তে দাগ্‌তে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।

(আবার কামান গর্জ্জন)

ঐ যে আবার গর্জ্জন! শাহজাদা, এই যে তরবারী গ্রহন করুন (তরবারি প্রদানে উদ্যত) আর দেরী করবার সময় নেই।

আজীম। কেন আমায় অনুরোধ কচ্ছ রুস্তম? আমার সাম্রাজ্যে কোন প্রয়োজন নেই।

রুস্তম। আপনি একি কল্লেন, সেনাপতি? এ সর্ব্বনাশের খবরটা কি এখন না দিলে চল্‌ত না? শাহজাদা, সিংহাসনে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু সিপাহীর প্রয়োজন আছে। আজ যদি আপনি আপনার এ প্রাপ্য অধিকার ছেড়ে দেন, তবে যে মোগল-সাম্রাজ্যে তার আর কোন অধিকারই থাকবে না।

(আবার কামানে অভ্রভেদী হুহুঙ্কার)

এই নিন্—আর সময় নেই—ঐ দেখুন সামনে কামানের ধুমে আর ধুলারাশিতে আকাশ সমাচ্ছন্ন করে মোগল সৈন্য এসে পড়েছে।

আজীম। দাও রুস্তম, তারবারি দাও।

(তরবারি আজিমের হস্তে অর্পণ)

পিতা, ক্ষমা কর্ব্বেন একদণ্ড বসে যে আপনার জন্য কয়েক ফোঁটা জল ফেল্‌ব, খোদা আমায় সে অবসরটুকুও দিলেন না।

(আবার শব্দ)

রুস্তম। রাজসিংহ, রাজপুত সৈন্য পথ ভ্রমণে বোধহয় অতিশয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এ বেলায় আক্রমণ আমি বাঙলার সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধ করি, আপনি সে অবসরে একটু বিশ্রাম নিয়ে তাজা হয়ে উঠে, বিকেল বেলায় যুদ্ধে নাম্‌বেন।

আজীম। হাঁ, সেই ভাল রাজসিংহ, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আচ্ছা, আজকে যুদ্ধ না করে কয়টা দিন অপেক্ষা কর্‌লে হয় না, রুস্তম ?

রুস্তম। সে কি করে হবে শাহজাদা ? ঐ যে তারা এসে পড়েছে।

আজীম। কেন তারা যতই আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌বে আমরা ততই পেছিয়ে পড়্‌ব।

রুস্তম। না শাহজাদা সে ভুল হবে, সৈন্যরা যুদ্ধের আশায় প্রস্তুত হয়ে আছে এখন যদি যুদ্ধ না করে পেছনে যেতে আরম্ভ করি তবে তারা হতাশ হয়ে পড়বে, আর বিপক্ষের সৈন্য উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌বে।

রাজসিংহ। শাহজাদা যা সঙ্গত মনে করেন তাই হউক, রাজপুত সৈন্য সকল সময়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

আজীম। তবে তাই হবে, আজই যুদ্ধ। সেনাপতি রাজসিংহ, আপনি যান্, বিশ্রাম করুন, যখন দরকার হবে আপনাকে খবর পাঠাব, প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

(রাজসিংহের প্রস্থান)

রুস্তম। আমিও যাই শাহজাদা সৈন্যদের সজ্জিত করে উপযুক্ত স্থানে তাদের স্থাপন কর্ত্তে হবে।

(কামান ভৈরব রবে গর্জ্জিয়া উঠিল)

আজীম। যাও রুস্তম, যা কর্ত্তব্য তুমিই সব কর্ব্বে।

(রুস্তমের প্রস্থান)

আজীম। দুটী বন্ধন আমার ছিল, এক পিতা আর সিয়ার। একটী বাঁধন আজ ছিঁড়ে গেল।—মৃত্যু সেও শান্তি, নিদ্রা জীবনের কোলাহল সব থেমে যায়, অসীম দুঃখ, উজ্জ্বল আশা শেষ হয়ে যায়, সব ফেলে চলে যেতে হয়—জীবনের ওপারে। সাম্রাজ্য, সিংহাসন কিছুই

আমি চাই না—আজ ঐ সবুজঘাসের চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়াই আমার একান্ত ইচ্ছা।—শুধু সিয়ার—

(আবার শব্দ)

ঐ যে কামান মৃত্যুর দণ্ড নিয়ে আহ্বান কচ্ছে—যাই মরণোৎসবের উদ্যোগ কতটা হল দেখ্‌তে হবে।

(পটনিক্ষেপ)

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—প্রান্তরস্থিত একটা উচ্চভূমি।

হামিদ ও জাহান।

জাহান। হামিদ, দক্ষিণদিকে রুস্তম ঘোরতর যুদ্ধ কচ্ছে, পেছন থেকে দু'দল সৈন্য যারা এতক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়নি, তাদের সাম্‌নে নিয়ে এস তারপর ঐ দিক পরিচালনা কর—শীঘ্র, দেরী কোর না—আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পাল্লেই আমাদের জয় হবে।

(হামিদের প্রস্থান)

জাহান। রাজসিংহ উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত মোগল সৈন্যের উপর লাফিয়ে পড়েছিল—উঃ কী ভয়ানক দুর্দ্ধর্ষ—রাজপুত সৈন্য প্রথম আক্রমণ প্রতিহত হওয়ায় ফিরে গিয়েছে। ঐ যে আবার আস্‌ছে নয়—একদল অশ্বারোহী সৈন্য তীরের মত মাঝখানে এসে পড়েছে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক খবর কি ?

সৈনিক। দক্ষিণদিকে আমাদের বেগ সহ্য কর্ত্তে না পেরে রুস্তমদিল খাঁ সৈন্য নিয়ে পেছিয়ে পড়েছে।

জাহান। যাও প্রহরী, সত্বর হামিদ খাঁকে মাঝখান দিয়ে সৈন্য নিয়ে আস্‌তে বলো—আমার আদেশ জানিয়ে এস।

প্রহরী। আদাব শাহজাদা।

(প্রহরীর প্রস্থান)

জাহান। ঐ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিশ্চয়ই আজীম শেষ চেষ্টা দেখ্‌তে এসেছে।—ঐ যে একটা জ্বলন্ত রক্তবর্ণ গোলা কার অশ্বের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে গেল? যাই:—

(জাহানের প্রস্থান)

(আজিম ও রুস্তমের প্রবেশ)

আজীম। রুস্তম, আঁধার হয়ে আস্‌ছে, সমস্ত দিন যুদ্ধ করে সৈন্যগুলি পরিশ্রান্ত! ঐ দেখ আক্রমণ কর্ত্তে গিয়ে দলে দলে বাত্যাহত লতার মত পড়ছে—আর আশা নেই। শুনেছিলুম মহারাজ অজিত সিংহ সাহায্যের জন্য আস্‌বেন—এ সময়ে যদি তিনি এসে পড়্‌তেন।

রুস্তম। শাহজাদা, আমি যাই, আর একবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে। এখনও আশা আছে।

(রুস্তমের প্রস্থান)

আজীম। রুস্তম, তুমি আমায় ছুনিয়ার আর একটা চিত্র দেখালে। পাশাপাশি ছুটো কি বিসদৃশ—একেবারে বিপরীত—আজ আমরা সিংহাসনের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই কর্চ্ছি। আর তুমি নিজের প্রাণের দিকে একটীবার না তাকিয়ে পরের জন্য এ ভীষণ যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লে!

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজসিংহ। শাহজাদা, আপনি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন। আর জয়ের আশা নেই।

আজীম। রাজসিংহ, আপনি না রাজপুত! তবে আমায় পালাতে বল্‌ছেন কেন? আপনারা আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন, আর এই বিপদের মাঝে ফেলে আমি প্রাণ ভয়ে পালাব—এত কাপুরুষ আমি নই, রাজসিংহ। এস।

(কামানের ভীমরবে গর্জ্জন)

এই দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের দীপ্তিটুকুও নিভে যাক্—ঘোর আঁধার।

(পটনিক্ষেপ)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৈশাখী বর্ষা।

—ঃ-*-ঃ—

সভয়ে হেরেছি তোরে লো কাল-বৈশাখি!
গৈরিক-বসনা বামা, জ্বালাময় আঁখি,
নৃমুণ্ডে আসব-পান-মত্তা কাপালিকা,
ভৈরবী ত্রিশূলপাণি! রক্ত ললাটিকা
জ্বল জ্বল দীপ্ত ভালে, ভীষণ দর্শন,
এলায়িত রুক্ষ' কেশে তাণ্ডব নর্ত্তন!
হেরেছি চঞ্চলা নারী ঘোরা উন্মাদিনী,
রুদ্রাক্ষ-মালিকা কণ্ঠে ভীমা সন্ন্যাসিনী।
হা তাপসী কে জাগাল সুষুপ্ত পরাণ
গৈরিকের অন্তরালে?—দীপ্ত দু' নয়ান
নিমেষে মেদুর হল ভরি অশ্রুজলে,
ঝরঝর ঝরে আঁখি বসন-অঞ্চলে!
মোহিনী সাজিলে মরি পরি' নীলবাস,
সজল নয়ন দুটি, মুখে মৃদুহাস!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বুদ্ধদেবের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর সংক্ষেপে তাঁহার ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে বোধিদ্রুমমূলে প্রতীত্যসমুৎপাদ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। এই ব্যাপারটী জটিল ও দুর্ব্বোধ। বিনয় পিটকে লিখিত আছে—"অবিজ্জা পচ্চয়া সংখারা, সংখার পচ্চয়া বিঞ্ঞানং, বিঞ্ঞানপচ্চয়া নামরূপং, নামরূপপচ্চয়া সলায়তনং, সলায়তনপচ্চয়া ফস্সো, ফস্সপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তণ্হা, তণ্হাপচ্চয়া উপাদানঃ, উপাদান পচ্চয়া ভবো, ভব পচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরামরণং সোক পরিবেদ দুক্খ-দোমনস্সুপায়াসা ভবন্তি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স সমুদয়ো হোতি। অবিজ্জায় ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা সংখার নিরোধো, সংখারনিরোধো বিঞ্ঞাননিরোধো···পে...জাতিনিরোধা জরামরণ সোক পরিদেব দুক্খ দোমনস্সুপায়াসা নিরুজ্ঝন্তি।"

সংসারচক্রে আবর্ত্তনের এই দ্বাদশটী নিদান—পরস্পর শৃঙ্খলিত। অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের, ষড়ায়তন হইতে বেদনার, বেদনা হইতে তৃষ্ণার তৃষ্ণা হইতে উপাদানের, উপাদান হইতে ভবের, ভব হইতে জাতির অর্থাৎ জন্মের, এবং জাতি হইতে জরামরণের উৎপত্তি হইয়াছে। অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, এইরূপ পর পর জরামরণের নিরোধে সকল শোক পরিবেদনা দুঃখ দৌর্ম্মনস্যের নিরোধ হয়। এই নিদান শৃঙ্খলের এক প্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরামরণ। একের অবিদ্যার স্থিতিতে শৃঙ্খলস্থ তাবৎ নিদানের স্থিতি, এক অবিদ্যার নিরোধে সকলের নিরোধ। এই অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দগুলি সকলই পারিভাষিক শব্দ। বিষয়টী জটিল, সময়ও অল্প, পূর্ণ ব্যাখ্যা সুতরাং অসম্ভব। ইহার যথাসম্ভব ব্যাখ্যা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'জিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে করিয়াছেন। মোটামুটি সংক্ষেপে একটি ব্যাখ্যা দিতেছি।—জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা বাস্তবিক

ভ্রান্ত জ্ঞান, অজ্ঞান, অবিদ্যা। মনুষ্যের সমস্ত চিত্তবৃত্তির নাম সংস্কার, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, অনুভূতি, ভয়, মোহ সকলই সংস্কার—তাহারাই আমার অন্তঃশরীরের বিভিন্ন অংশ। সেগুলির সমষ্টিমাত্রই আমার সমগ্র অন্তঃশরীরের নহে, তজ্জন্য আর একটী জিনিষের প্রয়োজন হয় তাহা বিজ্ঞান (অর্থাৎ Consciousness) ইহার কার্য্য বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করা, তাহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করা, যথাযোগ্য কর্ম্মে বিনিযুক্ত করা। তাহার পর নামরূপ ; বেদনা (Sensation), সংজ্ঞা, (perception) সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটি স্কন্ধের একযোগে নাম অর্থাৎ অন্তর্জগৎ অথবা মনোজগতের সৃষ্টি ; ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ এই চারিটী মহাভূতের সমষ্টি পঞ্চম স্কন্ধ অর্থাৎ রূপ অথবা বাহ্যজগৎ ; অতএব নামরূপ হইতেছে সমগ্র জগৎ,—বিশ্ব জগৎ অন্তর ও বাহ্য। অতএব—"অবিদ্যা বলে সংস্কারগুলি বিজ্ঞান কর্ত্তৃক সুবিখ্যাত হইয়া নামরূপে পরিণত হইয়া বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিয়াছে। দর্শন প্রভৃতি পাঁচ এবং অন্তঃকরণ এই ছয়টী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ষড়ায়তনের সাহায্যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের আদান প্রদান চান। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগৎ ও মনোজগতের যে Contact তাহা স্পর্শ। তাহার ফলে বেদনা অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতির নূতন নূতন বিকাশ। তাহার ফলে তৃষ্ণার উদ্গম, বাহ্যজগতের সহিত আদান প্রদান চালাইবার আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে উপাদান—বাহ্যজগতের প্রতি অন্তর্জগতের আকর্ষণ বাহ্যজগতে আসক্তি। এক্ষণে বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এখন অহং প্রত্যয়ের বিকাশ হইয়াছে। এখন আমি হইয়াছি, ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না। আমার এই উৎপত্তির নাম ভব। সেই আমার উৎপত্তির নামান্তর জাতি বা জীবরূপে জন্ম। জীব জন্মের মুখ্য ফল—ভগবান সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জরামরণের সহকারী শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য।"

বৌদ্ধগণ আত্মা স্বীকার করেন না ; অথচ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন। হিন্দুদের নিকট এরূপ ব্যাপার অভাব্য, অচিন্তনীয়, দুর্ব্বোধ ও আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত

হয়। কিন্তু বৌদ্ধের নিকট আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার নির্ব্বাণ লাভের পরিপন্থী—ইহাকে সক্কায় দিট্ঠি বলে, (fallacy of Soul) সংযুক্ত নিকারে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

* * *

সক্কায় দিট্ঠি প্রহানায়
সতো ভিক্‌ক্ষু পরিব্বজে।

Buddhistic Compendium of Philosophy নামক পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় আত্মা-বাদকে চতুর্থ উপাদান বলিয়া ধরা হইয়াছে—a theory of Soul অত্তুবাদ —উপাদানং। উপাদান নির্ব্বাণ লাভের পরিপন্থী।

"Ego" এবং "Continuous Personal Identfty" বৌদ্ধ স্বীকার করেন না। এতদ্বিষয়ে মিলিন্দ প্রশ্নে (মিলিন্দ পঞ্‌হো) বিস্তারিত আলোচনা আছে। আচার্য্য নাগসেন যবনরাজ মিলিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রথে আসিয়াছেন ?"

"হুঁ।"

"রথটা কি ? ঈষ কি রথ ?"

"না।"

"অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, রথদণ্ড, যুগ, রশ্মি...কি রথ ?"

"না।"

"অক্ষ চক্র রথপঞ্জর রথদণ্ড যুগ রশ্মি ব্যতীত অন্য বস্তু কি রথ ?"

"না।"

"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া রথ দেখিতে পাইতেছি না—তবে রথ কোথায় ? আপনি অলীক বলিতেছেন—আপনি সকল জম্বুদ্বীপের রাজা, আপনি কাহার ভয়ে মিথ্যা বলিতেছেন ? হে পঞ্চশত যবন, হে অশীতি সহস্র ভিক্ষু, তোমরা দেখ আমি মহারাজ মিলিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন রথে আসিয়াছি—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার রথ কই বলুন, কিন্তু রথ তিনি 'সম্পাদন' (দেখাইতে) করিতে পারিলেন না। দেখ তিনি মিথ্যা বলিতেছেন।"

তখন মহারাজ মিলিন্দ বলিলেন—"ভদন্ত নাগসেন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া (পটিচ্চ=অর্থাৎ ইহাদেরই হেতু, প্রত্যয়ে) রথের নাম হইয়াছে।"

তখন ভদন্ত নাগসেন বলিলেন—"সাধু সাধু, মহারাজা রথ কি তাহা জানেন দেখিতেছি। সেইরূপ মহারাজা আমার লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, প্লীহা, যকৃত, রক্ত ইত্যাদি হেতু অবলম্বন করিয়া রূপ, বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া নাগসেন এই সংখ্যা নামমাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, পরমার্থতঃ এ স্থলে কোনও পুদ্গলের উপলব্ধি নাই।"

অন্যস্থলে দেখি রাজা বলিলেন—"ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হয় সে কি সেই ? অথবা অন্য ব্যক্তি ?" নাগসেন বলিলেন—"ন চ সো ন চ অঞ্ঞো—অর্থাৎ—সে সেও নয় অন্যও নয়।"

রাজা বলিলেন—উপমা দিন।

নাগসেন—"আপনি কি মনে করেন মহারাজ, যখন আপনি শিশু তরুণ উত্তানশায়ী ছিলেন সেই কি আপান এখন এত বড় ?"

'না'

"শিশু তরুণ উত্তানশায়ী অন্য, এবং এই যে বড় আপনি ইনি অন্য ?"

"না।"

তাহার পর নাগসেন বলিলেন এই কায় অবলম্বন করিয়া তরুণত্ব, বৃদ্ধত্ব হয়। তাহার পর তিনি বলিলেন—"যে যদি একটা প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলে, প্রথম যামের অর্চ্চি, মধ্যম যামের অর্চ্চি নহে, অথবা পশ্চিম যামের অর্চ্চি নহে—প্রথম যামের প্রদীপ, দ্বিতীয় যামের প্রদীপ ও তৃতীয় যামের প্রদীপ—সে একই প্রদীপ। সেই প্রদীপের জন্যই (হেতু) সর্ব্বরাত্রি আলো জ্বলিতেছে।" নামরূপকে অবলম্বন করিয়াই রূপান্তর ঘটিতেছে। অতএব Rebirth is not Transmigration. এই শেষোক্ত বিষয়টাও উপমাদ্বারা বুঝান হইয়াছে—তাহা এখনে বলিবার সময় নাই।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বলি—"বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য অক্ষরে অস্তিত্ব মানেন না। যাহা বেদান্তের নিকট স্বতঃসিদ্ধ তাহা বৌদ্ধের নিকট একেবারে অসিদ্ধ। বৌদ্ধের নিকট নামরূপই সব অর্থাৎ যে জ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরা আমাদের প্রতীয়মান হয় তাহাই সব। জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই। এই পরস্পর সম্পর্ক রহিত বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক জ্ঞানগুলির পারিভাষিক নাম সংস্কার। তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, তবে একটা সম্বন্ধের কল্পনা করা হয় বটে। সেই সম্বন্ধ বিজ্ঞান নামক পদার্থ দ্বারা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান ও ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র। উহাও একটা অনির্ব্বাচ্য কোন একটা কিছু নহে। এই সংস্কার সমূহ ও সংস্কারে সমূহের প্রভু বিজ্ঞান উভয়েরই সমষ্টি একত্র করিয়া একটা মিথ্যা "আত্মা" বা "আমি" কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু তাহা অমূলক ও অনাবশ্যক কল্পনা।... সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টি করিলে যাহা হয় তাহাই নামরূপ। কিন্তু সেই নামরূপের সাক্ষী কেহ কোথাও নাই।"

এই কথাই অন্য ভাষায় Rhys Davids বলিয়াছেন—

(Hibbert Lectures 1881)—"Tho object of the wise man should be to know, inwardly and consiously, the great soul of all; and by this knowledge his individual soul would become united to the Supreme Being the true and absolute self. This was the highest point of the old Indian Philosophy (that is the Upanishads).

কিন্তু—"The distinguishing characteristic of Buddhism was that it started on a new line, that it looked at the deepest questions men have to solve from an entirely different standpoint. It swept away from the field of its vision the whole of the great soul-theory which had hithirto so completly filled and dominated the minds of the superstitious and the thoughtful alike. For the first time in the history of the world it proclaimed a salvation which each man could gain for himself, and by himself in this world, during this life, without any the least reference to god or to gods. either great or small.

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সময় অল্প। বৌদ্ধেরা আত্মা মানেন না, ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনাকে সময়ের অপব্যবহার মনে করেন। মজ্ঝিমা নিকায়ান্তর্গত সব্বাসবসূত্রে এই জল্পনা বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—ভবিষ্যৎ জন্মে আমি কি বা কেমন হইব? সত্যই কি আমি আছি না নাই? আমি কেমন? কোথা হইতে আমার সত্তা আসিয়াছে, কোথায় যাইবে।" এইরূপ জল্পনা একেবারে—নিষ্প্রয়োজন।

Rhys Davids (of cit. p-91) বলিতেছেন—"I have no hesitation in maintaning that Gotama did not teach transmigration of soul. What he did teach world be better summarized, if we wish to retain the word transmigra tion, as the transmigration of character. But it would be more accurate to drop the word transmigration altogether when speaking of Buddhism, and to call its doctrine the doctrine of Karma. Gotama held that after the death of any being, whether human or not, there survived nothing at all but that being's *Karma*, the result that is, of its mental and bodily actions. Every individual, whether human or divine was the last inheritor & the last result of karma of a long series of part idividual........"

এই কর্ম্মবাদ বড়ই দুর্ব্বোধ্য। অতএব বৌদ্ধগণ একটুকু ঘুরাইয়া বলিলেন যে তৃষ্ণা অর্থাৎ তৃষ্ণাই নূতন জীবের জন্মের জন্য দায়ী এবং এই জীবকেই পূর্ব্ব জীবের কর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইতে হয়। কিন্তু কি করিয়া যে ইহা ঠিক ঘটিত তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিত না—ইহার গূঢ় তথ্য কেবল বুদ্ধই বুঝিতেন। জীবন অনন্ত অস্তিত্বের শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়; এই সংসারের বৃত্ত হইতে বহির্গত হইবার অবস্থা প্রাপ্তি কাম্যবস্তু, এবং তাহার কারণ সমূহ ও জানিতে হইবে। এই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলেই শৃঙ্খলচ্ছেদ হইবে, কর্ম্মবন্ধন টুটিয়া যাইবে, আর জন্ম হইবে না।

অতএব জন্মের কারণ বা উপাদান—তৃষ্ণা। সংসারে (The endlessly reborn life flux of beings), বট্ট (বর্ত্ত), আবট্ট (আবর্ত্ত) এই তৃষ্ণার ফল। এই তৃষ্ণারই অপর বিকাশ উপাধিতে, তাহারাই 'bases or substrate of rebirth'; ইহাই পঞ্চকামগুণ

(Sensuous enjoyment), পঞ্চকখন্দা অথবা 'কিলেস।' পুনর্জ্জন্ম চারিটী যোনিতে হইতে পারে—(১) অণ্ডজ, (২) জলাবুজ (জরায়ুজ), (৩) সংবাদজ এবং (৪) 'ওপ পাতিকা' (Apparitional birth—পিতৃ সহযোগ ব্যতীত ও জন্মকে 'ওপপাতিকা' জন্ম বলে)। এই পুনর্জন্মের পাঁচটি গতি আছে—পঞ্চগতিয়ো—(১) নিরয়ো, (২) তিরচ্ছান যোণি, (৩) পিত্তিবিসয়ো, (৪) মনুস্সা, (৫) দেব।—অর্থাৎ নরক, পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক জাতিতে জন্মগ্রহণ প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ, মানুষ হইয়া এবং দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ। জন্মের নিরোধ হয় কি করিয়া ? দেখা যাউক ইহার কি উত্তর আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বুদ্ধদেব ইসিপত্তন মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া তিনি কহিলেন—হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিত ব্যক্তি দুইটী অন্ত পরিহার করিবে—যথা হীন অনার্য্য অনর্থমূল কামসুখ ভোগ এবং অনার্য্য অনর্থমূল শরীর ক্লেশকর কঠোর তপশ্চর্য্যা। এই দুয়ের অন্তর্বর্ত্তী অর্থাৎ মধ্যম পদই অভিজ্ঞা, সম্বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণে লইয়া যায়। ইহাই অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্গো)—তাহা হইতেছে এই ; সম্যক দৃষ্টি (সম্মাদিঠ্‌ঠি), সম্যক সঙ্কল্প (সম্মা সঙ্কপ্পো), সম্যক্ বাক্ (সম্মা বাচা), সম্যক কর্ম্ম (সম্মা কম্মন্তো), সম্যক আজীব (সম্মা আজীবো—Right livelihood), সম্যক ব্যায়াম (সম্মা বায়াদমা—Right exertion) সম্যক স্মৃতি (সম্মাসতি) এবং সম্যক সমাধি (সম্মা সমাধি)। তাহার পর তিনি চতুরার্য্যসত্যের ব্যাখ্যা করিলেন—

১। দুক্‌খম্ অরিয় সচ্চম্—জাতি পি দুক্‌খা, জরা পি দুক্‌খা, ব্যাধি পি দুক্‌খা, মরণম্ দুক্‌খং, অপিপয়েহি সম্পয়োগ দুক্‌খা ; পিয়েহি বিপ্পয়োগো দুক্‌খো, যম্পি ইচ্ছং ন লভবিও তং পি দুক্‌খং, সংখিত্তেন পঞ্চুপদানকৃখন্দা পি দুক্‌খা। অর্থাৎ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়ের সহিত যোগ, প্রিয় হইতে বিচ্ছেদ যাহা ইচ্ছা করিয়া পাওয়া যায় না—সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানকন্ধই দুঃখ।

২। ইদং খোপন ভিক্‌খবে দুকখ—সমুদয়ং অরিয় সচ্চং—যায়ং তণ্‌হা পোনোব্‌ভবিকা। নন্দিরাগসহ গতা তত্র তত্রাভিনন্দিনি। সেয্যাথীদং—কাম তণ্‌হা ভবতণ্‌হা,

বিভব তণ্‌হা—। অর্থাৎ দুঃখের উদ্ভব (হেতু) দ্বিতীয় আর্য্য সত্য তৃষ্ণাই পুনর্জ্জন্ম (ভব) ঘটায়, তাবৎ বস্তুতে আনন্দ, মোহ ও আকর্ষণের সহিত ইহার যোগ আছে—এই তৃষ্ণা ত্রিবিধ, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে অভিলাষ, জীবনের অভিলাষ এবং ধনের অভিলাষ।

৩। ইদং খোপনি ভিক্‌খবে দুক্‌খনিরোধম্ অরিয় সচ্চম‌ঃ যো তস্সা যেব তণ্হায় অসেস বিরাগ নিরোধা চাগো, পটিনিসগ্‌গো মুত্তি অনালয়ো।—অর্থাৎ দুঃখ নিরোধ তৃতীয় আর্য্যসত্য—যথা (আকর্ষণের বস্তু হইতে) নিঃশেষ নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিসর্গ, মুক্তি ও অনাসক্তি।

ইদং খো ভিক্‌খবে দুক্‌খনিরোধগামিনি পটিপদা অরিয়সচ্চং অয়মেব অরিয় অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্গো—অর্থাৎ দুঃখনিরোধের পথ চতুর্থ আর্য্যসত্য তাহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

তবে তৃষ্ণার নিরোধই হইতেছে নির্ব্বাণ—এবং তাহা লাভ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। যে সরিৎ বাহিয়া নির্ব্বাণ সমুদ্রে পৌঁছা যায়—তাহার চারিটী ক্রম আছে।—এই চারিটী মার্গ (চত্তারো মগ্গো) প্রথম সোতাপন্নের (স্রোতাপন্নের) দ্বিতীয় সকদাগামীর (সকৃদাগামীর)—নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহাঁকে আর একবার জন্মিতে হইবে ; তৃতীয় অনাগামীর (ইনি আর মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিবেন না, পরন্তু ব্রহ্ম লোক হইতে নির্ব্বাণে পৌঁছিবেন), এবং চতুর্থ অর্হত্ত্বের অর্থাৎ নির্ব্বাণের। প্রত্যেক ক্রমের আবার নীচ উচ্চ ভেদে দুই স্তর আছে—যথা স্রোতাপত্তি, স্রোতাপত্তিফল ইত্যাদি। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র এবং সুমঙ্গলা বিলাসিনী দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত মত আছে। সংযুক্ত নিকায় মজ্ঝিমনিকায়, কথাবত্থু, ইতিবুত্তক প্রভৃতি সকল পুস্তকেই এ বিষয়ে এক মত—নির্ব্বাণ হইতেছে তৃষ্ণার নিরোধ। নির্ব্বাণ তৃষ্ণার উপসম—বূপসমো ; অচ্চন্ত সন্তি—অত্যন্ত শান্তি (final peace) ; অতএব ইহাই পরম সুখ—সারীপুত্র বলিতেছেন—তত্র খো আয়স্মা সারীপুত্তো ভিক্‌খু আমন্তেসি—সুখমিদম আবুসো নিব্বানং, সুখমিদম আবুসো নিব্বানং তি।—পরমত্থদীপনীকার ধর্ম্মপাল বিমানবত্থুর টীকার কোন ও স্থলে ইহার ব্যাখ্যা

করিতেছেন—নিত্তণহভাবং নিব্বানং অর্থাৎ নিস্তৃষ্ণাভাবই নির্ব্বাণ। কেহ কেহ বলেন নির্ব্বাণ অগ্নির নির্ব্বাপণ; আত্মাই সেই অগ্নি—এই মত একবারে ভ্রান্ত। কি সেই অগ্নি?—রাগ্, দোস (দ্বেষ), মোহ—তৃষ্ণারই বিকার। Rhys Davids বলিতেছেন—(Hirbert lectures 1887 V. 100)—"That Arhatship is called Nibbana or Nirvana, a word which means the going out, the becoming extinct, and has been therefore by writer ignorant of the first principlys of Buddism, been supposed to mean the extinction of the soul! It is the going out of craving (তণ্হা) and the three fires just referred to (Viz. The inward force of lust, hatred and dilusion)."

রীজ ডেভিডস মন্দ বলেন নাই—কেননা অনেকেই এই নির্ব্বাণের সহিত বেদান্তের তুরীয় অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াছেন—বোধহয় দুই অবস্থা একই ধরিয়াছেন। আমি বেদান্তীও নহি, বৌদ্ধও নহি, কাহারও সাধন জানি না—দুই অবস্থা এক কিনা বলিতেও পারি না। যাহা হউক যাহা পুঁথিতে আছে তাহাই নিবেদন করিতেছি—

কঠোপনিষদে (৩১৫ বল্লী) আছে—

তদেতদিতি মন্যন্তে ঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতিবা ॥ ১৪ ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি নচন্দ্র তারকন্নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

অর্থাৎ—সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি, কিছুই জ্বলে না। তাঁহার ভাষা দ্বারা সকলই উদ্ভাসিত হয়।

পালিপুস্তক 'উদানে' এইরূপ একটি শ্লোক আছে—

"যত্থ আপো চ পঠবী, তেজো বায়ো ন গাধতি
ন তত্থ সুক্কা জোতন্তি, আদিচ্চো নপ্পকাসতি
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি, তমো তত্থ ন বিজ্জতি।"

অর্থাৎ—সেখানে জল, পৃথিবী, তেজ বায়ু প্রবেশ করে না; শুক্র বস্তুও তথা নাই, আদিত্য প্রকাশিত হন না, চন্দ্রমা উদিত হন না, অন্ধকার নাই।

বুদ্ধদেব ঠিক নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, তবুও তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন কপিল এবং তাঁহার বাদকে সাংখ্যের মায়াবাদ ধরিয়া লইয়া প্রমাণ দিয়াছেন যে বুদ্ধ কপিল-বস্তুতে জন্মিয়াছেন ও তাঁহার মাতা মায়াদেবী ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর প্রমাণ আর কি আছে? (এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মহাযান তন্ত্রের কথা প্রসঙ্গে বলিবার ইচ্ছা ছিল।) অনেকে চার্ব্বাক মতের সহিত বৌদ্ধ মতের সাদৃশ্য দেখেন। এক সময়ে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ জৈন মত ও বৌদ্ধ মতের ভিতর পার্থক্য দেখিতে পাইতেন না। মোসাহেবের আলুর মত বেদান্তের ঝোলে, সাংখ্যের ঝালে, লোকায়তবাদের অম্বলে ও জৈন মতের চড়চড়িতে বৌদ্ধ মত দিব্য চলিত!

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ দেবতা মানিতেন না। এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় যথা আজীবকগণের—কঠোর তপশ্চর্য্যায় বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'নঙ্গুট্ঠ জাতকে'র কথা বলিব। 'বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কহিলেন—বৎস তিনটী বেদ (ত্রয়ী) অধ্যয়ন করিয়া, তোমার জন্মের সময় যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই অগ্নি দেবতার পরিচর্য্যা কর; তাহা হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। বোধিসত্ত্ব অগ্নি লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দানে একটা গরু পাইলেন। তখন তাহাকে অগ্নি দেবতার নিকটে বলি দিবার সঙ্কল্প করিলেন; পরক্ষণেই মনে হইল—লবণ তো নাই, বিনা লবণে অগ্নি গৌ মাংস ভক্ষণ করিবেন কিরূপে? অতএব গরুটাকে বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া লবণের সন্ধানে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। এদিকে এক দল দস্যু সেই বনে প্রবেশ করিয়া বেওয়ারিশ গরুটাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল—খালি লাঙ্গুল, চর্ম্ম ও অস্থি পড়িয়া রহিল। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়া সেই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন—"যে দেবতা নিজের জিনিষ সামলাইতে পারে না, সে আমাকে রক্ষা করিবে কি করিয়া? অতএব দেবতা, দস্যুরা যখন মাংসটা খাইয়াই গিয়াছে, তখন লেজ ও চামড়া খাইয়াই তুমি ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। হে হীন

জাতবেদ এই লও লাঙ্গুলটা।" পরে জল দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মজ্ঝিমনিকায়ে তাথিক অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের কঠোর তপশ্চর্য্যার এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে—কেহ বা গোড়ালীর উপর কষ্টে বসিয়া আছে, কেহ বাদুড়ের মত বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইয়া আছে, কেহ বা কণ্টক শয্যায় শায়িত, কেহ বা পঞ্চ অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছে, কেহ বা জলে দেহ মগ্ন করিয়া বসিয়া আছে। বুদ্ধদেব এই সকলের বিরোধী ছিলেন।

বুদ্ধদেব বেদ স্বীকার করিতেন না। দীঘনিকায়ান্তর্গত তেবিজ্জ সূত্তে বেদবিদ্যার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বাসেট্ঠ নামক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারই মুখ হইতে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—"তাহা হইলে সাতপুরুষের মধ্যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদের একজন ও ব্রহ্মাকে চাক্ষুষ দেখে নাই—যে ঋষিদের বচন এই ব্রাহ্মণ গণ আওড়াইতেছেন তাঁহাদের কেহই ব্রহ্মাকে জানেন নাই; দেখেন নাই; দেখিবার ভাণ পর্য্যন্তও করেন নাই—ব্রহ্মা কোথায়, ব্রহ্মা কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন। সারি সারি অন্ধ ব্যাক্তিগণ না দেখিয়া যেমন গল্প করে এও যে তাই হইতেছে!"......"আচ্ছা ধর এই রাপ্তী নদীতে বান আসিল। এখন যদি কোন লোক তাহার অপর তীরে কার্য্য আছে সে যদি অপর তীরকে সম্বোধন করিয়া বলে—হে অপর তীর তুমি একবার এ তীরে এস এবং সে অপর তীরের স্তুতি, প্রশংসা করিয়া এ দিকে আসিতে প্রার্থনা করে তবে তাহা আসিবে?"

"কখনই না।"

"সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণ বিগর্হিত হইয়া অবিরত ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, যমকে নিরন্তর আহ্বান করে, তবে দেহান্তে কি তাহারা ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবে?" পরে তিনি প্রতিপন্ন করিবেন—যে এই ত্রয়ীর বিদ্যা জলশূন্য মরুভূমি, পথশূন্য বন-প্রদেশের ন্যায় ধ্বংসের মূল। তাহার পর তাঁহার মতে প্রকৃত বিদ্যা কি ও প্রকৃত ব্রাহ্মণকে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ নীতিমূলক (Ethical, moral) ছিল। তাহাতে দশশীল রক্ষা করিতে হইত—প্রাণাতিপাত অথবা প্রাণিবধ, অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ (চৌর্য্য—অদিন্নাদান), অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ, সুরা মৈরেয় প্রভৃতি প্রমাদ স্থান. বিকাল ভোজন, নৃত্যগীতবাদ্যাদি, মালা, গন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডনাদি, উচ্চশয়ন মহাশয়ন ও স্বর্ণ এবং রৌপ্য গ্রহণ হইতে বিরত হইবে, নানাবিধ ধ্যান (ঝান) ধারণা, কর্ম্মস্থান, ভাবনা—সাধনের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহা বিস্তৃত ভাবে বলিবার সময় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের একটা স্থূল আভাস মত দিলাম।

পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এ প্রবন্ধে বলা অসম্ভব। এই আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক কথা যথা,--নীবরণ, সংযোজন, ইদ্ধি, কিলেস, উপাধি ইত্যাদি বলিবার ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সে সব কথা বলিবার উপক্রম করিলেই আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। অতএব আমার প্রবন্ধ এইখানেই নির্ব্বাণ লাভ করিল

শ্রীকালীপদ মিত্র

বিধবা।

—০:০:০—

এখনো ত' বছর খানেক হয়নি আজো শেষ
তবুও কেন পরতে হলো এমন ধারা বেশ—
সিঁদুর-রেখা পরতে নাহি—শুভ্র ভালে টিপ,
বাজবে নাকো হাতের চুড়ী জ্বালতে সাঁজের দীপ।'

প্রসাধনে নাই অধিকার—মৌন সাঁজের বেলা
পল্লীঘাটে আর হবে না হাস্যরবের খেলা,
সসম্ভ্রমে সিক্তবাসে অঙ্গখানি ঢেকে
আস্‌বে নাকো সজল-চরণ-চিহ্ন দুটী এঁকে!

যতন করি' আল্‌তা পরি'—আরত' আঙ্গিনাতে—
নীলাম্বরী বসন পরি' সঙ্গিনীদের সাথে
মিশ্‌তে আমি পারবো নাকো—থাক্‌তে হবে দূরে
বাসনা মোর যতই' কেন থাকনা পরাণ জুড়ে!

আঁচলখানির আড়াল দিয়ে—কতই' ভয়ে ভয়ে,
প্রদীপ রেখে—কি জানি কোন প্রাণের কথা কয়ে—
শুভ্র ছোট আঁচলখানি যত্নে টানি গলে
প্রণাম করা হবে না মোর আর তুলসি তলে।

যেথায় শুভ—চিহ্ন সেথা থাক্‌বে নাকো মোর
আমায় দেখি চখাচখির বন্ধ হবে দোর,
আমার পরশ লাগ্‌বে নাকো কোনই' শুভ কাজে
আমার আঁচল-হাওয়া সেথা বাজের মত বাজে।

কাহার বুকে দিয়েছিলাম কঠিন মনস্তাপ
আজকে তাহার পেতে হলো রুদ্র অভিশাপ—
বেঁচে আমি এমনি ক'রে মরবো চিরদিন,
ম'রে বাঁচা হবে না মোর—এমনি ভাগ্যহীন।

কে তুমি গো করলে আমায় অমঙ্গলের রাণী
কিসের লাগি আঁধার কোলে আন্‌লে আমায় টানি,
কোন পাপে মোর জীবন প্রাতে নামিয়ে দিলে সাঁজ
কোমল বুকে এমন করে হান্‌লে নিঠুর বাজ!

কিসের লাগি নিশ্বাসেতে বিষ দিয়েছে মোর
পরশ কেন বজ্রসম লাগ্‌বে সুকঠোর,
দৃষ্টি কেন ভস্মীভূত করবে সবার প্রাণ
বধির কেন করবে সবে আমার প্রাণের গান!
শুধাই' ওগো! মৌন মধুর মরণ তোমায় আজ
সসীম কবে মিলিয়ে যাবে তোমার অসীম মাঝ—
শুধাই' তোমায়! না হ'তে মোর একটী বছর শেষ
কে অমারে পরিয়ে দিল এমন ধারা বেশ!

শ্রীরেণুকা দাসী।

নারী-সমস্যা।

—:০:—

বর্ত্তমান যুগে মানুষের মনকে যে সমস্ত সমস্যা সব চেয়ে বেশী ভাবাইয়া তুলিয়াছে তাহার মধ্যে নারী-সমস্যা একটি প্রধান। যে প্রথা যে মতবাদ এতদিন নারী সম্বন্ধে কায়েম হইয়াছিল অনেকেই আজ তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। নারীর কি করণীয়, কতটুকু অধিকার, ইউরোপ ও আমেরিকার বহুদেশেই আজ তাহার একটা বেশ ভাল করিয়া বোঝাপড়া হইতেছে।

সকল দেশের নারী-জীবনের সমস্যা যে একরূপ তাহা নয়—অন্ততঃ সকল দেশে তাহা সমান বাস্তব হইয়া উঠে নাই। সমস্যা বাস্তব না হইয়া উঠিলে তাহা সমস্যাই নয়—পুথির সমস্যা হইতে পারে, জীবনের সমস্যা নয়। তাই ইউরোপ ও আমেরিকায় সেথানকার আচার ও প্রথার জন্য নারী-জীবনে যে অভাব ও অভিযোগের সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের দেশে তাহা অনেক সময়েই কল্পনারও অতীত।

প্রকৃত পক্ষে নারী-সমস্যা বলিতে বাস্তবিক যাহা বুঝায় তাহা ইউরোপ ও আমেরিকাতেই হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা সবে আসিতেছে মাত্র—আসিলেও তাহা দুই একজনের ব্যক্তিগত জীবনে আসিতে পারে, জাতীয় জীবনে বাস্তব হইয়া উঠে নাই।

সকল দেশেই অল্পবিস্তর নারীকে ভার বা দায় বলিয়াই মনে করা হয়। 'ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এ কথাটা যে শুধু আমাদের দেশের লোকেই বলে তা নয়, ইউরোপ ও আমেরিকায়, মুখে প্রকাশ না করিলেও লোকের অন্তরের কথাটা তাই। পুরুষ আহরণ করিবে, নারী তাহাই গ্রহণ করিবে—ইহাই সকল দেশের প্রথা। ইহার মূল কারণ নারীর আর্থিক অধীনতা। এই আর্থিক অধীনতাই নারীকে পরাসক্ত করিয়াছে, পুরুষের মুখাপেক্ষী করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আজ নারী দায় বা ভার। ভার বলিয়াই, এই পরাসক্ত প্রকৃতির জন্যই পুরুষের চেয়ে নারীর বহুবিষয়েই গরজ বেশী। নারীর বিবাহের গরজ বেশী, পুরুষের সাহায্য লাভের গরজ বেশী, তাহাদের মনস্তুষ্টির গরজ তার ইয়ত্তাই নাই। কারণ পুরুষের নারী না হইলে চলিতে পারে, নারীর তা চলিবে না। তাঁর আশ্রয়ের জন্য, তাঁর ভরণপোষণের জন্য, সামান্য মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পুরুষকে তাঁর চাই-ই।

এই পরাসক্ত প্রাকৃতির জন্যই জগতে নারীর আজ এত হীনাবস্থা; তাঁর অধিকার ও দায়িত্বের এত বৈষম্য। নারী সম্বন্ধে যে ধারণা, তাঁর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে তার অনেকটাই নারীর এই পরাসক্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছে।

নারী প্রচেষ্টার একটি মূল কথা হইতেছে এই পরাসক্ত প্রকৃতি অস্বীকার করা। নারীর পরাসক্ত ভাবটা প্রকৃতিগত নয়। নারী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও বিধি-নিষেধই নারীকে পরাসক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অমুক কাজটা নারীর নিষিদ্ধ, অমুক কাজটা করিলে তাহার কমনীয়তা চলিয়া যাইবে—এরূপ স্তোকবাক্য হইতে বাঁচাইয়া নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা দিলেই তাঁর পরাসক্ত প্রকৃতি অপ্রাকৃত হইয়া পড়িবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস্তবিক হইয়াছেও তাই। চিরপ্রচলিত মতবাদগুলির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া নারী আজ এমন কোন কাজ নাই যাহার মধ্যে প্রবেশ না করিতেছে।

আর্থিক স্বাধীনতাই নারী-প্রচেষ্টার শেষ কথা নয়। কিন্তু ইহাতে নারী তাঁর সত্তা নূতন করিয়া অনুভব করিতেছেন। এই অনুভূতির জোরেই আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকেই বলিতেছেন,—নারী সম্বন্ধে যে ধারণা, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ প্রচলিত তাহা ভ্রান্ত; এবং এই ভ্রান্ত মত ও ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই নারীকে এতদিন পর্য্যন্ত যে অধিকারে অধিকারী বিবেচনা বা অধিকার বিচ্যুত করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

তাই নারী-প্রচেষ্টার মূল কথা হইতেছে, বঞ্চিত অধিকার ফিরাইয়া পাওয়া। রাষ্ট্রীয় অধিকার চাই, সকল রকম ব্যবসা ও কাজের দ্বারগুলি উন্মুক্ত চাই, সম্পত্তি সম্ভোগ ও বিবাহ সংক্রান্ত আইনগুলির মধ্যে সাম্য চাই—এক কথায় নর-নারীর সমান অধিকার চাই—ইহাই মুখ্য কথা।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে নারীদের অনেকেই এই অধিকারগুলি চাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথেষ্ট ক্লেশ যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। ইহার ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলই সুফল নয়। একে ত নারী-প্রচেষ্টার মূলকথা হইতেছে নষ্ট-অধিকার লাভ; তাহার উপর আবার এই বাধা পাওয়াতে সমস্ত প্রচেষ্টাটির মধ্যে পুরুষের সহিত নারীর এমন একটা রেষারেষী ভাব আনিয়া দিয়াছে যেন ইহা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে জাতিতে লড়াই—অনেকটা শ্রমিক ও ধনিদের লড়াইয়ের মতন!

হইবার কথাও তাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নারী-জগৎ ও পুরুষ-জগৎ আখ্যা দিয়া পরস্পরের কাজের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্য-রেখা টানিয়া যেমন নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতে পারিয়াছিলেন বর্ত্তমানে আর তা চলে না। স্বাতন্ত্র্য রেখা ঘুচাইয়া দিয়া নারী আজ একই জগতের অধিবাসিনী, একই জগতে আসিয়া পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিতেছেন। নারী আজ পুরুষের প্রতিদ্বন্দী; বর্ত্তমানে নারী তাই পুরুষকে দেখিতেছে তার অধিকারের অন্তরায় রূপে, তার ন্যায্য দাবীর বিঘ্ন-স্বরূপে। নারী আপনাকে এখানে নিষ্পেষিত মনে করিতেছে। তাই মনোভাবটাও সেইরূপই কিছু উগ্র হইয়া উঠিতেছে!

যতদিন দাবী ও অধিকারের উপর নির্ভর করিয়াই নারী-সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া হইবে ততদিন এরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। নারী নিষ্পেষিত, নারী অনেক অধিকার হইতে

বঞ্চিত তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহার নিরাকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহাদের এই নিষ্পেষণ ও বঞ্চিত অধিকারের তালিকা প্রকাশেই ত নারী-সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রকৃত পক্ষে, নারীর অধিকার ও দাবী নারী-সমস্যার মূল কথা নয়—বর্ত্তমান অপ্রাকৃত সমাজের অন্যায্য ও পক্ষপাত ব্যবস্থায় এরূপ দেখাইতেছে মাত্র। তাহা কিন্তু আরও অনেক বড়—তাহা মানব সমস্যা।

কতগুলি মূল ভিত্তিকে আঁকড়াইয়া বর্ত্তমান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মূল ভিত্তি-গুলির উপর দাঁড়াইয়া সমাজ মানব সম্পর্কের কাঠামোগুলি সৃষ্টি করিয়াছে। আর্থিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি মানবের সকল সম্পর্কের বিধিনিষেধই ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে জগতে তাহাদেরই একবার যাচাই করিয়া লইবার আয়োজন চলিতেছে। কারণ মানুষ প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে বর্ত্তমানে আর মনের সঙ্গে সায় দিয়া নিতে পারিতেছে না। তাই আজ মানুষ চাহিতেছে এমন সমাজ গড়িতে, যেখানে ন্যায় ও কল্যাণের সঙ্গে বিধি-ব্যবস্থার মিল হইতে পারে।

শ্রমিক-সমস্যা, নারী-সমস্যা, পরাধীন-জাতির সমস্যা প্রভৃতি যত কিছু সমস্যা আজ মানবকে চিন্তিতে করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মূল কথা একই—এই সামাজিক মূলভিত্তি-গুলিকে 'একবার পরখ করিয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা।

নারী সমস্যার মূলকথা তাই। নর-নারী সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ চিরপ্রচলিত আছে তাহাকে বর্ত্তমান জগৎ আর চিরসত্য বলিয়া মানিয়া নিতে রাজী নয়। তাই নর ও নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে প্রথা চিরপ্রচলিত, বর্ত্তমানে এই নারী-সমস্যায় তাহারই একটা পরখ হইতে বসিয়াছে এবং এই নূতন পরখের উপরেই গড়িয়া উঠিবে নূতন সমাজ, নূতন নূতন প্রথা ও বিধি-নিষেধ লইয়া। নারী-সমস্যার মূল কথাটাই এই—নূতন ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সোণার বাঙলা।

সমাজের দাবী।

—ঃ০ঃ—

সাম্য স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষিণী আমরা নিজেরাও কথাটা মানি এবং বিরোধী দলকেও বার বার বল্‌তে শুনি যে সমাজ নাকি নারীর কাছ থেকে দাবী করে প্রেম আর পবিত্রতা। তফাৎ এই যে বিরোধী দল বলেন শুধু ঐ দুটাতেই নারীত্ব বজায় থাকে; আর কিছু বেশী থাক্‌লে নারীত্ব হারাবার সম্ভাবনা, আর আমরা ঐ "শুধু" কথাটী উঠিয়ে দিয়ে আরো কিছু সংযোগ করে দি।

নারী দেহ দিয়ে সৃষ্টি কার্য্য চালিয়ে যান, বলেই তাঁর কাছে প্রতিভার দাবী ধরে বিশ্বসমাজ বসে থাকে না, তাঁর কাছ থেকে সব সময়ই চায় আদর্শ জননীর ঐ দুইটী বিশেষ গুণ প্রেম আর পবিত্রতা।

নারীর কাছ থেকে সমাজ যে পবিত্রতা দাবী করে তার সঙ্গে কি বহির্জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই? অন্তরের পবিত্রতা ত চাই নিশ্চয়ই কিন্তু শুধু অন্তরের পবিত্রতা নিয়ে বসে থাকলেই কি সমাজের প্রতি সকল কর্ত্তব্য শেষ হ'বে? ইংরাজীতে একটা কথা আছে cleanliness is next to godliness. দেহের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতা (দেবত্ব)র প্রায় সামিল, দেহের পবিত্রতা শুধু প্রতিদিনের স্নানে হয় না—ঘর দ্বার-ও পরিষ্কার রাখ্‌তে হয়। শুধু নিজের ঘরটী ঝেড়ে মুছে তক্‌তকে করে রাখ্‌লেও হয় না ঘরের আশ পাশও দেখ্‌তে হয়।

পাড়াগাঁয়ের কথা ছেড়েই দিলাম, কালিকাতার মত আজব সহরের রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে কত মায়ের বাছার গায়ের উপর কত জননীই না ঘর ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেন—কত শিশুর মল মূত্র জড়িত কাগজ বা ন্যাকড়া ছুঁড়ে দেন। জননী যিনি পবিত্র-তার আধার আচার, নিয়ম শৃঙ্খলাকে তিনি এমন করেই তো নিত্য প্রতিদিন অগ্রাহ্য করে চল্‌ছেন। আজ আমার ছেলে পথ চল্‌তে গিয়ে অপরের মায়ের হাতের প্রক্ষিপ্ত ন্যাকার-জনক আবর্জ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে অপবিত্র হয়ে আসে, কাল সেই মায়ের ছেলেই আবার আমারই পানের পিক্ আর নাকের সিকনি মেখে ঘরে যায়। এমনি করে পরের ছেলেকে নোংরা করে দিয়ে আমরা জননীত্বের পরকাষ্ঠা দেখাচ্ছি!

আমার ঘরের আঁস্তাকুড় ঝেঁটিয়ে তুলে রাস্তায় ময়লার গামলায় না ফেলে চাকর বা দাসী ফেলে এলো পাশের বাড়ীর দরজার সামনে—আমিতো তাদের কিছুইত বারণ কর্‌লাম না। বরং পাশের বাড়ীর চাকর যদি কিছু বলতে এলো তো হাত মুখ নেড়ে দুদশ কথা শুনিয়ে দিলাম এরই নাম হ'ল সুচিতা রক্ষা।

রাশীকৃত আর্জ্জবনা উঠানে পচ্‌ছে কিন্তু রান্নাঘর ধোয়া মোছা গবর লেপা চল্‌ছেই এতেই কি শুচিতা রক্ষা হয়? পচা আবর্জ্জনারাশির কাছে দুর্গন্ধময় স্থানে মাছি ভন্ ভন্ করছে, নিষ্টিবন ইত্যাদি লিপ্ত হয়ে ছেলে মেয়েরা খেলা করছে, চানাচুর বা ঘুঙ্‌নীআলা ডেকে সেই খানেই বসে খাচ্ছে, ছেলেমেয়ের ঘুস ঘুসে জ্বর, সর্দ্দি পেটের অসুখ লেগেই আছে, আমাশা বা Typhoidও হচ্ছে কিন্তু তাতে ত সাত পাঁচীল তোলা পর্দ্দা ঘেরা অন্তঃপুরে জননী দলের সমাজের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষার কোন বাধা পাচ্ছে না।

আবর্জ্জনা রাখার জন্য না হয় একটা পুরোণো মেটে হাঁড়ীই সরাচাপা দিয়েই রাখ্‌তে বল—কর্ম্মিষ্ঠা তারা ঘর ঝাঁট দিয়ে তরকারী কুটে সেই খানেই গিয়ে সব জঞ্জাল ফেলে আস্‌বে তারপর সুযোগ মত রাস্তার dust bin তাদের পৌঁছে দেওয়াবে।

ট্রেণে যেতে দেখেছি কত বাংলা দেশের অন্তঃপুরে বৌ—ঘরের পাশের পায়খানাতে কোলের বাছাকে নিতে পারেন না শুচিতা নষ্ট হবার ভয়ে কিন্তু বাছাকে যেখানে বসে আছেন সেই খানেই মলমূত্র ত্যাগ কর্‌তে বলেন ও করান।

নিজের বসবার জায়গাটাকে পায়খানায় পরিণত করায় শুচিতা নষ্ট হয় না—যেখানটায় ঐ সব কাজকরা উচিত সেখানটায় গেলে শুধু যত দোষ।

"বুকভরা মধু, বঙ্গের বধু" বাংলা দেশের মেয়ে আমরা আমাদের যেমন স্নেহ কোমল মায়ের প্রাণ—তেমন নাকী আর কোনও জাতের নাই—তাইতেই তো আমরা এমন প্রেমের ব্যবহার করি যে আমরা সন্তানের রোগটা আমার পড়্‌শীর সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। হায় শুচিতা হায় প্রেম। এমনি করে তোমাদের অপমান প্রতিদিনই হয়ে যায় সে কার দোষে? এও কি বিদেশী শিক্ষার ফল? আজ সমাজ; তাই বসে বসে ভাবী তোমার দাবী আমরা কেমন করে মেটাবো—শুধু সতী স্ত্রী হয়ে না বুদ্ধিজীবি মানুষ হয়ে প্রতিভার তুমি দাবী করনা বটে আমাদের কাছে—কিন্তু যে প্রেমের তুমি দাবী কর্‌ছ সে কি বুদ্ধি কিরণ সম্পাতে উজ্জ্বল নয়? যে পবিত্রতা তুমি আকাঙ্ক্ষা কর্‌ছ তাকে কি মনুষ্যোচিত বিচার বিবেচনার দ্বারা বুঝে ভাববেসে গ্রহণ কর্‌তে বল না?

বিচার বিবেচনা কর্ব্বার দাবী আমরা করে বস্‌লাম তোমার কাছে এই বলে যে তা হ'লেই তোমার দাবী আমরা মিটাতে পারব—তুমি আমাদের সুযোগ দাও।

সোণার বাংলা। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

নারীর স্বাবলম্বন।

—:o:—

সর্ব্বং আত্মবশং সুখং একথা যে নারীর বেলাও প্রযোজ্য এই কথাই আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই, এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যে আমরা কতরূপেই করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় আমরা নারী জাতি স্বাবলম্বনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব। স্বাবলম্বিনী হইতে পারিলে বিপদে নির্ব্বাক ও পঙ্গু রহিয়া মানুষ হিসাবে মৃত আখ্যায় ভূষিত হইতে হইবে না, আমরা জ্যান্ত হইয়া দেহ ও মনের জোরে লাঞ্ছনা হইতে নিজেদের সম্মান ও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব। আমাদের মধ্যে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি আত্মনির্ভরশীলা নারীদের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যে যে দেশের পুরুষ তাহার মা বোনের রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে, সে দেশে এইরূপ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পৌরুষ সম্পন্ন নারীর জন্মগ্রহণ ঘোর সংরক্ষণবাদীদেরও সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না। যদি এরূপ দুর্দ্দশা নাও হইত তথাপি আমাদের নারীকে স্বাবলম্বনের সহায়ে সমস্ত জগতে পরিভ্রমণ করিতে বলিতাম, এখন ত বলিবই।

আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য যেমন দেহের পরিপোষণের আবশ্যক মনের পরিপোষণের নিমিত্ত তেমনই স্বাবলম্বনের আশ্রয় অবলম্বনীয়। এই স্বাবলম্বনের অভাবেই হিন্দু বিধবারা দুমুঠো ভাতের জন্য অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহিয়া থাকে। আজ ছেলেদের কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই সময় নারীরাও যেন ঐ শিক্ষার সকল রকম সুযোগ ও সুবিধা পায়। সময়ের সদ্ব্যবহারের সুবিধা পাইয়া হিন্দু বিধবারা যদি নিজেদের

ভরণপোষণের উপায় বিধান করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া সর্ব্ববিধ নির্য্যাতনে নিস্পন্দ রহিয়া তাহাদের আর আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না। বিধবাদের শিক্ষা পাইবার অবসর জোটে, নিজেদের যত্ন ও চেষ্টায় এই অবসর সময়ে তাহাদের স্বতন্ত্র হইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে।

স্বাবলম্বন সধবা বিধবা সকলেরই মেরুদণ্ড হইবে। ইহার বলেই তাহাদের ঋজু হইয়া কর্ম্মজগতে বিচরণ করতঃ স্বহস্তে স্বীয় প্রয়োজনের সংস্থান করিতে হইবে। নিজেদের বিষয় নিজেদেরই ভাবিতে হইবে, পুরুষের উপর বরাত দিলে চলিবে না। এই জন্য নারীর মধ্যে চিন্তা করিবার শক্তির জন্ম দিতে হইবে, তাহাদের ভাবিবার সময় জুটাইয়া লইতে হইবে।

আমরা নারীদের সর্ব্ব বিষয়ে স্বাবলম্বিনী হইতে বলিয়া পুরুষের বিদ্বেষ-পরায়ণা হইতে বলি না, কারণ বিদ্বেষ মাত্রই মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী—আমরা কেবল নারীদের নিজের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এবং দেহ ও মনে তদুপযোগিনী বলিষ্ঠা হইতে বলিতেছি। মতামত দিবার উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। নিজেদের ভালমন্দ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও ভাবিয়া চিন্তিয়া মত প্রকাশ করিবার নির্ভীকতা আনিতে হইবে।

নারীর শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহার মীমাংসার জন্য সকল নারীদেরই মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। নারীর উপর চাপান-শিক্ষা চুপটি করিয়া ভালমানুষের মত মানিয়া লইলে চলিবে না। নারীদের শিক্ষা নারীরাই ঠিক করিবে, কারণ তাঁহারা নিজেদের অভাব যতটা বোঝেন পুরুষের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই।

দৈনন্দিন সকল বিষয়েই নারীর বিশিষ্ট মত পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আর এক জনই তাহার জন্য ভাবিবে, আর একজনের মধ্যে অস্তিত্ব বিলীন করিয়াই তাহাকে গড়িয়া উঠিতে হইবে এ আদর্শ আমাদের চিন্তার ও জীবনে কতই না অবসন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। এই জড়তা ও অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত নারীর মধ্যে স্বাবলম্বনের বীজ উপ্ত করিয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব জাগাইয়া তুলিতে নারীজাতির মহাসাধনা করিতে হইবে।

নিজেদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং দেহ ও মন তদুপযোগী গড়িয়া উঠিলে নানারূপ কৃত্রিম বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে না। কুসংস্কারের

বেড়া জালে অনায়াসেই নিজেদের ধরা দিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আদর্শের জন্য প্রাণপাত না করিয়া মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়াই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সাহস জাগিবে। জীবন-যুদ্ধে নামিয়া নানা দিক হইতেই শক্তি ও সাহস সঞ্চিত হইতে থাকিবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারী-সমাজের সঙ্গে পরিচয় লাভও সহজ হইয়া আসিবে। ভারতের নারী আর চির নাবালিকা না রহিয়া বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রসর-বাদিনীদের নিকট "সাহস বিস্তৃত বক্ষপট" দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে এবং নারীর বিভিন্নমুখীন উন্নতির সম্পর্কে তাহাদেরও বলিবার অধিকার জন্মিবে।

বিজলী

শ্রীঅমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খোকার ঘুমন্ত মুখের হাসি।

—:-*-:—

১

মেঝের উপর ঘুমিয়ে আছে
হেসে আমার খোকা,—
জাগন্ত কি ঘুমন্ত মুখ
লাগ্‌চে বড় ধোঁকা।
হিমপ্রভাতে আকাশ কোলে
বুঝি অরুণ-রশ্মি দোলে,
মরি, অধর রাগে ফুটে যে গো
গোলাপ থোকা থোকা

২

মেঝের উপর ঘুমিয়ে আছে
হেসে আমার খোকা,
রঙের লীলায় নেতিয়ে পড়ে
নিথর এ কোন্ পোকা !
দেবশিশুরা খেলচে সাথে
হাত এনে ওর কোমল হাতে,
ওর ঠোঁটের ভাষা বল্‌চে যেন—
'একলা ত নয় দোকা' !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রাজতরঙ্গিনী।

—:০:—

প্রথম তরঙ্গ।

(অনুবাদ)

কাশ্মীর রাজ্য সুউচ্চ শৈল শিখরে পরিবেষ্টিত; উহা মহা পরাক্রান্ত সৈন্য দ্বারাও বিজিত হইবার নহে। কাশ্মীরবাসী, পারলৌকিক ত্রাস ব্যতীত, অন্য ত্রাস কাহাকে বলে, তাহা অবগত নহে। শীত ঋতুতেও তাহারা উষ্ণসলিলা নদী অবগাহনসুখ উপভোগ করে; গ্রীষ্মে, সলিলস্নাত সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া নদীতটবাসীদিগকে সুখ প্রদান করে। কাশ্মীরের নদী সকল সর্ব্বদা স্থির, প্রশান্ত, ভীষণ জলজন্তু তাহাতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কাশ্মীর কাশ্যপ স্থাপিত দেশ, কশ্যপ (সূর্য্যদেব) তাঁহার মহিমা প্রচার করিবার জন্যই যেন

তথায় নাতিউষ্ণ কর বিতরণ করেন। বিশাল বিদ্যা মন্দির, জাফরাণ, বরফ-বারি ও আঙ্গুর ফল, স্বর্গ রাজ্যেও যদিচ দুর্লভ, তথাপি উহা কাশ্মীরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ত্রিজগতের মধ্যে কৈলাস উৎকৃষ্ট স্থান; কৈলাসের মধ্যে হিমালয় উৎকৃষ্টতর, কাশ্মীর আবার হিমালয়ের উৎকৃষ্টতম প্রদেশ।

অতি আদিম কাল হইতে কাশ্মীর রাজ্যে নিম্ন লিখিত দেবমূর্ত্তি ও পুণ্যকীর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়:—

কাশ্মীরের দারুময় মহাদেবের মূর্ত্তি; বারেক মাত্র মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারিলে অক্ষয় দিব্যলোক লাভ হয়।

কাশ্মীর শৈলে মন্দাকিনী পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া সায়ংকালে, প্রবাহিতা হন। পুণ্যাত্মা তাহা প্রত্যক্ষ করেন, পাপীর চক্ষে তাহা পতিত হয় না।

অগ্নির সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ব্রহ্মা স্বয়ং ধরাবক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া বনানী সকল ধ্বংস করেন।

দেবীভঙ্গ পর্ব্বতস্থ হ্রদবক্ষে দেবী সাবিত্রী হংসরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করেন। গঙ্গাদেবী তথা হইতে প্রবাহিতা হইতেছেন।

নন্দীক্ষেত্রে দেবারাধিত চন্দন চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নন্দীক্ষেত্রে দুর্গা মূর্ত্তি আজিও বিরাজিত। তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইলে মানব দিব্য বাক্‌শক্তি ও অনুপম কবিত্ব লাভ করে ও পরকালে স্বর্গ ভোগের অধিকারী হয়।

কাশ্মীর দেবাদিদেব চক্রবৃত্ত, বিজয়েশ, আদি-কেশব ও ঈশানের অধিষ্ঠান স্থান। কাশ্মীর দেবালয়ে পরিপূর্ণ।

কাশ্মীর রাজ্যের রাজকাহিনী কাশ্মীরের তৎকালের গৌরবগাথা বা কলঙ্ক বার্ত্তা যাহাই প্রচার করুক, আমি তাহার যথাযথ সত্য বিবরণ প্রদান করিব। এই গ্রন্থে কাশ্মীরের আদি অবস্থা ও রীতি নীতির বহু তথ্য বিবৃত হইবে; সুধীগণ কি তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন না? অনিত্য মনুষ্য-জীবন-ইতিহাস চিন্তা করিলে রাজ্যের গৌরব আপনি প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। অতএব সুধীগণ, কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের এই সুললিত জীবন ইতিহাস শ্রবণ করুন।—

ষড়কল্প হইতে ছয়টী মন্বন্তর ধরিয়া ধরা বারি-নিম্নে নিমজ্জিতা ছিলেন ; হিমালয় তন্মধ্যে বিরাজিত ছিলেন। বর্ত্তমান বিবস্বতকল্প উপনীত হইলে মহাপ্রাণ কাশ্যপ স্বর্গ হইতে দেবতাকে আহ্বান করিয়া আঘাত দ্বারা পৃথিবীকে জলোপরি উত্থিত করিলেন—এইরূপে কাশ্মীর রাজ্যের সৃষ্টি হইল। তৎপর নীল, নাগাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজছত্রে নাগচিহ্ন শোভা পাইত। নাগাদিগের বহু সম্প্রদায় কাশ্মীরে বাস করিত। তাহাদিগের ধনরত্নাদি কুবেরের ধনরত্নের তুল্য ছিল। আদি রাজ নীল নাগাগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার দেড় হস্ত পরিমিত একটি দণ্ড ছিল। তাঁহার মস্তকোপরি রাজছত্র শোভা পাইত। তিনি একটি 'কুণ্ডে'র অধিকারী ছিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী কালের কাশ্মীরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। কলিযুগের প্রথমে, প্রথম গোনন্দের রাজ্য কালের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাগণের বিষয় কিছুই অবগত হইবার উপায় নাই। গোনন্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ও পাণ্ডবশত্রু জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। জরাসন্ধ গঙ্গাবিধৌত কাশ্মীরের এই মহাপ্রতাপশালী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী মথুরা আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। গোনন্দ ও জরাসন্ধের যুক্ত সেনাদল মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া যমুনা পুলিনে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ মহা ভীত হইয়াছিল। প্রথমবারে কেশব সৈন্য গোনন্দের পরাক্রমে পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল কিন্তু মহাবল বলরাম উপস্থিত হইয়া পুনঃ সৈন্য সমাবেশ করিলেন ; উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল ; বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা বহুকাল সংশয়ের বিষয় ছিল ! পরিশেষে গোনন্দ বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীরক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদল জয়শ্রী লাভ করিল।

দামোদর পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু কাশ্মীরের ন্যায় সৌন্দর্য্যময় রাজ্য লাভ করিয়াও তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার গর্ব্বিত অন্তঃকরণ, পিতৃহন্তার নির্য্যাতনচিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। এই সময়ে গান্ধার রাজ তাঁহার কতিপয় কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার আত্মীয়গণ সহ বিবাহিত করিবার মানসে নিমন্ত্রণ করিলেন। সিন্ধু তীরে স্বয়ম্বর মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল, এতদুপলক্ষে মহা সমারোহের আয়োজন হইল। দামোদর

বহু অশ্বসৈন্য সমভিব্যাহারে উৎসব ব্যর্থ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; শত শত গান্ধার নিহিত হইল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে দামোদর জীবন হারাইলেন।

দামোদরের রাণী শ্রীমতী যশোবতী গর্ভাবতী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণে ঈর্ষাপরায়ণ মন্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের এ কার্য্যে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ হইতে শাস্ত্রীয়প্রমাণ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন কাশ্মীরের কুমারীগণ পার্ব্বতীর অংশ ; কাশ্মীরের রাজন্যবর্গ মহাদেবের বিভূতি। ঘোর সংসারী ও পাপাত্মাদিগের, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া মহাপাপ অর্জ্জন করা উচিত নহে। মনুষ্য আপনার স্ত্রীর মূল্য অনুধাবন করে না কিন্তু প্রজাগণের উচিত তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে মা ও দেবীর ন্যায় অবলোকন করে।"

যথা সময়ে রাণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ইনি একটি নির্ব্বাপিত বংশের অবতংস। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বালকের জাতউৎসব সুসম্পন্ন করা হইল ও তিনি রাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। উপযুক্ত সময়ে বালকের পিতামহের নামানুযায়ী দ্বিতীয় গোনন্দ নামে তিনি অভিহিত হইলেন। বালকের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত হইলেন ; একটি তাঁহার মাতা, তিনি বালককে স্তন্য পান করাইতেন, অপর ধাত্রী তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিত। বালক যাহাদিগকে দেখিয়া হাসিত, তাঁহার পিতৃ মন্ত্রীগণ তাহাদিগকে (সৌভাগ্যবান মনে করিয়া) অর্থ দান করিতেন। শিশুর হাসি যে অর্থহীন, তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিতেন না। মন্ত্রীগণ মধ্যে যদ্যপি কেহ রাজার শিশুসুলভ বাক্যকাকলি বুঝিতে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তিনি লজ্জিত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা শিশুকে তাহার পিতৃ সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতেন—তাঁহার পদদ্বয় পদপদ্মাসনে স্থাপিত হইত ; শিরোপরে চামর ব্যজিত হইত। শিশুরাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সমক্ষে প্রকৃতিবর্গের বিচার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইত। এই সময়ে কুরুপাণ্ডবের মহাসমর উপস্থিত হয়। কিন্তু গোনন্দ রাজ অতি শিশু ছিলেন বলিয়া কোন পক্ষই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

গোনন্দ রাজের পর ৩৫ জন রাজার ইতিহাস বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী রাজা লব। লব মহা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার সৈন্য অসংখ্য ;

তিনি তাহাদের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে; তাঁহার সৈন্যগণের চীৎকার ধ্বনিতে রজনীতে অধিবাসীবর্গের নিদ্রা হইত না, শত্রুগণ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইত। তিনি গোলয়া নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন। এই নগরীতে ৮৩ লক্ষ প্রস্তর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে লিদারী প্রদেশস্থ লিভার গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যান।

তাঁহার পর তদীয় পুত্র কুশেষ্য সিংহাসনে অধিরুঢ় হন। তিনিও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। কুশেষ্য কুরুহর নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র খগেন্দ্র অতি সাহসী ও সহিষ্ণু রাজা ছিলেন। নাগাগণ তাঁহার শত্রু। তিনি বহুনাগা বিনষ্ট করেন। তিনি খাগীখুন ও মুসা নগরী স্থাপন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র নির্ভীক, অতি পবিত্র স্বভাব ও নম্র নৃপতি। তিনি দারাতের সন্নিকটে সৌরনগরী স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে একটি সুরম্য রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করান—এই প্রাসাদের নাম 'নরেন্দ্র ভবন।' তিনি অপুত্রক ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর গোধর নামক, অন্য বংশীয় অপর একজন রাজা হন। তিনি হস্তীশালা নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যান।

তৎপর তাঁহার পুত্র সুবর্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি দানশীল নৃপতি ছিলেন; তিনি ভিক্ষার্থীদিগকে সুবর্ণ দান করিতেন। করলা প্রদেশে তিনি সুবর্ণমণি নামক খাদ খনন করান।

তাঁহার পুত্র জনক প্রজাবর্গের জনক স্বরূপ ছিলেন। তিনি বিহার ও জলধর নির্ম্মাণ করান।

তাঁহার পুত্র শচীনর। শচীনর ক্ষমাশীল ও মহাত্মা নৃপতি। শচীনর সমাঙ্গশাসনর ও রাজগ্রহর নির্ম্মাণ করান। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

শচীনরের পর মহাত্মা অশোক কাশ্মীরের অধিপতী হন। তিনি শকুনীর প্রপৌত্র ও শচীনরের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্র। অশোক সত্যবাদী ও নিষ্কলঙ্ক রাজা ছিলেন। তিনি

বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী। তিনি বিতস্তা তীরে (ঝিলম) শুষ্কক্ষেত্রে পর্ব্বতোপরি বহুশতস্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। তিনি ধর্ম্মারণ্যের প্রান্তদেশে এরূপ একটি সুউচ্চ চৈত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন যে উহার মস্তকদেশ দৃষ্ট হইত না। তিনি শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠাতা; শ্রীনগর ৯৬ লক্ষ সুরম্য প্রাসাদে পরিশোভিত ছিল। তিনি শ্রীবিজয়েশের পতনোন্মুখ প্রাচীরপ্রকার নির্ম্মূল করিয়া তৎস্থানে সুদৃঢ় শৈলপ্রাকার নির্ম্মাণ করান ও শ্রীবিজয়েশের মন্দিরের চত্বর মধ্যে আরও দুইটী প্রাসাদ প্রস্তুত করান ইহার একটির নাম অশোক ও অপরটির নাম ঈশ্বর। তাঁহার রাজ্য কালে ম্লেচ্ছগণ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু তখন তিনি ধন সম্পদে বিতস্পৃহ হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; ঈশ্বর চিন্তায় তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

অশোকের পুত্র জলক; জলক বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ও শিববরে সিদ্ধ ছিলেন। জলক ম্লেচ্ছগণকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিয়া পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাবত্তার বিবরণ শ্রবণ করিয়া দেবতারাও স্তম্ভিত হইতেন। যদ্যপি কোন স্বর্ণগোলক সলিলে নিক্ষিপ্ত হইত তিনি তাহাও শর-বিদ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি সলিলমধ্যে অবস্থান করিবার বিদ্যা (যোগবল) অবগত ছিলেন। তিনি এই বিদ্যাবলে যৌবন সম্পন্না নাগ কন্যাগণের পতি হইয়া ছিলেন। তিনি মহাদেবের ত্রিমূর্ত্তি—বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠের উপাসনা করিতেন। ভিন্ন দেশ-বাসীদিগকে (ম্লেচ্ছগণ) পরাজিত করায় তাঁহার অত্যন্ত সুনাম হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে স্বরাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া একটি স্থানে তিনি তাঁহার কেশ বন্ধন করিয়াছিলেন—অদ্যাপিও এই স্থান 'উজ্জটা ডিম্ব' নামে অভিহিত।

ম্লেচ্ছগণকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি অন্যান্য দেশ জয় করিতে মনোযোগী হইলেন। কান্নুজ জয় করিলেন। কান্নুজ হইতে চতুর্বর্ণের, প্রতি বর্ণের কতকগুলি লোক আনয়ন করিয়া কাশ্মীরে স্থাপন করিলেন। ইহারা সকলেই ধর্ম্মবেত্তা, আইনজ্ঞ ও স্ববর্ণ ধর্ম্মপরায়ন ছিলেন। জনকার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কাশ্মীরের অবস্থা হীন ছিল; শাসন কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইত না। তিনি উপযুক্ত শাসন পদ্ধতি প্রচলন করিবার মানসে, সাতটী

নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন। এই পদসপ্ত যথাক্রমে, প্রধান বিচারপতি, প্রধান রাজস্ব সচিব, ধন রক্ষক, রাজদূত, প্রধান পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও সেনাপতি নামে অবিহিত হইত। রাজা, দ্বার ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশের শাসন ভার তদীয় রাজ্ঞী ঈশান দেবীর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অষ্টাদশটী উপাসনালয় স্থাপিত হয়। বরভল্ল ও অপর কয়েকটি স্তম্ভ তিনি নির্ম্মাণ করান। রাজা প্রতিদিন নন্দী পুরাণ শ্রাবণ করিতেন। বশ্যের জনৈক শিষ্য পুরাণ আবৃত্তি করিত। শ্রীনগরের জ্যেষ্ঠ রুদ্রদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত; এতদ্ব্যতীত তিনি সোদর দেবের অর্চ্চনা করিতেন।

কথিত আছে, একদা বিজয়েশ্বরের মন্দিরে গমন কালে, পথি মধ্যে রাজার একটী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়; রমণী তাঁহার নিকট কিছু খাদ্য যাচ্ঞা করিল। তিনি তাহাকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে খাদ্য ইচ্ছা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, সহসা রমণী কদাকার রূপ ধারণ করিয়া নরমাংস প্রার্থনা করিল। তাহার এই অস্বাভাবিক ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য রাজা নরহত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া, নিজ শরীর হইতে তাহার প্রয়োজনীয় মাংস গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহার সেই বীরোচিত আত্মত্যাগ দেখিয়া রমণী যেন বিচলিতা হইল ও বলিল আপনি দ্বিতীয় বুদ্ধ'—পরের প্রাণের জন্য এত মায়া অন্য কাহারও নাই।' রাজা শিব উপাসক তিনি বুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ,তুমি আমাকে দ্বিতীয় বুদ্ধ বলিয়া সম্বোধন করিলে—বুদ্ধ কে?"

রমণী তাহা বলিতেই আসিয়াছেন; তিনি বক্তার ন্যায় অতি তেজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন। সৌরকরহীন লোকালোক পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে কীর্ত্তিকা জাতির বাস। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে ভজনা করেন। এই জাতি রোষ কাহাকে বলে জানে না—শত্রু মহা অনিষ্ট করিলেও ক্ষোভ করে না, লুণ্ঠনকারীকেও ক্ষমা করে ও তাহাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা পায়। তাহারা সকলকে সত্য মাহাত্ম্য শিক্ষা দেয়, জ্ঞানালোক প্রদান করে; পৃথিবী মহা অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাহা বিদূরিত করাই তাঁহাদের কার্য্য। কিন্তু আপনি ইঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। আমাদিগের এই দেশে একটি মন্দিরের ঢক্কা ধ্বনিতে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আপনি দুষ্টবুদ্ধি ব্যাক্তিগণের কুপরামর্শে এই মন্দিরটি ধ্বংস করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধারণ ইহাতে রাগান্বিত হইয়া আপনার বিনাশ করিতে আমাকে

প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু আমাদিগের পুরোহিতপ্রবর সে সংকল্পের অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলিলেন যদি আপনি (রাজা) আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া আপনার স্বর্ণ দ্বারা উক্ত মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে মন্দির ভগ্ন জনিত পাপ হইতে আপনি মুক্ত হইবেন। হে মহারাজ! সেই জন্যই আমি ছদ্মবেশে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজাকে মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া কীর্ত্তি দেবী স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎস্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন।

রাজা নন্দীক্ষেত্রে শিব ভূতেশের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইলেন। তাঁহার শেষ জীবন ভগবৎ চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছিল। কনকবাহিনী নদীতীরে 'চির-শ্মশান' ক্ষেত্র; রাজা এই স্থানে তিন রাত্রব্যাপী পূজা উৎসব করেন। এতৎ উপলক্ষে রাজপরিবারের এক শত নারী জ্যেষ্ঠ-রুদ্র সমক্ষে নৃত্য গীত করিয়াছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিলেন। তিনি ও তাঁহার রাজ্ঞী চির-শ্মশান ক্ষেত্রে জীবনলীলা শেষ করেন।

দ্বিতীয় দামোদর তৎপরে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অশোক রাজের বংশধর বা অন্য রাজ বংশের তাহা অবগত হওয়া যায় না। দামোদর অতিশয় ধনী ছিলেন। তাঁহার গৌরব গাথা অদ্যাপি গীত হয়। তিনি কাশ্মীরের পার্শ্ববর্ত্তী যক্ষরাজ 'কুবেরকে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটি জলাকীর্ণ প্রান্তরোপরি সেতু নির্ম্মাণ করান। স্বয়ং তথায় একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া দামোদরসূধা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিবর্গের হিতকল্পে একটি অসাধারণ কার্য্য করিয়া যাইবার মানসে তিনি বন্যার গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য জলাভূমির চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ শৈল প্রাকার (বাঁধ) নির্ম্মাণ কার্য্যে যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার সে সংকল্প সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। একদা রাজা শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বে স্নানার্থ নদীতে গমন করিতেছিলেন; কতিপয় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া নদী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ যোগ প্রভাবে রাজচরণ সমীপে নদী আনয়ন করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, এই যে বিতস্তা।

এখন আমাদিগকে আহারীয় প্রদান করুন।" রাজা ইহাকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া সন্দেহ করিয়া বলিলেন, 'এক্ষণে আপনারা অন্যত্র গমন করুন; আমি স্নানাদি সমাপন না করিয়া আপনাদের ভোজন করাইতে পারিব না।' ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে 'সর্প হও' বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। রাজা অভিশাপগ্রস্ত হইয়া কাকুতি মিনতি করায় ব্রাহ্মণগণ বলিলেন 'তুমি যদ্যপি দিবামানে পবিত্র রামায়ণের আদি অন্ত শ্রবণ করিতে পার, তবে শাপ মুক্ত হইয়া মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইবে।' অদ্যাপি তাঁহাকে তৃষ্ণার্ত্ত সর্পরূপে দামোদর সুধায় বিচরণ করিতে দেখা যায়! ঋষিগণের অভিসম্পাত দানের শক্তিকে শত ধিক্কার। এরূপ একটি সদাশয় নৃপতি তাঁহাদের অভিশাপে বিনষ্ট হইলেন! শত্রুগণ নির্জ্জিত যশঃ গরীমা কালে হয় ত পুনঃ প্রাতষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু হায়! ব্রাহ্মণের অভিশাপে যিনি বিলুপ্ত হইলেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না!

দমোদরের পর, হুষ্ক. যক্ষ ও কনিষ্ক নামক তিনজন রাজা কাশ্মীরে একত্র রাজত্ব করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামানুকরণে তিনিটী রাজধানী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত যক্ষরাজ 'জয়স্বামীপুর' নাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা—তিনি আরও একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করান। রাজাগণ যদিও তুরস্কবংশসম্ভুত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা শুষ্কলেত্র নামক সমতল ক্ষেত্রে বহু উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের রাজ্য কালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ সন্নাসীগণ প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রতিহত ভাবে তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর লোকধাতুর এই আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত ১৫০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠনাম বৌদ্ধিষ্ঠত নাগার্জ্জুন কাশ্মীরের বনমধ্যে (একাধি ক্রমে) ছয় দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন।

তৎপর অভিমন্যু রাজত্ব করেন। শত্রু বলিতে অভিমন্যুর কেহ ছিল না। তিনি কাস্তকোষ্ঠ নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন; একটি শিব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেব পীঠোপরি তাঁহার নাম খোদিত করাইয়াছিলেন। তিনি এক নগরী স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুযায়ী তাহার নাম অভিমন্যুপুর রাখিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্য্যপ্রমুখ পণ্ডিতগণ অবির্ভুত হন ও তাঁহার অনুমত্যানুসারে রাজ-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এদিকে নাগার্জ্জুনের অধিনায়কত্বে বৌদ্ধগণ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে

লাগিলেন। তাঁহারা শৈব মতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাজিত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, নীল পুরাণোক্ত পূজা পার্ব্বণ, উৎসবাদি দেশ হইতে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। নাগগণ ইহাদের ব্যবহারে উত্তপ্ত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন; পর্ব্বত শিখর হইতে বরফখণ্ড গড়াইয়া দিয়া বহু বৌদ্ধ ধর্ম্মীকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ও অসীম উদ্যমের সহিত পুরাণোক্ত উৎসবাদি বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজা অশান্তিময় যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে দূরে থাকিবার মানসে দর্ভবিসারে গমন করিলেন। অবশেষে কাশ্যপ বংশ সম্ভূত পুণ্যশ্লোক চন্দ্রদেব মহাদেবের আরাধনায় (মহাদেবের বরে) সিদ্ধ হইয়া অশান্তির শেষ করিলেন। তিনি বরফ ক্ষেপণ বন্ধ করিয়া দিলেন; নীল পুরাণ উক্ত পূজাআদি পুন প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পুণ্যাত্মা পুর্ব্বেও একবার যক্ষগণকে হত্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় গোনন্দ তাঁহার পর রাজা হইলেন। গোনন্দ সিংহাসনারুঢ় হইয়া নীল পুরাণ ব্যবস্থিত উৎসবাদির বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়া নাগ জাতিকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং দুর্ম্মতি বৌদ্ধগণ যাহাতে নির্জ্জিত না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা হইল। তিনি অতি সদাশয় ও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন; তিনি কাশ্মীর রাজ্যে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। সূর্য বংশের রামচন্দ্রের ন্যায় তিনি তাঁহার বংশের প্রধান নরপতি। প্রকৃতিবর্গের পূণ্যফলে সদাশয় নৃপতিগণ অবতীর্ণ হন; তাহাদের সৌভাগ্য বলে রাজ্যের পরহস্তগত অংশ সকল পুন অধিকৃত হয়। যে রাজা প্রজাপীড়ন করেন তিনি রাজ্যের ধ্বংশের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; যিনি প্রজাপালন করেন তাঁহার উন্নতির অবধি থাকে না। এই রাজার ইতিহাস পাঠ করিলে সুধীগণ ভবিষ্যত রাজন্যবর্গের উন্নতি অবনতি স্থির করিতে পারিবেন। সুযশা গোনন্দ ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্য।

আজকাল এই নব জাগরণের যুগে আমরা অনেকেই দেশের কথা ভাব্‌ছি, কিন্তু আমাদের এই ভাবাটা, আমাদের চিন্তা কোন পথে চলেছে তা' সুস্পষ্ট হয়ে' উঠ্‌ছে না। ভাববার নেশা আমাদের চেপে ধরেছে সন্দেহ নাই কিন্তু অন্যান্য সকল নেশারই মত এ নেশাও আমাদের চোখ খুলে দিচ্ছে না, বরং মুদিয়ে রাখতেই চেষ্টা করছে। দেশব্যাপী নানা আন্দোলনের ফলে প্রাণে আমাদের টনক্ লেগেছে কিন্তু সে আঘাত এখনও আমাদের মাথায় গিয়ে পৌঁছায় নাই তাই কথার বোঝা বাড়ছে—কাজ কিছুই হচ্ছে না। দেশের সকল অবস্থা শান্ত মনে বিচার করে ব্যবস্থা কি হতে পারে—তারই একটা সুসমঞ্জস ও সঙ্গত চেষ্টা দেশের লোকের মাঝে এখনও দেখা দেয় নাই।

জীবনের সব চাইতে বড় প্রশ্ন বা সমস্যা "বেঁচে থাকা"—"আত্মরক্ষা।" এ সমস্যা যে কত বড় ইতিহাস খুঁজলেই তার উপলব্ধি হয়। কালের গতিতে জগতের কত জাতি যে মরে গেছে—তার সংখ্যা নাই—কেন মর্‌ল এ প্রশ্নের উত্তরে সে একই কথা,—বেঁচে থাকবার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না, আত্মরক্ষার শক্তি তাদের লোপ পেয়েছিল। দেশের দিকে স্থির মনে তাকালেই আমাদের অবস্থাটাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিছুদিন পরে আমরাও—এ বাঙ্গালী জাতিটাও যে লুপ্ত জাতির ইতিহাসের একটা অধ্যায় অধিকার করে বসব—আর সে দিনটাও যে খুব বেশী দূরে নয় দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। আমাদের প্রাণের গতি মুমূর্ষের নাড়ীর স্পন্দনের মত ধীরে ধীরে চলেছে।

জনসম্পদই জাতির প্রধান সম্পদ। আমরা ক্রমশঃই এই জনসম্পদেই হীন হয়ে পড়েছি। বছরের পর বছর যাচ্ছে, মৃত্যু তার বিষাণ বাজিয়ে কত জীবন ওপারে নিয়ে যাচ্ছে তার সংখ্যা কে করে। যে শিশু সন্তানের জন্মে বাঙ্গালীর দুঃখ দৈন্যগ্রস্ত আঁধার কুটীরে হাসির উজ্জল

আলোক ফুটে উঠত সে শিশু সন্তান আজ ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল তুলে শ্মশানের পার্শ্বে শয্যা পেতে নিচ্ছে—এ কি কম অভিশাপের কথা। যে দেশে জন্মের হারের চাইতে মৃত্যুর হার বেড়ে চলে, তার যে কাল শেষ হয়ে এসেছে এ কথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করবেন না। গত কুড়ি বৎসরের হিসাব খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে মৃত্যু সংখ্যা হতে জন্ম সংখ্যা যতটা অধিক ছিল বৎসর বৎসর সেই আধিক্যের হার ক্রমশঃই কমে আসছে—আমরা কোন মনগড়া তালিকা প্রস্তুত করে' এটা প্রমাণ করব না—আমাদের সরকার বাহাদুরের রিপোর্টই আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবে।

প্রথমতঃ আমরা প্রতি দশবৎসরের হিসাব দেব ১৯০১ হতে ১৯১১ পর্যান্ত দশ বৎসরে এ দেশে জন্ম হয়েছিল ১৫৭৯৭৩৪৪ এবং মৃত্যু হয়েছিল ১৩৭২৮২৯৯। মৃত্যু হতে জন্ম সংখ্যা ২০৬৯০৪৮ এত বেশী এ হিসাবে উক্ত দশ বৎসরে আমাদের বাংলাদেশে মোট ২০৬৯০৪৮ এত লোকসংখ্যা অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৫৬৭ জন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার পরবর্ত্তী দশবৎসরে (১৯১১—১৯২১ পর্য্যন্ত), সরকারী রিপোর্ট হতে জানা যায় যে জন্মসংখ্যা ১৪৮৬০২৫৭ ও মৃত্যুসংখ্যা ১৪০০১৬৭৭। জন্মসংখ্যা হতে মৃত্যুসংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে বিগত দশবৎসরে—৮৫৮৫৮০ জন মাত্র আমাদের জন্মসংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছি এ হিসাবে প্রতিদিনের বাড়তি সংখ্যা ২৩৫ দাঁড়ায়। উপরের—অঙ্ক গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ও তুলনা করলেই জাতির অবস্থা কোন পথে চলেছে, উন্নতির না ধ্বংশের পথে তা' সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ দেখতে পাওয়া যায় যে জাতির-উৎপাদিকা-শক্তি কমে আসছে অথবা—মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ—দৈনিক হিসাব অনুসারে প্রথম দশ বৎসরে যত জন করে প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল—দ্বিতীয় দশবৎসরে তার চাইতে অনেক কমে গেছে, প্রায় ৫ ভাগের ২ ভাগ হয়েছ। এ কি ভয়ের কথা?

তারপর—১৯২০ ও ১৯২১ সালে—বাঙ্গালীর মৃত্যুসংখ্যা ১৪৮১৬১২ ও ১৪০৩০৩০ আর জন্মসংখ্যা ১৩৫৯৯১৩ এবং ১৩০১০০১, দুই বৎসরেই জন্মসংখ্যা হইতে মৃত্যুসংখ্যা বেশী, এত যে—দৈনিক হিসাবে প্রতিদিন ৩০৬ জন করে কমে যাচ্ছে আর কোনও অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা—আমাদের অবস্থার শোচনীয়তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব না। যারা বোঝবার তাদের পক্ষে ঐ যথেষ্ট। আর যারা না বুঝবার তারা কর্ত্তৃপক্ষের মত উপরের—অঙ্কগুলিকে অবিশ্বাস্য

মনে করতে চেষ্টা করবেন স্বায়ত্ত শাসনের ফলে আমাদের হাতে যে ক্ষমতা এনেছে সে ক্ষমতার ব্যবহার না করে আমরা আজ গেয়ে বেড়াচ্ছি যে উপরের অঙ্কগুলি ভুল, এই ভুলের জন্য—বিশেষ করে দায়ি করছি মিউনিসিপাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির দিক দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তার প্রধান কর্ত্তব্য অবধারণ করেছেন যে Vital statistics মৃত্যুর তালিকা বিশেষ যত্ন সহকারে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যাক ও সব কথা—এখন প্রশ্ন হল—আমাদের জাতীয় জীবনের এ দুর্দ্দশার কারণ কি? নানা মুনির এ বিষয়ে যে নানা মত হবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। যারা বিদেশীয় সভ্যমত মুগ্ধ হয়ে বিদেশীয় আচার ব্যবহার আহার ও বিহার গ্রহণ করেছেন তারা বলবেন ভাত ছেড়ে বিদেশী রকমের খাদ্য গ্রহণ না করাই আমাদের এ দুর্দ্দশার কারণ। তারা বোধ হয় ভুলে যান—যে পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘজীবন ভোগ করে গেছেন এবং তখন দেশে মৃত্যুর আহ্বানে—এত লোক সাড়া দিত না। আর একদল লোক আছেন যাঁরা বলে থাকেন যে আমাদের সামাজিক কুপ্রথাগুলিই আমাদের জাতীয় জীবনের এ অধঃপতনের কারণ। অতি অল্পবয়সে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ, বিধবা বিবাহের অপ্রচলন প্রভৃতি কারণ দেশকে জনসম্পদে হীন করে ফেলছে। স্বীকার করি যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে অনেক বিধবা যাঁরা বন্ধ্যা অবস্থায় কালাতিপাত করছেন তাহাও সন্তান জন্ম দিয়ে দেশের সম্পদের বৃদ্ধি-সাধন করতে পারেন—স্বীকার করি যে বাল্য-বিবাহের কুফলে সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না ও শৈশবেই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়—কিন্তু একটা কথা তবুও মনে জেগে উঠে যে—এ দোষ-গুলি ত আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা পূর্ব্বে অনেক বেশী ছিল তবে সে সময়ের বাঙ্গালী জাতি জনসম্পদে এত ধনী হল কি করে পুরুষ ও নারীর উৎপাদিকা শক্তি বেশী ছিল কেন ও শিশুর জীবনী শক্তি বর্ত্তমান শিশুর শক্তি অপেক্ষা বেশী ছিল কেন? এ সকল কথা একটু বিশেষ বিবেচনা করে দেখলেই পরিস্কার বোঝা যায় এগুলি ছাড়াও আর একটা জিনিষ আছে যা আমাদের এ দুর্দ্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

সকল কথার মূলের কথা হল খাদ্যাভাব। বাঙ্গালীর ছেলে আজ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। জীবন রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে জিনিষগুলি আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় একটু মাছ, একটু দুধ তাই আজ বাঙ্গালীর দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। জীবন যাত্রার

প্রধান উপকরণগুলি বিলাস দ্রব্যের মত দামী ও বহুল ব্যয়সাধ্য হয়েছে। এখন কথা হল যে তবে কি দেশের উৎপন্ন শস্য আমাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হবার জন্য তার পরিপোষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ কথার উত্তর দিতে গেলে হৃদয়ে ক্রোধ ও ক্ষোভ উভয়ের যুগপৎ সঞ্চার হয়। আমাদের "সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা ভূমি তাঁর সন্তানের উদর পূর্ত্তির জন্য এখনও ক্ষেতে ক্ষেতে প্রচুর শস্য জন্মান। দেশে এত শস্য জন্মে যে এক বৎসরের শস্যে ৪।৫ বৎসর অনায়াসে চলে। নির্ব্বোধ আমরা সে শস্য জাহাজে করে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে অনাহারে দিন কাটাই। মাতৃস্নেহ শতধারে উৎসারিত হয়ে দেশকে সিক্ত করছে কিন্তু হতভাগ্য নির্ব্বোধ সন্তান আমরা, মায়ের দান পরকে বিলিয়ে দিয়ে শূণ্যহাতে বসে আছি যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করেন যাদের এই বিলিয়ে দেবার ব্যবসাতে কিছু স্বার্থ আছে তারা বলবেন যে ব্যবসা বানিজ্য বন্ধ করে রাখলেই কি জাতির কল্যাণ হবে? আমাদের কথা এই যে জাতির প্রয়োজনের জন্য যতটা দরকার ততটা দেশে রেখে উদ্বৃত্তটা দিয়েই ব্যবসা বানিজ্য চালান উচিত। সর্ব্বাগ্রে জীবনরক্ষা তারপর ব্যবসা বানিজ্য। খাদ্যাভাব যে আমাদের কতটা হয়েছে তা আমরা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি কারণ আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। প্রতিদিন কে কতটা পুষ্টিকর জিনিষ খেয়ে থাকেন তার হিসাব যদি প্রতিদিন নেন তবে অনেকের হিসাবেই' শূন্যের ভাগ বেশী দেখতে পাওয়া যবে।

আমাদের খাদ্যাভাব ঘটেছে কিন্তু জীবন সংগ্রামটা আমাদের ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে চলেছে আমরা আধপেট খেয়ে কিম্বা কতকগুলি অখাদ্য দিয়ে উদর পূর্ত্তি করে আপসে কার্য্যস্থলে গিয়ে সারাটা দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করি এবং আমাদের পুত্রগণও কোনও প্রকারে নাকে মুখে কয়েকটা ভাতের দানা মুখে ফেলে স্কুলে পড়তে চলে যায় ও ১১টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলগৃহে বন্ধ থাকে। এভাবে পরকালের পথটা আমরা প্রশস্ত করছি। আমরা সকলেই বুঝতে পারছি যেন এই পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনীশক্তি চলে যাচ্ছে কিন্তু তবুও উপায়হীন হয়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও—আমাদের সেই আফিস ঘরে ও সেই স্কুল ঢুকতে হচ্ছে আমরা তুলনা করি আমাদের সঙ্গে অপর দেশের লোকের বলে থাকি জার্ম্মাণ ছেলেরা আমাদের ছেলেদের চাইতে অনেক অধিক পরিশ্রম করে—ইংরাজ ছেলেরা কেমন বলিষ্ঠ ও শক্ত। তাদের অনুকরণ করবার জন্য আমরা অনেকেই ছেলেদের উপদেশ দিয়া থাকি।

কি তুর্ভাগ্যের কথা—ছেলেদের মুখে একটু আহার দেবার মত শক্তি যাদের নাই তারাই আবার উপদেশ দেয় জার্ম্মাণ ছেলের অনুকরণ করতে। তাই প্রতি বছর বছর দলে দলে ছেলে পাস করে বেরুচ্ছে—লাভ করছে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ—আর হারাচ্ছে চোখ কাণ নাক স্বাস্থ্য। আমরা ছেলেদের অভিভাবক হয়ে শত্রুর মত তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি কালের করাল গহ্বরে—তাই আজ গৃহে গৃহে উৎসাহহীন, বীর্য্যহীন পাসকরা যুবকের দল। দেহ যখন তুর্ব্বল থাকে তখন সে নানা "ব্যাধি মন্দির" হয়ে পড়ে। তাই যখন দেশে কোনও রকম একটা মড়ক উপস্থিত হয় গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠে,— কারও বা দেখতে পাওয়া যায় "উপযুক্ত" ছেলে মরে গেল, কোন নারীর "উপযুক্ত স্বামী মরে গেল,—এভাবে দেশব্যাপী শোকের হাহাকার গগন ভেদ করে উত্থিত হয়। তাই আজ মনে হচ্ছে—আমাদের এই শিক্ষার মন্দিরগুলি চূর্ণ হয়ে মিশে যাক্, ছেলের দল মুক্ত হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়ুক এবং মুক্ত আকাশের তলে স্বাধীনভাবে মাটী কেটে হাল ধরে জীবিকা অর্জ্জন করুক।

জীবন আমাদের নূতন করে আরম্ভ করতে হবে—সে নূতন করে আরম্ভ করবে মানে—"Return to Nature."

এখনকার এই সভ্যতার আবরণ সাজ খুলে ফেলে প্রথমতঃ জাতিকে সবল সুদৃঢ় মানব সম্পদ দ্বারা—পূর্ণ করে তুলতে হবে—তারপর যেদিন দেখা যাবে জাতীয় জীবনে জোয়ার এসেছে লক্ষ লক্ষ পূর্ণ স্বাস্থ্য উৎসাহপ্রোজ্জ্বল মুখের দীপ্তিতে বাংলা আলোকিত হয়ে উঠেছে—সেদিন আমরা ভাবব এই সভ্যতার কথা।

খাদ্যের অভাব দূর না করলে এই প্রশ্নের সমাধান হবে না। খাদ্যের অভাবেই এই স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু। এই খাদ্যের অভাবের জন্যই আমরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিসূচিকাগ্রস্ত হয়ে মারা যাই। ১৯২১ সনে এক বিসূচিকায় বাংলা দেশে ৮০৫৩৭ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জা এসে সহস্র সহস্র লোক ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মরকের বছর—৭৫০,০০০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তারপর ম্যালেরিয়া রাক্ষসী কত লোক যে গ্রাস করেছে তাহার সংখ্যাই নাই। ম্যালেরিয়া গরীবের রোগ। যে সংসারের পুরুষ ও নারী আধ পেট খেয়ে খেয়ে বলহীন—হয়ে পড়েছে আমরা দেখতে পাই সে সংসারেই ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রথম প্রবেশ করে। ধনীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া বিশেষ দেখিতে পাওয়া

যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত দেহ সবল থাকে ততদিন ম্যালেরিয়া বীজ আমাদের দেহে প্রবেশ করলেও—সহজে আমাদের কবলিত করতে পারে না। প্রায় সকল রোগের মূলেই খাদ্যাভাব।

তারপর শিশুর মৃত্যু—সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানতে পাই বাংলার কোন কোন স্থানে শতকরা ৭০ জন শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে। কি ভয়ানক কথা!—সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় মনে করেন যে—এই শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্য প্রধানতঃ দায়ী—অজ্ঞ গ্রাম্য ধাইগুলি। ডিরেক্টর মহোদয় তাঁর রিপোর্টের অপর এক স্থানে স্বীকার করেছেন যে শতকরা পঞ্চাশটী শিশুর মৃত্যুর কারণ তাহাদের জন্মগত তুর্ব্বলতা (Dibility at birth) এখন প্রশ্ন হল এই জন্মগত তুর্ব্বলতার মূলে কি?—একই উত্তর খাদ্যাভাব, দেশের দারিদ্র্য। দেশের পুরুষ যারা তারাই এক প্রকারে উপবাসী, অপুষ্ট দেহ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগের দাস—তাদের সন্তান কি করে স্বাস্থ্যবান সবল হতে পারে? খাদ্যাভাবে মায়ের বুকের অমৃত ধারা শুষ্ক,—মাও উপবাসী ও রোগে কাতর—এ অবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য কি হতে পারে? প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ শিশু না খেয়ে মারা যাচ্ছে—দেশের কি তুর্ভাগ্য।

বাঙ্গালী যে আজ মরতে বসেছে সে বিষয় বুঝতে আজ আর কারও বাকী নেই, অন্য কোন দেশ হলে সকল দেশ জুড়ে এমন একটা বিকট চীৎকার হাহাকার উঠত যাতে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীর হৃৎকম্প উপস্থিত হত—কিন্তু এদেশের অবস্থা কে দেখেবে বা কে শুনবে। জন্মের হার কমে গেছে মৃত্যুর হার বেড়েছে, মরক এসে আপনার অধিকার স্থাপন করছে—শিশুর দল মাতৃ-অঙ্কে শুয়ে না খেতে পেয়ে মরছে আর চাই কি—একটা দেশের মরবার উৎসবে আর কি আয়োজন চাই।

তারপর—আর একটা ব্যপার—সে দিকে বোধ হয় এখনও—কারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সকল দেশরই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের লোকগুলিই (Middle class) জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। আজ আমাদের সেই মধ্যবিত্তগুলি নষ্ট হতে বসেছে। দেশের দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ভীষণ জীবন-সংগ্রামে ভীত হয়ে অনেক মধ্যবিত্ত অবস্থার যুবক বিবাহ করতে রাজী হচ্ছেন না। সকল সহর খুঁজে বেড়ালে এমন অনেক যুবক সকলেরই চক্ষে পড়বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে মণ্ডিত হয়েও তারা আজ যে উপার্জ্জন করছেন তাতে করে

বর্ত্তমান অবস্থায় সংসার প্রতিপালন অতি কঠিন ব্যাপার। অনেকে আছেন কোনও প্রকার কাজের যোগাড় না হওয়ায়—হতাশ হৃদয়ে বেকার অবস্থায় কাল কাটাচ্ছেন।

এই প্রকার বুদ্ধিমান যুবকগণ—তদি বিবাহ না করেন তবে দেশ যে হলেও-হতে-পারত-কত বুদ্ধিমান সুসন্তান হতে বঞ্চিত হল তা হিসাব করে দেখলে দুঃখ আমাদের না এসে পারে না। আমি বলছি না তারা উপার্জ্জন কিছু না করেই'—বিবাহ করে বসুক কিন্তু সমস্ত জীবনের জন্য সঙ্গে ও কতগুলি সন্তান একত্র হয়ে দুঃখের ফলে অভাবের সাথে জীবন যাপন করল—আমি শুধু দেশের অবস্থাটা ধরে দেখাচ্ছি। এ সকল যুবক বিবাহ না করাতে দেশ কতটা জনসম্পদ হতে বঞ্চিত হল তাই—দেখানই আমার উদ্দেশ্য—। এ অবস্থাটা যদি অরও—ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় তবে বাঙ্গালিকে মৃত্যুমুখে নিয়ে যেতে এও—যে কিছু সাহায্য করবে সে নিশ্চিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—যারা দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত, শিক্ষার কোনও বালাই যাদের নাই তারা কিন্তু সুস্থ মনে বিবাহ করছে ও প্রভূত সন্তান জন্ম দিয়ে অকাল মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।—আর একটা বিষয় যার জন্য মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের জন্মের হার কমে আসবে সে হল খুব বেশী বয়সে বিবাহ। অনেক স্থলেই আজ কাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেরা উপার্জ্জনের পথে আসতে প্রায় ২৮।৩০ বৎসর পার হয়ে যায়—আর মেয়েদের বিবাহের বয়সও প্রায় ১৮.২০ হয়ে পড়ছে। দেশের অবস্থা অনুসারে আমার মনে হয় কিছুদিন পরে মেয়েদের বিবাহের বয়স ২০।২৫ দাঁড়াবে। ছেলের বয়স ৩০ দাঁড়ালে ও মেয়ের—বয়স ২০ পার হলে তাদের উৎপাদিকা শক্তি অনেকটা কমে যাবে। অনেকে বোধ হয় বলবেন যে বিলাতে ও তাই হচ্ছে তবে তাদের কেন কমছে না তার উত্তরে বলতে হবে যে, আমাদের সঙ্গে ও দেশের অনেক তাফাৎ যেমন আমাদের দেশের মেয়েরা ১২।১৫ মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিন্তু ও দেশের মেয়েরা ১৮ হতে ২২ মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে থাকে—এখানেই একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ও বিষয়ে আমাদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থার সামঞ্জস্য না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হবে না।

সোনার বাংলা যে আজ—শ্মশান হতে চলেছে তারই একটা ছবি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা পেয়েছি।—ইতিপূর্ব্বে অনেকেই এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন আমিও তাদের সুরে গলা মিলিয়ে দুঃখের গান আজ আপনাদের শোনলেম। এখনও আমাদের রক্ষা পাবার সময় আছে এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাদের আজ জীবন সংগ্রামে নামতে হবে। দেশের যুবক মহলে বসে বসে আলোচনা করে উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। উপায় স্থির হলে তারপর—কার্য্যে অবতীর্ণ হতে হবে। জীবনকে দায়িত্বহীন করে—কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়া এক প্রকাণ্ড কাপুরুষতা—আমি আশা করি আমাদের দেশের যুবকের দল এই কাপুরুষতা ত্যাগ করে আজ কর্ম্ম ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়বে জীবনের সকল প্রকার দায়িত্ব দেশের প্রতি দায়িত্ব, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, মানবতার প্রতি কর্ত্তব্য সকল ভার ধীর ভাবে গ্রহণ করে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হবে—জীবনের আনন্দগুলি কাপুরুষের মত ত্যাগ করতে কোনই পৌরুষতা নাই, বরং তারই সঙ্গে আছে একটা প্রকাণ্ড অবমাননা আমাদের পুরুষত্বের প্রতি, আমাদের চরিত্রের প্রতি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ জগতের কিছুই সুখসম্পদ স্বাস্থ্যজ্ঞান আত্মা বলহীনের লভ্য নয়—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মরণ আড়াল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবশেষে উঠিলাম। দস্তর মত চেষ্টা করিয়াই আমার সেই আত্মগোপনের স্থান হইতে নিজকে টানিয়া তুলিতে হইয়াছিল। মনের চাঞ্চল্যে শরীরের শক্তিও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছিল যেন! অথচ প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল,—এভাবে বসিয়া থাকা ঠিক্ হইতেছে না,—ডাক্তার যদি 'টের' পান কি ভাবিবেন! হায়! তখনও ভাবাভাবির হিসাব, আপনার প্রকৃত বর্ণ লুকাইয়া ভালমানুষ সাজিবার মানুষের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা!

বর্ত্তমান অবস্থায় সংসার প্রতিপালন অতি কঠিন ব্যাপার। অনেকে আছেন কোনও প্রকার কাজের যোগাড় না হওয়ায়—হতাশ হৃদয়ে বেকার অবস্থায় কাল কাটাচ্ছেন।

এই প্রকার বুদ্ধিমান যুবকগণ—তদি বিবাহ না করেন তবে দেশ যে হলেও-হতে-পারত-কত বুদ্ধিমান সুসন্তান হতে বঞ্চিত হল তা হিসাব করে দেখলে দুঃখ আমাদের না এসে পারে না। আমি বলছি না তারা উপার্জ্জন কিছু না করেই'—বিবাহ করে বসুক কিন্তু সমস্ত জীবনের জন্য সঙ্গে ও কতগুলি সন্তান একত্র হয়ে দুঃখের ফলে অভাবের স'থে জীবন যাপন করল—আমি শুধু দেশের অবস্থাটা ধরে দেখাচ্ছি। এ সকল যুবক বিবাহ না করাতে দেশ কতটা জনসম্পদ হতে বঞ্চিত হল তাই—দেখানই আমার উদ্দেশ্য—। এ অবস্থাটা যদি অরও—ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় তবে বাঙ্গালিকে মৃত্যুমুখে নিয়ে যেতে এও—যে কিছু সাহায্য করবে সে নিশ্চিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—যারা দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত, শিক্ষার কোনও বালাই যাদের নাই তারা কিন্তু সুস্থ মনে বিবাহ করছে ও প্রভূত সন্তান জন্ম দিয়ে অকাল মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।—আর একটা বিষয় যার জন্য মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের জন্মের হার কমে আসবে সে হল খুব বেশী বয়সে বিবাহ। অনেক স্থলেই আজ কাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেরা উপার্জ্জনের পথে আসতে প্রায় ২৮।৩০ বৎসর পার হয়ে যায়—আর মেয়েদের বিবাহের বয়সও প্রায় ১৮।২০ হয়ে পড়ছে। দেশের অবস্থা অনুসারে আমার মনে হয় কিছুদিন পরে মেয়েদের বিবাহের বয়স ২০।২৫ দাঁড়াবে। ছেলের বয়স ৩০ দাঁড়ালে ও মেয়ের—বয়স ২০ পার হলে তাদের উৎপাদিকা শক্তি অনেকটা কমে যাবে। অনেকে বোধ হয় বলবেন যে বিলাতে ও তাই হচ্ছে তবে তাদের কেন কমছে না তার উত্তরে বলতে হবে যে, আমাদের সঙ্গে ও দেশের অনেক তাফাৎ যেমন আমাদের দেশের মেয়েরা ১২।১৫ মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিন্তু ও দেশের মেয়েরা ১৮ হতে ২২ মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে থাকে—এখানেই একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ও বিষয়ে আমাদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থার সামঞ্জস্য না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হবে না।

সোনার বাংলা যে আজ—শ্মশান হতে চলেছে তারই একটা ছবি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা পেয়েছি।—ইতিপূর্ব্বে অনেকেই এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

প্রয়াস পেয়েছেন আমিও তাদের সুরে গলা মিলিয়ে দুঃখের গান আজ আপনাদের শোনলেম। এখনও আমাদের রক্ষা পাবার সময় আছে এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাদের আজ জীবন সংগ্রামে নামতে হবে। দেশের যুবক মহলে বসে বসে আলোচনা করে উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। উপায় স্থির হলে তারপর—কার্য্যে অবতীর্ণ হতে হবে। জীবনকে দায়িত্বহীন করে—কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়া এক প্রকাণ্ড কাপুরুষতা—আমি আশা করি আমাদের দেশের যুবকের দল এই কাপুরুষতা ত্যাগ করে আজ কর্ম্ম ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়বে জীবনের সকল প্রকার দায়িত্ব দেশের প্রতি দায়িত্ব, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, মানবতার প্রতি কর্ত্তব্য সকল ভার ধীর ভাবে গ্রহণ করে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হবে—জীবনের আনন্দগুলি কাপুরুষের মত ত্যাগ করতে কোনই পৌরুষতা নাই, বরং তারই সঙ্গে আছে একটা প্রকাণ্ড অবমাননা আমাদের পুরুষত্বের প্রতি, আমাদের চরিত্রের প্রতি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ জগতের কিছুই সুখসম্পদ স্বাস্থ্যজীবন আত্মা বলহীনের লভ্য নয়—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মরণ আড়াল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবশেষে উঠিলাম। দস্তর মত চেষ্টা করিয়াই আমার সেই আত্মগোপনের স্থান হইতে নিজকে টানিয়া তুলিতে হইয়াছিল। মনের চাঞ্চল্যে শরীরের শক্তিও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছিল যেন! অথচ প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল,—এভাবে বসিয়া থাকা ঠিক্ হইতেছে না,—ডাক্তার যদি 'টের' পান কি ভাবিবেন! হায়! তখনও ভাবাভাবির হিসাব, আপনার প্রকৃত বর্ণ লুকাইয়া ভালমানুষ সাজিবার মানুষের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা!

কাজ করতে হয়। সেটা সংসারে থাকতে হলে করতেই হবে, এতে আর দ্বিধা কি !"

আমার মন ভাবের সামান্য বাহ্যিক প্রকাশও তীক্ষ্ণদর্শী বৃদ্ধের চক্ষু এড়ায় নাই,—সাবধান হইলাম। বলিলাম,—"দ্বিধা নয়, ভয় হয় পাছে আমার নির্বুদ্ধিতায় আপনার কোন কাজ পণ্ড করে ফেলি !"

"সে ভয় নেই, পূর্ব্বেই বলেছি তুমি পারবে; আমি ত সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গেই আছি ! শোন তবে—দেখ্‌লেই ত ছোকরাটা কি ভাবে অকালে প্রাণ দিলে—তোমায় যতটুকু বলেছি তার চাইতে আমায় এ মৃত্যুতে আরও বিপদগ্রস্ত করেছে। অলকা বলেছি ত—আমার এক স্বর্গীয় বন্ধুর কন্যা—তাঁর অগাধ নগদ অর্থ, ব্যাঙ্কে সব জমা আছে,—উইল করে গেছেন তিনি—কেমন খেয়ালী লোক ছিলেন, এই ছেলেটার দিকে তাঁর ছিল বড় ঝোঁক—অলকাকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসেছিলেন,—ওর পড়াশুনা যা' সেই হিসেবেই তিনি করিয়াছিলেন; উইলে ত সেটা লিখে গেছেন,—এখন বুঝ্‌তে পারছ আমার বিপদ ! আমি এখন প্রকাশও করতে পারি না ওর এ আত্মহত্যার কথা অথচ উইলটার সর্ত্ত অনুসারে তা না করলেও নয়,—ওর মৃত্যু প্রমাণিত না হলে অলকাকে অন্যত্র বিয়ে দিবার উপায় নেই। যদিও উইলখানা আজও অলকার নিকট গোপন আছে কিন্তু একদিন ত তা প্রকাশ করতে হবে,—এখন কি করি সেই মহা সমস্যা !'

আমি বলিলাম—"সত্যিই ! ....উইলখানা ভাল করে না দেখলে কিই বা বলা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন—"That's business like,—কথার মত কথা—কিন্তু অতি গোপনে অন্য কেউ এর একটু গন্ধ পেলেই সর্ব্বনাশ ! মেয়েটাকে এমনি বশে আনা দায় ! সেও আবার অসুখে পড়েছে—নানা কারণে কাজটার কিনারা হওয়া চাই তাড়াতাড়ি ! কিন্তু পর্ব্বতের মত বাধা সামনে !. মেয়েটাকে কিছুতেই জানতে দিতে পারা যায় না অপমৃত্যুর কথা—তা হলে একদম বিগড়ে যাবে !"

তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না; অতুল অলকার সেই একদিনের কথাবার্ত্তাতেই আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তাহাদের দুটিতে কি ভাব ছিল। ডাক্তারের কথায় তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল,—অতুলকে সরাইবার জন্য তাঁর কেন অত,—উইলখানাই যত অনর্থের মূল ! ডাক্তারের বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় ঐ উইল, অতুলও ছিল তাহাই ! আরও কি

সন্দেহ থাকে ? এ অপকর্ম্ম ডাক্তারেরই। নিশ্চয়,—নিশ্চয়—অতিনিশ্চয় ডাক্তারই অতুলকে হত্যা করিয়াছে ! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল ! এই লোকের সহিত করিতে হইবে আমার কারবার,—চলা ফেরা ! সে আর বেশী কি ? জেলের কল্যাণে আমার এমন সৎসঙ্গ অনেক হইয়াছে! আর কিছু না হ'ক,—চোর ডাকাত নরহন্তার সংসর্গে আমার আর ভয় নাই, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতাও কম হয় নাই; ডাক্তার আমাকে যতই নাবালক মনে করুন,—আমার সাহস আছে—আমি তাঁর কুচক্র ভেদে অযোগ্য হইব না। কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার। সেই নীতিই অবলম্বন করিলাম। ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম "ওঁদের দুটিতে খুব ভাব ছিল বুঝি ! আহা ! বেচারা কি জন্যে তবে প্রাণ দিলে ! বিয়েতে ত কোন বাধা ছিল না !"...........

ডাক্তার বলিলেন—"হাজার হ'ক তোমরা যুবক,—যুবকের মত তোমার ভাবনা,—ভাবটাব ও-সব তোমাদেরই ভাবা সাজে। বল ত,—কি করে আমি, আগে পিছু না দেখে, না বুঝে ওকে মেয়ে দেই ! খেয়ালী ছোকরা অত টাকা হাতে পেলে কি কথা ছিল, একেবারে জাহান্নামে যেত ! আমি সেটা সহজে হতে দেই নি, সেইটাই আমার মহা অপরাধ,—অভিমানে প্রাণ দেওয়া হ'ল !"

বলিলাম—"গেছে, আপদ চুকে গেছে, আপনা হতে সরে গেছে,—বেশ হয়েছে ! আপনি এখন ইচ্ছামত দেখে শুনে মেয়েটাকে সৎপাত্রে দিতে পারবেন,—অমঙ্গলে মঙ্গলই হয়েছে ! তবে উইলখানা, তাও ত বলছিলেন তিনি উইলের কথা জানেন না,—তবে আর... "

ডাক্তার বলিলেন—"তবে যে আর কি সেটা তোমার এখনও বুঝতে দেরী আছে—কিছুদিন আমার সঙ্গে না চল্‌লে ফিরলে অত তুমি এখনি বুঝবে কি ? উইলটা সে জানে না যেন,—জগতে আর কেউ কি জানে না, ব্যাঙ্কার, অলকার বাপের সলিসিটর, তা ছাড়া উইলের তিন চারটি সম্ভ্রান্ত সাক্ষী,—রেজেষ্টরী দলিল,—রেজেষ্টরী অফিস,—এরাও কি উইলের কথা জানে না ? এতগুলো লোকের জানা আর জানা হলো না ! ভাল যা হোক !"

বুঝিলাম বৃদ্ধের ক্ষত স্থানে আঘাত করা হইয়াছে ! বলিলাম,—'জানে জানুক, ওদের জানা অজানায় আসে যায় কি ! যুবকটি বেঁচে থাক্‌লে অবিশ্যি কথা ছিল—সে যখন

নেই,—উইলেরও মূল্য আর আছে কি? বিয়েটা ত এখন যেখানে সেখানে হ'তে পারে!"

"সেইটাই ত ভাববার! এত দিন একটা বাঁধাবাঁধি ছিল,—ইচ্ছা করলেও অন্যত্র বিয়ে হবার যো ছিল না,—এখন কে বল্লে ও আমার ইচ্ছা মত বিয়ে করতে রাজি হবে,—গোঁড়া হিন্দু ঘরের মেয়ে ত নয়—দু চার মাস পরে সাবালিকা হবে—তখন আমার কথা না শুনে যদি, আমি আর কি করতে পারব!"

ওঃ এই জন্যই এত,—এত তাড়াতাড়ি,—এ না হইলে অতুল হয় ত আরও কয়টা দিন বাঁচিতে পারিত!

আমি বলিলাম "তিনি কি এমনি খোষ মেজাজী!"

"না না—তা কেন—যদি হয়—সেই কথাই বলছি—সব দিকটাই ভেবে দেখা দরকার!"

"ঠিকই! বলছিলেন, তাঁর অসুখ, তিনি ভাল হয়ে উঠুন,—এর মধ্যে একটা উপায় হবেই,—অনেক দিন দেখা না হলে ত একটা কিছু ওঁর মনে হবে—তখন না হয় দুর্ঘটনাটার কথা বল্‌বেন।"

"না—না—না—কি যে বলছো,—আদত কথাটা এখনও কিছুই বোঝনি,—কি করে এখন ওর আত্মহত্যার কথা প্রকাশ করা যায়? বুঝ্‌ছ না কেন তুমি,—মরাটা যে কয়েদী—তুমি—এটা প্রচার না থাক্‌লে তোমার অস্তিত্বই যে নেই! এত ভুলো তুমি,—হাঁদা—নিজের ভালমন্দটা পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার না—এত বেকুব!"

বৃদ্ধ মহা বিরক্ত হইয়াছেন,—হইবারই কথা! আমি মূলেই ভুল করিয়াছি এ বিশ্বাস তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছে কিন্তু আমি চাই ওঁর মনের ভাব রগরাইয়া রগরাইয়া নিঃশেষ করিয়া বাহির করিতে! আমি বলিলাম "ও মরাটার কথা তুলিতে যাবেন কেন! বলছিলেন—অভিমানে প্রাণ দিলে,—সেই অভিমানেই কি যুবকটির অন্য দেশে চলে যাওয়া অস্বাভাবিক,—অন্যত্র মারা গেছে সেটার প্রচারের ব্যবস্থা এমন কি কঠিন হবে!"

বৃদ্ধ আশ্বস্ত হইলেন,—বলিলেন "বলেছ বেশ,—সেইটাই হবে স্বাভাবিক! তারই ব্যবস্থা করছি! তুমি প্রস্তুত থেক—শেষ রাতে কলকাতা রওনা হতে হবে,—বলেছি অলকার সেখানে অসুখ,—মেয়েটার ভালমন্দ দেখ্‌তে হয় সবার আগে!"

বৃদ্ধ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, আমাকে মহা রহস্যে নিমজ্জিত করিয়া। এ সমস্যার সমাধান আমি করিতে পারিব কি! বৃদ্ধের প্রার্থিত বরটি কে? আমি! এতটা নির্ভর এখন আমার উপর,—তার মত ধুরন্ধর কিছুতে করিবে না। তবে কি তার পুত্র? খুব সম্ভবও সেই,—কিন্তু বৃদ্ধের কথাবার্ত্তায় মনে হয়,—পুত্রের উপরও তাঁর আস্থা নাই,—যথেষ্ট তাঁর সন্দেহ আছে—পুত্র সেই অর্থের মালিক হইলে পূর্ণস্বার্থ তাঁর রক্ষিত হইবে কি না। তবে কে সে বর,—বৃদ্ধের অভীষ্ট ক্রীড়নক!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:*:—

কোচবিহারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন বৃষ্টি। ৮·২২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে বিগত বর্ষে এ সময় ছিল ৪·৯৮ ইঞ্চ। সহরে এবারে প্রায় ঘরে ঘরে হাম হইয়াছিল, এখন কমিতেছে। গবাদির পীড়াও এবারে বেশী। সরকার হইতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা হইয়াছে। ফলে পীড়া হ্রাস পাইতেছে। শস্যের অবস্থা মন্দ নহে কিন্তু এরূপ ভাবে বৃষ্টি চলিলে,—জমীর জঙ্গল পরিস্কার একরূপ অসম্ভব। সুতরাং শস্যের অপকার হইবে।

* * *

কোচবিহারের মহামান্য রাজসভা রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সাহায্য কল্পে ৪,২৪৮৲ টাকা সাহায্য দান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শিক্ষাই সর্ব্ব উন্নতির মূলে।

* * *

কোচবিহারে কতিপয় যুবকের চেষ্টায় একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। প্রাতে দরিদ্র সন্তানগণকে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়,—শিক্ষকের

অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারা শিক্ষকতা করেন। এরূপ চেষ্টা চাই গ্রামে গ্রামে। ঘরে ঘরে নরনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা হউক।

* * *

নারীর অধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে,—সুখের কথা। শিক্ষিতা নারী উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিতা হউন—স্ত্রীশিক্ষার গরীমা তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে।

পাটনা গবর্ণমেণ্ট কুমারী শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীমতী সুধাংশুবালা হাজরা বি-এল, পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী কর্ণেলিয়া সোয়াবজি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

রাজ কোট রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার দুইজন মহিলা-সভ্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

অন্য পক্ষে আবার বাঙ্গলার শ্রীমতী রেজিনা গুহ ওকালতি পাশ করিয়াও কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। আসামেও ব্যবস্থাপক সভায় নারীর নির্ব্বাচনাধিকার প্রত্যাখ্যিত হইয়াছে। হউক—নিরাশ হইবার কিছু নাই। নারী প্রকৃত শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত হইবেই হইবে।

আসল কথা,—সেই শিক্ষারই কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। কতিপয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলার গর্ব্বে গর্ব্বিত বা পরাজয়ে নিরাশ হইলে সুফল হইবে না,—যিনি যে বিষয়ে কৃতী তাঁহার পথ তিনি করিতে পারিবেন। কিন্তু চাই কৃতীর সংখ্যায় বৃদ্ধি। বঙ্গের নিরক্ষর নারীর সংখ্যা অত্যধিক। যাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানেন তাঁহারাও নাম মাত্র শিক্ষিতা,—বিদ্যা জোড় চিঠিপত্র লেখার। এ অবস্থার উন্নতি অচিরে হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিতাগণ তৎপর হউন। ওকালতি না হইল তাহাতে কি? তাহা হইতে গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। তাঁহারা তাঁহাদের ভগিনীগণের শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করুন। সে দিন আসিলে বুঝিব নারী প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

নিত্য নারী নির্য্যাতনের সংবাদ, উহার কয়টিই বা প্রকাশ পায়! কত বধু বিনা অপরাধে পশুর অধিক নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিতেছেন—তাহার সংখ্যা কে রাখে? আমরা জানি—বঙ্গের হিন্দু মুসলমান বহুস্থলেই বধুর নির্য্যাতনে তৎপর। পণ্ডিতের পরিবারে বধুর পিতাকে পীড়ন করিবার ইচ্ছায় নিরপরাধ তের বৎসরের বধুর প্রতি পশুর মত ব্যবহার করা হইয়াছে। শিক্ষিত বি-এ, পাশ মুসলমান যুবক, শ্বশুরের খরচে পড়িয়াও নিমকহারাম শিক্ষায় কলঙ্ক লেপন করিয়া স্ত্রীকে নিত্য প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছে,—অথচ ইহারা ভদ্র,—ভদ্রপরিবারের বাহিরে ঢাকিবার চেষ্টা—অন্দর—আবরণ,—আর এই ব্যবহার।

ইহার প্রতীকার কোথায়? শিক্ষিতা নারী এ বিষয়ে অবহিত হউন—ভগিনীগণের আত্মবোধ, সাহস,—আত্মনির্ভরতা যাহাতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে জীবন উৎসর্গ করুন—ব্যবস্থাপক সভা বা এখন নাই জুটিল! দলে পুষ্ট হইলে পশ্চাতে আর পড়িয়া থাকিতে হইবে না।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা—বড় ভয়ানক, মৃত ত মরিয়াছেই—যে মারে তাহাদেরও হৃদয়ের পরিচয় অতি শোচনীয় ভাবে প্রকাশ পায়। লবণকর গবর্ণমেণ্টের সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। দরিদ্রের গ্রাসে বজ্রপাত করিয়া পালক, দেশে একি ভীষণ হাহাকারের সৃষ্টি করিলেন। এ দেশের দরিদ্র—সভা করিয়া, কাগজে লিখিয়া নিজেদের দুঃখ দৈন্য জোর-গলায় প্রচার করিতে জানে না—সে শিক্ষা তাহাদের নাই তাই বলিয়াই কি মূককে এরূপ ভাবে তাড়ন করিতে হইবে? তাহারা চীৎকার করিতে জানে না বলিয়াই কি ভাবিয়া লইতে হইবে—উহারা বঞ্চিত হইলেও উহাদের বেদনা-বোধ নাই। আশ্চর্য্য—সঞ্জীবনীতে দেখিলাম শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় আবার এই লবণ করের স্বপক্ষে ওকালতী করিয়াছেন—আমরা জানি সরকারের লবণে তিনি পুষ্ট কিন্তু দেশের লোকের একটু রক্তও কি তাঁহার দেহে নাই? সঞ্জীবনী কোন প্রাণে—এ ওকালতী পত্রিকাস্থ করিলেন! সঞ্জীবনী নিজেই ত বলিয়াছেন—এই লবণকরের ভার যে দুর্ব্বহ—তাহা অনেক সুধী ও বিবেচক স্বীকার করিয়াছেন—

ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিব সার বেসিল ব্ল্যাসকেটের বোম্বাই গমন উপলক্ষে সার ফজলভয় করিমভয় ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিরূপে এক অর্ভথনা সভা করেন। এই সভায় তিনি বলেন—ভারতগবর্ণমেণ্ট সৈন্য বিভাগের ব্যয়সংকোচ ব্যাপারে সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য লবণকর বৃদ্ধি করিয়া দেশের লোকের প্রাণে আঘাত দিয়াছেন। ইহাতে সভাসমিতি ও ব্যবস্থাপক সভা সমূহে অপ্রীতিকর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উপরও অযথা বোঝা চাপান হইয়াছে। আর বোঝা বাড়াইতে গেলে ইহার বিনাশ হইবে।

সৈন্য বিভাগে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার লাঘব করা উচিত ছিল। বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মীদিগের বেতন কমিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। দেশে শিক্ষিত যুবকদিগের কাজ কর্ম্ম জুটিতেছে না। তাহাদিগকে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করিলে দেশের লোকের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টেরও মহা উপকার সাধিত হইত। গবর্ণমেণ্ট তাহা না করিয়া লবণকর বৃদ্ধি করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

ব্যবসায়ীদিগের এই সমিতি লবণকর বৃদ্ধির সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে। বড়লাটের এই মহাভ্রমের ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের বিশ্বাস হারাইলেন। ১৯১৭ সনের আগষ্ট মাসের ঘোষণায় আর তাহাদের বিশ্বাস থাকিবে না। শান্তিপ্রিয় দেশে প্রতিনিধিদের সমবেত মতকে এরূপভাবে উপেক্ষা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। যদি তাঁহাদের মতকে এরূপভাবে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আর ভবিষ্যতের জন্য আশা পোষণ করিতে পারেন না। লর্ড রেডিং এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট তাহা অবজ্ঞেয় হইয়াছে। তাহারা এ সকল যুক্তির অসারতা সহজেই বুঝিতে পারে। ব্যবস্থাপক সভা সমূহের সদস্যগণ দেশের প্রতিনিধিরূপে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ রাখেন। তাঁহারা জানেন যে, দেশের অবস্থার পক্ষে নূতন কর স্থাপন কতটা সম্ভবপর। লর্ড রেডিংএর এই কার্য্যের ফলে বহু শান্তপ্রকৃতি জননায়ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন। তাঁহার এই ব্যবহারে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইল।

* * *

ভারতের লবণকর বৃদ্ধি বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে, পার্লামেণ্টে তাহার আলোচনা করিতে দেওয়া হইবে কিনা, গত সোমবার পার্লমেণ্টে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড উইণ্টারটন তদুত্তরে বলিয়াছেন, "আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বৃদ্ধিহারে কর আদায় করা হইতেছে।"

সুতরাং পার্লামেণ্ট লবণকর বৃদ্ধি আইন বন্ধ করিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্ট পারিবেন না, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা পারেন নাই, ভারতের জনসাধারণের সুপরামর্শ লবণকর বৃদ্ধি বন্ধ করিতে পারেন নাই। লবণকর বৃদ্ধি একমাত্র ভারতবাসীই করিতে পারে। ভারত-বাসীরা যত লবণ ডাল তরকারীতে খায়, তাহার বেশী লবণ পাতে খায়। "আমরা পাতে লবণ খাইব না" সমস্ত ভারতবাসী যদি এই সঙ্কল্প করে, তবে লবণের কর দ্বিগুণ হওয়াতে কোন ক্ষতি হইবে না।

ভারবাসীর পরামর্শ ভারতের গবর্ণর জেনারেল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ভারতসচিবও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারবাসীর মর্য্যাদা তাহার নিজের কার্য্যের উপর এখন নির্ভর করিতেছে। ভারতবাসীর যদি আত্মসম্মান বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সহিত বলিবে, "আমরা পাতে লবণ খাইব না।"

* * *

যাহাদের অন্নের সহিত অন্য ব্যঞ্জন আছে—তাহারা পাতে লবণের ব্যবহার কমাইয়া দিন। কিন্তু যাহাদের ব্যঞ্জনই ঐ লবণ তাহাদের উপায়? আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি—কৃষকের মধ্যে ভাল অবস্থা যাহাদের তাহাদেরও অন্নের ব্যঞ্জন শাক—কোন প্রকার সিদ্ধ, ও লবণ। আর সাধারণ কৃষকের ব্যঞ্জন কোন প্রকার অম্ল, ও লবণ। শাক ও লবণ—পিঁয়াজ, লঙ্কা ও লবণ। লবণই তাহাদের আহারে প্রধান ব্যঞ্জন—ইহাদের লবণ বর্জ্জন কিরূপে সম্ভবে!

কলা বা অন্য ক্ষার হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া কোচবিহারের লোক পূর্ব্বে ব্যবহার করিত। আবার তাহারই প্রচলন হ'ক—ছোট বড় সকলে 'ছ্যাঁকা'—ক্ষারের জল ব্যবহার করিয়া লবণকর ব্যর্থ করুন।

কদলী বৃক্ষ বসা বা ফলের খোসা শুষ্ক করিয়া পোড়াইয়া লইলে যে খার হয় তাহা কোন একটি ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রে রাখিয়া জল দিলে উহা চুয়াইয়া যে জল নিম্নস্থ পাত্রে জমা হয় তাহাই ছ্যাঁকা। ছ্যাঁকা লবণাক্ত—ইহাতে অল্প লবণ মিশাইলে লবণের কাজ চলে।

বঙ্গের ছাত্রগণ ক্রমেই নানা বিষয়ে কৃতীত্ব দেখাইতেছেন। ভারতব্যাপী প্রতীযোগীতা পরীক্ষায় তাঁহাদের ফল ক্রমেই সন্তোষজনক হইতেছে। বিগত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে সমগ্র ভারতের সিভিল সার্ভিসএর প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় বঙ্গের চারিটী ছাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এবৎসর মাত্র নয়টীকে সার্ভিসে গ্রহণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ও ষষ্ট হইয়াছেন মান্দ্রাজী, দ্বিতীয় তৃতীয় অষ্টম, নবম বাঙ্গালী, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তমআগ্রা অযোধ্যাবাসী। আমরা আরও বিশেষভাবে এই কৃতীত্বের জন্য গৌরব অনুভব করিয়াছি। ইহার মধ্যে শ্রীমান জ্যোতীন্দ্র নাথ তালুকদার অষ্টম হইয়াছেন যিনি, তিনি আমাদের রাজসাহী বিভাগের নাটোর মহকুমার অন্তর্গত হালসা গ্রাম নিবাসী ও কোচবিহার মহারাজার স্মৃতি রঞ্জিত দেবীগঞ্জের উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় ও অত্র সহরস্থ জেঙ্কিন্স স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। উত্তর বঙ্গের তিনি প্রথম আই, সি এস,। শ্রীমানকে আমরা অতি সরল ও সদাশয় বলিয়া জানি, ভগবান তাঁহার—দীর্ঘজীবন দান করুন।

* * *

রাজসাহী বিভাগের আর একটী গৌরবমণি শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চৌধুরী। পাবনা জেলাস্থ করঞ্জা গ্রামে তাঁহার নিবাস। রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দান করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে বহুনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকার রাসায়নিক পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শুভ ১৩৩০ সালের স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা,—৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

পঞ্জিকা হিন্দুর নিত্য প্রয়োজনীয়; প্রত্যেক দৈনিক কার্য্যে হিন্দু পঞ্জিকাকে মানিয়া চলেন। গ্রহ, তিথি প্রভাবে হিন্দুর অকাট্য বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহারা আজ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের একটী নিত্য স্মরণীয় মহৎ উক্তি ও সুক্ষ্ম যুক্তি—শরীরমাদ্য খলু ধর্ম্ম সাধনম্—এই মহামন্ত্র বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিলেন ইহার ফলে রোগ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নারীর অসম্মান, শিশুর মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ অকল্যাণ ভারতবাসীর জীবনে নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছে, এই বিস্মৃতির দিনে স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় সহকর্ম্মী দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য নানা দিক হইতে যেরূপভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। প্রশংসার জন্য নহে—জানি তাঁহারা প্রশংসালোলুপ নহেন,—প্রকৃত কর্ম্মী; তাহাদের এই কর্ম্মের পুরস্কার ভগবান একদিন দান করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কুগ্রহ মনুষ্য জীবনে মহা অনর্থের মূল কিন্তু তাহা অপেক্ষা যে আরও ভয়ঙ্কর কুগ্রহ আমাদের জীবন নাশ করিতে বসিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা বড় রাখি না। আলোচ্য গৃহ পঞ্জিকার হর পার্ব্বতী সংবাদে অতি সুনিপুণভাবে এই সকল গ্রহ উপগ্রহের পরিচয় ও তাহাদের কুপ্রভাব ও গ্রহ শান্তির—রোগের প্রতীকারের ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে পঞ্জিকাতে আলোচিত হইয়াছে ইহাতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলির শিরোনাম হইতে এই পঞ্জিকার উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। কদভ্যাস, ধূমপান ফল, মাদকদ্রব্য সেবন ফল, ভোজন ক্রিয়া, সেব্য অসেব্য, জীবাণুরহস্য, ব্যাধি ও ব্যাধিপ্রতিসেধক, ব্যায়াম, জাতীয় অবনতি ও তাহার প্রতীকার, পল্লীমঙ্গল, সহরবাসীর কর্ত্তব্য, ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি, বাঙ্গালীর আঁতুর ঘর,

দাম্পত্য জীবন ও বিবাহ, প্রসব ও শিশুচর্য্যা, চিকিৎসক ও চিকিৎসা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আলোচ্য হইয়াছে। আশা করি বঙ্গভাষা পাঠক্ষম প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই গৃহে পঞ্জিকাকে গৃহে স্থান দিয়া ইহার উপদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। উপরের লিখিত ঠিকানায় এক আনা মূল্যের ডাক টিকিট পাঠাইলে পঞ্জিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বর ও মানব; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিনবতিতম ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিবৃত সন্দর্ভ আমরা পুস্তিকাকারে প্রাপ্ত হইয়া ও তাহা পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় কেবল বিদ্বান ও শাস্ত্রীয় তত্ত্বের নিধি নহেন, তিনি একজন ভক্ত। ভক্তের উক্তি সমালোচ্য নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার। ভক্ত নিজেও ভগবানের উক্তি নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার অনুভূতি ভ্রাতৃগণকে শুনাইবার জন্য আনন্দে আত্মহারা হইয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "কান পাতিয়া শোন বিশ্বপতি পরম পিতার সাদর আহ্বান, ভুলিয়া যাও দুঃখ শোকের ব্যথা, ভুলিয়া যাও বিপদ আপদের কথা, উৎসবের আনন্দ-ধারায় আমাদের সকল ব্যথা সকল যন্ত্রণা ধৌত করিবার জন্য ভগবান স্বয়ং উপস্থিত। ভগবানের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতম যোগ। যে অপরাজিত পরমপুরুষের শক্তি বলে আমাদের আত্মা ত্রিভুবন বিজয়ের শক্তিধারণ করে তিনিই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও।"

আপনাকে পরীক্ষা কর। আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ধর্ম্ম সাধনের জন্য, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের উদ্দেশ্যে স্বীকার করিতে হইবে তাহার প্রভাব। ভক্তের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে হইবে—

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।

ঠাকুরের পৌরহিত্য সার্থক হউক। তাহার প্রার্থনা স্পর্শ করুক হৃদয়ে হৃদয়ে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(নব পর্য্যায়)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক — শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

সপ্তম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক।

কোচবিহার।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

সপ্তম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
অকাল বোধন (সন্দর্ভ)	শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩১২
অভিনব চিকিৎসা	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	৪৫

আ

আত্মপ্রতি (গান)	স্বর্গীয় কবি চণ্ডীদাস বাগচী	২৮

উ

উদ্বোধন (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৫

ক

কদম্বমূলে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	১৩৯
কবি ও বাজীকর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	[illegible]২[illegible]
কবি নজরুল ইসলাম (কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	২৭৬
কলাবিদ্যা ও বস্তু তান্ত্রিকতা (সন্দর্ভ)	শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ,	[illegible]৬৯
কামিনীগাছের তলায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	৭৩
কিসের অভাবে এ দশা ?	শ্রী —	৩১

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
	খ	
খদ্দরের উপায়	"নবসঙ্ঘ"	১০৪
	গ	
গান	৺রামনিধি গুপ্ত	১০৬
গান	দীনসেবক ব্রহ্মানন্দদাস	৩৪৩
গোপন না প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ,	২০৬
গ্রন্থ-সমালোচনা	সহঃ সম্পাদক	১৮৯
	জ	
জন্মাষ্টমী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ী বি, এস-সি,	২৫১
	ঝ	
ঝড়ের রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন	৩৫
	দ	
দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ,	১৩, ২৮৯
	ধ	
ধর্ম্মভাব	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	২২৮
	ন	
নামাঙ্কন (কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	৮
নারী-প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
নারীর কথা	শ্রীযুক্ত অশ্রুমান দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল,	৮৭
	প	
পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষা সংস্কার	শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ রায় এম-এ	২০৭, ২৬৯
পাথেয় (কবিতা)	সম্পাদিকা	২৫৩
প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা কি দোষাবহ	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	১০১
প্রতীক্ষমানা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন	৩৭৮

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
প্রাচীন ভারতে মদ্যপান	শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	২৩৮
প্রেম-স্বপ্ন (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	১২৯
	ব	
বিরাট পুরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	২৫৭
বিপন্ন (চিত্র)	শ্রী—	৩৬
ব্যায়ামের দুই চারিটি সঙ্কেত	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু	৪৭
	ভ	
ভক্তিমন্ত্র (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ,	২৮৬
ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬৩
ভুল-ভাঙ্গা (গল্প)	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র প্রসাদ বসু	৩১৪
ভ্রম সংশোধন	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৫২
	ম	
মরণ-আড়াল (উপন্যাস)	শ্রী—	৫৭, ১১৮, ১৭৭, ৩৮০
মায়ের ডাক	অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ,	৯১
মদ্যপান সম্পূর্ণ অবৈধ (প্রতিবাদ)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	৯২
মোগল-সন্ধ্যা (নাটক)	শ্রীযুক্ত অশ্রুমান দাশ গুপ্ত এম-এ, বি-এল, ও শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,	৭, ১০৬, ১৬৭, ৩৫৯, ৩৩৬
	র	
রক্তাম্বরা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী	৭৪, ১৪০, ২১৪, ২৭৮, ৩২৪
রবীন্দ্র সদনে	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম-এ,	৩৫৭
রাজতরঙ্গিণী (ইতিহাস)	শ্রী—	১৯, ৬৭, ১৫৭, ৩৪৬
রামায়ণের ধর্ম্ম (আলোচনা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বিএল,	২৯৬
	শ	
শরতের গান (কবিতা)	সম্পাদিকা	২৬৮

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
শোক-সংবাদ	সহঃ সম্পাদক	১৮৯, ৩২২
	স	
সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'এক কথা	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	১৯৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	সহঃ সম্পাদক	১২৩, ১৮৪, ২৫৪
সুখের দিনের শেষে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৬৫
সুরভিআশ্রম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	২২৬
স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫৫
স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	২৯, ১৫৪
	ক্ষ	
ক্ষণিক সঙ্গীত (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৩৩৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নারী-প্রসঙ্গ। *

বড় ধন্য হয়েছি যে তোমাদের নিমন্ত্রণ পেয়েছি। আমাদের দেশে সর্ব্বত্র নারীরাই আতিথ্য করেন। তাঁরাই বাইরের লোককে ঘরের লোক করে নেন। এই তো তাঁদের 'বরণ'। এই বরণ করেই তাঁরা সর্ব্বদা অপরিচিতকে ঘরের লোক করেন। এই বরণ বা গ্রহণ করার ব্রত নারীর। এই নগরে পুরুষবন্ধুরা আমাকে সম্মানের সহিত স্বাগত করেছেন তবু যেন আমি এতদিন ঘরের বাইরেই ছিলাম। তোমাদের অন্তঃপুরে, দেশের হৃদয়ের মধ্যে এতদিন আমি আসি নাই।

* করাচী নগরে নারীসভায় কবি রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

দেশের হৃদয়ের মধ্যে নারীর বাস। দেশ তার প্রীতির ও আত্মীয়তার নিবেদন নারীর দ্বারাই জানায়। আজ এই কথাই বুঝলাম। যাহার পূর্ব্বে, ঠিক এই নগর থেকে চলে যাবার সময়ে তোমরা আমাকে ঘরে গ্রহণের মঙ্গলাচরণ করচ এতে আমার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়েচে।

জানি তোমরা বক্তৃতা চাও না। প্রীতি ও সমাদরে তোমরা জানিয়েছ যে, আমি দেশের জন্য কিছু করেচি। তোমাদের সস্নেহ অভ্যর্থনায় বলেচ যে, আমি তোমাদের আপন ঘরের আত্মীয়-জন। তাই দেশ-মাতার অন্তঃপুরে তোমাদের কাছে ডেকে নিয়েচ। এইটাই কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, বিশেষতঃ অন্য প্রদেশের অন্য ভাষার ভাষী লেখকের পক্ষে এ অভাবনীয় সৌভাগ্য।

তোমরা আমার কাছে কিছু হিতকথা শুনতে চেয়েছ, হৃদয়ের ভাব আজ কেমন করে বল্‌বো তা তো বুঝতে পারচি না। নারীর প্রতি, সর্ব্বদেশের নারীর প্রতিই আমি বড় শ্রদ্ধা রাখি। আমার প্রেরণা চিরদিন নারীর কাছ হতে পেয়েচি। যাঁরা আমাকে পোষণ করেছেন, জীবন দিয়েচেন তাঁদের কাছেই আমি আমার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণাও পেয়েছি। এইজন্যই তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার এই নূতন আরব্ধ কাজেও দেশজননীদের কাছে এই প্রেরণা চাই। আমার কাব্যে সেই প্রেরণা প্রিয়জনের কাছে পেয়েছি। তাঁদের প্রীতিতে তাঁদের সেবায় প্রেরণা পেয়েছি।

এই যে নূতন কাজ হাতে নিয়েচি, ইহা তরুণ বয়সে লেখা সাহিত্য-সেবার কাজ নয়। আমার সাহিত্য বাংলাতে লেখা। তার সুকুমার সম্পদ অন্য ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না। সেই ভাষায় চাবি বিনা এই রসের ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খোলে না। কাব্য অনুবাদ করা চল্‌তে পারে, তবে তার রমণীয় রস ও সুকুমার সৌন্দর্য্যের সম্পদ কখনই অনুবাদে আসে না। কাজেই বাংলা জানা ছাড়া আমাকে জানার অন্য উপায় নাই।

আমার এই নূতন (বিশ্বভারতীর) কাজে বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগের একটি ভাব আছে। বিশ্বজগতকে সেবা করবার এই সাধনা একলা আমার সাধনা নয়, ইহা সর্ব্বভারতের। বিশ বাইশ বৎসরের চেষ্টায় আমি একটি শিক্ষার তীর্থ রচনা করেছি। বহুকষ্টে বহুসাধনায় আমার অন্তরের সেই আকাঙ্ক্ষার যেন একটু চেহারা এখন দেখা দিয়েচে। আমার অন্তরের আদর্শটা ক্রমশ যেন প্রকাশ হয়ে আসচে। তাই বলছিলাম, এই কাজে দেশ-ভগ্নীদের কাছে প্রেরণা

চাই। ইহা যেন পুরুষদেরই সৃষ্টি না হয়। যদি আমার এই প্র[illegible]কে তোমরা যথার্থ ভারতীয় করতে চাও তবে এই সাধনাকে তোমরা নিজের সাধনা বলে গ্রহণ কর। এই ব্রতেও নারীর সেবার আবশ্যকতা সর্ব্বকাজে অনুভব করি।

যে-কোন সাধনাতে প্রেরণা-দানের শক্তিটি নারীর শক্তি। শিক্ষায় রাজনীতিতে নারীর অন্তরের প্রেরণা না পেলে কখনও শক্তি সত্য ও গভীর হয় না। আমি চিরদিন নারীর প্রেরণা পেয়েচি। আমার ভাগ্য ধন্য যে তোমাদের নগরে এসেও তোমাদের কাছ থেকে নতুন করে আমি প্রেরণা পেলাম।

এর অর্থ এ নয় যে সবাই তোমরা আশ্রমে এসে সাহায্য কর্‌তে পার। তবে আমার এই কাজে যদি যথার্থ প্রীতি ও শ্রদ্ধা তোমাদের থাকে, তবে তাতেই এই কাজ ধন্য হবে। অন্য সকল সেবকদের মধ্যে তোমাদেরই শ্রদ্ধা মূর্ত্তিমান হবে ও তাদের সেবায় দিনের পর দিন জোর দেবে। আমাদের সব অনুষ্ঠানেই নারীর কর্ত্তব্য, নারীর সাধনা অনেক পরিমাণে দরকার। সেইটে যদি বাদ পড়ে, শূন্য থাকে তবে অনুষ্ঠান একপেশে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার প্রাণশক্তি ফুটে ওঠে না। মানব-সভ্যতার সাধনা এত দিন পুরুষের সাধনা-মাত্র ছিল। কাজেই কেবল মাত্র পুরুষের সেবা পেয়ে এই সভ্যতার প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বর্ত্তমান সভ্যতা নারীর সেবা হতে বঞ্চিত এবং কেবল পুরুষের চেষ্টাজাত বলে তার মধ্যে লোভ, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা এ-সবই দেখা দিয়েচে। আজ তাই সর্ব্ব জগৎ পীড়িত ও ব্যথিত। পুরুষ কেবল তন্ত্র ও যন্ত্র নিয়েই কাজ করে। ব্যক্তিদের দিকে চায় না। তাই শক্তি, লাভ, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র লক্ষ্যের কাছে এই "ব্যক্তিত্বকে" বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তিদের দুঃখ বোঝবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত হৃদয় পুরুষদের নেই। তারা বিচ্ছিন্ন আসমানী তত্ত্ব (abstract truths) মাত্র বোঝে। ব্যক্তিত্বের দরদ বোঝে না।

যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে থাকার দুঃখ, আমি বুঝতাম। সেখানে দুঃখ কিসের? স্কুলে বড় দুঃখ, কারণ তাতে ক্লাশ আছে, ব্যক্তিগত ছাত্র নাই। ফললোভী মাষ্টার ক্লাশ দেখেন, ছাত্র দেখেন না—ব্যক্তির দরদ বোঝবার হৃদয় স্কুলের নাই, কাজেই এই রীতি নিষ্ঠুর। আমি বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়ে স্কুল ছাড়লাম। স্কুল পুরুষের সৃষ্টি, ব্যক্তির হৃদয়ের দরদ বোঝবার শক্তি তার নেই।

সভ্যতার যন্ত্রের দরকার আছে, তবে তার ব্যক্তিগত দরদ বোঝবারও দরকার আছে। ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে, এটাও তার বোঝা দরকার! আমি এই যন্ত্রের নিষ্ঠুরতা বুঝেচি; তাতেই আমার আশ্রমের সেবার্থ এই নারীর সেবাকে চাই। আমার কাজের হৃদয়ে তাঁদের চাই।

নারীর যে মহাশক্তি আছে, তা কেবল তাঁদের গৃহ সংসারই লুটে নিচ্চে, দেশ আর নারীর সেবাকে পাচ্ছে না। কাজেই বঞ্চিত দেশ দরিদ্র রয়ে গিয়েচে। হৃদয়ের রস ও কর্ম্মের শক্তি ঘরে ও সংসারেই রয়ে গিয়েচে। এই হেতু দেশ বহু দুঃখগ্রস্ত। নারী পিছে থেকেও প্রেরণা দান (iuspire) করে। এই প্রেরণার অভাব হলেও সেই অভাব সব সময় পুরুষরো বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু সব কাজেই তারা শক্তিহীন হয়ে আসে। তাই তো দেশের কাজে শক্তি হচ্চে না।

এই জন্যই আমি চাই আমার কাজ নারীরা নিজের বলে গ্রহণ করুন। আমি সহর থেকে সহরে যাচ্চি, পুরুষদেরই বলচি। নারীদের বল্‌তে পারচি না কোথায় নারীরা, কোথায় বোনেরা আজ তোমাদের যদি বা পেলাম, কিন্তু তোমারে কাছে হৃদয় প্রকাশ করবার মত ভাষা কই? এই যে ইংরাজীতে তোমাদের কাছে বলচি এই ভাষা না—তোমাদের, না—আমার তবু তোমাদের সামনে যে এসেচি এও ঢের। এই অতিথিকে কখনও তোমরা ভুলবে না, এই আশা মনে রাখি।

আমার কথার উপসংহারে পুরাণের একটা গল্প বলি। নারী পত্নী-সাবিত্রী তাঁর স্বামী সত্যবানকে মৃত্যুলোক হ'তে ফিরিয়ে আনেন। একথা সত্য যে আমাদের দেশ যুগ যুগ ধরে মৃত্যুগ্রস্ত। সত্য-সাধনা যে নেই। নানা মৃত আচারে, অনুষ্ঠানে ভিতরের সত্য চাপা পড়ে গিয়েচে। আজ সত্য দেখাই যায় না। ঋষিদের লক্ষ্য ভুলে গিয়েচি, ভারত তার সত্য হারিয়েচে। তোমরা এই দেশের কন্যা আমাদের ভগ্নী ও মাতা। তোমরা সাবিত্রী তোমাদের শ্রদ্ধাতে, সাধনাতে ও তপস্যাতে ভারতের সেই গভীর জীবনকে, সত্যকে বাঁচাও। সরল প্রেমের জোরে সত্যকে, সাধনাকে মৃত্যুর দ্বার হতে ফিরাও। নূতন জীবন তাকে দাও। আমরা পুরুষেরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে তার বিরাট প্রকাণ্ড পার্থিবতার মোহে মুগ্ধ হয়েচি। তাই সত্য লাভে বড় বাধা হয়েচে।

তোমাদের মিনতি সরল শ্রদ্ধায় তোমরা ভারতের সনাতন সত্য-সাধনার নূতন জীবন দাও। গভীর অধ্যাত্ম জীবন (spiritual life) দিয়ে সাধনার জীবনকে বাঁচাও। এই পার্থিব শক্তির পদদলন থেকে আমাদের দেশের সাধনাকে রক্ষা কর। অন্ততঃ ভারত একমাত্র সেইরূপ দেশ হোক, যেখানে আত্মার সত্য পার্থিব সত্য হতে বড়। লোভ, অতি-উৎপাদন, নিষ্ঠুরতা-জর্জ্জরিত, বৈষয়িক-বুদ্ধি-কলুষিত, জরা-জীর্ণ, বিশ্বাসহীন জগৎকে শ্রদ্ধার দ্বারা, আশার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা বাঁচাও। শ্রদ্ধাতে সাধনার জীবনকে জাগ্রত রাখ।

পরের অনুকরণ, স্বার্থান্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, প্রতিদিন আমাদের দুর্ব্বল করেচে। তাদের সভ্যতার সুরা পান করে কেমন মত্ত হয়েছি তা দেখলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাশা ও অবসাদ আসে। জানি এই দুর্গতি আসবে ও যাবে, তোমরা যদি তোমাদের তপস্যার জ্যোতি দাও, তোমাদের শ্রদ্ধার জীবন দাও, প্রাচ্যের আত্মাও জাগ্রত হবে। আমাদের মৃতপ্রায় আচার, ভারগ্রস্ত সত্য, তোমাদের সাধনার বলে প্রকাশিত হবে। নিত্যসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আবার জাগবে। তোমরা জীবন দাও, যাতে ভারতের যথার্থ জীবনের প্রকাশ হয়। যাতে দুর্ভিক্ষগ্রস্থ, ক্ষুধিত, তৃষ্ণিত, আহত প্রতীচ্য এদেশে এসে এই প্রাচ্যের সাধনার আশ্রমে জীবনে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে।

'শ্রেয়সী'।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

উদ্বোধন।

—:o:—

চির সুন্দর হে
জাগো!
মম বিরহ বেদন অবসানে।

চপল কানন বীথি,
আকুল মিলন গীতি,
সজল নয়ন নিতি
ছল ছল অভিমানে ;
শিথিল কবরী পাশ,
মলিন নিচোল বাস,
ব্যথিত নীরব ভাষ
কেঁদে ফিরে সারাপ্রাণে।
চির বাঞ্ছিত হে
জাগো !
মম মরম মুখরি' গানে গানে।
বাসক শয়ন পাতি'
কুসুম মালিকা গাঁথি'
জাগিয়া কাটাই রাতি
চেয়ে চেয়ে আঁখি পানে ;
যামিনী বহিয়া যায়,
মালিকা শুকানো হায়,
কাঁদিয়া দখিন বায়
কত ব্যথা বহি আনে !

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

মোগল-সন্ধ্যা।

—:০:—

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র সময়—স্তিমিত জ্যোৎস্নালোক
জাহান, হামিদ খাঁ ও আহত আজীম।

জাহান। হামিদ, যুদ্ধক্ষেত্র আজ কি ভয়ানক দেখাচ্ছে! অনেক যুদ্ধ জয় করেছি, যুদ্ধক্ষেত্রও অনেক দেখেছি, কিন্তু এত রক্তের খেলা ত কোন দিনই দেখি নি। রাজপুত সৈন্যের বীরত্ব চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্য যে এত নির্ভিক সে ত জানতুম না। একটী সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেনি—মৃত্যুকে সমস্ত আকাঙ্খার সঙ্গে বরণ করেছে। হামিদ, ঐ শোন কোন্ আহত সৈন্যের আর্ত্ত চীৎকার। মুমূর্ষুর কাতরতা থেকে থেকে এ ভীষণ রাত্রির নীরবতায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। উঃ কি ভীষণ, আকাশে নিশ্চল তারাগুলি আগের মতই মিটি মিটি হাস্‌ছে। নিথর আঁধার স্থানে স্থানে কালো হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে আর নদী সেই পুরাতন কল্ কল্ স্বরে বয়ে চলেছে।

(একজন সেবাব্রতচারীর প্রবেশ; সঙ্গে জলপূর্ণ চামরার থলে)

কে তুমি যুবক এ আঁধারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুড়ে বেড়াচ্ছ ?

হামিদ। নিশ্চয়ই চোর, শাহজাদা! মৃত সৈনিকদের সম্পত্তি চুরি কর্ত্তে এসেছে।

যুবক। আমি চোর নই—স্বামী প্রেমদেবের শিষ্য। তার সঙ্গে এ যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা কর্ত্তে এসেছি।

হামিদ। তবে তোমার হাতে ওটা কি ?

যুবক। এর ভেতর জল।

জাহান। হামিদ, নিজের কলুষিত মনের আলোকে জগতটাকে দেখ না। যাও যুবক তোমার কাজ কর।

চন্দ্রের আলায় ঐ বেদনা কাতর মুখখানা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। হামিদ দেখে এসো ও মোগল না বাঙ্গালী।

(হামিদের অগ্রসর হওন।)

হামিদ। তাইত, এ যে শাহজাদা আজিম।

জাহান। (ছুটিয়া গিয়া) কি! দাদা আজিম! হামিদ, এখনও জীবন আছে, শীঘ্র শিবির হতে আলোক ও পাল্কী নিয়ে এস।

(হামিদের প্রস্থান)

(উচ্চৈঃস্বরে) দাদা! দাদা! (ঝুঁকিয়া পড়িয়া)

আজিম। কে? সি-য়া-র

(আজিমের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু)

জাহান। (উপবেশন) একি হল, হায় আর ত নিঃশ্বাস পড়ছে না (নাকে হস্তার্পণ করিয়া) প্রদীপ নিভেছে—একটুখানি দীপ্তি দেখিয়ে চির আঁধারে ডুবে গেল।

(আজীমের মস্তক অঙ্কে স্থাপন করে)

দাদা, ক্ষমা চাইবার অবসরটিও আমায় দিলে না? এ আমারও ঠিক্ শাস্তি। আজ চোখে জল আস্‌ছে না, কেন আসবে? স্নেহ, দয়া, ভালবাসা এ জগতে আর কিছুই নেই—আছে শুধু পর্ব্বতের মত প্রকাণ্ড লোভ। ছোট বেলায় সিয়ার আর আমি তোমার কাছে বসে কত খেলাই খেলেছি, কত স্নেহই তুমি করেছ কিন্তু সব ভুলে গিয়ে যুদ্ধে এসেছিলাম। তাই খোদার এই কঠোর বিধান।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ, আর কিছুই দরকার নেই, সাঁজের মেঘের কোলের বর্ণরাগ, প্রভাতের গরিমা আজ ঝরে গেছে; দাদা, দাদা! ক্ষমা করো। মৃত্যুর পরে যদি জীবন থাকে সেখান থেকে তোমার ছোট ভাইটিকে ক্ষমা পাঠিয়ে দিও।

(পটনিক্ষেপন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল উদ্যানবটিকা। কাল—অপরাহ্ন।

ফরাকসিয়ার ও জুলেখা দণ্ডায়মান।

জুলেখা। কার কথা ভাব্‌ছিলে, সিয়ার! বল না, আমি কখনো রাগ্ কর্‌ব না; বল তোমার পায়ে পড়ি।

সিয়ার। তুমি রাগ কর্লে ত আমার বয়ে ভারী বয়ে যাবে। আমি কেন বল্‌ব—কি সুন্দর তার কালো কালো দুটো চোখ———

জুলেখা। থাম, থাম, আর তোমার বল্‌তে হবে না। আমি সব বুঝেছি, আমায় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে—ক'দিন হতে দেখ্‌ছি তোমার মুখে হাসি নেই, কেবল ভাবনা, সত্যি করে বল।

সিয়ার। হাঁ সত্যি করে বল্‌ছি—ঢেউ খেলানো মিশ্‌মিশে কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল।

জুলেখা। বেশ বলে যাও।

সিয়ার। টুকটুকে গালের উপর কালো তিলটী ছোট্ট একটুকু।

জুলেখা। ভারি দুষ্টু তুমি, সোজা করে বল্লেই হোত আমাকে ভাব্‌ছিলে। আচ্ছা, সিয়ার! বাবা বল্‌ছিলেন তুমি বাদশা হবে, বাদশা' হলে তুমি ভালবাস্‌বে তো?

সিয়ার। তুমি যে তখন আমার বেগম হবে, তোমায় কি না ভালবেসে থাক্‌তে পারি জুলি!

জুলেখা। শুনেছি বাদশাদের অনেকগুলো করে বেগম থাকে—আমি যেমন পায়রা পুষেছি, কারো নাম মতি, কারো নাম চুনী, কারো নাম বা হীরে ঠিক্ তেম্‌নি বাদশারা সুন্দর মেয়ে ধরে এনে বেগম-মহালের খাঁচায় অনেক বেগম পোষে, একি সত্যি সিয়ার?

সিয়ার। হাঁ সত্যি।

জুলেখা। তবে তুমিও বাদশা' হয়ে ওরকম অনেক বেগম পুষবে, নয়?

সিয়ার। (একটু কৌতুকের হাসি হা'সয়া) নিশ্চয়ই।

জুলেখা। যাও, তবে আর আমি তোমার বেগম হচ্চিনা। যদি প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার বেগমমহাল শুধু আমার রূপেই আলো পাবে তবেই আমি তোমার বেগম হতে স্বীকার করব। তা ছাড়া কখ্‌খনো না।

সিয়ার। জুলি, তুমি বুঝি ভাব তুমি খুব সুন্দরী।

জুলেখা। হাঁ ভাবি বৈ কি? আগে ভাবতুম না। তুমি যেদিন থেকে আমায় ভালবাস্‌তে সুরু করেছ ঠিক্ সেদিন থেকে।

সিয়ার। কেন?

জুলেখা। বাঃ বেশ, এও তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে তুমি যে ভারী সুন্দর, যারা নিজে সুন্দর তারা সুন্দরীকেই ভালবাসে।

সিয়ার। ও তাই তুমি বড় ভুল করেছ। আমি তোমার চোখে সুন্দর হতে পারি কিন্তু সকলের চোখে নয়।

জুলেখা। আলবৎ সকলেরই চোখে। যে বল্‌বে না, তার চোখ নেই—থেকেও নাই।

সিয়ার। তোমার কথামত যারা কুৎসিত তারা কুৎসিতকেই ভালবাস্‌বে না?

জুলেখা। সে কেন হতে যাবে। সুন্দরকে যে সবাই চায়। সুন্দর যারা তারাও চায় আর কুৎসিত যারা তারাও, তবে যারা সুন্দরী তারাই শুধু সুন্দরদের পেয়ে থাকে।

সিয়ার। বেশ, তোমার আগেকার কথার সাথে পরের কথায় মিল রইল কোথায়? সব ভুল করে ফেলেছ।

জুলেখা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌তে চাই না। বেশ ত আমায় যদি সুন্দরী বল্‌তে তোমার ইচ্ছে না হয় তবে নাই বা বল্‌লে।

সিয়ার। নিশ্চয় বল্‌ব তুমি সব চাইতে সুন্দরী। জুলি, সৌন্দর্য্য আমার কাছে শুধু দেহের রূপ নয় সে যে একটা ভাব প্রতি অঙ্গে অঙ্গে যে ভাব ফুটে উঠেছে।

জুলেখা। বাঃ আমি একটা ভাব?

সিয়ার। জুলি, সত্যই তুমি এটা ভাব। ঐ যে রাজমহলের শীর্ণ গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে বক্ষের উপর বসন্তের মৃদু নিঃশ্বাস সন্তাড়িত ক্ষীণ তরঙ্গের কুঞ্চন-রেখা ধারণ করে পূর্ণতায় অপ্রগল্‌ভ সৌন্দর্য্য শান্তি, মহিমায় করুণ ওর মধ্যে যে ভাব তোমার মধ্যেও সেই ভাব। শীতের কুহেলিকাজাল যখন পূর্ণিমার শুভ্র জোৎস্নালোকে ভেসে যায়, ধরিত্রী মুখখানি পবিত্র, মৌন, রিক্ত সৌন্দর্য্যে ভরে ওঠে সেই রূপের সঙ্গে তোমার রূপ এক সুরে বাঁধা। জুলি, তোমার এই স্নিগ্ধ ভাব-সুষমাই আমার চোখে তোমায় সুন্দর করেছে।

জুলেখা। বেশ তুমি ত এক নিঃশ্বাসে একটা প্রকাণ্ড রকমের বক্তৃতা করে ফেল্লে, এর পাল্টা জবাব দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। এত মুখের জোর আমার নেই আর এতক্ষণ দম আটকিয়ে রাখ্‌তেও আমি পারব না। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখি—ঐ যে সাগর আপনার বিশাল উন্মুক্ত বক্ষ বিস্তার করে নব বধূর মত মৃদুগুঞ্জনা, কম্প্রচরণ গামিনী প্রেয়সী গঙ্গাকে নীরবে ডাক্‌ছে সেই স্থির সাগরের মত হলে তুমি। কেমন হয়েছে ত?

সিয়ার। বাঃ বেশ বলছে, তুমিও যে কবি হয়ে উঠ্‌লে।

জুলেখা। পরশ পাথরের স্পর্শে যেমন সব সোনা হয়ে যায়।

সিয়ার। পরশ পাথর কে? তুমি না আমি? আমি ত আগে কবি ছিলুম না তুমিই আমার প্রাণে সুরের আগুন জ্বেলে দিয়েছ। জুলি, এখানে এসে ঐ দেখ পশ্চিম আকাশে কেমন রঙের খেলা। একের পর আর এক রঙ্গ পাপ্‌ড়ীর মত যেন ঝরে পড়ছে আবার কখনও বা সকল রঙ্ মিলে একই সঙ্গে ফুটতে চাচ্ছে। এ যেন একটা সঙ্গীত 'সা' থেকে 'নি' পর্য্যন্ত প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ্বনিত হয়ে পরে একই সঙ্গে ঝঙ্কৃত হবার প্রয়াসী। জুলি, একটা গান গাইবে?

জুলেখা। তুমি যখন বল্‌চ তখন নিশ্চয়ই গাইব।

(গীত)

কি গান তোমার কণ্ঠে বাজে কোন্ তানে।
ক্রন্দন উঠে গুঞ্জরী নব যৌবন অবসানে॥
বেদনা-ব্যাকুল হৃদিটী বয়ে যায় কত দূর।
মারাল মরণ চাও গাহিয়া ঐ সে করুণ সুর॥
ঘন নির্ঝর বাদলের গান শোনালে গোপন স্বপনে।
ব্যথা তোমার কম্‌বে কিগো মিলিয়ে যাবে কলতানে॥

(পটক্ষেপণ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠস্থ প্রবেশদ্বার। কাল—প্রভাত।

জাহান হামিদ খাঁ ও রুস্তমদিল খাঁ দণ্ডায়মান।

জাহান। হামিদ, নগরের তোরণ দেশে ত একটা লোকও দেখ্‌ছি না।

হামিদ। তাই ত, সব গেল কোথায়? এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করে আসলেন, জনাব, আর একটা প্রাণীও আজ আপনাকে অভিবাদন কর্ত্তে আসে নি। সব বেয়াদব; নেমখারামের দল।

জাহান। ঐ দেখ নগর যেন এ কয় দিনের কিসের উৎসবে মত্ত হয়ে আজ তন্দ্রাহত হয়ে পড়েছে। তোরণ দ্বারের ফুলের মালাগুলি শুকিয়ে গেছে, কত প্রমোদ রজনীর জাগরণে সুদৃশ্য প্রাসাদগুলির শোভা যেন একটু মলিন, পরিহিত আভরণগুলি যেন স্বস্থানচ্যুত, রাজপথ জনহীন, ব্যাপার কি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, হামিদ।

হামিদ। ব্যাপার আর কি বুঝ্‌তে চান, সংসারের যে ব্যাপার চিরকাল ঘটে থাকে এখানেও তাই ঘটেছে।

রুস্তম। মনে হয় কারও যেন অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে—

জাহান। অভিষেকোৎসব? কার হবে!

হামিদ। ঐ যে সেনাপতি জুলফিকার আসছে এবার সব খবরই পাবেন।

জুলফিকার। বন্দেগী শাহজাদা!

জাহান। বন্দেগী জুলফিকার খাঁ।

জুলফিকার। শাহজাদা! যুদ্ধে ত আপনার কোন অস্ত্রাঘাত লাগে নি।

জাহান। না সেনাপতি, আপনাকে ধন্যবাদ।

জুলফিকার। কি হামিদ, তোমাকেও যে অক্ষত দেখছি আমি যে কৌশলটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম সেইটেই বোধ হয় অবলম্বন করেছিলে?

জাহান। ক্ষমা করবেন জুলফিকার খাঁ। আপনার উপদেশ মত কাজ করবার সুবুদ্ধি আমাদের হয় নি। হামিদ বলছিল বটে।

জুলফিকার। আমি উপহাস করে শুধু ওকথাটা হামিদকে বলেছিলুম।

জাহান। এ যে আপনার উপহাস মাত্র তা আমি বেশ জানি। (শ্লেষ জড়িত-স্বরে)

জুলফিকার। কি রুস্তম যে।

রুস্তম। হাঁ খাঁ সাহেব আবার আপনাদের দেখতে এসেছি।

জুলফিকার। হামিদ! যুদ্ধ হতে ফিরে আসলে পর আপনার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হবার কথা ছিল।

জাহান। হাঁ কিন্তু সে আপনাদের মরজী।

জুলফিকার। শাহজাদা জাহান্দার রাজ্যে প্রচার করে দিয়েছেন যে তিনিই এখন মোগল-সাম্রাজ্যের একমাত্র সম্রাট তাই আপনার অভিষেকের পরিবর্ত্তে গত—পরশুদিন তাঁরই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছে, আর বর্ত্তমান দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হলেন ইমতিয়াজ বেগম।

হামিদ। কে? সেনাপতি?

জুলফিকার। সেই—বিখ্যাত গায়িকা অপূর্ব্ব-সুন্দরী বাইজী লালকুমারী।

(হামিদ এই কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল)

শাহজাদা সম্রাটের আদেশে এ খবর জানাবার ভার আমার উপরেই পড়েছে। কিছু মনে মনে করবেন না আমি শুধু সম্রাটের আদেশ পালন করলুম।

জাহান। (দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া)

জুলফিকার খাঁ! দেখুন দেখি ভ্রাতৃরক্তে এ হাত কতটা কলঙ্কিত হয়েছে? অবাক হয়ে রইলেন যে, দেখুন!

জুলফিকার। শাহজাদা আমার কোনই দোষ নেই মনে কিছু করবেন না।

জাহান। মনে আর করব কি! এ অভ্যর্থনাই আমার উপযুক্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জুলফিকার খাঁ! এ মুখোস আপনি কবে ছাড়বেন? বয়স ত আপনার কম হয় নি। আমায় ভাঁড়াবার চেষ্টা বৃথা। আমি জানি আপনার যথার্থ রূপটা কি ঘোর কুৎসিত, কি বীভৎস! সেই বীভৎসতাটাকে আপনি আরও বাড়িয়ে তুলছেন আপনার ঐ ছিন্ন সছিদ্র ছদ্ম বেশটী পরে'।

জুলফিকার। শাহজাদা! সম্রাটের আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম্ম—

জাহান। মিথ্যা কথায় এ জায়গার বাতাসটাকে আর কলুষিত করবেন না। সম্রাটের আদেশ পালন আপনার ধর্ম্ম—! তবে বাহাদুর বাদশার আদেশটা রক্ষা করা ধর্ম্ম বলে মনে হয় নি কেন?

জুলফিকার। আপনাদেরই মঙ্গলের জন্য।

জাহান। আমাদের মঙ্গলের জন্য? যা করেছ সবই স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। সাপের মত খল, ক্রুর, বিশ্বাসহন্তা! তোমাকে জাহান্দার বাদশা চিনে নি কিন্তু জাহান চিনেছে।

জুলফিকার। (রাগতঃ স্বরে) শাহজাদা!

জাহান। আমার সম্মুখ থেকে এখনই তুমি চলে যাও। তোমার মত হীন, ঘৃণিত, নরপশুর রক্তে এ তরবারি কলুষিত করতে চাই না—সে জন্যই এতক্ষণ সহ্য করে আছি।

জুলফিকার। উদ্ধত যুবক! তোমার পতনের আর বেশী দেরী নেই। এসো হামিদ!

হামিদ। আদাব শাহজাদা!

জাহান। যাও, হামিদ! তোমাদের একই সঙ্গে থাকা উচিত। কিন্তু মনে রেখো হামিদ! যে পথে চলেছ সে পথে কখনই তোমার মঙ্গল হবে না।

(জুলফিকার ও হামিদের প্রস্থান)

জাহান। রুস্তম, আমি মিথ্যা প্রলোভনে পড়েছিলাম। সাফল্যের মোহ আমার চোখের সামনে সুখের মরীচিকা সৃষ্টি করে—আমায় কত নীচে নাবিয়ে নিয়ে গেছে। আমার মতিভ্রম হয়েছিল—যার স্নেহের অঙ্কে আমার শৈশবের সুখের দিনগুলি কেটে গেছে—স্নেহশীল দাদা আজিম! তোমায় কি না জীবনের ওপারে মৃত্যুর দেশে রেখে এলুম। রুস্তম! মিথ্যাকে জীবনে বরণ করেছিলাম তাই এ শাস্তি আমার যথার্থ পাওনা—এ আমার যথার্থ পুরস্কার!

পটপরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী প্রমোদ ভবন। সময়—রাত্রি।

লালকুমারী, জাহান্দার, জুলফিকার খাঁ ও হামিদ খাঁ।

লালকুমারী। আমার সব সাধ পূরেছে—বাইজী ছিলুম, বেগম হয়েছি। লালকুমারী আজ বেগম, না কে সেই লালকুমারী, সে ত মরেছে। আমি আজ দিল্লীর সম্রাজ্ঞী ইমতিয়াজ। এখন কিছু দিন ধরে দুনিয়াটাকে শাসন করতে হবে, দেখব কে আমার ক্ষমতাটাকে বাধা দেয়। যে বাধা দিতে আসবে মৃত্যুদণ্ড তার মাথার উপর আকাশের বাজের মত অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়বে। এ সাম্রাজ্যে শুধু একটা আইন আমার হুকুম। আমার হুকুমে লোক বসবে আর আমার হুকুমে দাঁড়াবে। জুলফিকার খাঁ! তুমি ভেবে রেখেছ যে জাহান্দার বাদশা প্রেমের স্রোতে ভেসে চলবে—আর এ দুনিয়াটার কর্ত্তৃত্ব তুমি করবে। হাঁ জাহান্দার বাদশা ভেসে চলবে বৈ কি যত দিন আমার এ যৌবন আর এ রূপ। কিন্তু ইমতিয়াজ বেগমকে ভুলিয়ে রাখবে কি করে? সে অনেক দিন লক্ষ্য করেছে তোমার ঐ ভাণকরা সরলতার দৃষ্টির আড়ালে একটা ধারাল ছুরি ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। তোমারি সাহায্যে সিংহাসনটাকে দৃঢ় করে তারপর তোমায় একদিন নিপাত করব—তবেই আমি ইমতিয়াজ বেগম।

(জাহান্দারের প্রবেশ)

জাহান্দার। ইমতিয়াজ তোমার ঐ দেহটাকে ঘিরে কি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছ—ও আগুনে যে আমার সব পুড়ে গেছে। আমার কত কালের সাধনা, আমার কত সাধের কর্ম্ম চিন্তা ভাব সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ইমতিয়াজ। নাথ! এ ভাবনা আজ তোমার এল কেন?

জাহান্দার। তাই ত, এ ভাবনা আজ ভাবছি কেন? এ যে অতীতের সুর। অতীতকে চোখের সামনে হতে একেবারে মুছে ফেলেছি এখন শুধু আমার একমাত্র সত্য সুন্দর বর্ত্তমান। অগাধ অনন্ত সমুদ্রের জ্যোৎস্না হিল্লোলের হাসিটুকু নিয়ে বর্ত্তমানের চিরচঞ্চল ঢেউগুলি হৃদয়কূলে আঘাত করে' যেমন আঁধারের দেশ হতে এসেছিল তেমনি আবার ছায়ার দেশে চলে যাচ্ছে। ইমতিয়াজ! তোমায় ছেড়ে যখন দূরে থাকি তখনই

এ দুর্ভাবনাগুলি আমায় চেপে ধরে—আবার তোমার কাছে এলেই সব ভুলে যাই—কত সুন্দর তুমি!

ইমতিয়াজ। হাঁ আমি আবার সুন্দর! তোমার বর্ত্তমান কত সুন্দর।

জাহান্দার। অভিমানিনি! আমার বর্ত্তমান তুমিই সৃষ্ট করেছ; তোমার ঐ অপরূপ রূপের নিত্য নবীন উন্মেষে আমার কামনার দীপ সহস্র শিখায় জ্বলে উঠছে, রূপে এত জ্বালা, ভোগে এত অতৃপ্তি। ইমতিয়াজ! আমায় সব ভুলিয়ে দাও স্মৃতির দাহন থেকে আমায় মুক্ত করে' জগৎটাকে আমার বেফাঁক করে দাও। পারবে?

(জুলফিকার খাঁ ও হামিদ খাঁর প্রবেশ ও কুর্নিশ করিয়া অবস্থান)

ইমতিয়াজ। কি জুলফিকার খাঁ! খবর কি?

জুলফিকার। জাহান এসেছে।

ইমতিয়াজ। তাকে খবর দিয়েছ?

জুলফিকার। হাঁ সম্রাজ্ঞী! কিন্তু.........

ইমতিয়াজ। "কিন্তু" বলে—কথা শেষ না করেই থেমে পড়লে যে? বল খবর পেয়ে তার ভাবটা কি রকম হয়েছিল?

জুলফিকার। বড় সুবিধার নয়। তার ভাবে বোধ হল যেন সে বিদ্রোহ করবে। কি বলো হামিদ!

হামিদ। হাঁ...না...তবে একটা গোলযোগ যে ঘটবে সে নিশ্চয়।

জুলফিকার। সে নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র করে' দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে চেষ্টা করবে।

জাহান্দার। না জুলফিকার খাঁ! জাহান জাহান যদি কিছু করে সে ষড়যন্ত্র নয়, প্রকাণ্ড যুদ্ধ।

ইমতিয়াজ। সে একই কথা সম্রাট!

জুলফিকার খাঁ! যাও জাহানকে বন্দী করো; আমার হুকুম শীঘ্র তাকে বন্দী করো।

জুলফিকার। সম্রাজ্ঞীর আদেশ শিরোধার্য্য,—চলো হামিদ!

(কুর্নিশ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ)

জাহান্দার। জুলফিকার খাঁ, দাঁড়াও।

লালকুমারী। কেন, বাদশা।

জাহান্দার। একটু ভেবে নি।

ইমতিয়াজ। ভাবনার এতে কিছুই নেই সম্রাট! সিংহাসনকে দৃঢ় করতে হলে রক্ত দিয়ে মাটী ভেজাতে হবে—যাও জুলফিকর খাঁ! দাঁড়িয়ে রইলে যে এখনি যাও, হুকুম পালন কর।

(জুলফিকার ও হামিদের প্রস্থান)

জাহান্দার। ইমতিয়াজ!

ইমতিয়াজ। কি সম্রাট?

জাহান্দার। সম্রাট! ইমতিয়াজ! সম্রাট!

(অবরুদ্ধ রোষে প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। হুকুম দেবার কি নেশাটাই আজ আমায় চেপে ধরেছিল—একটু বেশী দূরে চলে গেছি বোধ হয়। না, ঠিকই করেছি। এ সিংহাসন আমায় রক্ষা করতেই হবে,—যখন বেগম হয়েছি এ যেন দু'দিনের খেলা হয়ে দু'দিনেই না ফুরিয়ে যায়।

পটক্ষেপণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নামাঙ্কন।

—:০:—

দেশ বিদেশে যখন গেছি যেইখানে
নামটী তোমার লিখেছিলাম সেইখানে—
লতায় ঘেরা খসরুবাগের মন্দিরে
নামটী তোমার ক'রেদিছি বন্দী রে।

শারদীয় পূর্ণিমার এক পক্ষতে
লিখেছিলাম যমুনারই বক্ষতে
জলের বুকে জলের লেখা অক্ষরে
নামটী লিখি—এমন নহি দক্ষ রে!

নব নীপের তরুণ শাখের অঙ্কেতে
লিখেছিলাম নামটী তোমার সঙ্কেতে;
কেউ হেসেছে—কেউ বলেছে মন্দ রে—
তবুও লেখা হয়নি আমার বন্ধরে।

প্রণয় যেথা মূর্ত্তি ধরি' মর্ম্মরে
প্রচার করে বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্ম রে;
পঞ্জীভূত প্রণয় যেথা নিশ্বাসে—
নামটী তোমার লিখি সেথায় বিশ্বাসে।

"যদি কোথাও স্বর্গ থাকে সংসারে
এইখানেতে—নয়কো কোন দূরপারে"—
স্বর্গ এমন বিশ্বমাঝে যেইখানে
যত্নে লিখি নামটী তোমার সেইখানে।

সাগর কূলে যেথায় ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী
বৃথাই গেছে পরশমণি অন্বেষি—
বিজন বেলা-ভূমির প'রে নির্জ্জনে
নামটী তোমার লিখেছিলাম একমনে।

বিশ্ববুকে যে নাম তোমার অঙ্কিত
হৃদয় তারে সে নাম সদাই ঝঙ্কৃত—
গানটী যবে থামবে হৃদি-যন্ত্রে,
নামটী রবে বিশ্ব বুকের অন্তরে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

রাজতরঙ্গিণী।

—:০:—

গোনন্দের পর বিভীষণ (প্রথম) ৫৩ বৎসর, ৬ মাস (কাশ্মীরে) রাজত্ব করেন। তৎপর ইন্দ্রজিৎ ও তাঁহার অভাব হইলে, তাঁহার পুত্র রাবণ সিংহাসনারূঢ় হন। রাবণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই লিঙ্গ বিবিধ চক্রে পরিশোভিত এবং মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপিত। লিঙ্গ দেব ভবিষ্যত বাণী, প্রত্যাদেশপরায়ণ। রাবণ রাজ তাঁহার সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাবণ ও তদীয় পিতার রাজ্যকাল ৩৫ বৎসর ৬ মাস।

তৎপর রাবণের পুত্র বিভীষণ (দ্বিতীয়) ৩৫ বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন।

বিভীষণ লোকান্তরিত হইলে তদীয় পুত্র নর (১ম) রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গলার্থ যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বিচার শক্তির অভাবে, প্রজাবর্গের অশেষ দুঃখের কারণরূপে পরিণত হইয়াছে। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার প্রাসাদ সন্নিকটে বাস করিত। পাপাত্মা তাঁহার রাণীকে মোহজালে আবদ্ধ করিয়া রাণী সহ পলায়ন করে; রাজা এই ব্যাপারে এরূপ মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ধর্ম্মালয় ভস্মসাৎ না করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন না। কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা বৌদ্ধমন্দিরগুলি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং বিতস্তা তটে একটি সুন্দর নগরী স্থাপন করিলেন। এই নগরী বহু প্রশস্ত বর্ত্মে, মূল্যবান বিপণী-বীথিকায় সুসজ্জিত ছিল। মনোহর উদ্যান ও নানা প্রকার স্থপতি কলায় পরিশোভিত হইয়াছিল। নগরী মধ্য প্রবাহিতা বিতস্তা-বক্ষে অসংখ্য বাণিজ্য তরণী ভাসমান থাকিত।

এই নগরী মধ্যে জনৈক অনুপমা ব্রাহ্মণ কামিনী বাস করিতেন। তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যকাহিনী সর্ব্বত্র গীত হইত, (তিনি নাগদুহিতা ছিলেন—প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়া ব্রাহ্মণকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন।) অসামান্যা ব্রাহ্মণ বধূর রূপ-বার্ত্তা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা তাঁহাকে হস্তগত করিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। কলঙ্ক ভয় দুরাত্মাকে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। আর একটি ঘটনা ঘটিয়া রাজার চিত্তদমন চেষ্টা অসম্ভব করিয়া তুলিল। এক দিন ব্রাহ্মণী গৃহ-অলিন্দে উপবেশন করিয়াছিলেন। গৃহ বহির্দ্দেশে কতকগুলি শস্য আতপতাপে শুষ্ক হইতে দেওয়া হইয়াছিল; একটী অশ্ব আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অশ্বকে বিতাড়িত করিতে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন; তৎকালে তাহারা কেহই গৃহে উপস্থিত ছিল না। তিনি স্বয়ং অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া অশ্বসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া সজোরে তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। তাঁহার হস্তচিহ্ন অশ্বগাত্রে সুবর্ণ চিহ্নে অঙ্কিত হইয়া গেল। রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রাপ্ত হইতে অধিকতর ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে বহু ধন রত্নের প্রলোভনে পতিতা করিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিলেন, সকল চেষ্টাই

নিষ্ফল হইল। ইহাতে সেই কামান্ধ নির্লজ্জ রাজা নিরস্ত হইল না। স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার স্ত্রীরত্নকে প্রার্থনা করিলেন। স্বামী রাজ অত্যাচারে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণীকে হস্তগত করিবার মানসে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গুপ্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করিলেন ও নাগরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুহিতার অপমান নির্য্যাতন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া নাগরাজ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। নরের বিতস্তা নগরী আক্রমণ করিতে অচিরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধ-বাহ্নতে বিতস্তা ধ্বংস মুখে পতিত হইল। পলায়নপর নগরিকগণ চক্রচরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। নগরী ভস্মস্তূপে পরিণত হইল; বিতস্তা নগরী শত সহস্র মৃত দেহে কলঙ্কিত অপবিত্র হইল। নর রাজ সমরে প্রাণ হারাইলেন।

ইতিমধ্যে নাগরাজ ভগিনী রমণী বহু সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, ভ্রাতার সাহায্যার্থ গিরি-কন্দর হইতে বহির্গতা হইলেন। সমর ক্ষেত্রের এক যোজন ব্যবধানে থাকিতেই তিনি ভ্রাতার সাফল্যের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রমণী স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্তা হইলেন। তাঁহার উন্মত্ত সৈন্যগন পঞ্চ যোজন মধ্যস্থ পল্লীগুলি মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিল; কেহই পরিত্রাণ পাইল না। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন উক্ত প্রদেশে দৃষ্ট হয় বহু শিলাস্তূপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ও সেই প্রদেশ এখনও রমণী-অটবী নামে অভিহিত হইতেছে।

বহু লোকের প্রাণসংহার করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ নাগরাজার আপনার প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জনপদ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর গিরি আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি সরোবর খনন করেন। অমরেশ্বর যাত্রা পর্ব্ব উপলক্ষে এই সরোবর বর্ত্তমান কালেও দৃষ্ট হয়। এই সরোবর সন্নিকটে আর একটি তড়াগ দৃষ্ট হয়—ইহা জামাতৃসর নামে অভিহিত। নাগরাজ জামাতা উক্ত ব্রাহ্মণ এই সরোবর খনন করাইয়াছিলেন।

রাজার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা অজ্ঞানতার হেতু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু রাজার দুর্ব্বলতায় প্রজাকুল যেরূপ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয় অন্য কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। রাজা যখন প্রজা পালনের ছল করিয়া অন্যায় আচরণে লিপ্ত হন, তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অজ্ঞাতে আগমন করে। কারণ ইহা নিশ্চিত যে সতী স্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও দেবতার অভিশাপে ত্রিলোক

ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। কত কাল হইয়া গিয়াছে, তবুও চক্রধর গিরি সন্নিকটস্থ ভস্মাচ্ছাদিত গৃহের স্মৃতি অদ্যাপি মনুষ্যগণকে, সকল কথা স্মরণ করাইয়া সাবধান করাইতেছে! নর ৩৯ বৎসর ৯ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই স্বল্পকাল মধ্যে কিন্নরপুর গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

ঘটনাক্রমে যুদ্ধকালে, নররাজ তনয় যুবরাজ সিদ্ধ, রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বিজয় ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া বিধ্বস্ত রাজ্যের পুন শ্রীবিধান করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি ধর্ম্মগতপ্রাণ ছিলেন ও নির্ম্মল নিষ্পাপ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন শান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার পিতার দুর্ভোগ-কাহিনী তাঁহার উপদেশ স্বরূপ হইয়াছিল। যদিও তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিলাস স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তত্রাচ তিনি সকল প্রকার প্রলোভন হইতে, নিজকে সাবধানে রক্ষা করিতেন। তাঁহার ধনস্পৃহা ছিল না ও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার ইষ্টদেব মহাদেবকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি সশরীরে মহাদেব লোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। সপ্তদিবস তাঁহার এই মহত্ত্বের পুরস্কারবার্ত্তা দুন্দুভি সহযোগে সর্ব্ব স্থানে ঘোষিত হইয়াছিল। নরের ভৃত্যবর্গ নরের সহিত একত্র অবস্থানাদি করায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন ও নিন্দনীয় হইয়াছিল। নরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারাই জগতের আপামর সকলের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। যে যেরূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, ভালই হউক মন্দই হউক, সে আশ্রয়দাতার ভাগ্যাবং ভাগ্য ভোগ করে। তাহারাও সিদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গলাভে সমর্থ হইয়াছিল। রজ্জু হইলে তৃণকে নিম্নতল কূপে নিপতিত ও নিমজ্জিত হইতে হয়, আবার সেই তৃণই পুষ্প সহবাস প্রাপ্ত হইলে দেবতার শিরোদেশে উঠিতে সমর্থ হয়।

তদীয় পুত্র উৎপলাক্ষ তৎপর ৩৬ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। উৎপলাক্ষের নয়নযুগল কুমুদের ন্যায় সুন্দর ছিল, তাহা হইতে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল।

তারপর তাঁহার পুত্র হিরণ্যাক্ষ সিংহাসনারূঢ় হন। হিরণ্যাক্ষ তাঁহার নিজনামে একটী নগরী স্থাপন করেন। ৩৭ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন তদীয় পুত্র হিরণ্যকুল ষষ্টিতম বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর হিরণ্যকুলাত্মজ মুকুল সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার

রাজত্ব কালও ষষ্টিতম বৎসর। ইঁহার রাজত্বকালে ম্লেচ্ছগণ কাশ্মীর আক্রমণ করে। মুকুলের দেহান্তে তদীয় পুত্র মিহিরকুল পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। মিহিরকুল মৃত্যুর ন্যায় নৃশংস ছিলেন। তাঁহার আদেশে রাজ্যে দিবারাত্রে নরহত্যার ইয়ত্তা ছিল না। এমন কি আনন্দ উৎসবেও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইত এমন কি শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যায়ও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার রাজ্যে হত্যার সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে কাক ও শকুনী উড়িতে দেখিয়া লোকে তাঁহার ও তদীয় সৈন্যগণের আগমন অনুমান করিত। একদা তিনি তাঁহার রাণীর বক্ষে স্বর্ণ-রেখায় অঙ্কিত পদ চিহ্ন দর্শন করিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন ও অন্তঃপুর-রক্ষীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিয়াছিল 'মহারাণীর অঙ্গাবরণ সিংহল দেশীয় কৌশিক বাসে প্রস্তুত। ঐ বস্ত্রে সিংহলরাজের পদাঙ্ক অঙ্কিত আছে। সেই চিহ্নই মহারাণীর বক্ষে লিপ্ত হইয়াছে। ইহা অবগত হইয়া নররক্তপিপাসু মিহিরকুল তৎক্ষণাৎ দক্ষিনাবর্ত্তে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া সিংহল আক্রমণ করেন। সিংহলের রাজা হত হইলেন; তৎস্থলে অনৈক নৃশংস ব্যাক্তিকে স্থাপন করা হইল। রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উষাদেব নামক সূর্য্যের একখানি আলেখ্য সিংহল হইতে আনয়ন করেন। তিনি ফিরিবার কালে চোল, কর্ণাট, নাট প্রভৃতি প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সকল প্রদেশের রাজন্যবর্গ তাঁহার আগমন সংবাদ অবগত হইবা মাত্র স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। মিহিরকুল রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা হতশ্রী রাজ্যে পুনরাগমন করেন। যৎকালে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে ছিলেন তখন তাঁহার শত হস্তী, গর্ত্তে পতিত একটী হস্তীর আর্ত্তনাদে বিচঞ্চল হইয়া উঠে। রাজা সেই অপরাধে শত হস্তীকে বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন।

পাপস্পর্শে দেহকে কলুষিত করে; পাপকথা বর্ণনে ইতিহাসও কলঙ্কিত হয়। একদা রাজা মিহিরকুল যখন চন্দ্রকলা নদী পার হইতে ছিলেন তৎকালে এক খণ্ড ভারী প্রস্তর তাঁহার গন্তব্য পথে অবরোধ করে। দেবতার স্বপ্নাদেশ হইল—এই প্রস্তরে যক্ষ বাস করেন, সতী নারী ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। রাজা নগরের স্ত্রীগণ দ্বারা ইহা পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন কিন্তু সকলেই বিফল মনোরথ হইল। অবশেষে কুম্ভকার পত্নী চন্দ্রাবতী প্রস্তর স্থানভ্রষ্ট করিতে সমর্থা হইলেন। রাজা এতগুলি অসতী স্ত্রীর পরিচয় পাইয়া

এরূপ ক্রোধান্বিত হইলেন যে তিনি স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতা সহ ঐ স্ত্রী সকল বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিন কোটী নরহত্যা সম্পাদিত হইল। এই ঘটনা অনেকের চক্ষে প্রশংসনীয় হইতে পারে কিন্তু নরহত্যা সর্ব্বদা নিন্দার্হ। প্রজা রাজার বিরুদ্ধ এরূপ নৃশংস ব্যবহার দেখিয়াও যে বিদ্রোহী হয় না, তাঁহাকে হত্যা করে না তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কেননা দেবতা রাজাকে রক্ষা করেন। যাহা হউক রাজা যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যকার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুযায়ী নামকরণ করিয়া মিহিরেশ্বর নামক বিগ্রহ তিনি শ্রীনগরে স্থাপন করেন এবং মিহিরপুর নামক সুবৃহৎ নগরটী তাঁহার রাজ্যকালে তাঁহার নামানুযায়ী স্থাপিত হয়। তিনি তাঁহারই মত দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর গান্ধারবাসী ব্রাহ্মণগণকে কতকগুলি গ্রাম দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ এরূপ নির্লজ্জ যে তাহারা সহোদর ভগ্নী ও পুত্র বধুগণ সহ সহবাস করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছ স্বভাব সম্পন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয়—এরূপ ব্যক্তিগণও ধ্বংসমুখ না হইয়া জীবিত থাকে। তাহারা তাহাদিগের স্ত্রীগণকে তৈজষ পত্রের ন্যায় বিক্রয় করিত এবং তাহাদের স্ত্রীগণও এরূপ নির্লজ্জ ছিল যে অন্যের সহবাসে কুণ্ঠাবোধ করিত না। বর্ষাঋতু সমাগমে শিখীকে আনন্দিত করে, শরতের শুভ্র নির্ম্মল আকাশে হংসগণের অসীম আনন্দের কারণ,—দাতা ও গৃহীতা সমধর্ম্মাবলম্বী।

পৃথিবীর মহাত্রাস নৃশংস এই নরপতি বৃদ্ধ বয়সে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একবারে অচল্ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। মৃত্যুকালে তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। যে রাজা তিন কোটী নরহত্যা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই তিনিও স্বর্গগত হইলেন কেন না তিনি নিজ দেহকেও নির্দ্দয় ভাবে নির্য্যাতিত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করায় তাঁহার পাপের নিরাকরণ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণগণ তাহার রাজ্যময় বিস্তৃত হইয়াছিল সত্য কিন্তু আর্য্যোচিত অনেক ক্রিয়াকর্ম্মও তাঁহার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; পরিশেষে তিনি তপঃ পরায়ণ হইয়াছিলেন ও অগ্নিতে আত্মাহুতি দান করিয়াছেন। তিনি গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে সহস্রাধিক গ্রাম দান করেন। এইরূপে একটি রাজা যিনি অসিধারা প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে হৃদয়ে অসহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন অগ্নি প্রবেশে তিনি স্বয়ং অগ্নিজ্বালা অনুভব করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। সত্তর বৎসর ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর প্রকৃতিবর্গ যুবরাজ বককে সিংহাসনারূঢ় করাইলেন। বক অতি অমায়িক রাজা। প্রথমে লোকে তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। তদীয় পিতার ন্যায় লোকে তাঁহাকেও সংশয়ের চক্ষে দেখিত কিন্তু সময়ে সকলেরই চক্ষে তিনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বর্ষা অন্তে গ্রীষ্ম ঋতুকে যেমন মানুষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া লয় তাঁহাকেও তদ্রূপ বরণ করিয়া লইয়াছিল। পুণ্য যেন অন্য লোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অর্থবিত্ত সম্বন্ধে প্রকৃতিপুঞ্জ পুনঃ নিরাপদ হইয়াছিল। আবার রাজ্যে সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি লবণোৎস নামক নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে ভট্ট নামক জনৈকা উপাসিকা একদা রাত্রে সুসজ্জিতা রমণী বেশে রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহার গৃহে ধর্ম্মোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু কোন প্রকার উৎসব পর্ব্বের পরিবর্ত্তে তিনি দেখিতে পাইলেন ভট্ট একটি মাত্র পুত্র ব্যতীত তাহার অপর পুত্র ও পৌত্রগুলিকে বলি দিতে ব্যস্ত। অবশেষে সে নিজেও দেবী সমক্ষে আত্মঘাতী হইয়াছিল। কি ভয়ানক কথা! আজও এই ভীষণ কাহিনী ক্ষীরা আশ্রমে কথিত হয়। রাজা ৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর ক্ষিতীন্দ্র ৩০ বৎসর ও তদীয় পুত্র বসুনন্দ ৪২ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করেন। তৎপর তৎপুত্র দ্বিতীয় নর ৬০ বৎসর ও নরের পুত্র অশোক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি অক্ষভালা নামক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। অশোক পুত্র গোপাদিত্য ৬০ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্ব কালে সত্যযুগ যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি বহু গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ রসুন প্রভৃতি অখাদ্য ভোজন করিত ও ভিন্ন দেশীয় আচরণভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে আনয়ন করিয়া বৃশ্চিক প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করিতেছিল তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। রাজা জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক দেবতার স্থাপন করেন। দেবোদ্দেশ্য ব্যতীত অযথা পশুবলি তাঁহার রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গোকর্ণ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোকর্ণ তাঁহার নামানুযায়ী গোকর্ণদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৫৩ বৎসর ১১ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রাদিত্য

অতঃপর রাজা হন। তিনি ভুতেশ্বর নামক দেবতা ও অক্ষৌহিনী নামক দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার গুরু অগ্রদেব উগ্রেশ নামক দেবতা ও মাতৃচক্র নামক দেবীর দশটী বিভুতর প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর এই পুণ্যশীল রাজার দেহান্ত হইলে তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির সিংহাসনারূঢ় হন। তাঁহার চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র থাকায় লোকে তাঁহাকে অন্ধ রাজা বলিত। তিনি অতি সতর্কতার সহিত পিতৃরাজ্য শাসন করিতেনএবং পুরাতন আইনকানুন মানিয়া চলিতেন। কিন্তু কিছুকাল রাজত্বের পরে তিনি তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতাগর্ব্বে এরূপ গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে মুর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তিগণকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী আমাত্যবর্গকে অবহেলা করিতেন। অনুগ্রহ বিতরণে তিনি মূর্খ ও জ্ঞানীর পার্থক্য একবারেই রক্ষা করিতেন না এবং তাঁহার সুধী অমাত্যগণ ক্রমে ক্রমে বিরক্তিসহকারে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমদর্শিতা সন্ন্যাসীর পক্ষে গুণস্বরূপ কিন্তু রাজার পক্ষে অতি মারাত্মক দোষ। স্তাবক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগের হস্তে ক্রীড়নক রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই তরল স্বভাবে ব্রাহ্মণগণ প্রজার ত্রাস রূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার অনুগ্রহও ছিল ক্ষণস্থায়ী। তিনি যেসমস্ত ব্যক্তিকে অসাক্ষাতে নিন্দা করিতেন সাক্ষাতে আবার তাহাদেরই প্রশংসা করিতেন। এই রূপে তিনি জনগণের নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার সিংহাসনকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মন্ত্রীগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন ও সৈন্যগণকে তাঁহাদের স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া রাজত্ব পার্শ্বস্থ রাজাগণকে রাজ্যধ্বংস করিতে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারাও শকুনীর মত কাশ্মীরে প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন। রাজা রাজ্যরক্ষা করিতে অসমর্থ ছিলেন; তিনি প্রথমে বিদ্রোহী মন্ত্রীগণের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য বৃথা চেষ্টা করেন। মন্ত্রীগণ সন্দেহ করিয়াছিল যে তিনি রাজ্যে পুনঃ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদিগকে বধ করিবেন। তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং তাহাদের গতির প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। মন্ত্রীগণ সসৈন্যে রাজপ্রসাদ আক্রমন করিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে রাজপ্রসাদ শীর্ষে তাহাদের পতকা উড্ডীন করিয়াছিল। রাজা অবশেষে

পরাস্ত মানিলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগে স্বীকৃত হইলেন। তিনি অন্তঃপুরের মহিলাবর্গ এবং ধনরত্ন সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া ধূলিময় রাজবর্ত্ম অতিবাহিত করিয়া—স্থানান্তরে চলিয়া যান! প্রজাবর্গ তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল না। আক্রমণকারীগণ—তাঁহার ধনরত্ন ও স্ত্রীগণের অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়াছিল। তিনি পর্ব্বত মধ্যে অবিরত পরিভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম করিতেন আবার উদ্দেশ হীন যাত্রা আরম্ভ করিতেন। কখন তিনি দুরন্ত শত্রুগণের চীৎকারে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিতেন এবং গভীর গুহা মাঝে লুকাইয়া শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতেন। অবিরত গহন বন ভ্রমণে, নদ্যাদি অতিক্রমের কষ্টে তাঁহার সুকোমালাঙ্গী রাণীগণ মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন, কখন তাঁহারা অতীত সুখস্মৃতিময় রাজ্যের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতেন। তাঁহাদিগের অশ্রু নির্ঝরের ন্যায় প্রবাহিত হইত। কখন তাঁহারা গিরিশিখর হইতে সুন্দর কাশ্মীরনগরী অবলোকন করিতেন। এই কাশ্মীর একদিন তাঁহাদের সুখের বাসর ছিল। এক্ষণে তাঁহাদিগকে তথা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এমন কি বনের পক্ষীগণও তাঁহাদের ক্রন্দনে ক্রন্দন করিত। অবশেষে নিকটস্থ জনৈক রাজা যুধিষ্ঠিরে দুঃখে দ্রবীভূত হন ও তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া—তাঁহার দুঃখাপনয়নে চেষ্টিত হন।

ইতি—কাশ্মীরের প্রধান অমাত্য চম্পক পুত্র কহলন প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর প্রথম সর্গ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ক্রমশঃ—

শ্রী—

আত্মপ্রতি।

—:০:—

[রচনা—স্বর্গীয় কবি চণ্ডীদাস বাগ্‌চী]

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস-রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

———

স্বরলিপি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

—:*:—

[শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

কীর্ত্তন (ধানেশ্রী)—জলদ একতালা।*

স্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
II { গঋা গা পা | ক্ষাপা দা ক্ষাদনা I দা পক্ষা ক্ষাদনা | পক্ষা গঋা গা |
হি০ য়া র মা০ ঝা রে০০ য ত০ নে০০ রা০ খি০ ব

০ ১ ২´ ৩
| গক্ষা পদা দপক্ষা | পক্ষা ক্ষাগা গঋা I গা –ঋা –গা | ৠা –ন্া –সা } |
বি০ র০ ল০০ ম০ নে০ র০ ক ০ ০ থা ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| { নর্সা ঋর্া সর্না | না ক্ষাদা –ননা I ক্ষাপা পদা দা | পক্ষা গঋা গা |
ম ০ র ম ০ না জা০ ০নে ধ ০ র০ ম বা০ খা০ নে

০ ১ ২´ ৩
| পক্ষা ক্ষানা পক্ষা | পদা পক্ষাগা গা I ঋা –গক্ষা –গঋা | সন্া –ঋসা –ন্সা } II
সে০ আ০ র০ দ্বি গু০০ ণ ব্য ০০ ০০ থা০ ০০ ০০

---

* নান্নুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী সাঁকুলিপুর গ্রাম নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়া বাবাজীর সুর ও তাল অবলম্বনে লিখিত। লেখিকা।

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II{পক্ষা দপদা নর্ঋা | র্সা -না র্সা I র্ঋা র্ঋা র্ঋর্সা | র্ঋনা র্সনা -র্সর্সা |
যা০ রে০০ না০ দে ০ খি জ ন ম০ স্ব প০ ০নে

০ ১ ২´ ৩
| নর্ঋা র্ঋর্সা র্গর্ক্ষা | র্গা র্ঋর্গা র্গর্ঋা I না -র্ঋনা -র্সা | র্সা -না -র্সা} |
না০ দে০ খি০ ন য়০ ন০ কো ০০ ০ পে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {ক্ষা দা র্ঋনা | র্সা র্সনা র্সা I নদা দা পদনা | পক্ষা ক্ষাপক্ষা গা |
অ বু ধ০ সে অ০ নি দি০ ব স০০ র০ জ০০ নী

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাপা ক্ষাদা -না | পক্ষা দপা ক্ষাগা I ঋা -গা -ঋা | সা -ঋা -সা}II
স০ দা০ ই প০ ড়ি০ ছে০ ম ০ ০ নে ০ ০

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II{ন্সা ঋসা গঋা | গঋা ন্ঋা সন্সা I ন্া ঋা ন্সা | সন্া ঋগা ক্ষাপা |
হা০ ম০ অ০ ভা০ গি০ নী০০ প রে র০ অ০ ধী০ না০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাপা দক্ষা মদা | ক্ষাপা ক্ষাগা ক্ষাগা I ক্ষা -পা -ক্ষাদা | পা -ক্ষা -পা |
স০ ক০ লি০ প০ রে০ র০ ব ০ ০০ শে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাপা দপা দা | র্ঋা নর্সা র্সা I নর্সা র্ঋর্সা নর্সা | নদা দা পক্ষা |
স০ দা০ ই এ থ০ নি প০ রা০ ণ০ পো০ ড় নি০

০ ১ ২´ ৩
| গা গক্ষাদা দা | নদা ক্ষাপা ক্ষাগা I গা -া -ঋা | সা -া -া} |
ঠে কি০০ মু পি০ রী০ তি০ র ০ ০ সে ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
| {গা ক্ষাদা পক্ষা | দা ক্ষাপদনা র্সা I নর্ঋা র্সনা র্গর্ঋা | র্গর্ঋা র্ঋর্সা র্সা |
অ মু০ ক্ষ০ ণ ম০০০ ন ক০ রে০ উ০ চা০ ট০ ন

০ ১ ২´ ৩
| নদা ক্ষাদা নর্সর্ঋা | নর্সা র্সনা নদা I না -র্সা -র্ঋর্সা | না -র্সা -া} |
মু০ খে০ না০০ নিঃ স০ রে০ ক ০ ০০ থা ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {নর্সা র্ঋনা র্সা | র্সর্ঋর্গা র্গর্ঋা র্গা I র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্সর্ঋা র্সনা নর্সা |
চন্ ডী০ দা সে০র ম০ ন অ রু ণ ন০ য়০ ন০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাগা ক্ষানা দা | ক্ষাপা ক্ষাগা ঋা I ন্া -ঋা -ন্সা | ন্া -সা -া} II II
ভা০ বি০ তে অন্ ত০ রে বা ০ ০০ থা ০ ০

কিসের অভাবে এ দশা ?

এদশা দুর্দ্দশা না সুখের অবস্থা ? অতীতের তুলনায় বঙ্গ আজ উন্নতির পথে অগ্রসর না পশ্চাৎপদ, সুখ-সমৃদ্ধি তার বৃদ্ধি পাইয়াছে না বঙ্গ আজ শ্রীহীন, হত-সম্পদ, সুখশান্তি স্বাস্থ্য বিবর্জ্জিত, ধ্বংসোন্মুখ ? কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের ত কথাই নাই,— বিলাতী সভ্যতালোকে ঝলসিত-আঁখি শিক্ষিতের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, অবাধ উন্নতি — বিলাতী সভ্যতার পরা-গতি বসনে ভূষণে, বিলাস-উপকরণে, যাতায়াতের সুবিধায়, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাকঘরে উন্নত শিক্ষার সুবিধানে, এক কথায় পৃথিবীর সহিত বঙ্গের শুভ সম্মিলনে, ভাবের আদান-প্রদানে বঙ্গের যে চিত্র শিক্ষিত বঙ্গবাসীর চক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল মোহনীয় বরণীয় নহে শ্লাঘ্য ! আজও সেই মোহনীয় উন্নতির অতি উগ্রতায় বিগলিত, বাষ্পে পরিণত হইয়াও সে উন্নতি-

অবনতি সমস্যার সমাধান হইয়াছে কিনা সন্দেহ! কে অস্বীকার করিবে বঙ্গের সে অন্ধকার যুগের কথা! বিদেশ গমন অর্থে ছিল দেহপাত, পথের অসহ্য ক্লেশ, বিষম অসুবিধা, দস্যু-তস্করের হস্তে অকাল মৃত্যু! বিদেশস্থ আত্মীয়ের সংবাদ প্রাপ্তির আশা ছিল দুরাশা! কি ভীষণ অবস্থা! রোগের চিকিৎসা বলিতে ছিল অশিক্ষিত হাতুড়ে বৈদ্যের বড়ি—টোট্কার প্রসার! বিদ্যালয় বলিতে ছিল—কুড়িখানি গ্রামের মধ্যে একটি গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা,—শিক্ষা দেওয়া হইত জোড়—বোধোদয়, ধারাপাত, শুভঙ্করী, জমীদারী-মহাজনী; নীতি শিক্ষা হইত—পিতার তাম্রকূটের তহবিলের বংশনাশ!—কল্কির আগুন উস্কাইয়া ধূম্রমুখী করিয়া গুরু-সেবার উপযুক্ত করিয়া দিবার কারিগরী!—বালক হইত অকাল ধূম্রপায়ী! কোথায় ছিল এ সুকুমারমতি বালকের মতি বুঝিয়া রসের এ কিণ্ডারগার্টেন! ছড়ির ঘায় ছিল সর্দার-পোড়ের সাদর-সম্ভাষণ! পাঠশালা হইতে পলায়নের ছিল মজাটা কেমন,—বৃক্ষশাখায় ঘন পত্রান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়াও ছিল না পরিত্রাণ! পড়া ত খুব,—দলে দলে পোড়ো পাঠাইয়া করা হইত পলাতকের অব্যর্থ-সন্ধান! পলাতকের পরিণাম ছিল কি ভয়াবহ! গুরু মহাশয়ের গুরু বেত্রাঘাতে তাহার দেহ হইয়া যাইত চিত্র-বিচিত্র! ভুক্তভোগীর পৃষ্ঠে আজও সে চিহ্ন অবিনশ্বর! দফে দফে কত উল্লেখ করা যায় সে অন্ধকার যুগের অসুবিধা, অনুন্নত অবস্থার কথা—কোথায় ছিল প্রাণমন তৃপ্তিকারী ক্ষুধাহারী এ চা-সুধা—হুঁকা-কল্কি-চকমকিসর্ব্বস্ব তাম্র-কূটের পরিবর্ত্তে এ অশেষ সুবিধার আধার—অহিফেণবারিসিক্ত রাসাগ্রাস নামধেয় স্বল্পদামী সিগারেট! ছিল কি—হইয়াছে কি! ছিল না অনেক—সভ্যতা-ভব্যতা রক্ষার মত হইয়াছে আজ অনেক, উন্নতি—উন্নতি—বিদেশের সংস্পর্শে অশেষ উন্নতি—আরও চাই উন্নতি! চাই-চাইয়ের হাহাকার, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সহস্রগুণে অভাব-অভিযোগের কারণ বৃদ্ধি পাইয়া সেই চীৎকার! এই কি উন্নতি? এ দুর্দ্দশা না সুখের অবস্থা?

এ সভ্যতা-আলোক-উদ্ভাসিত বঙ্গে আজ সভ্যোচিত প্রায় সমস্ত উপকরণই বর্ত্তমান, নাই কেবল আমাদের দেখিবার ক্ষমতা, ভোগ করিবার অবস্থা, আত্মশক্তিতে জীবনরক্ষা করিবার সামর্থ্য—আপনার বলিতে আমাদের কিছুই নাই—সমস্তই পরহস্তগত! পরমুখাপেক্ষী আমরা, পর-প্রসাদে বঞ্চিত হইলেই আমরা শূন্য! কেবল গগন-বিদারী হাহাকার মাত্র আমাদের সম্বল! অন্ধ যে তাহার পক্ষে উজ্জ্বল আলোকের কি ফল, চিররুগ্ন যে তাহার

ভোজ্যে সুখ কোথা? কেবল পীড়া বৃদ্ধির কারণ! যে কারণেই হউক্ যে দেশে স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই হীন হইতেছে—নিত্য নব নব ব্যাধি যেখানে নব নব নামে অধিবাসীকে আতঙ্কিত বিপদগ্রস্ত করিয়া কালের করাল বদনে নিক্ষেপ করিতেছে সে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিরতার জলে ফল কি? জন-সংখ্যা যে-ভূমে ভূমিষ্ট হইবামাত্র হ্রাসের দিকে দ্রুত চলিয়াছে, তথা-কথিত সভ্যতায় তাহার কি উপকার? মরণের দেশে মহাপ্রস্থান করিবার জন্য দ্রুত যানের প্রয়োজন! মৃত্যু সংবাদ বহন করিবার জন্যই কি তার-বর! পরের ঘরে পয়সা যোগাইয়া দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতে কি, পূর্ব্বে বিবেচিত হইত যেগুলি বিলাস উপকরণ এখন সেগুলির নিত্য প্রয়োজনীয়তা? পূর্ব্বে ছিল যথা—কার্য্যোপলক্ষে সাধারণ ভদ্রলোকেরও পদব্রজে দৈনিক দশ ক্রোশ গমনাগমন, অনায়াস-প্রয়াসে সে স্থলে গোশকটের ব্যবহার, তাহার পরিবর্ত্তে অশ্বযান প্রভৃতি,—আরও উন্নতিতে (গ্রাম্য পথেও) সাইকেল,—ট্যাক্সি। সহরে ত একপদ অগ্রসর হইতেই চাই দ্রুতগামী সুখযান।

এ সভ্যতার যুগে এই সকল সুখ সুবিধার প্রতি বক্র কটাক্ষপাত যে বর্ব্বরোচিত সে বিষয়ে দ্বিধা নাই কাহারও। কে ইচ্ছা করে আবার সেই অন্ধকার যুগে ফিরিয়া যাইতে? পদব্রজে দৈনিক দশ ক্রোশ অতিক্রম সুখেরও নহে সভ্যতার লক্ষণরূপে গৃহীত হইবারও উপযুক্ত নহে নিশ্চয়। যদি সে অবস্থায় হইত উন্নতিজ্ঞাপক—স্বল্পেই সুখী, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমপ্রিয় বর্ব্বরগণই তাহা হইলে সভ্যশিরোমণি, কিন্তু একবাক্যে স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই অসভ্যের সে অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে কোন ক্রমেই। তবে বঙ্গের বর্ত্তমান সভ্যোচিত অবস্থা ব্যবস্থায় আমাদের অরুচি হইবার কারণ? দুর্দ্দশা কেন তাহাতে? প্রাণমনতৃপ্তিকারী সুপেয় স্বাস্থ্যবর্দ্ধক দুগ্ধ কিসে অপকারী—এ নির্জ্জলা দুগ্ধে অলক্ষ্যে কোন্ ব্যাধির বীজাণু সংক্রামিত? এ সভ্যতা-আলোকসমুজ্জ্বল দেশের অন্তরপ্রদেশে মহা অন্ধকার।

বঙ্গের বর্ত্তমান সভ্যতা কেন, ইহা হইতে আরও উন্নততর মানবসেবায় সভ্যতার চরম সুখদ দান মানব জীবনে চিরপ্রার্থনীয়,—কখনই নহে দুষ্য। দুষ্য,—অশেষ অকল্যাণের আকর হইয়াছে তাহা আমাদের অদৃষ্টের দোষে। অনধিকারীর অদম্য উপভোগ-স্পৃহা আমাদের এই দুরদৃষ্টের মূলে। যাহার অধিকারী হইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই নাই,—যাহা নহে আমাদের নিজস্ব, আমাদের অর্থবিত্তশক্তিসামর্থ্য যাহাতে অধিকার স্থাপনে অ[illegible]

উপভোগস্পৃহাই আমাদের হইয়াছে কাল,—পরপ্রত্যাশীর পরের অনুগ্রহে পুষ্ট হইবার অভিলাষীর অশেষ দুঃখ। শক্তি নাই যাহার গোযানের ব্যয়বহন করিবার তাহার পক্ষে অসভ্যোচিত চরণযানই উপযুক্ত, মঙ্গলকর।

উপভোগের জন্য অধীর হইবার পূর্ব্বে হও উপযুক্ত; শক্তি অনুযায়ী হ'ক সুখ সুবিধার ব্যবস্থা। শুনিতে পাই স্বর্গে অনাবিল চির আনন্দ কিন্তু তাহা যে কেবল দেবভোগ্য। সে সুখে আমাদের ফল! মানুষ দেবত্ব লাভের আশায় আশন্বিত হক্, সেই সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখুক দেবত্বলাভের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও স্বর্গ-সুখের আশা তাহার দুরাশা,- কেবল বিড়ম্বনা। আত্মশক্তির দৈন্যই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য; সে দৈন্যের নিরাকরণ করিতে সমর্থ না হইলে, অন্যের বস্তুতে সুখ-উপকরণে লোভ তস্করের ধর্ম্ম। সে পাপের পরিণাম কি,—বঙ্গবাসীর জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন হইবে বঙ্গের বারো আনা না হক্ চারি আনা ত শিক্ষিত সমৃদ্ধ, তাঁহারাও কেন আজও বঞ্চিত? দেহের একাঙ্গের পীড়ায় ঘটায় না কি সমস্ত দেহের ক্লিষ্টতা, অকর্ম্মণ্যতা? সমাজদেহেও সেই কথা! এককে উপেক্ষা করিয়া অন্যের উন্নতি অসম্ভব! জননী জন্মভূমির দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে চাই প্রতি দেহে প্রাণে শক্তির সঞ্চার,—যেটি কাম্য,—তাহা উপভোগ করিবার জন্য অধীর হইবার পূর্ব্বে তাহাকে নিজস্ব করিবার শক্তিতে, আত্ম-শক্তির বিনিময়ে কাম্য বস্তুকেই করা চাই আপনার। দেশে কোন বস্তুর ব্যবহার প্রচলনের পূর্ব্বেই সে বস্তুকে করা চাই স্বদেশী, আপন আয়ত্বের—তবেই না তাহাতে প্রকৃত সুখ, স্বদেশের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি উপকরণ সেইটি,—নতুবা পরের পণ্যে সুখসুবিধা পরিণামে বিষ! সে বিষ নিজের মৃত্যু, দেশের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। কি শিক্ষা-দীক্ষা, কি বাণিজ্য ব্যবসায়, কি সামাজিক প্রথা, রীতি নীতি,—যাহাই নহে আমার এ সোণার বাংলার,—স্নেহের আধার ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বরবিশ্বাসী বাঙ্গালীর, তাহা যতই উন্নত সুখদ হক্ না কেন আমার নহে তাহা কল্যাণের,—সে সভ্যতাকে দূরে হইতে নমস্কার!

"আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়।"

কবির এ মহাবাক্য না স্মরণে রাখিয়া আমার ভাবে জননীজন্মভূমির উপযোগী ব্যবস্থায় আমাদের তাচ্ছিল্য,—অন্য পক্ষে বিদেশী ভাবের সুখ-তৃষায় মরীচিকায় পশ্চাতে অবিরত ধাবিত হইবার প্রবৃত্তিতেই আমাদের এ দশা। ফলে—

"আপন বুঝিয়া চল এই বেলা"

এই নীতির অনুসরণের অভাবেই আমাদের এ দুর্দ্দশা।

শ্রী—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ঝড়ের রাতে।

—ঃ০ঃ—

ঈশান কোণে বিশাণ বাজে নিশান ওড়ে কার,
বাদল মেঘে মাদল কে গো বাজায় অনিবার,
আকাশ পারে কে চলেছে,
প্রলয় ঝড়ে কে মেতেছে,
উড়িয়ে চাঁচর কেশ—
নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ধায় আপন-ভোলা বেশ!

মুহু মুহু ঝিলিক্ মারে তীব্র তড়িৎ হাসি,
আন্‌মনে যায় পথের 'পরে কোন্ সে উদাসী;
আঁধার বীণা বারে বারে
উঠ্‌ছে বেজে হাহাকারে—
কিসের ব্যর্থতায়?
নিশ্বসিছে দীর্ঘ-নিশাস্ নিশার বুকে হায়!

দোদুল—দোলে তরু লতায় মাতন হ'ল সুরু,
সন্ত্রাসিত নিখিল হিয়া কাঁপ্‌ছে দুরু দুরু;
উন্মাদিনী বৈশাখী ঐ
নৃত্য করে তাথৈ থৈ;
হাত ছানি দ্যায় মুহু
পিয়ার লাগি কোন্‌ বিরহা ডুক্‌রে কাঁদে উহু !

থইহারা ঐ মেঘ-সায়রে কে হবে হায় পার,
ঝড়ের রাতে কাহার লাগি প্রলয় অভিসার;
না জানি কে পাগলপারা,
দিগ্‌ বিদিকে দিশে-হারা,
ছুট্‌ছে বারংবার—
নিবিড়-ঘন গহন-রূপে ঘনায় আঁধিয়ার !

শ্রীসরোজকুমার সেন।

বিপন্ন।

—:০:—

দার্জ্জিলিং মেলে কলিকাতা যাইতেছিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী,—গাড়ীতে অসহ্য ভিড়,—কোন মতে একটু যায়গা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। কোলাহলের অন্ত নাই। দস্তুরমত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতেছিল, অনেকেই গরম মেজাজে প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন তাঁহাকে গাঁটের কড়ি ফেলিয়া টিকিট কিনিতে হইয়াছে—তাঁর যায়গা অন্যে দিতে বাধ্য! আশ্চর্য্য গাঁটের কড়ি দিয়াও অমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও এ সহজ কথাটা কাহারও মনে জাগিতেছিল না রেল কোম্পানি, এক্ষেত্রে ই, বি, রেলওয়ে স্বয়ং সরকার তাঁর পক্ষে সদাগর আর

অন্যের পক্ষে বদান্য নন, রেলের ভাড়া দেড়গুণ চড়াইয়া গাড়ী কমাইয়া অন্য যাত্রীকেও তাঁরা তুল্য ভাবেই অনুগৃহীত করিতেছেন! ভাবিতেছিলাম—জগতটা পশু-শালাই বটে—নরমের যম, শক্তের ভক্ত! যাত্রীর সে কষ্টের জন্য প্রকৃত অপরাধী যে প্রভুরা তাঁদের কর্ণে এ সমবেত চীৎকারটাও যদি পৌঁছাইত তবুও হয় ত তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও হইতে পারিত কিন্তু রেল হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের এ অন্তর্দাহের অবসান,—কি শান্তিতেই আছি আমরা,—দাদার আস্ফালন বৌদির উপর,—বৌদির আক্রোশ উননের উপর! তাহাতেই তৃপ্তি!

সান্তাহার হইতে গাড়ী ছাড়িয়া একদম নাটোর। গাড়ী চলিবার সময় যাত্রীরা একটু শান্ত হইয়াছিল, গাড়ী থামিতেই,—আবার সেই চীৎকার। "যায়গা নাই দেখছো নাকি ঘাড়ের উপর চড়ে যাবে নাকি? কেহবা নরম সুরে হাঁকিতেছিলেন—'আমাদের অবস্থা দেখে নিজেই বিচার করুন মশায়—তিলটি রাখবার যায়গা নাই।' কাহার বিচার কে করে। দশ মিনিটের মধ্যে রায় হওয়া চাই।

"আমার না গেলেই নয় যে মশায়—দাঁড়িয়ে কোন মতে যাব—এই ঈশ্বরদী পর্য্যন্ত—অনুগ্রহ করুন—কোন গাড়ীতেই যায়গা নাই যে।"

"যায়গা নাই ত যাবেন কি করে?—ঈশ্বরদী যাবেন এ গাড়ীর ধরবার জরুরীটা এমন কি! বসে থাক্‌বেনই ত সেখানে গিয়া—পরে মিক্সট আসছে, সেটা অরুচি কিসে!"

"একটু আগে গেলে স্নান আহারটা হয় সেখানে।"

"ওঃ সেই গরজ,—হবে না, কেন বকাচ্ছেন বলুন!"

মারামারির উপক্রম। সাজোরে যবনিকা পতন!

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে,—এমন সময়, পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমাকে আকৃষ্ট করিল—সত্যই সেই,—আমাদের দিবাকর! দিবাকর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী! সে বড় ডিপুটীর ছেলে। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিলাম। মুহূর্ত্তে প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গেল,—তাহাতে বিচলিত হইবার সময় নাই, হাত বাড়াইয়া দিলাম—"উঠে পড়, উঠে পড়—দাঁড়াবার যায়গা হবে কোন মতে!"

দিবাকর গাড়ীতে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"ভাল ভাই তুই ছিলি যেই—এ ট্রেণটা ধরতে না পারলেই হয়েছিল আর কি! যাক আছিস কেমন ভাই!"

"দেখ্তেই পাচ্ছিস্—চিরদিনের ভবঘুরে—ঘুব পাকই থাচ্ছি! আমাদের কথা ছাড়,—তুই এমন ভাবে চলেছিস্ কোথা ?—এতদিনে নিশ্চয় একটা কৃষ্ট বিষ্টু হয়েছিস্—এমন ভাবে তোকে আজ আস্তে দেখে বাস্তবিকই জান্তে ইচ্ছা হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি তোর কিসের ? এতদিন পরে দেখা, খুসী ও হইনি কম—তোর মুখখানা দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না দিবাকর !"

দিবাকর আমার বাল্যবন্ধু—সমপাঠী ও আমাদের সময়ের নামজাদা ছাত্র—ইউনিভার্সিটিতে বরাবর ষ্টাণ্ড করিয়াছে—এম-এ ইংলিসে হইয়াছিল দ্বিতীয় ! ওর বাপ ডিপুটী,—ছেলেকেও করিবেন ডিপুটী—সেটা পূর্ব্ব হইতেই সকলের জানা ছিল। অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি আমার বিশ্বাস ছিল এত দিন ও পাকা হাকিমী করিতেছে !

দিবাকর বলিল "ছাড় তোদের কেষ্ট বিষ্টু হওয়ার কথা—কেষ্ট বিষ্টুর রস বিধিমতে জানা হয়ে গেছে ভাই ! জানিস্ বোধ হয়—সেবারের কথা, গেভেন এণ্ড আর্থ তোলপাড় করে বাবা করে দিলেন ডিপুটী। মনে করলেম এত কষ্ট করে লেখা পড়াটা করা বুঝি সার্থক হ'ল, সুখে হাকিমী করা যাবে। কে জান্ত তখন বিধি বাম—দস্তুর মত নিজের প্রিন্সিপল্‌কে আধমারা করেই হাকিমী করতে গিয়েছিলেম—চারটা বছর কেটেছিলও ভাল ভালই কিন্তু অত করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেম না—বেটারা অবশেষে একটা কেসে ইঙ্গিত করল কি না নির্দ্দোষ একটা আমারি মত এম-এ পাশ যুবককে শাস্তি দিতেই হবে নৈলে নাকি পুলিসের কাজ চলে না—লোকটার অপরাধের প্রমাণ না থাক্‌লেও ছিল নাকি তার অন্তরে অন্তরে ঘোর বদমায়েসী ! কাকে বুঝাই বল—অন্তরের গোপন ভাব দিয়ে ফৌজদারী বিচার করবার প্রসিজিওর কোন্ আইনে লেখে ?—অথচ আমরা আইনের হাকিম,—ভদ্রলোকটিকে বেকসুর খালাস দিলাম—সেই হ'ল আমার সার্ভিসের কেরিয়ারে কাল ! টিক্‌তে পারলেম না—খারাপ যায়গায় বদলীর পর বদলী করে অস্থির করে তুল্‌ল,—অত ঝক্‌মারি কি সহ্য হয়—কাজে ইস্তফা দিলাম,—প্রকৃত কথা বল্‌বার সাহস হ'ল না—অসুখের হেতুবাদে।—তাতেও রক্ষা নেই,—বাবাকে ছেলের অপরাধে পেনসন্ নিতে হ'ল। বুঝতেই পারছিস ব্যাপারখানা ! ঘরে বাহিরে কেবল গঞ্জনা,—যাকে কোন দিন চিনিও না—সেও আমার হটকারিতার ফল—আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে অযাচিত উপদেশ বিতরণে আমায় উপকৃত করতে কার্পণ্য করলে না। বাবা ত অসন্তুষ্ট হবেনই শ্রীমতী পর্য্যন্ত ছুষতে ছাড়লেন না—

ডিপুটী গৃহিনীর অমন ভাবে পদচ্যুতি কি কম পতন। সকলের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল তখন মা বসুধা দ্বিধা হও প্রবেশ করি—আমাদের শিক্ষার গলায় দড়ি !

শুনে কি করবি সে সময়ের ভোগান্তির কথা, বুঝতে পারবিনে ভাই। মনের দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছিলাম যেন ! তখনো জানিনে অদৃষ্টে তার চাইতেও আরও ভোগ আছে,—বাবা স্বর্গগত হলেন—তখন সত্যিই মনে হ'ল—আমিই পিতৃহন্তা। আমার ব্যবহারই বুঝি তাঁর মৃত্যুকে এগিয়ে আন্‌ল। অনুতাপ অনুযোগের অবধি থাক্‌ল না। তোর কাছে সত্যি বল্‌তে কি ভাই, তখন মনে হচ্ছিল—ওদের পায়ের পয়জার বয়েও মিথ্যার মর্য্যাদা রেখেও যদি তখন চাকুরিটা রাখ্‌তুম—বাবা আমার অমন মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে যেতেন না"।

বাবার স্বর্গারোহণের পর আমাকে বিধিমত বুঝতে হল—খেটে না খেলে অচল। বাবা যে মোটা মাইনে পেতেন—বাহিরের ঠাট্ বজায় রাখতে তা শেষ হয়ে যেত, তারপর বোনদের বিয়েতে ধারই করেছিলেন হাজার কয়েক টাকা,—সম্বল মাত্র তাঁর লাইফ ইন্সিওর,—তা মন্দ ছিল না—হাজার কুড়ির উপর,—বছরের চেষ্টায় কোম্পানীর কবল হতে টাকা উদ্ধার হলে—ঋণ টিন শোধ দিয়ে দাঁড়াল হাজার নয়। ভাবলেম,—এটা দিয়েই একটা ষ্টেপাষ্টারের (বুলে দের) ব্যবস্থা করি,—চাকুরী ঝক্‌মারিতে আর যাওয়া হবে না—এ বারে করা যাক্ ব্যবসা ! খুলে ফেললেম একটা স্বদেশী মালের দোকান। কাট্‌তি হতে লাগলো অসম্ভব। সংবাদপত্রেও বের হ'ল দেখলাম—আমার অযাচিত অতিউক্তি প্রশংসা। খুসীই হলেম। লাভের অংশ অঙ্ক কষে বের করলেম—হবে বেশ,—সাধে কি শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস ! ষান্মাষিক হিসাবটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ফল দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো ! বিক্রি যত তার চাইতে বাকী অনেক বেশী—আদায়ের বেলায় তাগিদই সার। আরও বছর খানেক দোকানটা চল্ল,—আসলেই টান—বাকী আদায়ে অনুপায় হলে দোকান পাট বন্ধ করতে হ'ল—হায় দেশ ! দোকানের বাকী মাল নিলামে জলের দরে বিক্রি করে উঠ্‌ল মাত্র হাজার তিনেক ! মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেম—অভিজ্ঞতা বল্লে যে-ব্যবসায় বাকী কারবার বাঙলা তার নয়—কাবুলীর মত বিচার বুদ্ধিহীন হয়ে নির্ম্মমভাবে বাঙ্গালীর রক্ত চুষতে না পারলে ভদ্রলোকের সাধ্য নেই বাঙ্গলার ব্যবসা করা—

সত্যিই ভাই ব্যবহারের উপযুক্ত নই আমরা! ভাবলেম—এবারে কৃষি; সুজলা সুফলা ভূমির আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট হতে হবে—এ দেশে লেবার (মজুরী) সস্তা, নিজে খাট্‌লে হবে না কেন? আবার আশান্বিত্‌ হয়ে আরম্ভ করলেম আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে,—পুরাদমে অদম্য উৎসাহে চাষ আবাদ! ও হরি! এটাতেও তুল্য ফল,—মজুর সস্তা হলে হয় কি—কাজ দিতে তারা চায় না একবারে,—নিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও আশানুযায়ী কিছুতে করতে পারলেম না,—কফির আবাদ হয়েছিল বেশ, হলে হবে কি সেখানেও চুরি, তবুও লাভ হয়েছিল শো দু কিন্তু অন্য ফসলেই মেরে দিলে--সেবারে অতি বর্ষা, রেলের বাঁধের কল্যাণে জলনিকাশ হতে পারলো না—সব ডুবে গেল, আমিও সেই সঙ্গে ডুবলেম,—বাকী ছিল ত মাত্র হাজার তিনেক,—তা হতে তিন শ উঠ্‌বারও আশা হারিয়ে বুঝতে হল এদেশে ভদ্রলোকের পক্ষে কৃষি কার্য্যও নয়। এখন ভদ্রলোক যান কোথা? আশা সেই চাকুরী! সেই দেহিপদ পল্লবম, তবে আর ডেপুটীগিরিতে অপরাধ করেছিল কি? ভাবলেম এবারে চাকুরী করতেই হবে যখন প্রফেসারীর চেষ্টা করা যাক, আর না হ'ক দেশের ভবিষ্যত-আশা যুবকদের তৈরি করতে পার যদি সেও হবে একটা কাজ! ভবিষ্যত-আশাদের যাই হ'ক,—দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করেও আমার মত মেডালিষ্টেরও চাকুরী জুট্‌ল না। দরখাস্তের উত্তরে কল্‌কাতার একটা কলেজ হতে জবাব পেলেম কাগজে তাঁদের কাজ দুশো টাকা বলে বিজ্ঞাপিত হলেও এখন তাঁরা কোন নতুন লোককে দিতে রাজী নন অত। আধাআধি শেষে এক'শ, আমি স্বীকার কিনা তাই জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন—আমার অভাব তখন—তাতেই স্বীকার করলেম। তখন তাঁরা বল্লেন—চাক্ষুষ দেখাশুনা না করে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার (বাহালী চিঠি) দেবেন না তাঁরা! তাতেও স্বীকার,—চল্লেম আবার কল্‌কাতায় চাকুরীর পরীক্ষা দিতে!

সেও এই দার্জিলিং মেলে,—তখন সবে সেকেণ্ড ক্লাসের মায়া কাটিয়ে ইণ্টারের যাত্রী হয়েছি! ভিড়ের ভয়টা তখনো কাটেনি—দেখে দেখে অবশেষে একটা কম্পার্টমেণ্টে দেখলাম—মাত্র একজন—উঠে পরা গেল! সহযাত্রী বাহিরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন—আমি উঠ্‌তেই ফিরে চাইলেন! খুব যেন প্রীত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন, বল্লেন "দিবাকর বাবু যে—নমস্কার!"

চিনতে পারলেম না। পরিচয় জিজ্ঞেস করতে ভরসাও হ'ল না। তিনি, বোধ হয় আমার ভাব দেখে বুঝেই বল্লেন "চিন্‌তে পারলেন না বুঝি,—না চেনবারি কথা,—আমি আপনার যেমন করে দেখেছি আপনার তার দরকার হয় নি—মনে আছে বোধ হয়—আপনার এজলাসে সেই হরিরামপুর হাটের স্বদেশী কেসটা,—বিলাতি কাপড়ের দোকানে মারপিট,—আমি ছিলাম তার প্রধান আসামী।"

আমি তাঁকে হ্যাণ্ডসেক্‌ করতে হাত বারিয়ে দিয়ে বল্লেম—"হয়েছে হয়েছে আর বল্‌তে হবে না,—অবিনাশ বাবু আপনি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—এখন বল্‌তে কি, পুলিসের কাণ্ডটা ঠিক ধরে ছিলেন আপনি—কিন্তু তাতে আপনার প্রমোশন হয় নি নিশ্চয়!"

"প্রমোশন! বলুন—তিরোধান!"

"অ্যাঁ—বলেন কি! আপনি কি তবে এক্‌জিকিউটিব সার্ভিসে নাই,—দেখছি প্রকৃতই অপরাধ করেছি আমি!"

"অপরাধ আপনারও নয়—আমারও নয়—আমাদের দেশের পোড়া অদৃষ্টের—যাক!"

তিনি প্রশ্ন করলেন "তবে এখন করছেন কি?" আমার তখনকার মনের অবস্থায় তাঁহার সহানুভূতি অনুভব করতেছিলেম। সংক্ষেপে আমার অবস্থাটা বলে গেলাম। তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন "তাই ত—এমন হবে কে জান্‌ত! যদি অপরাধ না নেন আমি একটা কাজ...নিয়ে দিতে পারি। সেটা বোধ হয় কলকাতার কলেজে প্রফেসারীর চাইতে মন্দ হবে না—মাইনে ঐ এক শো—মাষ্টারী, একটা ছেলের প্রাইভেট টিউটারী,—অভিভাবকটি বেশ ভাল লোক—ছেলেটি যা—একটা রত্ন। টাকা না পান শান্তিতে কাজ করে সুখ পাবেন। আমাকে সে জমীদার বাবুটি অনেক দিন হ'তেই আপনাদের মত একটি ভদ্রলোককে দেখে দিতে অনুরোধ করে আস্‌ছেন—যাকে তাকে ত আর রিকমেণ্ড করা যায় না,—আপনি ছেলেটির ভার নিলে বেশ হবে।"

বল্লেম "আমার আপনি কি জানেন যে রিকমেণ্ড করছেন—আমি যদি আপনার বিশ্বাসের অযোগ্য হই!"

৬

"সে ভাবনা আমার,—আপনি অনুগ্রহ ক'রে স্বীকার করুন—বাস্তবিকই ছেলেটীতে আমি ইন্‌টারেষ্টেড্‌ !

বলা বাহুল্য সেই কাজই নিলাম। সত্যিই যেখানে যে শান্তি পেয়েছিলেম চাকুরীর জীবনে আর কখনও পাইনি। জমীদার বাবুটি এক অদ্ভুত লোক, অমন লোকের কল্পনাও কখনো আমি করতে পারি নি—একাল সেকাল তাঁতে কেমন মিলে মিশে গিয়েছিল,—ভালমন্দের অমন অপূর্ব্ব সম্মিলন আমি ত আর কোথা দেখি নি—নিজের সামাজিক সংস্কারে, আচারনিয়মে তিনি ছিলেন গোঁড়া, আবার উদারতায় বিপদে আপদে কোল দিতে তিনি হাড়ী ডোমের বিচার একটুও রাখতেন না; নিজের জমীদারীর বিচার, ছোটখাট ফৌজদারীর পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি হ'ত তাঁর কাচারীতে,—জরিমানাও আদায় হতো,—আভাষে একদিন বলেছিলাম সেটায় বেআইনীর কথা। তাতে তিনি যা উত্তর করেছিলেন সেটা ফেলবার নয়। জানি দিবাকর বাবু,—অত আইন দেখলে আমরা বাঁচি কিসে—তাতে প্রজারও লাভ নাই আমাদের ত নাই, ভাবুন এমন একটা ফৌজদারী কেস আদালত করতে গেলে খরচ কত, আমি যা নেই তার চতুর্গুণ, আমরা যাই করি,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা,—এক টাকায় কারো একশো টাকার দণ্ড হয় আবার একশো টাকাকেও কেউ কেয়ারই করে না,—আদালত কি তা ভাবেন,—শাসনই যদি উদ্দেশ্য হয় তা এতেও হয় আদালতেও হয়! নৈলে এসব ছেড়ে দিলে লোকগুলোর কি ভয় থাকে? না—আমাদের মানে? এটা বেআইনী হ'ক আমাদের করতেই হয়!' সরকারের জরিমানা তহবিলের জেল পপুলেশনের ক্ষতি যেটা তিনি গণনাই করতেন না,—তাঁর প্রতাপে সেটা সরকারে জানাবার আশঙ্কাও ছিল খুব কমই। অন্য দিকে আবার ছিলেন তিনি দয়ার অবতার, দুস্থকে তিনি কি মুক্তহস্তে দানটাই করতেন—তাদের বিপদে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত হতেন,—সকলের সঙ্গেই অমন সমভাব আমি কমই দেখেছি। যাই বলিস্ তোরা ভাই আমি একেবারে মুগ্ধ, বাধ্য হয়ে পড়েছিলেম তাঁর,—তাঁর দোষ আর চোখে পড়্‌ত না! ছেলেটির কথা আর কি বল্‌ব—সত্যই রত্ন,—যেমন মেধাবী, তেম্নি তার মিষ্টি ব্যবহার। তার চৌদ্দ বৎসর বয়েস; সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, এক বৎসর তাকে ম্যাট্রিকে ডিটেন হতে হবে কিন্তু সে ছেলেকে বয়েসের বাধা ধরে, ধরে রাখবার নয়! আর তার ছোট

বোনটি—দেব-শিশু,—আমি তাদের ব্যবহারে,—ভাই, তাদের পরিবারের একজন নিকটতম আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিলেম, কি সুখেই দিনগুলো গিয়েছে।

আমার অদৃষ্টে সে সুখ সইবে কেন, ভাই! বছর খানেক না কাটতেই অকস্মাৎ একদিন বজ্রাঘাত হ'ল,—একদিনের জ্বরে ডাক্তার ডাক্‌বারও সময় হ'ল না—জমীদার চলে গেলেন! তাঁর মৃত্যুতে এ অঞ্চলে যে হাহাকার উঠেছিল তা হতেই বুঝা যায় লোকে তাঁকে কত ভালবাস্‌ত!

স্মরণ করতে ইচ্ছা করে না আর সে দিনের কথা—তখন মনে হয়েছিল জীবনে আর এদের কাছ ছাড়া হব না। মাতৃ-পিতৃহীন শিশু দুইটিকে পরমাত্মীয়ের মত বক্ষের মাঝে লুকিয়ে রাখবো—ওদের মুখের দিকে চাইতে আমার প্রাণ ফেটে যেত!

তখোনি কি জানি—আমার ইচ্ছা ইচ্ছামায়ের—ইচ্ছার নিকট তুচ্ছ!

নাবালকের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গেল। নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। দুটা মাস না যেতেই আরম্ভ হল—বিশ্রী কাণ্ডকারখানা,—সেই বেয়াইনী জমীদারের রাজ্যে কথায় কথায় আইন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এমন অবস্থা করলে—লোকজন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লো—আমার উপর ম্যানেজারের অনুগ্রহটা বেশী। কালেক্টারের নিকট কোন কনফিডেন্‌স্যাল রিপোর্টের ফলে কিনা জানি না—সহসা কালেক্টার অফিস হতে এক নোটিস পেলাম—আমাকে আর প্রয়োজন নাই। একমাসের মাইনা পুরস্কার দিয়া আমার সার্ভিস ডিস্‌পেন্স্‌ উইথ (বরখাস্ত) করা হয়েছে!' জানতাম এই কালেক্টরই ছিলেন আমার হাকমী জীবনের প্রভু,—ম্যাজিষ্ট্রেট, সে আদেশে মর্ম্মাহত হলেও—আশ্চর্য্য হলেম না একটুকু! আমার ছাত্রকে ছেড়ে যেতে হবে। তাই হ'ল! আঃ—সে বিদায়ের কথা বলতে পারবো না—ছেলেটা হুহুকরে কাঁদতে লাগলো—মেয়েটার ধুলায় লুটান,—তা দেখে আমারও ধৈর্য্য ধরবার শক্তি ছিল না,—ছেলেদের মতই কাঁদতে হল!

"সে আজ সাত দিন পূর্ব্বের কথা! আজও যে মন ঠিক হয় নি ভাই—ভাবি যখন পাগল হয়ে যাই!"

গাড়ী থামিল। ষ্টেসন প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে কুলীরা চীৎকার করিয়া হাঁকিল "বাবু—কুলি কুলি" "পোড়াদ'—পোড়াদ'।"

দিবাকর সহসা থামিয়া বলিল "পোড়াদা—এত সকালে এসে পড়েছি! আমি—আবেগে অনেক কথা বকে গিয়েছি দোষ নিস্‌নে ভাই।"

উত্তরের অবসর না দিয়া—দিবাকর তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল। আমি বলিলাম—"একটু দাঁড়া দিবাকর,—শুনি বল........."

"ও গাড়ীটা বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না ভাই।"

বলিলাম—'আসল কথাটা শোনা হল না ভাই,—আজ তোর অত জরুরী কিসে..."

দিবাকর অশ্রুভরাক্রান্ত নয়নযুগল আমার দৃষ্টি সমক্ষে স্থাপন করিয়া বলিল "ভাই আমি বড় বিপন্ন—মানুষে ঠেকিয়েছে এত দিন, আজ আমার শত্রু স্বয়ং দেবতা,—খবর পেয়েছি বাড়ীতে আমার স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রের কলেরা।"

গোয়ালন্দগামী গাড়ীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল,—দিবাকর ছুটিল। চক্ষের জলে আর দৃষ্টি চলিল না!

অতবড় লোকের অমন ছেলে—তার কি এ নিয়তি! না,—দেশের আবহাওয়ায় দিবাকর আজ বিপন্ন!

শ্রী—

বিরাগ।

—:০:—

আজি, মুছিয়া ফেলিব হৃদয় হইতে—
অকাতরে যত অভিমান্!
বাঁধিব— হৃদয় লোহার বাঁধনে—
করিব সবায় সমজ্ঞান্॥
আজি, প্রতিষ্ঠিব এক, অভিনব ছবি—
হৃদয়ে আমার একতার।

অসার— দেহের ইন্দ্রিয়চয়ের—
গরব করিব চূরমার॥
আজি, বিলাসিতা সব করি পরিহার—
অহমিকা জ্ঞান করিব নাশ।
তোমার— আমার—আমার—তোমার—
তুমি,—আমি—এই প্রতিভাষ॥
আজি— জ্ঞানের শিখরে আরোহিতে সুখে—
দ্রুত-পদে হ'ব ধাবমান্।
কি করিবে— আজি মায়ার শিকল?—
ভাঙ্গিয়া করিব খান্ খান্॥
আজি,— জননীও যদি, হন্ আগুয়ান—
বাঁধিবার তরে মায়াপাশে।
তবুও না হ'ব প্রতিহত-গতি—
উদিত 'বিরাগ' হৃদয়াকাশে॥

শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য।

অভিনব চিকিৎসা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ন্যূনাধিক্ এক বৎসর হইল এমিল্ কুএ (Emile Coue) নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড আমেরিকায় এক নূতন চিকিৎসাপ্রণালী প্রচার করিতেছেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহু লোক আরোগ্য লাভ করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে জানাইতেছেন এবং সংবাদপত্রে এতৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা

কোন সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু লেখা হইয়াছে কিনা জানি না। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেকে এই চিকিৎসাপ্রণালীর সমর্থন করিয়া নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং আর এক দল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারাই বলিতেছেন যে ইহা একেবারেই অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ। কেহ কেহ কুএকে প্রবঞ্চক বলিয়াও অবিহিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু কুএ নিজে প্রতারিতই হউন বা আর কিছুই হউন তিনি প্রবঞ্চক নহেন কেননা তিনি এই চিকিৎসা করিয়া কাহারও কাছে অর্থ গ্রহণ করেন না।

ফ্রান্সের অন্তর্গত (Nancy) নামক ক্ষুদ্র নগর কুএর জন্ম স্থান, তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর। ইয়োরোপের সকল দেশ হইতেই বহু লোক নান্‌সিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাঁহা দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই চিকিৎসায় অনেকে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তিনি আমেরিকায় গেলে সেখানকার এক জন চলচ্চিত্র-প্রদর্শক তাঁহাকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার চিকিৎসা অতি অনায়াসসাধ্য এবং বিনামূল্যে লভ্য বলিয়া লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ "আমি দিন দিন সর্ব্ববিষয়ে উত্তরোত্তর সুস্থতর হইয়া উঠিতেছি" এই কয়েকটী শব্দ প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এমন অনুচ্চ স্বরে বিশ বার আবৃত্তি করিতে হইবে যেন নিজে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, শব্দ কয়েকটীর ইংরেজী ফর্মিউলা এই Day by day, in every way, I'm getting better and better, বিশ বার গণনার সাহায্যের জন্য এক গাছা দড়ীতে বিশটা গ্রন্থি দিয়া এক এক বার মন্ত্রের আবৃত্তি হইয়া গেলে এক একটী গ্রন্থি অঙ্গুলী দিয়া সরাইতে হইবে। ইহা আমাদের দেশের মালা জপের ন্যায়। মন্ত্রটা লিটানির (Latany) মত পড়িতে হইবে। যাঁহারা লিটানি কাহাকে বলে না জানেন তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও" যে রূপে আবৃত্তি করা হয় সেই রূপে আবৃত্তি করিবেন। আবৃত্তির সময়ে মন্ত্রের প্রতি যে মনঃসংযোগ করিতে হইবে এমন নহে। মন এদিকে ওদিকে গেলেও ক্ষতি নাই। কুএ বলেন যে এই রূপে নিজেকে শুনাইয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিলে নিজকে হিপ্‌নোটাইজ (hypnotize) করা যায় এবং তাহার ফলে সর্ব্ববিধ রোগ—দৈহিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—ভাল হয়।

স্বর্গে এবং পৃথিবীতে আমাদের বুদ্ধির অতীত কত কি আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং এই চিকিৎসাপ্রণালী যে মিথ্যা এবং ভ্রান্ত তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? হিপ্‌নোটাইজ করিলে যে অনেক দুরারোগ্য রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে—তাহা শিক্ষিত লোকে জানেন। যদি নিজের উচ্চারিত শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নিজকে হিপ্‌নোটাইজ করা যায় তাহা হইলে রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইতে পারে। এই চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় নাই, কোন রূপ আয়াস নাই, মনঃসংযোগের প্রয়োজন নাই, স্থান ও ক্ষণের অসুবিধা নাই, বিশ্বাসেরও প্রয়োজন নাই এবং এই প্রণালী অবলম্বন করিলে কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা পরীক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।

কুএ এই চিকিৎসা বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার নাম My method. মূল্য ছয় শিলিং। রোগীদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ব্যায়ামের দুই চারিটি সঙ্কেত।

খুব খানিকটা খাইলেই দেহের পুষ্টি হয় না। আমাদের দেশের বড়লোকেরা প্রত্যহ নানারূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহ যেন এক একটি ব্যাধির যাদুঘর। কেন, ইহার কারণ বলিতে পার কি? কারণ তাঁহারা কিন্তু পরিশ্রম করেন না।

খাদ্যের সঙ্গে আমাদের জীবন-ধারণের ও শারীরিক সুস্থতার খুব নিকট সম্বন্ধ বটে; কিন্তু সেই খাদ্য নির্ব্বাচন, চর্ব্বণ ও পরিপাকের উপর আমাদের সুস্থতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আমাদের বারো আনা ভাগ ব্যাধি জন্মে কেবলমাত্র খাদ্য নির্ব্বাচনের অবিমৃষ্যকারিতায়, উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করায় ও উপযুক্তরূপ পরিপাক-শক্তি না থাকায়। পাঠক-পাঠিকাবর্গ বোধ হয় জান যে, আমরা কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তাহা পেটের

মধ্যে গিয়া কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারে পাচক রসের (Renin pehsin, Hydrochloric acid প্রভৃতি) সাহায্যে সংপেষিত ও পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করে; পাচক রসের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী ব্যক্তিবিশেষে ঐ পেষণ ও পরিপাক এক এক প্রকার হইয়া থাকে; ইহাকেই তত্তৎব্যক্তির হজম-শক্তি কহা যায়। পরিপাক ক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ক্ষীরবৎ তরল খাদ্য-দ্রব্য, অন্ত্র মধ্য দিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে; তন্মধ্যে যেটুকু অংশ রীতিমত পরিপাক করা হইয়াছে, সেটুকু রক্তের মধ্যে আশোষিত হইয়া রক্তের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যেটুকু পরিপাক হয় নাই, সেটুকু বিষ্ঠার আকারে ও প্রকারান্তরে ঘর্ম্ম মূত্ররূপে দেহ হইতে নিসৃত হইয়া যায়।

সুতরাং হৃষ্টপুষ্ট হওয়া অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের গ্রহণের উপর যত না নির্ভর করুক্ ততোধিক নির্ভর করে ঐ খাদ্য সম্যকরূপে পরিপাক করার উপর; এবং এই পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায় নিয়মত প্রনালাবদ্ধ-ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে বা ব্যায়ামে। যাহারা দিন মজুরী করিয়া প্রত্যহ নিয়ম মত শারিরীক পরিশ্রম করে ও ডাল ভাত শাক চচ্চড়ী খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের দেহ এবং যাহারা ঘি, দুধ, ছানা, চিনি খাইয়া ফরশীর নল মুখে করিয়া সোফায় শুইয়া থাকেন তাঁহাদের দেহ—পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

যাহাদের কেবল মাত্র মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়—কোনরূপ দৈহিক শ্রমের ধার দিয়াও যাইতে হয় না, তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যহ কিছু সময় করিয়া ব্যায়াম যে কতদূর উপকারী তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। ভ্রমণ অপেক্ষা সহজ ও আশু ফলপ্রদ ব্যায়াম আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু ইহাতে দেহের প্রত্যেক অঙ্গটির পরিচালনা হয় না বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুতা সাধিত হয় না। আমাদের দেশে এমন অনেক ধনী সন্তান আছেন যাঁহাদিগকে হয় ত জীবনে কখনও পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হয় নাই বা হইবে না, এবং সহরে যেখানে ছয় পয়সায় ট্রামে চড়া যায় ও দুই চারি আনায় রিক্স হাঁকান যায়, সেখানে অনেক মধ্যবিত্ত বাবুমহাশয়ও প্রায়শঃ "চরণ-বাবুর জুড়ী" চালাইতে লজ্জা বা আলস্য বোধ করেন। কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ তাঁহারা অনায়াসেই 'শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্‌'রূপে গঠন করেন এবং অকালে কাল কবলিত হন।

স্বাস্থ্য দুই প্রকার;—একটি মানসিক অন্যটি কায়িক। স্বাস্থ্যচর্চ্চা করিতে গেলে দুইটির প্রতিই অল্পবিস্তর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মানসিক পরিশ্রমে দেহের যতটা ক্ষতি করে, দৈহিক পরিশ্রমে মনের ততটা ক্ষতি সাধন করে না—ধ্রুব সত্য। পরন্তু যদি মনকে অবহেলা করিয়া একমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যেরই উন্নতি বিধান করা যায়, তাহা হইলে তাহা মানুষের পশু-বৃত্তি পরিস্ফুরণের সহায়তা করিবে মাত্র; আপনার শক্তি কোন পথে নিয়োজিত করিলে পরের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রখিয়া নিজের আহার্য্য সংগৃহীত হয়, তাহা কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিলে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধিত হয়, সে সন্ধান মন উৎকর্ষিত না হইলে কেহই দিতে পারে না; সেইজন্যই সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজন। কিন্তু মনের স্বাস্থ্যকে আমরা (বাঙালী জাতি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরূপ লবণের বোঝা ও তোতা পাখীর মত ধর্ম্মজ্ঞানহীন অবাস্তব অসার ভেদজ্ঞান-বিধায়ক মুখস্থ করা বিদ্যার মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছি। ইহাতে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে না, উহার উন্নতিও হয় না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি, শ্রদ্ধা—এই ছয় প্রকার চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ, ধর্ম্ম-চিন্তা, স্বাধ্যায় ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। আসল বাগানকল মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে গিয়া আমরা প্রায়শঃ শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া যাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক ছাত্রেরই Buchu র সেই সারগর্ভ বাণী সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখা উচিত + —"Learning in a broken body is, like a sword without a handle." (বাঁট বা হাতলহীন তলোয়ারের মত ভগ্ন দেহে বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।) শরীর মনের আধার; চিত্তবৃত্তির দ্যোতনা হয় দেহ-যন্ত্র মধ্য দিয়া। সুতরাং দেহকে সর্ব্বদা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ না রাখিলে মন আপনার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সাধন করিতে পারে না। ভগ্ন ও সছিদ্র কলসীতে কতক্ষণ জল ধরিয়া রাখা যায়? ফলতঃ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান একান্ত কর্ত্তব্য; তাহাতে মনও অনেক সময় সুস্থ থাকে। এই জন্য প্রথমতঃ শারীরিক ব্যায়াম ও দ্বিতীয়তঃ নিয়মিত পুষ্টিকর আহার গ্রহণ ও বিহারে সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন।

প্রধানতঃ লোকে তিনটি আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া ব্যায়ামে তৎপর হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা দেহের কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি করিবার ও সুস্থতা বজায় রাখিবার বা কোন বিশেষ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য ব্যায়াম করেন; ইহাকে ইংরাজীতে physical exercise বলা

হয়। স্যাণ্ডো, বার্ণার ম্যাক্‌ফ্যাডেন্, আর্ল লীডার-ম্যান, হেকেন্‌স্মিথ্ প্রোফেসর রেলো, রোঁদি, কাপ্তেন ফণীন্দ্র গুপ্ত, মংচিত্তুন প্রভৃতি এই প্রথম শ্রেণীর ব্যায়ামকারী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই শ্রেণীর ব্যায়ামের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা—কেবল অঙ্গসৌষ্টব ও দৈহিক লাবণ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা প্রকার ব্যায়াম করেন; তাহাকে ইংরাজীতে physical culture বলা যায়। আমেরিকার পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আজকাল এই শ্রেণীর ব্যায়ামে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তথায় অঙ্গসুষ্ঠু-সাধনোপযোগী নিত্যনূতন ব্যায়ামের কৌশল ও ব্যায়ামশালার উদ্ভব হইতেছে। তৃতয় শ্রেণীর লোকেরা পালোয়ান্ বা কুস্তীগির হইবার জন্য ও সাধারণে নিজ অসাধারণ শক্তি-কৌশল দেখাইবার জন্য নানারূপ ব্যায়াম চর্চ্চা করেন; ইঁহাদের অনেকেই শক্তিচর্চ্চা একটা অর্থকরী ও জীবন-নির্ব্বাহ ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর লোকদিগকে athlete নামে অভিহিত করা হয়। কাল্লু, কিক্কড় সিং, গোবর গুহ, ভীম ভবানী, রামমূর্ত্তি, মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। আপাতঃদৃষ্টিতে এই তিন শ্রেণীর লোকদের ব্যায়ামে কার্য্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও, সকলেরই এক সাধারণ উদ্দেশ্য—দেহকে সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও শক্তিশালী করিয়া তুলা।

এক্ষণে ব্যায়াম অর্থে আমরা কি ও কতখানি বুঝি—তাহাই একটু বিশদভাবে বলিতে চেষ্টা করিব। যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক শ্রম হয় ও করিবার স্থায়ী শক্তি জন্মে এবং যাহা মনের অনুকূল ও দেহের বলবর্দ্ধক তাহাকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে রাজবল্লভ, চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশকার, বাগভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বিজ্ঞানশাস্ত্রকারগণ নানা কথা কহিয়া গিয়াছেন এবং নানা ভাবে তাহার গুণাগুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফল কথা তাঁহাদের মতে, ব্যায়াম দ্বারা দেহ লঘু, কর্ম্মে সামর্থ, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, শরীর স্থির যৌবনাপন্ন, বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধি নাশ ও পাকাশয়ে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির কোন রোগ জন্মে না বা সহজে তাহাকে কোন সংক্রামক রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা, বিরুদ্ধ ভোজন করিলেও অত্যল্পকাল মধ্যে পরিপাক হয়, স্থূলতা নাশ বা অসম্ভবরূপ মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়, এবং 'বিভক্ত ঘন গাত্রতা' (শরীরে যেস্থল যেরূপ হইলে সুন্দর দেখায় তাহা) জন্মে। উপযুক্ত পরিমাণে ও ব্যক্তিগত সামর্থ অনুসারে ব্যায়ামে সর্ব্বদা সুফল দর্শে, নতুবা অতিরিক্ত অভ্যাসে

নানারূপ উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়; যথা—কাশরোগ, জ্বর, সর্দ্দি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমন, রক্তপিত্ত প্রভৃতি।

এখন আমরা সাধারণের উপযোগী কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ব্যায়াম-কৌশলের বিষয় বলিব। এগুলি বারো হইতে উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি নিয়মিত অভ্যাস করিলে অল্পকাল মধ্যে নিশ্চিত ফল প্রত্যক্ষ হইবে। বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকদের খেলা-ধুলা, দৌড়ঝাঁপ সাঁতার, সাইকেল চালানো প্রভৃতি ব্যতীত কোন প্রণালীবদ্ধ নির্দ্ধারিত ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। উনত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণও ব্যায়াম সুরু করিতে পারেন; কিন্তু তাহার ফল প্রত্যক্ষ হইতে একটু দেরী লাগিবে এবং ব্যায়াম করিয়া হঠাৎ বন্ধ করিলে বাত, হৃদি-দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি ব্যাধি জন্মাইতে পারে। সাধারণতঃ উনত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের দেহের খুব সামান্য বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়; অধিকাংশেরই শরীরের বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না—সমভাবে থাকে; বাঙ্গালী বাবুদের বরং কিছু কিছু করিয়া কমিতে আরম্ভ করে। যাঁহারা উনত্রিশ বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই ব্যায়াম সুরু করিয়াছেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়াম চালাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে চল্লিশের পর হইতে ব্যায়ামের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চাশের পর ভ্রমণ ব্যতীত আর কোন সশ্রম ব্যায়াম করা উচিত নহে।

এইবার ব্যায়াম করা সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটী উপদেশ দিয়া আমরা প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

(১) মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করা সর্ব্বাপেক্ষা হিত কর। শীতকালে একটা গেঞ্জী গায়ে বা ঘরের মধ্যে খালিগায়ে করা যায়; গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদা খালিগায়ে ব্যায়াম করিবে; একবারে নগ্ন হইয়া ব্যায়াম করিতে পারিলে ভাল হয়, তাহাতে বাধা থাকিলে লেঙট্ পরিয়া করা যাইতে পারে। ব্যায়াম জিনিষটিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে একখানি বা সম্মুখে-পশ্চাতে দুইখানি বড় আয়নার সম্মুখে উহা প্রত্যহ অভ্যাস করা উচিত যখনই কোন অঙ্গ বিশেষের পেশী ব্যায়ামের সময় সঙ্কোচনের ফলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তখনই আয়নার মধ্য দিয়া ঐ অংশটির প্রতি অপলক একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে থাকিবে।

(২) ব্যায়ামের সময় মনঃসংযোগই প্রধান বিষয় ব্যায়াম করিতে করিতে মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে ব্যামের সমূহ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরে দুই প্রকার পেশী আছে; এক প্রকার স্বেচ্ছানুবর্ত্তী (Voluntary), অন্যপ্রকার স্বতঃপ্রবৃত্ত (Involuntary) পেশী। আমাদের দেহের উপরের মাংসলভাগ এই স্বেচ্ছানুবর্ত্তী পেশী দ্বারা গঠিত এবং উহা দ্বারাই আমাদের অস্থিময় কঙ্কালটী আবৃত থাকে; এই পেশীগুলী আমাদের রবিবাবুর সেই পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মত একান্ত আজ্ঞাধীন; আমরা যখন যাহা বলি, ঠিক তাহা করে। আমাদের একই প্রকার হুকুম তামিল করিতে করিতে তাহারা এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, সেই মনের মধ্যে উদয় হইতে না হইতে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই কাজ করিয়া বসে। অন্যদিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংশপেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না এবং তাহারা সর্ব্বদা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। আমরা ইচ্ছা করিয়াও ইহাদের গতি বা ক্রিয়া বোধ করিতে পারি না, এমন কি অচেতন অবস্থায়—ঘুমের সময়ও ইহাদের কার্য্য অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। পাকস্থলী Stomach অন্ত্র (Instestines), হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পেশী উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। আমাদের প্রত্যেক শরীরের স্বেচ্ছানুবর্ত্তী ও স্বতঃপ্রবৃত্ত পেশীর মুটামুটী সংখ্যা পাঁচশত। এখন, প্রথম শ্রেণীর পেশীগুলিকে অধিকতর কর্ম্মঠ ও আজ্ঞাবাহী করিয়া তুলাই ব্যায়ামের মূখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য মানসিক একাগ্রতা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ যদি ব্যায়ামের সময় মনঃসংযোগ করিয়া মনে মনে বলা যায়,—"আমার পেশীগুলি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া অধিকতর পুষ্ট ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠুক"—, তাহা হইলে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী পেশীগুলির স্বাভাবিক আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বশতঃ আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে সচেষ্ট হয় ও এইরূপ ক্রমাগত আজ্ঞা পলনের চেষ্টা একদিন স্থায়ী কার্যে পরিণত হইয়া যায়। মানুষের মনের সহিত শরীরের কি নিবিড় সম্বন্ধ তাহা এই ঘটনা হইতেই বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক ব্যায়াম করিবার সময় তুমি যে ব্যায়াম করিতেছ (অন্য কিছু করিতেছ না বা ভাবিতেছ না) এবং তাহা শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই করিতেছ, একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। সেইজন্য নির্জ্জন স্থান খুঁজিবে।

(৩) ব্যায়াম কখনও কষ্ট-কাঠিন্য করিয়া অভ্যাস করিবে না। ব্যায়ামের সময় কখনও মুখ সিঁটকাইও না ঐ সময় মুখ খানি সৌম্য, শান্ত ও সহাস রাখিবার চেষ্টা করিবে।

মোট ফেলার মত করিয়া কখনও কোনদিন ব্যায়াম করিবে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ধীরভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। ঐ সময় কোন অঙ্গ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইতস্তত: দ্রুত সঞ্চালন করিবে না, বা ব্যায়াম নিযুক্ত প্রত্যাঙ্গাদিকে হঠাৎ ঝাঁকানি দিবে না।

(৪) নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। হঠাৎ জোরে শ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবে না; অতি ধীর নিঃশব্দে করা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম-নিযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন বা ঐ স্থানের মাংসপেশী আকুঞ্চন প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তালমান্ বজায় রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ করা যাইতে পারে; ইহার বিপরীত হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আবার কোন কোন ব্যায়ামের যৌগিক 'কুম্ভক' বা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন হয় মোদ্দা কথা স্থানীয় মাংশপেশী ও নিঃশ্বাসের সহিত যেন গায়ক ও বাদকের সম্বন্ধ অটুট থাকে।

(৫) কতগুলি ব্যায়াম বিধি একাদিক্রমে কষ্টসাধ্যভাবে পালন করিতে যাওয়া বোকামি মাত্র; তাহাতে অনেক সময় অনেক কুফল দর্শে, প্রত্যেক প্রকারের পর পর অন্ততঃ আধ মিনিট (সময় বিশেষে এক মিনিট) করিয়া বিশ্রাম লওয়া ও সমস্ত মাংশপেশী গুলিকে শ্লথ করিয়া দেওয়া উচিত।

(৬) আয়ুর্ব্বেদ মতে শীতকালই ব্যায়ামের পক্ষে সর্ব্বপেক্ষা প্রশস্ত সময়; তন্নিম্নে হেমন্ত বসন্ত কাল। সকল ঋতুতেই প্রতিদিন ব্যায়াম করা চলে, তবে সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম লওয়া যাইতে পারে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতে শক্তির অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করা উচিত। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্বা ঈষৎ শুষ্ক ও পিপাসা বোধ না হয় ও কপাল, নাসিকা, গাত্র সন্ধি ও বগলদুইটিতে অল্প অল্প ঘর্ম্মোদ্গম হয়, তখনই অর্দ্ধ শক্তি পরিমাণ ব্যায়াম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ভাবে শ্রান্ত হইলেই (কি শীত কি গ্রিষ্ম) তৎক্ষণাৎ ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই ব্যায়াম উপকারী; অসুস্থ ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র ব্যায়ামের বিধান দেওয়া আছে, তৎসম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে। কাসরোগী, শ্বাসরোগী, জ্বরবানরোগী, ক্ষয়, রক্তপিত্ত ও শোষরোগী কখনও নিম্নলিখিতরূপ ব্যায়াম করিবে না। যে কোন ব্যায়ামই হউক না কেন, স্নান-ভোজনের পর বা রতি ক্রীড়ার পর ব্যায়াম কদাচ অভ্যাস করিবে না, তাহাতে শরীরের যথেষ্ট অপকার হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও আয়ুর্ব্বেদের সহিত প্রায় একমত।

(৭) প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালই ব্যায়ামের পক্ষে প্রশস্ত সময়; অন্য সময় করিলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। শয্যা ত্যাগ করিয়া খালিপেটে ব্যায়াম করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। শক্তি ও প্রয়োজন বুঝিয়া দুইবেলা ১৫—২০ মিনিট কাল করিয়া ব্যায়াম করা যাইতে পারে। ছাত্রেরা একবেলা ব্যায়াম করিলেই যথেষ্ট; কারণ উহার উপর স্কুলে ড্রিল করিতে ও বৈকালে ফুটবল প্রভৃতি খেলা করিতে হয়। তাহাতেই দুইবেলা পূর্ণভাবেই ব্যায়ামের কাজ সাধিত হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল ফুটবল প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী খেলায় শরীরের অতিরিক্ত (violent exercise) সাধিত হয় তাহা শরীরের পক্ষে প্রায়ই উপকারী না হইয়া বরং অপকারী হইয়া উঠে। আমাদের দেশী কপাটি, হাডু গুডু, কিৎকিৎ প্রভৃতি খেলা এ দেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। বাঙালীর পক্ষে প্রতিবারে অর্দ্ধঘণ্টার বেশী সময় ব্যায়াম করা উচিত নহে; কিন্তু প্রথমে পাঁচ মিনিট হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ঊনত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যায়াম ক্রমশঃ বাড়ান যাইতে পারে; তৎপরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়ামের পরিমাণের যেন হ্রাস বৃদ্ধি না হয়! চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে উহার মাত্রা ক্রমশঃ কমাইয়া একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে হয়। ব্যায়াম করার অব্যবহিত পরেই কখনও স্নানাহার বা জলপান করিবে না। ব্যায়ামের পরই স্নানাহার ভাল; কিন্তু অন্ততঃ গাত্রের ঘর্ম্ম শুকাইলে হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসিলে (অন্ততঃ ১৫ মিনিট পরে) তবে স্নান করা বিধেয়। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে উত্তমরূপ তৈল মর্দ্দন ও স্নানের সময়—ভাল করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। আহারের পূর্ব্বে লবণ ও আদা খাইয়া লইলে ভাল হয় ও আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে। আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর পর এক গ্লাস করিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিও।

(৮) ব্যায়ামের সময় মাংসপেশীর আকুঞ্চন যতদূর সম্ভব সম্পাদন করিবে—যাহাতে পেশীটি ফুলিয়া উঠিয়া তোমাকে, যৎসামান্য যন্ত্রণা দিতেও কুণ্ঠিত না হয়। ব্যায়ামকারীর অতিরিক্ত ঘি, দুধ খাইবার স্বচ্ছলতা থাকিলে—খাইবে, নচেৎ প্রয়োজন নাই। সাদা-মাঠা শাক-চচ্চড়ী ভাত খাইয়াই শরীরের শক্তির উদ্বোধন হইবে; কিন্তু সকল কাজে নিয়মনিষ্ঠ হইবে। ব্যায়ামের সময় কক্ষের দরজা জানালা যতদূর সম্ভব মুক্ত করিয়া দিবে ও কদাচ মুখ দিয়া নিশ্বাস টানিবে না। মুক্ত বায়ু যতদূর পার সেবন করিবে; কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডা

বা রৌদ্র লাগাইও না, শীত, বর্ষার সময় উপযুক্ত পরিমাণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে! নিয়ম রক্ষা, অধ্যবসায়, ও একাগ্রতা ব্যায়ামে সাফল্যলাভের তিনটি প্রধান উপায়—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

এইবার দুই চারিটি সহজসাধ্য সর্ব্বসাধারণের উপযোগী আশুফলপ্রদ ব্যায়াম-কৌশলের কথা বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট এবারকার মত বিদায় গ্রহণ করিব।

(১) দুইটি পায়ের গোড়ালী একত্র করিয়া পায়ের পাতা ত্রিকোণাকারে ঈষৎ ফাঁক করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটি উভয় পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখ। তার পর হাত দুইটি সোজাভাবে সম্মুখ দিয়া মাথার উপর ধীরে ধীরে তুলিতে থাক ও ঐ সঙ্গে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে থাক। তার পর নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া গোড়ালী দুইটি ঈষৎ উঁচু করিয়া ধরিয়া, হাতের পেশীগুলি রীতিমত শক্ত করিয়া যেন উপরের কড়িকাঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ করিতে যাইতেছ, এইরূপভাবে পরিগ্রহ কর। এইভাবে ৫।১০ সেকেণ্ড থাকিয়া হাত দুইটি নীচের দিকে নামাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন ও ঐ সঙ্গে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর ও মাংসপেশীগুলি আল্‌গা করিয়া দাও। এই কৌশলটিও নিম্নলিখিত—অন্যান্যগুলি প্রথমে তিনবার বা পাঁচবার হইতে আরম্ভ করিবে।

(২) পূর্ব্ববৎ সহজ ও সোজাভাবে দাঁড়াও, কিন্তু দক্ষিণ পদটি সম্মুখ দিকে ঈষৎ অগ্রসর করিয়া রাখ। এক্ষণে নিঃশ্বাস টান ও সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বের দিক দিয়া সোজাভাবে হাত দুইটি মাথার উপর দিকে ধীরে ধীরে তোল ও মনে মনে ভাব যেন হাত দিয়া কোন ভারী দ্রব্য মস্তকের উপর উঠাইতেছ। তারপর নিঃশ্বাস না বন্ধ করিয়াই শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে হাত দুইটি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন। ঐ ভাবে বাম পদ সম্মুখে আগাইয়া অভ্যাস কর।

(৩) প্রথমবারের ন্যায় গোড়ালি একত্র করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। এক্ষণে নিঃশ্বাস টানিতে আরম্ভ কর ও তৎসহিত হাত দুইটি সোজা করিয়া পার্শ্বের দিক তুলিয়া স্কন্ধের সহিত সমকোণের (Right angle) সৃষ্টি কর। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া গোড়ালির উপর ভর দিয়া যাঁতার (Pivot) সূক্ষ্মাগ্র কীলক বা ঘড়ীর কাঁটার মধ্যগত আলএর মত শরীরটি এক পার্শ্বে যত দূর পার ঘুরাও, তারপর পুনরায় অন্য পার্শ্বে অর্দ্ধ চক্রাকারে ঘুরাও (অবশ্য পার্শ্ব-

বিস্তৃত হাত দুইটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া যাইবে)। তারপর হাত নামানর সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া এস।

(৪) মেজে বা বিছানার উপর চিৎ হইয়া লম্বালম্বি শুইয়া পড়। দেহের সমস্ত পেশী শ্লথ করিয়া স্থির সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে থাক। এক্ষণে ধীরে ধরে গভীরভাবে নিঃশ্বাস টান ও সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বুকের উপর খারা করিয়া উঠাও; উঠাইয়া মুষ্টি খুলিয়া হাতটি অলগাভাবে থপাস করিয়া বিছানার উপর ফেবিয়া দাও, কিন্তু ঐ সঙ্গে অতি ধীর শ্বাস পরিত্যাগ কর। তারপর দুই এক মিনিট কাল চুপ করিয়া পড়িয়া থাক; পুনরায় উপরি উপরি উক্ত ব্যাপারটি অনুষ্ঠান কর। শ্রান্তি, আলস্য, স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশীর জড়তা টান্‌টান্ অবস্থায় এই ব্যায়ামটি অমোঘ ফলদায়ী।

(৫ ক) সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে হাঁটু দ্বয় ভাঙ্গিয়া গোড়ালি উঁচু করিয়া দুইহাতে ভর দিয়া উবুর হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়! এই অবস্থায় অন্ততঃ অর্দ্ধ মিনিট কাল অবস্থান কর। তারপর মাথাটি সন্মুখের দিকে অবনমিত করিয়া এবং শরীরের সমস্ত ভার হাত দুইটির উপর দিয়া পা দুইটি একত্র করিয়া পিছনের দিকে সবেগে বিলম্বিত করিয়া দিয়া অবস্থান কর।

(৫ খ) এইরূপ ভাবে প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল অবস্থান করিয়া, প্রথমে কটি-দেশটি নীচু ও পরে হাত দুইটি ভাঙ্গিয়া বক্ষ ও শীর্ষদেশ নীচু কর; পুনরায় হাত দুইটি সোজা করার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ ও শীর্ষদেশ উঁচু করিয়া কটিদেশ উঁচু কর; এইরূপ কয়েক বার অভ্যাস কর। শ্রান্তি বোধ করিবামাত্র হাতের উপর ভর দিয়া পা দুইটি ভিতরদিকে মুড়িয়া পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া এস; পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী বিশ্রাম কর।

আজ এই পর্য্যন্ত। আগামীবারে ব্যায়াম কৌশল বিষয়ে আরো দুই চারি কথা বলিতে বাসনা রহিল।

'স্বাস্থ্যসমাচার'

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মরণ আড়াল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অলকার অসুখ হইয়াছিল খুব বেশী। আমরা কলিকাতা পৌছিয়া দেখিলাম—তিনি আরোগ্যমুখী। তখনও অতিশয় দুর্ব্বল,—রোগশয্যা ত্যাগের শক্তি নাই।

মেয়েটী বেশ। তাঁহার রক্তহীন পাংশুল বদন-মণ্ডলে এমন একটা স্নিগ্ধতা, বিশেষত্ব বিরাজিত, যাহাতে লোককে আকৃষ্ট করে। কথা বলেন কম,—আমার সহিত তাঁহার কয় দিনেরই বা পরিচয়, বলিবারই বা কি আছে, শক্তিও নাই,—তবু মনে হইতেছিল,—আমি যেন তাঁহার কত দিনের পরিচিত,—আত্মীয়। সহানুভূতিতে হৃদয় আমার পূর্ণ হইয়া উঠিত,—মনে পড়িত তাঁহাদের সে দিনের কথা,—তাঁহাতে ও অতুলে! কোথায় আজ অতুল। বেচারী জানে না অতুলের দশা। সহ্য করিতে পারিবেন কি ইনি অতুলের অমন ভাবের মৃত্যু! হয়ত—অতুলের অপমৃত্যুর রহস্য চিরকাল ইঁহার অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে কিন্তু বন্ধুর মহাপ্রস্থানের নির্ম্মম আঘাত সহ্য করিতে হইবে ইঁহাকে অচিরেই। ইঁহার শরীর মনের অবস্থা দেখিয়া সেই কথাই আমার মনে হইত,—কিবা হয়! সার্থান্ধ ডাক্তার, একটুকুও কি দয়ামায়া নাই তোমার প্রাণে! এমন সুরভি সুন্দর নির্ম্মল কুসুমকে লোকে পদদলিত করে কোন প্রাণে!

সাধ্য নাই কাহারও ডাক্তারের বাহিক ব্যবহারে তাঁহার অন্তরের ভাব ধরিতে পারে! অলকার সহিত তাঁহার অতি অমায়িক মোলায়েম ব্যবহার; 'মা' না বলিয়া কথা বলেন না,—তাঁহাকে সুখী করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট যেন। অভাব নাই কিছুরই।

অলকাকে সর্ব্বদা দেখিবার অবসর ডাক্তারের কমই—তাঁহার অনন্ত কাজ,—দস্তুর মত বিজিনেছ (কারবার) এথানে, ছয় সাতটা দোকান—একটা লেবরেটারী, সেখানে বহু প্রকারের পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়,—তাঁহার অধীনে তিনটা বড় ডাক্তার,—ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য রকমের আরও নাকি কারবার আছে। ডাক্তারের অবসর কোথা? কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ

সকল ত কর্ম্মচারীর ই পরিচালনা করে—ইচ্ছা করিলে কি আর ডাক্তার কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা অলকাকে রীতিমত দেখিবার শুনিবার অবসর করিতে পারিতেন না? ডাক্তার রোগী গৃহে দেখা দেন দেন ঘড়ি ধরিয়া। সেই সময়টুকুর মধ্যেই আপ্যায়িত আলাপনে আত্মীয়তার একশেষ করেন। অলকা কি ভাবেন জানি না, আমার কিন্তু সন্দেহাকুল সংকীর্ণ মনে মনে হয়, একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিতেছে। এখানে আসিবার পর ডাক্তার আমাকে সে প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন নাই। আমি কেন জিজ্ঞসা করিব। তাঁহার আদেশে বাসায় বসিয়াই দোকানের হিসাবপত্র কিছু কিছু দেখি—দিনে তিন চারি ঘণ্টা;—অবশিষ্ট সময়টা একটানা অবসর। বহির্জগতের সহিত আমার সম্বন্ধটা দাঁড়াইয়াছে অদ্ভুত। বলিতে কি এখনও মনের ভয় কাটে নাই,—কোন সূত্রে আবার কিবা হয়,—বাসাতে বসিয়াই দিন কাটে। জনসমুদ্র মহানগরীর মধ্যে অবস্থান করিয়াও আমি একা। সময় সময় অলকার কক্ষে কাটাই—সেটাও ডাক্তারের ইঙ্গিতে। রোগী শুশ্রূষা আমার ছোট বেলা হইতে বাতিক। নার্শেরই মত রোগীর ঔষধ পথ্য যাহাতে যথা সময়ে দেওয়া হয়, তাঁহার অভাব অসুবিধা যাহাতে না হয় সে বিষয়ে আমার খর দৃষ্টি। জেলে নয়টা বৎসর খাটিয়া আর কিছু না হ'ক নিয়মের কাজ ঠিক সময়মত করিবার শক্তি আমার খুব জন্মিয়াছে। অলকা অতি ভদ্র,—তাঁহার অমন অবস্থাতেও আমার সেবা গ্রহণে কখনও সঙ্কুচিত হন—আমি তাহার জবাব দিতে জানি,—অনেক সময়ই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলি না,—আমি যখন তাঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছি,—তখন ও পরিবারের একজন বলিয়া কি দাবী করিতে পারি না? কেন কুণ্ঠিত হইবেন তিনি আমার সেবা গ্রহণে। শিষ্টাচারের আদানপ্রদানে আমাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব সঞ্জিবীত হইয়া উঠিতেছে, বেশ অনুভব করি কিন্তু তাহাতে ত আমাকে শান্তি দিতে পারে না। জানি আমি, ভবিষ্যতে অলকার জন্য কি আছে। মনে পড়ে আমার,—বাঙলার মেয়েদের কথা,—স্বাধীনা, শিক্ষিতা হইয়াও তাঁহারা কত অধীন! আজ যদি কন্যা না হইয়া অলকা হইতেন পিতার পুত্র সন্তান,—এ অবস্থা ঘটিত কি! সেই সঙ্গে ভাবি নিজের কথা,—পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি করিলাম! হ'ক বাঙ্গলা সোনার—জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান—কিন্তু আবহাওয়া তাঁর নয় গর্ব্ব করিবার মত,—তাঁর প্রাচুর্য্য বরং করিয়াছে—সন্তানকে তাঁর অলস,—কর্ম্মশক্তিপরাঙ্মুখ, পরপ্রত্যাশী, পরাধীন। বঙ্গসন্তান নয় মানুষ,—মনুষ্যধর্ম্মে ফুটিয়া

উঠিবার এত বাধা,—জগতে কোন দেশে আছে কি না জানি না। সমাজ,—আচার ব্যবহার অধিবাসীর আত্মীয়তার গর্ব্ব অন্যে করে করুক আমি ত পারিব না! সমাজ দিখিয়াছি নিভার মাতৃ-উক্তিতে,—সহানুভূতির পরিচয় পাইয়াছি জেলে যাইবার পূর্ব্বে,—আর জাত্যাভিমান বর্ণাশ্রমের পূর্ণ পরিণতি জেলে,—ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্র ছেদনের যন্ত্র জেলের রেগুলেসন,—জগন্নাথ-ক্ষেত্র—হাড়ী ডোম ব্রাহ্মণ সব একাকার,—শক্তের চাপে সব তরল। শক্তিহীন জাতি কাপুরুষ—পুরুষ নয়,—শিক্ষায় তাঁহাদের মনকে কতখানি উন্নত করিতে পারে বিলাতফেরত বাঙ্গালী ডাক্তার গুপ্ত তাহার উদাহরণ। অভিশপ্ত জীব আমি, আরও বা কত দেখিতে হয়—সু কি আমার জীবনে নাই! সু ছিলেন যাঁহারা, শান্তি ছিলেন যিনি—কোথায় তাঁহারা? সমস্ত ভাবনা চিন্তা এলোমেলো হইয়া যায়—প্রাণটা কেমন করে—অস্থির হইয়া এ নরকে ডুবিয়াও ভাবি কোথায় নিভা কেমন আছ বা! নরহরিদা বাঁচিয়া আছ কি! তাহাদের নিকট ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু আজও যে আমি বন্দী,—অবস্থার দাস।

অদৃষ্টটা দেখুন—অবশেষে জুটিলাম যদি এখানে—এখানেও সেই চিত্র,—যাকেই মনে ভাবি আপনার তাঁরই বিপদ! নিজের উপর ঘৃণা জন্মে—সত্যিই মনে হয় আমি বুঝি শনি, আমার দৃষ্টিতে সমস্ত ছারখার হইয়া যায়,—অলকার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে ভয় হয়!

আষাঢ়ের প্রথম। দিনটা সে দিন বিশ্রী,—আকাশ ভরা মেঘ,—অবিরত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার! সম্মুখের 'আল্‌সায়' নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া একদল কাক কাতর কণ্ঠে থাকিয়া থাকিয়া কা—কা করিতেছে। একখানা বই হাতে করিয়া দোতালার বারাণ্ডায় বসিয়া আছি,—পড়িবার প্রবৃত্তি নাই—যত রাজ্যের চিন্তা! অলকাও একখানা ইজিচেয়ারে গরম কাপড়ে আপাদকণ্ঠ আবৃত করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নীরবে আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন। বদনে বিষাদের ছায়া—মনেও বুঝি তাঁহার বাহিরের মতই অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল একটা কথা প্রসঙ্গ পাড়িয়া তাঁহার চিন্তা স্রোতে বাধা দেই,—কিন্তু কথা জুটিতেছিল না!

অবশেষে তিনি নিজেই সে নীরবতা ভঙ্গ করিবেন—"এমন ভাবে পড়ে থাকা বড় কষ্টের নয় কি মিষ্টর গুপ্ত?"

"নিশ্চয়! কিন্তু কি করবেন বলুন—শরীর ত আপনার আজও ঠিক হয় নি!"

"আর শরীর,—শরীর ঠিক হলেই বা কি করতেম,—বড় জোড় একটু ঘোরাফেরা, তার বেশী আর কি!"

ঔদাস্যে তাঁহার মনটা পূর্ণ হইয়া আছে। কি উত্তর দেব! বলিলাম "দিনটাও হয়েছে যে বিশ্রী,—মনটাও কেমন বিশ্রী হয়ে যায়!"

তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন,—আমার মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "ঠিকই মিষ্টার গুপ্ত! ভাল লাগে না কিছুই,—অনেক সময়ই মনে হয় আপনায় বলি,—একটা কথা,—আমার রোগের সময় আপনার চেষ্টা, আপনার সহৃদয়তা আমাকে সে সাহস দেয় কিন্তু ইচ্ছা হয় না বল্‌তে—আমার কথা নয় সুখের—সকলকে জানাবার নয়—পাছে........।"

মানুষের মন বুঝি প্রতিধ্বনিপরায়ণ—আমার মনেও ঐ কথা,—আমি তাঁহার বাক্য শেষ হইবার অবসর না দিয়া বলিলাম—'কেন তা মনে কর্‌ছেন,—আমি আপনাদেরি একজন—আপনাকে ত আমি অন্য ভাব্‌তে পারি না।'

'বুঝেছি তা তাইত বল্‌তে সাহস পেয়েছি—কিন্তু 'আপনাদের' হলে আমার কাজ হবে না,—কিছু মনে করবেন না মিষ্টার গুপ্ত—এখনও আপনি সব জানেন না—আমি বড়ই অসহায়—আমাকে কি এ সময় সাহায্য করে অনুগৃহীত করবেন মিষ্টার গুপ্ত!'

বলিলাম "কেন অত বলছেন—আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন আপনি—যতদূর শক্তিতে কুলোবে,—তার একটুও ত্রুটী করবো না,—আমি সকল কথা না জানি—অনুভব করেছি—আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুর দরকার, আমি তার অযোগ্য হব না,—"

'জানি,—কিন্তু আপনায় এতে জড়াতে ইচ্ছা হয় না—কিছু মনে করবেন না,—বড় বিপদে পড়েই আপনার আশ্রয় নিচ্ছি—এতে আপনার অপকার হবে না—বল্‌তে পারি না; অবশেষে আপনার অপকারের কারণ হব মিষ্টার গুপ্ত!"

'আমার অপকার,—সংসারে আমার কি আছে,—আত্মীয়বান্ধবহীন—পথের ভিখারী আমি,—বেশী কি আর হ'তে পারে আমার,—আজ এ আশ্রয়ে জুটেছি—কাল নয় অন্য দোরে যেতে হবে,—লাভলোকসানের বিচার আমার এইটুকু,—আমার অপকার কেউ

করতে পারবে না, আমার জীবনের কাহিনী জানতেন যদি—এ কথা আপনার মনেও উঠ্‌ত না—আমার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আপনার যদি একটু উপকারে আস্‌তে পারি ধন্য মনে করবো নিজকে।'

তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া—অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"সে আপনার উদারতা মিষ্টার গুপ্ত। কিন্তু এ যে হবে আপনার মনিবেরই বিরুদ্ধে,—বলতে ভয় হয়;—আমার একজন পরম আত্মীয়—এঁদের বিষ নজরে—ওঁর সঙ্গে বুঝি বচসা হয়ে,—কোথায় চলে গেছে, খোঁজ পাচ্ছি না অনেক দিন—যে খেয়াল সে পাছে বা কি করে বসে—তাঁর খোঁজ আপনাকে খুব গোপনে করতে হবে,—কিছুতেই সুস্থির হতে পারছি না—রোগ হতেও তাঁর চিন্তা আমাকে অস্থির করছে—নাম তাঁর অতুলচন্দ্র সেন। আপনাদেরই বয়সী। কি করে তাঁকে বুঝাব,—আমার কাছে তাঁর ফোটো আছে,—তা দেখে কি চিন্‌তে পারবেন না!"

"অতুলচন্দ্র সেন,—গোঁসাইগঞ্জে তাঁকে দেখেছি,—আমি গোঁসাইগঞ্জে ছিলাম—সেইখানেই ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়,—তারপরে না ওঁর কাজ নিয়েছি।"

"তিনিই,—তবে ত জানেনি তাঁকে।"

মনে মনে বলিলাম, জানি সব, কোথায় আর সন্ধান মিলিবে বন্ধুর তোমার!—বলিতে প্রাণটা ফাটিয়া যায়,—প্রাণপাত করিলেও ত পাইবে না তাহাকে।

সিঁড়িতে শব্দ হইল। ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। অভিবাদন করিলাম। তিনি আজ যেন আরও গম্ভীর। অলকার নিকটে উপস্থিত হইয়া—তাঁহার মাথায় হস্ত দিয়া—বলিলেন "আজ কেমন আছ মা? নানা কাজ,—তোমার কাছে একটু বস্‌তেও কি পাই। নিখিল আজ ঢাকা হতে ফিরেছে—হয় ত তোমার এখানে এক্ষুনি আসবে—ও এখানে থাকলে তোমার একটা কথাবার্ত্তা বলবার লোক হবে মা,—বড় একা থাক্‌তে হয়—মিষ্টার গুপ্ত—না থাকলে এ অবস্থায় আরও কত অসুবিধা হতো—তা নিখিল এসেছে—এখন আর আমার ভাব্‌তে হবে না!"

'তিনি বুঝি ঢাকা গেছিলেন—কেন জ্যাঠা মশায়?'

"সে কথা পরে শুনো মা—তুমি আজ ভাল আছ ত.— মন খারাপ করো না মা,—কি সংসারে বিপদ ত সদাই লেগেই আছে—বিপদ আপদে ধৈর্য্য না ধরলে চলে না,—কি অসুখটাতেই ভুগ্‌লে—শরীরের উপর দিয়ে কম ঝড়টা ত বয়ে যায় নি !"

"আমার জন্যে ভাববেন না জ্যাঠা মশায় !"

"ভাবতে কি চাই—ভবনা যে অপনি আসে মা ! তোমরা দুটি বিয়ে আর আমাকে আছে,—তোমাদের দুঃখ আমি যে সইতে পারি নে,—বুড়ো বয়সে আরও না জানি কত কষ্ট লেখা আছে মা—এখন যেতে পারলে বাঁচতেম—হরি !"

"কেন ওসব কথা বল্‌ছেন জ্যাঠা মশায় ।"

"না—কিছু না—তোমাদের অসুখ বিসুখ দেখে মনে হয় !" ডাক্তার আরও দুচারিটি কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন. আমাকে বলিলেন "মিষ্টর গুপ্ত একবার নীচে আসবেন কি ? নিখিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি !"

বৃদ্ধের অনুগমন করিলাম। তিনি সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বলিলেন "কাজটা একরকম ভাল ভালয় ঠিক করে ফেলেছি। প্রচার করবো ছোকরাটা ঢাকায় মারা গেছে, দশ দিন পূর্ব্বে ঢাকা হতে টেলিগ্রাম করিয়েছিলাম, অতুল সাঙ্ঘাতিক পীড়িত। নিখিল ছিল তখন রানাঘাটে, দু'দিন পরে তাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলেম,—অতুলকে দেখ্‌তে—"ঢাকায় বাবুর বাজারে অতুল অত্যন্ত পীড়িত,—রওনা হও এখুনি—চিকিৎসার ত্রুটী না হয়।" সে, টেলিগ্রাম পাইয়াই রওনা হয়ে গিয়েছিল ! বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করেছিলাম—সে মৃত্যু সংবাদই এনেছে ! নিখিল পৌছবার পূর্ব্বেই ডেথ-রেজিষ্টার আফিসে অতুলের মৃত্যু রেজিষ্টারী হয়ে গেছে, যে বাড়ীটার ঠিকানা দিয়েছিলেম সেটা এখন খালি। মৃত্যুর যে তারিখ দেওয়া হয়েছে সে রাত্রে একটা মৃত্যুর অভিনয় দস্তুর মত করা হয়েছিল,—পূর্ব্বেই ডাক্তার ডাকান হয়েছিল—ঔষধপত্রের ত্রুটী হয় নি, প্রতিবেশীরাও তার সাক্ষ্য দিয়েছে। হয়ে গেছে সব বিধি মতে এতেও কি ঠিক হবে না মিষ্টর গুপ্ত ? কলঙ্কের ভয়টা আমি বড় করি—একটা ছোক্‌রার খামখেয়ালীর জন্যে কম হাঙ্গামা পোয়াতে হ'ল না ত,—এখন মেয়েটা মানলে হয়,—তার শরীরের যে অবস্থা কিন্তু না বল্‌লেও ত নয়,—তারিই ভালর জন্যে এ বয়সে আমার এত করতে হচ্ছে,—না করে করি কি মিষ্টার গুপ্ত,—ওর বাপ যে আমার হাতেই ওকে দিয়ে গেছেন।"

সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—"তাই ত !"

ডাক্তার বলিলেন—"এই কথা জানাতে ডেকেছিলেম,—এখন তুমি অলকার কাছে ফিরে যেতে পার,—মেয়েটাকে কথাবার্ত্তার আগে হতেই যদি সংবাদটার জন্যে প্রস্তুত করে রাখ্‌তে পার মন্দ হয় না—না কাজ নেই—মেয়ে বড় বুদ্ধিমতী,—কি হতে কি বুঝে নেবে বা—তবে সাবধান হয়ে থেকো,—নিখিলের মনে ঘোরপ্যাঁচ নেই,—আসল কথাটা ওকেও জানতে দেইনি, ও জানে সত্যিই অতুল ঢাকায় মারা গেছে,—সে কথা কাউকে বল্‌তে মানাও করি নি, কেনই বা কোর্‌ব—যত প্রচার হয় ততই ভাল,—ও চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে এসেছে—ওর কথা সকলেই বিশ্বাস করবে। হয়ত ও কথায় কথায় অলকাকেও বলে ফেলবে,—বলে বলুক না—এক দিন বলতেই হবে যখন তখন জানানই ঠিক,—তবে মেয়েটার শরীর আজও ঠিক হয় নি, কি করা যায় বলো ! এতও সইতে হ'ল আমাকে !

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। উপরে যাইতে আমার সাহস হইতেছিল না। ধীরে ধীরে অতি অনিচ্ছায় অলকার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। আমি ফিরিতেই তিনি বলিলেন "এত শিগ্‌গির নিখিলদা আপনায় ছেড়ে দিলেন ! আলাপের সুরু হ'লে সে ত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়,—কে জানে রাত, কে জানে দিন,—জ্যাঠামশায় ওটার জন্যেই ওর ওপর বিরক্ত, আমার কিন্তু ওর ঐ সরল ব্যবহারের জন্যেই ওকে ভাল লাগে।"

আমি উত্তর করিলাম—'এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি,—অন্য কোন কাজে বুঝি ব্যস্ত আছেন। তাড়াতাড়িই বা এমন কি,—আমার মুনিব—দেখা হবেই,—জানাশোনা ত এক রকম হয়েই আছে !'

'সে ত'। আপনায় আজ অনেক কথা বলে ফেলেছি মিষ্টর গুপ্ত,—কিছু মনে করেন নি বোধ হয় ! অতুলদাকে আপনি চিন্‌তেন,—বন্ধুভাবে জানবার সুযোগ হয় নি বোধ হয়, সে এক আশ্চর্য্য লোক,—দেখা হলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন—কত উদার সে—আমার নিজের ভাইয়ের মত,—এক সঙ্গে আমরা ছোট বেলায় মানুষ হয়েছি,—তার ভালমন্দে আমায় পায় না কি মিষ্টর গুপ্ত ! সত্যিই আমি অতুলদার কষ্ট সইতে পারি নে,—আমার নিজের ভাই নেই—তাকেই ভাই বলে জানি।'

আমার উত্তর নাই। "অত উতলা হবেন না,—এত বড় অসুখের পরে—মনটাকে ভাল রাখ্‌তে চেষ্টা না করলে শরীর ...."

"কি হচ্ছে,—অলকা বড় ভুগেছ নয়? আমায় একটুও কেউ জানান নাই,—হিসেব দেখাই কি আমার বড় কাজ ছিল!"

নিখিল বাবু উপস্থিত হইলেন। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই—আমার দিকে ফিরিয়া হ্যাণ্ডসেক করিলেন,—বলিলেন "বসুন মিষ্টর গুপ্ত—উঠলেন কেন,—খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছেন না? বন্ধু—বন্ধু—আমরা বন্ধু, সেই চোখে দেখে অনুগৃহীত করবেন আশা করি।"

"আজ্ঞে! ভাল আছেন আশা করি।"

"আজ্ঞা—আবার কি! ধন্যবাদ,—এখানে আপনার অসুবিধে হয় নি ত কোন, এ কিন্তু আপনার নিজের বাড়ীঘর।"

"তা আর বল্‌তে হবে কেন?"

"আপনি বলুন ত মিষ্টর গুপ্ত ওর এমন অসুখ—একটা সংবাদ দিতে কি নেই,—আমি বরাবর বলে আস্‌ছি,—ইনেস্‌পেক্‌শন্ টিনেস্‌পেক্‌সন্ আমার কর্ম্ম নয়,—বাঁচালেন, ভাল এখন আপনি ও সব করবেন—ছুটি দিন ছুটি দিন, যত অনপ্লেজেণ্ট টাস্ক! এই ঢাকায় পাঠালেন—ফল্‌টা হ'ল কি,—নিজ চোখে ও সব দেখবার জন্যে আমাকে কি না পাঠালেই হ'ত না—কষ্ট দেওয়া নয় ত কি—মনটা আমার ভেঙ্গে গেছে—তাও যদি গিয়া দেখ্‌তে পেতেম,—আমরা ছুটিছে, তর্ক করি আর রাই করি। ওযে আমার কি ছিল—বাবা বুঝ'ন কি,— আমিই জানি—কি ছিল ও আমার! অতুল—"

অলকা অস্থির হইয়া বলিলেন—"অতুলদার কি নিখিলদা—বল কি হয়েছে তার,—বলছ কি তুমি—"

"ওঃ—তুমি বুঝি শোন নি..কিছু না—কিছু না—অতুল ভাল আছে!"

"কেন আর আমায় ভাঁড়চ্ছ! বুঝছি আমার মন আমার কয়দিন হতেই ডেকে বলছে—বল নিখিলদা অতুলদার আমার কি হয়েছে! ওঃ—হুউ......"

নিখিল অলকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সজ্ঞা লোপ পাইয়াছে—"মিষ্টর গুপ্ত আমি এ কি করলেম—বাবা কেন বল্লেন না—অলকা এর কিছু জানে না।"

নিখিলের অশ্রু বাধা মানিল না। আমার পক্ষেও সে দৃশ্য হইল অসহ্য। অলকার মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিলাম। এ সময় ডাক্তার কোথায়! নীচে বোধহয় বিজিনেছ লইয়া ব্যস্ত! মানুষ কি এত হৃদয়হীন হইতে পারে!

আরও কত দেখিতে হইবে ভগবান! ক্রমশঃ—

শ্রী—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

সুখের দিনের শেষে।

দেহের এরূপ কান্তি সুখের
চোখের জ্যোতি শান্তি বুকের
রেখে দেব রবির কাছে
মলিন হাসি হেসে।
অশ্বমেধের ভুলবো কথা
চারণগণের নূতন গাথা
ছত্র চামর সব ছাড়িয়া
সাজবো নব বেশে
মাগো আমার সুখের দিনের শেষে।

(২)

মায়া নদীর অলীক তরী
রত্ন মাণিক ল'ক মা হরি'
ছুটবো তখন চন্দন বন
কাঠুরিয়ার দেশে,
সুরভি তার দুগ্ধ দিয়ে
রাখবে মোরে রাখবে জিয়ে
সোণার ইঁটের সাধ নাহি মা
ল'ক না তাহা যে সে'
মাগো আমার সুখের দিনের শেষে।

(৩)

নৌকা থেকে মাঝ দরিয়ায়
সদাগর ত ফেলবে আমায়
শুকনো কোনো মালঞ্চেতে
লাগবো গিয়ে ভেসে,
ফুলে বাগান উঠবে ভরে
পাতবো জীবন নূতন' করে
মাল্য দেবে আবার গলে
রাজশ্রী হায় এসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রাজতরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বৃদ্ধ বয়সে রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য পুনঃ প্রপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি যখন পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে চেষ্টিত হইতেছিলেন তৎকালে তাঁহার মন্ত্রীগণ তাঁহাকে আনিকা দুর্গে অবরোধ করেন। মন্ত্রীগণ যুধিষ্ঠিরের অবরোধের ব্যবস্থা করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের জনৈক আত্মীয় প্রতাপাদিত্যকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। কোন কোন লেখক ভ্রম বশতঃ বিশ্বাস করেন যে এই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ও শকদিগের শত্রু। উজ্জয়িনী অন্তর্বিবদ্রোহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হর্ষ ও অন্যান্য নৃপতিকর্ত্তৃক কিয়ৎকালের জন্য শাসিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য বত্রিশ বৎসর রাজ্য সুশাসনের পর লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র জলোক সিংহাসনরুঢ় হন। এই রাজা তাঁহার পিতার ন্যায় সুযশঃ ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল তাঁহার পিতার রাজত্ব কালের ন্যায়ই গরীমাপূর্ণ ছিল। সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র যেন সুপ্রখর দিবাকরোজ্জ্বল দিবাবসানে সুনীল গগনে উদিত হইয়া নিশাকেও দিবসের ন্যায় সুখময় করিয়া তুলিয়াছিল। জলোকার পর তৎপুত্র তানজিন রাজা হন। তিনি তদীয় ম হষির মন্ত্রিত্বে রাজত্ব করিতেন। পূত সলীলা গঙ্গা ও চন্দ্রকলা যেরূপ মহাদেবের জটাজুট সুশোভিত করে এই রাজা ও রাণী তদ্রূপ ধরিত্রীকে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জলদোপরি নানাবর্ণের সামঞ্জস্যে বিচিত্র কোদণ্ডে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকট করেন ইনিও তদ্রূপ রাজ্যের বহুবর্ণ প্রকৃতিবর্গমধ্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রাজ্যের শান্তির বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কটিকা নামক নগরী স্থাপন করেন এবং মহাদেব তুঙ্গেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রৌদ্রতাপদগ্ধ মারব প্রদেশে ইঁহার রাজত্ব কালে বহু বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। মহাকবি চন্দ্রক তাহাদের রাজত্বকালে আবির্ভুত হন। তিনি একপ্রকার নৃত্যের আবিষ্কারক। নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ইহাঁর রাজত্ব কালে ইঁহাদিগর পরীক্ষার জন্যই যেন উপস্থিত হইয়াছিল। শরৎকালে ভাদ্রমাসে তুষারপাত হইয়া শালি ধান্য

এক কালে বিনষ্ট হইয়া মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। প্রজাকুলের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তাহাদিগের স্বাভাবিকবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া লজ্জা তিতিক্ষা হারাইল। প্রত্যেকেই উদর জ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, পিতা পুত্রের্ মমতা ত্যাগ করিল। দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখে অন্ধ হইয়া কেবল আপনার অসহ্য ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য রাক্ষসবৃত্তি গ্রহণ করিল। প্রজাকুল কঙ্কাল সার। কি ভয়ামক দৃশ! খাদ্যের জন্য পরস্পরের মধ্যে কি ভীষণ যুদ্ধ! এক অন্যেকে বধ করিয়া কিরূপে নিজের উদর পূর্ণ করিবে সেই চেষ্টা। এই দুঃসময়ে রাজা ও রাণী আত্মহারা না হইয়া মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাসে বুভুক্ষু প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া খাদ্য প্রদান করিতেন। রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া দূর দেশ হইতে শস্য আনীত হইয়াছিল। শস্যরক্ষার সুবন্দোবস্তে তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিতে পারিত না। ক্ষুধাতুর প্রজা কি গৃহে কি বনে কি রাজবর্ত্মে বা শ্মশানে যে যেখানে অবস্থান করুক না কেন তাহাদের তত্ত্ব লইয়া আহার্য্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা যখন রাজা দেখিলেন, তাঁহার ধান্যাগার শূন্য, তণ্ডুলের আর সংস্থান নাই তিনি তখন অসহনীয় দুঃখে কাতর হইয়া মহারণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজলক্ষ্মি! পূর্ব্বজন্মে না জানি আমরা কি মহাপাপই করিয়াছিলাম তাই আজ প্রাণসম প্রকৃতিবর্গের এই দশা! যাহার নয়ন সমক্ষে এতগুলি জীব অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার জীবনে ধিক্! আমি যখন এতগুলি জীবনকে রক্ষা করিতে পারিলাম না তখন আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল! ধরীত্রি আজ প্রকৃতই দীন, গৌরবহীনা! এতগুলি মনুষ্যের দৈন্য দূর করিতে অসমর্থা। পৃথিবীতে প্রলয়ের আর দেরী নাই। গিরিশঙ্কটগুলি বরফপাতে অবরুদ্ধ, প্রকৃতিকুলের দেশান্তরে গমনের উপায় নাই এখানে রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই তাহাদের যেন নিয়তি। দেখ কিরূপ ভাবে প্রজাকূল বীর, জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধনী, নির্ধন সকলেই সমভাবে মহাদুঃখে নিপতিত। সৌভাগ্যের দিনে যে দেশের চতুর্দ্দিকে মনোরম হাস্যোদ্দামে উদ্ভাষিত ছিল, আজ তাহা কোথায়? সমস্তই শ্রীহীন। প্রজাগণের বিপদুদ্ধারের আর কোন উপায় করিতে যখন আমি অসমর্থ আমার তখন অগ্নি প্রবেশে প্রাণ বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ। প্রজাকুল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে আমি আর তাহা দেখিতে পারি না। যে রাজা প্রজাকুলকে আত্মজের ন্যায়

সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন তাহাদের সুখে সুখী হন, তাঁহারই সুখ রজনী শান্তিতে অতিবাহিত হয়।" এরূপ বলিবার পর কোমল হৃদয় রাজা শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং বস্ত্রে বদন আবৃত করিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল না যেন, অকম্পিত শিখা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। রাণী স্বামীর তদবস্থা দর্শনে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বলিলেন "হে স্বামিন! আপনি কেন প্রজাকুলের দুঃখে এরূপ আত্মহারা হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সহিষ্ণুতাকে বিসর্জ্জন দিতেছেন! দৈব প্রতিকুল হইলে কে তাহাকে নিরোধ করিতে পারে? কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্ফলতাই মহতের পক্ষে অক্ষমতার পরিচায়ক নহে। কার্য্যই মহৎ, রমণীগণ তাহাদের স্বামীকেই ভালবাসিবে, মন্ত্রীগণ বিশ্বস্ত থাকিবেন, রাজা প্রজাপালন করিবেন ইহাই ত কর্ত্তব্য। দুঃসময়েও ইহার পরিহার নিন্দনীয়। হে রাজন্! গাত্রোত্থান করুন। আমি বৃথা বাক্য ব্যয় করি নাই, আপনার প্রকৃতিবর্গের দুর্দ্দশা অচিরে অবসান হইবে।" যখন মহামনা রাণী তাঁহার উক্তি সমাপন করিলেন, তখন কোথা হইতে প্রত্যেক গৃহে মৃত পারাবত পতিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করিল। রাজা তাহা অবলোকন করিয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু জীবনাশে দুঃখিত হইয়া রাজ্ঞীকে এই পারাবত সরবরাহে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষের অবসান হইল। রাণী ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিলেন। ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজার দেহান্ত ঘটিল। রাণী ভর্ত্তৃবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সহমৃতা হইলেন। যে স্থানে তিনি সহমৃতা হন, তথায় পথিকগণের বিশ্রামাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বহু দেশের পরিশ্রান্ত পথিক তথায় বিশ্রাম লাভ করে ও খাদ্যাদি প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। ভগবান পুত্রদানে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন নাই কিন্তু তাঁহারা নিজ কর্ম্মবলে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইক্ষু সুভক্ষ ফল প্রসব করে না কিন্তু উহা নিজেই ফল হইতে মধুরতর। কেহ কেহ বলেন যে রাণী অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন কেননা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—তাঁহার পাপেই দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল।

অপুত্রক রাজদম্পত্তি স্বর্গারোহণ করিলে স্বতন্ত্র রাজবংশসম্ভূত বিজয় কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। বিজয়েশ্বর নামক নগরীর ইনি প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টমবর্ষ রাজত্বের পর ইনি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র আজানুলম্বিত বাহু সুযশাঃ জয়েন্দ্র রাজা হইলেন।

তাঁহার সন্ধিমতী নামক জনৈক মন্ত্রী ছিলেন। সন্ধিমতী শিবের উপাসক; রাজপরিষদবর্গ মন্ত্রীবরের অগাধ বিদ্যার জন্যই ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে রাজবৈরি রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সন্দিগ্ধ রাজা, মন্ত্রীকে তাঁহার সন্নিকটে আসিতে দিতেন না। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। মন্ত্রীবরকে মহা দারিদ্রে ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজ দরবারের কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না; কারণ পারিষদগণ রাজারই প্রতিচ্ছায়স্বরূপ। রাজ রোষ কিম্বা দারিদ্র এই মহামনাঃ মন্ত্রীর অন্তঃকরণে তিলার্দ্ধমাত্রও বিক্ষোভ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। তিনি মহাদেবের আরাধনায় আনন্দে দিবারজনী অতিবাহিত করিতেন। এমন কি, সে শান্তিও উপভোগ করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল না। রাজপারিষদগণ প্রচার করিলেন যে মন্ত্রী সন্ধিমতীর কোষ্ঠীতে রাজ-যোগ লেখা আছে,—তিনি এক দিন কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন। রাজা এই সংবাদে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া সন্ধিমতীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। রাজার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত কারাগারে তাঁহাকে দীর্ঘ দশটী বৎসর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। সন্ধিমতী তাঁহার স্থলে রাজা হইবেন এই চিন্তা তাঁহার মৃত্যুচিন্তা হইতে অধিকতর উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। তিনি মন্ত্রীকে বধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা বলবত্তর। অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহার নির্ব্বাণ সম্ভবপর নয় যদ্যপি বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হয়। সেরূপ স্থলে নিয়তির পুত্তলিকা মানুষ বারিভ্রমে দ্রবীভূত ঘৃতই অগ্নিতে প্রদান করিয়া তাহাকে আরও সতেজ করে। নিষ্ঠুর রাজা রজনীযোগে মন্ত্রীকে নিহত করিবার সঙ্কল্প করিলেন কিন্তু মন্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ তৎপূর্ব্বেই প্রচারিত হইল। রাজাও অচিরে অপুত্রক অবস্থায় কালকবলে পতিত হইলেন। তিনি সপ্তত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করেন।

কিয়ৎ কালের জন্য কাশ্মীরের সিংহাসন শূন্য রহিল। অরাজক রাজ্যে প্রকৃতিবর্গের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সন্ধিমতী লোকান্তরিত হইয়াছিলেন না। প্রকৃতিবর্গ তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমে রাজশক্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হন নাই, পরিশেষে ইষ্টদেবের আদেশক্রমে রাজভার গ্রহণ করিলেন। রাজসম্মানে সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া

তিনি রাজপ্রসাদে নীত হইলেন। লাজ বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রকৃতিবর্গ আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অতি বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে অন্যের মন্ত্রণা গ্রহণের আবশ্যক ছিল না। তিনি অতি সুন্দর ভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে রমণীর প্রভাব নিস্ফল ছিল। তাঁহার রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, তিনি ধূপ ধুনা ও কর্পূরের গন্ধে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং যদিও তিনি রাজকার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতেন তথাপি তাঁহার শিবারাধনায় ও শিব দর্শনে ঔদাস্য ছিল না। তিনি ভুতেশ, বিজয়েশ, ঈশান প্রভৃতি শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা দর্শন করিতেন। হরমন্দির-সোপান-ধৌত বারিস্পৃক্ত বায়ু নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদা আগ্রান্বিত ছিলেন। হরশির সিঞ্চিত বারির ধ্বনি তাহাঁর নিকট বীণাধ্বনি হইতেও সুমধুর মনে হইত। প্রত্যুষে শিব বিগ্রহ স্নাত ও পূজিত হইয়া কি মোহন বেশ ধারণ করেন, তাহার সৌন্দর্য্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। প্রত্যহ সহস্র শিবলিঙ্গ তাঁহার জন্য নির্ম্মিত হইত। কোন কারণে তাহার ব্যত্যয় ঘটিলে তিনি সহস্র শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লিঙ্গরূপে পূজা করিতেন। পূজাশেষে সেই লিঙ্গগুলি নদীবক্ষে বিসর্জ্জিত হইত। জটাজুট সম্পন্ন ভস্মাচ্ছাদিত বহু ঋষি তাঁহার রাজ দরবারে সমাসীন থাকিতেন। তৎকর্ত্তৃক বহু সুবৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ বৃষভ ও ত্রিশূল অতি বৃহদাকার। রাজা পরিশেষে অরণ্যবাসে দেবসেবায় সম্পূর্ণভাবে নিজকে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় শিবপূজায়ই অতিবাহিত হইত। তিনি গ্রীষ্মে শিবমন্দিরপাদধৌত কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া শিব আরাধনা করিতেন। শরতে সরোবরের সন্নিধ্যে অবস্থান করিয়া তিনি একাগ্র চিত্তে শিবধ্যানে নিরত থাকিতেন। মাঘের প্রচণ্ড শীতে উন্মুক্ত স্থানে ঋষিগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রাজ্য শাসনাপেক্ষা শিবারাধনাতে বিশেষ রূপে অনুরক্ত হওয়ায় মন্ত্রীগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া অন্য ব্যক্তিকে রাজপদাভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহারা জানিত পূর্ব্বরাজবংশসম্ভূত অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের জনৈক বংশধর তৎকালেও বর্ত্তমান। গান্ধারাধিপতি গোপাদিত্য কাশ্মীর সিংহাসন অধিকারের আশায় যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন! এই রাজকুমারের মেঘবাহন নামক এক সন্তান বর্ত্তমান ছিলেন। প্রাগজ্যোতিষ রাজকুমারীর স্বয়ম্বর-সভায় তিনি আহূত হন এবং

রাজকুমারীর পাণিগ্রহনের সৌভাগ্যলাভে তিনিই সমর্থ হন। প্রাগ জ্যোতিষাধিপ জামাতাকে এই উপলক্ষে একটি ছত্র যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। কথিত আছে সেই ছত্র নরক রাজ বরুণ দেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ছত্র যাঁহার শিরোপরি শোভা পাইবে তিনিই একচ্ছত্রি রাজা হইবেন। উক্ত ঘটনায় মেঘবাহনের প্রতি লোকদৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। মেঘবাহন তদীয় পত্নী সহ গান্ধারে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কাশ্মীরের মন্ত্রীগণ তাঁহাকে কাশ্মীরের সিংহাসনরূঢ় হইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মন্ত্রী সন্ধিমতী তৎকালে আর্য্যরাজ নাম ধারণ করিয়া কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন। অন্তর্বিদ্রোহে কাশ্মীরের অবস্থা তখন শোচনীয়। সন্ধিমতীর রাজসিংহাসনে একবারেই স্পৃহা ছিল না। তিনি সেই সুযোগে নব ভূপতিকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিয়া নিজকে মুক্ত বিবেচনা করিলেন ও দেবারাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুতেই তাঁহার শান্তির ব্যত্যয় করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজ-বিলাস-ব্যসনের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি যে ইষ্টদেবতাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই ছিল তাঁহার আনন্দ। তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ হয় নাই তাহাই ছিল তাঁহার শান্তি। তিনি বলিয়াছেন, "রাজ্য শাসনে আমাকে, মনঃকষ্ট পাইতে হয় নাই। অদৃষ্টকে দোষী করিতে হয় নাই কখনও ইহাই আমার সৌভাগ্য।" পার্থিব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্তর্জগতে সুমহান্ রাজ্য স্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনি বিনা আপত্তিতে কাশ্মীর-সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। বহু ব্যক্তি তাঁহার সে কার্য্যের প্রতিবাদ করেন কিন্তু তাহাদিগের সকল যুক্তি-তর্ক নিস্ফল হইয়াছিল। রাজ্যশাসনের কি সুখ তাহা তিনি সম্যক্ রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আর বিষয়-লালসা পাশবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। নগ্ন শিরে, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি সন্ন্যাসী বেশে উত্তর দিকে প্রস্থিত হইলেন। মুখে বাক্য নাই, দৃষ্টি ধরণীনিবদ্ধ। অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন করিল। দুই ক্রোশ ভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি একটি ঘন-পল্লব-ছায়া-স্নিগ্ধ বিটপীমূলে উপবেশন করিলেন। এবং রোরুদ্যমান অনুগমনকারীগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। এই প্রকারে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে উপনীত হইলেন ও অবশিষ্ট সঙ্গীগণকে স্বস্বগৃহে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিলেন। ক্রন্দনরত অনুচরগণ তাঁহার

নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি পর্ব্বতারোহণে ঘোর বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বনে গুহা গহ্বরে সন্ন্যাসীগণ নিশিযাপন করিতেন। তিনি স্বহস্তে একটি সরিৎ তীরে পত্র দ্বারা কুটীর রচনা করিয়া পত্রশয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। পত্র তাহার হইল পান ও ভোজনপাত্রের উপাদান—ধরিত্রীবক্ষে তাঁহার শয়ন! রজনীতে পূর্ণচন্দ্র তাহার রজতকিরণ-প্রভায় চিরতুষার কিরীটী পর্ব্বত শিখর প্রতিভাত করিতেছিল, পর্ব্বত পাদদেশে নবতৃণ শ্যামল শোভা বিস্তার করিয়া বিমল শশী কিরণে হাস্য করিতেছিল, সুদূরে গোপবালাগণ মল্লিকাতরু নিম্নে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল, অজচালক রাখালগণের বেণু নিঃসরিত সুমধুরধ্বনি নির্ঝরের কল তানের সহিত মিলিত হইয়া মৃদু বায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছিল, পথক্লান্ত রাজা সেই বৈতালিকগীতে শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। বন্য জন্তুর চীৎকার ও কার্করেতুর কণ্ঠধ্বনি রজনীর অবসান তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, ভগবানের অর্চনার পর নন্দীক্ষেত্রে মহাদেব লিঙ্গ দর্শনাশে সোদর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রাজার সর্ব্বশরীর ভস্মে আচ্ছাদিত, কেশ শিরচূড়ে বদ্ধ, হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, তাঁহার ভক্তজনোচিত মুখভাব দর্শনে ঋষগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সমস্ত দিন সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন।

ইতি কাশ্মীরের প্রধান অমাত্য চম্পক প্রভুপুত্র কহ্লন প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় তরঙ্গ।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

কামিনী গাছের তলায়।*

যেতে ও গাছের তলায়
বুকটা কাঁপে দুরু দুরু;
মানুষের পরশ লেগে
ফুল ঝরে ও'র ঝুরু ঝুরু।

* চিরকুমার সভায় গীত।

থাকুক ও যেমন আছে,
যাব না গাছের কাছে,—
বাতাসে আসুক ভেসে
(মরি ! ও'র) গন্ধটুকুন ভুরু ভুরু !
সুদূরের সুবাস লভি'
থাকিব মোরা ঋণী,
কামিনী ফুলের আদর
করিব চিরদিন-ই ।
শিথিল বৃন্তোপরি
ফুটে থাক্ স্বপ্ন-পরী,—
দিলে যে সোহাগ-হাওয়া
(মরি ! ওর) ফুল করে সব উড়ূ উড়ু !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

রক্তাম্বরা *

—ঃ০ঃ—

মুখবন্ধ ।

আমার জীবন এত রহস্যময় যে আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট আমার জীবন-কাহিনী বলিতে পারি নাই। আমার জীবনের সহিত এক ব্যক্তি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে আজও আমাকে নীরব থাকিতে হইত। এতদিন আমার রচনাশক্তি

* ইংরাজী উপন্যাস অবলম্বনে।

ঔষধের প্রেস্ক্রপসন ও মাসিক পত্রিকায় দু'একটি ঔষধবিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু অক্ষমতা স্বত্ত্বেও আজ শুধু আমার প্রাণসমা প্রিয়তমার অনুরোধে এ জীবন কাহিনী সম্পূর্ণ সরলভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ডাক্তারের জীবনের ছোট বড় সব ঘটনাই তাঁহার রোগীদের চক্ষে একটু বড় হইয়া দেখা দেয় সেই জন্য আমি আমার আসল নামটি গোপন করিব। অবশিষ্ট কথ সরলভাবে সরলভাষায় পাঠকের নিকট স্বীকার করিব। কলিকাতা সহরের কলেজ ষ্ট্রীটের উপর আমার ডাক্তারখানা। দক্ষিণাও বেশ ভারী রকমের। বড় বড় জমিদার ঘরের আমি বাঁধা ডক্তার। খেতাবও মস্ত বড় কারণ আমি বিলেতের পাশকরা ডাক্তার। আমার নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ কর। আমি স্নায়ুর দুর্ব্বলতাজনিত সকল প্রকার রোগের স্পেশালিষ্ট! বড় বড় পরিবারে চলাফেরা করার দরুণ আমাকে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে হয়। কিন্তু এখন আপনারা আমাকে সাধারণের ন্যায় সহজভাবেই গ্রহণ করিবেন।

সহরের কর্ম্মকোলাহলের ভিতর এমন ঘটনা অনেক সময়ই ঘটে যাহা কাগজে কলমে লিখিলে লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত; এই প্রকাণ্ড সহরের জনতা এবং বিলাস-বৈচিত্রের ভিতরে শতসহস্র লোকের মাঝখানেও নিজকে একলা মনে হয়, ধনীর বিলাসিতা ও অপব্যয়ের পাশে দরিদ্রের ক্ষুধাতুর মূর্ত্তি নিত্যই চোথে পড়ে। ভয় হয় পাছে আপনাদের প্রত্যয় না হয় আমার কথা কিন্তু এমন সব ঘটনা নিত্যই ঘটে যাহা আমার বর্ণিত ঘটনার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। শুধু দুই চারি ঘণ্টা পুলিশকোর্টে বসিয়া থাকিলেই এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। সংসারে মহতের পাশে বসিয়া নীচ, সাধুর পাশে বসিয়া জালিয়াত, জুয়াচোর নিজ নিজ স্বার্থসাধনে ব্যস্ত সুতরাং সাবধান না হইলে বিপদে পড়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়।

লোকচরিত ।

আমার অতি বড় শত্রুও কল্পনা প্রিয়তার দোষ আমাকে দিতে পারে না। ছাত্রজীবনে যতটুকু কবিত্ব মাথায় থাকে এক বৎসর চাকরী করিলেই তাহা দূর হইয়া যায়। যাহারা ডাক্তারী পড়ে তাহাদের মন স্বভাবতঃই কঠিন হইয়া যায় আর পাশ করিয়া বাহির হইতে না

হইতেই তাহাদের ভিতরের সমস্ত ভাবুকতা শুখাইয়া যায় সে জন্য বেশীর ভাগ ডাক্তারই অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক। তখন সবে এক বৎসর পূর্ব্বে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। সে বেশীদিনে কথা নয় কারণ আমার বয়স এখনো চল্লিশ পার হয় নাই সকলে বলে আমি খুব কম বয়সেই পশার জমাইতে পারিয়াছি। সত্যিই খুব শীঘ্রই আমার উন্নতি হইয়াছে।

আমি বড় বড় নামজাদা অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাশ করিবার পর বুঝিলাম যে ডাক্তারি ব্যবসায়ে পশার জমানই মুস্কিল। পাশ করিবার পর আমি প্রথমে পঞ্জাবে একজন বড় ডাক্তারের সহকারী পদে নিযুক্ত হই। তাঁহার খাটুনী খুব ছিল কিন্তু আয় অতি অল্পই। কারণ বেশীর ভাগ দরিদ্রপল্লীতেই তাঁহার ডাক পড়িত। এই সকল দরিদ্র পরিবারে বড়ি ও মিকশ্চার বিতরণ আমার ভাগ্যে পড়িল।

অধ্যক্ষ ডাক্তারখানার উপরের ঘরে বসিয়া রাত দিন মদ্যপান করিতেন আর নিজের স্ত্রী ও রোগীদের উপর যার পর নাই মন্দ ব্যবহার করিতেন। দরিদ্র নিঃসম্বল রোগীদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বসন ভূষণ যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন ঔষদের দাম বলিয়া উঠাইয়া আনিতেন।

আমি একবৎসর রোদবৃষ্টি মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কারণ বেশীর ভাগ কাজ আমাকেই দেখিতে হইত। আঠার মাস সেখানে থাকিবার পর একদিন বড় বিপদে পড়িলাম। একটি লোক গুরুতর রূপে আহত হওয়ায় আমার অধ্যক্ষ তাহাকে দেখিতে গেলেন। সে সময়ে তিনি নেশার ঝোঁকে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কি কি করিতে হইবে উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে রোগীর নিকট পাঠাইলেন। আমি তাঁহার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিলাম কিন্তু ফলে রোগীর মৃত্যু হইল। তখন নালিশের আয়োজন হইল, আর আমার অধ্যক্ষ সমস্ত দোষ আমার স্কন্ধে চাপাইয়া নিজের গৌরব বজায় রাখিলেন। বিচারক তাঁহার মদ্যপানের কথা জানিতেন না আমি দেখিলাম যে অস্বীকার বা বাধা দেওয়া বৃথা সুতরাং সেইদিনই পদত্যাগ করিয়া রাগে দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম।

তারপর দমদমায় একজন ডাক্তারের অধীনে কাজ নেই কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব দেখিয়া কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই। তারপর বাঁকিপুর মজঃফরপুর সোনপুর অনেক স্থানে অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়া ফিরিলাম। এইরূপে চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিন্তু আয় অধিক না হওয়ায় কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই। ঠাট সব সময়ে বজায় রাখিতে হইত সুতরাং সঞ্চয় করিবার সুবিধা হয় নাই; ফলে একদিন ১৫ টি টাকা পকেটে লইয়া আমায় আবার কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে হইল। আমি অনেকবার সেই স্মরণীয় দিনটার ঘটনাগুলি মনে মনে আলোচনা করি। তখন পৃথিবী যেন আর একরকম ছিল। তখন একটি টাকা দর্শনী পাইলেই কৃতার্থ বোধ করিতাম। আর এখন পাঁচশত টাকা আমার দৈনিক আয়। তখন গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় মাস। সেদিন ভীষণ গরম। প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। কিন্তু তখোনো অন্ধকার হয় নাই। আমি গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। বেজায় গুমট বাঁধিয়াছিল। ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ। আমি আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের অনেকের খোঁজ লইয়াছিলাম কিন্তু তাহারা কেহই সে সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না। সে সময় বড়লোকেরা হয় পাহাড়ে নয় সমুদ্র ধারে। কিন্তু তবু জনতার বিরাম ছিল না আমি নিতান্ত অবসন্নচিত্তে ঘুরিতেছিলাম, আমার ন্যায় অর্থহীন অসহায়কে কেহই সাহায্য করিবে না জানিতাম। আমি তখন আমার অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম। বাঁকিপুরের এক নিভৃত কুটীরে আমার মা তাঁর প্রিয় পুত্রের মুখ চাহিয়া কত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন। আমাকে উচ্চশিক্ষা দিতে তাঁহাকে দারিদ্রদুঃখ বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তিনি মনে করিতেন ডাক্তার হইলেই পশার জমিবে। আমিও জননীর মুখ স্মরণ করিয়া দিবানিশি খাটিয়াছি কিন্তু কোন উপায় করিতে পারি নাই, সেদিন আমার আহার হয় নাই। শেষ টাকা কয়টা খরচ করিতে আমার মন সরে নাই কিন্তু ক্ষুধার তাড়নে শেষে একটি দোকান হইতে সস্তা কিছু কিনিবার অভিপ্রায়ে দাঁড়াইয়াছি। পরিচিতস্বরে কে আমার পশ্চাত হইতে বলিল "দ্বিজেন নাকি? কি খবর? তুমি কি ঘাট থেকে উঠে আস্‌ছ নাকি?"

ফিরিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। আমি সহর্ষে বলিলাম "এই যে বিনোদ যে।" আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম।

"তাই ত মনে হচ্ছে, নয়? অন্ততঃ বিনোদের ছায়া ত বটে। করাচি গিয়ে ভয়ানক জ্বর হয় তাইতে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে গেছি।" বলিয়া সে উচ্চ হাস্য করিল।

বিনোদ রায় বরাবরই হাস্য কৌতুকপ্রিয়। ছাত্রাবস্থায় সে ঠাট্টা তামাসা করিয়া আমাদের সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আমি বলিলাম "মাংস আবার জমিয়েছও ত বেশ। কি খেয়ে পারলে? কড্‌লিভার অয়েল?"

"না। একটু করে ব্রাণ্ডি আর বরফ। এসো এই মোড়ের হোটেলে কিছু খাবে, চল, তোমাকে জাগিয়ে তোলা দরকার হয়েছে।"

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সঙ্গে চলিলাম। বিনোদকে দেখিলে একটি বাড়ন্ত গড়নের বালক বলিয়া বোধ হয়। সে একটু বেঁটে, তার মাথার চুলগুলি ভারী নরম ও কোঁকড়া, চোখ দুটি উজ্জ্বল কৃষ্ণ,--গঠন অতি বলিষ্ঠ। পরণে উৎকৃষ্ট শান্তিপুরে ধুতি, চুড়িদার-হাতের সিল্কের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর ও রূপো বাঁধান ছড়ি তার সখের পরিচয় দিতেছে। এই বেশ সত্ত্বেও তার পকেটে একটি ষ্টেথোস্কোপ ফেলা ছিল। বুঝিলাম সেও চিকিৎসা ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়াছে।

আহার করিতে করিতে আমরা পরস্পরকে পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা এক সঙ্গেই পাশ করিয়া বাহির হই। কিন্তু তার পরে আর দেখাশোনা হয় নাই। সে আমার হতাশাপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিল, তারপর নিজের কথা বলিতে লাগিল। সে করাচীতে গিয়া জ্বর লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল, সুস্থ হইয়া এখন এখানেই ডাক্তারী করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি রকম চ'ল্‌ছে?"

"হ্যারিসন রোডে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলেছি।"

"পশার বেশ জম্‌ল?"

"সে সৌভাগ্য এখনো হয় নি। লোকের কাছে পুলিশ stationএর নীল আলো আর আমার বাড়ীর সামনের নীল আলো দুইই সমান। কোন এপিডেমিক হ'লে তবে আমাদের মত লোকেরও ডাক পড়ে কিন্তু তাত নেই কেবল বাত, অজীর্ণ, মাথাব্যথা ছাড়া আর ত

রোগ নেই। তোমার আপাততঃ কোন কাজ না থাকে তুমি আমার বাসায় চল না, দু'একদিন থাকবে? আমি একলা থাকি, একজন সঙ্গী পেলে ভারি স্ফুর্ত্তি হবে। তারপর কাজ পেলে চলে যেয়ো। কোথায় এসে নেমেছ?"

আমি আমার বাসার ঠিকানা বলিলাম। "চল, তা'হলে একটা গাড়ী করে তোমার বাসায় গিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার বাসাতেই আস্তানা ফেলা যাক্, বাড়ী ফিরে সকালে একটু মাংস আনিয়ে ছিলাম। মাংসর ঝোলের সদ্ব্যবহার করা যাবে।"

"মুখরোচক বটে।"

আর একটু সাধাসাধির পর আমি অগত্যা তাহার আতিথ্য স্বীকারে বাধ্য হইলাম। বিনোদের বাড়ীখানি তার কোন্ আত্মীয়ের নিজের বাড়ী। ভারি চমৎকার বাড়ীখানি। সামনে একটু ঘাসের জমি, কয়েকটি ফুলের গাছ। ভেতরেও আস্‌বাব পত্রের অভাব ছিল না। কারণ কেবল ডাক্তরী করিয়া বিনোদকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইত না। তাহার পিতা ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বসিবার ঘরের পাশে খাবার ঘর, তাহার পরের ঘরখানিতে একটি চেয়ার, টেবিল, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ডাক্তারি বইএ ভরা দুটি আলমারি ও একটি রোগীদের ব্যবহারের জন্য খাট রাখিয়া সেটীকে ডাক্তারখানারূপে ব্যবহার করা হইত। বিনোদ ছেলে খুব ভাল। আমি তার কাছে বড় আনন্দে ছিলাম। বুড়ী রামীর মা আমাকে খুব যত্ন করিত, আর বিনোদ তার রসিকতায় সব সময়েই আমাকে সরস রাখিত। রোগীর সংখ্যা নিতান্তই কম। একদিন বিনোদ বলিল "জান ভাই আমি সেই হ্যারিসন রোডের গল্পের ডাক্তারের মত,—তাকে নেহাৎ দায়ে না প'ড়লে কেউ ডাকৃত না।"

এক সপ্তাহের বেশী বিনোদের আতিথ্য গ্রহণে আমার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিনোদকে সে-কথা বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সুতরাং আমি চাকরী পাইবার আশায় বসিয়া রহিলাম। যাহা হউক আমি তিন সপ্তাহ তাহার নিকট থাকিয়া তাহার ডাক্তারির সাহায্য করিতাম। বিনোদ বেচারী কোনদিনই রোগ ভাল বুঝিত না। তাই সে আমাকে জিজ্ঞসা করিয়া লইত। তার সব রোগীরই সম্বন্ধে এক নিয়ম ছিল। সে নাড়ী টিপিত আর জিহ্বা পরীক্ষা করিত। রোগী চলিয়া গেলে বলিত "টাকার জন্য সব কোরতে হয়, ওরা জিব্ দেখানো ভারি পছন্দ করে।"

একদিন বৈকালে বিনোদের ডাক্তারখানার উপরের ছোট ঘরখানিতে বসিয়া আমরা দু'জনে গল্পগুজব করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ বিনোদ বলিল "দ্বিজেন আমার বোল্‌তে লজ্জা হচ্ছে, আমার ওপর একটু অনুগ্রহ কোরবে?"

"অনুগ্রহ আবার কি—ভাই কেন কোরবো না?"

"তোমার ঘাড়ে যদি খুব দায়িত্ব চাপাই?"

"কি দায়িত্ব?"

"ভয়ানক। আমার এই প্রকাণ্ড (!) কারবারের হাল ধরে রাখতে হবে। আমি অনেকদিন বাড়ী যাইনি একবার বাড়ীটা চট করে ঘুরে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"বেশ ত আমি আনন্দের সঙ্গে কারবারের ভার নিতে রাজি আছি।"

"অশেষ ধন্যবাদ। তুমি ভাই কল্পতরু। আমি একহপ্তার মধ্যেই ফিরে আস্‌ব, তোমার কোন ভাবনা নেই। মোটে চার পাঁচ জন রোগী বৈত নয়! ছোট দুটি মেয়ের জ্বর, এক বৃদ্ধা শয্যাগত আর এক ভদ্রলোক তাঁর গেঁটে-বাত ব্যথা,—লেগেই আছে। এঁদেরই একটু খোজ খবর নিতে হবে।"

বিনোদের কথায় আমার হাসি পাইল। বিনোদ এত অমনোযোগী যে লোকটির রোগ ধরিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। সে আবার বলিল "দর্শনীর অনেক টাকা! তা তুমিই নিয়ো, তিন-তিনটাকা, তা তোমার তামাকের খরচটা চোল্‌বে।"

পরদিন হইতে আমি বিনোদের যায়গায় কাজ করিতে লাগিলাম। বিনোদ সেই দিনই বেনারস যাত্রা করিল আর আমি কাজে মনোযোগ দিলাম। প্রথম দুদিন বেশ গেল। আমি সেই মেয়ে দুইটিকে, বৃদ্ধাকে ও গেটের ব্যথায় শয্যাগত লোকটিকে দেখিলাম। শোথের রোগীকে বাঁচান শক্ত। তাঁর যে রোগ তার আমাদের শাস্ত্রে কোন ব্যবস্থাই নাই। সকলকে দেখা শেষ করিয়া আমি বিনোদের ছোট ঘরটিতে বসিয়া ধূমপান করিয়া কাটাইতাম। তৃতীয় দিন সকালে প্রায় বেলা দশ টার সময় আমি বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। রাস্তায় গাড়ী আসিবার শব্দে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানার চাকরদের ডাকিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতে শুনিলাম। আমি চমকিয়া উঠিলাম কারণ ওই ঘণ্টা বাজা মানেই আমার তিনটি টাকা লাভের সম্ভাবনা। একটি প্রৌঢ় ধরণের কালরংএর

কাপড়পরা স্ত্রীলোক, বোধহয় কোন বড়লোকের বাড়ীর চাকরাণী হইবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনিই কি ডাক্তার বাবু?" আমি বলিলাম 'হাঁ' "এখুনি আপনাকে আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে। আমার মনিবের অবস্থা বড় খারাপ দাঁড়িয়েছে।" "তাঁর কি অসুখ?" স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল "আমি নামটাম জানি না বাবু, তবে আপনি গেলেই টের পাবেন।"

"আচ্ছা আস্‌ছি" বলিয়া আমি উপরে আসিয়া পোষাক পরিলাম, যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইলাম তারপর তার সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

রাস্তায় আমি রোগের কি কি লক্ষণ তাহা জানিবার জন্য অনেক প্রশ্ন করিলাম কিন্তু তার কথাবর্ত্তায় বুঝিলাম যে নয় সে ভয়ানক বোকা অথবা কোন কথা বলিতে তার বারণ আছে, অবশেষে গাড়ী একটি ধূসর রংএর অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ীখানি ফুল গাছ ও লতাপাতা দিয়া খুব সুন্দররূপে সাজান। আমরা যাইতেই দ্বারবান সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; আমাকে তার প্রভুর পড়িবার ঘরে বসাইয়া মনিবকে খবর দিতে গেল।

দৈব।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড। আলমারিতে মহামূল্য বই সব সাজান দেখিয়া মনে হয় গৃহস্বামী পণ্ডিত লোক। লিখিবার টেবিলের উপর একটি পড়িবার জন্য বৈদ্যুতিক আলো আর রূপোর ফ্রেমে বাঁধন কোন সুন্দরী মহিলার প্রতিকৃতি। টেবিলের পাশে একটি ব্র্যাকেটে চিঠির কাগজ স্তরে স্তরে সাজান, তাহার শিরোদেশে কোন রাজপরিবারের মুকুট আঁকা।

কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন, তিনি আকারে ক্ষুদ্রকায়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে। তাঁহাকে দেখিলে কিছু স্বাভিমানী ও তেজস্বী বলিয়া ধারণা জন্মে। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, আকার প্রকারে উচ্চবংশজাত বলিয়া মনে হয়। তিনি অত্যন্ত মিহি গলায় বলিলেন "নমস্কার ডাক্তার, আপনার দেখা পাওয়া গেছে যে এই ঢের।"

আমি উত্তর দিলাম "আমিও সম্মানিত কম হই নাই।"

তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বসিতে বলিয়া নিজে টেবিলের অপর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। জানিনা ইচ্ছা করিয়াই হউক বা ঘটনাক্রমেই হউক আমার মুখটি আলোয় ও তাঁহার মুখটি

অন্ধকারে পড়িল। তাঁহার এই বসিবার ভঙ্গীর কোথায় যেন একটু কিছু গোপন করিবার ভাব ছিল আমি ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই। তাঁর মোমের মত সাদা রক্তলেশ হীন মুখখানি টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি বলিলেন "আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছি, ঔষধের ব্যবস্থায় আমার তত দরকার নেই।"

"রোগীকে আগে দেখে তারপর গল্প করলে ভাল হোত না?"

"না, না! প্রথমে আমাদের দু'জনের দু'জনকে বোঝা দরকার।" আমি তাঁর মুখের দিকে চাহিলাম। কোন ভাবই দেখিতে পাইলাম না কারণ তাঁর মুখে ছায়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক লোকটি কে জানিবার জন্য আমার ভারী কৌতূহল হইল।

"তা হ'লে অসুখ বেশী কিছু নয়?"

"বাঁচানো শক্ত" তারপর মিষ্ট স্বরে বলিলেন "তুমি কি মনে কোরবে জানি না ডাক্তার কিন্তু আমার একটা অদ্ভুত মত আছে সেটা এই যে উকীল ডাক্তারে যেমন দর্শনী পেলে তবে কাজ করে তেমনি এ পৃথিবীতে প্রত্যেক লোকই ইচ্ছা করলে দর্শনী আদায় করে তবে কাজ করতে পারে।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বোল্‌লেন? আপনার কথা আমি ধরতে পারলাম না!"

"আমি বোলছি যে পৃথিবীতে টাকা দিলে যে কোন লোককে দিয়ে যে কোন কাজ করান যায়।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "অনেকের পক্ষে এ কথাটা থাট্‌তে পারে কিন্তু আবার অনেকের পক্ষে খাটেও না।"

তিনি যেন একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "আপনার পক্ষে খাটে?"

আমি এ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম এমন সময় ভদ্রলোক আবার বলিলেন "আমি তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করি যে তুমি কি এতই বড়লোক যে তোমার টাকার দরকার হয় না?"

আমি সরলভাবে বলিলাম "একেবারেই বড়লোক নই।"

"তা হ'লে টাকা পেলে যে কোন কাজ কোরতে রাজি আছ?"

আমি বড় বিরক্তি বোধ করিলাম, বলিলাম "আমি কি তা বোলেছি!" কয়েক মিনিট তিনি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পাঁচটি সংখ্যায় লেখা যায় এ রকম এক তোড়া টাকা নিতে চাও?" আমি বিমূঢ়ের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করিলাম "পাঁচটি সংখ্যায় লেখা যায় এত টাকা? কিসের জন্য?" সেই মুহূর্ত্তে আমার সন্দেহ হইল এই লোকটি ঔষধের সাহায্যে কাহারও প্রাণনাশ করিতে চায়, সে চিন্তা আমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

"তোমার কাছ থেকে যে কাজ চাই তা বেশী শক্ত নয় করা। তুমি অল্প বয়সী যুবক, অবিবাহিত, তোমার ব্যবসায়েও তোমার যথেষ্ট উৎসাহ আছে, এক্ষুণি যদি কুড়ি হাজার টাকা পাও ত সেটা নিশ্চয়ই তোমার খুব কাজে আস্‌বে।

"স্বীকার করি আমার টাকার দরকার। অত টাকা পেলে চিরজীবনের মত অন্নচিন্তা থেকে রেহাই পাব।" বলিয়া তিনি কি কাজ আমায় করিতে বলেন জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি কৌশলে আমার প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গেলেন।

"আমার যা কাজ চাই তা তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌বে কিন্তু ইতস্ততঃ কোরলে চলবে না কাজটি আজই শেষ কোরতে হবে।"

"তা হলে এর সঙ্গে জীবনমরণের সম্বন্ধ আছে?"

"মরণের আছে, জীবনের নয়।"

আমি নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কারণ তিনি আবার তাড়াতাড়ি বলিলেন।

"আর বেশি কিছু বল্‌বার আগে ডাক্তার, আমি তোমাকে জানাতে চাই যে আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কেহ যেন জান্‌তে না পারে।"

"আপনি যা চান তাই হবে।"

ঘরের বায়ুতে যেন আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আমার মাথা ঘুরিতেছিল, আমি এই প্রলুব্ধকারীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলাম। তিনি আবার বলিলেন—"বেশ তা হলে আরও এগুতে অনুমতি কোরচ্ছ? এখুনি

আমি বোল্‌লাম যে তুমি অবিবাহিত, তুমি ত না বোল্‌লে না, তার মানে তোমার এখনো বিয়ে হয় নি কেমন ?”

“না, বিয়ে কোরতে ইচ্ছে নেই।”

“যদি কাল সন্ধ্যার আগেই তোমার স্ত্রী মারা যায় তবু নয় ?”

“সন্ধ্যার আগেই মারা যাবে ? আপনার কথা বড় রহস্যপূর্ণ। খুলে বোল্‌লে বুঝতে পারি।”

“আমার কথার মানে এই যে আমার মেয়ে কঠিন রোগে শয্যাগত, মরণ তার অবশ্যম্ভাবী। দুজন ডাক্তর ক'মাস ধ'রে তার চিকিৎসা কোরলেন কিন্তু তার রোগ সারবার নয়। অসুখ হবার আগে একটী ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য সে পাগল হয়। সে ছেলেটির গুণ বোলতে কিছুই নেই, মানুষের যা কিছু খারাপ সবই তার ভেতর পাওয়া যেতে পারে তবু আমার মেয়ে তাকে প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসে। অসুখের বিকারের মধ্যে সে তার নাম ধরে ডেকেছে। সেই তার ধ্যান জ্ঞান। এখন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার অনুতাপ হচ্ছে আমি কেন ওদের বিয়ে দিই নি। শেষ কথা এই যে আমি চাই আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে কর।”

“আপনার মেয়েকে বিয়ে কোরব ?”

“হাঁ, তার মাথার ঠিক নেই সে তোমাকে তার প্রণয়ী বলেই মনে কোরবে আর তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সুখের হবে।”

আমি উত্তর দিলাম না, আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

“আমি জানি আমার এ অদ্ভুত প্রস্তাব কিন্তু আমি পাগলের মত হয়ে এই ফন্দি এঁটেছি। আমি যদি কোনমতে ওর শেষ সময়ে সুখ দিতে পারি, প্রাণ দিয়ে তা কোরব। ভগবান জানেন অনুতাপ রাখ্‌বার আমার স্থান নেই” তাঁহার মুখ গভীর নৈরাশ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল।

“কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু সাহায্য কোরতে অক্ষম।”

“সাহায্য কোরতে তুমি এসময়ে বিমুখ হবে ? আমার অভাগিনী কন্যার শেষ মুহূর্ত্তে এতটুকু সুখ দিতে পারবে না ?”

“আমি জাল জুয়াচুরির ভেতর থাক্‌তে চাই না।”

“ওঃ ! টাকা বুঝি মনের মত হয় নি ! আচ্ছা চল্লিশ হাজার দেব।”

“আর একি সত্যি বিয়ে ! না ছেলে খেলা হবে ? নকল বিয়ে ?”

“নকল বিয়ে ? না না বিয়ে রীতিমত রেজেষ্ট্রী করে হবে।”

“কেন নকল বিয়ে হলেও ত হোত।”

“তা আমার মতে,—বিয়ে জিনিষটা সব অবস্থায়ই সত্যি হওয়া উচিত।”

“কেন ?”

“সে বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।”

“কিন্তু সত্যিকার। বিয়েতে অনেক আয়োজন কোরতে হয়।”

“আমি সে সব কোরব। কোন ত্রুটী হবে না। তোমার কিছুই কোরতে হবে না। কারণ আমি চাই বেলার বিয়ে সত্যি সত্যিই হবে আর তাকে বিয়ে করে তুমি আমার যে উপকার কোরবে তার মূল্যস্বরূপ বিয়ের পরই তোমায় চল্লিশ হাজার টাকা দেবো।”

তারপর দেরাজ হইতে একতারা নোট হাতে লইয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন “আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে এই টাকার তোড়া তোমার”। আমি টাকার তোড়ার দিকে চাহিলাম তারপর সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিলাম যাহা দেখিলাম তাহাতে চমকিয়া উঠিলাম। লোকটি মানুষ না শয়তান ? আমার মুখের ভাবে মনের কথা বুঝিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন।

“ভয় পাচ্ছ কেন ? আমার মেয়েকে ঠকিয়ে তার মৃত্যুর শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত সুখের কোরতে চাই তাতে দোষ কি ? এস এস এ উপকার তোমায় কোরতেই হবে” বলিয়া তিনি টাকার তোড়ার প্রতি সঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পাঠক, আপনাকে আমার স্থানে রাখিয়া ভাবিয়া দেখুন। আমি অর্থলোভী নই কিন্তু কত বৎসর পরিশ্রম করিয়া হয় ত বৃদ্ধ বয়সে কষ্টসঞ্চিত চল্লিশ হাজার টাকা পাইব কিনা কে জানে ? হয় ত, না খাইয়া মরিতে হইবে। আর এ হাতের কাছে লক্ষ্মী স্বয়ং, কাজও কিছু বেশী শক্ত নয় মেয়েটী মুমূর্ষু, কয়েক ঘণ্টা পরে আমি আবার যে রকম ছিলাম সেই রকমই হইবে। এ বিবাহের কথা চিরদিন গোপন থাকিবে। টাকার লোভে আমি জ্ঞান হারাইলাম। ভিতরের কথা আমি তখন জানিতাম না জানিলে টাকার তোড়া অগ্নির মুখে

নিক্ষেপ করিতাম। টাকা আমাকে রাজী করাইল। হায় অর্থ! তুমিই অনর্থের মূল।

আমার প্রলুব্ধকারীর মুখে তখন হাসি দেখা দিল। টাকার তোড়া দেরাজে রাখিয়া বলিলেন "সময় বেশী নেই প্রস্তুত হবে চল।"

আমার বক্ষের স্পন্দন-শব্দ বাহির হইতে শোনা যাইতেছিল। আমি নিজেকে কোন্ অজানা বালিকার কাছে বলি দিতে চলিলাম। লোকটির পিছনে পিছনে দ্বিতলে গেলাম। একবার ভাবী পত্নীর মুখখানি দেখিব আশা ছিল। আমরা উপরে যাইতেই ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সব তৈরী দিননাথ?"

"সব। বাড়ীর বাইরে বর ও পুরোহিতকে ফিরে পৌঁছে দেবার গাড়ী পর্য্যন্ত।"

তখন আমাকে বলিলেন "একটা কথা বলে রাখি কোন কিছুতে অধীর হোয়ে না। ক্রমে সব পরিস্কার হয়ে যাবে।"

তিনি পকেট হইতে দুছড়া ফুলের মালা বাহির করিলেন; তারপর আলমারির হইতে বরকন্যার বিবাহের পোষাক বাহির করিয়া আমাকে শীঘ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা হইলে আমাকে সভাস্থলে লইয়া গেলেন। কিছু পরে এক অবগুণ্ঠনবতী বালিকাকে লইয়া এক সুন্দরদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। এই আমার পত্নী! অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া দৃষ্টি চলিল না। কিছু পরে পুরোহিত আসিলেন।

তখন কন্যার পিতা কন্যার দিকে ঝুঁকিয়া আদর করিয়া বলিলেন "মা বেলা তুমি যাকে চাও আজ তারই হাতে তোমায় সম্প্রদান কোরব, শুনছ?"

তাহার ছোট হাতখানি আমার হাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আমি মন্ত্র পড়িলাম। মাল্য বদল হইল। ফুলের গন্ধ ও ফুলের চেয়েও কোমল তার স্পর্শ আমাকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিল বিবাহের সময় নাম শুনিলাম "বেলাবাসিনী আদিত্য।" বিবাহের পর আমি তাহাকে আমার অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিলাম। তারপর যে স্ত্রীলোকটি আমায় ডাকিয়া আনিয়া ছিল সে আমার স্ত্রীকে উপরে লইয়া গেল। আমি, সেই সুন্দরদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ও আরও দু'চারি জন অপরিচিত ব্যক্তি আহার করিতে বসিলাম। আহারান্তে আমার শ্বশুর আবার আমাকে তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন "এ অবধি ত সব ঠিক হয়ে গেল কিন্তু আর একটু কাজ এখোনো বাঁকি আছে। সেটুকু হোলেই টাকা পাবে।"

"কি কাজ আবার?"

"তোমার স্ত্রীকে কাল সন্ধ্যার আগে মরতে—তাকে মরতেই হবে। বুঝলে?"

"আপনি তা হলে নিজের মেয়েকে মারবার জন্য ঘুষ দিচ্ছেন?"

"আগেই বলেছি প্রতিবাদ করতে পাবে না। আমি যা বল্লাম তার কিছুতেই অন্যথা হবে না। ও মরলেই সব টাকা তোমার।"

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

নারীর কথা।

—:o:—

১ম প্রসঙ্গ,—নারী ও মাতৃত্ব।

আজকাল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক কাগজে নারীর সম্বন্ধে যত ভাবের যত রকমের আলোচনা চলিয়াছে তাহাতে ভয় হয় যে এ বিষয়ে কোন কথা লিখিতে গেলেই কাহারও না কাহারও বিরক্তিভাজন হইতে হইবে এবং তজ্জন্য বেশ শক্ত দু'কথা শুনিলেও শুনিতে হইতে পারে। আলোচনার একটা মাত্রা আছে, সেই মাত্রা অতিক্রম করিলেই উহা দলাদলির সৃষ্টি করে—আর যথনই দলাদলির সৃষ্টি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে—তখন হইতেই আমাদের স্থিরজ্ঞান প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হয় এবং দলাদলির উত্তাপে এমন সব কথা প্রকাশিত হয় যাহার ভিত্তি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যাহার মূলে থাকে শুধু একটা তর্ক ফাঁদিবার ও চালাইবার নেশা। সৌভাগ্যের বিষয় যে নারীর সম্বন্ধে আজকাল আমাদের আলোচনার চূড়ান্ত হইতেছে এবং দুর্ভাগ্যেরও কথা যে ইহাতে দেশে দলাদলিরও সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের আলোচনা কল্যাণের সংযত সরল পথ ত্যাগ করিয়া অকল্যাণের পথকে আশ্রয় করিয়াছে।

উপরে নারী বিষয়ক যে সকল আলোচনার কথা বলিয়াছি তাহা প্রায়ই নারীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমাজিক ও আর্থিক অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথায় পূর্ণ। বিদ্রোহ আমাদিগকে

নির্ব্বিচারে চক্ষু বুঁঝিয়া ভাঙ্গিবার শক্তি দান করে বটে কিন্তু গঠন করিবার মত শক্তি ও কৌশল কোনদিনই প্রদান করে নাই। তাই যদিও আজ চারিদিক নারীর কথায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে তথাপি তাহাতে নূতন কিছু গঠন বা সৃষ্টির সাহস, শক্তি, আনন্দ বিতরিত হইতেছে না, যাহা হইতেছে সে কেবল ভাঙ্গিবার জন্য পূঞ্জীকৃত ধূমায়মান অসন্তোষ ও অস্থিরতা।

কয়েক দিন হইল আমি চারি পাঁচ সংখ্যা পুরাতন "ধুমকেতু" পত্রিকা লইয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম দেখিলাম তাহাতে প্রায় সমস্ত প্রবন্ধগুলিই একটা উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ফেণিলতায় আবিল। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ব্যতীত উহাতে নারীর সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধও পড়িলাম—প্রায় সকল গুলিই নারীরই লেখা। "নারীসমস্যা" সমাধানের চেষ্টা তাহাতে অতি সামান্যই দেখিলাম, অধিকাংশ স্থানই তার অভিযোগের কথায় পূর্ণ। সে অভিযোগ পুরুষের বিরুদ্ধে; পুরুষ তাহাদের উপর জুলুম করিয়া মাতৃত্বলাভের ব্যবস্থা করে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সুখ নষ্ট করে। পুরুষের প্রতি নারীর যে ঘোর অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারই একটা উচ্ছ্বাস অপর একটী প্রবন্ধে দেখিলাম। তাহার ভাবটা এই যে যুগব্যাপী নিপীড়ণের ফলে বর্ত্তমান নারী পুরুষের উপর কোন আস্থাই স্থাপন করিতে পারিতেছে না এমন কি পুরুষ যদি এখন তাহাদিগকে স্বাধীনতাও দিতে চায় তবে তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই ভয় জাগিয়া উঠে যে এই অনুগ্রহের পশ্চাতেই বোধ হয় নিগ্রহের একটা ষড়যন্ত্র গঠিত হইতেছে। যাহাই হউক নারীসমস্যা সমাধানের জন্য এই চেষ্টা বড়ই সুখের ও কল্যাণকর হইত যদি শুধু উচ্ছ্বাসের দ্বারা এই চেষ্টা পরিচালিত না হইয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহচর্য্যে সংঘটিত হইত—, যদি তাহাতে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত না হইয়া স্থির প্রশান্ত জ্ঞানের উদাত্ত সঙ্গীত বাজিয়া উঠিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "নারীসমস্যা"—নারীর রাষ্ট্রীর অধিকার প্রাপ্ত কিম্বা নারীর আথিক স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে চাই না—কারণ ইউরোপে এই 'নারীসমস্যা' যে ভাবে উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের দেশে উহা এখনও সে ভাবে উপস্থিত হয় নাই। জাতীয় জীবন বিকাশে "নারী-মাতার"—দায়িত্ব কত এবং সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দেশের নারীগণ কতটা অবহিত সে বিষয়েই একটু আলোচনা করিব ইচ্ছা করিতেছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে—আমাদের দেশের নারীরাও উপরে কথিত—"মাতা" হিসাবে তাহাদের যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে সে গুলিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিতে শিখিতেছেন। আমার এ অভিযোগের মূলে একটা প্রকাণ্ড দুঃখের কথা আছে। সরকারী বেসরকারী সকল রিপোর্টেই আমরা দেখিতে পাই শিশুর অকালমৃত্যু আমাদের দেশেই ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২০ ও ১৯২১ খৃঃ এ দেশে হাজার করা ২০৭ ও ২০৬ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। বাংলার কোন কোন জেলায়—যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার এক স্থানে প্রতি হাজার শিশুর জন্মের মধ্যে ৭০০ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। কি ভয়ানক দুঃখের কথা!—এই যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র শিশু মায়ের কোঁলে মাথা রাখিয়া বেদনাকাতর চোখে মায়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে আমি জানিতে চাই দেশের কোনও "শিক্ষিতা" নারী এ বিষয়ে কোনও কিছু লিখিয়া তাহাদের দুঃখের কথা আলোচনা করিয়াছেন কি —কিম্বা এ অবস্থার কোনও প্রতিকার হইতে পারে কি না তাহার আলোচনা করিয়ছেন কি?—সন্তান প্রসব নারীরই কার্য্য; শিশুর মুখে সঞ্জীবনীরস বক্ষের অমৃতধারা ঢালিয়া দেওয়া একান্ত নারীরই কর্ত্তব্য তবুও যখন দেখিতে পাইতেছি যে দেশের এই দুর্দ্দিনে নারী সমাজে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতেছে না তখন এ অভিযোগ মিথ্যা বলিতে পারিতেছি না। যখন দেখিতে পাই যে তাহাদের অঙ্কে শয়ন করিয়াই শিশু অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হয় এবং তাহারা সাময়িক শোকের বশে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াই আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন এবং এই শোকাবহ ঘটনার পুনরভিনয় যাহাতে না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকেন তখন কি এ অভিযোগ সত্য বলিব না যে—মাতৃত্বের গৌরব এ দেশের নারী ভুলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে—অভিযোগের আরও কারণ আছে যেহেতু মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা খুজিলে দেখিতে পাই যে "নারীমঙ্গল" প্রভৃতি অধ্যায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নারীর সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্দীপনাময় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। অনেক নারী হয়ত বলিবেন—এ-সব বিষয়ে কেবল "ডাক্তার" সবই আলোচনা করিবেন—এবং তাঁহারা দু এক জনে করিতেছেন ও যেমন প্রবীণ বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন বাবু, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে— শিশুপালন ও রক্ষণ ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় আছে যে সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশের প্রয়োজন নাই—উপযুক্ত মাতা যিনি, তাহার উপদেশেই চলিতে পারে—এবং যে সব বিষয়ে অজ্ঞতা ও

অনবধানতার জন্য শিশুর স্বাস্থ্যের হানি ঘটিতে পারে—, এমন কি অনেক সময় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। এ রকম বিষয়ে—কোনও নারীর একটী প্রবন্ধও এ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই—এ উদাসীনতার অর্থ কি ?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় 'নারীর মাতৃত্ব"। এখানে এ কথাটাও বলা সঙ্গত যে যদিও আমি নারীর মাতৃত্বের দিকটাই তার জীবনের মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিক বলিয়া উল্লেখ করিতেছি তবুও রাষ্ট্রীয় কিম্বা সামাজিক কর্য্যে তাহার যে সমান অধিকার আছে তাহা অঙ্গীকার করিতেছি না।

জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে নারীর দায়িত্ব পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ পিতা ও মাতা এই দুই এর মধ্যে শিশুর জীবন ধারণের জন্য ও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে মাতার স্থান পিতার স্থানের অনেক উর্দ্ধে। যে সমস্ত প্রভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয় তাহারা প্রায়ই মাতার সাহায্যেই শিশু দেহে ও মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মানব সভ্যতার প্রতি যুগেই যে মাতৃত্বের এই উচ্চ আদর্শ সমাজের নরনারীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। রোমক সভ্যতার কোন এক যুগে গর্ভিনী নারীর গৃহ ফুলের মালায় বিভূষিত হইত। এথেনীয় সভ্যতার যুগে গর্ভিনী নারীর বাসস্থান পবিত্র, দেব মন্দিরের তুল্য বিবেচিত হইত। Renaissance এর যুগে যখন নূতন নূতন ভাব দলগুলি একে একে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল তখনকার আদর্শ সুন্দরী নারী যে গর্ভিনী নারী তাহা আমরা—তৎকালীন অঙ্কিত চিত্রগুলি হইতে জানিতে পারি।

মনুষ্যজাতির—উন্নতি বিধানে নারীর কর্ত্তব্য কি এবং কি উপায়ে সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে—সে সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান যুগের—বিখ্যাত সাহিত্যিক Ibsen বলিয়াছেন "The women will solve the question of mankind and they will do it as mother." Ellen key এক জায়গায় বলিয়াছেন যে—কোন কোন ক্ষেত্রে নারী তাহার ব্যক্তিত্বের-স্ফূর্ত্তির-জন্য সন্তান প্রসব না করার দাবী করিতে পারে সত্য কিন্তু সাধারণতঃ মাতৃত্বই নারীর সর্ব্বাপেক্ষা—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কালে মাতৃত্বের এই আদর্শ নানাদিক হইতে আক্রমণ করা হইতেছে এমন কি নারীর পক্ষ হইতেও ইহা অধীকার করা হইতেছে। এই

ভাবটা বিশেষ রকম প্রকাশ পাইয়াছে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নারীর মধ্যেই। পুরুষের জীবনের আদর্শের প্রতি তাহাদের একটা অকারণ মোহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে মাতৃত্বের প্রতি জাতির ভবিষ্যৎগঠনে নারীর মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবহেলা দেখা দিয়াছে। পুরুষের কার্য্যজীবনের বৈচিত্র্য, সাফল্য ও বিফলতায় সুখদুঃখের আশা নৈরাশ্যের খেলা; বর্ত্তমান নারীর চতুর্দ্দিকে এমন একটা মোহের জাল রচনা করিয়াছে যে তাহারা আজ নারী ও পুরুষের দেহগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অস্বীকার কিম্বা অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষের শিক্ষার মত শিক্ষা—পুরুষের কার্য্যের মত কার্য্য, এমন কি পুরুষের ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রকরণ গুলিকেও গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের কতগুলি কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি যাহা নারীসমাজ দাবী করিতেছেন তাহাকে অন্যায় বলিতে পারিব না কিন্তু যখন নারী—স্বীয় কর্ত্তব্যের গণ্ডী অবহেলা করিয়া যে কর্ত্তব্য একান্ত তাহারই, অন্য কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা পদদলিত করিয়া—পুরুষের কার্য্য অনুকরণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে তখন ইহাকে অন্যায় ও দোষাবহ বলিতে বাধ্য হইব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে "Freedom is only good when it is only a freedom to follow the laws of one's own nature, it ceases to be freedom when it becomes a slavish attempt to imitate others" স্বাধীনতা ততকাল সুফল প্রদান করে যতকাল ইহা আমাদের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিবার স্বাধীনতা শুধু আনয়নকরে আর যে স্বাধীনতা আমাদের স্বীয় প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া—পরপ্রকৃতি অনুসরণে প্রবৃত্ত করে, সে স্বাধীনতা দাসত্বেরই রূপান্তর মাত্র। বর্ত্তমান কালে নারীর এই পুরুষ প্রকৃতি অনুকরণ করিবার স্পৃহার জন্যই পাশ্চাত্য দেশে মাতৃত্বের গৌরব আর পূর্ব্বের মত অনুভূত হয় না এবং আমাদের দেশের নারীও যে ঐ গৌরব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা তাহাদের লেখার মধ্যে পাইতেছি। "নারীত্ব সার্থক করিবার সহস্র পথ আছে বিবাহ ছাড়াও করবার পথ আছে"—নারীত্ব সর্থক করবার সহস্র পথ আছে কিন্তু সে নারী হিসাবে নয় মানুষ হিসাবে এ কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এ নারীত্ব সার্থক করিবার জন্য সকল নারীকেই যে বিবাহবন্ধন ত্যাগ করিয়া মাতৃত্বের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া—সহস্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে এ কথা অনুমোদন করিতে পারি না—। আমরা compulsory motherhood এরও পক্ষপাতী নই। মাতৃত্ব এত বড় একটা দায়িত্ব যে

যদি কোন নারী এ দায়িত্ব গ্রহণে নিজকে অনুপযুক্ত মনে করেন তবে তাহার উপর এই বৃহৎ কর্ত্তব্যের ভার নিক্ষেপ করা অতিশয় অসঙ্গত হইবে। Lady Henry Somerset এ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে "If voluntary motherhood is the crown of the race, involuntary compulsory motherhood is the very opposite" এ সম্বন্ধে এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা একান্ত ব্যক্তিগত কথা। ইহাকে সমাজগত ও জাতিগত মনে করিয়া দেশের সকল নারীকেই মাতৃত্বের দায়িত্ব পরিহার করিয়া সহস্র বিভিন্ন পথে তাহাদিগের নারীত্বকে সার্থক করিবার জন্য আহ্বান বা নিমন্ত্রণ জাতীয় উন্নতির মহা অকল্যাণকর এবং যাহারা এই আহ্বান প্রেরণ করেন তাহারা জাতীয় উন্নতির ঘোর পরিপন্থী।

মাতৃত্ব নারীজীবনে কতটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে সে সম্বন্ধে Ellen Keyর একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

"As a general rule, the woman who refuses mothehood in order to serve humanity is like a soldier who prepares himself on the eve of battle for the forthcoming sturggle by opening his veins"

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মদ্যপান সম্পূর্ণ অবৈধ।

(প্রতিবাদ)

গত ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যার 'প্রতিভা' পত্রিকায় "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় "বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্র ও দেশাচার ভদ্রসমাজে মদ্যপানের প্রতিকূলে কেন" এইরূপ একটী কৌতূহলগর্ভ প্রশ্নের অবতারণা

করিয়াছেন। প্রবন্ধকার প্রাচীন স্মৃতিশিরোমণি মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতার প্রমাণাদি তুলিয়া "ফলতঃ স্মৃতিশাস্ত্র সুরাপান দ্বিজমাত্রেরই পক্ষে মহাপাপ এবং মদ্যপান অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ পাপ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং স্মৃতির এই ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ মানিয়া লইয়াছেন।" বলিয়া বর্ত্তমান সমাজের উপর স্মৃতিশাস্ত্রের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর "মনুশাসিত আর্য্যসমাজে * * * * এই প্রথা উঠিয়া যায় নাই" ইত্যাদি লিখিয়া লেখক মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক এবং ২য় অধ্যায়ের ১৭৭ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া "মদ্যপান সমাজে প্রচলিত ছিল" এইরূপ অনুমান, এবং ২য় শ্লোকটী ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশেষ নিষেধপর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুরাপান শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও সমাজ হইতে উঠিয়া যায় নাই, এই উক্তির দ্বারা লেখক কি বলিতে চান, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ইহার দ্বারা লেখক যদি মনুস্মৃতির অনুশাসন সর্ব্বথা সম্মানিত হয় নাই বলেন, তদুত্তরে বক্তব্য যে, শাস্ত্রের যাবতীয় বিধিই কি আমরা যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছি? যদি সমগ্র বিধি-পালনের ত্রুটি সত্ত্বেও শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে পূর্ণমাত্রায় নিষেধ পালনের অসদ্ভাবে শাস্ত্রের আজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট দিন দিন যত নিত্য নূতন আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রচলন করিতেছেন, প্রত্যেক প্রজাই কি ঐ সব বিধান মাথা পাতিয়া লইতেছে? আর যে দু'দশজন ঐরূপ আইন লঙ্ঘন করিতেছে, সমাজ কি আদর্শ ভাবিয়া তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করিতেছে? লেখক "ন মাংসভক্ষণে দোষঃ" ইত্যাদি শ্লোকটীর যে অনুবাদ দিয়াছেন, উহা মূল ও ভাষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"অবিহিতাপ্রতিষিদ্ধমদ্যমৈথুন নিবৃত্তের্মহাফল—
কথনার্থোঽয়ং উক্তস্যৈব মাংস বর্জন মহাফল কথনস্যানুবাদঃ।"

অর্থাৎ অবিহিত ও অনিষিদ্ধ মদ্যমৈথুনাদি হইতে নিবৃত্তি মহাফল জনক, ইহা বলিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত ৫৪ শ্লোকে মাংস বর্জনের যে মহাফল বলা হইয়াছে, এই ৫৬ শ্লোকটী তাহারই অনুবাদ। তাৎপর্য্য, একই শাস্ত্রকার (মনু) যদি একটী (৫৪) শ্লোকে একবার মাংসবর্জনের মহাফল বলিয়া পরে আবার অন্যত্র (৫৬) শ্লোকে মাংস ভক্ষণে কোন দোষ নাই বলেন, তাহা হইলে স্বোক্তিবিরোধবশতঃ তাঁহার উক্তি উন্মত্ত প্রলাপের মত

প্রাজ্ঞসমাজের অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। এ জন্য মীমাংসানিপুণ ভাষাকার সমাধান করিয়াছেন, যে এই ৫৬ শ্লোকটী ৫৪ শ্লোকের অনুবাদ মাত্র, অর্থাৎ ঐ ৫৪ শ্লোকের উক্তিটী এই ৫ শ্লোকে অন্যভঙ্গীতে বলিয়া দৃঢ় ভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। শ্লোকটীর প্রকৃত অনুবাদ বঙ্গবাসীর সংস্করণে, "বৈধমাংস ভক্ষণে" ইত্যাদি দেখিলেই বিষয়টী সহজবোধ্য হইবে। এই শ্লোকে বৈধমৈথুনাদি সেবনে দোষ নাই বলাই গ্রন্থকারের মুখ্য অভিপ্রায়! বিশেষতঃ এই বৈধমদ্য—মৈথুনাদি হইতে নিবৃত্তিকেও মহাফল বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে দোষ নাই বলায়, পাপ নাই এমন অর্থ বুঝাইবে না। দোষ ও পাপ একার্থক নহে। ক্বচিৎ দোষ শব্দে পাপ বুঝাইলেও ঐটী উহার গৌণার্থ বুঝিতে হইবে। শব্দ শাস্ত্রে সম্ভব পক্ষে মুখ্যার্থত্যাগ করিয়া গৌণার্থের গ্রহণ জঘন্যনীতি রূপে নিন্দিত হইয়াছে। তারপর ২য় অধ্যায়ের ১৭৭ সংখ্যক, "বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকটী তুলিয়া ঐ শ্লোকস্থিত মধুশব্দের ভাষ্যকার কৃত অর্থ "ক্ষৌদ্র" এবং অনুবাদক পণ্ডিত মহোদয় প্রদত্ত অর্থ "মধু"ত্যাগ করিয়া অদ্ভুতমদ্য অর্থের কল্পনা করিয়া ঐটী একেবারে বিশেষ নিষেধপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল কিরূপে বুঝা দুরূহ। ক্ষুদ্রা শব্দে মধুমক্ষিকা, তৎকৃত বলিয়া ক্ষৌদ্র (ক্ষুদ্রা+ষঞ) শব্দে মধুবুঝায়,—ইহা লেখকের মত পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্যই জানেন। এই বার লেখক স্মৃতিশাস্ত্রকে রেহাই দিয়া প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের "খেয়াল" কাব্য ঋতুসংহার পর্য্যন্ত ঘাঁটিয়া "মদখাওয়ার" প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন! বলা বাহুল্য যে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ ইতিহাস বা মতান্তরে মহাকাব্যরূপে পরিগণিত হইলেও ঐগুলি স্মৃতিশাস্ত্র নহে। সমাজ শাসন লৌকিক কাব্যেরও স্মৃতিশাস্ত্র সমকক্ষ হইবার দাবী সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। মনুসংহিতার মতে শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার ধর্ম্মনির্ণয়ে মুখ্যপ্রমাণ। "স্মৃতিস্তুধর্ম্মসংহিতা," শ্রুতিমূলক ধর্ম্মসংহিতাগুলিকেই স্মৃতি বলা হয়। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠ পর্য্যন্ত বিংশতি জনঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রকার নামে পরিচত। কালিদাস ত দূরের কথা, উহাতে বাল্মীকির পর্য্যন্ত নাম নাই। বৈদ্যকশাস্ত্রে শূকরের ও কুকুরের মাংসের গুণবর্ণনার ঘটা আছে। অতএব সেগুলি ভক্ষ্য ইহা বোধ হয় লেখকেরও মত নহে। ঐ শাস্ত্রমতে কদাচিৎ জীবন সঙ্কটে মদ্যপান ব্যবস্থিত হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার জন্যও অপেক্ষাকৃত অল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। ভবিষ্যপুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে,—

"যদি রোগৈর্ভবেদ্দ্রষ্টোনেতরস্য কদাচন।
কৃচ্ছ্রংচাত্র নরশ্রেষ্ঠ তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ।"

লেখক রামায়ণ হইতে সুরার উৎপত্তির যে বিবরণ দিয়াছেন, উহাতে তিনি "সুরা" শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঁয়তাল্লিশ সর্গের আটত্রিশ সংখ্যক "দিতেঃ পুত্রাঃ ন তাং রামঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সুরা শব্দটী শরীরিণী বরুণ কন্যারূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক এখানে সেটী একেবারেই দ্রবময়ী বোতলবাহিনীরূপে ধরিয়া লইয়াছেন। শ্লোকের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উপক্রম ও উপসংহার এবং প্রকরণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ঐ প্রকরণের বত্রিশ হইতে আটত্রিশ পর্য্যন্ত শ্লোকে সমুদ্র মন্থনে ধন্বন্তরি, অপ্সরোগণ, সুরার অধিষ্ঠাত্রী বারুণীর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের বিশ্বাসার্থ আমি লেখকেরও উপজীব্য বঙ্গবাসীর সংস্করণের রামায়ণ হইতে অনুবাদটী যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। "রঘুনন্দন! তৎপরে সেই সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী বারুণী নামে বরুণের মহাভাগা কন্যা, কেহ তাহাকে গ্রহণ করেন, এই অভিলাষে উত্থিত হইলেন।" এই শ্লোকোক্ত সুরাটী যদি দ্রবময়ী হইতেন, তাহা হইলে উহার সহিত "বরুণাত্মজা" "অনিন্দিতা" "মহাভাগা" বিশেষতঃ "পরিগ্রহং মার্গমাণা" বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইতে পারিত কিনা, সংস্কৃতজ্ঞ সুধী মণ্ডলী ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তৎপর কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বানর ও রাণী বানরী এবং লঙ্কার রাজা রাণী রাক্ষস রাক্ষসীর আদর্শ বর্ত্তমান সমাজে অনুসৃত হওয়া উচিত কিনা, প্রাজ্ঞ সামাজিকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। সুখের বিষয় লেখক স্বয়ং উহাতে বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখক মহাশয় উত্তরকাণ্ডে অশোক বনে রামচন্দ্রের একটি বেশ জমকাল পান গোষ্ঠীর বর্ণনা আছে বলিয়াছেন। আমরা ঐ অংশ পাঠ করিয়া পান গোষ্ঠীর কোন নিদর্শন দেখিলাম না। ঐ অংশে বাল্মীকি—প্রতিভাসুলভ অশোক বনের একটি সরল সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাই। "অশোক বনিকাং সীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।" ৫২।১৭। তৎপরে "কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদহ" ৫২।১৮। শ্লোকে কুশাস্তরণের উপর পাতিত পুষ্পসজ্জিত আসনে রামচন্দ্রকে উপবেশন করিতে দেখি। বনের মধ্যে কুশাসনে বসিয়া পান গোষ্ঠীর খবরটা নূতন বটে। লেখক বলিতে পারেন, কেন, "কুব্জিকাপ্যপ্সরায়তে" এটাত শাস্ত্রেরই বচন? বাৎসায়ন প্রণীত

কামসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশে যেরূপ দেশ কাল পাত্র লইয়া পান গোষ্ঠীর রচনা পদ্ধতি দেখিয়াছি, এস্থলে তাহার একটু আভাসও পাই না। অধিকন্তু রামচন্দ্রকে এখানে "পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মকার্য্যাণি" ৫২।২৭। করিতে, সীতাকে "সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃত্বাপৌর্ব্বাহ্ণিকাণি বৈ" ৫২।২৮। দেব পূজাদি করিতে শুনি। তবে আঠার শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে সীতাকে মৈরেয় মধুপান করাইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। "পায়য়ামাস" পদটী নিজন্ত ক্রিয়া, সুতরাং রাম নিজে পান করেন নাই, একটা বেশ সাব্যস্তই আছে। ঐ শ্লোকে শুচি অর্থাৎ পবিত্র মৈরেয় মধু (শীধু) পান করাইলেন, ইত্যাদি আছে। লেখক মৈরেয় মধু অর্থে শীধু (জ্বাল দেওয়া ইক্ষু রস) বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকায় শতমূলীর রসে প্রস্তুত মদ্যকে শীধু বলা হইয়াছে। যে অর্থই ধরা যাউক, মৈরেয় মধু যে দ্বাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট সুরা মদ্য নহে, ইহা নিশ্চিত। উহা নিকৃষ্ট সুরা মদ্য হইলে তৎপূর্ব্বে "শুচি" পবিত্র এ বিশেষণ সাজিত না। লোকে "গঙ্গাজল পবিত্র" বলার রীতি প্রচলিত। কিন্তু "মদ্য পবিত্র" এরূপ বলিতে শুনা যায় না। যাহা প্রাকৃত লোকেও বলে না কবিগুরু বাল্মীকি এমন একটা নিরর্থক বিশেষণ রামায়ণে প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে। লেখক মহাশয় এখানে "শুচি" শব্দের "স্বচ্ছ" তর্জমা করিয়াছেন। এরূপ নূতনতর তর্জমার উদ্দেশ্য কি বুঝা যায় না। এই ওষধিজ মৈরেয় মধুপান যে ক্ষত্রিয় স্ত্রীর পক্ষে মহা পাতক নহে, এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার কথা লেখক পূর্ব্বে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। এইবার রামায়ণের শেষ প্রমাণ, সীতাদেবী সুরাপূর্ণ সহস্র কলসদিয়া গঙ্গাপূজার মানস (মানত) করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। কালিকা পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে ত্রিবিধ পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। তন্মধ্যে "সুরা মাংসাদ্যুপহারৈর্নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।" ইত্যাদি প্রমাণে মদ্যমাংস উপকরণে অমন্ত্রক পূজাকে তামসী বলা হইয়াছে। লেখকের উদ্ধৃত দুই শ্লোকেই "যক্ষ্যে" এইরূপ পূজার্থক যজধাতুর কর্ত্তৃগামি ক্রিয়ার ফল বুঝাইতে লৃট্‌বিভক্তির আত্মনে পদের প্রয়োগ হইয়াছে। উহাতে স্বয়ং পূজা করিবেন, ইহাই বুঝাইতেছে। স্ত্রীলোক কৃত পূজায় মন্ত্রপাঠ নাই. সুরা মাংস উপহার, সুতরাং ঐ পূজা তামসী ও শাস্ত্রবিধান সঙ্গত। মদ্যমাংস তামসী পূজার উপকরণ রূপে প্রদত্ত হইলেই, উহাদের অবাধ পানভক্ষণ সমাজে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ অনুমানের বিশিষ্ট হেতু দেখা যায় না। মহাভারতের

প্রণেতা শ্রীলব্যাসদেব বলিয়া উহার অনেক প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে উদ্ধৃত দেখা যায়। সুতরাং উহাতে যদি মদ্য পানের প্রশংসাবাদমূলক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় সেটী বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের উপসংহাররূপ ফল শ্রুতিতে "অপেত ধর্ম্মা" "ব্রহ্মহা" "ইহপরলোকগর্হিতঃ "পুনঃ সংস্কার মর্হতি" প্রভৃতি যে অভিসম্পাত ও সুতীব্রনিন্দা—বাদ দেখা যায়, তৎসত্ত্বেও যদি ঐ গ্রন্থের স্থলান্তরে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত পান গোষ্টীকে সভ্যসমাজের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে নারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের কৃত পঞ্চম বেদ নামে সমাদৃত মহাভারত গ্রন্থখানি অসামঞ্জস্য-বহুল ঘটনা পূর্ণ স্বোক্তি বিরোধের ভাণ্ডার বলিতে হয়। বিচারক প্রাজ্ঞগণ জগন্মান্য ব্যাসদেবের বালসুলভ এই অদূরদর্শিতার সমর্থন করিবেন কি? হরিবংশখানি মহাভারতেরই পরিশিষ্ট। সুতরাং মূল গ্রন্থসম্পর্কে—প্রযুক্ত যুক্তি ইহাতেও প্রযোজ্য হইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যদুবংশ ধ্বংস প্রসঙ্গে যে মদ্যপানের কথা আছে, উহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অভিশাপের কথা স্পষ্ট না থাকিলেও ঐ দুই গ্রন্থেই "বিপ্রাণাং সশাপ ব্যাজেন" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণোক্ত অভিসম্পাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ঐ ইঙ্গিত হইতে ছত্রিশ কোটি যদুবংশের ধ্বংসের মূল উহাদের অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত আত্ম-কলহ বা গৃহবিচ্ছেদ ইহা বেশ পরিস্কার বুঝাইতেছে। অনুসন্ধিৎসু লেখক এস্থলে "শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণ চরিত্র" পুস্তকে এবিষয়ে আদৌ উল্লেখ করেন নাই" লিখিয়াছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কৃষ্ণ চরিত্রের ৭ম খণ্ড, প্রভাস, ১ম পরিচ্ছেদ যদুবংশ ধ্বংস প্রস্তাবের পাদটীকায় (বসুমতী সংস্করণ ৫৫৭ পৃঃ) ৺বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষ গণকে এই নীতির অনুবর্ত্তী হইতে অনুরোধ করি।" এতবড় একটা কথা গবেষণাশীল শাস্ত্রদর্শী লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি আকর্ষণ না করা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয়! কালিদাসের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রঘুবংশ ও কুমার সম্ভব তৎকৃত মহাকাব্য। জলকেলি, মধুপান প্রভৃতি মহাকাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ঐগুলি বাদ দিলে অঙ্গহানি প্রযুক্ত মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য-পুষ্টি হয় না। দেবতা বা সদ্‌ বংশজাত ক্ষত্রিয় রাজা মহাকাব্যের নায়ক বা অবলম্বন। ইহার বর্ণনীয় মূল বিষয়টী ইতিহাস বা লোক বৃত্ত হইতে গৃহীত হয়। কাব্য প্রকাশ, সাহিত্য

দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশে এ সকল কথা সবিস্তারে উল্লিখিত আছে। ঐরূপ নায়ক অবলম্বনে যে কাব্য রচিত হয়, উহাতে রস পুষ্টির জন্য কল্পনা বাহুল্যের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। কেবল কালিদাস কেন, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ কোন মহাকবিই বিলাসিধনি সুলভ পানোৎসব আদি বাদ দিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং ঐ কবি কল্পিত অতি রঞ্জিত চরিত্র হুবহু নকল করিলে আসল সমাজের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। নাটকগুলি দৃশ্য কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মেঘদূত খণ্ড কাব্যখানি যক্ষের রাজধানী, যক্ষের দৈনিক জীবনী ও বিলাস প্রথা বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অবশ্য কবি দেবযোনি বিশেষ বা উপদেবতাদের রাজভৃত্য যক্ষ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব প্রতিভাবলে তৎকালীন উত্তর ভারতের একখানি অত্যুত্তম মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মূল অবলম্বন কর্ত্তব্যবিমুখ, শ্রমকাতর, বিলাসের দাস, কামকিঙ্কর, প্রথমশ্রেণীর স্ত্রৈণ প্রভুনিগৃহীত যক্ষ—সভ্য মানব সমাজের আদর্শ হইবার নিতান্ত অযোগ্য। ঋতুসংহার পুস্তিকাখানি আজ কাল্‌কার চটকদার নাটক নভেলের ন্যায় বেশ মুখরোচক, কর্ণরসায়ন ও অবসরবিনোদন। উহাতে প্রকৃতির বরপুত্র কবির বর্ণনাগুণে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সজীব ও মোহন ছবি অঙ্কিত হইলেও কর্ম্মিজগতের প্রাণের কোন সাড়া নাই। ঐ চটুল কাব্যখানি কালিদাসীয় যুগের শ্রম বিমুখ বিলাসী ঔপনিবেশিক দিগের সাময়িক ক্রীড়াক্ষেত্রের চিত্রসদৃশ। লেখক মহিলামণ্ডলীর পক্ষে মদ্য মাংসাহার নিষেধের পোষক কোন প্রমাণ পান নাই বলিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রবন্ধের কলেবর পুষ্টির আশঙ্কায় মাত্র দুই একটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

(১) যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যাৎ ন তাং দেবাঃ পতিলোকং
নয়ন্তীতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃতা শ্রুতিঃ।

(২) ভবিষ্যে,— "ব্রাহ্মণ্যাপি ন পেয়া বৈ সুরাপাপ ভয়াবহা।"

* * *

পতত্যর্দ্ধ শরীরেণ ভার্য্যা যস্য সুরাং পিবেৎ॥"

উদ্ধৃত পূর্ব্বশ্লোকে কেবল ব্রাহ্মণী শব্দ থাকিলেও পরার্দ্ধে "যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে"

সামান্যতঃ উল্লেখ থাকায় দ্বিজাতি স্ত্রীমাত্রকেই বুঝাইতেছে।

(৩) শ্রীমদ্‌ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়, ২৯ ও ৩১শ গদ্যাংশে;—"কলত্রং বা সুরাং পিবতি" "যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি" যে দ্বিজ পত্নী সুরাপান করে, এবং যে সকল স্ত্রী পশু (মাংস) ভক্ষণ করে ইত্যাদি।

শাস্ত্রে সংক্ষেপে সুরাপানের নিম্নোক্ত দোষগুলি উক্ত হইয়াছে; "সুরাপানে মত্ততা, শারীরবৈকল্য, গতি এবং বাক্যের স্খলন, লজ্জা এবং মানহানি, কামাধিক্য, লোহিত নেত্রতা এবং ভ্রান্তি।"

যে সময়ে সভ্যদেশ মাত্রেই রাজ বিধান দ্বারা সুরাপান প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধ মহাদেশ যে সময়ে "যদি কোন ষ্টিমার কোম্পানি মদ্যবহন করে, তাহারও দণ্ড হইবে" এরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত করিয়াছেন, যাহা পান করিলে ইহকালে মানবের অর্থনাশ, শরীরনাশ, স্বাস্থ্যনাশ, মাননাশ এবং ধর্ম্মনাশ, আর পরকালে অনন্তকাল নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়; বর্ত্তমান সময়ে সেই জঘন্য সুরাপান সংক্রান্ত প্রাচীন পদ্ধতির প্রচার করিবার প্রয়াস স্বীকার করিয়া জন সাধারণের শিক্ষক স্থানীয় সংবাদ পত্রের পবিত্র কলেবর কলঙ্কিত করিবার সার্থকতা কি, আমরা পণ্ডিত লেখকের নিকট সেটী জানিতে চাহি।*

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

মায়ের ডাক।

—:o:—

আজ এই বিশাল মহাদেশের সুপ্তচেতনার মহাবসানে প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক পল্লীতে এবং প্রত্যেক সমাজে যে এক বিরাট কর্ত্তব্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, পূর্ব্বগগনে নূতন আশার অরুণ-উষার আরক্তিম কিরণচ্ছটার সমাগমে যে সহস্র বিহঙ্গমীর কলকণ্ঠের মঙ্গলগীতি আমাদের বিবশ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে আলস্যজড়তা ত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ 'প্রতিভা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতিবাদও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। প্রতিভা ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ইচ্ছা নয়, তিন মাস অপেক্ষা করা। উভয় লেখকই স্থানীয়,—স্থানীয় পত্রিকায় তাঁহাদের বক্তব্য আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—সেই হিসাবে এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ 'পরিচারিকা'য় প্রকাশিত হইল। সঃ সঃ।

করিতেছে—ইহা মহাশক্তিপূজার পুণ্যবোধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঘোর অমানিশার অবসানে যেমন দিবাকরের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রকার পৃথিবীর ইতিহাসেও প্রত্যেক সমাজের পতন এবং উত্থান সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সংঘটিত হইয়া থাকে। সমাজ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া পুরুষের প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত, জাতির ভিত্তিস্বরূপা মাতৃজাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়; পক্ষান্তরে যখন তাঁহাদিগকে জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায় মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তখনই তাহার সভ্যতা এবং শান্তির চরম বিকাশ হয়। প্রাচীনভারত এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্যদেশ ইহায় সাক্ষ্য দিতেছে। ইউরোপ যে আজ আমাদিগকে স্বীয় শিক্ষায়, গৌরবে এবং শৌর্য্যে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে ইহার একটি কারণ যে তাহারা মাতৃজাতিকে সম্মান করিতে জানে—তাহারা শক্তির উপাসক!

অতীত ভারতের ইতিহাসেও এমন একটা গৌরবময় অধ্যায় আছে, যখন মাতৃজাতি মস্তিষ্ক শক্তির প্রতিযোগিতায় পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন। বৈদিক যুগের মাতৃজাতির প্রতিভা এবং মৌলিকতার কথা চিন্তা করিলে বিস্ময় এবং আনন্দে প্রাণ বিহ্বল হইয়া উঠে। একমাত্র সতীত্বের গর্ব্ব করিয়াই যে ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা নহে; ইঁহাদের পরমার্থজ্ঞান এবং সাহিত্যকলার পারদর্শিতা এখনও বেদের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ইঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পদতলে জ্ঞানাবতার শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যকেও অবনত মস্তকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে সাধারণ কুলাচার হইতে আরম্ভ করিয়া কূট রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মেই সহধর্ম্মিণীর স্থান অতি উচ্চে রহিয়াছে। অতএব কোন জাতিরই অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলে সমাজের অধোগতি ভিন্ন উন্নতি সম্ভবপর হইবে না।

মাননীয় মনুমহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের প্রাচ্য এবং প্রতীচীর মনীষী মণ্ডলী সকলেই মাতৃজাতির সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। ভগ্নস্বাস্থ্যকে নীরোগ করিতে হইলে যেমন তাহার রোগের মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হয়, সেই প্রকার কোনও দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশজননীগণের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রথমেই করিতে হইবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য একমাত্র জননীই

সর্ব্বতোভাবে দায়ী এবং তাঁহাদের জীবন-গঠনে তাঁহারা যে প্রকার সহায়তা করিতে পারেন শত শিক্ষক দ্বারও তাহা সম্ভবপর নহে।

দেশের যাঁহারা হিতাকাঙ্খী তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্যই হইল—সমাজোপযোগী এবং ধর্ম্মানুমোদিত স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন। দেশে এরূপ শিক্ষা বর্ত্তমানে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। যাহাও কদাচিৎ দৃষ্ট হয় তাহাও আবার আমাদের যথোচিত সাহায্যের অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে দুই এক নীরব কর্ম্মীর আজীবন সাধনায় যে আশাতরুর উদ্ভব হয় তাহা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবার পূর্ব্বেই সহানুভূতিবারির অভাবে অকালে কালের করাল কবলে বিলীন হইয়া যায়! সমুদ্রের অতল অন্ধকার গহ্বরে কত যে মহামূল্য রত্ন আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত থাকে কে তাহার সন্ধান করে?

"মাতৃ-মন্দির" শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা কি দোষাবহ ?

মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক সকল রকম কাগজেই মেয়েদের বিষয় নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। অনেক জায়গায় এ সব আলোচনা মেয়েরাই করেন। এটা দেশের পক্ষে একটা শুভলক্ষণ বলেই মনে হয়; কারণ এতে করে বোঝা যাচ্ছে দেশ আমাদের সম্বন্ধে আর যাই হোন, সম্পূর্ণ উদাসীন নন্।

শিক্ষা এবং আদর্শ কি হবে এই নিয়েই আলোচনা বেশী হয় এবং সেই সময়েই অনেক স্থলে বর্ত্তমানে শিক্ষিতা ব'লতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ প্রসূত আক্রমণ দেখা যায়। আমি অনেক প্রবন্ধ পড়ে দেখেছি—যেগুলিতে আক্রমণ বেশী সেগুলির লেখক এবং হঠাৎ কখনও লেখিকাগণ যাঁদেরকে আক্রমণ কর্ছেন তাঁদের সঙ্গে যে কোনও রকম পরিচয় রাখেন তার প্রমাণ দেন না। অথচ নিজের মনগড়া কতকগুলি দোষ এই

শিক্ষিতা নামধারিণীদের উপর চাপিয়ে দেন। শিক্ষিতা বল্‌লে সেই মাত্র-বোধদয়-পড়া, স্বামীকে ভুলবানান সংযুক্ত, "যাও পাখী বোলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে" ছড়া লেখা, পাখী ফুলের ছবি শোভিত চিঠি লেখ্‌বার ক্ষমতামাত্রপ্রাপ্তা মেয়েটী হতে মিস্ হল্যাণ্ডের মত পি এইচ্ ডি উপাধিধারিণী সবাইকেই বোঝায়, এবং ঐ নোলোক-নাকে উচ্ছ্বাসময়ী বধূটির মন আর ডিগ্রিধারণীর মনটাকেও এক পর্য্যায়ভুক্ত করে ফেলা হয়। এখন ঐ বউটীকে লেখা পড়া শেখাবার সময় যেমন করে হোক বিয়ে হলে বরকে চিঠি লিখতে পারলেই হ'ল বলে লেখা পড়া শিখতে বলা হয় এবং সে জীবনের উদ্দেশ্যকে ঐটুকু পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। অনেকগুলি প্রণয়সম্ভাষণ মুখস্থ করা, আর প'য়ে রফলা আর শ'য়ে রফলা ঠিকমত লিখতে পারাই বিদ্যার যার চরম সীমা সে যদি সোণার জলে নাম লেখা সিল্কের মলাট ঝকুঝকে সব উপন্যাসগুলির মধ্যেই দিনগুলিকে ডুবিয়ে দিতে চায় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না—দোষ দেওয়া যায় তাঁদেরকেই কেবল, যাঁরা তার জীবনের লক্ষ্যটীকে ঐ ছোট সীমার মধ্যে এনে দিয়েছেন। কিন্তু যার বিদ্যার সীমা আরও এগিয়ে গিয়েছে যে জ্ঞান পিপাসার জন্যই কত সাহিত্য, কত ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সেও যে শুধু খাটে শুয়ে ঐ নভেলগুলিই পড়বে—এ রকম যাঁরা মনে করতে পারেন তাঁদের পক্ষে বাতুলাগারে যাওয়াই সব চেয়ে প্রশস্ত উপায় বলেই মনে হয়। অথচ এই রকম বাতুলের মত কথা বাহাদুরীর সঙ্গে বলেই অনেক পুরুষ আনন্দ পান—আজও দেশে তাই দেখা যায়।

অল্পদিন হ'ল কোনও একটা স্কুলের রিপোর্টে ডিগ্রিধারিণীদের খাটো কর্‌বার প্রয়াসে একটা এরকম বাতুলের গল্প বেরিয়েছিল। কেরাণীর শিক্ষিতা স্ত্রী খেচড়ান্ন রাঁধতে গিয়ে পাক প্রণালী পড়ে নির্দ্দেশ মত রান্না করেছিলেন—হাঁড়িশুদ্ধ জল উনানে চাপিয়ে চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি আস্তাকুঁড়ে ফেলে, নিজের মুখে সরা চেপে—এক অপূর্ব্ব খাদ্য। রিপোর্ট পড়ে সব আগেই আমার মনে হল এ বোধহয় স্ত্রীশিক্ষা যুগের প্রথম অবস্থায় পুরুষের কাছেই বিদ্যালাভ করেছে এমন একটী মেয়ে—নৈলে তার এ দুর্দ্দশা হবে কেন যে সরাটা নিজের মুখে চাপা দেবে।

মেয়েদের কোনও মত না নিয়ে, তাদের দরকার অদরকার কি না জিজ্ঞাসা করে পুরুষেরাই যখন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন, তাঁরাই যখন বালিকাবিদ্যালয়গুলি চালাতেন এবং বালিকাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন তখন ঘরেও নারী সম্পর্কে না আস্‌ছে যে মেয়ে তারই পক্ষে একরকম হওয়া কিছুটা সাজ্‌ত যদি সে পাগল বা "ছাগল" (idiot) হ'ত। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্না মা দিদিমা শ্বাশুড়ী ইত্যাদিকে বাড়ীতে দেখ্‌ছে এমন মেয়ের বুদ্ধির কল্পনা করাও সেই পুরুষেরই সাজে, যাঁর বাহিরের ঘরে তাসের আড্ডাটা স্ত্রীর হাতের চা মিঠাই আর সাজা পানের জোরেই অবাধে অবিরাম গতিতে চলে আসে।

শিক্ষিতাকে ছোট করলেই কি অশিক্ষিতার গৌরব বেড়ে যায়? তবে এই নিতান্ত হাস্যকর, নিজেদের সঙ্কীর্ণ মনের পরিচায়ক এই হীন প্রয়াস বারবার কেন?

এটা ঠিক, বি, এ, এম, এ; পাশ করাই শিক্ষিতার লক্ষণ নয়—ইংরাজিতে culture বা refinement যাকে বলা হয়, ডিগ্রী পেলেই যে তা পাওয়া যাবেই এ কথা বলা যায় না—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের পাশ করা অনেক ছেলে। কিন্তু একজন শিক্ষিত ছেলে নারীর সম্মান রেখে চল্‌তে জানে না বলেই যে সকল শিক্ষিত ছেলেই জানে না এটা যেমন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নয়, তেমনি কোন পাড়ার একটী শিক্ষিত বৌ রাঁধতে জানেন না বলে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারিণী আর ৩৯৯টি মেয়ে রাঁধতে জানেন না—এ প্রমাণ হয় না। আমি বেথুন কলেজে পড়া ১৮৮টি ডিগ্রীধারিণীর মধ্যে ৮৬ জনকে জানি, ঘর কন্নার সকল রকম কাজই যাঁরা জানেন এবং পাঠ্যাবস্থায়ও সম্পন্ন করেছেন।

শিক্ষা আমাদের যে রকম হওয়া উচিত সে রকমটা হচ্ছে না—সে তো শুধু মেয়েদের বিষয়েই নয় ছেলেদের বিষয়েও সমান সত্য। তার জন্য যাঁরা শিক্ষা লাভ করতে চাচ্ছেন তাঁরা দোষী নন, যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের দোষ থাকলেও সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই শৈশব অবস্থায় অনেক ভুলচুকের মধ্যে দিয়েই, অনেক উঠে পড়েই তাকে দাঁড়াতে হবে; কাজেই অকারণ গালি গালাজ ত্যাগ করে—দাঁড়াবার চেষ্টার দিকে মনোনিবেশ করলে শক্তি, সময় এবং বোধ হয় অর্থেরও অপব্যবহার হয় না। দেশের দেহও সতেজ নূতন চিন্তার রক্ত ধারায় সুস্থ নিরাময় হয়ে ওঠে।

'সোনার বাঙলা' শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

খদ্দরের উপায়।

—:o:—

খদ্দর বুঝি আর টিকে না। বাজারে খদ্দরের কাট্‌তি একেবারেই কমে গেছে, বাংলায় যে সব তাঁত দিবারাত্র ঠক্ ঠক্ করে জাতির জেগে থাকার লক্ষণ প্রকাশ করছিল, এখন সব স্তব্ধ। আমাদের হাড়েও ঘুণ ধরছে, তাঁতগুলিও উয়ে কাটছে, কংগ্রেসের টাকা যাঁদের হাতে আছে তাঁরা কোন গতিকে জোলা দিয়ে, খদ্দরের অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছেন, কিন্তু জাতিকে যদি স্বদেশী করে তোলা না যায়, চেষ্টা করে আর কতদিন জেদ বজায় রাখা যাবে?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল স্বদেশী। দেশকে স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করাই তখন একমাত্র প্রচার ছিল, কোথা থেকে যে প্রয়োজন মত বস্ত্র সরবরাহ হবে, সে দিকে স্বদেশীর পুরোহিতবৃন্দ দৃষ্টি দেন নি, সে সুযোগে, বোম্বায়ের ব্যবসায়ীগণ দু পয়সা করে নিলেন, তাও ম্যানচেষ্টারের সূতায়, কাপড়ের গাঁটে স্বদেশী মিলের মার্কা থাকলে যথেষ্ট হতো, দেশের লোক সেদিনও, দেশের নামে ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নি।

আজ স্বদেশী প্রচারের সঙ্গে, নেতৃবৃন্দ, বস্ত্র উৎপন্ন করার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন, আশার কথা। কিন্তু এখনও আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা চরকায় সূতো কেটে, স্বদেশী-ব্রত উদযাপন করতে পারব কিনা?

শুনতে পাই এদেশে তুলা যথেষ্ট হয়, সূতা প্রস্তুত করাও অসম্ভব নয়, দেশে বস্ত্র ব্যবহারও ফুরাবে না, এই অবস্থায়, বঙ্গলক্ষ্মীর মত, আরও বড় বড় কল নির্ম্মাণ হলে, যদি চরকায় আমরা কৃতকার্য্য না হই, এতদ্দ্বারা স্বদেশীর প্রাণরক্ষা হতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্তে আসতে হলে, একবার প্রাণপণ করে দেখা উচিত চরকায় আমরা বস্ত্রসমস্যা দূর করতে পারব কিনা?

আমাদের মনে হয়, চরকায় সূতা কেটে কাপড় বুনে এত বড় দেশের বস্ত্রাভাব দূর করতে হলে, এক অসাধারণ উপায় অবলম্বন করতে হবে, আর সে উপায়টা অর্থকরী তো

নয়, পরন্তু কৃচ্ছ্র তপস্যামূলক। কেন না, সূতার মজুরি যুগিয়ে যদি বস্ত্র বুনা হয়, তা হ'লে বস্ত্রের মূল্য কোনমতেই, আমরা বিলাতি কাপড়ের তুলনায় কম করতে পারবো না, আর দেশের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, শারীরিক শ্রম দিয়ে দেশের কাজে মরণকেও মেনে নিতে অনেকে রাজী হতে পারে, কিন্তু অর্থ দিয়ে দেশসেবা একপ্রকার অসম্ভব। ভগবানের দেওয়া শরীর যখন আছে, তখন দধীচির মত তা দিয়ে যদি শত্রুবধের বজ্র নির্ম্মাণ হয়, অনেক দধীচির সন্ধান পাওয়া যায়, এই লক্ষ্মীছাড়া জাতির এমনই অর্থহীন অবস্থা, অর্থ দিয়ে দেশপ্রীতি রক্ষা দূরের কথা—এক প্রকার অসাধ্য বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

আজন্ম দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ সংকল্প নিয়ে অনেক তরুণকে দেখি, পরিধেয় বস্ত্রখানি কিন্তু তাদের খদ্দর নয়, তার কারণ উলঙ্গ থাকার দায় থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে, যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে একখানা বস্ত্র খরিদ কালে, স্বদেশীর বিচার করতে পারে না, কাজেই বলতে হয়, খদ্দরের মূল্য যথেষ্ট চড়া হ'লে দেশের লোককে তা ব্যবহার করতে বাধ্য করা যায় না।

তবে উপায় কি? আমরা বলি, দেশের মা বোনেরা চরকা যদি ধরেন, সখের দায়ে নয়, একযোগে, তা হলে কি হয় বলা যায় না, দেশ যদি জাগে তা হলে একযোগেই জাগ্‌বে, দেশের প্রাণ বল্‌তে কেবল তুমি আমি নই, সে হচ্ছে একটা অখণ্ড সামগ্রী, সে প্রাণ কি জেগেছে! তা যদি জাগ্‌তো তা হলে এই স্বদেশব্রত পালনে আমাদের নারী-শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ দেখতুম।

উর্ব্বরা সোণার বাংলায় গৃহস্থের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে অতি সহজে কার্পাস বৃক্ষ জন্মে, বৎসরে দুইবার তুলা উৎপন্ন হয়, প্রতি গৃহকর্ত্রী যদি হরিনামের মালা (?) ছেড়ে, দিবানিদ্রা শিকায় তুলে, পরকুৎসায় সময়ক্ষেপ না করে' এই কর্ম্মে উদ্যত হন আর সেই গৃহপ্রস্তুত সূতায় প্রতি বাড়ীতে একখানি করে তাঁত চলে, তা' হলে উঠানের এককোণে অল্পায়াসে যেমন লাউ কুমড়া বেগুন প্রভৃতি প্রতিদিনের আনাজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই বিনা ব্যয়ে বস্ত্রাভাব দূর করতে পারে। কতখানি প্রাণ থাকলে ভাবতে যা সহজ,—কাজেও তা সহজ হবে, মায়েরা বোনেরা সে কথাটা ভেবে দেখবেন কি?

'নবসঙ্ঘ'

———

মোগল-সন্ধ্যা।

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল রাজপ্রাসাদ।

কাল—অপরাহ্ন।

ফরাকসিয়ার, হোসেন আলি খাঁ, আবদুল্লা খাঁ ও প্রেমদেব।

সিয়ার। সন্ন্যাসি! তোমার কি প্রয়োজন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ?

প্রেমদেব। হাঁ শাহজাদাপুত্র আমি প্রভাত হতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার সাক্ষাৎ পাবার জন্য রাজবাটীর দেউরীতে বসেছিলুম, প্রহরীরা আমায় প্রবেশ করতে দেয় নি।

হোসেন। তুমি দুঃখিত হয়ো না, সন্ন্যাসি।

প্রেমদেব। দুঃখিত কি আর হব সুবাদার। স্বদেশে প্রবাসী আমরা, আপনাদের উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত অখাদ্য অংশটা দিয়ে জীবন ধারণ করছি, সুখ দুঃখের বোধটা হারিয়ে ফেলেছি, অপমান লাঞ্ছনা সে ত আমাদের দৈনিক বরাদ্দ এতে দুঃখিত কেন হব?

সিয়ার। তোমার কি প্রয়োজন বল?

প্রেমদেব। আজ একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, হৃদয় শক্ত করুন, তা না হলে ভেঙ্গে পড়বেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে এ সুদীর্ঘ পথ আমি অশুভশংসী পেচকের মত একরকম উড়ে এসেছি কোথায়ও একটু বিশ্রাম করি নি।

সিয়ার। যুদ্ধক্ষেত্র? সুবাদার! পিতার সঙ্গে কি কারও যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা ছিল?

হোসেন। হাঁ, সিয়ার।

সিয়ার। এ খবর আমাকে আগে দেওয়া হয় নি কেন?

হোসেন। শাহজাদার আদেশ মতই এ খবর আপনাদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে।

সিয়ার। পিতার আদেশ! যাক্ কি খবর তুমি নিয়ে এসেছ—সন্ন্যাসি?

প্রেমদেব। আমি যুদ্ধের খবরই এনেছি। আমি গিয়েছিলাম বাঙালী সৈন্যের বীরত্ব স্বচক্ষে দেখতে আর আহত সৈনিকদের সেবা করতে।

সিয়ার। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে, না পরাজয়?

প্রেমদেব। পরাজয়।

হোসেন। পরাজয়! তবে শাহজাদা আজিম্ এখন কোথায়?

সিয়ার। বল সন্ন্যাসি! পিতা এখন কোথায়?

প্রেমদেব। আমি রাত্রিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখতে পাই তিনি আহত হয়ে একাকী পড়ে আছেন—জ্ঞান ছিল কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না—আমার জলপাত্র হতে এক অঞ্জলি জল তাকে পান করালুম, তারপর—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আপনাদের সে কথাগুলি বলতে এসেছি।

সিয়ার। তোমার সে কথা পরে শুনব। বলো, পিতা জীবিত আছেন ত?

প্রেমদেব। জানি না। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে এল, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন; আমার পাত্রের জলও ফুরিয়ে এল। জল আনতে একটু দূরে গিয়েছিলাম; ফিরে এসে দেখি তিনি সেখানে নেই। জলপূর্ণ পাত্র হাতে নিরাশ হৃদয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু পরেই আমার এক শিষ্যের সঙ্গে দেখা হল। সে আমায় বলল যে এক শাহজাদা আর এক সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের সে ঐ দিকেই যেতে দেখেছে।

সিয়ার। তবে তারা পিতাকে বন্দী করেই নিয়ে গেছে, হোসেন আলি খাঁ। সন্ন্যাসি, কে যুদ্ধে এসেছিল জান?

প্রেমদেব। শাহজাদা জাহান।

সিয়ার। জাহান পিতাকে বন্দী করেছে? অকৃতজ্ঞ জাহান ভুলে গেছে পিতা তাকে কত স্নেহ করতেন। হোসেন আলি খাঁ! আপনারা এখনও চুপ করে রয়েছেন, আপনারা না পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী!

আবদুল্লা। তাইত, কি করা যাবে ভাবছি—পরাজয় হয়েছে—শাহজাদা আজিম বন্দী হয়েছেন। সময় বড়ই খারাপ পড়েছে,—সিয়ার! প্রতিকার একরকম কিছুই দেখছি না।

সিয়ার। (হোসেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া) আপনারও কি এই মত—?

হোসেন। না সিয়ার! শাহজাদাকে উদ্ধার করতেই হবে। আবদুল্লা! অনেক নিমক খেয়েছ এখন শোধ করবার সময় এসেছে—

আবদুল্লা। সে বুঝি হোসেন কিন্তু কি করে শোধ করবে,—উপায় ভেবেছ কি?

হোসেন। যুদ্ধে নামতে হবে। সৈন্য সংগ্রহ করে দিল্লী আক্রমণ করতে হবে—

আবদুল্লা। হোসেন! তুমি পাগল হয়েছে মুষ্টিমেয়, অশিক্ষিত কতকগুলি সৈন্য নিয়ে মোগলের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া একটা ঘোরতর পাগলামি।

হোসেন। একটুও পাগলামি নয়, আবদুল্লা! তুমি এখন যেটা অসম্ভব বলে ভাবছ তাকে সম্ভবে পরিণত করবই করব। চাই শুধু অপ্রতিহত মনের বল আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ দুটোতে হোসেন কারো চাইতে কম নয়। সবই আমি করব তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সিয়ার! প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় আমি দিল্লীর সিংহাসনে নিশ্চয়ই বসাব।

সিয়ার। সুবাদার! পিতাকে উদ্ধার করতে হবে।

আবদুল্লা। প্রতিজ্ঞা করাটা বড়ই সোজা—হোসেন! শুধু কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেই হল কিন্তু পালতেই যত অসুবিধা ও বাধা এসে পড়ে। তবে——কিনা, সিয়ার! যদি আমার একটা সাধ তুমি পূর্ণ করতে সম্মত হও তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

সিয়ার। বলুন আপনার কি সাধ।

আবদুল্লা। জুলেখা আমার প্রাণের চেয়ে আদরের মেয়ে তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।

সিয়ার। আমি রাজী আছি, সুবাদার!

হোসেন। বেশ কথা! এখন ত তোমার কোনও আপত্তির কারণ নেই—

আবদুল্লা। না হোসেন!

হোসেন। সন্ন্যাসি, রুস্তম কোথায়?

প্রেমদেব। জানি না, বোধ হয় তাকেও বন্দী করে নিয়ে গেছে। মারবার রাজ অজিতসিংহ একজন অধীনস্থ সামন্তরাজকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়াছিলেন, তিনি অসীম

বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ের কোনই সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে দেশের দিকে প্রস্থান করেছেন।

হোসেন। ভালই হয়েছে, রাজপুতবীর কখনই এ পরাজয় সহ্য করবে না, তা হলে মারবারাধিপতি অজিতসিংহের সাহায্যও আমরা পাব। সন্ন্যাসি, তুমি এখন যাও বিশ্রাম করগে। আর কিছু কি বলবার আছে?

প্রেমদেব। হাঁ সুবাদার। রাত্রির সেই গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে তিনি বলতে লাগলেন "হোসেন আর আবদুল্লাকে বলো তাদের হাতে বিশ্বাস করে আমি সিয়ারকে সঁপে দিয়ে গেছি। সিয়ার যেন সকল কাজেই হোসেনের পরামর্শ মত চলে।"

সিয়ার। সন্ন্যাসি, সিয়ার পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তুমি এখন যাও,—বিশ্রাম কর।

(প্রেমদেবের প্রস্থান।)

আবদুল্লা। হোসেন কাজটা ভাল হোল না। সন্ন্যাসি সকল কথা প্রকাশ করে দিতে পারে, তবে সব শ্রম ব্যর্থ হবে।

হোসেন। কোন হ্যায় রে—

প্রহরী। হুজুর— (সেলাম করিয়া অবস্থান)

হোসেন। ঐ সন্ন্যাসিকে এখনই বন্দী করে নিয় এস।

প্রহরী। যো হুকুম (সেলাম করিয়া প্রস্থান।)

আবদুল্লা। ঐ কাফেরদের কোনদিনও বিশ্বাস করবে না। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যতটা খাতির রাখা দরকার কেবল ততটা করবে।

(প্রহরী ও প্রেমদেবের প্রবেশ)

হোসেন। সন্ন্যাসি, তোমায় বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে সে আশঙ্কায় তোমাকে বন্দী করছি। যতদিন সৈন্য নিয়ে আমরা দিল্লীর দিকে না যাত্রা করি ততদিন তোমায় কারাগারে থাকতে হবে।

প্রহরী। সেলাম, সুবাদার সাহেব। বান্দা দেখেছে এ দুষমণ বাইরে গিয়েই একটা লোকের সঙ্গে চুপি চুপ কি আলাপ করছিল।

প্রেমদেব। চুপ্ কর, মিথ্যাবাদী।

সুবাদার সাহেব, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—আমার বন্দী করবার হুকুম দিয়েছেন ঠিকই করেছেন। আপনারা এসেছেন বিদেশে থেকে, দেশজয় করেছেন, রাজ্যশাসন করবেন। শুধু পাওনার দাবীটাই ভাল করে বুঝবেন, দেবার কর্ত্তব্য কোথায়? আপনারা রাজা আর আমরা প্রজা এ সম্বন্ধের মাঝে. সহানুভূতি দয়া মায়া একটুও নেই, যা আছে সে শুধু অবিশ্বাস ঘৃণা আর কঠোরতা। কিন্তু একটু বিশ্বাস করলে ভাল করতেন। আপনাদেরই বা দোষ দেব কি? এই দেখুন আমারই স্বদেশবাসী, আপনাদের কাছ থেকে একটু কৃপার ভিখারী; তাই আজ অম্লান বদনে একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলল। (প্রহরীর হাত ধরিয়া) কেন মিথ্যাকথাটা বলে আজ তোকে এমন করে নাবিয়ে দিলি—আমরা যে একই মায়ের ছেলে, তোর সঙ্গে আমার প্রাণের টান রয়েছে আয় আমরা দুজনে হাত ধরে দাঁড়াই।

(হোসেনের প্রতি)

বিশ্বাস করতে শিখুন, সুবাদার! তা না হলে দেশে যে বাতাস এসেছে, সে বাতাসে ঐ সাম্রাজ্য ধূলিমুষ্টির মত উড়ে যাবে।

পট পরিবর্ত্তন।

স্থান—চিনকালিচ খাঁর বাসভবন।

সময়—রাত্রি—প্রথম প্রহর।

(গান)

লয়লা। আকুল অন্তরে ওগো একি মম হোল?
দূরে যে রয়েছে প্রিয়, কেন জোছনা আলো?
একা, একা, একা রজনী পোহালো
কই প্রিয়তম মিছে এই মালিকা
শুকাল কলিকা ব্যাকুল বালিকা
জলভরা আঁখি কালো॥

আজ দাদামশায়ের কাছে শুনেছি জাহান যুদ্ধ হতে ফিরেছে, নিশ্চয়ই সে বড় ক্লান্ত তাই আসে নি—যদি সে একবার আসত তবে সিয়ারের খবরটা বোধ হয় পাওয়া যেত—সিয়ারকে ত যুদ্ধের ভেতর কেউ দেখে নি—সে তবে কোথায় গেল? যেখানেই সে থাক, তাকে ভাল রেখো—খোদা।

(জাহানের প্রবেশ)

জাহান। কার জন্য প্রার্থনা করছিলে, লয়লা? আমার জন্য বোধ হয়?

লয়লা। (একটু লজ্জিত হয়ে)—তোমার জন্য কেন করব, জাহান? তুমি ত যুদ্ধ জয়ী হয়ে এসেছ যারা হেরেছে তাদের জন্যই প্রার্থনা করছি।

জাহান। তবে আমার জন্যও একটু করো লয়লা।

লয়লা। কেন, তোমার সুখের ভরা আরও সুখে ভরতি করতে!

যারা সংসারে কষ্ট পায় তাঁদের জন্যই আমার প্রাণ কাঁদে। তোমার ত কোনঃ দুঃখ নেই জাহান—তুমি জয়লাভ করে এসেছে—

জাহান। না লয়লা—এ যুদ্ধে সব চাইতে বড় পরাজয় আমার হয়েছে—এ সংসারের জুয়াখেলার ঘরে আমার সব চাইতে বড় জিনিষটা ধরে ছিলুম—আমি সব হারিয়েছি।

লয়লা। সে কি—তুমি কি হারিয়েছো, জাহান? তোমার কথা হেয়ালীর মতো লাগছে যে?

জাহান। শুনবে, শুনবে—আমার কি হারিয়েছে। আমি এই প্রকাণ্ড মোগল-সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার লোভে প্রলুব্ধ হয়েছিলুম। জাহান্দার আমায় বলেছিল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পর আমার অভিষেক হবে, তাই স্বেচ্ছায় উৎসাহী হয়ে আমি যুদ্ধে গিয়েছিলুম। সেখানে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা সব বলি দিয়ে এসেছি—ভ্রাতৃরক্তে হাত কলঙ্কিত করেছি—উঃ—কি দুরপনেয় কলঙ্ক সমস্ত সাগরের জলেও প্রক্ষালিত হবার নয়।

লয়লা। এ লোভে তুমি কেন পড়লে জাহান! সত্যি, এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হয়েই এসেছ।

জাহান। এ লোভে আমি কেন পড়লুম? তোমার জন্য লয়লা—শুধু তোমার জন্য—

লয়লা। আমার জন্য?

জাহান। হাঁ, তোমাকে এই মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করবার জন্য—আমার প্রেমের উপহার ঐ কোহিনূরমণি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবার জন্য।

লয়লা। তুমি ভুল করেছ, জাহান—মস্ত ভুল করেছ।

জাহান। হাঁ আমি ভুল করেছি—লয়লা! আমি কেন ও কথায় বিশ্বাস করলুম—আমি প্রতারিত হয়েছি—জগতের অর্দ্ধেক লোকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি—কি ভয়ানক প্রতারণা!

লয়লা। সে ভুলের কথা আমি বলছি না—তুমি আরও ভুল করেছ—তুমি প্রেমও বোঝ নি আমাকেও বোঝ নি।

জাহান। কেন?

লয়লা। জাহান—জেনো—যথার্থ প্রেম রিক্ততাকেও বরণ করে সুখী হ'তে পারে—সংসারের—সুখে যেটুকু 'কম্‌তি' পড়ে, হৃদয়ের পূর্ণতা দিয়ে সে তাকে 'ভরতি' করে দেয়।

জাহান। তবে পুরুষের শৌর্য্য নারীর ঐ কমনীয় দেহটাকে সাজাবার জন্য সংসারের আহবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কেন লয়লা?

লয়লা। সে পুরুষের অহঙ্কার,—পুরুষের ধর্ম্ম।

জাহান। তবে তুমি আমার হৃদয়ের পূজাটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে লয়লা?—

লয়লা। তাই বলেছিলাম তুমি আমাকেও বোঝ নি, জাহান। তোমার ভালর জন্যই তোমাকে এ কথাটা আজ আমার বলতে হবে। আর যেন ভুল করে—মনুষ্যত্বকে খাটো না কর। আমার জন্য তোমার জীবনের আদর্শটা হ'তে চ্যুত হয়ো না।

আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি—প্রেমের বিনিময়ে যে ত্যাগটা করতে পারা যায় জাহান সে ত্যাগ তোমায় আমি শ্রদ্ধার বিনিময়ে করতে দেবো না।

জাহান। লয়লা, কি বল্লে, তবে একি শুধু শ্রদ্ধা।

লয়লা। হাঁ জাহান—তুমি কষ্ট পাবে তবুও তোমায় বলতে হচ্ছে—তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি—কিন্তু—

জাহান। আর না—থামো—চোখ পুড়ে যাবে স্পষ্ট করে জানবার অত আলো আমার এ চোখে সহ্য হবে না—

ভক্তি! শ্রদ্ধা! আমি চাই না—কি মূল্য এর আছে—সেদিনকার যুদ্ধে আমি গলা চেপে এদের নাশ করে এসেছি যদি পার প্রেম দাও।

(তরবারির উপর হস্তার্পণ)

এ দুখের জগৎকে সৃষ্টি করে, খোদা! তোমার এ খেলা খেলবার—কি প্রয়োজন ছিল।

(একটু নিম্ন স্বরে)

লয়লা! এ কথা তুমি আমায় কেন জানালে—আমি মিথ্যা নিয়ে ছিলাম মিথ্যা নিয়েই থাকতুম—আমি ভুল করেছি সমস্ত জীবনটা আমার—ভুল করেই কেটে যেত কি ক্ষতি তোমার ছিল—একটা শান্তি তাও কারো সহ্য হল না।

লয়লা। ক্ষমা করো জাহান আমি তোমার ক্ষমা চাচ্ছি।

জাহান। ক্ষমা! আজ জগতে সকলকেই ক্ষমা করতে পারব, লয়লা—কিন্তু একজনকে নয়—এ দুনিয়াটাকে সৃষ্টি করেছে সে সেই নিষ্ঠুরকে।—

দুষমন্‌—যদি প্রাণ দিয়েছিলে তবে ব্যর্থতা সৃষ্টি করলে কেন—ভবিষ্যৎকে যদি এত ভীষণ করে রেখেছ তবে প্রাণে আশা দিয়েছ কেন—তোমার খেলবার সাধটা মেটাবার জন্য নয়? ভাঙা হৃদয়ের পাহাড় গড়ছ, চোখের জলে সাগর তৈরী করছ—আর—বেদনার আর্ত্তধ্বনির সঙ্গে তোমার কৌতুকের অট্টহাসি মিলিয়ে বীণার ঝঙ্কারের সৃষ্টি করছ।

তোমার এ খেলার আমোদটুকু আজ আমি আর হতে দিচ্ছি না লয়লা! এ কি তুমি কাঁদছ এ কিসের জন্য—দয়া!

আমার কোনই দুঃখ নেই হৃদয় পাথর করেছি—

(জুলফিকার খাঁ ও হামিদ খাঁ কতিপয় সৈন্য নিয়ে প্রবেশ)

(জুলফিকার খাঁ)—এই যে, হামিদ বন্দী করো—

জাহান। কে জুলফিকার খাঁ? আমায় বন্দী করতে এসেছ বাদশার হুকুম তামিল করতে এসেছ।

(তরবারি কোষমুক্ত করণ)

না, (তরবারি দূরে নিক্ষেপণ)

এসো, এই নাও—(হস্ত প্রসারিত করে দেওয়া)

জুলফিকার খাঁ, এ জগতের সঙ্গে হিসাব নিকাশ সব শেষ করে ফেলেছি—তোমাকেও ক্ষমা করেছি কিন্তু একজনকে পারি নি—

(লয়লার প্রস্থান)

(চিনকালিচ খাঁর প্রবেশ)

চিনকালিচ। এ কি! জুলফিকার তুমি এখানে।

জুলফিকার। বাদশার আদেশে বিদ্রোহ করবার আশঙ্কায় জাহানকে বন্দী করতে এসেছি খাঁ সাহেব।

চিনকালিচ। বাদশার আদেশে জাহানকে বন্দী করা—কিন্তু আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এ আদেশ পালন করবার হুকুমও কি বাদশাই দিয়েচেন ?

হামিদ খাঁ। বাদশার আদেশ সব স্থানেই পালন করা যায়।

চিনকালিচ। চোপরাও হামিদ কি জুলফিকার চুপ করে রইলে যে ? অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার অধিকার বাদশার নিজেরও নেই। সম্রাট জাহান্দারকে বলো এ অপমান চিনকালিচ খাঁ কখনও সহ্য করবে না—আর তোমায় বলছি জুলফিকার খাঁ তোমারও সময় হয়ে এসেচে—যাও শীঘ্র বেরিয়ে যাও।

প্রস্থান। (পটনিক্ষেপ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—যোধপুর, কাল অপরাহ্ন।

অজিতসিংহ ও রাজসিংহ।

অজিতসিংহ। বাংলা হতে হতভাগা আজিমের পুত্র এই যে পত্র পাঠিয়েছে—

(রাজসিংহের হস্তে পত্রার্পণ)

তার নামটা যেন কি ভুলে যাচ্ছি।

রাজসিংহ। ফরাকসিয়ার।

অজিতসিংহ। হাঁ, ফরাকসিয়ার। আচ্ছা, রাজসিংহ তাকে তুমি দেখেছ ?

রাজসিংহ। না। মহারাজ—সে ত যুদ্ধক্ষেত্রে আসে নি, শাহজাদা আজিম তাকে বাংলায় রেখে এসেছিলেন।

অজিতসিংহ। কতটা বয়স তার হবে এখন জান ?

রাজসিংহ। না।

(অজিতসিংহের হস্তে প্রত্যর্পণ)

অজিতসিংহ। রাজসিংহ—আমিই এবার যুদ্ধে যাব, তোমায় এখানে থেকে রাজ্যরক্ষা করতে হবে। একবার পরাজিত হয়েছি সত্য কিন্তু আমি নিরাশ হই নি—দেখব এবার ভারতের অদৃষ্ট গতি একটা নূতন দিকে চালিয়ে দিতে পারি কি না ?

হোসেন আলি খাঁ আর আবদুল্লা খাঁ কে বলতে পার।

রাজসিংহ। শুনিছি এরা সৈয়দবংশীয় মুসলমান শাহজাদা আজিমের অধীনস্থ বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার।

অজিতসিংহ। বেশ। রাণা অমরসিংহ আবার মিলিত হবার জন্য আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছেন—বড়ই কঠিন সমস্যা এসে পড়েছে। কর্ত্তব্য অবধারণ বড়ই শক্ত। আমি রাণাকে লিখে দিয়েছি শাহজাদা আজিমের পুত্র ফরাকসিয়ারকে সাহায্য করবার জন্য আমি সসৈন্যে আগ্রার দিকে চলেছি। সে যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমি সেখান হতে ফিরে এসে তারপর পারমর্শের জন্য মিলিত হব।

রাজসিংহ। মহারাজ! আমার একটা নিবেদন আছে।

অজিতসিংহ। কি, বল।

রাজসিংহ। আপনার অনুপস্থিতিতে দেওয়ান রঘুনাথ আর যুবরাজ অভয়সিংহ রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব এই আমার প্রার্থনা।

অজিতসিংহ। পরাজয়ে তুমি মর্ম্মাহত হয়েছ রাজসিংহ। এ যুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমায় প্রণষ্ট গৌরবটা পুনরুদ্ধার করবার সুযোগ আমি তোমায় দেব, তা না হলে তোমার প্রতি অবিচার করা হবে। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

(দুর্গাবতীর প্রবেশ)

(রাজসিংহ প্রস্থানোদ্যত)

দুর্গাবতী। যেয়ো না, রাজসিংহ! দাঁড়াও মেবার হতে আসবার পথে এ কি শুনলুম, মহারাজ! রাজসিংহ! এ কি সত্যি ?

অজিতসিংহ। হাঁ রাণী, আমাদের পরাজয় হয়েছে।

দুর্গাবতী। তুমি মাথা নীচু করে রইলে কেন রাজসিংহ? এ পরাজয়ের জন্য দায়ী তুমি নও।

মহারাজ! আজ এ কোন্ গৌরবের মুকুট তুমি আমার জন্য আহরণ করেছ? মোগলের দাসত্ব আবার তার উপর এই পরাজয়! উঃ এ কি অলঙ্কার তুমি আমায় পরিয়েছ। এর বিষের জ্বালায় আমার সমস্ত শরীর যে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমি বলেছিলাম মহারাজ এ যুদ্ধে যাবার কোনই দরকার নেই, মোগলের জয়ে রাজপুতনার কি স্বার্থ? এ অপমান তুমি স্বেচ্ছায় বরণ করেছো!

আমি মেবারের রাজকন্যা—আমি যে বংশে জন্মেছি সেই শিশোদীয় বংশ কোনও দিন মোগলের দাসত্ব করতে যায় নি, পেরেছে ত সমস্ত জীবন যুদ্ধ করে প্রাণপাত করেছে। তোমার এ পরাজয়ে আমার কোনও সহানুভূতি নেই—।

অজিতসিংহ। দুর্গাবতি! আজ তুমি আমায় যত কঠোর কথাই বলো, আমাকে নীরবে সহ্য করতেই হবে—কেন না আমার পরাজয় হয়েছে। কিন্তু এ পরাজয়ে আমি হতাশ হই নি। যে কাজটাকে আমি কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি সে আমি কখনই ছাড়ব না। তোমার শ্লেষ, তোমার পরিহাস আমার প্রাণে বিষম বেদনার সঞ্চার কর বটে কিন্তু যে ব্রত আমি হাতে নিয়েছি তা হতে আমায় নড়াতে পারবে না—এ তুমি ঠিক জেনো রাণি!

সংসার আমার শ্মশান হয়েছে—যে উৎস হতে কর্ম্মী পুরুষ মাঝে মাঝে কর্ত্তব্য পালনের শক্তি সংগ্রহ করে থাকে সে উৎস আমার একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে—যাক্ সব চুকে যাক্ শুধু আমি, আর আমার ব্রত।

রাজসিংহ। রাণি মা! আমি আবার যুদ্ধে যাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করুন এ যুদ্ধে যেন আমার জীবন দান করতে পারি—তবেই আমার এ কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

দুর্গাবতী। রাজসিংহ পরাজয়ের কথা বলেছি দুঃখিত হয়ো না। আশীর্ব্বাদ করি এ যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে।

রাজসিংহ। আপনার আশীর্ব্বাদে এবার আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।

(প্রস্থান)

অজিতসিংহ।—(একটু হাসিয়া) রাণি, মেঘ হতে বাজ এসে উঁচু গাছের চূড়াটাকেই মুষড়ে দিয়ে যায়, তাই তোমার যত বিরোধ সব আমার সঙ্গে, নয়?

(প্রস্থান)

দুর্গাবতী। ভগবান, এ তুমি আমায় কি করলে! আমার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কেন জাগিয়ে দিলে?

নারী করে সংসারে পাঠিয়েছ যদি তবে নারীর মনটা কেড়ে নিলে কেন,—স্বামীর ইচ্ছার অনুগমনই যে স্ত্রীর ধর্ম্ম এ শিক্ষা যে আমি ছোট বয়সে মার কাছে থেকে পেয়েছিলুম।

মহারাজা তুমিই না আমায় শিখিয়েছ যে নারীর একটা ভিন্ন অস্তিত্ব আছে—আমাকে তুমি সমান অধিকার দিয়েছ—আজ সে অধিকারের বলেই নিজের মনটা একটু একটু করে খুলে দিচ্ছি—দুজনের মাঝখানে এত বড় ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে যে তুমি তোমার সাধের সংসারকে আজ শ্মশান বলেছ।

না, আর এগোব না। যে শিক্ষায় সংসারে অশান্তি এনে দেয় সে শিক্ষা নারীর নয়।

ভগবান্! এ বিরোধ ঘুচিয়ে দাও আমি আর কিছু চাই না—সেই চোখে চোখে হাসিতে—, হৃদয়ের সুখের মিলনে, প্রেমের মধুরতায় জীবনটাকে সহজ সুখের করে দাও।

স্বামী আমার!

পটনিক্ষেপ।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মরণ আড়াল।

—:○:—

দশম পরিচ্ছেদ।

অতুলের অকাল মৃত্যু অলকার প্রাণে কি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলাম। সহানুভূতি জাগ্রত হইবার কারণ ছিল, ডাক্তারের প্রতিদিনের ব্যবহারে বুঝিতে হইতেছিল—অলকার ভবিষ্যত ক্রমেই গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার ভারি ব্যস্ত,—প্রায়ই গোপনে পরামর্শ চলিতেছে,—কি বিষয়ে আমার তাহা জানিবার উপায় নাই,—অপর পক্ষ কে তাহা অবগত নই,—তবুও কেন যেন মনে হয় অলকার অদৃষ্ট তাহাতে জড়িত। অসহায়া অলকা, সরলা বালিকা,—বাগুড়াবদ্ধ হরিণী—সে জানে না,—শোক হইতেও আরও কি ভীষণ মনঃকষ্ট তাহার অদৃষ্টে লিখিত আছে। অদৃষ্টের কঠিন কুলীশ ঘাতে জর্জ্জরিত আমি,—ভাগ্যচক্র কাহাকেও নিষ্পেষিত করিতে উদ্যত দেখিলে আমাকে আকুল করে। অনেক সময় মনে হয়—আমি যাহা জানি তাহা অলকাকে খুলিয়া বলি—সাবধান করিয়া দেই—কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল,—তাহাতে তাঁহার উপকার হইতে অপকারেরই সম্ভাবনা বেশী। ইচ্ছা হয় না আর এখানে থাকি—কিন্তু আমারও অবস্থা অলকারই মত,—ডাক্তারের পাশচ্ছেদ করিবার শক্তি আমার নাই।—সহ্য করিতেই হইবে! সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই কি পশুর মত নীরবে সহ্য করিব—বিনা বিচারে ডাক্তারের অঙ্গুলীহেলনে উঠিব বসিব,—আত্মরক্ষার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিব? এতই অসহায় হেয় হইয়াছি আমি! না, তাহা কখন হইতে দেব না,—প্রাণপণ—ডাক্তারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতেই হইবে। অলকা একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সহায়তা ভিক্ষা করিছিলেন আমি তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিব না। প্রকাশ করিয়া সমস্ত কথা বলিতে না পারিলেও--অলকাকে আমি আভাষে শক্ত হইতে বলি,--বৃথা বুঝাইতে চাই শোক করিবার এ সময় নহে তাঁর। সে সুযোগও এখন আমার কম! পুরাদস্তুর এখন আমাকে কাজ করিতে হইতেছে,—ডাক্তারের বিরাট কারবারের প্রধান কর্ম্মচারী আমি,—নিখিল বাবু

নাম মাত্র আমার উপরে। কাজ কম নয়,—প্রায় সমস্ত দিন খাটিয়াও পাড়ি জমান দায়,—অলকার নিকট বসিবার অবসর আমার কম,—কখন সন্ধ্যার পর একটু অবসর, সে সময়ই প্রায়ই নিখিল বাবুও উপস্থিত থাকেন,--বাজে গল্পগুজবে,—নিখিল বাবুর তরল হাস্যরসে সময়টা কাটিয়া যায়,—অলকার সহিত কোন গূঢ় বিষয় আলোচনা করিবার বা তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার সুবিধা কমই ঘটে।

ডাক্তারের সহিত এখন প্রায় কোন বিষয়ে আলোচনা হয় না বলিলেই হয়। সময় সময় তিনি আফিসে উপস্থিত হন--আমার কাজ কর্ম্ম দেখেন,--উপদেশ দেন--আমার কার্যপ্রণালীর অযাচিত উচ্চ প্রশংসা করেন—বস্তুতঃই আমি কর্ত্তব্যপালনে সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা করি কিন্তু তাহা বা ডাক্তারের প্রশংসা আমাকে শান্তি দিতে পারে না,—মনে হয় এ ভূতের বোঝা টানিয়া ফল কি! হয় ত এক দিন এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ঐশ্বর্য্যবান হইব—সে ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণে শান্তি কোথায়,—অজ্ঞাতনামা কুলাঙ্গার আমি, স্বজনস্নেহবঞ্চিত হতভাগ্য—অদৃষ্টের দাস—অর্থে আমার প্রয়োজন! যে অর্থে ইচ্ছানুযায়ী একটি অসহায় প্রাণীর উপকার করিবার সাধ্য নাই,—সে অর্থের উপকারিতা কি?—কিসের মোহ?—যে অবস্থা, সংসারে আমার প্রিয়তম যে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—সে অবস্থা কিসে প্রার্থনীয়,—শ্লাঘ্য কিসে! চায় না মন অর্থ—চায় না মন পালিত পশু অধিকার,—পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী পালকের অপরিমেয় আদর,—মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া শিরে বারিসিঞ্চনে মঙ্গলের বাহ্যিক-অভিনয়—দেখিতে বেশ—প্রাণরক্ষা হয় কি?

প্রাণ কাঁদে অতীত ফিরিয়া যাইতে, বর্ত্তমানকে ছাঁড়িয়া ফেলিয়া আত্মভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে, নিজেকে ফিরিয়া পাইতে; মনে হয় এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া পলায়ন করি! দুর্দ্দম্য মনের বিদ্রোহভাব দমন করিতেই কার্য্যে নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করিতে প্রয়াস পাই—বৃথা চেষ্টা,—কে বলে, বাহিরের কাজ অন্তরকে জয় করতে পারে—কর্ম্মের মাদকতা আত্মবিস্মৃতি ঘটায় ক্ষণিকের জন্য,—ক্ষতস্থানে জিভ লাগিয়াই থাকে!

দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্ত পথিক ঐ নিজালয়ে ফিরিতেছে—দারিদ্রের শতচিহ্ন তাহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—আশঙ্কার সীমা নাই—দরিদ্র নিরন্ন গৃহী বুঝি,—তোমরা তাহার অবস্থাকে দুঃখের বলিবে,—না—বড়ই মধুর ঐটী, প্রাণের টানের অমন প্রকাশ আর কোথাও

নাই! ধনী বুঝে না প্রাণের মর্ম্ম—সে চায় অর্থ,—মনুষ্যের সুখ দুঃখ প্রাণের হিসাব তাহার প্রকাণ্ড লেজারে নাই। কার্য্যান্তে যখন শ্রান্তক্লান্তঅবসন্ন হইয়া বাসায় ফিরি, মনটা আমার হাহাকার করিয়া উঠে—কবে আবার দেখা হইবে—হইবে কি না জীবনে কে জানে—চন্দ্রমাহীন রজনী—ঘোর অন্ধকার!

অফিস হইতে ফিরিয়াই সে দিন শুনিলাম ডাক্তারের আহ্বান—বলিতে কি এখন তাঁহার আহ্বানে আমার প্রাণে আসে আতঙ্ক—তাঁহার আত্মীয়তায় জাগে আশঙ্কা!

ডাক্তার বিশ্রাম-কক্ষে একাকী,—সাধ্য নাই কাহারও তাঁহার বিনা আহ্বানে নিকটে আসে—এ বিশ্রাম গৃহ নয়—আমার পক্ষে দ্বিতীয় কারাগার!

ডাক্তার পার্শ্বের চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "বসো নবকুমার,—খুব খাটছ দেখছি,—বেশ বেশ,—আমি লোক খুব চিনি—উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক তুমি,—তোমাকে দিয়াই আমার সব রক্ষা হবে—আমারই বা কি এসব—তোমাদেরই—তোমাকে আমি নিজের ছেলে বলেই জানি—এখন তোমাদের কাজ তোমরা কর—আমি দেখে সুখী!"

ভূমিকায় বুঝিতে বাকি থাকিল না—আরও বা কোন গুরুতর ষড়যন্ত্রে আমাকে অচিরে লিপ্ত হইতে হইবে। বলিলাম—"আপনার অনুগ্রহ!"

"অনুগ্রহ কেন বল—আমার কর্ত্তব্য। নিখিল আমার একমাত্র পুত্র—কিন্তু সে কাজ-কর্ম্মের কেউ নয়—সবে মাত্র তুমি—আমি তোমাকেই অবলম্বন করেছি—পুত্রের অধিক বিশ্বাস আমার তোমাতে—জানি আমি, তুমি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত! এমন অনেক কথা বলেছি তোমাকে—নিতান্ত আত্মীয় মনে না করলে যা অন্যের কাছে বলা চলে না। তুমি পুত্রের মতই আমার সাহায্য করেছ—তোমার পরামর্শেই আমি এত সহজে অতুলের মৃত্যুর কিনারা করতে পেরেছি,—বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—"

ভনিতা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল—আমি আত্মভাব গোপন করিয়া বলিলাম—"কেন আমায় লজ্জিত করছেন—কি করতে হবে বলুন, আমার সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও আপনার আদেশ পালনে ত্রুটি হবে না।"

"জানি,—কাজটা এমন কিছু নয় কিন্তু অতি গোপনীয়,—খুব সাবধানে করতে হবে—যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে, বুঝলে? একজনের জীবন মরণ নিয়ে সম্বন্ধ—দায়িত্বটা কম

নয়! রাজচন্দ্রকে তুমি নিশ্চয় জান,—তুমি জান আমি জানি,—অনেক কথাই তোমার আমি জানি—হঠাৎ এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ো না, রাজচন্দ্র আমার আত্মীয়,—আমি তার বাড়ীতে গিয়াছিও কয়েক বার,—তুমি তার প্রতিবেশী ছিলে,—তোমায় আর আমি জানব না। দেখ, বিধাতার কি খেলা,—কোন সূত্রে তোমাতে আমাতে এমন ভাবে ঘনিষ্ঠতা—বাপ আর ছেলের মত ঘটে গেছে,—তোমার পূর্ব্বের কথা জানাতে আমার পক্ষে ভালই হয়েছে, তোমাকে আরও আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পেরেছি। মনে একটুও দ্বিধা রেখ না—আমি তোমায় ছেলে না ভেবে পারি না,—আমার কাছে নিখিলের চাইতে কম স্নেহের বস্তু নও তুমি,—ছেলের কথা বাপে জানলে ভাল বৈ তাতে মন্দ হবার কিছুই নেই।"

"রাজচন্দ্র বড় বিপন্ন, একটা লোকের, একটা মতলবী পাগলের মাথায় ঢুকেছে রাজচন্দ্রকে খুন করতেই হবে—একদিন রাজচন্দ্রকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে নাই,—ভাগ্যে ভাগ্যে রাজচন্দ্র বেঁচে গেছে সে দিন। এ লোকটাকে কৌশলে সরাতে না পারলে রাজচন্দ্রের প্রাণ সংশয়! লোকটাকেও জান তুমি—তোমাদের গ্রামের সিংপাড়ার আব্বাস সর্দ্দার। ডাল-কুত্তাও আব্বাসের মত ভয়ঙ্কর হয় না—রাজচন্দ্রকে পেলে ছিঁড়ে ফেলে দেবে,—অথচ এই লোকটাই ছিল রাজচন্দ্রের অতি বাধ্য! হঠাৎ ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়,—তখন রাজচন্দ্র ওকে ঢাকা পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করে—ওর জন্য, ওর পরিবারের জন্য রাজচন্দ্রই যত ব্যয়বিধান করেছে, এখনও বোধ হয় করে কিন্তু লোকটার বিশ্বাস হয়ে গেছে উল্টা! আজকাল সব ডাক্তারও হয়েছে যেমন—একটা নতুন সাহেব ডাক্তার পাগলা গারদের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছে,—পাগলের প্রকৃতি সে বুঝে কি—বাহিরের কথাবার্ত্তা শুনে আব্বাস ভাল হয়ে গেছে ভেবে ওকে ছেড়ে দিয়েছে। দেখ না একের বুদ্ধির দোষে অন্যের কি ভয়ানক বিপদ!"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় আছে সে এখন? আমার সে চেনা লোক, পাছে, আমায় চিনে ফেলে—"

ডাক্তার বলিলেন "সে কথা কি আমি ভাবি নি? চিনতে পারবে না। কত দিন পূর্ব্বে সে তোমায় দেখেছে,—তখন ছিলে তুমি ছেলেমানুষ—পরিবর্ত্তন ত কম হয় নি, এ বেশে চিনতে পারবে না। আর তুমি নিজে তার কাছে যেতে যাচ্ছ কেন,—কৌশলে তাকে তোমার ফাঁদে ফেলতে হবে। সেইটার জন্যই তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলের দরকার—নৈলে

যাকে তাকে দিয়ে এটা হতে পারতো ! রাজচন্দ্র বা আমার সংস্রব এতে আছে—এটা ওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না, বুঝলে ? জান্‌লেই আরও বিপদ !"

বুঝিতে আমার বাকি নাই। জেল আমাকে অনেক বুঝাইয়াছে—ডাক্তারের সংস্রব জেলই হইতে আমায় কম বুঝায় নাই, বুঝিতে হইবে আরও অনেক। আমি প্রস্তুত ! দেখি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় ! বলিলাম—'না, সে জানাব কেন,—দেখা যাক।'

ডাক্তার আমার আরও নিকটে আসিয়া বলিলেন—"লোকটা খুনে, অতি ভয়ানক, খুব সাবধান,—কোন রকমে যেন ও সন্দেহ করতে না পারে; টাকায় সংসার বশ টাকার মায়া করো না—একের জায়গায় দু দিয়া ওকে বশ করে ফেলবে !

বলিলাম "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

"বেশ বেশ—তা হলে তুমি আজই মিক্সটে রওনা হচ্ছ। খবর পেয়েছি লোকটা এখনও ওর বাড়ীতেই আছে—সিংপাড়ায়। খুব সাবধানে সেখানে চলাফেরা কর্‌বে—সে তোমার দেশ—বিপদের আশঙ্কা কম নয় তা জান, তোমায় বল্‌তে হবে কি !"

"যে কাজ করতেই হবে—বিপদ বলে পেছপা হয়ে ফল কি তাতে,—আজ্ঞা করছেন আজিই রওনা হব। রাজচন্দ্র বাবুও কি বাড়ীতে ?"

"আরে না,—অত কাঁচা কি আমি—তাকে সরিয়েছি,—জেনে রাখ রাজচন্দ্র হতে তোমার বিপদ নাই,—সে সব আমি ঠিক করেছি—কখনও তোমাতে তাতে দেখাশুনা হয় যদি সে তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে বাধ্য হবে—সে জানে তুমি আমার লোক সাধ্য নাই তার তোমার শত্রুতা করে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে তুমি আজ তাকে বিপদমুক্ত করতে যাচ্ছ,—মানুষ হয়ে সে এত বড় মোটা কথাটা বুঝবে না !"

অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না—যাক্‌ সে কথা ! ও সকল কূট তর্ক মনে তুলিবার অবসর আমার নাই, প্রাণ তখন আমার উতলা বুকের রক্ত টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে ! আবার চলিয়াছি সেই দেশে—আমার দেশে—এই ভাবে ! আতঙ্ক না আনন্দ-শিহরণ, গমনের অনিচ্ছা না বিদ্যুদ্বেগে ছুটিবার আকাঙ্ক্ষা আত্মহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে আমাকে ! সংযত হইতে চেষ্টা করিয়া ডাক্তারকে বলিলাম—"তবে আজই,—গাড়ীর ত বেশী দেরী নাই,

সাড়ে আটটায়—আর কি কিছু বল্‌তে আছে ? লোকটাকে সরিয়ে দেবার কোন উপায় ঠিক করেছেন কি ? টাকার কথা বল্‌ছিলেন—টাকা দিলে সে বিদায় হবে কি ?""

ডাক্তার বলিলেন "পার ত ভাল।"

বলিলাম "পারবো মনে হয় না—যে কারণেই হ'ক্‌ ওর প্রাণে একটা তীব্র প্রতিহিংসার ভাব জেগেছে, টাকায় ওকে শান্ত কর্‌তে পারবে না, ওর মন ফিরাতে হবে অন্য ভাবে, বাঙ্গালী চায় চাকুরী—সব মোহ কাটে—বাঙ্গালী চাকুরীর মায়া ছারতে পারে না, ওকে একটা ভাল চাকুরীর প্রলোভনে দেশান্তরী কর্‌তে হবে—কিন্তু সেটার উপায় করি কি করে ! আপনি বল্‌ছেন আপনার কারবার সংস্রবে ওকে রাখা হবে না।"

"হাঁ, হাঁ ওটি করো না, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—একটা উপায় করতেই পারবে।"

বুদ্ধিমান নই আমি—কণ্টক উদ্ধারের কণ্টক,—কণ্টক উদ্ধার করিবই—কিন্তু ডাক্তার, পরকে বিপদগ্রস্ত করিয়া নিজের এ নিরাপদ হইবার চেষ্টা কয় দিন চলিবে ? বিষ, বিষনাশক হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বিষ প্রাণনাশক ধর্ম্ম হারায় না !

সেই রাত্রেই রওনা হইলাম, বিদায়ের পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল একবার অলকাকে বলিয়া যাই, নানা দিক চিন্তা করিয়া সে ইচ্ছা দমন করিলাম ! আমি নিজেই অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলিকা অন্যকে সাহায্য করিব কি প্রকারে ? ধিক্কার আসে প্রাণে,—শক্তিহীন—নামগোত্রহীন আমি আমার আবার জীবন ! এই জীবন লইয়া আবার চলিয়াছি,......কোথায় ?......কাহার কাছে ?—কি দেখিব কে জানে ?

ক্রমশঃ—

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—ঃ০ঃ—

বৃষ্টি সমভাবেই চলিতেছে। পরিমাণ ৫১.২৬ ইঞ্চি। গত বৎসর এ সময় ছিল ৪২.৯০ ইঞ্চি। অতিবৃষ্টিতে স্থানে স্থানে ধান্য ও পাটের ক্ষতি হইয়াছে। তরি-তরকারী দুর্ম্মূল্য। স্থানীয় মৎস্যের আমদানী নাই বলিলেই হয়। ভরসা চালানী ইলিশ, তাহাও অগ্নিমূল্য। সাধারণ ছোট

মাছ ৸০—১৲ সের। স্বাস্থ্য মন্দ নয়। গো-মড়ক কমিয়াছে। চাউল মোটা ৮০ তোলার মণ—৬৷৷ হইতে ৬৷০ টাকা।

এ দিকে বৃষ্টির বিরাম নাই, তাহাতে আবার পবন দেবের কৃপাও কম হয় নাই। বিগত ১ ই জুন তুফানগঞ্জ মহকুমায় প্রবল ঝড়ে বহু বৃক্ষ ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। তুফানগঞ্জ মহকুমার কাছারী গৃহের ছাদ সম্পূর্ণ উড়িয়া গিয়াছে; ডাক্তারখানা, স্কুল ও ছাত্রাবাস প্রভৃতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এ জন্য স্কুলের গ্রীষ্মের বন্ধ আরও ১৫ দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইয়াছে। এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায়ও কোন প্রাণহানি হয় নাই, ইহাই সুখের বিষয়।

আমাদের শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর নাবালক। এই কালে রাজকার্য্যের পরিচালনের জন্য ২১শে মে তারিখে রিজেন্সি কাউন্সিল (সহবরাহকারী মহামান্য রাজসভা) স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাণী মহারাজমাতা রিজেন্সি কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ও রিজেণ্ট, এইচ, জে, টোয়াইনৃয়্যাম এস্কোয়ার, বি, এ, আই, সি, এস্ ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ (মহারাজ পিতৃব্য) এবং শ্রীযুক্ত জগদ্বল্লভ বিশ্বাস এম-এ, বি-এল, সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রথিতযশাঃ ও সুযোগ্য ব্যক্তি, ইঁহাদিগের হস্তে রাজ্য পরিচালনভার ন্যস্ত হওয়ায় প্রজাকুল আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছে।

স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে বর্ত্তমান বৎসর হইতে বি, এসসি, ক্লাশ খোলা হইবে। ভিক্টোরিয়া কলেজ স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহার দ্বারা দেশ উপকৃত ও উন্নত হইতেছে। বাঙ্গলার বহু ছাত্র এ কলেজে অধ্যয়ন করে। এই কলেজ বিদ্যমান থাকায় রাজ্যের প্রকৃতিবর্গ ও কর্ম্মচারীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন। কলেজের এতদিন বি, এসসি, বিভাগ না থাকায় স্থানীয় অনেক ছাত্রকেই অন্যত্র ব্যয় বাহুল্যের জন্যই পাঠে বিরত হইতে হইত; সে অভাব নিরাকৃত হইলে স্থানীয় অধিবাসীবর্গের একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

বিদেশী কাপড়ের কাটতি কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু স্বদেশী বস্ত্রের দিকে লোকের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে আর সন্দেহ নাই। লোকের আর্থিক অবস্থা ও স্বদেশী জিনিষের দুর্ম্মূল্যতা এবং তাহারও সরবরাহের সুবন্দোবস্তের অভাবেই বিদেশী বস্ত্রের এত কাট্তির কারণ। সুখের বিষয় কোচবিহারে একটি বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অবসর কালে যুবকগণ এই বিদ্যালয়ে বস্ত্রবয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ও দেশজাত সূত্রে বস্ত্রবয়ন করিয়া দেশসেবায় নিজকে নিয়োগ করুন। বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়াছে, তাঁহারা চরকার সুতা ক্রয় করিতে এবং তুলা ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া সূত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতে ইচ্ছুক। এদিক হইতে এই বিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়া নিজের উপার্জ্জনের পথ সহরবাসী পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। বস্ত্রসমস্যার সমাধানের সহিত ইহাতে দারিদ্রেরও একটা কিনারা হইতে পারে। কোচবিহারে একদিন চরকার অতি প্রচলন থাকিলেও বর্ত্তমানে চরকা নীরব। আশা করি এই সুযোগে অনেক বেকারই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশ ও নিজকে উপকৃত করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে চতুর্দ্দশ অধিবেশন শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে মহাসমারোহের বিগত ৮ই ও ৯ই আষাঢ় নৈহাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ বঙ্গের অধিকাংশ বিখ্যাত সাহিত্যিকই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাব ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্কিমত্ব,—তাঁহার নিকট বঙ্গ ও বঙ্গভাষা কতদূর ঋণী তাহা উপস্থিত সকলের প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাও সময়োপযোগী ও সুন্দর হইয়াছিল। তিনি দুইটী প্রস্তাব তাঁহার বক্তৃতায় অবতারণা করেন, প্রথমটী সাহিত্যসেবীগণের উৎসাহ কল্পে চারি সহস্র মুদ্রার একটি পুরস্কার ও দ্বিতীয়টি ভিন্ন ভাষা হইতে উপযুক্ত গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ। সভার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আতিথেয়তায় ও সুবন্দোবস্তে সাহিত্যিকগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-ভবন বঙ্গের সাহিত্যিকগণের পুণ্যতীর্থ। সে তীর্থের রেণু স্পর্শ করিয়া সকলেই ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু রেল কোম্পানী এই তীর্থকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। বঙ্গবাসী ইহার রক্ষার জন্য সচেষ্ট না হইলে এই

স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাহিত্যিকগণ অচিরে সাহিত্য সম্রাটের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তৎপর হউন।

গত বৎসরের দুর্ঘটনার পরও সান্তা-সিরাজগঞ্জ রেল লাইনে এখনও জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। যে একটি পুল নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহা সম্পন্ন হইলে চলন বিলের বিরাট জলরাশি নির্গমে ইহা কোন সহায়তা করিতে পারিবে না। এই রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বের সমুদয় ধান্য এই মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডুবিয়া গিয়াছে। লাইনের এক পার্শ্বে। জল অন্য পার্শ্বের জল অপেক্ষা সময় সময় এক হাত, দেড় হাত পরিমাণ উঁচু হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে আবাদের আর সুফলের আশা নাই। ৭।৮ বৎসর হইতে ক্রমাগত অজন্মা। এই অঞ্চল পাবনা জেলার প্রধান শস্য ভাণ্ডার—অথচ ইহাই একেবারে শস্যহীন হইয়া গেল। সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার না হইলে দেশ ধ্বংস হইলে কি হইবে প্রতিকারে।

শত শত গৃহস্থ গত বৎসরের বন্যায় গৃহহীন হইয়াছে। ভারতবাসী অকাতরে অজস্র দান করিয়া বহুপ্রাণ রক্ষা করিয়াছেন,—যে সহৃদয়তার পরিচয় দেশের লোক দুস্থের জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় কিন্তু এতগুলি অর্থ এ দরিদ্র দেশের ব্যয় হইল কাহার দোষে? মূল সংস্কৃত হইল না—অসহযোগীতা রক্ষা করিয়াছে সহস্র প্রাণ! কিন্তু তাঁহারা আবার প্রস্তুত হইয়া থাকুন এরূপ দানের জন্য! দুর্ঘটনার কারণ সংশোধিত না হইলে দুঃখ দূর হইবে না! যে সহানুভূতি দুস্থের দুঃখ দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে সেই সহানুভূতি মূল সংশোধনে তৎপর হক!

কুসংস্কার দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে! সৎশিক্ষার উন্নত চিন্তায় দেশের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে, কেবল রাজকীয় অধিকার লাভের চেষ্টা দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ করিতে হইবে না। গৃহের অন্ধকার দূর করিতে না পারিলে বাহিরের বিদ্যুতালোকে কি উপকার সাধিত হইবে! উচ্চচিন্তা উচ্চভাব,—পারিবারিক আদর্শ, ভারতের নিজস্ব ক্রমেই হৃত

হইতেছে; বাহিক সাজসজ্জায় বাক্য আড়ম্বরে আমরা সভ্য হইলেও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা,—সারল্য, সহৃদয়তা আমরা হারাইতেছি। শিক্ষিত যুবক, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না যুবতীর ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় নাই—তাহার প্রামাণ নিত্য প্রাপ্ত হইতেছি। গুরুজনের সম্মান, ভক্তি, বশ্যতা, পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা, সহ্য করিবার শক্তি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। পুত্র পিতাকে গ্রাহ্য করিতে অনেক স্থলেই রাজী নয়,—তাহাতে নাকি স্বাধীন মতের অবমাননা করা হয়,—পিতার মুখে মুখে তর্ক ত বঙ্গ পরিবারের নিত্য ব্যাপার। উপার্জ্জনশীল সন্তান পিতার সাহায্যে আসে কমই,—তাহাদের উপার্জ্জনে নিজেদের উদর পূরণ হয় না,—ব্যয় বাহুল্যতা, বিলাসিতা ইহার মূল! উন্নতি তাহা হইলে কোথায়? কোন আদর্শে এ কি পরিণতি!

স্বাবলম্বনই নাকি ইংরাজী শিক্ষার দান কিন্তু কোথায় বাঙ্গলার সে স্বাবলম্বন? চাকুরীর জন্য উমেদারের ত অভাব দেখি না! চাকুরীর চেষ্টায় বড় লোকের দরবারে শিক্ষিতের ভাঁড়ামী দেখিলে—অশিক্ষিতকেও লজ্জিত হইতে হয়। দুইটি পয়সার জন্য সে কি খোসামোদ,—পরচর্চ্চা, তথাপি উদরান্নের সংস্থান হয় না! শক্তের ইহারা ভক্ত আর সুযোগ পাইলে দুর্ব্বলের যম! আমরা দুইটি টাকার জন্য উচ্চশিক্ষিতকে অনৃতের আশ্রয় লইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি,—আশ্চর্য্য হই নাই। শিক্ষিত যুবক শ্বশুরের অর্থে আত্মতৃপ্তি করিতে না পারায় বধূনির্য্যাতনে তৎপর হইতে দেখিয়াছি। কত দুর্ঘটনা, কত অত্যাচার অবিচার নিত্য এইরূপে ঘটিতেছে। তথাপি দেশের চোখ্ ফোটে না, মোহ কাটে না। এক স্ত্রী বর্ত্তমান দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে, এম-এ,ও এ দেশে কুণ্ঠিত নন,—স্ত্রী অপরাধ দাবী পরিপূরণে পিতৃপুরুষের অক্ষমতা।

* *
*

দুঃখের ত শেষ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই আবার রমণীই বাঘিনী! অশিক্ষিতা শাশুড়ী বধূকে পশুর মত খাটাইয়াই কর্ত্তৃত্বপণার চরম করেন। রোগযন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া দিবা রাত্র পরিশ্রমের একশেষ করিতে পারিলেই এ দেশে বধূর প্রশংসা—বহু পুরুষ ও স্ত্রী অভিভাবককে এরূপ উক্তি করিতে শুনিয়াছি "আমরা ত বড় লোক নই মশায়, স্ত্রী গৃহ কার্য্য না করিলে আমাদের চলিবে

কেন!” নিজের সংসারে আত্মীয়ের জন্য পরিশ্রমকে কে অন্যায় বলে? কিন্তু রাঁধিবার বেলায়, বাঁটিবার বেলায় বধূ, আর আহারের বেলায় তাহার ভাগ্যে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট কেন? বিনা ঔষধে তাহার রোগ আরোগ্য হইবার ব্যবস্থা কি তাহার পক্ষে প্রশংসার! এ প্রশংসার শেষ হইবে কবে! কন্যার ন্যায় বধূও যত্নলাভের সৌভাগ্যবতী হইবে, মুখে আমরা কন্যাকে বধূর সহিত তুলনা করি কিন্তু মনে মনে জানি বধূর মৃত্যুতে আমাদের অপকার কমই বরং অর্থ আগমের আশা আছে—ছেলের দ্বিতীয় বিবাহে!

বধূর আত্মহত্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রতিকারের কি পথ নাই! কোচবিহারে সহরের বুকে একটি নির্য্যাতিত বধূ বস্ত্র কেরোসিনে সিক্ত করিয়া আগুনে আত্মহত্যা করিল! কম দুঃখে কি কেহ এরূপ ভীষণ মৃত্যু বরণ করে! কি সে যন্ত্রণা! জীবন তাহার যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কাটা ছাগের মত অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সে ভোগ করিয়াছে! আত্মহত্যার কি ভীষণ পরিণাম! শাশুড়ীর অত্যাচারই নাকি এ মৃত্যুর কারণ,—হৃদয়হীন স্বামী তাহার সহযোগী,—এইটি তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—প্রথমাও অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিনা চিকিৎসায় জীবনপাতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। তথাপি এ দেশের লোক এমন পরিবারে ও এমন বরে আবার কন্যাদান করে! এরূপ ভাবে কন্যা হত্যা করিতে কন্যাদানের ধর্ম্ম অর্জ্জন না করিলেই কি নয়! সমাজ এ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছে! তৃতীয়বার দার পরিগ্রহও এ বরের পক্ষে কঠিন হইবে না। হিন্দু সমাজে কন্যাদান করাই চাই!

যতদিন বঙ্গের বালিকাকে স্বাবলম্বী হইবার মত শিক্ষা দেওয়া না হইবে ততদিন এ রোগের ঔষধ নাই!

বৈদিক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের দেহাবসান ঘটিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও ছিলেন উৎসাহের অবতার,—অক্লান্ত কর্ম্মী,—সুবক্তা, গবেষণাশীল; তিনি বৈদিক যুগের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—স্বাধীন ভাবে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত —ঋগ্বেদের প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা ও মানবের আদিজন্মভূমি প্রভৃতি গ্রন্থ সভ্য সমাজে আদরনীয় হইয়াছে। পরিচারিকার পাঠক তাঁহার রচনার সহিত সুপরিচিত। বিদ্যারত্ন মহাশয় অকালে মহাপ্রস্থান করেন নাই, তথাপি এরূপ একজন পণ্ডিতের তিরোধানে আমরা ব্যথা পাইয়াছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি!

স্থানাভাবে প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা পত্রিকাস্থ করিতে না পারায় আমরা লজ্জিত আছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।”

৭ম বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

প্রেম-স্বপ্ন।

—:০:—

মানি সখি ফুরায়েছে প্রণয়-স্বপন,
নিমেষে হাসির ছটা, আকুল নিঃশ্বাস,
বোঝাতে বুঝিতে কথা প্রেম-নিবেদন,
চোখে চোখে আলাপন, বচন-উচ্ছ্বাস!
জানি গো নাহিক আর আবেগ-চঞ্চল
দ্বিধালাজ-দুরুদুরু কম্পন হিয়ায়,
নব সাধ আকিঞ্চন, ভাবনা তরল,
বিরহ মিলন গীতি হর্ষে বেদনায়।

স্বপন যা' ছিল সে যে সত্য সবি আজ,
কল্পনার মায়লোক মিলায়েছে তাই,
বাহির লুকালো ধীরে অন্তরের মাঝ,
ভাদরের ভরা নদী প্রশান্ত সদাই।
মূর্ত্তিমতী গেহে তুমি হে মানসী মোর!
নয়নে টুটেছে তাই স্বপনের ঘোর।

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষ্টেশনে পঁহুছিয়া শুনিতে পাইলাম, অতিবৃষ্টিতে নীচে কোথায় পাহাড় ধসিয়া পড়ায় ৩ নং উর্দ্ধগামী যাত্রী গাড়ীখানি আসিতে পারে নাই। বর্ষাকালে পাহাড়ে মাঝে মাঝে এরূপ Landslip হওয়ায় রেলগাড়ী চলাচলের বড়ই অসুবিধা ও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় এরূপও ঘটে যে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকায় কলিকতা হইতে আগত অনেক যাত্রীকে শিলিগুড়ী হইতে আবার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

পূর্ব্বে প্রায় প্রতি বৎসরই পাগলাঝোরার নিকটবর্ত্তী কোন না কোন স্থলে Landslip হইত, কখনও বা পাগলার উচ্ছ্বসিত উদ্দাম জলস্রোত রেলপথ প্লাবিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইত। ইহার প্রতিবিধান কল্পে দার্জ্জিলিংএ একবার নাকি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারগণের এক বৈঠক বসে, এবং সেই বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী

পাগলার প্রধান জলপ্রবাহটিকে প্রায় বার চৌদ্দটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হয়, তদবধি পাগলাঝোরার নিম্নস্থ রেলপথ কিয়ৎ পরিমাণে নিরাপদ হইয়াছে।

অপরাহ্ণ মোটর গাড়ীতে ব্যতীত দার্জ্জিলিং যাইবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। ষ্টেশনের পশ্চাদ্দিকস্থ ব্যাঙ্ক রোড ধরিয়া Eagles craig নামক পাহাড়টি দেখিতে গেলাম। একটি সরু চড়াই পথ দিয়া পাহাড়ের উপরে আসিয়া উঠিলাম, পাহাড়ের উপর হইতে পর্ব্বতপাদমূলে অবস্থিত তরাই প্রদেশের দৃশ্য কি মনোহর ও নয়নাভিরাম। দূর হইতে পাহাড়টির আকৃতি দর্শন করিলে সত্য সত্যই ইহাকে Eagles craig বলিয়া মনে হয়। Eagles craig হইতে নামিয়া আসিবার সময় পার্শ্বে বর্দ্ধমান মহারাজের কাছারীবাড়ী দেখিতে পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কাছারীতে তহশিলদার বাবুই সর্ব্বদা বাস করেন। উপর হইতে মাঝে মাঝে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কেহ কেহ আসিয়াও দু'এক রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। কোন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে কথাপ্রসঙ্গে অবগত হইলাম, পূর্ব্বে যখন দার্জ্জিলিংএ শুধু সেনানিবাস ছিল এবং লোকে দার্জ্জিলিংকে কেবলমাত্র দুঃসহ শীতপ্রধান জঙ্গলদেশ বলিয়া জানিত সেই সময় কার্শিয়াং লায়াল ব্যাঙ্কের অধিপতি মিঃ লায়ালের নিকট হইতে তদানীন্তন বর্দ্ধমান মহারাজ চারি হাজার টাকা মূল্যে এই কার্শিয়াংএর জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করেন। মহারাজ বাহাদুরের এ কার্য্য নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত মনে করিয়া রাজ সরকারের জনৈক পুরাতন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী দুঃখের সহিত কহিয়াছিলেন যে মহারাজা এতগুলি টাকা শুধু শুধু জলে ফেলিয়া দিলেন। অন্তরাল হইতে রাজা বাহাদুর প্রভুভক্ত বৃদ্ধ আমলার এ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "বাবা, টাকা জলে ফেলি নাই, টাকার গাছ পুঁতিয়াছি, দেখবে কালে সোণা ফলবে।" মহারাজের ভবিষৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, বর্ত্তমানে কার্শিয়াং সম্পত্তির বাৎসরিক মুনাফা চারি হাজারের কত গুণ বেশী দাঁড়াইয়াছে তাহা একবার মাত্র যাঁহারা কার্শিয়াং টাউনটি দেখিয়াছেন তাঁহারাই ধারণা করিতে পারেন। গল্পে গল্পে গাড়ীছাড়ার সময় হইয়াছে দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ীতে যাত্রীগণের জন্য শৌচাগারের কোনও বন্দোবস্ত নাই, এবং বৃষ্টি

হইলে সকলকেই বাবুই পাখীর মত বসিয়া বসিয়া ভিজিতে হয়। কোম্পানীর এ সব দিকে কোন দৃষ্টি না থাকিলেও ১৯ মাইল পথের মধ্যে কমপক্ষে অন্ততঃ ।৫ বার টিকট পরিদর্শনের বিশেষ কড়া বন্দোবস্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। রেলের কর্ম্মচারী গার্ড, চেকার, ড্রাইভার প্রভৃতির অধিকাংশই দেশীয়, দু'চারিটি মাত্র সাহেব ও বাঙ্গালী আছেন। এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট এবং কোন বিষয়ে বিশেষ কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন করেন না বলিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষ নাকি দেশীয়গণকেই অধিক পছন্দ করেন, শুনা যায়। এ লাইনে Signal এর কোন বন্দোবস্ত নাই, এবং একখানি গাড়ীর (Train এর) পশ্চাতে "হুড়্ হুড়্" করিয়া পাঁচ, ছয়খানি (Train) গাড়ীও সময় সময় ছুটিতে থাকে, এবং প্রায় প্রত্যেক গাড়ীর (Carriage বা Wagon) পশ্চাদ্ভাগে বরাবর এক এক জন করিয়া (Brakesman) ব্রেকস্ম্যান দাঁড়াইয়া থাকে। রাস্তায়, ষ্টেশন ভিন্ন অনেক স্থানেই গাড়ী থামিতেছিল এবং অনেক যাত্রী নামা উঠা করিতে ছিল। তাহাদিগকে টিকেট দেওয়া এবং তাহাদিগের নিকট হইতে টিকেট গ্রহণ করা সকল কার্য্যই গার্ড বাবুকে করিতে হইতেছিল। এই রূপে নানা স্থানে থামিয়া এবং পথের মধ্যে যথা অযথা কারণে বিলম্ব করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ট্রেনখানি দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ী প্লাটফরমে প্রবেশ করিতেই "বাবু কুলী, বাবু কুলী" রবে কুলীরমণীরা "নামলো" লইয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, ডাকগাড়ীর সময় কুলী যুবতীরা যেরূপ যাত্রীর মাল লইয়া পরস্পরের সহিত টানাটানি গালাগালি আরম্ভ করিয়া দেয়, রাত্রিতে কুলীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় তেমন কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হইল না। কুলীর পিঠে মাল চাপাইয়া আলো হস্তে আর্দ্দালি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

মাথার উপরে স্তরে স্তরে অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়া নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের মত সমস্ত সহরটিকে অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিয়াছিল। দীর্ঘ প্রবাসান্তে দার্জ্জিলিংএ প্রত্যাগমন করিয়া দার্জ্জিলিংএর সান্ধ্যছবি দর্শনে মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। পথিপার্শ্ব গৃহমধ্যে কর্ম্মনিরতা কোন পাহাড়ী যুবতী "ম ত য নু পর পরদেশ" গানটি—আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল, বায়োস্কোপ ফেরত কোন যুবক সুরাবিজড়িত স্বরে "রাণী বোনাই মা, দিদি কাঞ্চী বোনাই মা, একলা ছোড়েও দাজু, পানকা দোকানমা"

গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিতেছিল, কোথাও বা লাইট্‌পোষ্টের অস্পষ্ট আলোকে দাঁড়াইয়া কাচিৎ যুবতী কোন উন্মার্গগামী যুবকের সহিত প্রেমালাপে ব্যাপৃত ছিল, আবার কোন স্থলে পানের দোকানের সম্মুখে কোন কোন যুবতী সুরারঞ্জিত চক্ষু যুবকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল। এই সকল অভিনব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ থিয়েটার হলের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, রাত্রে পাহাড়িয়া থিয়েটারে "শকুন্তলা" নাটকাভিনয় হইবে বলিয়া হলে বহু লোক সমাগম হইয়াছে। পাহাড়িয়া থিয়েটার দর্শন জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল, সুতরাং যথা সত্বর বাটী পৌঁছিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া অনতিবিলম্বে হলে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেশী ভিড় ছিল না বলিয়া অল্পায়াসেই একটি মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইলাম। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই যুবক যুবতী ও বালকবালিকা, সকলেই মনোযোগের সহিত অভিনয় দর্শন করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সিগারেট পান করিতেছিল। সম্মুখ ভাগে উত্তম বেশে সজ্জিতা তিনটি যুবতী দু'টি যুবকের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অভিনয় দর্শন করিতে করিতে সাধারণ শ্লীলতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতে ছিল।

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে ইহাদের মধ্যে একটি কোন ধনাঢ্য সর্দ্দারের কন্যা, সুদূর পল্লী হইতে পিতামাতার অজ্ঞাতে সহর দর্শন ও সহরের আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতে আসিয়াছে, দ্বিতীয়া কোন.........শুশ্রূষা কারিণী, তৃতীয়া বর্ত্তমানে সহরবাসিনী কিন্তু পূর্ব্বে প্রথমারই ন্যায় কোন সুদূর পল্লীবাসী পিতামাতার গৃহ অলঙ্কৃত করিত। যুবক দু'টির অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, ইহারা সহরবাসী এক জীব, নিজেদের বিশেষ কোন ব্যবসায় বা জীবিকা কিছুই নাই কিন্তু মাঝে মাঝে এরূপ দু'চারিটী শিকার সংগ্রহ করিয়া বেশ আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইয়া দেয়; দার্জ্জিলিংএ নাকি প্রায়ই এরূপ অনেক অবিমৃশ্যকারিণী যুবতী গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সহরে বেড়াইতে আসে, এবং এই শ্রেণীভুক্ত কোন যুবকের কবলে পতিত হইয়া কিছুকাল সহরের আমোদপ্রমোদ ও ভোগবিলাসে অর্থ-সম্বলাদি ব্যয় করিয়া ফেলে পরে হৃতসর্ব্বস্বা হইয়া কেহ কেহ পুনঃ লজ্জাহীনার মত গৃহে ফিরিয়া যায়, কেহ বা সহরেই কোন একটা কাজকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লয়।

অভিনয় মোটামুটি মন্দ হইতেছিল না, মাঝে মাঝে পাহাড়িয়া বালকগুলি তাহাদিগের নৃত্যগীতনৈপুণ্যে দর্শকগণের মনমুগ্ধ করিতেছিল। উপযুক্ত শিক্ষা ও যত্ন চেষ্টার ফলে কালে যে ইহারা অভিনয় বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শরীর বিশেষ অবসন্ন ও ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল দেখিয়া অভিনয় এক অঙ্ক শেষ হইলেই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

* * *

লোদোমা যাত্রা ঃ—

কিছুদিন দাৰ্জ্জিলিং-এ অবস্থান করিয়া পুনরায় লোদমা যাত্রা করিলাম। সেপ্টেম্বর মাস অতীত প্রায় কিন্তু তখনও পাহাড়ে বর্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। বর্ষা কালে এদেশে মফঃস্বল পথ ভ্রমণ যে কিরূপ বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যেগুলিকে "কোম্পানী বাটো" বা সরকারী রাস্তা বলে সেগুলিরই এমন ভীষণ অবস্থা ঘটে যে বর্ষার প্রারম্ভেই সরকার হইতেই নোটীশ দিয়া ইহার কোন কোন পথে লোক চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অপরিসর ঢালু দুর্গম হইয়া উঠে, তদুপরি অতি-বৃষ্টির ফলে কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় অনেক সময় হয়ত পথের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, আবার কোথাও বা পাহাড় ধসিয়া পড়ায় উভয় দিকের পথই বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পথে চলিবার সময় হঠাৎ পাহাড় ধসিয়া পড়ার (Land slip হওয়ার) যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২৪ শে সেপ্টেম্বর দুপ্রহরে দার্জ্জিলিং হইতে রওনা হইয়া সিপাহাড়ী ডাওসেসান বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে গো গাড়ীর পথ পরিত্যাগ করিয়া বামদিকে পুলবাজার অভিমুখে নামিয়া চলিলাম। দেশীয় ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ানদিগের গোর ভূমির পার্শ্ব দিয়া উৎরাই পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথের অবস্থা দর্শনে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। উৎরাই পথে অশ্বারোহণ সুবিবেচনার কার্য্য নহে বলিয়া পদব্রজেই রওনা হইয়াছিলাম; বন্ধুর পিচ্ছল পথে প্রায়ই পা পিছলাইয়া যাইতেছিল। বহু কষ্টে সিংটাম চা বাগানের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা পাওয়া গেল।

বাগান হইতে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা মেরামতের কোন ব্যবস্থা করিয়াছে কি না তাহা জানি না কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে পথের যে অংশটুকু চা বাগানের মধ্য দিয়া গিয়াছে সেটুকু অপেক্ষাকৃত কম বন্ধুর ও সম্ভব মত সুগম।

প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিতেই দূরে জলপ্রপাতের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র একটি বাঁশ জঙ্গল উত্তীর্ণ হইতেই অতি নিম্নে একটি রজত রেখার মত শুভ্র জল স্রোত দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমশঃ শব্দ স্পষ্টতর ও নদীর ক্ষীণ কায় বৃহত্তর বোধ হইতে লাগিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীতীরে উপনীত হইয়া দেখিলাম যে ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীর শুভ্র ফেনিল খর জলস্রোত উভয় তীরবর্ত্তী প্রস্তরময় সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া গভীর গর্জ্জনে নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর উপরে পারাপারের নিমিত্ত লৌহ সেতু বর্ত্তমান ছিল সুতরাং অনায়াসে পুলের সাহায্যে এ পারে আসিয়া পঁহুছিলাম। পুলের সন্নিকটে পথিকগণের বিশ্রামার্থ কোন পরলোকগত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া রহিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ তথায় উপবেশন করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম, কিন্তু তথা হইতে আবার কিয়দ্দূর চড়াই উঠিতে হইবে জানিয়া মহা প্রমাদ গণিলাম। গত্যন্তর নাই, সুতরাং বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম, সৌভাগ্যক্রমে অল্প পথ গমন করিয়াই অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি পাওয়া গেল, তৎপরেই আবার নিম্নদিকে নামিতে নামিতে উৎরাই পথে একেবারে ছোট রঙ্গীতের উপরের ঝুলায়মান লৌহ সেতুর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। পুলের উভয় পারেই বাজার তবে হাটের দিন ওপারেই হাট বসে। শুক্রবার দিন, নদীর বিস্তীর্ণ বালুকাময় তীরের উপর বেশ বড় রকমের হাট লাগে, হাটে আলু, মাখন, মুরগী, পাঁঠা, এলাচি যথেষ্ট আমদানি হয় বলিয়া বহুদূর হইতে লোক এই হাটে ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকে।

সিকিম রাজ্য হইতে যে সকল দ্রব্যাদি লোকে হাটে বিক্রয় জন্য লইয়া আসে, এবং ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হাট হইতে ক্রয় করিয়া সিকিমে লইয়া যায় তাহার একটি হিসাব রাখার জন্য হাটে একটি ট্রাফিক্ অফিস আছে এবং তথায় একজন মুহুরি সরকার হইতে নিযুক্ত আছেন।

হাটের উত্তরে প্রায় একশত ফুট উর্দ্ধে ঠিক নদীর উপর পুলবাজার থানা অবস্থিত। বাজার হইতে থানায় যাইতে হইলে সরু একটি নালার মত ক্ষুদ্র ঝরণা পার হইয়া চড়াই উঠিতে হয়। গত বৎসর বর্ষাকালে ক্রমাগত কয়েক দিবসের অতি বৃষ্টির ফলে হঠাৎ এক রাত্রিতে উপরে Landslip হয় এবং এই ক্ষুদ্র ঝরণা পথে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড নীচে গড়াইয়া আসায় বাজারবাসী বহুলোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। এ জন্য লোকে ঝরণার পার হইতে দোকান পাট উঠাইয়া হাটের অপর প্রান্তে লইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহারা এখনও ঝরণার কিছু দূর ব্যবধানে দোকান করিয়া আছে তাহারা বর্ষাকালে কোন ক্রমেই তথায় রাত্রি যাপন করে না।

অপরাহ্ন প্রায় টার সময় থানায় পৌঁছিলাম। থানায় বিহার দেশীয় জনৈক কায়স্থ দারগা ছিলেন, তিনি আমাকে অভ্যাগত দেখিয়া অতি যত্ন আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহার দর্শন মনে হইতেছিল যেন তিনি আমার কত দিনের পরিচিত পুরাতন বন্ধু। পথশ্রমজনিত ক্লান্তি অপনোদন জন্য তিনি যথাসত্বর আমার জন্য চা ও জল-খাবার প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন, জলযোগান্তে একটু সুস্থ হইয়া উভয়ে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে রাত্রির ভোজ প্রস্তুত হইল, বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া, যথাসময়ে আহার সমাধা করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, জাগরিত হইয়া ঢাকের শব্দ ও রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। জানালা খুলিয়া দেখি যে বাজারের উপর কয়েক খানি চা-দোকানের সম্মুখে বহু স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া মশালের আলোকে নৃত্যগীত করিতেছে।

ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত মনে মনে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম, এ দিকে পুলবাজার দার্জ্জিলিং অপেক্ষা ৭॥০ মাইল নিম্নে অবস্থিত হওয়ায় শীতও বেশ অনেকটা কম ছিল, সুতরাং একখানি আলোয়ানে দেহ আবৃত করিয়া বাজারের দিকে নামিয়া গেলাম। যে স্থানে স্ত্রীপুরুষেরা গোলাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মধ্যস্থলে একটি যুবক ঢাক বাজাইয়া গান গাইতেছিল এবং অদূরে একটি কিশোরী যুবতী সেই বাজনার তালে তাল মিলাইয়া

নৃত্য করিতেছিল। সমবেত দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতেও মাঝে মাঝে দু'চারিটী যুবকযুবতী কখন কখন তাহাদিগের সহিত নৃত্যগীতে যোগদান করিতেছিল।

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে যুবতীটি কোলুং-এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে দু'একজন সমবয়সী "সাথী"র সহিত পুলবাজার হাটে বেড়াইতে আসিয়াছিল। যুবক তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া লিম্বু জাতির জাতীয় প্রথানুযায়ী তাহাকে সঙ্গীত যুদ্ধে আহ্বান করে, কিন্তু বলিকা পরাজিত হওয়ায় সে তাহাকে বিবাহার্থ বন্দিনী করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিয়াছে। যদি নিজ সঙ্গীত নৈপুণ্যে যুবতী জয়লাভ করিত তাহা হইলে যুবক লজ্জায় সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিত এবং সে যথেচ্ছা গমন করিতে পারিত।

নৃত্যগীত শেষ হইলে এক মুণ্ডিত মস্তক লামা আসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বরকনে উভয়ে কুক্কুটকুক্কুটীযুগলকে হস্তে ধৃত করিয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে লামা বরকনেকে সম্বোধন করিয়া লিম্বু ভাষায় কি যেন বলিলেন তখন বর কনের করতলে করতল বিন্যস্ত করিল।

মন্ত্র পাঠান্তে লামা নবীন দম্পতির হস্ত হইতে কুক্কুট দুইটিকে গ্রহণ করিলেন। খুক্রী সাহায্যে কুক্কুট-গ্রীবাচ্ছেদন পূর্ব্বক, নির্গত রুধির ধারা এক খণ্ড কদলীপত্রে ধারণ করিলেন। ইহা হইতে নাকি পরিণীত যুবকযুবতীর ভবিষ্যজ্জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয়।

একখানি কদলিপত্রে সিঁন্দুর গুলিয়া রাখা হইয়া ছিল, বর দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সেই সিন্দুর লিপ্ত করিয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সুন্দরি! আজ হইতে তুমি আমার স্ত্রী" এইরূপ কয়েকবার কহিয়া সেই অনুলেপনে নবপরিণীতা পত্নীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে সীমান্ত পর্যন্ত সিঁন্দুর রঞ্জিত করিয়া দিল।

তৎপরে সমাগত আত্মীয়কুটুম্ববর্গ সকলে ভোজন করিতে বসিল। ভোজের নিমিত্ত জার মদ্য, শূকর মাংস ও অন্ন প্রভৃতি পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিবাহ শেষ হইয়া গেল দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতে শুনিতে পাইলাম,—এ বিবাহ দম্পতির পক্ষে শুভকর হয় নাই কারণ লামা যে অশরীরী আত্মাকে 'আবাহন' করিয়া বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আদেশ করিয়া

ছিলেন সে আত্মা তাহাদিগকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করে নাই। বরের মাতা এ নিমিত্ত অশুভাশঙ্কায় ভীতা হইয়া লামার দ্বারা গ্রহশান্তি করাইতেছে। গ্রহশান্তির প্রয়োজন হইলেই লামাগণের আরও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সুতরাং প্রেতাত্মা যখন তাঁহাদেরই বাগ্‌যন্ত্র সাহায্যে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া থাকেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। গ্রহশান্তি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেলে যুবতী মুক্তিলাভ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এরূপ ঘটে যে কন্যা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না।

কয়েকদিন পরে জারমদা, শূকর শাবকের মৃতদেহ ও একটি রৌপ্য মুদ্রা উপঢৌকন লইয়া ঘটক কোলবুং পাত্রী আনিতে যাত্রা করিল। লিম্বুদিগের বিবাহও যেমন আশ্চর্য্য রকমের পাত্রী প্রার্থনাও তদ্রূপ অদ্ভুত ধরণের। শুনিতে পাইলাম যে ঘটক পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন দ্রব্যগুলি ভূমিতে রক্ষা করিলে পাত্রীর পিতা নাকি ক্রোধের ভান করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, এবং "তোমরা কেন আমার কন্যাকে গোপনে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে" এইরূপ বলিতে থাকেন। ঘটক তখন বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করে এবং ক্রোধোপশমন জন্য আরও একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করে।

পরে পাত্রীর মূল্য বাবদ একটি শূকর ও কিঞ্চিৎ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হয়, বরের আর্থিক অবস্থা অনুসারে এই পণের পরিমাণ দশ হইতে একশত কুড়ি মুদ্রা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বরপক্ষ নগদ মুদ্রা দিতে অক্ষম হইলে নির্দ্ধারিত পণের বিনিময়ে তুল্য মূল্যের দ্রব্যাদি দান করিবারও প্রথা আছে।

আদান প্রদান শেষ হইলে কন্যাকে ঘটকের নিকট সমর্পণ করা হয়, কিন্তু কন্যা ইত্যবসরে গৃহের কোণে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। পিতা কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া "আমার কন্যা হারাইয়া গিয়াছে, কেহ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর" এইরূপ কহিলে ঘটক অনুসন্ধানকারীর পারিশ্রমিক বাবদ আরও দু'একটি মুদ্রা বাহির করিয়া দিলে কন্যা অন্তরাল হইতে আপনা আপনি বহির্গত হইয়া আইসে।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

কদম্বমূলে।

আজ, শ্যামের বামে দাঁড়াল রাই
ব্রজের আসরে,—
যেন মেঘের গায়ে সৌদামিনী
আকাশ-বাসরে!
নাচে নবীন তৃণে খঞ্জন এ,
আঁকা হেমের ঘড়া অঞ্জনে,
মরি, জড়া'ল ঐ কনকলতা
তমাল-পাশ রে!

একি নীল গগনে শারদশশীর
সদ্য উদয়?
ওযে কমল মাঝে ভৃঙ্গ গাঁথা
মত্ত-হৃদয়!
ওগো, কজ্জলে আর চন্দনে
বাঁধা রূপ যে রূপ যে যুগল বন্ধনে,—
ঘোষে হাসি বাঁশী এক ঠাঁয়ে আজ
কেকার কাঁসরে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

রক্তাম্বরা।

—ঃ৹ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিয়ের সর্ত্ত।

আমি তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা হলে খুন করাটাও আপনার টাকা দেবার একটা সর্ত্তের মধ্যে ?"

"আমি ত বোল্‌ছি যে সে সন্ধ্যার আগে মরবেই। যেমন করেই হোক কয়েকঘণ্টার বেশি সে বাঁচবে না। তুমি ডাক্তার তুমি তাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির মৃত্যুযন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই দিতে পার।"

আমি ক্রোধভরে বলিলাম "পরিষ্কার কথা এই যে আপনি চান, আমি তাকে মারি আপনি যে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চান তা বিয়ের জন্য নয় তাকে মারবার জন্য।"

তিনি বেশ শান্তস্বরে বলিলেন "ওঃ! তুমি সমস্তটা ভুল বুঝেছ। খুনের ত অনেক রকম পর্য্যায় থাকতে পারে। মরণোন্মুখী বালিকাকে মেরে ফেলা দয়ারই কাজ, তাতে পাপ নেই।"

আমি অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলাম "তার জীবনের এক মুহূর্ত্ত থেকেও তাকে বঞ্চিত করা আমি পাপ মনে করি। আর মশাই আপনি নিজের অবস্থার কথা ভেবে দেখ্‌ছেন না? কাউকে খুন করবার জন্য লোককে ঘুষ দিলে রাজদ্বারে দণ্ড পেতে হয় তা জানেন না?" তিনি মৃদু হাসিলেন।

"ওসব বোকামিতে, মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। তোমার কোন সাক্ষী আছে? তুমি আদালতে নালীশ কোরলে কে তোমায় বিশ্বাস কোরবে?"

সত্যিইত তাঁর কথাই ঠিক। সাপকে বেশী খেলান ভাল নয় ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহলে বুঝতে হবে যে এই উভয় প্রস্তাবেই আপনার স্বার্থ আছে?"

আমার আশা ছিল আমি ভিতরের কথা কিছু জানিতে পারিব। কিন্তু তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "সে আমি বুঝব।"

"তাহলে আমার বিবেকও বোধ হচ্ছে আপনার। আমি কাউকে খুন করে আমার বিবেককে খুন কোরতে চাই নে। আপনার টাকায় নমস্কার।"

তাঁহার চক্ষু আগুনের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন "তাহলে তুমি অস্বীকার কোরছ?"

"নিশ্চয়। সে ত দূরের কথা আমি উপরে গিয়ে তোমার কন্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা কোরব।"

"বাঁচান! অসম্ভব। কিছুতে সে সারবে না। তা তোমার মত ভেল্কীবাজরা হয় ত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।"

"হতে পারে। আমি তাকে নিশ্চয়ই খুনের হাত থেকে বাঁচাব।"

"তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও?"

"আমি তোমার নিজের মেয়েকে তোমায় খুন কোরতে দেব না। তা ছাড়া তার ঘরে ঢুকতে আমি তোমায় বারণ কোর্‌ছি। আমি ডাক্তার, তুমিই আমাকে তার চিকিৎসার জন্য আনিয়েছ। সুতরাং আবার যদি আমার বারণ সত্ত্বেও তুমি তার ঘরে যাও আমি পুলিশ ডাক্‌তে বাধ্য হব।"

লোকটার মুখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু আবার হাসিও দেখা দিল, বলিল "সব বাজে। তুমি আমায় তার শয্যার কাছে যেতে বারণ করবার কে?"

"আমার অধিকার আছে তাই কোর্‌ছি। তুমি বোলেছ যে তোমার স্বার্থের জন্য কাল সন্ধ্যার আগেই সে ম'রবে! তুমি নিজেই তাকে মারতে, কিন্তু ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে গেলে পরে গণ্ডগোল হয় সেই ভয়ে আমায় ডেকে ছিলে।"

সে খুব ধীরভাবে বলিল "ঠিক বোলেছ। সেই জন্যই তোমায় চল্লিশ হাজার টাকা দিচ্ছি। তোমার ডাক্তারি বিদ্যের জন্যই।"

"আর মরণের সার্টিফিকেট দেবার জন্যও বটে।"

নিশ্চয়ই তা বটেই ত।"

"বেশ তাই আমি সোজা বোল্‌ছি যে তুমি খুনী বদমায়েস। তোমার কন্যার জীবন তোমার কাছে কিছুই নয়। তোমার মত লোকের কাছে ভদ্রলোকের মান বাঁচান দায়।"

"তোমার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ! তোমার মত ভদ্রলোকের মান বড় অদ্ভুত ধরণের। তুমি অনায়াসে এক অচেনা অজনা মেয়েকে টাকার লোভে বিয়ে কোরলে।"

আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলাম "লোভ ত তুমিই দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কোরলে! ভাগ্যে আসল পাপ করবার আগে আমার টাকার নেশা ছুটে গেছে! আমি চল্লেম। এ সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

"তা কি হয়? তুমি যে আমার জামাই।"

"তাইতে ত তোমার মেয়েকে খুন করবার অধিকার পেয়েছি।"

"তুমিই বল স্বামী ছাড়া আর কে তাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে?"

"আর কারই বা তাকে বাঁচাবার বেশী অধিকার আছে?"

"বাঁচান ত অসম্ভব।"

"কেন?"

"সে মরবেই।"

"তোমার কথায় নাকি! আরও একটা কথা, তার রোগ সত্যিই যদি মারাত্মক হোত, তা হলে তাকে মারবার জন্য আমায় অত টাকা ঘুষ দেবে কেন? কয়েক ঘন্টার হেরফের এ তোমার ক্ষতিটা কি?"

"ক্ষতি আমার হইতেই হবে। সন্ধ্যার আগে তাকে মরতেই হবে।"

"যদি আমি বাধা দিতে পারি তা হলে মরবে না।"

"তা হলে টাকার মায়া কাটালে?"

"টাকার কাণাকড়িও ছোঁব না।"

"যদি ছুঁতে বাধ্য হও?"

"তার মানে?"

"মানে বুঝাবে একদিন। তখন এমন দিন থাকবে না। আমার সঙ্গে মিলে কাজ কোরলে ভাল কোরতে।"

"ভাল তোমার হোত,—আমার নয়।"

"না তোমারই। তুমি আগেই ত চল্লিশ হাজার টাকা নিতে রাজি হোয়েছ।"

"ঢের হোয়েছে। পুলিশে খবর দিলে এক ঘন্টায় জেলে যাবে।"

"ওসব ভয় আমার নেই তা ত আগেই বোলেছি। আমি কোন কাজে কখন ভুল করি না।"

"আমিও বাজে কথা কিছু বলি না।"

প্রথম হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এতক্ষণে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেওয়ায় ও পরে আমার দ্বারা তাহাকে খুন করায় তাহার বিশেষ স্বার্থ আছে। সে আমাকে তাহার অসৎ কার্য্যের সঙ্গী করিতে চায়। আর একটা কথা এতক্ষণে মনে পড়িল। আমার হাতের ভিতর যে ছোট হাতটি ছিল তাহা ত রোগীর হাত নয়, সে হস্ত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। আমি তাহার নাড়ীর গতি অনুভব করিয়াছিলাম তাহাতে জ্বর বা কোন রকম অসুস্থতার চিহ্নও ছিল না কিন্তু সে নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ নিজে করিতে পারে নাই। যেন মন্ত্রমুগ্ধ! আমার প্রলুব্ধকারী এইখানেই আমায় ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পারে নাই। শেষকালে সে বন্ধুত্বের ভান করিয়া খুব মিষ্ট স্বরে বলিল "সত্যিই কি কিছু করতে পারবো না ডাক্তার? শত্রুতায় তোমার ত লাভ নেই মিত্র হলে বরং আছে। মনে রেখো এই বিয়েতে তুমি আমার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে।"

"তোমার উত্তরাধিকারী?" আগে সেকথা ভাবি নাই। এখন মনে পড়িল। বাড়ী দেখিয়া খুব ধনবান বলিয়া বোধ হয় বটে। আমি বলিলাম "তুমি বড় দয়াবান। কিন্তু অজানা লোকের কাছ থেকে অত বড় দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে নেই।"

ওঃ! আমি ত আর অজানা নই। আমার নাম অনন্তকুমার আদিত্য।"

"আচ্ছা আদিত্য মশায় এবার তবে আসি। যাবার আগে একবার স্ত্রীকে দেখতে চাই।"

সে হাসিয়া বলিল "এ ত খুব স্বভাবিক, তুমি যে তাকে দেখতে চাইবে কিন্তু দেখতে পাবে না।"

"তোমার কথায় ?"

সেই ছোট হাতটির অধিকারীকে জানিবার আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছিল। বাড়ীটি অতি রহস্যপূর্ণ কিন্তু সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আমার প্রবল বাসনা হইল। আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল "একটি মাত্র সর্ত্তে তুমি যেতে পারো। সে সর্ত্তের কথা তোমায় আগেই বলেছি।"

"তাকে মার্‌ব ? না আদিত্য মশায়, অন্য লোক দেখুন। আমার দ্বারা হবে না।"

"আরও দশ হাজার দিলে ?"

"যদি এক লক্ষ দেন তবুও নয়।"

"কেন তুমি ত প্রথমে রাজি ছিলে !"

"কখনো ছিলাম না।"

"তাহলে তার ঘরে যেতে পাবে না।"

এমন সময় কে দ্বারে করাঘাত করিল। বাহির হইতে কে বলিল "দরজা খোল আদিত্য।"

"কে মেজর, এস এস ভেতরে এস" বলিয়া আদিত্য দ্বার খুলিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দর-দর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্রবেশ করিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "দরজা বন্ধ করে কি হচ্ছে ? খবর সব ভাল ত ?"

"সব ভাল। ইনি আমার জামাই, বিলেতের পাশ করা ডাক্তার। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ কর।"

তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল "ইনি মেজর দত্ত। অনেক দিন সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন।"

"এস এস বাবা সুখে থাক।" বলিয়া আমায় মেজর দত্ত মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন! "আমি তোমার বিয়ের কথা সব জানি। আমি ও আদিত্য অনেক দিনের বন্ধু। অদ্ভুত এ বিয়ে! বেলা বেচারী! সেদিন আদিত্যর খাস জমিদারীতে তাকে দেখলাম একটুকু ফুটফুটে মেয়ে। যেন বাড়ীর সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে সে.........! মানুষের

জীবনের কিছু ঠিক্ নেই বাবা—কিছু ঠিক্ নেই। সবই তাঁর ইচ্ছা বাবা—সবই তাঁর ইচ্ছা ! কেমন আছে সে এখন ?"

আদিত্য বলিল "সেই রকমই। আজ রাতটুকুও কাটবে না।"

"আহা ! আহা !" মেজর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, সেই সময়ে আমায় প্রলুব্ধকারী উঠিয়া বাহিরে গেল। আমিও উঠিয়াছিলাম কিন্তু মেজর বলিলেন "আমার বন্ধুর এরকম করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার খেয়াল কেন হোল কে জানে !"

আমি বলিলাম "আমার আদিত্য মশাইকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।"

"উনি খুব ভাল লোক, আর ওঁর বিস্তর টাকা। তোমার ভাগ্য ভাল। ভবিষ্যতে সবই ত তোমার।"

"আজকের দিন আমার জীবনে একটি বিশেষ দিন। সকালবেলা অবধি ভেবেছি—কখনো জীবনে বিয়ে কোর্‌ব না, আর এ বেলা আমার বিয়ে হ'য়ে গেল।"

"অনুতাপের ত কিছু নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার যেমন ছিলে তেমনি হবে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম এ লোকটিও একজন ষড়যন্ত্রকারী কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম "আমার মত এরকম সচরাচর কারও হ'তে দেখা যায় না।"

মেজর সিগারকেস বাহির করিয়া একটি নিজে ধরাইলেন, একটি আমায় দিলেন। তারপর অসুখের আগে বেলা কি রকম ছিল সেই গল্প করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি অসুখ তার ?"

"নাম জানি না। ছয় সাত জন ডাক্তার রাত দিন দেখেও ঠিক কোরতে পারে নি। কেউ বলে কিছু আমি বলি সবই শ্রীহরির ইচ্ছে। আদিত্য বিস্তর খরচ করেছে কিন্তু কি হবে ? বেলাকে কি সে কম ভালবাসে ? ওই একরত্তি মেয়ে রেখে তার স্ত্রী যখন মারা গেল কত কষ্টেই সে মানুষ কোর্‌লে ও'কে। ও'র মুখ চেয়ে বিয়ে অবধি আর কোর্‌ল না। ওই ওর সর্ব্বস্ব। আহা বেচারীর কি কষ্ট !"

আমি উত্তর দিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে ভীষণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক চীৎকারধ্বনি কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমি চমকিয়া বলিলাম "শুনুন শুনুন, এ কি ?"

আবার সেইরূপ চীৎকার। হঠাৎ মনে হইল আদিত্য নিজেই নিজের মেয়েকে খুন করিতেছে। আমি দৌড়িয়া উপরে উঠিলাম।

রক্ষাকবচ।

উপরে গিয়া দেখি ঘরের দ্বার আগ্‌লাইয়া আদিত্য মশায় দাঁড়াইয়া। আমি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম "সরে যাও।"

"কেন বৃথা চেষ্টা কোরছ, যেতে পাবে না ভেতরে।"

"আমি কার কাতর-চীৎকার শুন্‌লাম। আমার স্ত্রী নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। আমি তার স্বামী তাকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাব।"

"খুব কর্ত্তব্যজ্ঞান ত। একমুঠো টাকার জন্য যে নিজেকে বিক্রী করে তার আবার কর্ত্তব্যজ্ঞান!"

আমি সরোষে চীৎকার করিয়া বলিলাম "আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হোয়েছিলেম সত্যি কিন্তু আমি পাষাণ নই,— পাপও কিছু করি নি।"

লোকটি হাসিল। তারপর আরও ভাল করিয়া দ্বার প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

হায়। কেমন করিয়া ভিতরে গিয়া আমার স্ত্রীকে বাঁচাইব!

আদিত্য আবার বলিল "তুমি টাকা চেয়েছিলে, টাকা দিতে রাজি ছিলাম। এখন টাকা চাও না,—চলে যাও।"

"যাব না। এই রাতের কথা তোমাকে চিরদিন মনে রাখ্‌তে হবে।"

লোকটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি আবার বলিলাম "সরে যাও বোল্‌ছি নয়ত ভাল হবে না।"

সে কয়েক পা পিছাইয়া ঠিক দ্বারের সম্মুখে আস্তানা নিল। তারপর পিস্তল বাহির করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিল। মুহূর্ত্তে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। আমি বুঝিলাম আমার জীবন সঙ্কট। আমার পত্নীও বিনারোগে মৃত্যুমুখী। আমি লোকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণপণ বলে বন্দুকটি কাড়িয়া লইলাম। লোকটির আকার দেখিয়া তাহাকে দুর্ব্বল বলিয়া ভাবিয়াছিলাম কিন্তু সে বেশ বলবান। ধস্তাধস্তির সময় একটা গুলি আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আঘাতও একটু লাগিল। লোকটি যে সুবিধা পাইলে আমায় হত্যা

করিত এই চিন্তা আমায় পাগলের মত করিল; আমি পিস্তল কাড়িয়া লইয়া দরজার উপর ক্রমান্বয়ে পিস্তলের আঘাত ও লাথি মারিতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আমার স্ত্রী পালঙ্কের উপর রেশমের বিছানায় লাল বেনারসী পরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিল। হাতে সেই আংটী, তাহাকে দেখিয়া গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। এক মিনিট পূর্ব্বে বালিকা-কণ্ঠে করুণ স্বর শুনিয়াছি তাহাতে ত কোন ভুল নাই। তবে সে ঘুমাইল কেমন করিয়া? আমি দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মুখটি দেওয়ালের দিকে—ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। কেন যে লোকটি আমায় প্রবেশ করিতে বাধা দিল, এমন কি মারিবার চেষ্টা করিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সব রহস্য-পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল! আমি খুব মনোযোগের সহিত তাহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা করিলাম। অতি মৃদু নিঃশ্বাস পড়িতেছে। তাহার হাত দুখানি পাথরের মত হিম ও কঠিন।

এক মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া আমি প্রবল বাসনার বশে তাহার মুখখানি দেখিবার আশায় খাটখানি দেওয়ালের নিকট হইতে সরাইয়া আনিলাম, তারপর ঘুরিয়া দেওয়ালের দিকে গেলাম। হঠাৎ গলায় ও ঠোঁটে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করিলাম। সব যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোধহয় ভারী খাটখানি সরাইতে গিয়া কোন শিরা বা উপশিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পত্নীর মুখখানি দেখিবার ইচ্ছা তখন এত প্রবল যে আমি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাহার গায়ের ঢাকা খুলিলাম। কি দেখিলাম? সে অপূর্ব্বদৃষ্ট! মানুষ সেরূপ দেখিলে পাগল হইয়া যায়। চক্ষু দুটি উন্মীলিত কিন্তু নিশ্চল। কি সে ভ্রমর কৃষ্ণ পক্ষ্মঘেরা জলকর। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালআয়ত কৃষ্ণতারকা! মুখে মৃদু হাসির আভাস। সে হাসিটুকু মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়াছিল। আমি নত হইয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার অসুখ কোরেছে? কি হয়েছে বল দেখি? আমি ডাক্তার, তোমায় ভাল কোরে দেবো।" কোন উত্তর নাই। নিশ্চল দেবীপ্রতিমা। আমার তখন সন্দেহ হইল, আমি আবার পরীক্ষা করিলাম। গালে হাত দিলাম। উঃ! যেন বরফ। এতক্ষণে বুঝিলাম। আমার স্ত্রী মরিয়াছে। সন্ধ্যা আসিবার বহু পূর্ব্বেই সে মরিল। কিন্তু মৃত্যু আমায় দেখাইতে

পারিল না। এত রূপ জীবনে দেখি নাই মৃতই হউক আর জীবিতই হউক দেখিয়া মজিলাম।

সে যদি জীবিত থাকিত। চিরদিন ওই রূপরশি হৃদয়ে লইয়া পূজা করিতাম। সে মুখ হইতে চোখ ফিরান যায় না। শিশুর মত পবিত্র ও কোমল সে মুখ। রোগের ছায়ামাত্র নাই। কেন সে চীৎকারও করিল? ঘরের দ্বারই বা কেন বন্ধ ছিল? তাহাকে তাহলে খুন করা হইয়াছে। আমি চাদর খুলিয়া লইলাম। গলায় সরু চেনহারের সঙ্গে একটী প্রশ্ন চিহ্নের আকারের রক্ষাকবচ। তাহার গঠন অতি বিচিত্র। সুন্দর সুন্দর বড় বড় হীরা বসান। আমি কবচখানি আমার পত্নীর স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ রাখিবার মানসে খুলিয়া লইলাম। সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়াও মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিলামনা। তাহার বক্ষের বসন উন্মোচন করিয়া হৃদয়ের গতি পরীক্ষা করিলাম। বক্ষের মধ্যস্থলে উল্কি—তিনটি হৃদ্‌পিণ্ড একগাছি মালিকায় গ্রথিত—উল্কিতে চিত্রিত করা হইয়াছে। আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম আজকালকার মেয়েরা উল্কি খুব কমই পরে। চক্ষু পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ চক্ষুটির অপেক্ষা বাম চক্ষুটী মুদিয়া গেল। তখন বুঝিলাম তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে। একটু আগেই সে মরিয়াছে। এই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সে চীৎকার করিয়াছিল। তখন তার জ্ঞান ছিল। আমি সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন বোতল বা পুরিয়া পাইলাম না। তারপর যদি অসুখ হইয়া থাকে এই ভাবিয়া প্রেসক্রপসন খুঁজিলাম তাহাও পাইলাম না। তাহার শয্যার পাশে বিবাহের মালাখানি ঝুলিতেছে কিন্তু অপূর্ব্বসুন্দরী সেই আমার স্ত্রী, হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া চিরজন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। তাহার জীবনহীন সুন্দর দেহ শয্যায় শায়িত।

অনেক খুঁজিয়া মাথার বালিশের নীচে একটুকরা কাগজ পাইলাম তাহাতে লেখা "জহুরা আসিয়াছে।" জহুরা! সে কে? সেই কি আমার স্ত্রীর প্রণয়ী? ঘরের আসবাব ও সজ্জা দেখিয়া বোধ হয় আমার স্ত্রী বিদুষী ছিলেন। শিল্পে ও সঙ্গীতে তাঁর অধিকার ছিল। ঘরের দেওয়ালে তাঁহার স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র লম্বিত। চারিপার্শ্বেই তাঁহার শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আবার তাঁহার শয্যার কাছে ফিরিয়া গেলাম। আবার গলায় ও ঠোঁটে

সেই রকম যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। আমার গলা ঠোঁট জ্বলিয়া যাইতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না। পায়ে যেন কে গরম লোহার শিক বিঁধিয়া দিতেছিল, বিশ্ব অন্ধকার ঠেকিল, মুখ নাড়িবার ক্ষমতা ছিল না, বুঝিলাম মেজর আমাকে সিগারেটে বিষ মাখাইয়া দিয়াছিল কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে আমি চেতনা হারাইলাম।

প্রবাস যাত্রা।

একদিন জ্ঞান হইল। তখনো গলায় ও ঠোঁটে ব্যথা ও ফোলা আছে। ঘরের বাহিরে চাপা গর্জ্জনের শব্দ শুনিলাম। ঘরটি যেন দুলিতেছিল। তারপর কল চলিবার আওয়াজ কানে গেল। চক্ষু খুলিয়া দেখি বেশ আলো হইয়াছে আমার বামদিকে ছোট গোল একটা ফুকর ছিল তাহার ভিতরদিয়াই আলো আসিতেছিল মাঝে মাঝে ঢেউ আসিয়া ফুকরটিকে ঢাকিয়া দিতেছিল তখন বুঝিলাম যে আমি সমুদ্রের উপর চলিয়াছি। ঘরটি সরু ও ছোট। বড় অপরিষ্কার। আমি যে গদির উপর শুইয়াছিলাম সেখানি অত্যন্ত শক্ত। জাহাজখানি নিশ্চয়ই যাত্রী জাহাজ নয়। আমার সদ্য মৃত পত্নীর কক্ষ হইতে এত শীঘ্র এই জাহাজে কেমন করিয়া আসিলাম? তৎক্ষণাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলি আমার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল আমার স্ত্রীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ের ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত দেখিলাম। কিন্তু তবুও আমার প্রলুব্ধকারীর কতকগুলি কার্য্যের কোন কারণই পাইলাম না। আমার গলার ও ঠোঁটের যন্ত্রণা ও ফোলার জন্যই অতীত ঘটনাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। আমি একঘণ্টার ভিতর বিবাহিত এবং বিপত্নীক হইলাম!

অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। পায়ে একটুও শক্তি ছিল না। সমুদ্রপীড়া আমার হয় নাই কারণ আমি পূর্ব্বে সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়া গিয়াছি। কয়েক মিনিট পরে আমি উঠিয়া অতি কষ্টে দ্বারের নিকট গেলাম। দ্বার বাহির হইতে বন্ধ দেখিলাম। তখন গদির উপর বসিয়া পড়িয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সেই রক্ষাকবচটির কথা মনে পড়িল। সেটী পকেটেই পাইলাম। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেটীকে দেখিতে লাগিলাম। প্রশ্নচিহ্ন আঁকা অনেক লকেট, সেফ্‌টিপিন দেখিয়াছি তাহাদের গঠন এমন মনোহারী নয়। ইহার গঠন অতি বিচিত্র।

এইটিই আমার স্ত্রীর একমাত্র স্মৃতি। সেই "জহুরা আসিয়াছে" লেখা কাগজটিও পকেটে পাইলাম। এ জহুরা কে? কেন বা আসিল? বুঝিতে পারিলাম না। হয় ত ইহার দেখা পাইলে সব রহস্য ভেদ করিতে পারিব। কামরার বাহিরে যাইবার বড় ইচ্ছা হইল। চারিদিকে কাল রংএর ধূলো ও আলকাত্‌রা দেখিয়া মনে হইল জাহাজটি কয়লা জাহাজ। আমি উঠিয়া এক টুকরা কাঠ লইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলাম। বাহিরে সমুদ্রগর্জ্জনের শব্দে সে শব্দ ডুবিয়া গেল। আমি তখন প্রাণপণে আঘাত করিতে লাগিলাম তখন দুইজন বলিষ্ঠ আকারের নাবিক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল" কি বাবু? এত গোলমাল কোর্‌ছ কেন?"

"গোলমাল কি? আমি বাহিরে যেতে চাই।"

লোকটা হাসিয়া বলিল "তার আর আশ্চর্য্য কি? খোলা হাওয়ায় যেতে চাও?"

"হাঁ।"

"কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার স্বাস্থ্যের হানি হবে। ওইখানেই থাবো। ভাল কামরা পেলে বোধ হয় সুবিধা হোত না?"

আমি স্থিরভাবে বলিলাম "একটা উপকার আমার কর। তোমাদের কাপ্তানকে ডেকে দাও। তোমরা কাপ্তানের আদেশে আমায় বন্ধ রেখেছ আমি তাঁর সঙ্গে কথা বোলতে চাই।"

দুজনে আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল তারপর বলিল "তুমি গোলমাল যদি না করতে তাহলও আমরা কয়েক মিনিট পরে তোমায় দেখ্‌তে আসতুম।"

আমি হাসিলাম "যাও কাপ্তানকে ডাক।"

"বেশ দরজা বন্ধ করে দেব কিন্তু।"

"তা দাও। তবে না খেতে দিয়ে মেরো না" দুজনে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে দরজা লাগাইয়া দিল তারপর একজন অপরকে বলিল "লোকটা ত বদমায়েস নয়, ও ত ভদ্রলোক।'

পাঁচ মিনিট পরে লম্বা দাড়িওয়ালা একজন লোক দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কাপ্তান?"

সে বলিল "হাঁ"

"কোন অধিকারে এখানে আমায় বন্ধ রেখেছ! আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হয়ে দেখি সমুদ্রের উপর বন্দী অবস্থায়।"

"তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। সমুদ্রযাত্রায় তোমার উপকার হবে।"

"তা হলে শরীর সারাতে এখানে এসেছি? এ জাহাজের নাম কি?"

"তুমি নিজে বের করে নাও না?"

"তা সে বেশী কথা নয়; কিন্তু কাপ্তানই হও আর যাই হও আমায়বন্দী ক'রবার অধিকার তোমার নেই।"

"হাঁ কর্ত্তা, আমার যা খুশী তাই কোরব। তুমি যদি মুখবন্ধ না কর ত আর দেশ দেখ্‌বার আশাও ছাড়!"

"খুব ভদ্রভাবে কথা বোলতে জান ত তুমি!"

"যে বন্দরে জাহাজ লাগাবে সেখানকার কন্সল তোমার এ ব্যবহারের প্রতিশোধ দেবেন।"

"আমি ওদের মানি না। আমিই আমার জাহাজের কর্ত্তা।"

"কিন্তু জাহাজ চালান বন্ধ হ'লে অন্যরকম মনে হবে।"

"আমার জাহাজ চলা বন্ধ কোরতে হ'লে তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধির দরকার।"

"আমাকে স্বাধীনতা দিলে, আর কেমন কোরে আমি এখানে এলাম সরল ভাবে সব জানালে তোমার পক্ষে বোধ হয় ভালই হোত।"

"তোমাকে এখানে পাঠান হোয়েছে কেন, আমি তার কি জানি?"

"কে এখানে পাঠাল আমায়?"

"আমি তখন জাহাজে ছিলাম না,—জানি না।"

"এখন আমরা কোন্ সমুদ্রে?

"পরে জান্‌বে। এখন থেকে অত ভেবো না।"

"নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বার মত কামরাটাও আমায় দেওয়া হয় নি, এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হবার উপদেশ!"

"এ, তো যাত্রী জাহাজ নয়। খাবে কিছু!"

"খাবার আগে একটু বেড়াতে পেলে ক্ষিদে হোত।"

"না, রদ্দুর লাগ্‌লে সর্দ্দিগর্ম্মি হবে।"

"এখানে থাক্‌লে দমবন্ধ হ'য়ে মারা যাব যে।"

"সেও ভাল।"

"তাহলে তুমি আমায় স্বাধীনতা দিতে নেহাৎ নারাজ?"

"হাঁ, তোমায় আপাততঃ এখানে থাক্‌তে হবে।"

"কার আদেশে?"

"জানতে পাবে না।"

"ওঃ! ঘুষ খেয়েছ? কিন্তু ভেবে দেখো খুনের সাহায্য করার ফলটা কি।"

"হাঃ হাঃ হাঃ কে প্রতিফল দেবে? তোমার কল্পনা নাকি? যতক্ষণ কাগজ পত্রে গোলমাল না থাকে ততক্ষণ ওরা কিছু বলে না।"

"কিন্তু বিনাপরাধে বন্দী করবার জন্য যদি গ্রেপ্তার করাই তোমাকে?"

"আমার মনে হয় তুমি তা পারবে না বাবু।"

"কেন সরলভাবে সব কথা বল না বাপু?"

"কাকে বোল্‌ব? তোমার কি মাথার ঠিক আছে?"

"পাগল বলে বাইরে যেতে দিচ্ছ না?"

"হাঁ শুনেছি তোমার উপর নজর রাখা দরকার।"

"এটা জেনেও অজ্ঞান অবস্থায় আমায় জাহাজে নিলে?"

"বলেছি ত আমি তখন জাহাজে ছিলেম না, ফিরে এসে তোমায় দেখ্‌তে পাই।"

"তাহলে আমার সমুদ্রে হাওয়া খাওয়ার জন্য যে তোমায় ঘুষ দিয়েছে তার নাম জান না?"

"আমি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে কাজ কোর্‌ছি।"

"তোমার কর্ত্তৃপক্ষ? কে তারা? জাহাজের কি নাম?"

"Hanways রা কর্ত্তা। জাহাজের নাম প্রেট্রেল।"

"কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

"উপর হতে আমার প্রতি আদেশ,—সেসম্বন্ধে তোমায় কোন খবর না দেওয়া; আর যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবহার করতে।"

"তুমি বুদ্ধিমান, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা কি ঠিক নয়?"

"না কর্ত্তাদের আদেশ আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"জেনে রেখো তুমি নিজকে খুনের মামলায় জড়াচ্ছ।"

"মিল্‌ছে বেশ—তাঁরাও বলে দিয়েছিলেন ঐটাই তোমাতে গোল, জ্ঞান হ'লে তুমি ওই সব বোল্‌বে। আমি চল্লেম। তুমি মনে করতে পার এ যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছ।"

এই কথা বলিয়া নাবিক দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, আমি তবে বন্দী!

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

গান।

—:o:—

যে যাতনা অযতনে,—
মনে মনে মনই জানে;
পাছে লোকে হাসে শুনে,
লাজে প্রকাশ করি নে।

প্রথম মিলনাবধি,
যেন কত অপরাধী;
নিরবধি সাধি প্রাণপণে;—
তথাপি সে নাহি তোষে
আরও দোষে অকারণে!!

৺রামনিধি গুপ্ত।

স্বরলিপি।

[রচনা ও সুর—৺রামনিধি গুপ্ত।* স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।]

(ওর্ফে নিধুবাবু)

মিশ্র সিন্ধু—মধ্যমান।

স্থায়ী।

২´

ণা –া ধা পা মা II{–া জ্ঞা রা স রা –া –া –া |

যে ০ যা ত না ০ অ য ত নে ০ ০ ০

৩ ০

| –া । রা পা মা পা –া –া | মা –া –জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা রা –া –া –া |

০ ০ ম নে ম নে ০ ০ ম ০ ন্ ই জা নে ০ ০ ০

১ ১

| (–া –া । ণা –া ধা পা মা)}I –া –া । সণা –া ধর্সণা –া ধা I

০ ০ ০ ‘যে ০ যা ত না’ ০ ০০ এ০এ০ ০ ০ এ

২´ ৩

I –পা মা –জ্ঞা রসা –রা পা –া পা | –া পা –া মা জ্ঞা মপা মা –া |

০ এ ০ এ০ ০ এ ০ এ ০ এ ০ ম নে ম০ নে ০

০ ১

| –া –া –জ্ঞরা রজ্ঞা –মপা –মজ্ঞমা জ্ঞা রা | –া –া –জ্ঞরা রা ণা ধা ণা ধা I

০ ০ ০০ ম০ ০০ ন্০ ই জা নে ০ ০ ০০ পা ছে লো কে হা

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গানখানি শ্রীধর কথক কর্ত্তৃক রচিত। —লখিকা।

২´ ৩

I{ ণা –া ধা ণা –া –া –া –া | –া ধা র্সা –া –া –া র্সা ণা |

সে ০ শু নে ০ ০ ০ ০ ০ লা জে ০ ০ ০ প্র কা

০ ১

| –ধা ণা –া –া ধা পা –া –া | (–া –া –া রা ণা ধা ণা ধা)}I

শ্ ক ০ ০ রি নে ০ ০ ০ ০ ০ ‘পা ছে লো কে হা’

১´ ২´

I –া –া । সা –রা মা –পা ধা I –া ণর্সণা –া ধণধা –পা পা –া পা |

০ ০০ এ ০ এ ০ এ ০ এ০ ০ ০ এ০০ ০ এ ০ এ

৩ ০

| –া পা –া পা ধা –া –া –া | ণা র্সা –ণধা পমা –ধা –ণর্সণা ধপা মজ্ঞা |

০ এ ০ লা জে ০ ০ ০ প্র কা ০শ্ ক ০০ ০০০ রি০ নে

১

: –া –রসা –রা র্সণা –ধর্সণা ধা পা মা II

০ ০০ ০ ‘যে ০০০ যা ত না’

অন্তরা।

২´

মা মা মা পা –া II{ –া মা মা জ্ঞা রা –া –া রা |

প্র থ ম মি ০ ০ ল না ব ধি ০ ০ যে

৩ ০

| জ্ঞা রা ম –া –া জ্ঞ রা সা | রা –া ণ্া রা সা রা রা জ্ঞা |

ন ক ত ০ ০ অ প রা ধী ০ নি র ব ধি সা ধি

১ ১

| (র্জ্ঞা র্মপা –া মা মা মধা পা –া)}I –া রা জ্ঞা মা পা –া –া । I

প্রাণ পণে ০ ‘প্র থ ম০ মি ০’ ০ প্রা ণ প ণে ০ ০০

২´ ৩
I মা মা মণা ধা ণণর্সা নর্সর্রর্সা না র্সর্সা | –া না না র্সনা র্সা –া –া মা |
এ ঐ এ এ এ০০ এ০ ০ ০ এ এ ০ ০ যে ন ক ০ ত ০ ০ অ

০
| র্সনর্সর্রর্সণর্সা ণর্সণা ধা –া পর্সা ণধা পা পধণধপধপমগা |
প ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা০ ০ ধী ০ নি র ০ ব ধি০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

১
| মপা পণধা –পধা না –র্সর্রা র্সনধনা র্সা –া I
সা০ ধি০০ ০ ০ প্রা ০ ণ প০০০ ণে ০

২´ ৩
I{ –া –া মা পা মা পা –া –া | মা জ্ঞা রা সা –া –া রা –জ্ঞজ্ঞা |
০ ০ ত থা পি সে ০ ০ না হি তো যে ০ ০ আ র্ ও

০ ১
| রা মা –া –া জ্ঞা রা সা রা | (–া –া মা ধণা ধা –া –া ধা) }I
দো ষে ০ ০ অ কা র ণে ০ ০ ‘ত বু সে ০ ০ তো’

১ ২´
I –া –া । মা ধণা ধা –া ধা I –া ধা –া ণা –ধণা পধণর্সা –া ধা |
০ ০ ০ এ ০ এ ০ এ ০ এ ০ এ ০ ০ এ ০ ০ ০ ০ এ

৩ ০
| –পা পা –া পা –ধধা ণা র্সা –া | –া ণা –ধা পমা –ণধা –ণর্সণা –ধপা মজ্ঞা |
০ এ ০ আ র্ও দো ষে ০ ০ অ ০ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র ণে

১
| –া –রসা –রা র্সণা –ধর্সণা ধা পা মা II II
০ ০ ০ ০ ‘যে ০০ ০ যা ত ন’

রাজতরঙ্গিণী।

—:০:—

তৃতীয় তরঙ্গ।

রাজা সন্ধিমতী কাশ্মীরসিংহাসন পরিত্যাগ করিলে পর মন্ত্রীগণ গান্ধারে গমন পূর্ব্বক মহা সমারোহে মহামতি মেঘবাহনকে কাশ্মীরে আনায়ন করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইয়াছিল। মেঘবাহন উত্তরকালে সহৃদয় ও দয়ালু নৃপতিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। জীবে তাঁহার অসীম করুণা। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রখ্যাতনামা ভিক্ষুগণও তাঁহার ন্যায় জীবে দয়াশীল ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার রাজ্যে জীবহত্যা এক কালে নিবারিত হইয়াছিল। ব্যাধ প্রভৃতি যে সকল জাতির পশু হননই জীবিকা, তিনি অর্থদান করিয়া তাহাদিগের জীবনধারণের উপায় করিয়া ছিলেন। তিনি দুইটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মেঘবন নামক একটি গ্রামের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল ব্রহ্মণগণ এই গ্রামে বাস করিতেন। মেঘমঠ নামক তিনি একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করেন তাঁহার মহিষী অমৃতপ্রভা বৌদ্ধদিগের জন্য তাঁহার নানানুযায়ী অমৃতভবন প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যতম মহিষী যুকদেবী সপত্নীর যশঃ গৌরব নির্জ্জিত করিবার মানসে নদবন নামক এক অপূর্ব্ব বিহার নির্ম্মাণ করান। ইহার একাংশে বৌদ্ধ ছাত্রগণে জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, অপরাংশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিগণ সপরিবারে বাস করিত। অপর মহিষী ইন্দ্রদেবী ইন্দ্রদেবী-ভবন নামক একটি সুউচ্চ সমচতুষ্কোণী মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। আদম, মাম্মা প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণ সপত্নীগণের উদাহরণ অনুযায়ী তাঁহাদিগের নিজ নিজ নামানুসারে বহু মঠ ও বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্মীরে তৎকালে বহু সৎকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। রাজা অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রচার কল্পে ও অন্যান্য রাজন্যবর্গকে জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে বিজয়-অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি লঙ্কাদীপে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। লঙ্কায় যখন তিনি লোহনা নামক পর্ব্বত পাদমূলে উপস্থিত হন, সৈন্যগণ যখন তালীবন ছায়ায় বিশ্রাম করিতে ছিল, বিভীষণ পারিষদ সমভিব্যাহারে মেঘবাহনের সম্বর্দ্ধনা সঙ্গীত করিতে করিতে তাঁহার

সমীপে বন্ধুভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লঙ্কেশ্বর কাশ্মীরাধিপতিকে সসম্মানে লঙ্কায় অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ উপচারে অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহার মাংসলোলুপ রক্ষগণকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর বিভীষণ, কাশ্মীর রাজাকে পতাকা উপহার প্রদান করেন। এই সকল পতাকায় বিনয়াবনত রাক্ষসগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এমন কি অদ্যাপি যখন কাশ্মীর রাজ কোন পর্ব্বোপলক্ষে বহির্গত হন, পরধ্বজ নামক এই সকল পতাকা সেই শোভাযাত্রার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে। তিনি এই প্রকারে রাক্ষস রাজ্যে জীবহত্যা নিবারিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও বনানী মধ্যে কেহই জীবহত্যা করিতে সমর্থ হইত না। আমরা এই অতি সদাশয় দয়ালু নৃপতির কাহিনী জঘন্য স্বভাব ব্যক্তিগণ সমক্ষে বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু ঋষিগণ পুণ্যকাহিনী বিবৃত করিবার কালে শ্রোতাগণের সন্তোষ অসন্তোষের বিচার রাখেন না। রাজা চতুস্ত্রিংশৎ বর্ষ, রাজত্বের পর দেহত্যাগ করেন।

তদীয় পুত্র শ্রেষ্ঠসেনা পিতৃসিংহাসনারূঢ় হন। ইনি প্রবরসেনা ও তুঙ্গজিন নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি মাতৃচক্র, প্রবরেশ্বর ও আরও অনেক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু রাজাকে তিনি শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। ত্রিংশ বৎসর সুভাবে প্রজাপালনান্তর শ্রেষ্ঠ দেহত্যাগ করেন। ইনি সর্ব্বদা তাঁহার মণিময় তরবারি ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে হিরণ্য পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অপর পুত্র তোরামান ভ্রাতৃ রাজ্যশাসনে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি ভল্লরাজ প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহার স্থগিত করিয়া দীনরা নামক মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁহার এই কার্য্যে রাজা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন। তোরামানের সহধর্ম্মিণী ইক্ষাকুবংশীয় বরেন্দ্র রাজকন্যা অঞ্জনা স্বামীর সহ স্বইচ্ছায় কারাবাসিনী হন। তদবস্থায় তিনি দোহদবতী হন। অঞ্জনা আসন্নপ্রসবা হইলে গোপনে এক কুম্ভকারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন; তথায় তাঁহার এক পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হয়। অতি যত্নে কুম্ভকারগৃহিণী সন্তানকে নিজ পুত্ররূপে লালন পালন করে। কুম্ভকার ও তাহার পত্নী ব্যতীত অন্য কেহ সেই বালকের প্রকৃত পিতৃমাতৃ তত্ত্ব অবগত ছিল না। বালকের জননীর অনুরোধে সেই সন্তানের নামকরণ পিতামহের নামানুযায়ী হইয়াছিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সাধারণ ইতর ভাবাপন্ন বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল ও সুযোগ ও সুবিধামত সমৃদ্ধ বালকগণের সঙ্গ লাভের চেষ্টা করিত। ক্রীড়া কালেও সে নিজে রাজা সঙ্গীগণকে প্রজারূপে পালন করিবার অভিনয় করিত এবং শিষ্টকে পুরস্কৃত ও দুষ্টকে দণ্ড প্রদান করিয়া তাহার রাজ প্রবৃত্তির পরিচয় দিত। কুম্ভকার মৃণ্ময় পাত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে মৃত্তিকা দান করিত সে তদ্বারা শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিত। একদা বালকের মাতুল জয়েন্দ্র তাহাকে এরূপ ক্রীড়ারত দেখিয়া এবং বালকে তাঁহার ভগ্নিপতির সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বালকের পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। বালক তাঁহার পরিচয় অবগত ছিল না। তিনি তাঁহার নাম বালকের নিকট প্রকাশ করিলেও কোন ফলোদয় হইল না। ক্রীড়াবসানে বালক যখন নিজালয়ে প্রস্থানপর হইল, জয়েন্দ্র তাহার অনুগামী হইলেন এবং তথায় তাঁহার ভগিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। বহুদিন পরে এরূপ ভাবে ভ্রাতাভগিনীর সাক্ষাৎ এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। তাঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে ক্রন্দননিরত দেখিয়া বালক কুম্ভকারগৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'মা ইনি কে?' কুম্ভকার গৃহিণীকেই বালক মাতৃ সম্বোধন করিত। কুম্ভকারগৃহিণী উত্তর করিল "ইনি তোমার গর্ভধারিণী মাতা ও উনি তোমার মাতুল। তৎশ্রবণে বালক ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল 'সে কি?' আমূল ঘটনা বিবৃত করিলে বালক তথায় তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মাতুল সহ স্বদেশে আগমন করিল এবং বহু চেষ্টায় সে পিতার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু হতভাগ্য পিতা সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মাতা স্বামীর সহগমনে উদ্যতা হইলে সন্তান তাঁহাকে নিরস্ত করিল কিন্তু নিজে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইল। রাজা হিরণ্য তৎকালে দ্বাত্রিংশ বৎসর দুই মাস রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলেন।

এই কালে উজ্জয়িনী নগরে মহাপরাক্রম বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অপর নাম হর্ষ। তিনি একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। শক ও ম্লেচ্ছগণকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার সভায় বিদ্বজ্জন সমাদৃত হইতেন এবং তিনি বিবিধ শিল্প কলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশ্বযশঃ কবি মাতৃগুপ্ত তাঁহার

সভায় তৎকালে অবস্থান করিতেছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাতৃগুপ্ত বহু রাজ সভায় জয় লাভ করিয়া অবশেষে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাহিত্য-স্পৃহা ও ন্যায় বিচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রভুরূপে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় ক্রুর নীচাশয় কলহপরায়ণ ও দাম্ভিকগণের স্থান ছিল না। রাজা প্রকৃতিবর্গের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অকাতরে দান করিতেন। গুণীর গুণগরীমা তাহার নিকট অপুরিস্কৃত থাকিত না। তিনি হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ ও গঙ্গ বারির ন্যায় পবিত্র ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ কেহই অসূয়াপরবশ ও পরনিন্দাপরায়ণ ছিল না। আগন্তুকবর্গ তাঁহার সভায় আদৃত হইত। তিনি কোন স্বার্থান্ধের যুক্তি গ্রহণ করিতেন না; এমন কি অতি নীচাশয় ব্যক্তিও তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইত। মাতৃগুপ্ত এইরূপ রাজার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন 'এতদিনে আমি মনোমত নৃপতির সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি।' মহাকবি সেই উন্নতমনা সংযতচরিত্র রাজার পরিচর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া দেশ-ভ্রমণ স্পৃহা ত্যাগ করিলেন। রাজসভায় সকলেরই অবারিত দ্বার; মাতৃগুপ্ত প্রতিদিন রাজসভায় উপস্থিত হইতেন কিন্তু রাজাদেশে, সভা পণ্ডিত বিদ্বজ্জন মধ্যে তাঁহার স্থান নিরূপিত হইল না। বিদ্বান হইলেই উন্নতমনা হইবে এরূপ কোন কথা নাই, রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া মাতৃগুপ্তের সততা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এবং পরীক্ষা মানসেই রাজা কবির প্রতি প্রথমে কোন প্রকার অনুগ্রহই প্রকাশ করেন নাই। মাতৃগুপ্তও তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া অনন্যমনে রাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন,—তাঁহার পরিচর্য্যায় অসম্ভব কিছু পরিলক্ষিত হইত না, তাচ্ছিল্যও প্রকাশ পাইত না, রাজ-অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেও রাজা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন না—তীক্ষ্ণ ধী মাতৃগুপ্ত ছায়ার ন্যায় প্রভুর ইচ্ছার অনুগমন করিতেন। রাজঅন্তঃপুর-পরিচারিকাবর্গের প্রতি তিনি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই, ইর্ষান্বিত দাসগণের সহিত তিনি কোন সংশ্রব রাখিতেন না। তিনি রাজ সমক্ষে কখন প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করেন নাই,—সভাসদের মধ্যে রাজকার্য্যচর্চ্চাকারীর অভাব ছিল না,—তিনি রাজার নিকট তাহাদের গুপ্ত মন্তব্য কোন দিন আভাসেও নিবেদন করেন নাই। প্রভুর কৃপালোলুপ সভাসদগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ

করিলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না;—তিনি নিজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন,—অন্যের গুণাবলী মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিতেন এবং নিজের গুণ যাহাতে পরিস্ফুট ও পরিলক্ষিত হয় সেরূপ কার্য্য তাঁহার করণীয় ছিল। সভাসদগণকে তাঁহার গুণে, তাঁহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইয়াছিল,—এইরূপে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় মহাকবি মাতৃগুপ্ত সাধারণভাবে একটি বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভ্রমণে বহির্গত হইবার কালে মাতৃগুপ্তের মলিন বেশ, ছিন্ন বস্ত্র, অতিকৃশ দুর্ব্বল দেহ দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন। সামান্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মাতৃগুপ্তের ন্যায় একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত, অধ্যবসায়ী, উপযুক্ত ব্যক্তির কি দুর্দ্দশাই না করা হইয়াছে! বিদেশে বন্ধুহীন, যত্ন করিবার তাহার কে আছে? সে শীতাতপে কষ্ট পাইলেও কেহ দেখিবার নাই। রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলেও কেহ ঔষধ পথ্য প্রদান করিবার নাই—দুঃখে কেহ তাহাকে শান্ত্বনা দিবার নাই। রাজা চিন্তা করিলেন কর্ম্মক্লান্ত দেহে বিশ্রাম প্রয়াসী হইলে তাহাকে শুশ্রূষা করিবার কে আছে? এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে ব্যক্তি তাঁহাকে সেবা করিতেছে,—তাহাকে তিনি প্রতিদানে কি দান করিয়াছেন,—উল্লেখযোগ্য কিছুই না! মাতৃগুপ্তের উপযুক্ত পুরস্কার কি,—সাধারণ অভাব নিরাকরণ ইহার যোগ্য প্রতিদান নহে—সেই পুরস্কার নির্দ্ধারণের চিন্তাতেই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া শীত ঋতুর আবির্ভাব হইল। প্রচণ্ড শীত সে বৎসর। চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন; দিবা পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল, সূর্য্যদেব গগণে নাম মাত্র দেখা দিয়া সমুদ্রের বাড়বানলের তাপে উষ্ণ হইবার আশায় সাগরবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ব্যস্ত।

গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন,—কক্ষে অগ্নি আধারে জ্বলন্ত অঙ্গার উজ্জ্বল রহিলেও দীপশিখা শীতবাতে নিষ্প্রভ নির্ব্বাবিতপ্রায় হইয়াছে। তিনি দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য রক্ষীগণকে আহ্বান করিলেন কিন্তু তাহারা সকলেই নিদ্রাভিভূত। রাজা তখন উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"কে আছ?" উত্তর হইল "আমি মাতৃগুপ্ত।" রাজ-আদেশে মাতৃগুপ্ত সজ্জিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দীপশিখা বর্দ্ধিত করনান্তর প্রস্থানোন্মুখ হইলে রাজা তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। শীতে ও ভয়ে মাতৃগুপ্ত তখন কম্পিত কলেবর। রাজা প্রশ্ন করিলেন "এখন কোন যাম?" মাতৃগুপ্ত উত্তর করিলেন "ত্রিযামা শেষ যামে

উপনীত!" রাজা বলিলেন "কি প্রকারে তাহা তুমি অবগত হইলে—তুমি কি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিতেছ ?"

আত্ম অবস্থা নিবেদনের সুযোগ সমুপস্থিত এইরূপ বিবেচনায় মহাকবি তৎমুহূর্ত্তেই একটি শ্লোক রচনা করিয়া বলিলেন,—অনন্ত উৎকণ্ঠা-সমুদ্রে নিমজ্জিত যে, শীতে যে আর্ত্ত—ক্ষুধায় যাহার কণ্ঠ ক্ষীণ, হৃদয়ের সন্তোষ ব্যক্ত করিতে অসমর্থ—ওষ্ঠ কম্পন মাত্রই সার,—তাহার সান্নিধ্য হইতে যোষিতা নিদ্রা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর ন্যায় সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। সুশাসিত রাজ্যের ন্যায় রজনীও আমার নিকট দীর্ঘ! রাজা কবির দুঃখ শ্রবণে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিতে বলিলেন। গুণীর গুণকে এরূপ ভাবে উপেক্ষা করা হইতেছে,—সে চিন্তা রাজাকে ব্যথিত করিল, কিন্তু কবির উপযুক্ত পুরস্কার কি, তাহা তিনি অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া কাতর হইলেন। অবশেষে তাহার স্মরণ হইল—ভুস্বর্গ কাশ্মীর সিংহাসন এখন শূন্য,—ইহাকে কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ়কল্প হইয়া,—সেই রাত্রেই কাশ্মীর রাজ্যে গুপ্তভাবে দূত প্রেরণ করিলেন,—দ্বিধাহীন হইয়া মাতৃগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করিতে কাশ্মীরের মন্ত্রীগণকে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিলেন। যথারীতি লিখিত আদেশ পত্র স্বয়ং মাতৃগুপ্তই বহন করিয়া লইয়া যাইবেন—তাহা দূতগণকে বিজ্ঞাপিত করিতে বলিলেন। দূতগণ প্রস্থান করিলে রাজার আর সে রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হইল না—তিনি লিখিত-আদেশ প্রেরণের উৎকণ্ঠায় অবশিষ্ট রজনী বিনিদ্র ভাবে যাপন করিলেন।

অন্যপক্ষে মাতৃগুপ্ত আশাহত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন;—রাজ সমীপে তাহার আত্ম-নিবেদন বৃথা ও কেবল লজ্জার কারণ হইল—মহারাজার কৃপা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করি নাই, কিন্তু আমার সকল আশায় অন্ত হইল। আশাই অশেষ অশান্তির কারণ, আশাকে সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দিয়া আমি মহাশান্তিতে পর্য্যটনে বহির্গত হইব। অন্যের নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম—রাজা বিক্রমাদিত্য সেবা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যশঃ হইতে সকল সময় সত্য নির্ণীত হয় না। রাজা অতি মেধাবী, তিনি অনুগৃহীতকেই অর্থ প্রদান করেন। ইহার জন্য রাজা নিন্দনীয় এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে কারণ আপনার কর্ম্মের দ্বারাই

মনুষ্যের ভাগ্য* নিরূপিত হয়, মানুষ আত্মভাবে দুঃখ ভোগ করে। রত্নাকর বেলাভূমিতে মূল্যবান রত্নরাজি নিক্ষেপ করেন কিন্তু কেহ যদি বিপরীত ঝটিকাতাড়িত হইয়া সেই রত্নপূর্ণ উপকূলে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হয়, সে দোষ সমুদ্রের নয়—হতভাগ্যের অদৃষ্টের। যদি কেহ রাজদান অভিলাষী হয়, তাহার উচিত রাজ পারিষদের পরিচর্য্যা করা কারণ রাজ-হৃদয় আকর্ষণ করা অতি কঠিন কার্য্য! স্বয়ং মহাদেবকে যে উপাসনা করে তাহার ভাগ্যে ভস্মলাভই সার হয় আর যে শিববাহন বৃষের পরিচর্য্যা করে সে প্রতিদিন স্বর্ণলাভ করিতে সমর্থ হয়। আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ এরূপ কিছু অনুষ্ঠিত হয় নাই যাহাতে রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। সাধারণ দ্বারা ঢক্কানিনাদিত না হইলে রাজদৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। কেবল পরিচর্য্যায় ইচ্ছাই রাজদ্বারে যথেষ্ট নহে,—নীচও সাধারণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করে। বারিবিন্দু সমুদ্রবক্ষে অবস্থান কালে আত্মসত্বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না—তাহার অস্তিত্ব কেহই অনুভব করে না কিন্তু যখন সেই বারিবিন্দুই মেঘ দ্বারা নীত হইয়া পুনঃ তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্র বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই মুক্তার ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ চিন্তায় করিয়া কবি প্রভুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। সুধীজনেরও সদ্বিবেচনা দারিদ্রে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রজনী প্রভাত হইল। রাজা সভায় অধিষ্ঠিত হইলেন। দৌবারিককে মাতৃগুপ্তকে রাজসভায় আনয়ন করিবার আদেশ হইল। হতাশ কবিবরকে রাজ সকাশে উপস্থিত করা হইল। কবি বিনীত ভাবে রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান। রাজা মহাফেজকে আদেশ-পত্র প্রদান করিতে ইঙ্গিত করিয়া মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কাশ্মীরের পথ অবগত আছ কি? এই লিপি কাশ্মীরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রীকে প্রদান করিতে হইবে,—পথি মধ্যে এ পত্র পাঠ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর।"

মহারাজের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে—এরূপ অঙ্গীকার করিয়া মাতৃগুপ্ত রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সৌভাগ্যদেবী তাঁহাকে বরমাল্য দান করিতে বিতত হস্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন—মাতৃগুপ্তের নিকট তাহা তখনও অজ্ঞাত! রাজা যথারীতি রাজকার্য্যে মন নিবেশ করিলেন। এরূপ নিস্বহায় ও বন্ধুহীন ভাবে মাতৃগুপ্তকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন, মাতৃগুপ্তের ন্যায় গুণবান ব্যক্তিকে হেয় পত্রবাহক রূপে নিযুক্ত

করায় সকলেই রাজাকে নিন্দাভাগী করিলেন। নির্ব্বোধ রাজা, অবশেষে কিনা যিনি সৌভাগ্যের আশায় তাঁহাকে দিবারাত্র সমভাবে অক্লান্ত সেবা করিলেন, তাঁহাকেই এইরূপ শ্রমসাধ্য ক্লেশকর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভৃত্যেরা ভবিষ্যত সৌভাগ্যের আশাতেই প্রভুর সেবা করিয়া থাকে কিন্তু প্রভু, ভৃত্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল সেবাতেই তাহার সার্থকতা মনে করেন। গরুড়ের ভয় হইতে ত্রাণ লাভের আশায় নাগগণ নারায়ণের সেবা করে কিন্তু নারায়ণ নাগগণকে গুরুভার বহনে সমর্থ বিবেচনা করিয়া পৃথিবীর ভার ধারণে আদেশ করেন। এই বহুগুণে বিভূষিত বিদ্বান, কবিবর রাজসভায় পণ্ডিতগণকে সমাদৃত হইতে দেখি। রাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজার মনুষ্য চরিত্রে জ্ঞান অতি অল্প, নতুবা কেন তিনি সুবিদ্বান মাতৃগুপ্তকে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন! শিখি মেঘে ইন্দ্রধনু দর্শনে আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে কিন্তু জলদ প্রতিদানে নিছক বারিবিন্দু ব্যতীত তাহাকে কিছুই দান করে না।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য

[শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা]

[সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে বরিশালে গিয়াছিলেন; বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা হইতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণের উত্তরে শরৎ বাবু বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আমি বক্তা নই। কিছু বল্‌তে আমি আদপেই পারিনে। ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার

বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, কিন্তু কিছুদিন থেকে লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্য-সেবাই বড় সার্থকতা মনে হ'ল না। আমাদেরই সাহিত্যব্যাপারে কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে! সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হ'য়ে তার ভিতরের বাসনার কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে কাজে চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিকই মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিষ দেবার যো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাওয়ার যো নেই, ওদিক যাবার যো নাই, কোনদিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু আধটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভেবে ভেবে যদি বা একটা প্লট ঠিক করি তার নায়ককে ভেবে ভেবে বামুন ক'রতে হবে। কায়েতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রাখার যো নেই—তা'হলে সমাজ তেড়ে উঠ্‌বে।

আর এক কথা, স্বাধীনতার মানে অরাজকতা anarchy নয়। রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। "সিডশন" (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। আমার মনে হয় বড় সাহিত্যিক এখন আমাদের হবে না। রাজনীতিতে, ধর্ম্মে আচারে যেদিন আমাদের হাতবাঁধা পা-গুটানো থাক্‌বে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখ্‌তে পারবো, সেদিন বুঝ্‌ব সাহিত্য লিখ্‌ছি! বড় কথা বল্‌বার আমার শক্তি আছে। দু-বছর লেখা আমার বন্ধ। যেদিন আপনাদের মন চাইবে বড় আদর্শ, মুক্তির আনন্দ সেদিন বাস্তবিকই আনন্দ পাব। সকলের যদি বন্ধন-খসানোই আদর্শ মনে হয়, তবে আমিও তাই করব। আপনারাও যদি সাহায্য করেন, তবেই হবে। আমার ইচ্ছে এই, আমার কামনা এই, যেন এর চেয়ে বড় সাহিত্য লিখ্‌তে পারি। আমি লিখ্‌তে চাই মুক্তির সাহিত্য। এতে আপনাদের আনুকূল্য ও সহানুভূতি চাই, তবেইত সফল হব। আমি সামান্য যা কিছু লিখি তাতে কত সময় কত গালাগালি খাই। সমাজ একদিন গালাগালি দেবে না—অনুকূল

হবে; পারিপার্শ্বিক অবস্থা আশানুরূপ হয়ে উঠ্‌লে, যদি বেঁচে থাকি, সেইদিন হয়ত বড় সাহিত্য রচনা করতে পারবো। আর এখন যা লেখা হয়েছে, তা—মন্দ কি? ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্য)

—তরুণ, জ্যেষ্ঠ।

মোগল-সন্ধ্যা

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—দরবারকক্ষ কাল—প্রভাত।

জাহান্দার ও জুলফিকার।

জাহান্দার। জুলফিকার খাঁ! এ রাজ্যের সম্রাট কে?—বলো—

জুলফিকার। (একটু আশ্চর্য্য হয়ে) বেয়াদপি মাফ করবেন, আজ এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

জাহান্দার। বলো, আমার প্রয়োজন আছে।

জুলফিকার। জাহাপনাই এ দুনিয়ার মালিক।

জাহান্দার। তবে কার হুকুমে এ দুনিয়াটা চলবে?

জুলফিকার। আপনারই হুকুমে, জাঁহাপনা।

(ইমতিয়াজ প্রবেশোদ্যত)

জাহান্দার। জাহানকে বন্দী করেছ?

জুলফিকার। হাঁ করেছি খোঁদাবন্দ।

জাহান্দার। যখন সিংহাসনেই বসেছি তখন পুতুল সাজ্‌তে পারব না, জুলফিকর খাঁ। তোমার বিচার হবে—জাহানকে বন্দী করবার আদেশ আমি দিয়েছিলাম?

(ইমতিয়াজের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। তুমি দেও নি, সম্রাট কিন্তু আমিই দিয়েছি।

জাহান্দার। অধিকারের একটা সীমা আছে, সম্রাজ্ঞী। যাও, জুলফিকার, এবার তোমায় ক্ষমা করলুম—সাবধান।

(জুলফিকারের কুর্নিস করিয়া প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। ভেবেছিলুম সম্রাজ্ঞী হয়েছি, রাজকার্য্যেও আমার অধিকার আছে—সে আমার ভুল—বাদশার বিলাসের লীলা পূর্ণ করবার জন্য ইমতিয়াজ বেগম হয়েছে। এত অপমান! বাদসা দয়া ক'রে বেগম করেছে—এ দয়া ত যেচে আমি ভিখারীর মত নেই নি।

এ রইল তোমার কোহিনুর মণি—ইমতিয়াজের বেগম সাজবার পালা শেষ হয়ে গেছে।

(মুকুট জাহান্দারের পায়ের কাছে রেখে)

(আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে)

জাহান্দার। ইমতিয়াজ,—তোমার চোখের কোণে, এ কি শিশিরের মত টল্‌ টল্‌ করছে? হৃদয়ের ব্যথা এখনি গলিত নীহারের মত ঐ ইন্দীবর আঁখি দুটী হতে অবিরল ধারে প্রবাহিত হয়ে আসবে। তোমার চোখে জল? ইমতিয়াজ!

ইমতিয়াজ। না বাদশা! তোমার জিনিষ তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি তাতে আমার চোখে জল আসবে কেন?

(আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে)

জাহান্দার। (মুকুট তুলে হাতে নিয়ে) এসো, এই নাও আমিই তোমায় পরিয়ে দিচ্ছি।

কি বেদনা ভরা মানুষের জীবন—বেদনার অনন্তলহরী গুণে গুণেই জীবনের অবসান এসে পড়ে। জীবন আঁধারময়। সুখের আশা এ আঁধারে আলেয়ার আলোটুকু জেলে—জীবনকে আরও দুর্ব্বিসহ করে তোলে।

ইমতিয়াজ তোমায় ভাল বেসেছি, তোমার ঐ কালো আঁখিতারার আবেশ সাগরে সব ডুবিয়ে দিয়েছি, তবু কেন বিরাট হাহাকার সমস্ত জীবনটাকে দাবানলের জ্বালায় পুড়িয়ে দিচ্ছে—জানি না এ শূন্যতা আমার কিসে ভরবে,—

ইমতিয়াজ। জীবন একটা সুখের খেলা বাদশা। এ সাদা আলোর জগৎ; যখন যে রঙের কাচের ভিতর দিয়ে দেখবে, সে রঙ্ তখনি এতে প্রতিফলিত হবে। তুমি ভেবে ভেবে একে দুঃখের করে তুলচো।

জোহেরা সিরাজী লে আও।

(জোহেরার প্রবেশ)

জাহান্দার। হাঁ মাঝে মাঝে কব বাত করে কে আমায় পাগল করে তোলে!

ইমতিয়াজ, এ সিরাজী আমার সকল বেদনা দূর করে দিতে পারবে?

ইমতিয়াজ। হুঁ, পারবে।

জাহান্দার। তবে দাও—(এক গ্লাস পান করে) আর এক গ্লাস (পান করা) একেবারে ডুবে যাবে কোন হ্যায়. জুলফিকর খাঁকে বোলাও—বাঁদী, তুই গাইতে পারিস্?

বাঁদী। হাঁ পারি, জাহাপনা।

জাহান্দার। নাচতে পারিস্?

বাঁদী। নাচতে পারতুম কিন্তু আর পারব না জাহাপনা, মাপ করবেন।

ইমতিয়াজ। কেন কি হয়েছে তোর?

বাঁদী। সে শুনে আর কি হবে—ঐ সেই কাণার ছেলেটা চিন্‌কালিচ্ খাঁ আমায় পালকী থেকে নামিয়ে মার দিয়েছে। আগের দিনে বেগমদের বাঁদীর কত আদর ছিল, কত ক্ষমতা ছিল এখন সব শেষ—যেমন বেগম তেমনি বাঁদী।

ইমতিয়াজ। চুপ কর্ জোহেরা। যা, তোকে আর গাইতে হবে না।

(জোহেরার প্রস্থান)

জাহান্দার। কে চিনকালিচ খাঁ অপমান করেছে এত সাহস তার!

(জুলফিকর খাঁর প্রবেশ)

জুলফিকর। জাহাপনা!

জাহান্দার। চিনকালিচ খাঁর স্পর্দ্ধা বড়ই বেড়েছে, বেগমের বাঁদীকে অপমান! জুলফিকার! তাকে বলবে—যে তার বিরুদ্ধে—অভিযোগ আছে—আমি সাক্ষাৎ আর সদুত্তর চাই।

জুলফিকর। যে আজ্ঞে, সম্রাট্!

জাহান্দার। আর একটা কথা আজ হতে সমস্ত রাজকার্য্য সম্রাজ্ঞীর ইমতিয়াজের নামে পরিচালিত হবে। রাজমুদ্রায় সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকবে, বুঝলে। সকল কাজেই, জুলফিকর খাঁ! তোমাকে সম্রাজ্ঞীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে—দেখো যেন অন্যথা না হয়।

জুলফিকর। যে আজ্ঞে,—জাহাপনা!

ইমতিয়াজ। আমার আদেশ পালন করতে গিয়ে তোমাকে অনেক রূঢ় কথা শুনতে হয়েছে জুলফিকর খাঁ! অসন্তুষ্ট হয়ো না।

জুলফিকর। না বেগম সাহেবা! কিছু মাত্র না।

(হামিদ খাঁর প্রবেশ)

হামিদ। (কুর্নিশ করিয়া) খোদাবন্দ! একটা জরুরী খবর আছে।

ইমতিয়াজ। কি খবর হামিদ?

হামিদ। বাংলা থেকে গুপ্তচর সংবাদ এনেছে—যে শাহজাদা আজিমের পুত্র ফরাকসিয়ার বাংলা ও বিহারের সুবাদার হুজনের সহায়তায় দিল্লী আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছে।

ইমতিয়াজ। এ কি সত্য জুলফিকর খাঁ?

জুলফিকর। হাঁ আমিও শুনিছি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি—এত সাহস তাদের পক্ষে সম্ভব নয়—সে জন্যই এ খবরটা আপনাদের জানান প্রয়োজন মনে করি নি।

জাহান্দার। সুবাদার হুজন কে? জুলফিকর!

জুলফিকর। হোসেন আর আবদুল্লা।

ইমতিয়াজ। তুমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। কত সৈন্য যুদ্ধে যেতে পারবে তা আমায় জানাবে।

জাহান্দার। যাও প্রস্তুত হও, আমিই সৈন্য পরিচালনা করব।

জুলফিকর। যে আজ্ঞে—(কুর্নিশ করিয়া চিন্তিত মনে প্রস্থান)।

ইমতিয়াজ। (হামিদকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া) দাঁড়াও হামিদ!

(হামিদের কুর্নিশ করিয়া অবস্থান)

৬

জাহান্দার। এ শুধু গোলযোগের সূত্রপাত,—যাই দেখি কি হয়।

(জাহান্দারের প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে হামিদ! রুস্তম কোথায় জান—

হামিদ। হাঁ জানি সম্রাজ্ঞী! সে দিল্লীতেই আছে।

ইমতিয়াজ। তাকে এখুনি বন্দী করবে, তা না হলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। আরও একটা কাজের ভার তোমায় দিচ্ছি, শুনে রাখো। ঐ জুলফিকার খাঁর উপর তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে। যাবার সময় তার অন্তরের উত্তেজনার দীপ্তি মুখে ফুটে উঠেছিল, কেমন একটা ক্রুর—ক্ষুরধার হাসি ওর ঐ চাপা ওষ্ঠের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল।

হামিদ। হাঁ সম্রাজ্ঞী।

ইমতিয়াজ। ও হাসির অর্থ বড় ভাল নয়। মনে হচ্ছে যেন সে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে হামিদ! তার প্রতিপদক্ষেপ তোমায় লক্ষ্য করতে হবে, এ কাজ তুমি পারবে?

হামিদ। হাঁ নিশ্চয়ই পারব।

ইমতিয়াজ। দেখো বিশ্বাসঘাতকতা করো না,—যদি পার পুরস্কার পাবে।

(হামিদ কুর্নিশ করিলে পর ইমতিয়াজের প্রস্থান)

হামিদ। এ জীবনকে একটা নূতন পথে চালিয়ে দিতে হবে। শাহজাদা জাহানের কথার প্রতিধ্বনি এখনও আমার কাণে বাজছে যে পথে আমি চলেছি সে পথে আমার মঙ্গল নেই। মঙ্গল অমঙ্গল জানি না কিন্তু সবার হাতে দড়ী বাঁধা বানর সাজবার ইচ্ছে আর আমার নেই। সবাই বলে "হামিদ" যদি এ কাজ কর পুরস্কার পাবে। আমার দুর্ব্বলতার সামনে একটা টোপ ফেলে আমায় গাঁথতে চেষ্টা সবারই দেখছি। তাই বাতাসের মত বয়ে চলেছি কখনও এ দিক আবার কখনও বা ও দিক।

এবার বয়ে যাচ্ছি লালকুমারী না ও কি বলছি সম্রাজ্ঞী ইমতিয়াজের অনুকূলে জুলফিকার খাঁ! তরী সামাল এতদিনে অনুকূল বাতাস আজ হতে তোমার পালে সম্মুখ হতে এসে আঘাত করবে।

(পটনিক্ষেপ)

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার নিকটবর্ত্তী প্রান্তর।

সময়—মধ্যরাত্রি।

জুলফিকার। কী ভয়ানক আঁধার! আকাশে ঘন কালো মেঘ স্তরে স্তরে সাজানো অঞ্চল, দিগন্ত-প্রসারিত। দিকে দিকে আঁধার গাঢ় জমাট শক্ত হয়ে উঠেছে। সব মৃতের ন্যায় নীরব নিঝুম।

এই নীরবতার মাঝে কিসের ঐ আর্ত্তনাদ বিদ্যুতের ঝলকের মতো আঁধারের পরদাটাকে ছিন্ন চুঁফাঁক করে দিয়ে গেল?

ও পাখীর ডাক।—

ঐ যে যমুনার কালো জল আঁধারকে বুকে ধরে—শয়তানীর মত ফাঁদ পেতে বসে আছে।

কে যেন অলক্ষ্য থেকে আমার অনুসরণ করছে—আঁধারের আবরণে কে সেই অস্পষ্ট ছায়া, অশরীরী প্রেতের মত মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে আবার লুকাচ্ছে?

(পশ্চাত হতে এসে হামিদখাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা
জুলফিকারের বাম হস্ত ধারণ)

হামিদ। প্রেত নয়, জুলফিকার খাঁ, আমি হামিদ তোমার দুরভিসন্ধি—আমি বিফল করব।

(হামিদ খাঁর মুঠোর ভিতর হতে হাতখানি ছাড়াইয়া
সেই হাতে তার দক্ষিণ হস্ত ধারণ)

জুলফিকার। হামিদ! ভালই হয়েছে শত্রু সৈন্যের অবস্থান দেখতে এসে আঁধারে পথহারা হয়ে পড়েছিলাম; চলো, আর একটু এগিয়ে যাই, ঐ যে দূরে জোনাকীর মতো আলোগুলি দেখাচ্ছে ঐখানে বোধ হয় শত্রুদের শিবির—চলো।

(হামিদের হাত ধরে নিষ্ক্রান্ত হওয়া)

হামিদ। (একটু পরেই) জুলফিকার খাঁ, বিশ্বাসঘাতক পিশাচ, খোদা তোমার বিচার করবে ওঃ—

(রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে জুলফিকার খাঁর প্রবেশ)

জুলফিকার। খোদার বিচার! জুলফিকার সে ভয় কখনও করে নি আজও করবে না। হাঁ, এই খোদার দোহাই দিয়ে দুর্ব্বল যারা তারা সবলের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

রূপমুগ্ধ যুবক! নিশ্চয়ই তুই ইমতিয়াজের কথায় আমার পেছনে লেগেছিলি। কুকুর, কেমন শাস্তি পেয়েছিস্ !

মিথ্যা পাপ পুণ্য, এ ভেদ মানুষে করেছে—যদি মিথ্যাই না হবে তবে পাপের সুযোগ এ গাঢ় অন্ধকার আকাশ থেকে আজ ঢলে পড়বে কেন ?

জাহান্দারও আমায় বিচার করতে চেয়েছিল, তার শাস্তির আয়োজন চলছে -ভেবেছিলুম তোমায় সিংহাসনে বসিয়ে প্রভুত্ব আমিই করব—কিন্তু সে আমার হল না—তাই তোমাকে আজ সরাতে যাচ্ছি—

ক্রমশঃই যে আঁধার বেড়ে চলেছে—কে যেন ঐ আসছে ?

(হোসেন আলি খাঁর প্রবেশ)

হোসেন আলি। কে, জুলফিকার খাঁ ?

জুলফিকার। কি, হোসেন ?

হোসেন। হাঁ, আপনাকে অনেক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি বোধ হয়—এ আঁধারে পথ চিনে আসতে দেরী হয়ে গেল।

(একটু কাছে এসে) এ কী, আপনার হাতে রক্তাক্ত শাণিত ছুরিকা, আপনাকে অতিশয় উত্তেজিত বোধ হচ্চে।

(ছোড়া কোষবদ্ধ করে)

জুলফিকার। হাঁ, একজন সৈনিক আমার অনুসরণ করেছিল তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। যাক্, সব প্রস্তুত এখনি উপযুক্ত সময়—

হোসেন। চলুন শিবিরে, সেখান হতে সকলে একসঙ্গে রওনা হবো।

প্রস্থান।

(পটনিক্ষেপ)

জাহান্দার। কে তুমি মিঠে হাতে বীণার তারে ঘা দিলে ?

ইমতিয়াজ। একেবারে উন্মত্ত! বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় নরকের আঁধার খোলা দরজা পেয়ে শ্রাবণের ধারাসারের মত পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দীপগুলি নিবে গেছে। যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। নাথ! এ রূপের শিখা ধরে আমিই যখন তোমায় পুড়িয়েছি, সুরার সাগরে তোমায় বিভ্রান্ত তরীর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেছি, তখন আমাকেই আজ তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করতে হবে। থাক তুমি তোমার বিলাস নিয়ে, ইমতিয়াজ চলল—এ কি কেন যেন মনে হচ্চে আজকের এ বিলাসই যেন শেষ। জুলফিকর খাঁ কোথায় গেল্ যাই,—দেখি।

জাহান্দার। কোন হ্যায় রে বাইজী লে আও—

মিছে যে আমার রজনী যায়।
গোপনতম, এস আধ ঘুমে,—এভরা যৌবন বিফলে যায়॥
আঁখি ভরে এস মোহন স্বপনে
রূপে রংগে গানে এস প্রাণে মনে
এস হে দয়িত এস প্রিয়তম
তনু মম তব পরশ চায়।
যদি ভুলে থাক থেক সুরে গীতে
আলো হ'য়ে থেক জোছনা নিশিথে
দক্ষিণ হাওয়াতে পিয়াল রেণুতে
পিক কুলুতানে হারাণো হিয়ায়॥

(হোসেন আলি খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, ফরাকসিয়ার, চিনকালিচ খাঁ ও জুলফিকার খাঁর উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রবেশ)

(নর্ত্তকী প্রস্থান)

হোসেন। জুলফিকর খাঁ! এই কি সম্রাট জাহান্দার।

জুলফিকর। হাঁ।

জাহান্দার। (নিমীলিত চক্ষে) সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল কেন ? ফুর্ত্তি করো।

(চক্ষু উন্মীলিত করিয়া)

এ কি? সৈন্যদল! হাতিয়ার! এ স্বপ্নের খেলা দেখিয়ে আমায় ভয় দেখাবে মনে করেছ কুহকিনী?

হোসেন। জাহান্দার বাদশা এ তোমার স্বপ্ন নয়,—তোমায় বন্দী করতে এসেছি।

জাহান্দার। (দাঁড়াইয়া) কে তোমরা এই ভরা নিশীথে আমার স্বপ্নের নেশাটাকে ছুটিয়ে দিতে এসেছ?—বুঝেছি, ও কে—জুলফিকর?

জুলফিকর! তুমি ওখানে কেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? ভাবছ বুঝি আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি? একটুও না,—এসো, কে আসবে, বন্দী করো।

সিয়ার। যাও হোসেন।

জাহান্দার। না সিয়ার তুমিই এসো।

(সিয়ার জাহান্দারকে বন্দী করিল)

কত রঙের তুলির স্পর্শে জীবনটা আমাদের চিত্রিত হয়ে উঠ্‌ছে, জুলফিকর? এ রামধনুর মত মানব জীবন, নানা ভাবের বিচিত্রতায় রঙীন হয়ে উঠে নিমেষে প্রতিভাত হয়ে আবার নিমেষেই মিলিয়ে যায়! এ কাগে-গড়া-তোলা প্রাসাদের মত, সাগরের পাড়ের ঢেউগুলির মত মুহূর্ত্তে নিয়তির আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে কোথায় বিলীন হয়ে যায়। এ শুধু ভাঙ্গবার খেলা জুলফিকর! তুমি কেবল খোদার হাতের অস্ত্রটুকু,—তোমার ত দোষ দিতে পারছি না।

(লালকুমারীর ব্যস্তত্রস্ত ভাবে প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। অকস্মাৎ গান থেমে গেল কেন? এ কি! তোমরা কে? জুলফিকর খাঁ! যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। উঃ কি ভুলই আমি করেছি। জুলফিকর খাঁ! আজ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, নয়? কিন্তু সব বুঝেছিলুম তবুও হারালুম বিশ্বাস-ঘাতক?

জুলফিকর। সংসারের এ বাজীতে যে জয়ী হয় বেগম সাহেব.........।

(জুলফিকর খাঁকে হোসেন আবদুল্লার ইঙ্গিতানুসারে বন্দী করিল)

চিনকালিচ। সংসারের জয় পরাজয় শেষের দিনটায় খতিয়ে দেখতে হয়, জুলফিকর।

জুলফিকর। তবে—মর.........শয়তান।

কুক্কুর, সাবধান; শিক্ষা তোমায় একদিন দেবই দেব।

হোসেন। জুলফিকর খাঁ! সে অবসর পাবার সৌভাগ্য বোধ করি তোমার হবে না; যখন ফাঁদ পেতেছিলে তখন এ ভাবনা হাওয়া তোমার উচিত ছিল যে ও-ফাঁদে তোমারই পা পড়া অসম্ভব ত নয়ই বরং খুব নিশ্চিত। এখন শেষ সময়ে একবার খোদার নাম স্মরণ করো জুলফিকর খাঁ।

নবম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রা শিবির সময় রাত্রি।

জাহান্দার সুরায় বিভোর হইয়া বসিয়াছিল—সন্মুখে—পানপাত্র।

(ইমতিয়াজের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। এ কি সম্রাট! এখনও তুমি স্ফূর্ত্তি করছ?—ওদিকে যে তোমার সিংহাসন যাবার পথে বসেছে, কার হাতে বিশ্বাস করে সব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ?

জাহান্দার। ইমতিয়াজ! এ তুমি কোন সুরে গান ধরেছ? দুঃখ চিন্তা ভয় সব দূর করে দিয়েছি। দেখেছ? (পানপাত্র দেখাইয়া) এ কি জানো? আঙ্গুরের বুকের রক্ত, প্রাণ তাজা করা কেমন রক্তিম ঢল ঢল, চুমুকে চুমুকে আমার প্রাণে রসের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; হৃদয়ের বেদনাগুলি যেন এর স্পর্শে সুখের রূপ ধরে বসেছে—একটু খাবে, ইমতিয়াজ?

ইমতিয়াজ। না, সম্রাট!

জাহান্দার। ঢাল, পেয়ালা ভরতি করো। তুমি একটুও খাবে না ইমতিয়াজ? তোমার প্রাণে দুঃখ আছে, না? কিন্তু আমার শুধু আনন্দ শুধু স্ফূর্ত্তি। আনন্দে মসগুল হয়ে আছি। কাউকেও আমি চাই না। শুধু আমি আর বেহস্তের মধু—সেখানে বোধ হয় এ সিরাজীর নদী কুলু কুলু রবে বয়ে যাচ্ছে—আমি ভাসব।

ইমতিয়াজ। দোষ আর কাকে দেব। আমিই যে তোমায় এ-পথে টেনে নিয়েছি সম্রাট, নাথ!

(জুলফিকার খাঁর—চমকিত হওয়া)

জুলফিকার। খোদার বিচার! (স্বগতঃ ভাবে)

ইমতিয়াজ। (জাহান্দারের নিকটে যাইয়া)

নাথ!

জাহান্দার। ইমতিয়াজ! যবনিকা ঐ নেমে এসেছে—আঁধারের যাত্রী আমরা আমি যাচ্ছি আজ, তুমিও যাবে ছুদিন বাদে।

(ইমতিয়াজের ক্রন্দন)

কাঁদছ কেন, ইমতিয়াজ? একটা ছায়ার জন্য? জীবন একটা ছায়া একটা দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির দর্পণে মুহূর্ত্তের জন্য একটা কুহেলি লেখা,—আজ আছে, কাল নেই। সুখদুঃখের খেয়ালের বাতাস এ জীবনে কম্পন তুলে আলোছায়ার বিচিত্রতায় একে মধুর ও পূর্ণ করে দেয়—তাই এ মোহ। ভালবেসেছ আশীর্ব্বাদ করছি ভুলে যেও যেন তোমার দেরী না হয় তবেই একটু শান্তি পাবে।

ইমতিয়াজ। নাথ! এ অভিশাপ তুমি আমায় কেন দিচ্ছ। আমি এ আশীর্ব্বাদ চাই যেন তোমার স্মৃতিই আমার বাকী জীবনের একমাত্র ধ্যান হয়।

জুলফিকার। (যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাড়াইয়া)

শুধু—একটা ভুল, যদি সৈন্যেদের প্রস্তুত করে রাখতুম ইঙ্গিতে তারা এসে পড়ত। তোমায় বেশী বিশ্বাস করেছিলুম, হোসেন। বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলুম না—তা না হলে এ শৃঙ্খল আমায় না পরতে হবে, হোসেন! তোমাদের পরতে হোত। কিন্তু খোদার বিচার!

(প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। সবই যেন স্বপ্ন—আমি জেগে আছি ত? আমার—এত সাধের খেলা এত শীগ্‌গীর শেষ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মরণ আড়াল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ফিরিয়াছি আবার নিজ গ্রামে,—কত কাল পরে! কত পরিবর্ত্তন! সহরের উপকণ্ঠে আমাদের গ্রাম। গ্রামের অনেকাংশই এখন সহরের অন্তর্ভূত। নতুন নতুন বাড়ীঘর, নতুন সব বাসিন্দা, অপরিচিত মুখের অন্ত নাই; তথাপি আমাকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, পাছে পরিচিত কেহ চিনিয়া ফেলে।

জননী, জন্মভূমি! জননীকে হারাইয়াছি অতি শৈশবে; জন্মভূমি,—তাহাকে নিজের বলিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত! প্রাণ তবুও তাহার স্পর্শে কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে। এই ধুলা, এই মাটী আমার মধুর শৈশবের শত স্মৃতিতে ভরা। আমার নরহরিদা, একাধারে পিতামাতা আমার—আজও কি বাঁচিয়া আছে! কি অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাদের কে জানে! দ্বিপ্রহরে সহরে পৌঁছিয়া আশ্রয় লইয়াছি একটা হোটেলে। রাত্রের অন্ধকার ঘনাইয়া না আসিলে, এ অবস্থায় নিজ গৃহে ফিরিবার উপায় নাই। নিজ গৃহ! নিজের নামটি পর্য্যন্ত নয় যাহার নিজের, তাহার আবার নিজ গৃহ! নিজের নয় ত কি? প্রাণে যাহা এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, যাহার কথা স্মরণে আসিবামাত্র মন আনন্দরসে ভরিয়া উঠে, তাহাও যদি না হয় নিজের, সংসারে তাহা হইলে নিজের কি! নিভা,—প্রাণের বোনটি আমার, তুমি আজ কাহার,—বিবাহিত হইয়াছ নিশ্চয়, কোথায় বা কেমন আছ তুমি। আছ কি না আছ, তবুও চিরজীবন্ত তুমি এ প্রাণে! তোমার দেখা পাইব না কি! প্রতীক্ষা,—চোরের মত অন্ধকারের প্রতীক্ষা অসহ্য। অস্ত যাইতে জানে না এ দেশের সূর্য্য!

অবশেষে সন্ধ্যা মুখরিত করিয়া তুলিল, গোপীনাথ দেবের আরতির কাঁশর,—দামামার ধ্বনি। ছুটিতাম একদিন এই ধ্বনিতে, আরতির শেষে দেবতার চরণামৃতের আশায়, সঙ্গে থাকিত তখন নিভা, ছোট্ট মেয়েটি তখন সে! আজ অন্তরে অবস্থান করিয়া অন্তর ভরিয়া পূর্ণ প্রাণে পান করিতেছি দেব, তোমার চরণামৃত। তেমনি ভাবে আমার শৈশব-সঙ্গিনীটিকে

সঙ্গে দাও দেবতা! জীবনের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হয় নাই,—এটিকেও বিফল কর যদি, জীবন বলি গ্রহণ করিয়া সকল আশার শেষ করিয়া দাও গোপীনাথ। চিরপরিচিত পথ, হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকা, তবুও পা উঠে না। আশা আশঙ্কা আমাকে অচল অস্থির করিয়াছে। এখানেই ছিল না সেই পাঠশালা,—কে এখানে সৌধ নির্ম্মাণ করিল, চিহ্নটুকুও কি তার রাখিতে নাই! আমবাগানে ভূতের ভয়! আমরাই ছিলাম সেই ভূত, আজ নিরুপদ্রবে আঁধারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুকুরের বাঁধা-ঘাট নির্জ্জন নিস্তব্ধ,—ছেলেরা বুঝি এখন রাত দশটা পর্য্যন্ত জটলা করে না। ইহার পরেই আমার বাড়ী। বহির্প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম,—কণ্ঠ উঠে না কাহাকেও ডাকিবার জন্য! কে আছে? কে আছ? নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি,—ভাব ভাবনা আশঙ্কা রূপান্তরিত করিয়াছে আমাকে পাষাণে হৃতসর্ব্বস্ব নারী অহল্যা একদিন বুঝি এই অবস্থায় পড়িয়াই পরিণত হইয়াছিল পাষাণে!

ঐ সেই কণ্ঠস্বর—নরহরিদার সুর তানলয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—সেই প্রাণতম কণ্ঠস্বর—নরহরিদা তাহার চিরপ্রিয় রামায়ণ পাঠে রত। আশৈশব শুনিয়া আসিয়াছি বৃদ্ধের এই পাঠ,—অতৃপ্ত হৃদয়ে শুনিয়াছি,—আজও বৃদ্ধের প্রাণ সম্বন্ধে আমার হতাশ হৃদয়কে আশ্বস্ত করিল ঐ ধ্বনি! গৃহ প্রবেশের সাহস হইল না, কি করিয়া দাঁড়াইব গিয়া তাহার সম্মুখে! চিত্রার্পিতের ন্যায় কতকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। সহসা একটি পশ্চিম দেশীয় যুবক বহির্গত হইয়া আমার স্বপ্ন ভঙ্গ করিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"নরহরি বাবু কি বাড়ীতে আছেন?"

যুবক উত্তর করিল "হাঁ, ডাকিয়া দেব কি?"

বলিলাম "না—দরকার নাই তাঁর একখানা চিঠি আছে।—"

পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম,—চিঠিতে লিখিয়াছিলাম "নরহরি দা, আমি আবার এসেছি,—আশ্চর্য্য হয়ো না,—গোলমাল করো না—অনেক সংবাদ—অনেক গোপনীয় কথা তোমায় বল্‌তে আছে—গোলমাল করো না—তোমায় দেখতেই এসেছি।"

চিঠিখানি যুবকের হস্তে দিলাম। নরহরি দা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। একবারে আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ কাঁপিতেছে। অনেক চেষ্টায় ডাকিলাম "নরহরি দা!"

বাষ্পাকুল কম্পিত বদ্ধ কণ্ঠে নরহরি দা বলিল "ভাই—গোপীনাথ আবার এ দিন দেবেন ভাবতেও পারি নি।"

অগাধ স্নেহ-সমুদ্রে এমন অপার্থিব সুধা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ দেবতা! ইচ্ছা হয় না ও-বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হই কিন্তু সে ভাগ্য যে আমার নয়!

বৃদ্ধকে প্রণাম করিলাম,—চরণের ধূলি লইয়া ধন্য হইলাম। বৃদ্ধ ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া আমার হাত ধরিয়া উঠাইল। বলিল "তোর আশা যে ছেড়ে দিয়েছিলেম বিনোদ! কোন শত্রু রটায়েছিল তুই........."

বলিলাম "সেই কথা বল্‌তেই এসেছি নরহরি দা! অত উতলা হয়ো না,—আমার বিপদ আজও কাটে নি, তুমি অত উতলা হলে কে আমায় রক্ষা করবে নরহরি দা!"

"অ্যাঁ,—বলিস্ কি বিনোদ! কিসের বিপদ আবার তোর—আমি তোকে আর ছাড়ব না ভাই!"

"ভিতরে চল,—তোমার ভাই সেই বিনোদ আমি নই, ওনাম আমি হারিয়েছি, ভয় পেও না, জেল-পলাতক আমি, বিনোদ মরেছে, আমার নাম এখন অন্য, সেই কথাই শুনবে চলো।"

বৃদ্ধের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলাম। এই কি আমার সেই গৃহ!—সমস্তই শ্রীহীন! বৃদ্ধ যেন কোন মতে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছে। নিভৃত গৃহে বসিয়া বৃদ্ধকে একে একে আমার সমস্ত কাহিনী শুনাইলাম। বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। নয়ন তাহার শুষ্ক ছিল না, অতি কষ্টে তাহাকে সংযত করিয়া আমার এ কয় বৎসরের ঘটনা শুনাইলাম, তাহাকে বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইলাম—আমার কথা প্রকাশ হইলে কি মহা বিপদ!

বৃদ্ধ আতঙ্কিত হইয়া বলিল "এখন উপায়, তবে কেন তুই ফিরে এলি ভাই! সে সময়েও আমার যত চেষ্টা অত অর্থব্যয় তুই কোন কথা না বলে ব্যর্থ করেছিলি—আবার এখনো কেন তুই জেল হতে পলালি! এত দিন এত কষ্ট সয়েছিলি যখন,—আর ছটা মাসের জন্যে কেন এ বিপদে ঝাঁপ দিলি—আমি কোন কিনারা পাই না ভাই!"

"নরহরি দা তুমি না বল্‌তে অদৃষ্ট! এ আমার অদৃষ্ট! তুমিই না বল্‌তে পাপ না থাকলে দুর্ভাগ্য হয় না—এ আমার পাপের ভোগ—ঠিক বুঝে ছ—নিজের কাজেই কেবল পাপ হয়, তা নয়, নরহরি দা—দশের পাপে, সমাজের পাপে সকলকেই কম বেশী ভুগতে হয়। আমিও যে ছিলাম সমাজেরই এক জন। কেউ বা ভোগে কম—কেউ বা সেই সমাজের পাপে উচ্ছন্ন যায়। আমার অদৃষ্টে আছে সমাজের বজ্র—কুচক্রীর চক্রে আজ আমার এই দশা! রাজচন্দ্র পাপের জাল ফেলেছে, ধরা পড়েছি আমি—জানি না ওকেও একদিন এই 'পাপ' জড়িয়ে তুলে পাপভারে কুপোকাৎ হতে হবে কি না!"

বৃদ্ধ, রাজচন্দ্রের নামে উত্তেজিত হইয়া উঠিল "বলিস্ না বিনোদ ওর কথা, এমন মানুষও সংসারে হয়,—মানুষ এমনও নরপিশাচ হয়—আমাদের এদশা ওরই জন্যে—খুনী—ডাকাত কুমির অধম—নচ্ছার—ওর নাম মুখে আন্‌লেও পাপ হয়—পরেশকে খুন করেছে ওই—আমি তার প্রমাণ পেয়েছি—এত বড় মিথ্যা সংসারে চলে—আদালত—বিচার সব মিথ্যা—অধর্ম্ম—অধর্ম্ম—অশেষে নির্দ্দোষ তুই তোর আজ এই দশা, আর রাজচন্দ্র রয়েছে রাজার হালে—হায় গোপীনাথ—একি তোমার খেলা—কলিতে দানবেরই জয় দু'দিন পরে ভগবানের নাম বুঝি আর লোকে নেবে না!"

উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ করিল। অশ্রু গণ্ড প্লাবিত করিল—ধৈর্য্যের সীমা আছে,—আমি বৃদ্ধের অশ্রু উত্তরীয় অঞ্চলে মুছাইতে গিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না! নিঃসম্পর্কীয় নিস্পৃহ এ,—আমার জন্য ইহার ভাগ্যে কেন এত পরিতাপ!

স্নেহশীল বৃদ্ধ বলিল "কাঁদিস্ কেন ভাই! তোর চোখের জল দেখ্‌তে পারিনে—তোকে হারায়ে কি ভাবে আছি সেই অন্তর্যামীই জানেন! কি করব ভাই আমি যে ভাবতে পারিনে—দীনবন্ধুর দুর্ব্বলকে নিয়ে একি খেলা! বিশ্বাস হারাসনে ভাই, এত কষ্টের মধ্যেও আজ এদিন তিনিই দিলেন,—তাঁর দয়ায় আমাদের এ কষ্টের একদিন অবসান হবেই হবে নৈলে কি হারাধন ফিরে পাই, এ পরীক্ষার শেষ কর গোপীনাথ!

আমি আবার বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বলিলাম 'তোমার আশীর্ব্বাদ সার্থক হ'ক নরহরি দা!'

বঙ্গীয়-সাহিত্য ... ক্রমিক সং শ্রেণী সং কলিকাতা।

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না—করযোরে দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করিল। ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কিছু আহারীয় আনিয়া বলিল "খা বিনোদ! কে আছে তোকে যত্ন করে—তোর যা আছে ভোগ করে কে! তুই বেড়াচ্ছিস্ পরের কাজে! হায়! অদৃষ্ট!"

বলিলাম "দুঃখ করো না নরহরি দা—কর্ম্মভোগ ভুগতেই হবে, তবু তুমি ছিলে তাই এ সব আজও আছে!"

"আমি আর কয়দিন থাকৃব—সময় যে হয়ে এসেছে,—তোকে আবার ফিরে পাব কি করে!"

"ফিরে পাবে নিশ্চয়; সে আমি ঠিক করেছি,—এ অবস্থা অসহ্য,—এর পরিবর্ত্তন করতেই হবে—আমি মরবো না—এ ভোগ নৈলে ভুগবে কে—ভগবান আর ক'টা বৎসর যদি তোমায় রাখেন,—এ দিন থাকবে না!"

"আর ক'টা বৎসর! আর যে পারিনে বিনোদ!"

এতদিন পরে এমন ভাবে দেখা বাক্যের শেষ নাই—দুঃখ, হর্ষ আবেগের অন্ত নাই। রজনীতে নিদ্রা নাই,—যুবা আর বৃদ্ধের প্রাণ গলিয়া মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে! কি কষ্টেই বৃদ্ধ দিন কাটাইতেছে,—যোগীর মত আমার মঙ্গল সাধনায় তাহার সমস্তই উৎসর্গীকৃত,—এমন বন্ধু জগতে দুর্লভ। নিজেকে বঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধ আমার সম্পত্তির আয়ে জমাইয়াছে ত্রিংশ সহস্রের অধিক! এত অর্থ! কিন্তু যাহাতে আমার অর্থের সার্থকতা সে এখন কোথায়, কি ভাবে! বার বার সে প্রশ্ন মনে উত্থিত হইলেও প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছিল না,—কিবা শুনিতে হয়! বৃদ্ধ সে সম্বন্ধে নীরব,—আমার অবস্থা আমার বিষয়-সম্পত্তির প্রসঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত—সে কি করিয়া অনুভব করিবে আমার প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহাকে চায় রক্ষা করিতে,—নিভা কি তবে জীবিত নাই!

নিরাশ হইয়া বলিলাম "এত কষ্ট কেন করেছ নরহরি দা,—নিজের প্রাণে কিছু দাও নি—এ বয়সে তোমায় কোথা সুখে রাখব আর তুমি শরীরের কষ্ট দিতে ছাড় না।"

"কিসের কষ্ট—তুই কাছে থাকলে এ কেন আরও শত কষ্টও তুচ্ছ করতেম—কোন প্রাণে খাব পরব ভাই!"

"না—নরহরিদা আর নিভকে কষ্ট দিও না—তোমার পায়ে পড়ি—আমার আশ্রিত যারা তাদের সেবায় আমার যা কিছু ব্যয় হলে আমার কত সুখ তা কি তুমি বুঝবে না—নিভাদের ব্যয়, তার বিয়ে তুমি ত দিয়ে দিয়েছ নরহরি দা!"

"ও কথা আর তুলিসনে ভাই! আমি চেষ্টার কম করি নি কিন্তু ফল হ'ল কি তার! নিভার মাই ছিলেন আমার অন্তরায়! ঐ পাপ পিশাচটা কি মন্ত্রণাই না দিয়েছিল—তিনি সৎপাত্র পেয়েছিলেন রাজচন্দ্রকে,—খুনী বেটা—এই বিয়ের জন্যই দুঃখের ছেলে পরেশকে নিজ হাতে খুন করেছে—তোকে জেলে দিলে—তবুও নিভার মার চোখ ফুট্‌লো না, তিনি নিভকে ডুবালেন—বিয়ে দিলেন রাজচন্দ্রের সঙ্গে!"

আর শুনিবার শক্তি হারাইলাম। আঁা, নিভার বিবাহ রাজচন্দ্রের সহিত! সেই মহাশত্রুকেই আবার রক্ষা করিতে আসিয়াছি আমি! রক্তমাংসের দেহ নহে কি আমার। এত কাপুরুষ আমি—মুহূর্ত্ত জ্ঞান হারাইলাম! বলিলাম বল কি তুমি! নিভার বিয়ে হয়েছে রাজচন্দ্রের সঙ্গে! তাও তুমি হতে দিলে, বৃথাই তবে বলে গিয়াছিলেম জেলে যাবার সময়—আমার সমস্ত দিয়েও নিভকে রক্ষা করো—বৃথা বৃথা—সব বৃথা—একটা সামান্য কাজ,—আমার বিদায়-অনুরোধ, তাও রক্ষা কর নি নরহরি দা!"

"কেন যে পারি নি, কি করে আর বুঝাব বল! কোটাই বা পারলেম—তুই যে বিনা দোষে জেলে গেলি তারই বা কি করতে পেরেছিলাম! ওরা আমার কে যে ওদের কাজে আম কর্ত্তৃত্ব করবো, করতে গিয়েও ত অপমানিতই হয়েছি—নিভার মা আমাকে শত্রুই ভেবেছেন—বন্ধু নয়। কি কর্‌ব আর! খুনী তুই, তোর চাকর আমি, আমার পরামর্শ তিনি শুনবেন কেন। হয়েছে বেশ ফল তার ভুগে গেছেন কম কষ্ট ভুগে মরেন নি—আমি তোর কথা মনে করেই শেষের দিনে সাহায্য করেছি—নৈলে আরও যত ভুগতে হ'ত ওকথা ছেড়ে দে বিনোদ, পরের কথায় কাজ কি বল! পর কি আপন হয়!"

মনে মনে বলিলাম, আমি তবে তোমার কি! আমার জন্যে এত মাথার ব্যথা কেন তোমার! পর তুমি কাকে বলছ! বলিলাম "নিভার মা তা হলে মরেছেন! নিভা কোথায়? কেমন আছে?"

বৃদ্ধ যেন বিরক্ত হইয়া বলিল—"বল্লেমই ত সে রাজচন্দ্রের পরিবার, তার বাড়ীতেই! পাষণ্ডের হাতে পড়লে যা হয়—হয়েছে তাই! একটা ছেলে হয়েছে, কার ছেলে কে দেখে! খুনীর কথা ছেড়ে দে,—আমার ওদের কথা ভাল লাগে না ভাই! আর কি অন্য কথা নেই! আব্বাস ওকে যেদিন শেষ করতে বসেছিল—আমার কাজ নাই তাই চোখের সামনে খুন হতে দিলেম না। কাকে রাজচন্দ্র রেহাই দিয়েছে, আব্বাস ওর অত উপকার করেছে,—তাকেও কি দিয়েছে কম কষ্ট! তা তার শেষ আছে, আব্বাসের হাতেই ওর মৃত্যু—হওয়াই উচিত—!"

আমি বলিলাম "আব্বাস, আব্বাস সর্দ্দার—তার ও আবার কি করেছিল,—কোথায় আছে সে?"

"আমার যত মাথার ব্যথা,—তাকে তোরই জমীদারীতে কাজ দিয়েছি—ভাতে-কাপড়ে মারা যেতে বসেছিল—অথচ লোকটা কাজের—রাজচন্দ্রের পাল্লায় না পড়লে ওর এ দশা হতো না।"

কাজ ত দিয়াছ, তবে আবার কি দশা!"

"আমার মাথা, সকলেই আমার তোমার মত কিনা—অপমান, অত্যাচার মাথা পেতে সহ্য করবে, টাকার লোভ দেখিয়ে পরেশকে খুন করতে রাজচন্দ্র আব্বাসকে ফুঁস্‌লায় ও তাতে রাজি হয় না—শেষে খুন করেছে নিজে—তোকে খুনী সাজিয়েছে। আব্বাস পাছে সে সব প্রকাশ করে সেই ভয়ে ওকে পাগল বলে পাগলা-গারদে পুরেছিল—জগতে এত মিথ্যাও চলে এত অত্যাচারও সহ্য হয়! ও পাগলা গারদ হতে ফিরে প্রতিশোধ নিতে পাগলই হয়েছে। কোন মতে তোর কথা মনে করেই আমি ওকে সরিয়ে রেখেছি—ইচ্ছা হয় না আর পাপের প্রশ্রয় দিতে।"

অন্তরে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া কে যেন বলিয়া উঠিল—"সত্যই রাজচন্দ্রের মরণই মঙ্গল, যাহা আব্বাস করে নাই—আমি তাহা নিজ হস্তে সম্পাদন করিব—এমনিও মরিয়াছি, না হয় মহাশত্রুকে নিপাত করিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিব!"

বলিলাম "রাজচন্দ্রের এত অত্যাচার!"

"অত্যাচার বলে অত্যাচার—দেশটাকে ছারখারে দিল। আশ্চর্য্য এই সহরের বুকে বস এত অপকর্ম্ম করছে তবু ভাগ্যের জোর—আজও ওর কেউ কিছু করতে পারলে না।"

মনে মনে বলিলাম "কেমন না পারে দেখে নেব—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল—ছ! একি প্রতিজ্ঞা—রাজচন্দ্র যে নিভার স্বামী!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—ঃ০ঃ—

বর্ষণ বারির বিরাম নাই—কোচবিহারে বর্ষা এইরূপই। এমাসে সূর্য্যের মুখ কমই দেখা গিয়াছে। বৃষ্টি ৪২·১৬ ইঞ্চি। গত বারে এ সময় ছিল ৭৩·৩১ ইঞ্চি। খাদ্যবস্তু পূর্ব্ববৎ দুর্ম্মূল্য। দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে। মফঃস্বলের টাকায় পাকি ৮ সের। সহরে দুগ্ধের ব্যবসা পশ্চিম দেশীয়দের হাতে, তাহাদের সজল দুগ্ধ ছয় সের, খাঁটি চার সেরই মেলা দায়। তবু তাহাদেরই দুগ্ধ প্রায় সকলকেই লইতে হয়—কারণ দেশীয় লোকের দুগ্ধ নিয়মিত পাইবার আশা দুরাশা! প্রায়ই কামাই। পশ্চিমা কিন্তু যথা সময়ে হাজির হয়, প্রাতে রৌদ্রের পরশে গরম হইবার পূর্ব্বে চার চুমুকে গরম হইতে হইলে পশ্চিমা গোয়ালা ভরসা, এত সকালে দুগ্ধ যোগান এদেশীর কর্ম্ম নয়।

দুগ্ধ কেন অন্য ব্যবসাও ক্রমেই উহাদের হাতে যাইতেছে। ভহবাজারে পশ্চিমার দোকান বেশী; দেশী লোক দিন-মজুরী খাটিয়া খায়। প্রায় সর্ব্বত্র এই দশা,—বাঙ্গালা ব্যবসায় হটিতেছে তথাপি ইহার প্রতিকার চেষ্টা নাই।

সুখের বিষয় সহরে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাতা বিনামা, বালতী, বিস্কুট ইত্যাদির দোকান খুলিয়াছেন। ইহাতে দোকানীর স্থান উন্নত হইল কিন্তু ধনাগমের সহিত শিক্ষিতের

স্বদেশের প্রতি দৃষ্টির পরিচয় থাকিলে আরও সুখের হইত। যে ব্যবসাটা অল্প শিক্ষিতের আয়ত্তে আসিলে তাহাদের জীবনোপায় হয়, তাহাতে শিক্ষিতের স্থান নাই; বিশেষ ছোট কারবারে জুতা ছাতার লাভের চিন্তায় উন্নত মনেও ঐরকম তুচ্ছ বস্তুর ছাপ পড়ে। কেবল অর্থকে কেন্দ্র না করিয়া দেশের কল্যাণে লক্ষ্য রাখিয়া এ নির্দ্ধন দেশে ধনাগমের পন্থায় শিক্ষিতগণ মন দিলে নিজেরও উপকার কাজের মত কাজও হয়। সেরূপ ব্যবসায় যথেষ্ট রহিয়াছে,—সহরে হোটেল নাই যে দুই একটি আছে তাহাতে আহারীয় ও অন্য বন্দোবস্ত স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। খুলুন না কেন শিক্ষিতগণ একটা আদর্শ অন্ন-ভাণ্ডার: যাঁহারা অধ্যাপক ভাবে ছাত্রগণ স্কুল কলেজে থাকিতে, বোর্ডিংএ রাখিবার কালে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া অস্থির তাঁহাদের সেই সকল ছাত্রই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইলে সামান্য বেতনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া যখন এই সকল কদর্য্য হোটেলে অন্ন গ্রহণ করে তখন কাহারও প্রাণ কাঁদে না! বস্ত্রের ব্যবসায় মালিক এখানে মারয়াড়ী—বিলাতী বস্ত্রই তাহাদের প্রধান পণ্য। নানা কারণে স্বদেশী বস্ত্রের উপকারীতা ও আবশ্যকতা শিক্ষিত মাত্রেই অনুভব করেন কিন্তু তাহার আমদানীর চেষ্টা একবারে নাই,—স্বদেশী দেশালাইয়ের নাম শোনা যায়, দেখিবার সৌভাগ্য কমই হয়, আমদানী করিলে যথেষ্ট কাটতি হয়। প্রমাণ তাহার ঢাকাই ফেরিওয়ালা, দেশে সমবায় ও যৌথকারবারের প্রচলনে শিক্ষিত চেষ্টা না করিলে আশা কোথা? সাধারণের মত শিক্ষিতও যদি দশকে লইয়া একত্র হইয়া কাজ করিতে ভয় পান তবে সে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যগুলিও করিবে কে? বহু যৌথকারবার অনবধানতায় নষ্ট হইয়াছে,—বুদ্ধিমান, সুবিবেচক, চিন্তাপরায়ণ শিক্ষিত মহাত্মাগণ সে সমস্ত নিরাকরণের চেষ্টা করিয়া ব্যবসায় নামিয়া পড়ুন।

*   *   *   *

হতাশ হইতে হয়,—ইচ্ছা হয় না আর আমাদের মানসিক দৈন্যের পরিচয় বারবার দিতে। বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে, বোধ হয় বিকারগ্রস্ত নতুবা এত দেখিয়া শুনিয়াও কোনই প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না কেন,—একবাক্যে সকলেই বলিতেছেন—

'বাঙ্গালী জাতি মরণোন্মুখ। দারিদ্র্যে, রোগে বাংলার প্রাণবায়ু নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে অবস্থা ছিল আজ আর তাহার সে অবস্থা

নাই, শতকরা নব্বই জন লোক দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বাকী শতকরা দশজন লোকের মধ্যে কতক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, আর খুব অল্প সংখ্যকই একটু সমৃদ্ধিশালী। বাঙ্গালী রোগে জীর্ণ, দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ, আবশ্যক মত সে পথ্য বা ঔষধ পায় না, তারপর সুস্থ দেহেও তার যে অবস্থা ইহাপেক্ষা ভাল তাও নয়; অনাহারে তাহার শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে ইহার উপর নিত্য ব্যাধি আজ ম্যালেরিয়া, কাল অজীর্ণ, পরশ্ব আরও দুরারোগ্য অন্য কোন ব্যাধি, এইরূপে বাঙ্গালী আজ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দিন দিন মৃত্যুর পথেই ছুটিয়াছে। তারপর যাও দু'চার জন সমৃদ্ধিশালী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য যে অনাহার দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অপেক্ষা ভাল তাও নয়, ইহাদেরও নশ্বর দেহ অত্যাচার অনাচারের ফলে শীঘ্রই ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হয়, সংসার চলার উপযোগী অর্থের অধিকারী হইয়াও কত বাঙ্গালী যে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উপর দেশের জলবায়ুর এবং সময়ের যে অনেকটা প্রভাব রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

* * * *

পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রাত্যহিক জন্ম সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার, সুতরাং প্রতিদিন ৪০ হাজার এবং প্রতিবর্ষে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এই হারে লোক বাড়িতেছে না, সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালায় অবস্থাই শোচনীয়, বাঙ্গালায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক, বিগত কয়েক বৎসরে জন্মাপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ লোক অধিক মরিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গেরই অবস্থা খারাপ, বঙ্গের যে সব জিলায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বঙ্গে। এইগুলি ম্যালেরিয়ার আগার। পশ্চিম বঙ্গে যত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে পৃথিবীর কুত্রাপি শুধু ম্যালেরিয়ায় অত লোক মরে না, এমন কি ভারতবর্ষেও নয়। এই ম্যালেরিয়া ছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, কলেরা রোগে কত লোকই যে ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯২১ সালে বাঙ্গালায় হাজার করা সাড়ে ত্রিশ জন মানুষ মরিয়াছে; এত অধিক মৃত্যুর হার পৃথিবীর কোথাও নাই। বাঙ্গালা দেশই পৃথিবীর সকল রোগের আকর!

* * * *

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীরই পরমায়ু কম। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, কানাডা, মার্কিন যুক্তপ্রদেশ, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রত্যেক ব্যক্তির গড় পরমায়ু ৪৫ বৎসর, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে ৪০ বৎসর, রুষিয়ায় ৩৪ বৎসর এবং ভারতবর্ষে ২৩ বৎসর। শুধু বাংলাদেশের হিসাব খতাইয়া দেখিলে ইহাপেক্ষা কম হইবে নিশ্চয়। দারিদ্র্যের অনুপাতেই আয়ুর তারতম্য দেখা যাইতেছে, শুধু ভারতবর্ষ ব্যতীত রুষিয়াই পৃথিবীর সব দেশ অপেক্ষা দারিদ্র্য সেখানকার আয়ুও ভারতবর্ষেরই ঠিক উপরে। শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা আজ শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বাঙ্গলারই ফলে জলে পুষ্ট বাঙ্গালী আজ মৃত্যুর দ্বারে অতিথি, আর বাঙ্গলার অর্থে পুষ্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কেমন আনন্দে, সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে করিতে জীবন কাটাইতেছে। যে হারে বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিতেছে এবং যেরূপ দ্রুতহারে বাঙ্গলায় মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। এখন হইতেই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

* * * *

সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়। মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া হিন্দু-মুসলমানের একত্র মৃত্যুহার তত অধিক বোধ হইতেছে না, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যুহার আলাহিদা দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৪॥০ লক্ষ বেশী ছিল, পঞ্চাশ বৎসর পরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৬৩॥০ লক্ষ বেশী দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই সংখ্যা বাংলায় বৃদ্ধি হইতেছে, শুধু হিন্দুর সংখ্যাই কমিতেছে। আরও বিচিত্র এই, বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাই কমিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে যে অদ্ভুত ছুৎমার্গ হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারই পরিণাম এখনও হিন্দুসমাজে সংক্রামক ব্যাধি রূপে রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতাও হিন্দু হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ, সমাজ যে ভাবে অনুষ্ঠানবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে তাহার প্রসারের ত কোনই উপায় নাই, তদ্বিপরীতে সামান্য কারণেও হিন্দুকে সমাজচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত করা হয়, এই কারণেও হিন্দুসমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। এককালে হিন্দু যে কমঠ ব্রতের সাহায্যে আপনার বৈশিষ্ট্য এবং অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল, তখন তাহার সে আবশ্যকতা

থাকিলেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু বলি বাঁচিতে চায় তাহাকে সকল গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।' —নবসঙ্ঘ।

* * * *

সমাজ পাষাণ,—যেমন স্নেহহীন নির্ম্মম তেমনি অটল গতিহীন,—গতি যেটুকু নিম্ন দিকে। এত ভুগিয়াও বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সংস্কারের লক্ষণ দেখা গেল না। বরপণে দেশ উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে। ধনী ক্রমেই বরের দর বৃদ্ধি করিতেছেন। মধ্যবিত্তের কন্যার বিবাহ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এ দেশে কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়। কেন? কন্যাকে স্বাবলম্বী হইবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজে নাই। সে চেষ্টা কি অন্যায় না অসম্ভব!

* * * *

অনুপায় হইয়া অপাত্রে কন্যাদান বঙ্গে নিত্য ব্যাপার। ইহার ফলে গৃহ বাহিরে নারী-নিগ্রহের অন্ত নাই; সংসারের সুখ অন্তর্হিত হইতেছে,—পারিবারিক জীবন ভগ্নাহত, দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে! অকল্যাণের অবধি নাই। কত প্রাণ অকালে বিসর্জ্জন দিতেছে। সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজের ছাত্র, বয়স মাত্র কুড়ি—সে দিন আত্মহত্যা করিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে লিখিয়া গিয়াছে—"গুণবতী ভগিনীকে ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করায় এই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং আত্মহত্যা করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।" নরক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা বঙ্গে আর কত কাল চলিবে!

* * * *

নারীনিগ্রহের সংবাদ নিত্য—চারমাইনারের পাশবিক অত্যাচার—রংপুরে দিনে দুপুরে নারীর ইজ্জতহানীর অমানুষিক কাণ্ড—দেশের প্রাণে কি মহা আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপে মান ইজ্জৎ যেখানে বিপন্ন—সেখানে সভ্যতার বালাই লইয়া আর কি ফল! মা শক্তি কি বঙ্গের নরনারীর হৃদয় হইতে অন্তর্হিত!—যে শিক্ষায় আবার শরীর মনে শক্তির সঞ্চার হয় তাহাই এখন চিন্তার বিষয়!

ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা

শোক-সংবাদ।

আবার কালের কঠোর কুলীশাঘাত! গভীর একটি শোক-স্মৃতি জ্বলন্ত ভাবে জাগ্রত থাকিতেই কোচবিহারের রাজপরিবারের আর একটি সন্তান লোকান্তরিত হইলেন। বিগত ৭ই শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় মহারাজকুমারী প্রতিভাসুন্দরী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর হইয়াছিল। মাতার প্রাণে আর কত সহ্য হয়। মাতা মহারাণী ধৈর্য্য-সাগরসদৃশা হইলেও এ শোক তাঁহার হৃদয় শতধা করিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজমাতার ও মহারাজকুমার এবং রাজপরিবারের গভীর দারুণ আত্মীয়বিয়োগজনিত শোকের ন্যায় প্রকৃতিবর্গের, কর্ম্মচারীবৃন্দের হৃদয়ে আঘাত করিয়া এ রাজ্যে সকলকেই শোকাভিভূত করিয়াছে। অমঙ্গলে মঙ্গলবিধাতা যিনি, তিনিই এ সময়ে শান্তি বিধান করুন—এই আমাদের ব্যথিত কাতর প্রাণের প্রার্থনা।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

আর্ট ও সাহিত্য,—সুপ্রসিদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ, প্রণীত এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ১৮২—১৮/০ পৃষ্ঠা। ছাপা ও বাঁধা সুন্দর। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। প্রাপ্তি স্থান—৫৫ অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়। কলিকাতা।

তত্ত্বনিধি মহাশয় ভক্ত,—তাঁহার সর্ব্বকার্য্যই ভগবান লক্ষ্য, আর্ট ও সাহিত্যকেও তিনি সেই চক্ষেই দেখিয়াছেন। আর্টের কেন্দ্র ভগবান, তাঁহার লীলাভূমি, বিভূতির প্রকাশ প্রকৃতিতে। জগতের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন উদ্দেশে মঙ্গল স্বরূপের প্রকাশ প্রকৃতিতে সুতরাং মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রকৃতির এই বিকাশ ভঙ্গী বা চেষ্টাই আর্ট,—আর্টের সিদ্ধি স্বাভাবিকতায় মঙ্গলভাবের অভিব্যক্তিতে;—সত্য সুন্দরকে প্রকট করিয়া, মনের আবিলতা, আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়া, বিমল আনন্দের সহিত মনুষ্যকে মঙ্গলময়ের প্রতি আকৃষ্ট, নিবিষ্ট করাই,—উচ্চ আদর্শ, ভগবৎ চিন্তায় আবিষ্ট করিবার শক্তি ও অনুরক্তি দান করাই আর্টের লক্ষ্য তাহার দায়িত্ব। মনের মত্ততা, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, ক্ষণিক সুখের আয়োজন, অশ্লীল ভাষা যাহাতে মাথা তুলিবার আশঙ্কা আছে তাহা নহে আর্ট,—তাহা শিল্পীর শক্তির অপচয়, সমাজের বিষ—অস্বাভাবিক, অসুন্দর! চিরসুন্দরের রাজ্যে প্রকৃতি সুন্দর,—সৌন্দর্য্যে মনমুগ্ধকারী,—শিব; প্রকৃতির প্রকাশ যে আর্টে তাহার গঠনে চাই সৌন্দর্য্য,—অন্তরকেন্দ্রে শিবত্ব। তত্ত্বনিধি মহাশয় এই সকল গূঢ় তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে আর্টের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিণতি, কুশিল্পীর হস্তে পড়িয়া আর্টের উদ্দেশ্য কিরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাহা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন,—তিনি বক্তব্য বিশ্লেষণে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের মতি গতি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র চরিত্রের দোষগুণ নির্ভীক ও ধীরভাবে প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই অথচ বিনয়ের ও সীমা কুত্রাপি লঙ্ঘন করেন নাই। ইহাই তাঁহার আলোচনার বিশেষত্ব! বিষয় গুরুতর—তাঁহার সমস্ত মন্তব্য নতশিরে গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইলেও গ্রন্থখানি যে সুন্দর ও সুলিখিত তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন ও এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক পাঠিকা উপকৃত হইবে নিঃসন্দেহ।

"গৃহদাহ" ইত্যাদি উপন্যাসকে তিনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন অনেকেই হয়ত সে ভাবে দেখিবেন না। আর্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি উপন্যাস বা অন্য শিল্পে—তাঁহার সহিত অনেকেই একমত--কিন্তু বাহ্যিক পরিচ্ছদ বর্ণ সমাবেশে চিত্র চিত্রণে যথেষ্ট মত ভেদ হইবে। সু কু সুন্দর অসুন্দর লইয়া সংসার--প্রকৃতির আকৃতি- মঙ্গল উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকিয়া ভালমন্দের বিকাশ সর্ব্বত্র কুয়ের সমাবেশই দোষের নহে, কুর প্রতি সহানুভূতিই অতিশয় নিন্দনীয়—'গৃহদাহে'

শক্তিশালী লেখক শেষ রক্ষা করিয়া আর্ট অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিচার অল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়। আমরা পাঠকপাঠিকার নিকট এই সুন্দর গ্রন্থখানির পরিচয় মাত্র প্রদান করিয়া শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়কে তাঁহার সুন্দর ও সময়োপযোগী আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গলায় কথা—ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল, প্রণীত। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত। ঢাকা নয়াবাজার শ্রীনাথ প্রেসে সুচারুভাবে মুদ্রিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। উদ্দেশ্য বোধ হয়—প্রচার।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার এ আলোচনায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সন্দর্ভটিতে তিনি অল্প পরিসরের মধ্যে কথা ও কাব্যের উৎপত্তি, প্রকৃতি, গতি, অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু বিশদভাবে আলোচিত হইয়া বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সম্মিলনের ঘণ্টাবাঁধা সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে প্রবন্ধ রচিত তাহাতে সেরূপ আলোচনার আশা করা অন্যায়। আশা করি সুপণ্ডিত ও বিচারশীল লেখক ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধকে ভিত্তি করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ও বিস্তৃত আলোচনা সমালোচনায় বঙ্গীয় পাঠককে উপকৃত করিবেন।

অজ্ঞেয়কে জ্ঞানের গণ্ডীতে বাঁধিতে, অতৃপ্ত-হৃদয়ের তৃপ্ত হইবার স্বাভাবিক অদম্য আকাঙ্ক্ষায়--প্রকৃতিকে, প্রাণকে, জগতকে জানিবার ইচ্ছায় হৃদয়ের যে আকুলি ব্যাকুলি, প্রাণের ভাব অন্য প্রাণে সম্প্রসারিত করিবার প্রবৃত্তিতে, অন্যের ভাবে পরিতৃপ্ত হইবার ক্ষুধায় 'কথা'র উৎপত্তি; কাব্যে তাহার পরিপুষ্টি—'রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা বুদ্ধির অতৃপ্তি হইতে সংস্কারের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে কথা ও কাব্য।' কথাবার্ত্তা গল্পগুজবের সাফল্য, সার্থকতা যেমন সহানুভূতিতে, ভাবের আদান প্রদানের আনন্দে, 'কথা সাহিত্যেরও সফলতার মূল এই সহানুভূতি, লেখকের সঙ্গে পাঠকের এই আকাঙ্ক্ষার যোগ।' সুতরাং বক্তা ও শ্রোতার ভাব লইয়া প্রসঙ্গের

পরিণতি, তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনার তারতম্যে কথক বিবত্তর রূপ ও গুণের পরিচয়।— সাহিত্যেও তাই। 'শিশু-হৃদয়ে' রূপকথার প্রসার, 'রূপকথার বিশেষত্ব তার অসাধারণত্বে'। শিশু তার অদ্ভুত কল্পনায় অদ্ভুতত্ত্বের পক্ষপাতী। সেই শিশুই আবার যৌবনে স্বাভাবিক আকর্ষণে বাস্তবের উপাসক। দৈনিক জীবনের হাসিকান্না, সংসারের বাস্তব চিত্র-বিচিত্র, সংসারের মানব-প্রকৃতির শতসহস্র দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সে ব্যগ্র। কাব্য তাহার দর্পণ। যে কবি, যে শিল্পী তাঁহার মায়া-মুকুর নির্মাণে সিদ্ধহস্ত, বায়স্কোপের পটে প্রদর্শনের ন্যায় জীবন্ত সত্য, প্রকৃত দৃশ্য-ছায়া যথাযথরূপে মুকুরে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ, তিনি স্রষ্টা—সফলকাম। ডাক্তার নরেশচন্দ্র উপন্যাসাদির সাহায্যে এরূপ অনেক তথ্যই আলোচনার অন্তর্ভূত করিয়া আলোচ্য সন্দর্ভটিকে হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আরও এরূপ আলোচনা করিয়া আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রকে উপকৃত পরিতৃপ্ত করিবেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন, তাঁহাতে আশা করিবার মত আমাদের অনেক আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩৩০ সাল। | ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'এক কথা *

সুখের শৈশবে স্নেহকোমল পিতৃক্রোড়ে বসিয়া শিখিয়াছিলাম, "বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।" বীণা ও পুস্তকে যাঁর কোমলকর সুশোভিত, সেই সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করি। তার পর বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মণোচিত কুলবৃত্তির মহিমায় যথা বাগ্‌দেবী বীণাপাণির ধ্যানটি কণ্ঠস্থ করি, তখন শিখিয়াছিলাম, "নিজকর কমলোদ্যৎ— লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।" যে বাগ্‌দেবীর হস্তে লেখনী ও পুস্তক শোভিতেছে তিনি সকল বিভব সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাংশে 'পুস্তক' শব্দে কেবল পড়ার কথাই পাই, কিন্তু পরোক্ত ধ্যানে "লেখনী পুস্তক"

* কুচবিহার সাহিত্য সভায় পঠিত।

শব্দে লেখাপড়া দুইই বুঝায়। অনন্তর আর একটু বড় হইলে অর্থাৎ প্রৌঢ় কৈশোরে হিতোপদেশে পড়িলাম, "বিদ্যা শস্ত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ দ্বে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে।" শস্ত্র ও শাস্ত্র দ্বিবিধ বিদ্যাই মানবের প্রতিপত্তি লাভের মূল। এখন ক্রমশঃ উদ্ধৃত তিনটী পদাংশের সার দাঁড়াইল যে, শস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিত মানব প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী। প্রথম উদ্ধৃত শ্লোকাংশটী কোন্ গ্রন্থের তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ওটী যে প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। বেদাদি শাস্ত্রবিদ্যা ও ধনুরাদি শস্ত্রবিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত বিদ্যা ভারতে দীর্ঘকাল প্রচলিত। এই সনাতনীবিদ্যা স্রষ্টার মানসী সৃষ্টির অতি বর্ষীয়সী সহচরী। ভারতীয় আদি সংস্কৃত গ্রন্থ সামবেদের সায়নীয় ভাষ্যের অবতরণিকায় দেখিতে পাই, "সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ, আহ ক ইমে গীত্যুপায়া নাম? উচ্যতে—গীতিনাম ক্রিয়াহ্যাভ্যন্তর প্রযত্নজন্যা, স্বরবিশেষণামভিব্যঞ্জিকা; সামশব্দাভিলাপ্যা. সা নিয়তপ্রাণা যাচি গীয়তে। তৎ সম্পাদনার্থেহয়মৃগক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষনাভ্যাসো বিরামঃ স্তোভঃ ইত্যেব মাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে" ইতি। মীমাংসা-দর্শনের নবম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে "অনৈকত্বাৎ বিকল্পঃস্যাৎ।" এই সূত্রের ব্যাখ্যাকালে শবরস্বামী স্পষ্ট বলিয়াছেন.—"সামবেদে বহুতর গীতি সাধন, সেগুলি কি? বলি, অভ্যন্তর প্রযত্ন জন্য ক্রিয়া বিশেষকে গীতি বলা যায়। তাহাই বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ স্বরের অভিব্যঞ্জক, উহাকেই সাম বলা যায়, তাহা পরিমিতাক্ষরাদি নিয়মে গ্রথিত ঋক্ (পদ্য) অবলম্বন করিয়া গীত হইয়া থাকে। কেবল স্বরই এই গীতির সম্পাদক নহে, প্রত্যুত ঋক্‌গুলির কোন স্থানে অক্ষর বিকার, কোথায় বা বিশ্লেষ, কোথা বা বিপ্রর্ষণ, স্থান বিশেষে অভ্যাস, নিয়মানুসারে বিরাম এবং স্তোভযোগ প্রভৃতিও বহুতর সাধনা আছে, তৎ সমস্তই সামবেদে শ্রুত হওয়া যায়।" এই সন্দর্ভটীর বিবরণ করিলে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইবে বিবেচনায় সে প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল। অভিজ্ঞ পাঠক উহার লিপিতঙ্গীতে ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্বের অনেকটা সন্ধান পাইবেন। বস্তুতঃ আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, স্বীকার করি বা না করি, জননী জন্মভূমির সুখ-শীতল অঙ্কে স্থান লাভ করিবার শুভক্ষণ হইতে উহা ত্যাগ করিবার অশুভক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের বিশ্ববিমোহন করুণমধুর যে সঙ্গীত লহরী ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অহোরাত্র আমাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণমন মাতাইয়া তুলিতেছে, ঐ অনশ্বর সঙ্গীতের সনাতনী সত্তার অপলাপ

করা আর জীবন্ত মানবের প্রেতত্বখ্যাপন করা তুল্য কথা। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রমাণের জন্য অন্য সাক্ষী হাজির করিবার প্রয়োজন নাই। আপন আপন জীবনের কথা ভালরূপে মনে করিয়া দেখিলে স্পষ্টই সপ্রমাণ হইবে যে, বিশ্বসঙ্গীতের চিরউন্মুক্ত মহান্ উৎস ভারতে এমন কোন অভাগা জন্মগ্রহণ করে নাই, যে কোনদিন সুখ দুঃখময় সঙ্গীতের আস্বাদ লাভে একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছে। জন্ম-বধির ব্যক্তি সঙ্গীতের শ্রবণ প্রত্যক্ষে অনধিকারী হইলেও, সুগায়কের গীতিভঙ্গীদর্শনে সে উহার মানস প্রত্যক্ষে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়া থাকে। মানবের স্বচিত্ত রঞ্জিনীবৃত্তির ন্যায় পরচিত্তরঞ্জিনী নামে একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে। স্বার্থমূঢ়তা বশতঃ মাদৃশ মানবের এই বৃত্তিটির (Faculty) যথাযথ অনুশীলন (Culture) হয় না বলিয়া সেটী যে একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে। মানব, কেবল মানব কেন, সঙ্ঘধর্ম্মী (Sociable) জীবমাত্রই নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনের ছন্দোহনুবর্ত্তন করিয়া উহাদের মনোরঞ্জন সাধনে সতত ব্যতিব্যস্ত। ভারতের অমর কবি কালিদাসের দিব্য কাব্য অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখিতে পাই, মধুকরী তৃষ্ণার্ত্তা হইয়াও স্বীয় প্রিয়তমের প্রতিক্ষায় মধুপান করিতেছে না, কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গের অগ্রভাগ দিয়া প্রিয় স্পর্শসুখে অর্দ্ধমুদ্রিতনয়না প্রিয়তমা হরিণীর গাত্রকণ্ডুয়ন করিতেছে। আবার ভাবের কবি ভারত-বিভূতি ভবভূতি করুণ রসের অফুরন্ত নির্ঝর (spring) উত্তর-চরিতে দেখাইতেছেন, জলবিহারীমত্তকরী শুণ্ডাগ্র দ্বারা জল তুলিয়া প্রিয়া করিণীর গাত্র প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া একটি সনাল নলিনীপত্র আতপত্র রূপে উচ্চে ধারণ করিয়া প্রিয়ার গাত্রপতিত সূর্য্যাতপ নিরাকরণ করিতে ব্যগ্র রহিয়াছে। তির্য্যক্ জাতির (inferior animals) পরমনোরঞ্জিনী বৃত্তি যখন এত প্রবল, তখন সমাজবদ্ধ শিক্ষিত মানবের সে বৃত্তি অভ্যাসস্ফূর্ত্ত না হউক অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইহা নিশ্চয়। চতুঃষষ্ঠি কলা বিদ্যার শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতের ফল স্বচিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা আত্মবিনোদন ও পরচিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা পরমনোরঞ্জন। এজন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্যগণ সঙ্গীতরসে বঞ্চিত মানবগণকে শৃঙ্গপুচ্ছহীন দ্বিপদ পশু বলিয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ পশু তৃণভোজী, আর এই শ্রেণীর পশুরা তৃণভোজী হইলে প্রকৃত পশুদের জীবিকার উচ্ছেদ হইবে বলিয়া ইহারা তৃণ ভোজনে বিরত, এইরূপ একটি বিবৃতি দিয়া স্বীয় উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। নিঃসঙ্গুণ্ঠনব্যঙ্গপ্রিয় কাষ্ঠরসিক সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই যে কেবল এই

রূপ অসঙ্গীতজ্ঞতার দোষবাদে মুক্তকণ্ঠ, তাহা নহে। পাশ্চাত্য কবিকেশরী সেক্সপিয়ার (Shakespear) তাঁহার "মার্চেন্ট্ অফ্ ভিনিস্" নামক সুবিখ্যাত নাটকে লিখিয়াছেন,—

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils;
The motions of his spirit are dull as night,
And his affection dark as Erebus;
Let not such man be trusted"

Merchant of Venice, Act V. Scene I.

উদ্ধৃত সন্দর্ভের ভাবানুবাদ করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে মানবের হৃদয়ে সঙ্গীত বা সঙ্গীত অনুভূতির শক্তি নাই, যে মানবের মন সঙ্গীতের বিমোহন তানে বিগলিত হয় না, সে রাজদ্রোহী, দুরভিসন্ধিপরায়ণ অথবা দস্যু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাহার প্রবৃত্তি সকল অমানিশার ন্যায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন, তাহার প্রেম চিরতমসাবৃত রসাতলের ন্যায় একান্ত দুর্ব্বিগাহ; এরূপ মানব বিশ্বাসের অপাত্র। সুকবি নবীনচন্দ্র ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

"হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে রসের প্রধান।"

আমরা দেখিতেছি স্বাধীন দেশের কবি স্বাধীন চিত্তের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া স্বাধীন কণ্ঠে অসঙ্গীত-রসিকের প্রতি যেরূপ অসংযত অপভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার নিকট আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের দোষবাদ প্রশংসাবাদ তুল্য। এই সব দেখিয়া শুনিয়া স্বতঃই মনে ধারণা হয় যে এই রোগ, শোক, দুঃখদারিদ্র্যময় জগতে একমাত্র সঙ্গীতই অপার্থিব স্পর্শমণি। ইহার সংস্পর্শে মলাকীর্ণ লৌহ খণ্ডের সুবর্ণভাব প্রাপ্তির ন্যায় অনন্ত শক্তিশালী সঙ্গীতের পীযূষরসস্পর্শে দুঃখদাবদগ্ধ হৃদয়ও তৎকালে শান্তির অমৃত হ্রদে সুখে অবগাহন করিতে থাকে। এখন 'এই মহামহিমময় সঙ্গীতের স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থকে প্রকৃত সঙ্গীত বলা যাইতে পারে'—তাহার একটু অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সত্য কথা বলিতে

কি, সঙ্গীত শব্দটি আবাল্য শ্রুত হইলেও সহাবস্থিত চিরশ্রুত দেহদেহীর ভেদজ্ঞানের ন্যায় উহা আমাদের একান্ত সন্নিহিত হইলেও অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট, এবং নিতান্ত পরিচিত হইয়াও চির অপরিচিতের ন্যায় অনুভব পথের বহুদূরে অবস্থিত। অবশ্য যাঁহারা সঙ্গীতবিজ্ঞানে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি কেবল আমার মত অবিজ্ঞের পক্ষেই সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ অতি দুর্ব্বোধ ও সুদীর্ঘ কালের শিক্ষা, অভ্যাস এবং সাধনা ব্যতীত উহার উপলব্ধি হয় না বলিতেছি। অজ্ঞের পক্ষে বিজ্ঞোচিত আলোচনা অসঙ্গত ও অসমীচীন হইলেও দুরূহ বিষয় শিক্ষার চেষ্টা বা তৎ সম্বন্ধে যথামতি আলোচনা করিবার অধিকার সার্ব্বজনীন বলিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'সঙ্গীত কাহাকে বলে'—এ প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে বিবিধ বিদ্যাবিৎ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।" দুরূহ সঙ্গীত পদার্থের এরূপ সংক্ষিপ্ত, সুসঙ্গত, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষণ (Definition) অন্যত্র সুদুর্লভ বোধে আমি এইটিরই কিঞ্চিৎ বিবরণ করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টিত হইতেছি। উক্ত লক্ষণের সাহায্যে সঙ্গীত বুঝিতে হইলে উহার অন্তর্ভূত শব্দ ও সুর পদার্থ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ শব্দের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে সুরের মূর্ত্তিটি বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে বিবেচনায় শব্দের কথাই বলা যাইতেছে। অগণ্যবস্তুপ্রপঞ্চময় জগৎ মাত্র পাঁচটি উপায়ে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত হইয়া থাকে। সেই উপায়পঞ্চকের নাম চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের রাজা বা পরিচালক মন। কারণ মনঃ সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই ব্যাপার বা কার্য্য হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মে। এই শব্দ নিরাকার ও নিষ্ক্রিয়গুণ পদার্থ। দুইটি বস্তু পরস্পর আহত হইলে ঐ অভিঘাত হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের একত্র মিলনের নাম সংযোগ। ঐরূপ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শব্দকে সংযোগজগুণ কহে। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে শব্দোৎপত্তির নিম্নোক্তরূপ প্রণালী বর্ণিত আছে। দৃঢ়সংহত বা জমাটবদ্ধ পরমাণুসংহতি বস্তুর ঘনত্বের উৎপাদক। ঐ ঘনসংহত পরমাণুময় বস্তুদ্বয় পরস্পর অভিহত হইলে উহাদের পরমাণু মধ্যে একটা কম্পন জন্মে। ঐ কম্পনের বেগজ আঘাতে আহত বস্তুদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু তরঙ্গ কম্পিত হইয়া থাকে। তখন বীচি তরঙ্গের ন্যায়ে অর্থাৎ লোষ্ট্র নিক্ষেপে ক্ষুব্ধ সলিল সরোবরের প্রথম উত্থিত তরঙ্গের বেগে যেমন

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া সমগ্র সরোবরটী তরঙ্গায়িত করে, সেইরূপ আঘাত কম্পিত বায়ুর ধাবমান তরঙ্গ তরঙ্গ পরম্পরায় আমাদের কর্ণপটহে আহত হইলে উহার সহিত সংলগ্ন শব্দবাহিনী নাড়ীর সংশ্রবে ঐ শব্দ অন্তঃকরণে প্রতিফলিত ও তদাকারে আকারিত হইয়া শব্দজ্ঞান উৎপাদন করে। মন যদি এ সময়ে নিদ্রিত বা অন্য কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শব্দের স্বরবাহিনী নাড়ীর সহিত সম্পর্ক সত্ত্বেও শব্দ জ্ঞান জন্মে না। নিদ্রা ও কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার সময়ে ইহা আমাদের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে কদম্ব কেশরের ন্যায়ে অর্থাৎ কদম্ব পুষ্পের একটি কেশরের পর যেমন পর পর বহু কেশর সন্নিবিষ্ট, তদ্রূপ মূলশব্দোৎপত্তির সমকালে তাহার চতুর্দ্দিকে বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শব্দোৎপত্তির কালের যৌগপদ্য ও কিঞ্চিৎ ব্যবধানই উভয় মতের পার্থক্য। এই শব্দোৎপাদক বায়ু প্রকম্পনই সুরের জনক। এই প্রকম্পনের মাত্রাগুলি সমকালিক হইলে সুর জন্মে। সুধীন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন,—"দুইটি প্রকম্পনের মধ্যে যে কাল গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ মাত্রার সমতা মাত্র, শব্দ প্রকম্পনের সেইরূপ থাকিলে সুর জন্মে। যে শব্দে সমতা নাই তাহা সুর রূপে পরিণত হয় না; সে শব্দ বেসুর অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।" এই বিবৃতির ফলিতার্থ, সুরতান সম্বলিত শব্দের মিল বা ঐক্যতান সঙ্গীত। কবিবর Shakespear পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ্যে ইহাকেই "Concord of sweet sounds" বলিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে মহাদেবের নৃত্যবাচক তাণ্ডব এবং পার্ব্বতীর নৃত্যবোধক লাস্য এই উভয় শব্দের আদ্যবর্ণের "তা" ও "ল" এর সম্মিলনে 'তাল' শব্দের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধানকার অমরসিংহ "তালঃ কাল ক্রিয়ামানম্" গান ও বাদ্য বিষয়ে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণ বিশেষকে তাল বলিয়াছেন। সচরাচর একটি সুর যতটুকু সময় ধরিয়া গীত হইতে থাকে, ঐ সময়ের মধ্যে গেয় সুরটী কতটুকু বিলম্বিত (ঢিমে), কতটুকু দ্রুত (জলদ) কতটুকু মধ্য অর্থাৎ না বিলম্বিত না দ্রুত হইবে ইহা বুঝাইবার জন্য হস্তাঙ্গুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণ রূপ সঙ্কেত দ্বারা কাল ও ক্রিয়ার যে পরিমাণ করা হয়, উহাকেই তাল বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শব্দ সঙ্গীতের দেহ, সুর ও তাল ইহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থানীয়। এজন্যই সুরতালবিহীন শব্দ সমষ্টি গীত নামে অভিহিত হয় না। সঙ্গীতের

মূল শব্দ দুই ভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের দ্বিবিধ নামকরণ হইয়াছে। প্রথম কণ্ঠ-সঙ্গীত (Vocal music), দ্বিতীয় যন্ত্র-সঙ্গীত বা (Instrumental music) শব্দের সংস্তু দ্বৈবিধ্যই সঙ্গীতের দ্বিবিধ নাম করণের কারণ। বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু এই অষ্ট স্থানে যখন শারীর বায়ুর আঘাত জন্মে, তখন ঐ আঘাতজ শব্দগুলিকে বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণ যখন সুর ও তালের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন ইহার নাম কণ্ঠ-সঙ্গীত। একটি পূর্ণ সঙ্গীতে দন্ত্য আদি পৃথক পৃথক বর্ণের সমাহার থাকিলেও নাভিমূল হইতে উত্থিত নাদ বায়ু সর্ব্ব প্রথম কণ্ঠে আহত হইয়া বর্ণরাজ অকারকে উৎপন্ন করে এবং ঐ অকার সর্ব্ব বর্ণের মূল বলিয়া "প্রধানেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি" অর্থাৎ প্রধানের নামে গৌণের নামকরণ হয়, এই রীতি অনুসারে উহাকে কণ্ঠসঙ্গীত বলা হইয়া থাকে। অকার যে সর্ব্ববর্ণের প্রথম ও প্রধান তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার "অক্ষরাণাং অকারোহস্মি" এই শ্লোকাংশের তাৎপর্য্যের প্রতি সাভিনিবেশ মনোযোগ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ—মৃদঙ্গাদি বাদ্য যন্ত্র আঘাত করিলে যে সকল শব্দ জন্মে, উহাদের নাম ধ্বনি। এই ধ্বনি সুর ও তালের অনুগামী হইলে যন্ত্রসঙ্গীত নাম ধারণ করে। সুরতালবর্জ্জিত ধ্বনি অর্থাৎ বিশৃঙ্খল যন্ত্রশব্দ সঙ্গীত না হইয়া শ্রুতিকটু হইয়া থাকে। সঙ্গীতের অনুগত বলিয়াই বোধ হয় চলিত কথায় বাদ্যকে "সঙ্গৎ" বলা হয়। আমাদের দেশে বীণা, তানপুরা, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, একতারা প্রমুখ তন্ত্রীবদ্ধ; বেণু, মৃদঙ্গ, মুরজাদি অতন্ত্রীবদ্ধ যন্ত্র সমুখ দুই প্রকার যন্ত্র সঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। কাল ও রুচিভেদে হারমোনিয়ম্, পিয়ানো প্রভৃতি বিবিধ বিদেশী যন্ত্র এখন স্বদেশীয় যন্ত্রগুলিকে একরূপ নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। দেশে বর্ণ সঙ্কর, শিক্ষা সঙ্কর, ভাষা সঙ্কর, ও সমাজ সঙ্করের ন্যায় সঙ্গীত সঙ্করও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে সঙ্গীত বিদ্যার উপযুক্ত চর্চ্চার বিলোপ ঘটায় উচ্চ অঙ্গের দেশীয় সঙ্গীত ধ্রুপদ,—খেয়াল প্রভৃতির প্রচলন নাই বলিলেই হয়। ফলে উহাদের নিত্য সঙ্গী তানপুরা, এস্রাজ প্রমুখ দেশীয় সঙ্গীত যন্ত্রগুলির অপঘাত মৃত্যু ঘটিতেছে। আমরা কৈশোর বয়সেও রঙ্গিল কঞ্চুকাবৃত তানপুরা হস্তে বহু কলাবৎকে দেশীয় রাজা মহারাজা ও ধনীর মজলিসে পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতের আলাপ করিয়া রীতিমত পুরস্কৃত হইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। পূর্ব্বতন যাত্রার দলে তানপুরা ও বেহালার একাধিপত্য ছিল।

সময়ে সময়ে শ্রোতাগণ অভিনয় স্থগিত করিয়া "সূর্য্য" প্রভৃতি খ্যাতনামা স্বর্গীয় ওস্তাদের বেহালার গান, "রামকৃষ্ণ গদাই" প্রমুখ জুরীর অপূর্ব্ব রাগ রাগিণী সম্বলিত, মেঘমন্দ্র, তানপুরা-ধ্বনি মিশ্রিত উদাত্ত গম্ভীর সঙ্গীতের আলাপ শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। এখন সেরূপ গায়ক ও শ্রোতা উভয়ই বিরল। কালের গভীর কুটিলাবর্ত্তে লোকাভিরাম রাম, মর্ত্ত্যের অমরাবতী অযোধ্যা উভয়ই চির নিমগ্ন হইয়াছে। ভারতে আর আদি কবি ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ পবিত্র সামগানে মুখরিত হয় না, অনন্তবদন অনন্তদেব গীতপ্রিয় ভগবানের স্তুতি গীতি গানে উৎসাহহীন; দর্শন পুরাণের প্রথম ও প্রধান গায়ক ব্যাসদেবের পাঞ্চজন্যনিন্দী কণ্ঠস্বর নীরব নিস্তব্ধ। রামায়ণের ঋষি বাল্মীকির মধুময়ী বীণা ছিন্নতন্ত্রী, তাঁহার সাধের শিষ্য কুশীলবের কিন্নরকণ্ঠ চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা আর অযোধ্যার প্রাসাদোপম পৌর ভবনের মুরঃমন্দ্র মধুর সঙ্গীত লহরী ভারতের দিগ্‌দিগন্তপ্রান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাই না। বৃন্দাবনের বনে বনে গোচারণকারী গোলোকবিহারী যমুনাকাণ্ডারী শ্রীহরির ভুবনমোহন বেণুর কলতানে অর্দ্ধচর্ব্বিততৃণকবলমুখী ধেনু যূথকে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতে, কলনাদিনী স্বচ্ছতোয়া যমুনা তটিনীকে দুকূল প্লাবিত করিয়া উজান বহিতে, পুণ্যজন্মা বৃক্ষশ্রেণীকে সুগন্ধি পুষ্প, সরস ফল ও স্নিগ্ধ মধুধারা বর্ষণ করিতে, মধুপানমত্ত মধুকর কুলকে মধুর গুঞ্জনে বিভোর থাকিতে, কলনাদী কোকিল আদি বিহগ কুলকে কাকলীতানে মুগ্ধ হইতে; আর সর্ব্বোপরি কৃষ্ণৈকপ্রাণা প্রেমমূর্ত্তি ব্রজাঙ্গনাগণকে অকালে গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র ও প্রিয় দর্শনের অন্তরায়ভূত পতি স্বজনকে ছাড়িয়া, আপনা পাসরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমানা হইতে দেখিতে বা শুনিতে পাই না। আর দেখিনা, কীর্ত্তনাবতার গৌরাঙ্গসুন্দরের স্থাবর জঙ্গম মাতান, হিংস্রশ্বাপদ ভুলান, আকাশ পাতালভেদী কীর্ত্তনের রোলে নদীয়া শান্তিপুর তোলপাড় হইত। জানি না কোন্ অজ্ঞাত অভিশাপের দুরন্ত প্রভাবে অমরবাঞ্ছিত ভারতে বিমল অনন্দধারাবাহিনী গীতি ভাগীরথী আজ এই ভয়াবহ কীর্ত্তিনাশার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এখন ঘরে ঘরে গ্রামোফোন যেমন কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান অধিকার করিয়া ভারতীয় গায়ক গায়িকার পিকবিনিন্দি কণ্ঠস্বরকে কিম্ভূত-কিমাকার করিয়া তুলিয়াছে,—পক্ষান্তরে মজলিসে মজলিসে যন্ত্রসঙ্গীতের স্থানও তেমনি হারমোনিয়ম্ আদির দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় ক্রমশঃ ঐ সকল দেশীয় সুকুমার কলাবিদ্যার আত্যন্তিক ধ্বংস

ঘটিতেছে। দেশভেদে জলবায়ুর গুণবৈষম্যে মানবের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ শক্তির বিষম বৈষম্য ঘটে,—ইহা আমরা সকলেই জানি। একজন খাঁটি ইউরোপীয়ান্ বা ইউরোপে ভূমিষ্ঠ, লালিত, পালিত, শিক্ষিত ব্যক্তি যেরূপ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইংরেজীভাষা উচ্চারণ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন, অন্য দেশীয়ের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপরদিকে একজন খাঁটী ভারতীয় নিজ মাতৃভাষা যেরূপ সুন্দর ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন, অপর দেশীয়ের পক্ষে উহা অসাধ্য ব্যাপার। অধিকদূর যাইতে হইবে না, ভারতবাসীদের মধ্যে কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেরূপ বিশুদ্ধি ও শ্রুতিমাধুর্য্যের সহিত দেবভাষা উচ্চারণ করিতে পারেন, তথাকথিত বঙ্গবাসী পণ্ডিত আমরা তাহার যোগ্য অনুকরণেও অসমর্থ। তৎতৎ দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করিয়া অভ্যাস ও আলোচনার সাহায্যে কতকটা সাদৃশ্য লাভ হইলেও সাযুজ্য সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। একজন খ্যাতনামা ভাষাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "ইউরোপে পনর মাইল অন্তর ভাষাভেদ বর্ত্তমান।" আমাদের দেশেও "দেশান্তর ভাকা, কেউ বলে চুলো কেউ বলে আকা" এইরূপ একটি প্রাচীন ভাষা প্রবাদ ঐ মতেরই সমর্থন করে। বিষয়টী মূল প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নহে। সুতরাং এখনেই বিরতি দিয়া প্রকৃতের অনুসরণ করিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত যন্ত্রগুলি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ বিজ্ঞ সাধককল্প কলাবৎদিগের দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি দেশীয় সুরে সুসংবদ্ধ গীত ও বাদিত হইয়া আসিতেছে। বিদেশীয় যন্ত্রগুলি আজ যদি সহসা ভারতবাসিসুলভ কোমল কণ্ঠস্বরের সহিত বাদিত হইতে থাকে, তাহা হইলে "ঢাকের পিছে সানাইয়ের গান" হইবে। কালের গতি ও সমাজের রুচি ভেদে শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি, গীতি সকলেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু পরিবর্ত্তন ও পরিণাম এক জিনিষ নহে। শিশু পরিবর্ত্তিত হইয়া যুবা এবং বৃদ্ধ হইতে পারে, হইয়াও থাকে, কিন্তু তাহার কখনও বানরে পরিণতি হয় না। আমাদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর যাহাতে বিকৃত না হয়, আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ ও প্রকৃত মাধুর্য্য যাহাতে অক্ষত থাকে, এইরূপভাবে বিদেশীয় যন্ত্র প্রচলন বর্ত্তমান কালের সকলেরই ইষ্ট, কিন্তু 'ঘরকে পর করিয়া পরকে ঘর' করিবার চেষ্টা করিলে ইষ্টলাভ হইবে না বরং উত্তরোত্তর অনিষ্টের দাবানল দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে। প্রয়োজনের তাড়নায় রাজভাষা এখন আমাদের নিত্যারাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা

সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ঐ ভাষা কেবল আমাদের কর্ম্মজীবনের উপযোগীরূপেই শিক্ষণীয়। হিন্দুর গার্হস্থ্য বা ধর্ম্মজীবনে উহা কখনও উপাস্য হইতে পারে না। মাতৃভাষা ইষ্টদেবতার ন্যায় উপাস্য। কিন্তু রাজভাষা মাত্র বহু পূজার পাত্র। বিদেশীয় ধাত্রীর ক্রোড়ে লালিতপালিত ধনীর সন্তান যদি আজন্ম বিদেশী বুলি শিখিয়া স্নেহময়ী জননীকে অনাদর করে ও স্বীয় মাতৃভাষায় মাতৃ সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করে কিম্বা অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পবিত্র ভারতে উহার জন্মগ্রহণ প্রাক্তন মহাপাপের শাস্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সঙ্গীতের দেহ শব্দ, আর সেই শব্দের রক্তমাংস বর্ণমালা। ত্রয়োদশ স্বর ও পঞ্চত্রিংশৎ ব্যঞ্জন, এই বর্ণমালায় যে শব্দময় সঙ্গীতের জন্ম, ইংরেজী পঞ্চ স্বর ও একবিংশতি ব্যঞ্জন মিলিত মাত্র ষড়্‌বিংশতি বর্ণে গ্রথিত অপূর্ণ বর্ণমালার সাহায্যে আমাদের দেশের সপ্ত স্বর, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী অবিকলরূপে ধ্বনিত ও গীত হইতে পারে কি না তাহাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক বর্ণের এক একটি নিজস্ব আছে। বর্ণের ন্যূনাধিক্যে যদি ধ্বনির অল্পাধিক্য ঘটে, তাহা হইলে ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীতে বর্ণের অল্পতায় সুরের ন্যূনতা ঘটা স্বাভাবিক। ইংরেজী ভাষার কোন কোন খ্যাতনামা বৈয়াকরণিক তাঁহাদের ভাষার বর্ণমালায় এইরূপ বিকলাঙ্গতার কথা স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।

সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পররঞ্জন ও আত্মবিনোদনই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীব উদ্দেশ্যের ক্রীতদাস। স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের অহরহ প্রচেষ্টাই জীবের জীবনকে সজীব রাখিয়াছে। নিরলস পিপীলিকার ন্যায় আমরা অনুক্ষণ স্ব উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর। সেই সাধনার পথ যতই সুগম, সহজ ও অনায়াসগম্য হয়, ততই শ্রী ভকর হইয়া থাকে। এই হিসাবে সংসারে সুখের পথের পথিক জীবের নিকট সঙ্গীত যেমন পরম ও চরম সম্বল, তেমন আর কিছুই নহে। প্রাচীন আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" কিংবা "গানাৎ পরতরং নহি।" অর্থাৎ তাঁহাদের একদল জ্ঞানবাদী, অন্যদল গানবাদী।" জ্ঞান ও গান উভয়ই মুক্তির সাধন পথ। কিন্তু রেলপথে বিলাত যাত্রা করিতে পারিলে জলপথের যাত্রী যেমন আপনা আপনিই হ্রাস পায়, জলপথের নিন্দাবাদের দ্বারা আর বিলাত যাত্রীর প্রবৃত্তি রোধ করিতে হয় না, ঠিক তেমনি দীর্ঘকাল সাধ্য কঠোর শমদমাদিলভ্য তত্ত্বজ্ঞান ছাড়িয়া নিত্য সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত মানব গার্হস্থ্যধর্ম্মসুলভ গানেরই শরণ লইয়া

থাকেন। সঙ্গীতের স্বরূপ কীর্ত্তন অসাধ্য ব্যাপার। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, "তিনি তাঁহার নিত্যধাম গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন না; যথায় তাঁহার ভক্তগণ গান (সংকীর্ত্তন) করেন, তথায় তিনি নিত্য বিরাজিত।" যে গানে দেবাদিদেব মহাদেব পরম যোগী, মহর্ষি নারদ সংসার ত্যাগী চিরবৈরাগী, যে গান পৃথিবীর প্রতি রেণুকম্পনে, নদনদীর কুলুকুলু তানে, সৌরালোকের কণককিরণ কম্পনে, সুধাকরের মধুবর্ষী কৌমুদীচ্ছটাস্পন্দনে, মহাব্যোমের বিশ্ববিসারী প্রতিবিম্ব শিহরণে, সমীরণের অব্যক্ত মধুর নিয়ত নিঃস্বনে, প্রভাত-বায়ুর সুখশীতল স্পর্শে, বিহগকুলের উষাকীর্ত্তন কলরবে, ফুলরেণুচুম্বি অলিগুঞ্জরণে, পত্রপুঞ্জের মর্ম্মর নিক্বণে, অমানিশার নিশীথ নিস্তব্ধতায়, রাকাচন্দ্রের ভুবনমোহিনী ময়ূখমালায়, প্রভাতের শীত প্রশান্ত মধু স্নিগ্ধতায়, মধ্যাহ্নের রুদ্র গভীর গাম্ভীর্য্যে, সান্ধ্য শান্তির অস্ফুট ছায়ায়, শিশুর অহেতুক হাস্য ক্রন্দনে, জননীর সোহাগ তাড়নে, পিতার লালনর্ভৎসনে, ভ্রাতার আদরআপ্যায়নে, ভগিনীর শুশ্রূষাযত্নে, বন্ধুর প্রীতিআলাপনে, প্রভুর নিগ্রহানুগ্রহ বিতরণে, রাজার প্রজারঞ্জনে, প্রজার—রাজভক্তি-উপঢৌকনে, প্রিয়তমার সপ্রেম-সম্বোধনে, শৈশব-দোলার মৃদুমন্দ হিন্দোলনে, বিবাহ বাসরের মহোল্লাস-কল্লোলে, মৃত্যুশয্যায় অন্তিম-মর্ম্মোচ্ছ্বাসে, অবিরত আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতে, কখনও ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত, কখনও মিলন কখনও বিরহ, কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও করুণ কখনও কঠোর সুরে ঝঙ্কৃত অনুঝঙ্কৃত হইতেছে, সেই বিরাট্ বিশ্বরূপী মহান্ সঙ্গীতের কথা বলিবার উপযুক্ত ভাষা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনায়ত্ত।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষা সংস্কার।

(১) আদ্য ও মধ্যশিক্ষা।

আদর্শের পরিবর্ত্তন।—শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনায় জার্ম্মেণীর শিক্ষার নূতন পরিবর্ত্তন-গুলি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত। এই দেশে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ না। এই সত্যটী জার্ম্মেণীর শত্রুরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে সমাজের সকল স্তরে এই শিক্ষার বাসনা চরিতার্থ করিবার সমান সুযোগ ছিল না। সেই কারণে সমাজের নিম্ন ও মধ্যস্তরে ভিতরে ভিতরে একটা অশান্তির ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। সমাজ-তান্ত্রিকদল (social democrats) জাতীয় মহাসভাতে এই অশান্তির সংবাদ ঘোষণা করিলেও, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে দেশের শাসকসম্প্রদায় এমন শৃঙ্খলার সহিত একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল যে দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সকলেই জীবনের সমস্ত কার্য্যে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের ফল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিশেষ ভাবে অনুভূত হইত। জার্ম্মেণীর জ্ঞানপিপাসার কথা সাধারণ ভাবে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পিপাসা নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কারে নিয়োজিত থাকিলেও সকল আবিষ্কারই সাম্রাজ্যবুদ্ধি, শক্তিলিপ্সা, কর্ত্তৃত্বাভিমানে রঙীন হইয়া দাঁড়াইত। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে সত্যের মর্য্যাদা অপেক্ষা শক্তির আরাধনা ও শাসক-সম্প্রদায়ের পূজার অধিকতর সুবন্দোবস্ত ছিল। য়ুরোপীয় মহা সমরের ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মেণীতে সম্প্রসারিত শিক্ষাশালা, শিল্প বিদ্যালয় ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের শিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের পরই এরূপ চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং নূতন শিক্ষা-আইনের সাহায্যে এরূপ শিক্ষার সুব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বেসরকারী ভাবে কোথাও কোথাও এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেও, অর্থাভাবপ্রযুক্ত এই উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। জার্ম্মেণীতে সমাজের সকল শ্রেণীর ভিতর এই শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা যুদ্ধের পূর্ব্বেই কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর বিরাট কুরুক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টি, বিষাক্তধূম, জেপেলীন, ইত্যাদি মরণের নানা অদ্ভুত উপকরণের দ্বারা বিশেষ ভাবেই জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু জার্ম্মেণীতে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য; শিক্ষা এবং শ্রম শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলেও, দেশীয় শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের ও সামাজিক জীবনের দাবী সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হয়। ব্যষ্টি সমষ্টির ঐশ্বর্য্য যজ্ঞের—সমিধ্‌রূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ব্যক্তি, পরিবার, ও সমাজের স্বাধীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হৃষ্টান্তঃকরণে বিসর্জ্জন দেওয়ার অভ্যাস অর্জ্জনই জাতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই চেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সার্থক হইলেও একটা প্রচ্ছন্ন অশান্তি ও অসামঞ্জস্যের অনুভূতি সর্ব্বত্রই বিরাজমান ছিল। রাষ্ট্রে সমাজের উচ্চতম স্তরের একটি মাত্র সম্প্রদায়ের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজ সংস্থানে দ্বন্দ্বের অভাব ছিল না। শিক্ষা বিষয়ে এই একাধিপত্য কিরূপ অশান্তির কারণ হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রের মরণ-যজ্ঞে সামাজিক ভেদাভেদের স্থান ছিল না, এখানে সামাজিক সাম্য প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া লোকচক্ষুর গোচর হইতে লাগিল, এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পাণ্ডারাও শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজের সকল শ্রেণীর সমান অধিকারের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে এই সাম্যের দাবীর স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন, যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মেণীতে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফলে—সমগ্র দেশে স্বাধীনতার ভাব সমাজের সকল স্তরে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং শিক্ষাতেও এই স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক পরিচালনের ফলে শিক্ষায় আর সামাজিক বৈষম্যের স্থান নাই;—জীবনকে বৃহত্তর ও পূর্ণতর করিবার আকাঙ্ক্ষাই এখন দেশব্যাপী শিক্ষা প্রচেষ্টার একমাত্র আদর্শ। জার্ম্মেণী কিরূপ সংস্কারের সহায়তায় শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য ও এই আদর্শ সার্থক করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছে, তাহা শুধু আমাদের দেশের নয়, জগতের সমস্ত সভ্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত।

শিক্ষার বর্ত্তমান আদর্শ।—জার্ম্মেণীর সমাজ-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত অগ্রসর, শিক্ষা সম্বন্ধে উক্ত সম্প্রদায়ের এই বাম অংশের (Left wing) দাবী হইতে

নব সংস্কারের আদর্শ বিশেষভাবে বোধগম্য হইতে পারে। এই দলের একজন মুখপাত্র ডক্‌টার ল্যোহ্বেনষ্টাইন্ (Dr Lowensetein) তাঁহার এক নবপ্রকাশিত পুস্তকে জার্ম্মেণীর সামাজিক সাম্যবাদীদের শিক্ষা সংস্কারের আদর্শ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সমস্ত দেশে আইন্‌হাইট্‌স্ স্কুলেন (Einheits schulen) অর্থাৎ বাধ্যতা মূলক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সাম্যই হইবে এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নীতি। এখানে এমন কি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর প্রত্যেক বালকবালিকা যাহাতে জন্ম বা জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নিজ নিজ জীবন যাপনের উৎকৃষ্টতম সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে হৃষ্টমনে ও চিত্তাকর্ষক আবেষ্টনের মধ্যে গর্ভিণীদের গর্ভকাল অতিবাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং আবশ্যক হইলে ছোট ছোট শিশুদিগকে কুমার কাননের অনুরূপ কুমার কুটীরে (Kinderhut) শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইবে কুমার কাননে। এখানে বালকবালিকারা আট বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া, গ্রুণ্ড্‌স্কুলেন্ (Grund schulen) অর্থাৎ আদ্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। এই আদ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাল হইবে চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত। এ গুলিকে ইংলণ্ডের নিম্ন বিদ্যালয়ের সহিত তুলনা করা ভুল হইবে। এখানে লিখন, পঠন, ও গণনা, হস্ত বা কর্ম্ম শিক্ষা হইতে অধিকতর মূল্যবান বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সমবেত শিক্ষা এখানকার শিক্ষা প্রণালীর আদর্শ থাকিবে না। ছাত্র শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীদিগকে ছোট ছোট গুচ্ছে বিভাগ করিয়া বিদ্যামন্দিরেই কর্ম্ম সংঘের (Working society) সৃষ্টি হইবে। এরূপ নানা উপায়ে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী গতানুগতিকতা বর্জ্জিত থাকিয়া যতটা অকৃত্রিম ও বাস্তব শিক্ষায় পরিণত হয়, তাহার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই গ্রুণ্ড্‌স্কুলেনের শিক্ষা শেষ করিয়া বালকবালিকারা ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দেশের ওবের স্কুলেন্ (Ober schulen) অর্থাৎ উচ্চতর বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্টতর সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিবে। পরে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও বার্ত্তিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে মনোমত বৃত্তি ব শিল্প পারদর্শী হইবার সুযোগ ও প্রবৃত্তি অনুসারে এখান হইতেই সকল বালকবালিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে। উপরের আলোচনা হইতে পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষার আদর্শের নিম্নলিখিত পাঁচটী

পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে:—প্রথম,—খুব শিশুকাল হইতে শিক্ষারম্ভ; দ্বিতীয়,—সকল স্তরের শিক্ষায় সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষার সহিত কর্ম্ম বা ব্যবহারিক শিক্ষার সুব্যবস্থা; তৃতীয়,—ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রচলন; চতুর্থ,—শিক্ষায় সমাজের সকল স্তরের বালকবালিকার সমান অধিকার ও সমান সুবিধা, এবং পঞ্চম,—শৈশব, আদ্য, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পরস্পর সুসংযোগ।

আদ্যশিক্ষা।—কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা খুব সহজসাধ্য নয়;—বিশেষতঃ এই জাগতিক অর্থাভাবের দিনে। জার্ম্মেণীতেও অর্থের অনাটন কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। সেই জন্য সেখানে শীঘ্রই যে এই আদর্শে শিক্ষা সংস্কৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু জার্ম্মেণীতে নানা প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত থাকিলেও, বাধ্যতা-মূলক আদ্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বত্রই শিক্ষা-সংস্কার বিধিবদ্ধভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এইরূপ বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। এখানে শিক্ষার সকল শ্রেণীর বালক-বালিকার সমান অধিকার। দেশের সমাজ-তান্ত্রিকদিগের অপরাপর সাম্যভাবও এই বিদ্যালয়গুলিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষায় রেখাঙ্কন (Drawing), চিত্রাঙ্কন (Painting), প্রতিমা গঠন (Modelling) প্রভৃতি কর্ম্ম শিক্ষার উপায়গুলিকে খুব উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। গার্হস্থ্য-জীবন ও দৈনন্দিন-জীবনই শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। একই জার্ম্মেণ ভাষা দেশের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত পৃথক বলিয়া, সকল বালকবালিকাই মাতৃভাষার প্রাদেশিক রূপটীই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করে, এবং কথোপকথন, মৌখিক রচনা ইত্যাদিও এই প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহার করিতে শিখে। শারীরিক শিক্ষার (Physical training), জন্য ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে। যখনই সম্ভব হয়, খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে, এবং বালকবালিকারা পরিভ্রমণ ও পর্য্যটনের সাহায্যে খুব সাক্ষাৎ ভাবেই প্রীতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। দেশীয় শিক্ষা-সচিবের নির্দ্দেশ অনুসারে মাসে একদিন সকল বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকেই নিজ নিজ বর্গের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অপেক্ষাকৃত দূর দেশ পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়।

সকল ছাত্রছাত্রীই এইরূপ আদ্যবিদ্যালয়ে আট হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ চার বৎসর শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় অবস্থাভেদে কেহ এখানেই আরো দুই বৎসর থাকিয়া নিম্নশিক্ষা সমাপন করে; আবার কেহ চার বৎসর শিক্ষা শেষ করিয়া মধ্যবিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। ভবিষ্যতে হীন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পারদর্শী ছাত্রদের মধ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের আশা থাকিলেও, এখনও পিতামাতার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপরই এরূপ শিক্ষা নির্ভর করে। কিন্তু সকল শ্রেণীর এবং সকল অবস্থার পারদর্শী ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতীয় শিক্ষা বিধানে শিক্ষার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখাই জার্ম্মেণীর সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিকদলের এবং জগতের সকল উন্নত দেশের শিক্ষার চরম আদর্শ।

মধ্যশিক্ষা।—মধ্যশিক্ষার বিদ্যালয়গুলির বাহ্য সংগঠনের তেমন কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও, ইহাদের আভ্যন্তরীণ অনেক সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষার উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁক দেওয়া হয়, এবং সপ্তাহে একদিন সকল বালকই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বিভিন্ন ক্রীড়ায় যোগদান করিতে বাধ্য হয়। আদ্যবিদ্যালয়ে যেমন বালকবালিকাদের নিজ নিজ জন্মস্থান ও প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া মাতৃভাষা, ইতিহাস, ও ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এবং মাসে একবার সকল বালকবালিকাকেই শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ বন্দোবস্ত থাকে।—ইতিহাস শিক্ষায় একটী উল্লেখ যোগ্য সংস্কার সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বকার ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকগুলি উঠিয়া গিয়াছে, এবং নূতন পুস্তকে যুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তন ও রাজবংশের উত্থানপতনের বিবরণই একমাত্র আকর্ষণের বিষয় থাকিবে না। নূতন ইতিহাসের পুস্তক নূতন উদ্দেশ্যে ও নূতনভাবে লিখিত হইতেছে, এবং এইসকল পুস্তকে বিভিন্ন যুগের সভ্যতার উন্নতিই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জার্ম্মেণীতে ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকেরা প্রায়ই প্রাচীনমত, প্রাচীন পন্থা, এবং বিশেষভাবে জার্ম্মেণীর ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ঘোরতর পক্ষপাতি ছিলেন। তাই এখন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, এরূপ শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষার স্থান অধিকার করিলেও, এই

এই নীতি শিক্ষাও বাধ্যতামূলক নয়। অনেক বড় বড় সহরে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা এখন আর পাঠ্যতালিকা ভুক্ত থাকে না, এবং প্রচলিত বৈষয়িক (Secular) শিক্ষাই জার্ম্মেণীর শিক্ষার ভবিষ্যৎ আদর্শ।

বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষাসংস্কার গভীরভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মেণীতে একত্র শিক্ষার (co-education) ব্যবস্থা নাই; কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয়ে সময় সময় বালিকারা বালকদের সহিত শিক্ষা লাভ করে। এখন পুংশিক্ষার অনুকরণেই স্ত্রীশিক্ষা গঠিত হইতেছে, এবং সেই জন্য বালিকা বিদ্যালয়েও নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বর্জ্জিত, এবং বাধ্যতামূলক ক্রীড়া ব্যায়াম ও পর্য্যটন সম্বলিত ঐহিক শিক্ষাই স্ত্রীশিক্ষা সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শিক্ষকদিগের শিক্ষা।—শিক্ষক ও ছাত্রের এবং বিদ্যালয় ও গৃহের সংযোগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। জার্ম্মেণীতে শিক্ষকদিগকে পঠন ও পাঠনার পরিচালনে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করা হইতেছে। পূর্ব্বে নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিম্নশিক্ষার পর শিক্ষণ বিদ্যালয়ে (Normal school) ছয় বৎসরের জন্য শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষাবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতেন। এখন আদ্যবিদ্যালয়ের চার বৎসরের শিক্ষা শেষ করিয়া, সকল শিক্ষককেই মধ্যবিদ্যালয়ে আরো পাঁচ বৎসরের জন্য সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ইহার পর তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং এখানে শিক্ষকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুচ্ছের শিক্ষা সমাপন করিয়া, নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হন। নিম্ন শিক্ষকদিগকে এইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধারণ শিক্ষার অবসর দিয়া, শিক্ষকতার জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার পর শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। বালিকাবিদ্যালয়গুলিতেও এরূপ সংস্কার বিশেষভাবেই আরম্ভ হইয়াছে।

ছাত্রদিগের স্বায়ত্তশাসন।—মধ্যবিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর বিশ্বাস ও হৃদ্যতার ভাব এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিয়মানুশাসনে ছাত্রদের ভিতর স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের মধ্যেও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরা মিলিত হইয়া একটী সাধারণ ছাত্রসভা গঠন করে,

এবং এখানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হয়।—কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা খুব সাধারণ না হইলেও, দেশীয় শিক্ষাসচিবের নির্দ্দেশমত প্রত্যেক বিদ্যালয়ই ছাত্রদের একটী প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্গ হইতে দুই একজন ছাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, এবং ইহারা বিদ্যালয়ের শাসন পরিচালনে ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর মধ্যেস্থের স্থান অধিকার করে।—

অভিভাবক সভা।—গণতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মেণীতে বিদ্যালয় ও পরিবারের সংযোগ রক্ষার জন্য এমন একটী অনুষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে, যাহা অনেক দেশের অনুকরণীয়। পিতামাতাদিগের প্রতিনিধি সভা এখানে ছাত্রদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া জার্ম্মেণীর নবীন রাষ্ট্রে শিক্ষায় ও স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের নীতি সুদৃঢ় করিতেছে। জার্ম্মেণীর অনুকরণে ইংলণ্ডেও এরূপ সভা গঠনের চেষ্টা হইলেও, ইংরেজ শিক্ষকগণ এরূপ সভার প্রয়োজন সম্বন্ধে এখনও বিশেষভাবেই সন্দিগ্ধ কিন্তু জার্ম্মেণীকে এ বিষয়ে এখনই বহুদূর অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। অনুষ্ঠানটী খুব নূতন কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। শিক্ষাব্যাপারে ইহার ফলাফল বিশেষভাবেই অনুসন্ধানযোগ্য। এই কারণে অনুষ্ঠানটির বিস্তৃত আলোচনা অনর্থক হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

সভার গঠন।—বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের পিতামাতার ও প্রত্যেক অভিভাবক অভিভাবিকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে একটী মাত্র ভোটের অধিকার থাকে। একই পিতামাতার একাধিক সন্তান বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিলেও ভোটের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় না। অভিভাবক-সভার প্রতিনিধিদিগের নিম্নতম সংখ্যা পাঁচজন, এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত সভ্য দুই বৎসরের জন্য অভিভাবকসভার সভ্য থাকেন। কোন ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে, এবং তাহার অভিভাবকসভার সভ্য, থাকিলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার দলের সভ্যপদপ্রার্থীদের তালিকায় যে অভিভাবক পূর্ব্বনির্ব্বাচনের ভোট গণনায় তাঁহার নিম্নবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই অভিভাবকই তাঁহার স্থানে সভ্যপদ গ্রহণ করেন। নির্ব্বাচনের আটদিন পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্ব্বাচিত অভিভাবকদের প্রথম সভা আহ্বান করেন, এবং এই সভার সভাপতি ও অপরাপর কর্ম্মচারী ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যখনই আবশ্যক হয়, সভাপতি অভিভাবক সভা

আহ্বান করেন, এবং প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর সভার অন্ততঃ একটী অধিবেশন আবশ্যক হয়। অভিভাবকসভার এক তৃতীয়াংশ সভ্যের ইচ্ছাক্রমে অথবা শিক্ষকদের অনুরোধে যে কোন সময় সভার অতিরিক্ত অধিবেশন হইতে পারে। কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন হইলে, সভ্যেতর অপর ব্যক্তির আমন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু ইঁহাদের ভোটের অধিকার থাকে না। বিদ্যালয়ের প্রধান ও অপরাপর শিক্ষকেরাও সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন। সর্ব্বত্রই শিক্ষকের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলেও ভোটের অধিকার থাকে না। আবশ্যক হইলে শিক্ষকদিগকে আমন্ত্রণ না করিয়াও সভার অধিবেশন হয়। ক্ষেত্রবিশেষ অভিভাবক সভা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সমস্ত অভিভাবককে একত্র করিয়া একটী সাধারণ সভায় অভিভাবকদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

সভ্যনির্ব্বাচন প্রণালী।—এই অভিভাবক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী দেশীয় শিক্ষা দপ্তর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সভ্য নির্ব্বাচনের তারিখ শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। ভোটের অধিকার পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সভা নির্ব্বাচনের অন্ততঃ চার সপ্তাহ পূর্ব্বে সাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য তালিকা কোন প্রকাশ্য স্থানে এক-পক্ষ-কাল লটকাইয়া রাখেন। ভোটদাতাগণ ইহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং নির্ব্বাচনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তালিকাসম্বন্ধে নিজ নিজ আপত্তি প্রধান শিক্ষকের নিকট জ্ঞাপন করিতে পারেন। এইরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া প্রধান শিক্ষক তালিকাটী সংশোধন না করিলে, নির্ব্বাচন-সমিতির নিকট প্রতিবাদের অধিকার থাকে। কিন্তু সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইলে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অন্য প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে নির্ব্বাচন শেষ হইলে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নির্ব্বাচনসমিতির নিষ্পত্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার প্রার্থনার অবকাশ থাকে।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রধানশিক্ষকের আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য থাকে। অন্ততঃ চার সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিভাবকদের সাধারণ সভার একটী অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা অথবা ছাত্রদের সাহায্যে অভিভাবকদিগকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়। সাধারণ সভার এই অধিবেশনে তিনি অভিভাবক সভার নিয়মাবলী, ভাবী নির্ব্বাচনের

সভ্য সংখ্যা, নির্ব্বাচনের প্রয়োজন, ভোটদাতাগণের তালিকা, তালিকাসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনের শেষ তারিখ, প্রভৃতি বিষয় অভিভাবকদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। অভিভাবকদিগকে নিজ নিজ দলভুক্ত সভ্যপদপ্রার্থীদিগের তালিকা প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করা এবং এই সাধারণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ জানাইয়া দেওয়া এই অধিবেশনের অন্যতম কার্য্য। নির্ব্বাচনের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধিবেশন আবশ্যক হয়। প্রথম অধিবেশনের কার্য্যাবলীর পুনরালোচনাই এই সভার বিশেষ কার্য্য। নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রকাশ্য প্রস্তাব, উহাদের সমর্থন, অথবা ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচন সমিতির জন্য তিন জন সভ্য নির্দ্ধারণ এই অধিবেশনের অপর একটী কর্ত্তব্য।

নির্ব্বাচনের অন্ততঃ দশ দিন পূর্ব্বে সভ্যপদ প্রার্থীদিগের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা নির্ব্বাচন সমিতির নিকট পেশ হওয়া আবশ্যক। নবনির্ব্বাচনে যতগুলি সভ্যের প্রয়োজন হইবে, প্রত্যেক তালিকায় অন্ততঃ ততগুলি নাম থাকা উচিত, এবং প্রত্যেক তালিকায় সহরে অন্ততঃ কুড়ি জন এবং পল্লী অঞ্চলে অন্ততঃ দশজন অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন। এই নিয়মে কোন তালিকা প্রস্তুত না হইলে, নির্ব্বাচনসমিতি এরূপ তালিকা অগ্রাহ্য করিয়া, অপরাপর তালিকা কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া ইহাদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,। কোন তালিকা পরিত্যক্ত হইলে, নির্ব্বাচনের পর এরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের অধিকার থাকে। নির্ব্বাচনে প্রকাশিত তালিকাগুলির বিশেষ প্রয়োজন। প্রকাশ্য স্থানে খুব প্রকাশ্য ভাবে ভোট সংগৃহীত হয়। প্রত্যেক ভোটদাতা ভোটের কাগজে কোন একটী তালিকা নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া ভোট প্রদান করেন। এই ভোটের কাগজে কোনরূপ পরিবর্ত্তন থাকিলে, অথবা একের অধিক তালিকায় ভোট দান করিলে, ভোট অগ্রাহ্য হয়। ভোট সংগ্রহ সমাপ্ত হইলে, নির্ব্বাচিত সমিতি একটী প্রকাশ্য অধিবেশন ভোটের কাগজগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত উপায় নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম প্রকাশ করেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট—তাঁহাদের নাম প্রেরিত হয়। তারপর নির্ব্বাচন সমিতির প্রত্যেক সভ্যের স্বাক্ষরযুক্ত সভ্য নির্ব্বাচনের একটী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ভোটের কাগজগুলির সহিত, শিক্ষাবিভাগের

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নিম্ন বিদ্যালয়ের সম্পর্কে এরূপ বিবরণ ও কাগজপত্র জেলা শিক্ষাপরিদর্শক কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হয়।

সভ্যনির্ব্বাচন, সভ্যপদপ্রার্থীদের তালিকা, ভোটদাতাদিগের তালিকা প্রভৃতি অভিভাবক সভা সংগঠনের নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার আপত্তি, নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার দুইসপ্তাহ কালমধ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। আপত্তি মাত্রেই নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে না। শেষ নিষ্পত্তি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তিনি যদি আপত্তির সত্যতা স্বীকার করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্ব্বাচনে ব্যবস্থা হয়।

সভার উদ্দেশ্য ও অধিকার।—বিদ্যালয়ের সহিত গৃহের সম্বন্ধ দৃঢ় ও উন্নত করা এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগীতা পরস্পরের প্রভাব সুব্যবস্থিত রাখাই বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। অভিভাবকসভা বিদ্যালয়ের পরিচালন ও নিয়মানুশাসন এবং ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশ করেন। এই সকল বিষয়ে কোন প্রকার প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত আলোচনার অধিকার এই সভার নাই, এবং প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়গুলি খুব সাধারণ ভাবেই বিবেচিত হয়। সকল প্রকার ব্যক্তিগত বিষয় সকল অবস্থাতেই গোপনীয় থাকে। এইরূপ গোপনীয় বিষয় ভিন্ন সভার সকল প্রকার কার্য্যের বিবরণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের পরীক্ষা ও পরিদর্শন করার অধিকার থাকে। অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত আচরণের জন্য বিদ্যালয় হইতে সময় সময় কোন কোন ছাত্র বিতাড়িত হয়। আবার কখনও কখনও ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের অভিজ্ঞান পত্রে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে অপকৃষ্ট মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়। এরূপ মন্তব্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে, অথবা স্থলবিশেষে ইহাদ্বারা ছাত্র সমাজে তাহাদের সম্মানের লাঘব হয়। এইসকল ক্ষেত্রে ছাত্রদের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে শিক্ষকেরা অভিভাবক সভার মতামত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে সকল বিষয়ে এরূপ পরামর্শ প্রদানই অভিভাবক সভার একমাত্র বিশিষ্ট অধিকার হইলেও, এরূপ ক্ষমতার ভিতর দিয়া, বিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধে ও এই সভার প্রভূত প্রভাব পরোক্ষভাবে খুব সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে; এবং এইরূপে শিক্ষকদিগের

সহিত অভিভাবকদের এবং বিদ্যালয়ের সহিত পরিবারের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হইলে শিক্ষা একটি যথার্থ সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে থাকিবে।*

শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়।

রক্তাম্বরা।

—ঃ০ঃ—

নাবিকগণের স্বীকারোক্তি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইভাবে কাটিল। কেবল একবার সেই আগেকার নাবিকদুইটী আমাকে খাবার দিয়া গেল। আমাকে মুক্তি দিবার জন্য অনেক মিনতি করিলাম কিন্তু তাহারা বলিল "কাপ্তান বড় কড়া লোক। ওর সঙ্গে চালাকি নয়। ও বোলেছে তোমাকে যে খুলে দেবে তাকে গরম লোহা ছেঁকা দিয়ে মারবে।"

আমি হান্সওয়েদের কি করিয়াছ ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রভাতে আবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমার স্ত্রীর সুন্দর মুখখানি যেন কাতরস্বরে তার অকাল-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আমায় টানিতেছিল কিন্তু ছাড়া পাইবার উপায় নাই; সেদিন শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইল। বিষের নেশা ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছিল। আরও একদিন গেল, দুদিন গেল, রোজ নিয়ম মত নাবিকদের অপরিষ্কৃত, আধসিদ্ধ, খাদ্য খাইতাম সেদিন হঠাৎ সূর্য্যাস্তের একটু আগে কলের শব্দ থামিয়া গেল আমার কাঁচের ফুকরটিতে বাহির হইতে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। লোকজনের হুড়াহুড়িতে বুঝিলাম জাহাজ তীরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই পলায়নের সুযোগ। অনুমানেই বুঝিলাম জাহাজ তীরে লাগিল। একজন নাবিক যথা সময়ে আহারীয় দিতে উপস্থিত

*Changes in German Education—the times Educational Supplement February, 4, 1922,

হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদের জাহাজ কোন বন্দরে আসিয়াছে। সে উত্তর করিল,—সিংহল। বলিলাম একটি বার আমাকে ডেকে যাইতে দাও, ডেকে থাকিয়াই দেখিব বন্দরটি কেমন। এতদিন এমন ভাবে বদ্ধ থাকিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই কথা—কাপ্তেনের হুকুম নাই। অনেক কাঁদাকাটির পর কাপ্তেনের নিকট আমার কথা জানাইবার স্বীকার হইল। জানি না কেন কাপ্তেন অনুমতি দিলেন। বুঝিলাম নাবিক আমায় পাহারা দিতেছে। অনেক মাল উঠাইবার নামাইবার ছিল ২টা দিন তাহাতে কাটিয়া গেল। আমাকে একবার মাত্র বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত, তৃতীয় দিন বাহিরে আসিলাম সে দিন বড় ভিড়—পাহারার কড়াকড়ি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল—দেখিলাম আমাকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে না, কুলীদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম; এদিক ওদিক ঘুরিয়া সুযোগ মত তীরে নামিয়া আসিলাম। কেহ লক্ষ্য করিল না। রাস্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিস্তর কষ্টে কন্‌সালের আফিসে গিয়া কন্‌সালকে আমার পত্নীর মৃত্যু, আমার প্রাণহানির চেষ্টা ও বন্দী করার সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি যেন বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন "আমি এ কাপ্তানকে ত খুব ভাল করে জানি। সে খুব ভাললোক; বেশ, ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি যদি এসব সত্যি হয় বড়ই অদ্ভুত বোলতে হবে।"

আমি আমার পকেট হইতে পত্নীর গহনাটি ও সেই কাগজখানি দেখাইলে তিনি বলিলেন "আপনার কাহিনী বড়ই অদ্ভুত।" বলিয়া তিনি কাপ্তান ব্যনকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ইতি মধ্যে আমি আমার বিবাহ, পত্নীর মৃত্যু, আমার প্রাণনাশের ভয় ও আমার বন্দী হওয়ার বিষয় সমস্ত আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। এইবার যেন তিনি একটু উৎসাহিত হইয়া, বলিলেন "আপনি একজন অত বড় ডাক্তার, আপনার কথা বিশ্বাস না করবার মত কিছু নেই। আপনার এ রকম করে প্রবাসে পাঠাবার নিশ্চই কোন কারণ আছে। ভেতরের কথা জানতে হবে।" কিছুক্ষণ পরে কাপ্তান ব্যন আসিয়া বলিল "আমায় ডেকেছেন?"

"হাঁ, বোস। তুমি নাকি এলোকটিকে বন্দী করে রেখেছিলে।"

"হাঁ মশায়।"

"উনি অভিযোগ এনেছেন তুমি ওঁকে অজ্ঞান অবস্থায় দেশ থেকে নিয়ে এসেছ, আর বন্দী করে রেখেছিলে।"

"আমি কর্ত্তাদের আদেশ মত একাজ কোরেছি, তাঁরা সব দায়িত্ব নেবেন।"

"না দায়িত্ব তোমার। তোমাকেই ব্যবসার সনন্দ দেওয়া হয়েছে।"

"তা ত। কিন্তু কর্ত্তাদের হুকুম শুনতে আমি ত বাধ্য।"

"এখন ঠিক বল এ ভদ্রলোক কি ক'রে তোমার জাহাজে এলেন ?"

"আমি ঠিক জানি না। আমি বাড়ীতে দেখা কোরতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ছেলের অসুখ কাজেই ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে যায়। আসতে মাত্রই একজন লোক কর্ত্তাদের হুকুমনামা নিয়ে এল। শুনলাম, "একজন যাত্রী যাবেন, তিনি ঘুমোতে গিয়েছেন। এই দেখুন না হুকুমনামা।"

বান পকেট হইতে হুকুমনামাখানি বাহির করিয়া কন্সালকে দিল। চিঠিতে লেখা ছিল আমি পাগল, খুন করবার ইচ্ছা আমার প্রবল, সমুদ্রযাত্রায় আমার বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। আর আমার পাগলামীর একটা লক্ষণ এই যে আমার বিশ্বাস আমি কাহাকেও খুন হইতে দেখিয়াছি। এইবার রহস্য আরও জটিল হইয়া পড়িল। কন্সাল বলিলেন "হান্সওয়েদের নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কি রকম ভাবে ইনি এসেছিলেন কিছু জান ?"

"আমি ত ছিলাম না। তবে শুনেছি ঘোড়া গাড়ী ক'রে দুজন লোক এঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পুলিশ বাধা দিয়েছিল কিন্তু তাঁরা বোলেছিলেন, "মদ খেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

তুমি চিঠি পেয়ে কি কোরলে ?"

"আমি ওঁকে কামরায় পাঠায়ে দিলাম। তারপর উনিও অজ্ঞান ছিলেন; আমিও ওঁকে বিরক্ত করিনি। কর্ত্তাদের আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন কোরেছি।"

"কতদিনের জন্য এবার বেরিয়েছ ?"

"দেড় মাস।"

"তাহলে দেড়মাসের জন্য তোমার কর্ত্তারা এঁকে দেশ ছাড়া কোরে রাখতে চান ? ডাক্তার আমায় অতি ভয়ানক কথা বোলেছেন, আমি এর খোঁজ করা দরকার মনে করি।"

"আমার কোন দোষ নেই, জাহাজ ছাড়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডাক্তারের কোন অস্তিত্ব আমার জানা ছিল না। আমাকে ক্ষমা করুবেন।"

"ক্ষমা ত চাচ্ছ। অজ্ঞান লোককে জাহাজে নিয়ে তুমি নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ কোরেছ।"

"কর্ত্তাদের হুকুম অনুসারে কাজ কোরতে ত আমি বাধ্য।"

এ চিঠি কে দিল ?"

"যাঁরা ওঁকে পৌঁছে গেলেন সেই ভদ্রলোক দুটি।"

"তাঁদের আকৃতি কি রকম ?"

"শুনেছি তাঁরা প্রৌঢ়বয়সী আর পরিচ্ছদ তাঁদের খুব মূল্যবান ছিল।"

পাঠক বুঝিলেন কি ? ইহারাই সেই মেজর ও আদিত্য। কি ভীষণ চক্রী। কন্সাল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তারা চিঠি দিয়ে কি কোরলে ?"

"আমি যখন এলাম তখন তারা চলে গেছে।" কন্সাল তখন আমায় বলিলেন "এই চিঠি নিয়ে হান্সওয়েদের কাছে গিয়ে তাদের মতলব জিজ্ঞাসা করুন। আজকে একটা জাহাজ ছাড়বে। তাহাতে ফিরে যান।" কাপ্তান ক্ষুন্নস্বরে বলিল "ও চিঠি আমি দেব না হুজুর।"

"এখন চিঠি আমার জিম্মায়। তোমার ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। আমি পুলিশ লাগিয়ে এসব বিষয়ের খোঁজ নেব। ভাল চাও ত ভদ্রলোককে সাহায্য কর।"

"চিঠি দিতে চাই না।"

"বেশ তোমার কর্ত্তাদের লিখে দিচ্ছি যে তোমার কাছে জোর ক'রে এ চিঠি আমি নিয়েছি। ডাক্তার এ চিঠি না নিয়ে গেলে কি ক'রে খোঁজ করবেন ?"

আমি বলিলাম। "ভারী আশ্চর্য্য। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে বেলার মৃত্যুর সংবাদ লুকিয়ে রাখায় হান্সওয়েদের কি লাভ !"

"ডিটেকটিভ লাগান; তারা সে বাড়ীটির উপর নজর রাখুক।"

"বাড়ীটি কোথায় তা ত আমি জানি না।"

"চাকরাণী আপনার ঠিকানা বলে নি !"

"না গাড়োয়ানকে বলেছিল। আমি তখন শোনবার জন্য গা করি নি।"

তবে বিয়ের ত রেজেষ্ট্রি হোয়েছিল, রেজেষ্টারী আফিস ঠিকানা পাব বোধহয়।"

৪

"হ্যাঁ ঠিক বোলেছেন। সেখানে খোঁজ পাবেন নিশ্চয়।"

নব পরিচিতা।

শুক্রবার সকালে চাম্পওয়েদের আফিসে প্রবেশ করিয়া ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দেশান্তরিত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে পাগল ঠাওরাইয়া বলিলেন,—"বোল্‌ছেন কি কাপ্তান বানের জাহাজে আপনি বন্দী ছিলেন?"

আমি তখন কন্‌সালের জিজ্ঞাসাবাদ ও অন্যান্য ঘটনার কথা বলিয়া হুকুমনামাখানি বাহির করিয়া তাহাতে তাঁহার নিজের সই দেখাইলাম। তিনি কাগজটী দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "কাগজ আমাদের। নাম সই আমার নয়। এ জাল সই।"

"আপনার সই নয়?"

তিনি তৎক্ষণাৎ এক টুকরা কাগজে নাম সই করিয়া দেখাইলেন। তাই ত, লেখা এক রকম বটে কিন্তু এঁর লেখায় কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। তা ছাড়া ম্যানেজার বলিলেন যে কতকগুলি চিঠির কাগজের ধার কাটা অনুমান হওয়ায় ফেরত দেওয়া হয় এ তারই একটি। "আপিসে বারলকের টাইপরাইটার ব্যবহার করা হয় কিন্তু চিঠিটি রেমিঙ্গটনের টাইপরাইটার দিয়ে ছাপা।" তার পর তাঁর প্রধান কেরাণীকে ডাকাইয়া চিঠিখানি দেখিতে দিলেন। সেও জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। আমি তাঁদের জাহাজে কিরূপে গিয়াছিলাম এবং কাপ্তেন ব্যান কিরূপ হুকুম পালনে মনোযোগী সে বিষয় তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন "তুমি কোন ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছ। খুব বড় চক্রী না হ'লে এরূপ করিতে কেহ সাহস করে না।"

আমি সেখান হইতে রেজেষ্টরী আপিসে গেলাম। সেখানে জানিলাম যে বেলা নিজে নোটিশ দিতে আপিসে আসিয়াছিল। আমি বিনোদের বাড়ী যাবার পরই এ নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। নোটিশে কনের ঠিকানা দেখিলাম "বেলাবাসিনী আদিত্য, ৪ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। এতক্ষণে বাড়ীটির খবর পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই মেয়েটি যখন নোটিশ দিতে আসে তখন আপনি ছিলেন?"

"হাঁ আমি দেখেছিলাম।" "কি রকম দেখ্‌তে?" "খুব সুন্দরী!" "চুলের রং?" "তাঁর চুলগুলি রেশমের মত হাল্‌কা, কালো কোঁকড়া।" বর্ণনা ত মিলিল। বেলা নিজেই তা'হলে নোটিশের আবেদন কোরতে গিয়েছিলেন। রহস্য ক্রমে আরও ঘনাইয়া আসিল।

"তিনি কি একলা এসেছিলেন?"

"তাঁর বাবা সঙ্গে ছিলেন।"

"সে ভদ্রলোকটি তাঁর বাবা কেমন ক'রে জানলেন?"

"ভদ্রলোকটিই বোল্‌লেন। তাঁর নাম আদিত্য, তিনি মেজর।"

"মেজর! আদিত্যমশায় ত মেজর নন্। লোকটি দেখ্‌তে কেমন?

"সচরাচর সৈনিক বিভাগে কাজ কোরলে যে রকম হয়। খুব রসিক। "বৃদ্ধ?" "না পঞ্চাশও হবে না। চশমা ব্যবহার করেন।"

আমার প্রলোভনকারীর সহিত ইহার আকৃতিতে মিলিল না। কিন্তু মেজরের সহিত মিলিল। তখন সত্য কথা বুঝিলাম। মেজর পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার সম্মতি দিয়াছেন। রেজিষ্ট্রারকে ধন্যবাদ দিয়া আমি সেই বাড়ীটির খোঁজ করিতে গেলাম। কিন্তু এ সে বাড়ী নয়। এ বাড়ীতে আমার বিবাহ হয় নাই। বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকাডাকি করায় দাসী আসিয়া আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, সে পাঁচ বৎসর সে বাড়ীতে কাজ করিতেছে। আদিত্য মশায়ের নামও কখনো শোনে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এ বাড়ী আর কাহাকেও ভাড়া দেওয়া হয় নাই কখনো?" "না। আদিত্য নাম ত সচরাচর দেখা যায় না, আপনি সহজেই খুঁজে পেবেন।" মিছামিছি কষ্ট দেওয়ার জন্য গৃহস্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার রহস্যময়ী পত্নী ইচ্ছা পূর্ব্বক ভুল ঠিকানা দিয়াছেন ভাবিয়া মন বড় ব্যথিত হইল। তারপর পুরোহিতের নিকট গেলাম। তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তারপর সন্দেহ হইল আদিত্য পদবীও হয়ত মিথ্যা। ক্লান্ত শ্রান্ত মর্ম্মাহত হইয়া আমি আবার বিনোদের বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। রামীর মা বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, বলিল "বাবু কোথায় ছিলে এতদিন? যা হ'ক এসেছ নিশ্চিন্ত হোনু। আমি আর রামী কত কি গড়ছিনু গো, কি ভয়টাই পেয়েছিনু।"

"বড় ক্ষিদে পেয়েছে। একপেয়ালা চা আর কিছু।"

"বসুন সমস্ত ঠিক কর'ছ—আমি আমার বাবুকে কাল চিঠি লেখালু রামীকে দিয়ে।"

রামীর মা তাহলে বিনোদকে জানাইয়াছে। বিনোদ শীঘ্রই আসিবে! আমি নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে খুবই আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হইয়াছে। আমি তার করিয়া তাহাকে আমার ফেরার সংবাদ দিলাম। রামীর মা চা আনিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন নতুন রোগী-টোগী আসে নি?" "হাঁ দু'দিন পরেই এসেছিল, জিজ্ঞাসা কোরলে তুমি ফিরবে কবে, আমি কিছু বোল্‌তে পারলুম না। আবার এসেছিল। নিজের নাম লিখে গেছে।"

"কেমন দেখ্‌তে? কি রোগ?

"রোগ বুঝলুম না বাপু, অল্প বয়সী মেয়েমানুষ তা দেখ্‌তে সুন্দর বই কি। এই নাও তার নাম।"

নাম দেখিলাম "রাণী নীরলা দেবী।"

রামীর মা বলিল "একখান চিঠি লিখে দিয়ে গেছে, আমি হারিয়ে ফেলব তাই রামীর কাছে আছে। নিয়ে আসি গে।"

চিঠি পাইলাম। তাহাতে লেখা "ডাক্তার কর যত শীঘ্র সম্ভব ৩৮ নং——রোডে আসিয়া দেখা করিলে সুখী হইব" ঠিকানা হইতে বুঝিলাম ইনি রাজা হরনাথ দত্তের পত্নী। চাপল্য করিয়া, আমি পরদিন দেখা করিব লিখিয়া পাঠাইলাম. পরদিন যখন যাত্রা করিলাম তখন বড় মানুষ রোগীর বড়মানুষী রোগ সারাইবার ইচ্ছা একটুও ছিল না আমার। যাহা হউক আমি বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তারপর ভৃত্য আমায় ছোট একটি বসিবার ঘরে লইয়া গেল। খানিক পরে এক কৃশাঙ্গী তরুণী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরণে ময়ূরকণ্ঠী রংএর রেশমের সাড়ী। তিনি যে খুব সুন্দরী তা নয়, কিন্তু তাঁর চেহারাটা আকর্ষণীয়। দেখিয়া মনে হইল দৌর্ব্বল্যই তাঁর রোগ।

"নমস্কার ডাক্তারবাবু কালই চিঠি পেয়েছিলাম। ক'বার আমি গিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছি।"

"আমাকে কাজে বাইরে যেতে হয় শীঘ্র ফিরতে পারি নি।"

"এরকম প্রায়ই হয়। আপনার স্ত্রীর ত ভারি মুস্কিল। রামীর মা ভেবেই অস্থির।"

"আমি অবিবাহিত আমার জন্য ভাবিবার কেউ নেই।"

সেই সময়ে রাণীর বৃহৎ আয়ত কৃষ্ণতার নয়নের সহিত আমার চক্ষের মিলন হইল। তাঁহার নয়নে কি যেন একটা ভাব ছিল।

"আপনি এসেছেন ভাল হোয়েছে। আমার আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করবার আছে।"

"আপনার কি অসুখ? আমি সাধ্যমত যত্ন নিতে ক্রটী কোরব না।"

"বর্ণনা করাই ত মুস্কিল। কেমন বড় দুর্ব্বল বোধ হয়, মনে হয় টনিক খেলে ভাল হয়, কি টনিক খাই, বলুন ত।"

"আপনি কখনো বেশ ভাল থাকেন আবার হঠাৎ কখন বড় দুর্ব্বল বোধ হয়, না?"

"ঠিক ধরেছেন। এর কারণ বলুন ত।"

"ওটা বিশেষ রোগ নয়। মেয়েদেরই এ রোগ বেশী হয়। বেশী ভাবেন বুঝি।"

"বড্ড বিশ্রী রোগ,—নয়?"

"বিশ্রী আর কি? অনেকেরই আজকাল হচ্ছে।"

"সারাতে পারবেন তা হলে?"

"নিশ্চয়। সহজে পারব বোধ হয়।"

"ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি এ রোগ সারাতে পারেন? এ রোগ মেয়েদের প্রায়ই হয় ঘরে ঘরে! এ রোগ আপনি ভাল কোরেছেন তা হলে?" "কি রোগ দুর্ব্বলতা ত?

রাণী হতাশভাবে বলিল "না না প্রণয় রোগ।"

হারানিধি।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "প্রেমকে রোগ মনে করেন?"

তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "অনেক জায়গায় ত বটে। আমিত আর দশের ছাড়া নই?"

তাঁর কথায় বুঝিলাম তিনি কাহাকেও ভালবাসেন তাই আমি বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মত ক্ষমতা রহিল না। তিনি সুন্দরী নিশ্চয়। তবে হয় ত স্বামী স্ত্রীতে বনে না বোধহয় ধনের মোহে তাঁহাদের বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, এখন

তাঁহাকে পছন্দ হয় না। এরকম ত নিত্যই দেখা যায়। আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা হলে আপনি বড় অসুখী?"

"সত্যি বোলতে গেলে আমার মত অসুখী কমই আছে। তবে আপনি স্নায়ুরোগের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার,—এ রোগের চিকিৎসা খুব ভাল করেন শুনেছি, তাই পরামর্শ নেব বলে স্বামীর অজ্ঞাতে আপনাকে ডেকেছি।"

"আমার নাম জান্‌লেন কি ক'রে?"

আমার মত ডাক্তারের আবার নাম!

তিনি বলিলেন—"আপনি বাঁকিপুরে থাক্‌তে আমার এক বন্ধুর চিকিৎসা কোরেছিলেন তাঁরই কাছে আপনার নাম শুনি। ঔষধে আমার দরকার নেই,—চাই পরামর্শ।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি রোগের ওষুধ চান তাই ডেকেছেন? প্রেস্‌ক্রিপসন দেব না তা হলে?"

"প্রেস্‌ক্রিপসনের দরকার নেই। মনে শান্তি নেই—তারই অভাবে শুকিয়ে উঠ্‌ছি।"

"আমার আন্দাজ হচ্ছে যে আপনার ও আপনার স্বামীর মাঝখানে আর কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সত্য কি?"

"না না ডাক্তার বাবু তা নয়। আমার স্বামী কেমন নির্ব্বিকার লোক আমার এত ভালবাসার প্রতিদান দিতে জানে না।"

রাণীর এই সকল উক্তিতে আমি বড় বিচলিত হইলাম, তাঁর ন্যায় উচ্চবংশসম্ভূতার পক্ষে এতখানি স্বীকার করা যে কতখানি অপমানের তা আমার জানা ছিল তাই বড় ব্যথা অনুভব করিলাম।

"আমাদের দেশে আপনার মত দুঃখী রমণী অনেক আছেন। আমি ডাক্তার বটে স্বামী-বশ করা মন্ত্র ত জানি না। জানলে ঘরে ঘরে মন্ত্র নিত, কিন্তু মানুষের মনের গতি নিরূপণ কোরতে ত আমরা জানি না।"

"আমার এরকম নির্লজ্জের মত আপনাকে এসব কথা বলায় বিরক্ত হচ্ছেন বোধ হয়, কিন্তু"——

"না না আপনার দুঃখে বিরক্ত হব কেন?"

"আপনার কি আমার মত অভাগিনীর প্রতি দয়া হয় না?"

"হয় বই কি। কিন্তু এসব ভেবে শরীর খারাপ কোরচেন কেন? শরীর ত খুবই কাহিল। সে প্রবাদটি মনে রেখে বুক বেঁধে সব সহ্য করুন সেই সে প্রবাদটি জানেন নি ত,—লোকে বল্‌তেই বলে 'প্রেম শুধু পাওয়া যায় প্রেম না চাহিলে।' সেই ভেবেই সহ্য করুন।"

"আমার অবস্থায় ও-প্রবাদের কোন মূল্য নেই।"

"আপনার স্বামী কি তবে আর কাকেও ভালবাসেন?"

"তা জানি না তবে তিনি আমার বিষয় উদাসীন।"

"আপনারা কি খুব বেশি ছোট বড়?"

"আমি কুড়ি বছরের তাঁর এই পঞ্চাশ হোল।"

"রাজা ত নিজে পছন্দ করেই আপনাকে বিয়ে করেছিলেন, তবে এরকম কেন হোল?"

"হাঁ তখন ত উদাসীন ছিলেন না।"

"কতদিন বিয়ের হয়েছে?"

"ছয় বছর।"

আমি ডাইরেক্টরীতে দেখিয়াছিলাম তাঁদের বিবাহের আট বৎসর হইয়াছে। তবু সামান্য এ মিথ্যাটুকু মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক ভেবে চুপ করে রহিলাম। দেখিলাম তিনি আরও কি বলিতে চান অথচ বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, বলিলাম "আপনার কথা শুনে বড় দুঃখ হোল।"

"আজ অবধি কেউ আমার দুঃখে সহানুভূতি করে নি। আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু হলেন তাহলে।"

"আপনার বন্ধুত্বে আমি সম্মানিত বোধ কোরছি। কিন্তু আমি আপনার অসুখেরও চিকিৎসা করতে চাই।"

"মনের অসুখ সারলেই ও অসুখ সারবে।"

"সৎপথে থেকে স্বামীকে ভালবাসলে একদিন না একদিন তিনি আপনার মূল্য বুঝবেন।"

"তা ত কোরছিই। যথাসম্ভব তাঁর সেবা করে তাঁকে সুখী করতে চেষ্টা করি।"

"আশা ছাড়্‌বেন না। সৎস্বভাবা নারীর উপর পুরুষের কিছু না থাক্ একটা সম্মান বরাবরই থাকে।"

আপনি সহায্য কোরবেন আমার ?"

"কোনরকম সাহায্য দরকার হলে চাইলেই পাবেন।"

"কিন্তু আমার স্বামী যেন জানতে না পারেন, মনে রাখ্‌বেন তাঁকে না জানিয়ে পরামর্শ নিচ্ছি।"

"আপনার ইচ্ছামতই কাজ হবে।"

"ভবিষ্যতে ডাক্তার-খানাতেই দেখা পাব ?"

"আমি ডাক্তার রায়ের জায়গায় কাজ কোর্‌ছি। তিনি এলে অন্য কোথাও যাব।"

"তবে আমার কি হবে ?"

"আমি আমার ঠিকানা আপনায় জানাব।"

রাণীর কথাবার্ত্তায় তাঁর সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার বন্ধুত্ব সাদরে গ্রহণ করিলাম, অদ্ভুত আমি একজন স্ত্রীলোকের স্বামীবশ কারবার পরামর্শদাতা হইলাম। রাণী সুন্দরী রমণী তাই এপদে আমার ভয়ও ছিল। যাহা হউক প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া রাণীকে দেওয়ার পরও তাঁহার আমাকে বিদায় দেবার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। রাণী হাসিয়া বলিলেন "আপনার বন্ধুত্বে বড় গৌরব বোধ কোরছি।" সহসা তাঁহার মুখে এক জয়শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম। "শরীরের যত্ন নিতে ভুলবেন না।"

"আমি আপনার প্রেস্‌ক্রিপসনের সদ্ব্যবহার কোরতে রাজি নই কিন্তু"

"কেন ?"

"আমি ওসব মিথ্যা বল ছিলাম। জীবনে কখনো আমি দুর্ব্বল বোধ করি নি।"

"আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে এ রকম পরিহাস আপনার শোভা পায় না।"

"শোভা পায় না ঠিক কিন্তু উদ্দেশ্য আছে, এক দিন জানতে পারবেন।"

"আমার সময় বৃথা নষ্ট ক'রে কি ফল হোল ?"

রাণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হয়েছিল।"

আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম "আলাপের চমৎকার রীতি !"

"রীতি চমৎকার বটে, কিন্তু নূতন নয়।"

"আমার সঙ্গে আলাপ করে কি লাভ আপনার ?"

তিনি দ্রুত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, তার পর, আমার দিকে চাহিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিলেন "বিরক্ত হলেন ? কিন্তু কেমন অভিনয় কোরতে পারি দেখলেন ত ? বড় ডাক্তার হ'য়েও প্রতারিত হোলেন। কেমন কি না ?"

আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম "আমার উপর অন্যায় করা গেল।"

রাণী তখন অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "ক্ষমা কোরবেন না আমায় ?"

"নিশ্চয়ই কোরব। প্রকৃত উদ্দেশ্য অবিশ্যি জানাতে হবে।"

"কোনই উদ্দেশ্য নাই। আমি আপনাকে দূর থেকে দেখে আলাপ কোরতে ইচ্ছুক হই।"

"কেন ?"

"কিছু না বন্ধুত্ব ক'রব বলে।"

রাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

আমি তখন বলিলাম "স্বামীসংক্রান্ত সব কথা তা হলে মিথ্যা ?"

আমি কি করিয়া এই রমণীকে বিশ্বাস করিয়া ছিলাম ভাবিয়া পাইলাম না।

"না না সব মিথ্যা নয় ! একদিন তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেব আপনার।"

"তাঁর সঙ্গে পরিচয়ে আনন্দিত হব সন্দেহ নেই, কিন্তু এত মিথ্যার পর আর বিশ্বাস কোর্‌তেও প্রবৃত্তি নেই।"

"তা এক রকম ভাল। শত্রুতা হ'য়ে বন্ধুত্ব হলে খুব স্থায়ী হবে।"

"আপনি তা'হলে আমার বন্ধুত্ব চান ?"

"তাই ত ভেবেছি।"

"কোথায় দেখেছিলেন আমাকে ?"

অনেক জায়গায় ত দেখেছি।"

রাণীর ইচ্ছাটা কি ? তিনি কি আমাকে তাঁর প্রণয়ী নির্ব্বাচন কোরলেন নাকি ? অদ্ভুদ এ রমণী।

৫

তবু কোথায় ?"

"তিন হপ্তা আগে হোটেলে বন্ধুর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন।"

"সেখানে আপনি ছিলেন ?"

"আমার কথা মিথ্যা ? দেখিনি বোলতে চান ?"

"কি করে জান্‌বো, আমাকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন বোধ কোরেছিলেন।"

আমার কথা মুখেই রহিল। বীণার ন্যায় মধুর সুরে কে বলিয়া উঠিল "নীরলা ও নীরলা কোথায় গেলে ? দেরী হ'য়ে গেল যে !"

তৎক্ষণাৎ দ্রুতপাদক্ষেপে এত তরুণী ঘর আলো করিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই রাণী একেলা নহেন বুঝিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একি স্বপ্ন একি মায়া ? হায় একি ছায়া—না ছায়া নয়। এই আমার মৃত পত্নী সশরীরে লজ্জারক্ত মুখে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

সুরভি আশ্রম।

—:০:—

ফিরে পেলাম রাজ্য আমার
সোণার সিংহাসন,
সুরভি আশ্রমের লাগি
মন যে উচাটন।
স্তন্য তোমার পিয়ে
ছিলাম আমি জিয়ে
মায়ের কোলের মতন তোমার
স্নেহের নিকেতন।

(২)

দিত তোমার পুণ্য ধারায়
শূন্য হৃদে বল,
তোমার স্নেহ তাপিত দেহ
করলে সুশীতল।
শনিগ্রস্ত আমি,
চিন্তা দিবা যামি,
তোমার দয়া নূতন করে
গড়লে এ জীবন।

(৩)

ঘুমায়ে হায় তোমার ছায়ে
ছোট ছেলের প্রায়,
ভবিষ্যতের সুখের স্বপন
দেখেছিলাম হায়।
দুঃখ আমার দেখি
ভিজতো তোমার আঁখি,
ভগবানের কাছে কতই
করতে নিবেদন।

(৪)

দুখের নহে সুখের সেদিন
আজ ভেঙ্গেছে ভ্রম,
ভক্তিপ্রীতির অলকা মোর
সুরভি আশ্রম।

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II{পক্ষা দপদা নর্ঋা | র্সা -না র্সা I র্ঋা র্ঋা র্ঋর্সা | র্ঋনা র্সনা -র্সর্সা |
যা০ রে০০ না০ দে ০ খি জ ন ম০ স্ব প০ ০নে

০ ১ ২´ ৩
| নর্ঋা র্ঋর্সা র্গক্ষা | র্গা র্ঋর্গা র্গর্ঋা I না -র্ঋনা -র্সা | র্সা -না -র্সা} |
না০ দে০ খি০ ন য়০ ন০ কো ০০ ০ ণে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {ক্ষা দা র্ঋনা | র্সা র্সনা র্সা I নদা দা পদনা | পক্ষা ক্ষাপক্ষা গা |
অ বু ধ০ সে জ০ নি দি০ ব স০০ র০ জ০০ নী

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষপা ক্ষাদা -না | পক্ষা দপা ক্ষগা I ঋা -গা -ঋা | সা -ঋা -সা}II
স০ দা০ ই প০ ড়ি০ ছে০ ম ০ ০ নে ০ ০

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II{ন্সা ঋসা গঋা | গঋা ন্ঋা সন্সা I ন্া ঋা ন্সা | সন্া ঋগা ক্ষপা |
হা০ ম০ অ০ ভা০ গি০ নী০০ প রে র০ অ০ ধী০ না০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষপা দক্ষা নদা | ক্ষপা ক্ষগা ক্ষগা I ক্ষা -পা -ক্ষাদা | পা -ক্ষা -পা |
স০ ক০ লি০ প০ রে০ র০ ব ০ ০০ শে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষপা দপা দা | র্ঋা নর্সা র্সা I নর্সা র্ঋর্সা নর্সা | নদা দা পক্ষা |
স০ দা০ ই এ থ০ নি প০ রা০ ণ০ পো০ ড় নি০

০ ১ ২´ ৩
| গা গক্ষাদা দা | নদা ক্ষপা ক্ষগা I গা -া -ঋা | সা -া -া} |
ঠে কি০০ সু পি০ রী০ তি০ র ০ ০ সে ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
| {গা ক্ষাদা পক্ষা | দা ক্ষাপদনা র্সা I নর্ঋা র্সনা র্গর্ঋা | র্গর্ঋা র্ঋর্সা র্সা |
অ সু০ ক্ষ০ ণ ম০০০ ন ক০ রে০ উ০ চা০ ট০ ন

০ ১ ২´ ৩
| নদা ক্ষাদা নর্সর্ঋা | নর্সা র্সনা নদা I না -র্সা -র্ঋর্সা | না -র্সা -া} |
মু০ খে০ না০০ নিঃ স০ রে০ ক ০ ০০ থা ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {নর্সা র্ঋনা র্সা | র্সর্ঋর্গা র্গর্ঋা র্গা I র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্সর্ঋা র্সনা নর্সা |
চন্ ডী০ দা সে০র ম০ ন অ রু ণ ন০ য়০ ন০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষগা ক্ষনা দা | ক্ষপা ক্ষগা ঋা I ন্া -ঋা -ন্সা | ন্া -সা -া}II II
ভা০ বি০ তে অন্ ত০ রে বা ০ ০০ থা ০ ০

কিসের অভাবে এ দশা ?

এদশা দুর্দ্দশা না সুখের অবস্থা ? অতীতের তুলনায় বঙ্গ আজ উন্নতির পথে অগ্রসর না পশ্চাৎপদ, সুখ-সমৃদ্ধি তার বৃদ্ধি পাইয়াছে না বঙ্গ আজ শ্রীহীন, হত-সম্পদ, সুখশান্তি স্বাস্থ্য বিবর্জ্জিত, ধ্বংসোন্মুখ ? কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের ত কথাই নাই,— বিলাতী সভ্যতালোকে ঝলসিত-আঁখি শিক্ষিতের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, অবাধ উন্নতি — বিলাতী সভ্যতার পরা-গতি বসনে ভুষণে, বিলাস-উপকরণে, যাতায়াতের সুবিধায়, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাকঘরে উন্নত শিক্ষার সুবিধানে, এক কথায় পৃথিবীর সহিত বঙ্গের শুভ সম্মিলনে, ভাবের আদান-প্রদানে বঙ্গের যে চিত্র শিক্ষিত বঙ্গবাসীর চক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল মোহনীয় বরণীয় নহে শ্লাঘ্য ! আজও সেই মোহনীয় উন্নতির অতি উষ্মতায় বিগলিত, বাষ্পে পরিণত হইয়াও সে উন্নতি-

হয়, নারীদেরও ষোল সতের বৎসর বয়সেই দুই তিনটী সন্তান হয়। তাহারা দিবারাত্র সেই সন্তানদের অন্নবস্ত্রসংগ্রহ করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে সুতরাং তাহাদের মনোমধ্যে মনের বা আত্মার উন্নতি চেষ্টার কথা কখন উদিত হইবে। সংসারের অভাব মোচনের চেষ্টা ভিন্ন তাহাদের মনে কোন উচ্চতর ভাব জন্মিতেই পারে না। অন্য পক্ষে ইয়োরোপীয়েরা অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকায় তাহারা সংসারের চিন্তায় তেমন বিব্রত হয় না তাহাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখিতে পারে।

লেখকের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে ভারতীয় যুবকদের মনে স্বদেশের প্রতি এবং স্বজাতির প্রতি একটা প্রীতির ভাব জন্মিয়াছে এবং সেই জন্যই তাহারা দলে দলে আত্মোৎসর্গ করিয়া কারাগারে যাইতেছে। যে ভাব প্রণোদিত হইয়া যুবকেরা আত্মোৎসর্গ করিতেছে আমি সে ভাব বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব না। দেশের প্রতি প্রীতি হয় ত একটু জন্মিয়াছে কিন্তু সে জন্য যুবকেরা যে উপায় অবলম্বন করিতেছে তাহা ত আবার দেশের প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিবার উপায় বলিয়াই বোধ হয়। দেশপ্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্য কত জন যুবক জাতি ভেদ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

লেখকের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে ধ্যান করাকেই ভারতের লোক ধর্ম্ম মনে করে এবং ভাবে যে সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিলেই তাহাদের সাংসারিক সকল দুঃখ কষ্টের লাঘব হইবে। লেখকের এই সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু ইহা কেবল ভারতের বিশেষত্ব নহে। প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাই এই যে ঈশ্বরের সেবা কর তাহা হইলেই তিনি তোমার দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এইরূপ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। আমি যদি ঈশ্বরকে সেবা করি এবং তিনি যদি সুবিচারক হন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল করিবেন। এই বিশ্বাসের ফলেই ব্রাহ্মসমাজেও ধ্যানের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় কেন না ধ্যান করাই ব্রাহ্মেরা সর্ব্বপ্রধান সেবা কার্য্য মনে করেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ হইলে গৃহস্থের পুণ্য হয়। ছেলের অসুখ হইয়াছে,

পড়াও পুরোহিতকে দিয়া একরূপ চণ্ডী* সেই পুণ্যের ফলেই ছেলে ভাল হইবে। মাড়য়ারিদের বিশ্বাস যে ধ্যান অপেক্ষা দানই বড় ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বহু অর্থ বিতরণ করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষা এই যে যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে তাহারা নিজের ক্রুশ বহন করিবে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অত্যাচার, পীড়ন ও কষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। গীতার শিক্ষাও প্রায় এইরূপ। "কর্ম্ম (যাহাকে ইংরেজীতে duty বলে তাহা) করিয়া যাও, কর্ম্মে ফল লাভের জন্য যেন তোমার ইচ্ছা না হয়।"

লেখক এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে "গ্রামে ধর্ম্মের অর্থ পুরস্কার ও দণ্ড—কখন কখন ইহা যেন একটা চুক্তি। শিক্ষিত বৃদ্ধগণ বিবেচনা করেন যে ধর্ম্মের অর্থ philosophic resignation এবং prevention of warry. জাতীয়তাবাদী যুবকদের বিবেচনায় ধর্ম্মভাবের অর্থ,—দেশের জন্য আত্মত্যাগ। দেশের মঙ্গলটা যে কি এবং কি উপায়ে সেই মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহা তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া বিশেষ সাবধানে গবেষণা করা প্রয়োজন মনে করেন না।"

বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই লেখকের এই মতের অনুমোদন করিবেন। আত্মত্যাগোন্মুখ যুবকেরাও এই শেষকথাটা একটু মনদিয়া ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব কাহাকে বলে। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব। কিন্তু ঈশ্বরকে ত কেহ দেখে নাই সুতরাং কেমন করিয়া জানিব যে তাঁহার ইচ্ছা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আপ্তবাক্য অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া কার্য্য করাই ধর্ম্ম। কিন্তু অপ্তবাক্য কিরূপ? ইহার উত্তরে কেহ বলিবেন যে নরবলি দিলে ধর্ম্ম হয়, কেহ বলিলেবেন গোবলি দেওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই রূপ একদেশের লোক যে মতকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে অন্যদেশের লোক তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে

* এখনকার যুবকদিগের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে চণ্ডীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবার পাঠ করাকে "একরূপ" চণ্ডী বলিত। এখন বলে কি না জানি না।

করে। অথচ আমি নিজে স্বকর্ণেও ঈশ্বরের কোন বাণী শুনি নাই। এমন স্থানে কোন্ মতকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইব ?

যাঁহাকে স্বচক্ষে দেখি নাই এবং যাঁহার কথা স্বকর্ণে শুনি নাই তাঁহার ইচ্ছা কিরূপ ইহা জানিতে হইলে তুলনা এবং উপমা (analogy) ভিন্ন অন্য কোনরূপ যুক্তি প্রণালী থাকিতেই পারে না। এই যুক্তি প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হই তাহা দেখা যাউক।

ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সংসারপালন ও শাসন করেন সুতরাং তিনি আমাদের পিতা বা মাতা এবং তিনি আমাদের রাজা। এবিষয়ে কোনরূপ মতভেদ হইতেই পারে না। কিন্তু আমি এই প্রবন্ধে পুনঃ পুন "পিতা বা মাতা" অথবা "পিতা এবং মাতা" না বলিয়া কেবল "পিতা" শব্দই ব্যবহার করিব।

এখন আমাদের স্মরণ করা উচিত যে আমাদের পার্থিব পিতা এবং আমাদের পার্থিব রাজা আমরা কিরূপ কার্য্য বা আচরণ করিব বলিয়া ইচ্ছা করেন।

পার্থিব পিতার ইচ্ছা এই যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তান সুখে থাকে প্রত্যেকে সুবেশ ধারণ করিয়া সুশ্রী হয়, প্রত্যেকে নিজের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হয় প্রত্যেকে আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কার্য্য নিরত হইয়া শারীরিক বলসঞ্চয় করে এবং অধ্যয়ন করিয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়, প্রত্যেকে তাঁহার রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তানগুলির প্রতি স্নেহ মমতা দেখায় ও নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহাদিগকে শুশ্রূষা করে, সকল সন্তান তাঁহার সহিত বা সমক্ষে একত্র হইয়া আমোদআহ্লাদ করে প্রত্যেকে তাঁহার বাড়ীঘর ক্ষেত্র ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। জ্ঞানবান্ পার্থিব পিতা কখনই এরূপ ইচ্ছা করেন না যে সন্তানেরা কেবল তাঁহার কাছে বসিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাঁহাকে পিতা পিতা বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিয়া উত্যক্ত করে, বা কেবল তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ করে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কেবল তাঁহার ছবিখানির দিকে তাকাইয়া থাকিলেই তাঁহার প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে। পার্থিব পিতা তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের জন্য সন্তানদিগের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা করেন, পার্থিব রাজা ব্যাপকভাবে নিখিল সংসারের জন্য সেইরূপ আচরণই ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ আমরা

নিজের শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিব এবং নিজে অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও লোক সেবা করিবার চেষ্টা করিব এইরূপ ইচ্ছাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব। "পুণ্যাং পরোপকারে চ পাপং চ পর পীড়নে" এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটী কথার মধ্যে ধর্ম্ম ও পাপ কাহাকে বলে তাহা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে কাহারও উপকার না হয় তাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে এবং যাহাতে কাহারও অপকার না হয় তাহাও পাপ নহে। অর্থদান ঔষধদান প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা রোগশোক মোচনে যে ধর্ম্ম হয় এবং প্রহার, অপহরণ প্রভৃতি যে পাপ ইহা বুঝিতে কাহারও আয়াস পাইতে হয় না কিন্তু মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া বা গালাগালি দিয়া কাহারও মর্ম্মপীড়া দিলে যে পাপ হয় অথবা ভাল কথা এমন কি আমোদের কথা বলিয়া হাসাইয়া আনন্দবর্দ্ধন করিলেও যে পরোপকার অর্থাৎ ধর্ম্ম হয় তাহা অনেকে বুঝেন না।

সুতরাং লোকহিতার্থে যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গীতায় ইহা একবার কৃষ্ণের উক্তিতে "কার্য্য কর্ম্ম"* বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য সর্ব্বস্থলে ইহাকে কেবল "কর্ম্ম" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলায় আমরা বলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইংরেজীতে বলে duty.

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কর্ম্ম শব্দের এই স্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করিয়া আমাদের দেশের টীকাকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন যাগযজ্ঞ। Monier Williams তাঁহার শকুন্তলার টীকায় একস্থলে বলিয়াছেন In India every thing begins with a flash of light but ends in darkness. কর্ম্ম শব্দের টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা Monier Williams এর বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। "কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম" এই কথা কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইবার সময়ে গীতাকার ঋষি পদ্মনাভের মন কি স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আর টীকাকারগণের তমসাচ্ছন্ন মন সেই কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিল কিনা যাগযজ্ঞ। আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় যে ধর্ম্মজীবন নামক পুস্তকের অন্তত একস্থলে শিবনাথ শাস্ত্রী ও কর্ম্মের অর্থ যাগযজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কর্ম্মের অর্থ যদি যাগযজ্ঞই হইবে তাহা হইলে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সমুপস্থিত হইলে যুদ্ধ করাই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ইহা বুঝাইয়া

* কার্য্যংকর্ম্ম সমাচর।

দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না করাইয়া যজ্ঞ করিতে বলিলেই ত পারিতেন। তিনি যখন তাহা করেন নাই তখন মানিতেই হইবে যে কর্ম্মশব্দ কর্ত্তব্যকর্ম্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পিতা মাতার প্রতি, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি আত্মীয়-কুটুম্ব প্রতিবেশীর প্রতি, গ্রামের প্রতি, দেশের প্রতি, নিখিল সংসারের প্রতি বিশেষতঃ অসহায় দরিদ্র রুগ্ন ক্ষুধাতুরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। আমরা প্রত্যেকেই সংসারের সকল কার্য্য করিতে পারি না। অনেক স্থলে প্রকৃতিই আমাদের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যেমন জননীর শিশুপালন। অনেক স্থলে আমরা নিজে পৃথক্ ভাবে অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া লই—যেমন সৈনিকদিগের দেশরক্ষা ও বৈজ্ঞানিকদিগের প্রকৃতির গুপ্তরহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং গৃহীদের কেহ উপার্জ্জন করে, কেহ রন্ধন করে, কেহ শিশুপালন করে এবং কেহ শস্যোৎপাদন করে। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। যিনি যে কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি তাহা ছাড়িয়া অন্যের করণীয় কর্ম্ম করিতে গেলে কোন কোন স্থলে ঘোর অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা। প্রবল ঝড়ের সময়ে যদি জাহাজের অভিজ্ঞ কর্ণধার কর্ণত্যাগ করিয়া খালাসীর কার্য্য করিতে যায় এবং একজন অনভিজ্ঞ খালাসী যদি কর্ণ ধারণ করে তাহা হইলে সমস্ত লোক সমেত সেই জাহাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য কৃষ্ণের মুখ দিয়া গীতাকার বলাইয়াছেন যে পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। এই বাক্যের এরূপ অর্থ কখনই হইতে পারে না যে এক দেশের লোক আর এক দেশের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। নাগারা নরহত্যাকেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহারা যদি প্রতিবেশী খাম্‌তি অথবা সিঙ্ফোর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে কি বড় ভয়ানক হয়? আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের কয়েকটা দ্বীপের অধিবাসীরা নরহত্যাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। এখন তাহারা ইয়োরোপের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নরহত্যা ত্যাগ করিয়া কি বড় গর্হিত কাজ করিয়াছে? ভাবিতে দুঃখ হয় যে বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ট প্রতিভাবান্ লোকও গীতায় এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন যে একদেশের লোক অন্য দেশের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়।

একটু উপরে বলিয়াছি যে গীতার মতে কর্ম্মই ধর্ম্ম। গীতার বচনটী এই—যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্ অথবা যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্। এই প্রকার পাঠের একই অর্থ এবং সেই অর্থ এই যে ভাল করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই যোগ অর্থাৎ ধর্ম্ম। অনেকে বলেন এবং ভাবেন যে ধ্যানকেই যোগ বলে। এই মতটী যে ভ্রান্ত তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ একাধিক বস্তুর মিলন বা একত্র হওয়া। এই যোগে যে সর্ব্বপ্রকার বলবৃদ্ধি হয় তাহা সকলেই জানে। একটা ভারীবস্তু আমি একাকী তুলিতে পারি না, তুমিও একাকী তুলিতে পার না; কিন্তু তুমি আমি এক যোগে যখন টানি তখন সেটাকে উঠাইতে পারি। এই টানাতে উভয়কেই কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু কার্য্য না করিয়া কেবল আমি তোমার ধ্যান করিতাম এবং তুমি আমার ধ্যান করিতে তাহা হইলে কি সেই বস্তুটা উত্তোলন করা হইত? কখনই নহে। আমি ঘণ্টায় দেড় ক্রোশ চলিতে পারি; রেল গাড়ী যায় ঘণ্টায় ১৫ ক্রোশ। কিন্তু আমি যদি রেল গাড়ীতে চড়ি অর্থাৎ রেল গাড়ীর সহিত নিজকে যোগ করিয়া দিই, তাহা হইলে আমিও ঘণ্টায় পোনর ক্রোশ যাইতে পারি। রেল গাড়ীর সহিত নিজকে যুক্ত না করিয়া আমি যদি রেল গাড়ীর ধ্যানই করিতাম তাহা হইলে কি আমি মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতাম? কখনই না। আমি যদি আরিস্‌টল, নিউটন; গৌতমের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের মনের সহিত আমার মনের যোগ স্থাপন না করিয়া কেবল তাঁহাদের মূর্ত্তির বা গুণের ধ্যান করিতাম তাহা হইলে কি আমার একটুও জ্ঞান বৃদ্ধি হইত? কখনই না। সেইরূপ ঈশ্বরকে ধ্যান করিলেও কোনরূপ উপকার হইতে পারে না। তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া ভাবিলে ত কোন প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা নাইই। তাঁহার দয়াবত্তা, তাঁহার শক্তি, তাঁহার চৈতন্য অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিয়া যদি কার্য্য দ্বারা সেই সেই গুণ লাভ করিবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে সে চিন্তাও নিষ্ফল। আমরা যদি "তাঁহার বরেণ্য জ্যোতি আমাদিগের বুদ্ধিকে পরিচালন করুক" এই কয়েকটী কথার মূল সংস্কৃত দিবারাত্র উচ্চারণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করি কিন্তু সেই জ্যোতিতে পথ দেখিয়া নিজে নিজের বুদ্ধিকে পরিচালিত না করি অর্থাৎ কার্য্য না করি তাহা হইলেও কোনরূপ ফল লাভ হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার বা আত্মার অথবা মনের যোগ স্থাপন করাই সর্ব্ব প্রধান যোগ এবং

যোগের সেরূপ যোগ হইলেই কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্ম বিনা যোগ হইতেই পারে না। খ্রীষ্টীয় নাম প্রেম। অনেক লোকে একবার খ্রীষ্টকে বলিল "শাস্ত্রে ত অনেক কথা আছে, তাহার মধ্যে প্রধান কথাটা কি ?" তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপরায়ণ হও, মনুষ্যের প্রতি প্রেমপরায়ণ হও।" তাহারা বলিল "এও ত দুই প্রকার হইল ; ইহার প্রধান কোন্‌টা ?" খ্রীষ্ট বলিলেন "ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপরায়ণ হও।" বাস্তবিক তাঁহার প্রতি প্রেম হইলেই—তাঁহার সহিত যোগ হইলেই—জগতের প্রতি প্রেম আপনা হইতেই উদ্ভূত হইবে এবং এই শেষোক্ত প্রেম জন্মিলেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও জন্মিবে ।

সুতরাং কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে এই শিক্ষা থাকিলে তাহাই নিঃসন্দেহে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে বারান্তরে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবীরেশ্বর সেন ।

গোপন না প্রকাশ !

—:০:—

লুকায়ে আর কি ফল আছে বুকের বেদন
মুখের ভাবে ?
মন্‌রাখা ওই ম্লান হাসিটুক্ মরমতলের
সায় কি পাবে ?
আধ্‌শুকানো ওষ্ঠ অধর,
অন্দরে ওই করছে সদর,
ইন্দ্রধনুর অন্তরালে বজ্র কি হায় মুখ লুকাবে ?

আঁখির আড়াল কাচের আগল
মনের ছবি যায় যে দেখা,
ঢাকৃতে যাওয়ার "নয় কিছু"তেই
আঁকতে তারে যায় যে শেখা।
গুপ্ত করে রাখতে গিয়ে,
যেভাব উঠে দীপ্ত হয়ে,
তারে কি হায় ঢাকতে পারে—
মলিন হাসির ক্ষুদ্র রেখা ?
ওই যে সখি ভিজল আঁখি,—
পরখ্ বেশী চাও কিছু আর ?
দর্পণে এই ফিরাও আঁখি,
প্রমাণ পাবে আমার কথার।
সিক্ত-উদাস নয়ন তুলি,'
ভাবছ কি আর আপন ভুলি,'
মন লুকিয়ে হাস্‌তে হ'লে
এই পরিণাম গোপন কথার !

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় ।

প্রাচীন ভারতে মদ্যপান *

স্মৃতিশাস্ত্রে সুরাপান দ্বিজগণের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কর্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর্যধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা অর্থাৎ জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধই সকল পাপের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত পাপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে; সুরাপানও ঠিক ব্রহ্মহত্যার মতই মহাপাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান অশীতি রতির অধিক (ব্রাহ্মণের ?) স্বর্ণচুরি এবং গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচার এই চারিটী "মহাপাপ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এবং উক্তরূপ পাপে পাপী মনুষ্যের সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অথবা বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনকারীকেও মহাপাপী বলিয়া ধরা হইয়াছে (১)। এই চারি মহাপাপের শাস্ত্র-সম্মত শাস্তি প্রাণদণ্ড ছিল এবং উক্ত দণ্ড (অথবা উহার অনুকল্প কঠোর দণ্ড) গ্রহণ না করিলে পাপীকে সমাজচ্যুত হইতে হইত।

* বিগত আষাঢ় সংখ্যা পরিচারিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত "মদ্যপান সম্পূর্ণ অবৈধ" শীর্ষক প্রতিবাদ-প্রবন্ধের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ, 'প্রতিভা'য় প্রকাশিত 'প্রাচীন ভারতে মদ্যপান' নামক মূল প্রস্তাবের লেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও প্রতিবাদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ আমাদিগকে প্রদান করিতে প্রস্তুত তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতীভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধে একাধিক বার লিখিয়াছেন যে "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান শীর্ষক প্রবন্ধটি যদি পরিচারিকায় 'প্রতিভা' হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রেরিত এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃত কট্মট্ শব্দের অর্থ লইয়া এত আলোচনা অনেকেরই রুচিকর নহে এবং বাদপ্রতিবাদ অনর্থক শুষ্ক কলহে পর্য্যবসিত হইতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল যে অতঃপর আমি এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি।" আমরা শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে ও অনর্থক শুষ্ক কলহে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিতে বাদপ্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশে নিরস্ত হইয়া

(১) মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায় : ৫৪ শ্লোক।

সুরাপান সম্বন্ধে স্মৃতি-শিরোমণি মনুসংহিতা বলিতেছেন,—"কোন দ্বিজ মোহবশতঃ সুরাপান করিলে তাহাকে অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সুরাপান করাইবে, এইরূপ উত্তপ্ত সুরা দ্বারা পাপীর দেহ পুড়িয়া গেলে তবে সে ঐ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। অথবা, (সুরার অভাবে) গোমূত্র, জল, দুগ্ধ ঘৃত অথবা গোবরের রস অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া যে পর্য্যন্ত পাপীর মৃত্যু না হয়, তাহাকে পান করাইবে। অথবা মাথায় জটা রাখিয়া, কম্বলমাত্র পরিধান করিয়া সুরাপানের পরিচায়ক চিহ্ন (পান পাত্র ইত্যাদি) সর্বদা সঙ্গে রাখিয়া, চাউলের খুদ অথবা তিলের খইল মাত্র ভোজন করিয়া একবৎসর কাল কাটাইবে। সুরা অন্নের মল, পাপকেই মল বলে; সেই হেতু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সুরাপান করিবে

প্রতিভায় প্রকাশিত মূল প্রস্তাব উদ্ধৃত করিলাম। আলোচনা মাত্রই কলহ নহে। সংস্কৃত শব্দের বিচার আমাদের ন্যায় লোকের নিকট নীরস হইলেও সাধারণ পাঠকের রুচিঅরুচির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সত্যের সন্ধানে তাহা সুধীজনের অবশ্য আলোচ্য। বিশেষতঃ যে স্থলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ উদ্দেশ্য, সেস্থানে প্রকৃত তথ্যটি নিরূপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণের জন্য তাহার বিস্তারিত আলোচনা না হইলে ব্যক্তিগত ভ্রমের জন্য সমগ্র সিদ্ধান্ত পণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে। সত্য উদ্ধার হউক, বাদ-প্রতিবাদ অনর্থক নহে—কলহ নহে—উদ্দেশ্যকে সার্থক করিবার একমাত্র উপায়।

ভারতীভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান" শীর্ষক প্রস্তাবটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের প্রয়াসে লিখিত, মদ্যপানের বৈধতা অথবা বর্ত্তমান সমাজে উক্ত পানপ্রথার পুনঃ প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনের জন্য লিখিত নহে। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের এ উক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রাচীন ভাষায় লিখিত তথ্যগুলিকে প্রাচীন ভাষা আলোচনায়, পণ্ডিতগণের সহিত ভাষার বিচার বিশ্লেষণে, তাঁহাদের উপদেশে পুষ্ট হইয়া প্রকৃত তথ্যের সন্ধান-প্রয়াসী হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। লেখক, মহিলা-সম্পাদিত পরিচারিকায় এরূপ আলোচনা প্রকাশিত হওয়া শোভন নহে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার এ উক্তির যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। তিনি যে লিখিয়াছেন,—"ডাক্তারী পত্রিকায় নরনারীর শরীরসংস্থান সম্বন্ধে প্রস্তাবই প্রকাশিত হয়, কিন্তু

না। গৌড়ী (গুড় হইতে) পৈষ্টী (চাউল অথবা পিঠা হইতে) এবং মাধ্বী (মধুক অথবা মৌআ ফুল বা ফল হইতে) এই তিন রকম সুরা আছে ;—উহারা সকলেই সমান, উৎকৃষ্ট দ্বিজগণের উহাদের মধ্যে কোনওটিই পান করা কর্ত্তব্য নহে। মদ্য, মাংস এবং সুরাসব (অথবা সুরা ও আসব) যক্ষ রাক্ষস ও পিসাচগণের খাদ্য ; দেবগণের প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত নহে। সুরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তি অপবিত্র স্থানে পড়িয়া যাইতে, (অযথা) বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারে, অথবা মদের মত্ততার ফলে অন্যান্য কুকার্য্য করিতে পারে। যাঁহার দেহগত ব্রহ্ম (বৈদিক জ্ঞান) একবার মদ্যের দ্বারা প্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।” (২)

সাধারণ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ্য নহে, তাঁহার সে উক্তির সার্থকতা স্বীকার করি, কিন্তু প্রাচীন তথ্য ডাক্তারীকথা নহে—সাহিত্য, তাহা পরিচারিকায় প্রকাশে বাধা কি ? সেরূপ প্রস্তাব পরিচারিকায় অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। সুলেখক লিখিবেন সংযত ভাষায়—ভদ্র-আচ্ছাদনে। যাহা পাঠ্য তাহা সমগ্র নরনারীরই পাঠ্য হওয়া উচিত। নর-সম্পাদিত সাহিত্য-পত্রিকায় এমন প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া উচিত নয় যাহা নারীর অপাঠ্য বা নারীসম্পাদিত পত্রিকার অনুপযুক্ত। প্রত্যেক পত্র পত্রিকাই পাঠক ও পাঠিকা উভয়ের জন্য। ‘প্রাচীনের’ আলোচনাও এরূপ ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত নহে যাহা প্রাচীন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য কুতূহলী পাঠক বা পাঠিকার নিকট ভাষার জন্য অপাঠ্য। জ্ঞান পিপাসা মনুষ্যের স্বাভাবিক, তাহা নর বা নারীতে সীমাবদ্ধ নহে। জ্ঞানদা একের উপাস্য, অন্যের নহে—ইহা কখনই হইতে পারে না। নর বা নারী বিষয়টা জানিবার অধিকারী হয় যদি সে শক্তি তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সাহিত্য মন্দিরে—নর নারীর অধিকারে, জ্ঞানার্জ্জনে ভেদাভেদ, বাধা নাই। তবে এমন যদি বিশেষ কিছু গুহ্য বা গুপ্ত বিষয় আলোচ্য হয় যাহা সাম্প্রদায়িক,—তদ্রূপ প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। প্রাচীন প্রসঙ্গ আলোচনা সে পর্য্যায় ভুক্ত নহে নিশ্চয়ই।

সঃ সঃ।

---

(২) মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায় ; ৯০—৯৭ শ্লোক।

মনুসংহিতার মতই অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ অনুসৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ “সুরা”র সম্বন্ধেই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায় এবং পরে “মদ্য” ও “সুরাসব” যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচদিগের যোগ্য এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। “সুরা” অর্থে পরিশ্রুত (Distilled Spirit—Brandy, Rum, Whisky Etc.) এবং “মদ্য” ও ‘ আসব” অর্থে কেবলমাত্র অভিষুত (অথচ পরিশ্রুত নহে Fermented *but not distilled*—or wine,—Sherry, Claret, Beer Etc) মদজনক পানীয় বলিয়াই বোধ হয়। বিষ্ণুস্মৃতি গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ “সুরা”ই দ্বিজাতির পক্ষে অপেয় বলিয়া পরে (১) মাধূক (মধু অথবা মৌআ ফুল বা ফল হইতে), (২) ঐক্ষব (ইক্ষু রস হইতে), (৩) টাঙ্ক (?) (৪) কৌল (বদরী বা কুলের রস হইতে), (৫) খর্জ্জুর (খেজুর রস হইতে), (৬) পানস (কাঁটাল ফলের রস হইতে), (৭) মৃদ্বীকা (আঙ্গুর রস হইতে), (৮) মাধ্বীক (মৌআ ফুল অথবা ফল হইতে প্রকারান্তরে উৎপাদিত), (৯) মৈরেয় (শীধু—জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরস হইতে) এবং (১০) নারিকেলজ (নারিকেল বৃক্ষের রস হইতে—দক্ষিণাপথে এখনও হইয়া থাকে) এই দশবিধ “মদ্য”ই ব্রাহ্মণের পক্ষে অপবিত্র (কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে স্পর্শ দোষাবহ নহে) বলিয়াছেন (৩)। ফলতঃ স্মৃতিশাস্ত্র “সুরা”পান দ্বিজমাত্রেরই পক্ষে মহাপাপ এবং মদ্যপান অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ পাপ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের এই

---

(৩) গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮১ ॥
মাধূকমৈক্ষবং টাঙ্কং কৌলং খর্জ্জুর-পানসে ;
মৃদ্বীকারসমাধ্বীকে মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৮২ ॥
অমেধ্যানি দশৈতানি মদ্যানি ব্রাহ্মণস্য চ।
রাজন্যশ্চৈব বৈশ্যশ্চ স্পৃষ্ট্বৈতানি ন দুষ্যতঃ ॥ ৮৩ ॥”

বিষ্ণুসংহিতা, ২২শ অধ্যায় ॥

ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ মানিয়া লইয়াছেন। তন্ত্র-শাস্ত্র তান্ত্রিক সাধকগণের সাধনার অঙ্গস্বরূপে যে মদ্য অথবা সুরাপানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রকার আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় নহে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিব না।

"মৃদ্বীকা" শব্দের অর্থ দ্রাক্ষা অথবা আঙ্গুর; দ্রাক্ষা রস হইতে মদ্য প্রস্তুতের প্রচলন যে প্রাচীন ভারতে ছিল, এই প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

মনুসংহিতার গৌরব এবং প্রাচীনত্ব সর্ববাদি সম্মত। মনুসংহিতার এই অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্বে আর্য্যসমাজে সুরা অথবা মদ্যপান যে পাপ অথবা পাতিত্যজনক বলিয়া ঘৃণিত ছিল না;—প্রত্যুত সভ্যসমাজে উহা প্রচলিত ছিল তাহাই বোধ হয়। বেদশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ, সুতরাং বৈদিক সোমযাগ এবং সৌত্রামণি যজ্ঞের কথা তুলিয়া আমাদের উক্তি সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব না; সে কার্য্যের ভার উপযুক্ত বৈদিক পণ্ডিতের উপরই ন্যস্ত রাখা উচিত। প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে এ সম্বন্ধে আমরা কতদূর জানিতে পারি, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়বিশেষের দেব দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পিত সুরা অথবা আসব প্রয়োগের উদাহরণ যে আমরা গ্রহণ করিব না, তাহা এইমাত্র বলিয়াছি। "ধার্ম্মিক-আচার" বলিয়া পরিচিত কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

মনুশাসিত আর্য্যসমাজে দ্বিজসাধারণের পক্ষে সুরাপান অতিশয় ঘৃণিত পাপ বলিয়া প্রচারিত হওয়ার পরেও সমাজ হইতে এই প্রথা উঠিয়া যায় নাই। সুরাপান সর্ব্বদেশের সভ্যাসভ্য সমাজেই সুপ্রাচীন কাল হইতে সুপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে; উহার মূলে মনুষ্যের সুখেচ্ছা অথবা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই। মনুসংহিতায়ও এই ভাবের প্রকাশক একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—"মাংস ভক্ষণে, মদ্যপানে মৈথুনে দোষ নাই; জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই তাহাদিগকে এতদ্বিষয়ে পরিচালিত করিয়া থাকে,—তবে উহাদের পরিত্যাগ নিশ্চয়ই মহাফল প্রদান করে" (৪)। সুরা

(৪) ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥ ৫৬॥ মনুসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়ে

অথবা মদ্যপান সাধারণতঃ সমাজে প্রচলিত না থাকিলে উক্ত শ্লোক শাস্ত্রমধ্যে স্থান পাইত না। আরও, মনু মহারাজ বেদাধ্যায়ী ছাত্রমণ্ডলীর জন্য মদ্যপান বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন দেখিয়া (৫) আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ গৃহস্থ লোকের মধ্যে মদ্যপান সুপ্রচলিত ছিল বলিয়াই, ছাত্রদিগকে, পাঠ্যাবস্থায় অন্যান্য ভোগ-বিলাসের উপকরণ সামগ্রী বর্জ্জনের উপদেশের সহিত মদ্যপান করিতেও নিষেধ করা হইয়াছে।

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্য যে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যের অতিশয় পুরাতন গ্রন্থ, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এই মহাকাব্যে সুরার উৎপত্তির বর্ণনা আছে। সমুদ্রমন্থনে সুরার উৎপত্তি হওয়ার পরে, দেবগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু দৈত্যগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। "সুরা"কে দেবগণ গ্রহণ করায় তাঁহাদের নাম "সুর" এবং দৈত্যেরা তাঁহাকে গ্রহণ না করায় তাঁহাদের নাম "অসুর" হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সুরা প্রথমে দেবগণের "অন্ন"ই ছিল, মনুকথিত "যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচের অন্ন" (৬) ছিল না। কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের রাজা ও রাণীরা যে অতিশয় মদ্যপান করিতেন, তাহা রামায়ণকার পুনঃ পুনঃ লিখিয়া গিয়াছেন (৭), রাক্ষস

(৫) বর্জ্জয়েন্ মধুমাংসং চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১৭৭ ॥ ঐ দ্বিতীয়াধ্যায়ে।
ইত্যাদি—ব্রহ্মচর্যাশ্রমীর কর্ত্তব্য বর্ণনায়—১৭৭—১৮০ শ্লোক।

(৬) যক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ ॥ ॥ ৯৫ ॥ ঐ একাদশ অধ্যায়।
রামায়ণ আদিকাণ্ডে সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গে—
"দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্ ॥ ৩৮ ॥
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ ॥" ৪৫ সর্গ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)।
(৭) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩৩ সর্গ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)।

রাজধানী সুসভ্যা লঙ্কাও সুরা স্রোতে প্লাবমানা ছিল বলিলেও চলে (৮)। রাক্ষস এবং বানরেরা আর্য্য-সমাজভুক্ত ছিল না বলিয়া মনে করিলে অবশ্য তাহাদের আচার ব্যবহার লইয়া আর্য্যাচার সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। কিন্তু রামায়ণ উত্তর কাণ্ডে রামচন্দ্রের অশোকবনে পান-গোষ্ঠীর বর্ণনা আছে। অযোধ্যা রাজধানীস্থিত অতি শোভাকর অশোকবনের বর্ণনার পরে কবি বলিতেছেন,—"কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সীতার হস্তধারণ করিয়া, ইন্দ্র শচীকে যেরূপ করেন, সেইরূপে তাঁহাকে স্বচ্ছ মৈরেয় মদ্য (শীধু—জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত) পান করাইলেন। কিংকরগণ রামের ব্যবহার জন্য সত্বর সুমিষ্ট মাংস এবং বিবিধ ফল আনিল। নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরোগণ কিন্নরীগণে পরিবৃত হইয়া রামের নিকট নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যগীতপটু উদার প্রকৃতি রূপবতী নারীগণ পান-বশীভূত হইয়া কাকুৎস্থের নিকট নৃত্য করিতে লাগিল। রময়িতৃগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সতত সুভূষিতা মনোঽভিরামা সেই সকল সুন্দরীগণের মনোরঞ্জন করিলেন" (৯)।

(৮) সুন্দরকাণ্ড, দশম, একাদশ সর্গ ইত্যাদি—(বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

(৯) সীতমাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥১৮॥
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ ॥১৯॥
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।
উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥২০॥
অপ্সরোগণসংঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশংগতাঃ ॥২১॥
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীত বিশারদাঃ।
মনোভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ ॥২২॥
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরম ভূষিতাঃ।—৫২ সর্গ। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড মহর্ষি বাল্মীকির রচনা নহে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তথাচ, উহা অল্পদিনের রচনা নহে। সীতা-নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত এই উত্তরকাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত বৃত্তান্ত নানা পৌরাণিক পুস্তকে এবং লৌকিক কাব্যাদিতে অনেক দিন হইতেই স্থান পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কবি কালিদাস কৃত "রঘুবংশ" কাব্যে ও কবি ভবভূতি রচিত "উত্তরচরিত" নাটকে উত্তরকাণ্ডের সীতানির্ব্বাসন বৃত্তান্তই গৃহীত হইয়াছে। যাহাহউক, রামায়ণে মদ্যপান সম্বন্ধে আমরা আর কোন সামাজিক প্রবাদ প্রাপ্ত হই নাই।

পৌরাণিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ-সমাজে সুরাপান এবং তৎপ্রতিষেধের এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। দেবাসুর যুদ্ধের সময় (দেবগণের অমৃত ভক্ষণ ও তজ্জন্য অমরত্ব লাভের পূর্ব্বে) যুদ্ধে মৃত অসুরদিগকে তাহাদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে বাঁচাইতেন, কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতির ঐরূপ বিদ্যা না থাকায় মৃত দেবগণ পুনরায় জীবন-লাভ করিতে পারিতেন না এবং তজ্জন্য দেবপক্ষের অত্যন্ত হানি ঘটিত। এই ত্রুটি পরিহারের উদ্দেশ্যে দেবগণ বৃহস্পতিপুত্র কচকে ঐ বিদ্যায় বিদ্বান্ হইবার জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ ঈর্ষ্যা বশতঃ কচকে মারিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভর্জিত করেন এবং গুরু শুক্রাচার্য্য সুরাপানে মোহিত হইলে তাঁহাকে ঐ মাংসখণ্ড অথবা চুর্ণ খাওয়াইয়া দেন। শুক্রাচার্য্য সুরার মোহে মোহিত হইয়া কচের মাংস খাওয়ায় বুঝিতে পারেন যে কোনও ব্রাহ্মণেরই সুরাপান করা উচিত নহে; এবং তিনি এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া দেন (১০)। তিনিই অভিসম্পাত দেন যে অতঃপর যে ব্রাহ্মণ

(১০) সুরাপানাদ্ বঞ্চনাং প্রাপ্য বিদ্বান্ সংজ্ঞানাশং চৈব মহাতিঘোরম্।
দৃষ্ট্বা কচং চাপি তথাভিরূপং পীতং তদা সুরয়া মোহিতেন ॥৬৫॥
স মন্যুরুত্থায় মহানুভাবস্তদোশনা বিপ্রহিতং চিকীর্ষুঃ।
সুরাপানং প্রতিসঞ্জাতমন্যুঃ কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ ॥৬৬॥
যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন মোহাৎসুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিঁল্লোকে গর্হিতঃ স্যাৎপরে চ ॥৬৭॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব, ৭৬ অধ্যায় (বোম্বাই সংস্করণ) এবং মৎস্যপুরাণ, ২৫ অধ্যায় (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)। অন্যান্য পুরাণেও এই আখ্যান আছে। মৎস্যপুরাণের আখ্যায়িকা ও মহাভারতের আখ্যায়িকা অবিকল একরূপ, একটি অপরের প্রতিলিপি বলিয়াই বোধ হয়।

সুরাপান করিবেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে এবং তিনি ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দিত হইবেন।

মহাভারতে নানাস্থানে মদ্যপানের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই উদাহরণ ব্রাহ্মণ সমাজের আচার হইতে নহে, পরন্তু ক্ষত্রিয় সমাজের,—বিশেষতঃ রাজা মহারাজের অন্তঃপুরের—আচার হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিপর্ব্বে, খণ্ডবদাহ পর্ব্বাধ্যায়ে বনবিহার রত কৃষ্ণার্জ্জুনের সহযাত্রী স্ত্রী পুরুষে মদ্যপান, বিরাটপর্ব্বে, রাজা বিরাটের মহিষী সুদেষ্ণার জন্য কীচকগৃহ হইতে সৈরিন্ধ্রীবেশিনী দ্রৌপদীর মদ্য আনয়ন, যুদ্ধের অগ্রে যুদ্ধার্থী বীরগণের মদ্যপান (বীরপান)—ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে (১১)। অপর পক্ষে, শান্তিপর্ব্বে, রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে ধার্ম্মিক লোকের উপদেশ বশতঃই হউক, প্রাণান্তিক বিপদেই হউক অথবা অজ্ঞানবশতঃই হউক, মদ্যপান করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুনরায় সংস্কার (উপনয়ন গ্রহণ) গ্রহণ করিতে হয় (১২)। মহাভারতের মৌষলপর্ব্বের বর্ণিত প্রভাসক্ষেত্রে যাদব বীরগণের মদ্যপান বশতঃ পরস্পর বিবাদে সকলেরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশ গ্রন্থে যাদবগণের পান-গোষ্ঠির অতিশয় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বলরাম যে অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন, তাহা মদ্যের একটী নামেই (হলিপ্রিয়া) প্রকাশ পায়। তাঁহার কাদম্বরী নামক মদ্যপানের বিষয় ত পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে (১৩); কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম তাঁহাদের মহিষীগণ, কুমারবৃন্দ ও অর্জ্জুনাদি সখাদের

(১১) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২২ অধ্যায়।
ঐ বিরাটপর্ব্ব, ১৫ অধ্যায়, ১৬ অধ্যায়, ৭২ অধ্যায়।
ঐ দ্রোণপর্ব্ব ১২৭ অধ্যায়, ইত্যাদি।

(১২) প্রাণাত্যয়ে তথা হজ্ঞানাদাচরন্ মদিরামপি।
আদেশিতোধর্ম্মপরৈঃ পুনঃ সংস্কারমহতি ॥২০॥ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪ অধ্যায়।

(১৩) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪১শ অধ্যায়।

সহিত নানাবিধ পানাহার গীতবাদ্য নৃত্যলীলা বিলাস-সমন্বিত পানগোষ্ঠীর আনন্দে কিরূপ নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহার অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে (১৪) স্থানাভাববশতঃ আমরা উহার সম্যক্ পরিচয় দিতে অথবা উদ্ধার করিতে অক্ষম, সুতরাং কৌতূহলী পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন স্বয়ং ঐ স্থলগুলি পড়িয়া দেখেন। শ্রদ্ধেয় ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণচরিত্র" পুস্তকে এই বিষয়ের আদৌ উল্লেখ করেন নাই। প্রাচীন ভারতের রাজন্য-সমাজে সম্ভ্রান্ত নরনারীর পানগোষ্ঠীতে এবং নৃত্যগোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া যে আদৌ নিন্দার বিষয় ছিল না, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যালোচনা হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাৎস্যায়ন প্রণীত "কাম সূত্র" এবং অন্যান্য নানাগ্রন্থে পানগোষ্ঠী ও নটগোষ্ঠীর সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৬৯ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ উত্তানপাদ রাজের পুত্র উত্তমরাজের (ধ্রুবের বৈমাত্রেয়) পানগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। দেবীমাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীদেবীর মধু-প্রিয়তার কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না। অন্যান্য পুরাণেও নানাস্থানে রাজা এবং রাণীর মদ্যপানের উৎসবের বর্ণনা আছে, তাহার উল্লেখও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

কালিদাস প্রণীত কাব্যাবলীতে রাজমহিষী হইতে সমুদয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মদ্য অথবা আসবপানের অভ্যাসের বার্ত্তা পাওয়া যায়। ঋতু সংহার, মেঘদূত, রঘুবংশ এবং কুমারসম্ভব

(১৪) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৮।৮৯ অধ্যায়। এই দুই অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের রাসলীলা বর্ণন অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণের পানাহার ও (এখানকার রুচি অনুসারে) নিতান্ত অশ্লীল ভাবের নৃত্যগীতাদি লীলা বিলাসের বর্ণনা আছে। সম্প্রতি মথুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতেরা উহাদিগকে গ্রীক শিল্পের Bacchante মূর্ত্তি এবং ঐগুলি শিথীয় যুগের শিল্প বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উহারা কি হিন্দুযুগের শিল্পের নিদর্শন হইতে পারে না?

কাব্যে নারীগণের এই পরিচয় সাধারণভাবে পাওয়া যায় (১৫)। তাঁহার রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সম্রাট অগ্নিমিত্রের রাণী ইরাবতীকে কবি মদযুক্তা

(অর্থাৎ নেশার বশীভূতা) অবস্থায়ই রঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার কথাবার্ত্তা, হাবভাব এবং ব্যবহার সমস্তই মত্তের ন্যায়; এমন কি মদের মত্ততার জন্য তিনি চলিতেও পারিতেছেন না। তিনি সখীকে বলিতেছেন,—'সখি, আমার পা ত আর চলিতে চাহিতেছে না; নেশায় আমাকে বিহ্বল করিতেছে' (১৬)। আমাদের মনে হয়, এই রাণী মদের অতিশয় বশবর্ত্তিনী বলিয়াই কবি তাঁহার নাম 'ইরাবতী' ('ইরা' শব্দে মদ্য) অর্থাৎ মদ্যময়ী করিয়াছেন। কবি ভবভূতির নাটকে কিন্তু মদ্যপানের এরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত চরকসংহিতায় সুরা মদ্য এবং আসবের বর্ণনা ও তাহাদের পরিমিত পানের বহু প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সূরি মল্লিনাথের মেঘদূতের টীকায় (উত্তরমেঘ, ৫ শ্লোক) 'মদিরার্ণব' নামক গ্রন্থের নামোল্লেখ এবং তাহা হইতে "রতিফল" নামক স্বচ্ছ ও শীতল আসববিশেষের উপাদানের বর্ণনাত্মক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে ঐ গ্রন্থে সহস্রাধিক বিভিন্ন প্রকার সুরা, মদ্য এবং আসব প্রস্তুতের উপায় কথিত আছে। সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় কিনা জানি না আমরা অন্বেষণ করিয়া উহার কোন সন্ধান পাই নাই। কবিরাজ মহাশয়দিগের আধুনিক সংগ্রহ পুস্তকেও শতাধিক প্রকার মদ্যের বর্ণনা আছে।

পৌরাণিক কচ-শুক্রাচার্য্য সংবাদে শুক্রকর্ত্তৃক সুরার প্রতি যে অভিসম্পাত প্রযুক্ত হইয়াছিল, উহাতে সুস্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণগণের জন্যই উহার উপযোগ নিষিদ্ধ হইয়াছিল দেখা যায়; পরন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের প্রতি উক্ত নিষেধ প্রযুক্ত হইবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগের তান্ত্রিক সাধকগণ শুক্রশাপ-মোচন এবং শ্রীকৃষ্ণশাপ-মোচন জন্য দুইটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সুরাশোধন করিয়া থাকেন। মহাভারতে এবং মৎস্যপুরাণ প্রমুখ মহাপুরাণে শুক্রশাপের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহার উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করিয়াছি; কিন্তু মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে যদুবংশধ্বংস প্রসঙ্গে

(১৫) (১) ঋতুসংহারে,—গ্রীষ্ম বর্ণনায় ৩য় শ্লোকে—"প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং মধু", শরদ্ বর্ণনায় ৩য় শ্লোকে "মন্দ প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য", হেমন্ত বর্ণনায় ১২শ শ্লোকে "পুষ্পাসবামোদি সুগন্ধি বক্ত্রা নিঃশ্বাসবাতৈঃ সুরভি কৃতাঙ্গঃ", শিশির বর্ণনায়, ৫ম শ্লোকে "মুখ সবামোদিত বক্ত্রপঙ্কজা.", ১৩ শ্লোকে 'সুগন্ধি নিঃশ্বাস বিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতি প্রবোধকম্। নিশাসু হৃষ্টাঃ সহকামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্॥", বসন্ত বর্ণনায় ১১শ, ১২শ, ৩১শ, ৩২, এবং ৩৪শ শ্লোকে মদ্যপানের উল্লেখ দেখা যায়। ৩০শ শ্লোকে "মত্তালিযুথবিরুতং নিশি শীধুপানং সর্ব্বং রসায়নমিদং কুসুমায়ুধস্য" আছে।

(২) রঘুবংশের সপ্তমসর্গে অজ মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহের পর বিদর্ভ নগরবাসিনী ভদ্রমহিলাগণের বধূ বর দর্শনার্থ ঔৎসুক্য বর্ণনায়, রাজমার্গের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদ সমূহের বাতায়নগুলি নারীমুখ সমাচ্ছন্ন হওয়ায় কবি বলিতেছেন "তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্। বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্॥১১॥

(৩) কুমারসম্ভবের সপ্তমসর্গে হরগৌরীর বিবাহের অগ্রে হিমালয়-নগরে (ওষধি প্রস্থে) নারীগণের বর দর্শনে কৌতুহল বর্ণনায় ঠিক ঐ শ্লোকটিই (৬২ তম শ্লোকে) প্রদত্ত হইয়াছে। ৪র্থ সর্গের শ্লোকে "অসংভিত্ত্বয়িবারুণীমদঃ ইত্যাদিতে মদের প্রচলন উক্ত হইয়াছে।

(৪) মেঘদূতে উত্তরমেঘের ৫ম, ১৩শ, ১৭শ এবং ৩৪শ শ্লোকে এই ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০শ শ্লোকের শেষে যক্ষের উদ্যানস্থ বকুলবৃক্ষকে তাঁহার পত্নীর মুখ-মদিরার অংশী স্বরূপ বর্ণনা আছে। সে কালে সুন্দরীগণ স্বামীর সহিত একত্র মদ্যপান করিতেন বলিয়া যক্ষ তাঁহার প্রিয়ার মুখস্পৃষ্ট মদিরার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু নারীগণের মধ্যে উদ্যানবৃক্ষের কুসুমোদগমের নিমিত্ত প্রচলিত সকল তুক্ তাকের মধ্যে বকুলের মদ্য-গণ্ডূষ সেক বিহিত ছিল বলিয়াই বকুল বৃক্ষকেও তাঁহার সেই সৌভাগ্যের অংশী বলিয়া সঙ্কেত করা হইয়াছে। ঐ তুক্ তাককে দোহদ বলিত যথা "স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গু-বিকসিত বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ পাদাঘাতাদশোক স্তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্। মন্দারোনর্ম্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাচ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরোনর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥"

(১৬) "ইরাবতী। হঞ্জে মে চলণা অপ্পণো ণ পবট্টন্তি। মদো মং বিঅরেদি।" (সখি, মম চরণাবগ্রতো ন প্রবর্ত্তেতম্। মদো মাং বিকারয়তি।)

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে কোনরূপ শাপের বিবরণ খুঁজিয়া না পাওয়ায় উহার সম্বন্ধে কোনই সংবাদ দিতে পারিলাম না।

রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের কাব্যাবলী পর্য্যন্ত আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে রাজান্তঃপুরে এবং বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত ধনি-পরিবারে বিলাসোপকরণ মধ্যে নানাবিধ সুরা, মদ্য অথবা আসবের প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ শুচিতার প্রভাবে সভ্যসমাজে, বিশেষতঃ মহিলা-মণ্ডলীতে মাংসাহারের সঙ্গে মদ্যপান রহিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; আমরা কিন্তু তাহার পোষকপ্রমাণ পাই নাই। তান্ত্রিক প্রভাবকে যাঁহারা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত মদ্যপানের ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা জানি না। রামায়ণে গঙ্গা এবং যমুনা পূজায় সুরা পূজোপকরণ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১৭)। তথাকথিত "প্রক্ষিপ্তবাদের" মস্তকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাহারা এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের পরিশ্রম হইতে বিরত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্র এবং দেশাচার উভয়েই ভদ্রসমাজে মদ্যপানের প্রতিকূল। সমাজের এই সাধু অবস্থার কারণ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গের নিকট সানুনয় অনুরোধ করিয়া আমরা অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

(১৭) অযোধ্যাকাণ্ডে, রামসীতার গঙ্গাপার হইবার সময় সীতা গঙ্গার নিকট মানত করিতেছেন,—

"সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রয়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা ॥৮৯॥৫২॥ সর্গ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)
পুনশ্চ যমুনার প্রতি,—"স্বস্তি দেবী তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্।
যক্ষ্যে ত্বাং গো সহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ ॥২০॥৫৫ সর্গ (ঐ সংস্করণ)

জন্মাষ্টমী।

—:০:—

ঘনঘোর মেঘজালে ঘেরিয়া আকাশ;
মত্ত বায়ু ফেলে যেন প্রলয়ের শ্বাস।
স্তব্ধ নিশি দ্বিপ্রহরে মৌন প্রিয়জন—
বিশ্রামিছে নিজ গেহে ব্রজবাসীগণ
দিবসের কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি
নিদ্রার মোহন স্পর্শে শান্তি মাঝে আনি।
মেদিনী কম্পিত করি হুঙ্কারে গভীর
বিকট জলদজাল কৃষ্ণাকাশ পারে
যেন কোন্ দানবের তীব্র অত্যাচারে
ক্ষেপিয়াছে সংহারিতে শক্র দেববীর।
কৃষ্ণ যমুনার বক্ষ ফেনিল উত্তাল
গর্জ্জে উঠে রুদ্র ঊর্ম্মি প্রচণ্ড ভয়াল,
বুঝি কোন মহাপাপে দেবতার রোষে
পড়িবে ধরণী আজ কক্ষ হ'তে খ'সে।
সৃষ্টি তার ধ্বংস মাঝে হইবে বিলীন;
বুঝি আজ যুগ-শেষী প্রলয়ের দিন।
আকাশের প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ছুটে যায়
বিকট গর্জ্জন মহা ভৈরব লীলায়।
হেনকালে বসুদেব যমুনার তীরে
আসিলেন সিক্ত গাত্রে কম্পিত শরীরে;
ক্রোড়ে এক সদ্যজাত ফুল্লশিশু ধরি;
দেহে তা'র কি মোহন রূপ মরি মরি!
যেন এক দীপ্তি ঘন—নবীন উজ্জ্বল
পড়িতেছে বিচ্ছুরিয়া নাশি তমদল—
ভাদরের কৃষ্ণপক্ষে বাদল রাতের
গগনের বক্ষ চেরা বিজলীর সম

কিবা তা'র বর্ণ শ্যাম সুমধুর কম !
পথিকের আলো প্রায় আঁধার পথের
দেখাইয়া পথ বুঝি আনিয়াছে সেই
বসুদেব গৃহ হ'তে নদী পুলিনেই।

** ** **

মথুরার অধিপতি কংশ ধ্বংস হেতু,
রচিবারে মর্ত্তমাঝে পুণ্যে গড়া সেতু
স্বরগে গমন তরে পাপ মানবের
ভগবান নামিলেন মর্ত্ত্যে; দানবের
অত্যাচার নিবারিতে দানবের সাজে
বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভ মাঝে
প্রস্তর বেষ্টিত দৃঢ় কংস-কারাগার
দ্বিপ্রহর রজনীতে; স্তব্ধ চারিধার !
সহসা দম্পতী যেন হারাইল জ্ঞান
ক্ষণতরে; বসুদেব ভূমিতে শয়ান
শুনিলেন কর্ণ মাঝে কেবা যেন বলে—
"শীঘ্র তব নবজাত পুত্র লও কোলে;
যাও চলি বৃন্দাবনে গোপ নন্দালয়ে
আইস রাখিয়া সেথা শিশু পুত্র তব;
আর সেথা আছে এক কন্যাজাত নব,—
"আন তারে রাত্রিমাঝে তোমার আলয়ে।"
নিদ্রাভঙ্গে বসুদেব সমুখে চাহিয়া,
ক্রীড়ারত ক্ষুদ্র শিশু মুখ নিরখিয়া
স্মরিলেন স্বপ্ন তাঁর; তখনই উঠিয়া
লইলেন শিশুপুত্র ক্রোড়েতে তুলিয়া
ত্বরা ক'রি বাহিরিয়া অন্ধকার পথে
চলিলেন নদীপথে তীব্র মনোরথে
করিবারে পূর্ণ ত্বরা; নাহি লক্ষ্য তাঁর
অজস্র প্রবাহে পড়ে বৃষ্টি ধারাধার।

চমকে চপলা আকাশের বক্ষ চিরি;
ক্ষণেকেও বসুদেব না চাহেন ফিরি।

** ** **

নদীতীরে পঁহুছিয়া হতবুদ্ধি প্রায়
ভাবিছেন কেমনে এ রুদ্র যমুনায়
উত্তরিয়া পরপারে যাইবেন তিনি;
নাহিত' পারের তরে থানেক তরণী।
দাঁড়াইয়া চারিধারে চাহি অনিমেষ;
সহসা সমুখে তা'র ক্ষুদ্র শিবা এক
থল থল শব্দ ক'রি গেল সন্তরিয়া
পরপারে; দেখি তাই পুলকিত হিয়া
বসুদেব নামিলেন যমুনার জলে
শিশু পুত্র বহু যত্নে ধরি নিজ কোলে।
শিশুর মস্তক হেরি আচ্ছাদনহীন
বিকট ফণিনী এক,—এবে হিংসাহীন—
বিস্তারিয়া ফণা তার মূর্ত্তিমান কাল
ধরিল শিশুর মাথে বিস্তৃত ভয়াল।
নিরাপদে অতি সুখে গেলা বসুদেব
যমুনার পরপারে সেই বৃন্দাবনে
গোপরাজ নন্দালয়ে খুঁজি সেইক্ষণে
রাখিবারে শিশুপুত্র; যেমতি সে দেব
স্বপ্নমাঝে করিয়াছে আদেশ তাঁহারে
ল'য়ে যেতে গোপকন্যা কংস কারাগারে।
দেখে গিয়া সেথা সবে নিদ্রা নিমগন;
ধীরে ধীরে বিনাশব্দে শিশুকে তখন
রাখিয়া নন্দের প্রিয়া যশোদার বুকে
কন্যা ল'য়ে বসুদেব পূর্ণ মহাসুখে
কম্পিত ত্বরিত পদে গৃহপানে ধায়!
বুঝিল না কা'রে ব্রজে রেখে এল হায়!

কাহারে বা নরকন্যা ভাবি মনে মনে
চলে পথে বসুদেব ত্বরা প্রাণপণে !
ভাদুড়া রচিল জন্ম ইষ্টদেবতার ।
চরণে শরণ চায়, কিবা আশা আর ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

ভরা ভাদরেও এবার ছিল না এবার একেবারে বৃষ্টি। শস্যের দশা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সপ্তাহাধিক কাল হইতে অবিরত বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। নদীতেও বান ডাকিয়াছে। রৌদ্র দগ্ধ ওষধিরাজি আবার শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। কৃষক উচ্চ ভূমিতে দিন রাত কর্ষণ ও রোপণে ব্যস্ত। ভাদ্রে এইরূপ চলিলে বারো আনা শস্যের আশা করা যায়। তরি-তরকারী এবারে অন্য বৎসর অপেক্ষা কিছু শস্তা। কিন্তু মৎস্য প্রভৃতি দুর্মূল্য। সহরের স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। মফঃস্বলে স্থানে স্থানে বসন্ত ও কলেরা দেখা দিয়াছে। গো মড়ক মফঃস্বলে লাগিয়াই আছে। ব্যাধির প্রকোপ নিবারণে সরকার হইতে বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। নানা কারণে কোচবিহারে গো-জাতির ক্রমশঃই অবনতি ব্যতীত উন্নতি নাই, তাহার উপর প্রতি সপ্তাহে গোরুর দালালগণ গবাদি অন্যত্র চালান দেওয়ায় তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। অভাবই ইহার মূলে হইলেও দালালগণের প্ররোচনাও গো বিক্রয়ের অন্যতম কারণ। সময়ে ইহার প্রতীকার না হইলে একদিন এজন্য হাহাকার উঠিবে তাহা বলাই বাহুল্য ।

** ** **

বৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্থানীয় চাউলের আমদানী বাজারে একেবারে হয় না। এ দেশের নিয়মানুযায়ী অধিবাসীগণ ধান্য হইতে দিনকার দিন চাউল প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন টাট্কা চাউল ব্যবহার করে, তাহারা ঘরে মজুত চাউল রাখে না। বর্ষণকালে রৌদ্রের অভাবে চাউল প্রস্তুত হইতে পারে না সুতরাং গৃহে ধান্য থাকিলেও বৃষ্টির দিনে চাউলের অভাব উপস্থিত হয়। এই সুযোগে বাজারের মহাজনেরা চাউলের দর মোটা হাতে বাড়াইয়া থাকে। যে চাউল বৃষ্টির পূর্ব্বে ছয় টাকা মণ ছিল, এখন তাহার মূল্য পৌনে সাত টাকা, ইহার প্রতীকারের কি উপায় নাই ?

** ** **

বঙ্গের অন্যতম দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার অধীশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বিগত ২৮শে শ্রাবণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর হইয়াছিল। মহারাজ নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন ও তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরায় বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুবরাজের বয়স ৬ বৎসর সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যেও কার্য্য সরাবরাহকারী মহামান্য রাজসভা দ্বারা বর্ত্তমান মহারাজের নাবালককালে সাধিত হইবে। কোচবিহারের রাজপরিবার ও অধিবাসীবর্গ ত্রিপুরার আকস্মিক বিপদপাতে ব্যথিত হইয়াছেন। মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থে কোচবিহারের আফিস আদালত কলেজ স্কুল প্রভৃতি এক দিবসের জন্য বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজের মুক্তাত্মার অশেষ কল্যাণের জন্য ও শোক সন্তপ্ত রাজপরিবারের শান্তির জন্য আমরা সর্ব্বনিয়ন্তার নিকটে প্রার্থনা করি।

** ** **

ত্রিপুরা আর একটী রত্ন হারাইয়াছেন। পরিচারিকাও এই সঙ্গে তাঁহার একজন সহৃদয় বন্ধু ও লেখক হইতে বঞ্চিত হইল। কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মণ বিগত ৩ শে জুলাই শেষ রাত্রে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সময়ের বহু তথ্য অবগত ছিলেন এবং তাৎকালিক অবস্থার একটা ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী ছিলেন,—ইহার ফলে তাঁহার সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থায় বর্ণনা করিয়া তিনি পরিচারিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার শক্তি ও সুবিবেচনার পরিচয় পাঠকপাঠিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের ন্যায় উৎসাহশীল ছিলেন, সাহিত্য সেবায় তাঁহার অতুল আনন্দ হইত। কিন্তু বৎসরাধিক কাল হইতে শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁহার মনন কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে ত্রিপুরার তৎকালের ইতিহাসের বহু তথ্য সঙ্কলিত হইত। জানি না তিনি এই জন্য কোন উপকরণের চুম্বক সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা, আমরা আশা করি তাহার সুযোগ্য বংশধর শ্রীমান সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ এ বিষয়ে পিতার দপ্তরে অনুসন্ধান করিবেন।

কর্ম্মী মহাপ্রস্থান করিলেন। পরম পিতার করুণাশ্রয়ে নিশ্চয় তিনি কর্ম্মান্তে সুখী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে লোকান্তরিতের সে সুখশান্তি স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ করি। ভগবান তাঁহাদিগকে শান্তি দান করুন।

* * * * * *

বিপদের অন্ত নাই। মৃত্যুর আঘাত কঠোরতর কুলীশাঘাত হইতেও কঠোরতর। নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে! আমাদের শ্রীশ্রীমহারাণী আজ সহোদরের শোক-জর্জ্জরিত। বরোদার মহারাজকুমার জয়সিংহ রাওয়ের মহাপ্রস্থান আকস্মিক! তিনি কিয়ৎকাল হইতে জার্ম্মেণীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি যখন জার্ম্মেণী হইতে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডম উদ্দেশে রেলওয়ে যোগে যাত্রা করেন, গাড়ী আমষ্টার্ডমে উপস্থিত হইলে দেখা গেল মহারাজ কুমারের দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! মহারাজকুমারের এরূপ মৃত্যুতে আত্মীয়স্বজন বিশেষ ভাবে ব্যথিত ও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিয়ন্তার কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। আমরা কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি মৃতাত্মার মঙ্গলবিধান করুন—শোককাতরগণের অন্তরের সান্ত্বনা দিন। মহারাজ কুমারের মহাপ্রস্থানে শোক প্রকাশার্থ কোচবিহারের আফিস, আদালত, কলেজ, স্কুল দুই দিনের জন্য বন্ধ ছিল।

● ● ● ● * *

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এবারে কয়েকটী ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ পত্রিকাস্থ করিতে পারিলাম না, আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচারিকা'র ১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বরলিপিতে, দুঃখের বিষয়, আমি একটু ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। স্বরলিপির পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারিকাদ্বয়ে যাহা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে এই রকম হওয়া উচিত ছিল :—

| র্রা মা –া –া জ্ঞা রা সা রা | –া –া । মা ধণা ধা –া ধা I
দো ষে ০ ০ অ কা র ণে ০ ০০ এ ০ এ ০ এ

২´ ৩´
I (–া –া মা ণা ধা –া –া ধা)} | –া ধা –া ণা –ধণা পধণর্সা –ণা ধা |
০ ০ 'ত বু সে ০ ০ তো' ০ এ ০ এ ০০ এ০০০ ০ এ

অর্থাৎ স্বরাক্ষরগুলি যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহাই ঠিক, কেবল পুনরুক্তি সম্বন্ধে এখন তালাঙ্কের সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইল। 'পরিচারিকা'র সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উল্লিখিত শুদ্ধ সারিকা দুইটি, যদি ইতঃপূর্ব্ব প্রকাশিত সারিকাদ্বয়ের পরিবর্ত্তে লিখিয়া রাখেন, তাহা হইলে গানটির স্বরলিপি সংরক্ষণের পক্ষে সাহায্য করা হয়।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } আশ্বিন, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

বিরাটপুরে।

—:০:—

চির নিষ্প্রভ-চন্দ্র-সূর্য্য তারা,
গ্রহ-ধূমকেতু আলোক পুচ্ছ হারা,
অস্ফুট ফুলের পৃথক একটা পাড়া
আছে তার বুক জুড়ে,
বিরাটের সেই পুরে।

(২)

উড়িতে না পারি ভ্রমর গুমরি মরে,
ডাকিতে না পারি পিকের নয়ন ঝরে,
চলিতে না পারি লুকায় সরম ভরে,
মণি দীপ গৃহ যুড়ে
বিরাটের সেই পুরে।

(৩)

সিংহ ব্যাঘ্র থাকে শৃগালের মত,
শাল তাল তরু মাথা করে রয় নত,
মণি মাণিক্য হয়ে রয় জ্যোতি হত,
আলোকণা নাহি স্ফুরে
বিরাটের সেই পুরে।

(৪)

ফকিরের বেশে বেড়ায় রাজার ছেলে
সিংহাসনের সংবাদ নাহি পেলে
বাসুকী সেখানে হয়ে থাকে যেন হেলে,
মরে যায় মাথা খুঁড়ে
বিরাটের সেই পুরে।

(৫)

ঝঙ্কার হেতা উঠে না বীণার তারে
পাখোয়াজী শুধু বৃথা হাত তার নাড়ে
গাঁথা মালা হায় ছিঁড়ে যায় বারে বারে,
শেষে ফেলে দেয় দূরে
বিরাটের এই পুরে।

(৬)

ভগবান হেতা কীট হয়ে কাটে শিলা
পার্থ ধনুকে পরাতে পারে না ছিলা,
এ সব হরির বিরাট পুরের লীলা
দেখে দুটী আঁখি ঝুরে
বিরাটের এই পুরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:*:—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রা, সময় রাত্রি,—দ্বিতীয় প্রহর তাজমহলের সম্মুখস্থ বনবীথি প্রান্তে মর্ম্মরগঠিত অবতরণিকার উপর ফরাকসিয়ার ও জুলেখা দণ্ডায়মান; সম্মুখে যমুনার শান্ত প্রবাহ।

সিয়ার। জুলি! ঐ যে মর্ম্মরস্বপ্ন তাজমহল। উন্নতশির মিনারগুলি ওর ঐ দেখো সুনীল আকাশকে চুম্বন করবার আশায় কত ঊর্দ্ধে উঠে গেছে। বসন্তের মদির নিশ্বাসে

আকুলিত যমুনার অশ্রান্ত তরঙ্গগুলি কেমন আবেশ ভরে নেচে নেচে নিদ্রিতা মমতাজ বিবির শ্রবণপথে সাজাহান বাদশার প্রেমগুঞ্জরণের প্রতিধ্বনি কলসঙ্গীতে গেয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। মানবহৃদয়ের অনন্ত বিরহ-বেদনার মৌন উচ্ছ্বাস আলোর উচ্ছল জোয়ারে আজ লাজহীন, মুখর। কেমন সুন্দর দেখেছ!

জুলেখা। সত্যি বড় সুন্দর। সিয়ার! তুমি ত সাজাহানের মত দিল্লীর বাদশা হয়েছ। তোমার প্রেয়সীর সমাধির উপর তুমি এ রকম একটা সৌধ গড়ে দিতে পারবে?

সিয়ার। তুমিই ত আমার প্রেয়সী, জুলি! ধরো আমি যেন পারলুম, কিন্তু তুমি কি এ রকম একটা সৌধের নীচে ঘুমিয়ে পড়বার জন্য আমায় ছেড়ে চলে যেতে পারবে?

জুলেখা। ইস্‌ কেন পারব না? তুমি সত্যি করে বলো আমি মরলে পর এ রকম একটা তাজমহল তুমি গড়বে?

সিয়ার। হাঁ, আমি সত্যি সত্যিই বলছি—আমি গড়ব।

জুলেখা। তোমায় বিশ্বাস?

সিয়ার। যদি বিশ্বাস না করতে হয় নাই বা করলে।

জুলেখা। তোমায় খুব বিশ্বাস করি,—সিয়ার। কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, ওরকম লক্ষটা তাজমহলের জন্যও নয়। এ সৌন্দর্য্যদীপ্তিতেও—তোমা ছাড়া আমার জগৎ আলোকিত হবে না—তুমি যে দেশে নেই—উঃ! সে কি আঁধারেরই দেশ হবে, ভাবতে পারছি না। আচ্ছা, সিয়ার! তুমি আমায় যেমন ভালবাস, সাজাহান বাদশা কি—তাজ বিবিকে তেমনি ভালবাসতেন?

সিয়ার। হাঁ জুলি! সম্রাট সাজাহান যথার্থ প্রেমিক ছিলেন। কত নিভৃত নিশিতে রাজপ্রাসাদের শূন্য বাতায়নে বসে জলভরা ছল ছল আঁখি দুটী তার ঐ সৌধের পানে চেয়ে চেয়ে নিশান্তের তারার মত বেদনায় মলিন হয়ে যেত; কত দীর্ঘশ্বাস তার যমুনায় কল্লোল তুলে প্রভাতের আকাশকে বেদনার অরুণ আভাসে রঞ্জিত করে' অপূর্ব্ব লাবণ্য বিলাসে ডুবিয়ে দিত। সে যে স্বপ্নের কথা, জুলি!

জুলেখা। তোমার কথা যে আজ ফুরুচ্ছে না, সিয়ার। আমি একটা গান গাইব।

সিয়ার। জীবনের অব্যক্ত কথাগুলি আভাসেই চিরকাল থেকে যায়—তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা বৃথা। অনন্ত প্রেম চিরবিরহীর বাণীতে ফুটি ফুটি করে—ফুট্‌তে ফুট্‌তে আধখানা সঙ্গীতের মত অন্তরার মাঝে থেমে পড়ে।

(অবতরণিকার একধারে একখানা সুন্দর ছোট নৌকা যমুনার "তীরাপহত লহরীর"—সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছিল—সিয়ার ও জুলেখা উভয়ে একই সঙ্গে তাহাতে উঠিয়া পড়িল।)

কি গান গাইবে, গাও না জুলি!

গান।

জুলেখা।

কালো জলে চলে নীল তরী
চুমু খেয়ে ঢেউ ছল করি যেতেছে সরি।
আলো নাচে আধ কল গানে
কি যে কথা কয় কানে কানে,
বাঁধি প্রিয়তমে বাহুডোরে—
বলে আরো শুনি হিয়া ভরে
তাই শুনিই বঁধু নিশিদিনি
রাখ সখা রাখ বুকে করি।

পটপরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর দরবার কক্ষ। সময় প্রভাত; সম্রাট ফরাকসিয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট চিনকালিচ খাঁ হোসেনআলী খাঁ ও আবদুল্লা খাঁ দণ্ডায়মান।

হোসেন। (হস্তে একখণ্ড কাগজ) সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে কোন কোন স্থানে একটু কঠোর হতে হয় খাঁ সাহেব!

চিনকালিচ। তা স্বীকার করি, হোসেন! কিন্তু যে ক্ষেত্রে যতটা দরকার ঠিক ততটা, তার বেশী নয়। যেখানে আজীবন কারাগারে বন্দী করে রাখলেই চলে, সেখানে বধ করবার আদেশ কেবল নৃশংসতার পরিচয় দেয়।

হোসেন। খাঁ সাহেবের বয়স হয়েছে কিনা তাই হৃদয়টা কোমল হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ অবধি একটী কাঁটাও মাথা উঁচু করে থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অবসর পেলে সে পায়ে ফুটে বসতে কসুর করবে না।

চিনকালিচ। হাঁ অবসর পেলে সে আকার করতে পারে বটে; কিন্তু সে অবসর আসবার সম্ভাবনা যদি জীবনে একেবারে লোপ হয়ে যায়, তবে—

হোসেন। অবসরকে না আসতে দেওয়া বড় কঠিন কাজ, কিন্তু কাঁটাটী তুলে ফেলা তত কঠিন নয়।

(সম্রাটের স্বাক্ষরের জন্য হোসেনকে আবদুল্লা ইঙ্গিত করিল)

(হোসেন নিকটবর্ত্তী হইয়া) সম্রাট স্বাক্ষর করুন।

সিয়ার। দিন (এই বলিয়া বামহস্তে কাগজখানা লইয়া স্বাক্ষর করিতে উদ্যত।)

চিনকালিচ। সম্রাট! স্বাক্ষর করবার পূর্ব্বে একবার ভেবে দেখুন, এর কি কোনও প্রয়োজন আছে, কি নেই।

আবদুল্লা বাধা দেবেন না, খাঁ সাহেব! এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

হোসেন। জাহাঁপনা স্বাক্ষর করুন।

সিয়ার। (স্বাক্ষর করিতে করিতে) পিতার মৃত্যুর জন্য এই প্রতিশোধ। এই নিন্।

(হোসেনের হস্তে প্রদান)

চিনকালিচ। হায়! জাহান্দার জাহানের খেলাও শেষ হয়ে গেল। সম্রাট বাহাদুর-শার পুত্রদের শেষে এই পরিণাম;—উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনটী পরস্পর সংঘর্ষে আকাশচ্যুত হয়ে আঁধারের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। হোসেন! মনে কিছু করো না। সত্যই হৃদয়টা আমার একটু কোমল; এত দিন একই সঙ্গে ছিলুম, তাদের কোন দোষ থাকলেও আজ আর সে কথা ভাবতে পারছি না। তাই গলাটা কেমন ধরে আসছে, চোখের জল পড়ো পড়ো।

হোসেন। না খাঁ সাহেব! এ স্বাভাবিক।

সিয়ার। আর কোনও কাজ আছে, সেনাপতি?

হোসেন। হাঁ জাহাপনা! মহারাজ অজিতসিংহ গত যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নি। রাজপুতজাতটা কিছু দিন হল দিল্লীর বাদশাদের বিপক্ষতাচরণ করে আসছে। এদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। হিন্দুদের উপর যে মুণ্ডকর আওরঙ্গজেব বাদশা স্থাপন করে যান বাহাদুর বাদশা তাকে রহিত করেন। এবার রাজপুতনার হিন্দুদের উপর এ কর পুনঃস্থাপিত হবে। কি বলো, আবদুল্লা?

আবদুল্লা। সে ঠিক কথা। তার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ অজিতসিংহকে এ আদেশ পাঠান হোক, কেন তিনি মিথ্যা স্তোক বাক্যে আমাদের আশা দিয়েছিলেন? তাকে নিজে এসে এর কারণ জানাতে হবে।

সিয়ার। বেশ তাই হোক,—কোন পরোয়াণায় স্বাক্ষর করতে হবে?

হোসেন। না খোদাবন্দ, এ পরোয়াণায় স্বাক্ষর আমিই করব। তারপর,—দাক্ষিণাত্যের শাসন ভার চিনকালিচ খাঁর উপর অর্পিত হোক। খাঁ সাহেব! এ আপনার কৃত উপকারের পুরস্কার।

সিয়ার। ভাল কথা, আজ হতে চিনকালিচ খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার।

চিনকালিচ। বন্দেগী খোদাবন্দ।

আবদুল্লা। খাঁ সাহেব মনে রাখবেন যেন নেমকহারামী না হয়।

সিয়ার। এখন তবে উঠি, সেনাপতি।

হোসেন। আপনার মরজী।

(সিয়ারের প্রস্থান।)

আবদুল্লা। বিলাসের অঙ্কে প্রতিপালিত যৌবন লীলায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত নবীন সম্রাটের পক্ষে রাজকার্য্য সম্পাদন একটুও সুখের নয়। আসি খাঁ সাহেব।

(অবদুল্লার প্রস্থান)

চিনকালিচ। হোসেন! ভুল করলে, সুপ্ত সিংহের গায় হস্তক্ষেপ করতে কখনো যেয়ো না। রাজপুত শক্তি এখন বড়ই প্রবল, মুহূর্ত্তে এই মোগল সাম্রাজ্যটাকে ধূলিতে পরিণত করবে। মারবার রাজ অজিতসিংহ বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞ ও প্রকাণ্ড যোদ্ধা, সমস্ত রাজপুত

জাতিকে সংহত করে' এমন একটা প্রবল ঝটিকার সৃষ্টি করবে যার আঘাতে সাম্রাজ্যের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়ে উঠ্‌বে। সে ধাক্কা সামলানো বড় সহজ হবে না, হোসেন।

হোসেন। খাঁ সাহেব! সাম্রাজ্যের তরী ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরে চালাবার উপযুক্ত নাবিক থাকলে—আর কোনই ভয়ের কারণ থাকে না। আপনি ভীত হচ্চেন কেন? মোগল-সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়েছে, এ বিশ্বাস দূর করবার জন্যই আমাদের কতকগুলি যুদ্ধের সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে। আমি তাই আজ বিরোধকে জাগাতে যাচ্ছি।

চিনকালিচ। জানি না, হোসেন! এর পরিণাম কি। তবে প্রার্থনা এই যে এ বিরোধের অগ্নিতে যেন মহাত্মা বাবরের সাম্রাজ্যটা পুড়ে ভস্ম হয়ে না যায়। গড়া জিনিষটা ভাঙ্গতে দেখ্‌লে বড়ই কষ্ট হয়, হোসেন! সূর্য্য যখন ডুবে যায় নিজের বুকের রক্তের উৎস ধারায়—সমস্ত আকাশটাকে আপ্লুত করে' সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক।

হোসেন। লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে খাঁ সাহেব। যদি এতে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংশই হয় তবু এ গৌরবটুকু অন্ততঃ আমরা দাবী করতে পারব যে নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখাকে উজ্জ্বল করে তুলতে আমরাই চেষ্টা করেছিলাম। সেলাম খাঁ সাহেব! হৃদয় দৃঢ় করুন।

(হোসেনের প্রস্থান)

চিনকালিচ। হোসেন, তুমি ভাঙ্গবে আর আমি গড়ব। কার কৃতীত্ব কত?

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর রাজ প্রাসাদ, বেগম মহলের অভ্যন্তরস্থ উদ্যান।
সময়—অপরাহ্ন উদ্যানস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট লয়লা
ফরাকসিয়ারের সঙ্গে দর্শন প্রতীক্ষায়।

লয়লা। আমি কেন আসলুম? যদি সিয়ার এসে জিজ্ঞাসা করে "লয়লা! তুমি কেন এসেছ?" তখন কি উত্তর দেবো? সে কি আগেকার মত প্রেমের বিভোল সুরে আর

আমায় লয়লা বলে ডাকবে? মিছে আশা! সংসার একটা বড় রকমের ধাঁধা; যতই ভাবি সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। এ সংসারে শতবার দেখার পরেও দুদিনের অসাক্ষাতে মানুষ তার এক সময়কার প্রাণের চেয়ে প্রিয়জনকে ভুলে যায় আবার কিনা কখনও চার চোখের চকিত মিলনে চিরজীবনের জন্য দুজনাই দুজনের হয়ে পড়ে—এ ধাঁধার উত্তর কে দেবে? (একটু থামিয়া) এত দেরী হচ্চে কেন? সে ত আসছে না! আজ দেখা পাবার আশার ভিখারী হয়ে এসেছি। এত উতলা হলে চলবে কেন? যেখানে না চাইতে একটা মহান বীর-হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমার হস্তে পারত তাকে নিরাশার চির আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে আজ শূন্য ঝুলি নিয়ে ভিক্ষায় নেমেছি।—ঐ যে আসছে, যদি ভুলে গিয়ে থাকে—কেন এসেছি প্রশ্ন করে? এ কি করলুম? ও কে ছুটে এসে লতার মত হাত দুখানি দিয়ে সিয়ারের কণ্ঠে বাহুর হার পড়িয়ে দিল।

(সিয়ার ও জুলেখার প্রবেশ)

জুলেখা। কি গো তুমি কি চাইছ?

সিয়ার। থামো জুলি, সব জায়গাতেই কি আর ছেলেমানুষী করতে হয়? কি লয়লা! কেন এসেছ? তুমি বোধ হয় খাঁ সাহেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছ?

লয়লা। হাঁ, শুনিছি সম্রাটেরই আদেশে দাদামশায় দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছেন। আমি তাঁরই সঙ্গে যাব কিন্তু কবে এখনও ঠিক হয় নেই।

জুলেখা। কি আমি ছেলে মানুষ! (একটু রাগতঃ স্বরে) দাঁড়াও আমি আসছি, তোমায় একটা শাস্তি দেবই দেব।

(জুলেখার প্রস্থান)

সিয়ার। দেখেছ লয়লা! দক্ষিণ বাতাসের মত চঞ্চল, পার্ব্বত্য নির্ঝরণীর মত কেমন দ্রুত আর প্রভাতের শিশিরের মত কেমন স্বচ্ছ। (জুলেখাকে দেখিতে পাইয়া) শোন জুলি!

(জুলেখার প্রবেশ)

জুলেখা। (ক্রোধের ভান করিয়া) সাবধান সিয়ার! তুমি দিল্লীর সম্রাজ্ঞীকে অপমান করেছ। শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।

সিয়ার। কি শাস্তি তুমি আমায় দেবে? অনেক বার তোমার কাছ থেকে ও শাস্তি আমি পেয়েছি কিন্তু সে ত কঠোর নয়, ফুলের মত কোমল।

জুলেখা। কি শাস্তি দেখ্‌তেই পাবে?

(জুলেখার প্রস্থান)

লয়লা। দিল্লীর সম্রাজ্ঞীর শাস্তি যত কোমল, দিল্লীর সম্রাটের বিচার ততোধিক নির্ম্মম, ততোধিক কঠোর—প্রাণ ভেঙ্গে দিয়ে যায়, হৃদয়ের কামনার ফুলগুলি উপেক্ষার দুরন্ত উত্তপ্ত নিশ্বসে শুষ্ক করে ফেলে। সিয়ার......না, ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো—সম্রাট্‌।

সিয়ার। লয়লা! ভুলে যাও ওসব কথা, সে শৈশবের খেলা। সত্য মিথ্যা কিছুই তাতে নেই।

লয়লা। হাঁ সম্রাট! সে শুধু খেলা! কিন্তু আমার হৃদয়ের ব্যাথাটা জ্বালিয়ে রাখা কি ভুলে যাওয়া সে একান্ত আমারি, তোমার উপদেশ না হলেও চলবে।

সিয়ার। সে খুবই সত্য—তুমি পুরাতন কথাগুলি ভুলেছিলে, তাই বলেছিলুম।

লয়লা। আমি তোমার কাছে প্রেমের অভিসারিকা হয়ে আসি নি—ভোলা কথার স্মৃতিটাকে জাগিয়ে তুলে হৃদয়ে আবার নুতন সুরের সৃষ্টি করতে আসি নি। যে, মন্দিরে প্রেমের দীপখানি জ্বেলে পূজা করতে বসে, চলে গিয়েছিল সে অসমাপ্ত পূজাও যেচে নিতে আসি নি। এত ভিখারী তুমি আমায় ভেবো না সম্রাট! প্রেমের উপযাচিকা আমি হব? স্বর্গের মত অক্ষয়, সাগরের মত অসীম, আকাশের মত গভীর জগতে অতুল প্রেম আমার দ্বার এসে হাত পেতে ফিরে গেছে—আমি কণিকার বিনিময়ে তাকে পেতে পারতাম—যাক্ সে কথা। সম্রাট! আমার একটা প্রার্থনা আছে।

সিয়ার। কি প্রার্থনা বলো। দেখি তোমার এ প্রার্থনাটা মঞ্জুর করতে পারি কি না।

লয়লা। জাহানকে মুক্ত করে দিতে হবে।

সিয়ার। জানানের মুক্তি? বেশ। কে আছ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। বন্দেগী জাঁহাপনা।

সিয়ার। সেনাপতি হোসেন আলি খাঁকে খবর পাঠাবে যে অবিলম্বে জাহানকে, যেন মুক্ত করে দেওয়া হয়।

প্রহরী। যো হুকুম খোদাবন্দ।

(প্রহরী প্রস্থানোদ্যত)

সিয়ার। প্রহরী দাঁড়াও। জাহানকে কেন বন্দী করবার আদেশ দিয়েছি? তাকে শুধু বন্দী করতে নয়, তার প্রাণদণ্ডের আদেশও হয়ে গেছে। ওঃ পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসার জন্য। লয়লা! আমি দুঃখিত তোমার এ প্রার্থনাটাও আমি পূর্ণ করতে পারলুম না। যাও প্রহরী—ও আদেশ প্রত্যাহার কল্লুম।

(জুলেখা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে প্রবেশ করিল ও তড়িৎ পদক্ষেপে সিয়ারের কণ্ঠে মাল্যদান করিল)

জুলেখা। কেমন শাস্তি দিয়েচি, হোল ত। (লয়লার দিকে চক্ষু পড়িতেই) তুমি যে কাঁদছ (লয়লার কাছে যাইয়া) বুঝিছি দুষ্ট সিয়ার তোমায় কাঁদিয়েছে। ঐ যে আমি ঢুকতেই তোমায় বলছিল "তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করতে পারলুম না। কি প্রার্থনা তোমার, আমায় বলো।

লয়লা। যদি সম্রাটের কাছেই মুখ ফুটে জানাতে পেরেছি তবে তোমায়ও জানাতে পারব। আমার প্রার্থনা জাহানকে মুক্ত করে দিতে হবে। সম্রাজ্ঞী!

জুলেখা। জাহান তোমার কে? (লয়লাকে নিরুত্তর দেখিয়া) তাকে তুমি ভালবাস বুঝি? সিয়ার! এ প্রার্থনা তোমাকে মঞ্জুর করতেই হবে।

সিয়ার! না, জুলি! এ বিষয় নিয়ে তুমি আর আমায় অনুরোধ করো না। এসো যাই।

জুলেখা। (লয়লার নিকট যাইয়া দুঃখিত স্বরে) পারলুম না, ক্ষমা করো—তোমার ভালবাসার জনকে মুক্ত করে দিতে পারলুম না।

(জুলেখা ও ফরাকসিয়ারের প্রস্থান)

লয়লা। স্বগতঃ—এত উপেক্ষা, এত অপমান!—সিয়ার ভেবেছে নারীর চিত্ত ফুলের মত কোমল, তার ঐ উপেক্ষার তাপে শুষ্ক হয়ে মুষড়ে যাবে। মনে রেখো—সুশীতল জলভরা

মেঘেও বিশ্বদাহনকারী বজ্র থাকে, কুসুমেও কণ্টক থাকে জাহানকে আমি মুক্ত করবই করব। তারপর দেখব কেন তোমার এত দর্প, এত নিষ্ঠুর তুমি !

(বেগে প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপ)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শরতের গান।

—:*:—

কে আজ ডাক দিয়েছে প্রাণের মাঝে
মন লাগে না ঘরের কাজে !

প্রাণ জুড়ান কাহার হাসি
দূর গগণে বাজায় বাঁশী
শ্বেত জলদের ফাঁকে ফাঁকে
নীল চাহনির সরম লাজে
ও সে ডাক দিয়েছে প্রাণের মাঝে !

কচি পাতার সবুজ সাড়া
মৌমাছির ঐ গুঞ্জরণে
রবির সোহাগ কিরণ তাপে
কাঁপ্‌ছে মরি বনে বনে।

বুকের মাঝে কোথায় কেন
ব্যথার মত লাগ্‌ছে যেন
যতন ঘেরা এ ফুল বনেও
পাষাণ হয়ে কঠিন বাজে !
ও সে ডাক দিয়েছে প্রাণের মাঝে !

পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষা সংস্কার।

(২) শ্রমিক দিগের শিক্ষা।

ভাবের পরিবর্ত্তন।—য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ জানা যায় যে, যখনই এখানে কোন প্রকার বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে,—সে বিপ্লব রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, অথবা অর্থ-নৈতিক যেরূপই হৌক না কেন,—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার পাঠাগারের একটী ছবিতে, যখন জার্ম্মেণ ফরাসীতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, তখন জেনার এই সমর ক্ষেত্রের অদূরেই হেগেল্ তাঁহার একটী কঠিন পুস্তকের রচনায় ব্যপৃত। এই ছবিটী আমাকে উপরের সত্যটী বিশেষ ভাবে মনে করাইয়া দেয়। ফ্রান্সের নিকট জার্ম্মেণীর এই অপমানের পরই এই যুগের ফিকৃটে ও হেগেলের চিন্তা ধারাই জার্ম্মেণীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন আকার প্রদান করে। ইহারই ফলে ফ্রান্স্ একবার জার্ম্মেণীর পদচুম্বন করিতে বাধ্য হয়, এবং ইহার ফলে গত য়ুরোপীয় মহা সমরে জার্ম্মেণী নিজের দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় দিয়াও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একরূপ সমবেত শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে। জার্ম্মেণীর যুদ্ধের পূর্ব্বের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও, এই যুদ্ধের ফলেই বর্ত্তমান সময়ে এই শিক্ষার প্রায় সকল স্তরই নূতন জীবন ও নূতন সংস্কার চেষ্টাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে।

আদ্য ও মধ্য শিক্ষার ছোট ছোট পরিবর্ত্তনগুলি আপাত দৃষ্টিতে অনেকটা বাহ্য পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যথার্থ ভাবে সেগুলিও যে জীবনকে পূর্ণতর ও বৃহত্তর করিবার নূতন প্রয়াস তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মেণীর শিক্ষার কোন স্তরেই জ্ঞানার্জ্জন ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশানুরাগ শিক্ষার একমাত্র আদর্শ নয়। পরিবার, গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্র,—প্রত্যেকেই যে এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, এবং প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাও যে এরূপ এক একটী ছোট খাট পরিপূর্ণ জগৎ,—এই সত্য মনে রাখিয়া শিক্ষাদ্বারা মানবীয় হৃদ্যতার এবং বিশ্ব মানবীয় প্রতিবেশিক ভাবের পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণই জার্ম্মেণীর সকল প্রকার শিক্ষার নূতন আদর্শ। পতিত জার্ম্মেণীর শ্রমিকদিগের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার আলোচনায় এই ভাবের পরিবর্ত্তন আরো বিশদ হইবে।

নূতন শিক্ষক।—সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে কেবল সামাজিক সাম্যবাদী প্রজাতান্ত্রিক দলের রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় নেতারাই যে শিক্ষায় এই নব ভাবের উদ্বোধন করিতেছেন,—এরূপ নয়। দেশের শিক্ষকগণ, কারখানার মালিকগণ, শিক্ষা উপনিবেশের কর্ম্মিগণ, স্থানীয় শাসনপরিচালকগণ, এবং বিশেষ ভাবে দেশ বিস্তৃত শ্রমিক-সংঘগুলি শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রচলনের দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছেন। পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিরূপে শিক্ষকদের স্বাধীনতা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই শিক্ষক, অধ্যাপক, ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম্মযাজকগণই অবসর সময়ে শ্রমিকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। দেশের লোকে এই ধর্ম্মযাজকদিগকে সম্প্রদায় হিসাবে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেও, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং প্রাচীন মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া দেশের নূতন সামাজিক রাষ্ট্রীক সাম্যবাদের উপাসকরূপে দেশের লোকের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারাই দেশব্যাপী সার্ব্বজনীন শিক্ষার সহায়। জার্ম্মেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায় সর্ব্বত্রই এখনও এই নূতন ভাব বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের মধ্যে যুদ্ধ প্রত্যাগত সামরিক কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। দুই একটী বিশ্ববিদ্যালয় এই জন্যই প্রাচীন সামরিক ভাবের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু এখানেও প্রাচীনের সহিত নবীনের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

নূতন ও পুরাতন অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ কেহ এখনই সর্ব্বান্তঃকরণে নবভাবের আচার্য্যের স্থান গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক লাভ হওয়াতেই এখানে শ্রমিকদিগের উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষার অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। শ্রমজীবীদের সহিত বুদ্ধিজীবীদের এই অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ জার্ম্মেণীর শ্রমিক আন্দোলনের (Labour Movement) একটী অন্যত্র-দুর্ল্লভ বিশেষত্ব।

বালকদের শিক্ষা।—যে শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া জার্ম্মেণীতে শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, সেই গ্রুণ্ডস্কুলেন্ বা আদ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা পূর্ব্বেই সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। দেশীয় সার্ব্বজনীন শিক্ষার একটী বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে শ্রমিকদের শিক্ষার নূতন ভাব ও নূতন প্রেরণা বিশেষভাবে বোধগম্য হইবে। ফ্রাঙ্কফুর্টের (Frankfurt) কএক মাইল দূরে হ্বেগ্সাইডের (Wegscheide) বন্য প্রদেশের মধ্যে যুদ্ধের সময় একটী সেনানিবাস স্থাপিত হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের অধিবাসীরা নিজেদের অর্থে এই সেনানিবাসটী ক্রয় করিয়া, ইহাকে একটী শিবির বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছে। এখানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীই নিজ নিজ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বৎসরে একমাস কাল অবস্থান করে। সকল ছাত্রছাত্রীকেই বেতন দিতে হয়; কিন্তু বেতনের হার খুব অল্প,—সমস্ত খরচের পঞ্চমাংশ। অবশিষ্ট খরচ চাঁদা ইত্যাদি নানা উপায়ে সংগৃহীত হয়। শিবিরনিবাসটীর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন প্রায় সমস্ত কর্ম্মই এই এক মাসের জন্য বালকবালিকারা নিজেরাই সম্পন্ন করে। শিবিরের বিভিন্ন কুটীরে তাহারা এক একটী পরিবারের ন্যায় বাস করে। বসবাস, সামাজিক অবস্থা, ও পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন প্রকার পার্থক্যই এখানে সংগৃহীত হয় না। কিন্তু এইরূপে সংঅবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিলেও, বালকবালিকারা এখানকার দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিয়া তোলার যথেষ্ট অবসর পায়। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই প্রত্যেক কুটীরের বাহিরের দেওয়ালে দরজার চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার রঙদার রঙ্গচিত্র আঁকিয়া, নানা ভাবের নীতি কথা লিখিয়া, এবং অন্য নানা উপায়ে নিজেদের কুটীর সুন্দরভাবে সজ্জিত করে। এই সাজ সজ্জা সম্বন্ধে প্রত্যেক কুটীরের এক একটী নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে। সমগ্র শিবিরনিবাস এবং ইহার

অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কুটীরের শাসন ব্যবস্থার ভারও অনেকটা ছাত্রছাত্রীদের উপর ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা বিষয়েও তাহারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পায়। কেতাবী শিক্ষা অপেক্ষা নানা প্রকার কর্ম্মের ভিতর দিয়া বস্তুগত ও ব্যক্তিগত শিক্ষার আদরই এখানে খুব বেশী; এবং দেশের প্রচলিত গান, প্রচলিত নৃত্য, এবং প্রচলিত নানা প্রকার সমবেত ক্রীড়াও ছাত্রছাত্রীর ভিতর বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে মুক্ত প্রকৃতির সাহচর্য্য। সামাজিকতা বর্দ্ধন, এবং স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনই এই শিবির বিদ্যালয়টীর শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু ফ্রাঙ্কফুর্ট নয়,—জার্ম্মেণীর নানা স্থানে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই জার্ম্মেণীর শ্রমিকদের উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ভিত্তি বলা যাইতে পারে।

কিশোরদিগের শিক্ষা। পাশ্চাত্যের সম্প্রসারিত বিদ্যালয়গুলি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকারান্তরে কিশোর বয়স্ক শ্রমিকদের শিক্ষাশালা। জার্ম্মেণীতে সকল স্থানেই এই সম্প্রসারিত বিদ্যালয়গুলির সহিত কলকারখানা ও পণ্য শিল্পশালার কর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। কারখানা ও শিল্পাগারে শ্রমিকেরা প্রতিদিন আট ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করে না। ইহাই দেশের নিয়ম। দেশীয় শ্রমিক সংঘগুলির চেষ্টায় শ্রমিকেরা সর্ব্বত্রই ক্রমাগত চার বৎসরের জন্য স্থানীয় সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন আট ঘণ্টার শিক্ষা লাভ করে। এরূপ শিক্ষার সময়েও তাহারা নিজ নিজ নির্দ্ধারিত বেতন হইতে বঞ্চিত হয় না। কারখানার মালিকের এই সম্প্রসারিত শিক্ষার কালেও শ্রমিকদিগকে বেতন দিতে বাধ্য হন।

জার্ম্মেণীর বিভিন্ন মিত্ররাজ্য ও স্থানীয় জনসমাজের সহিত কলকারখানা ও পণ্যশিল্পাগারের মালিকেরা এরূপ শিক্ষার আংশিক ব্যয় ভার বহন করেন। স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিও বার্ত্তিক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক স্থানে নানা প্রকার সম্প্রসারিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল শিক্ষাশালায় শ্রমিকেরা নিজ নিজ অবলম্বিত বৃত্তির তত্ত্বের দিকটী আলোচনা ও আয়ত্ত করে, এবং মালিকদিগকে নিজ নিজ কারখানায় এই সকল বৃত্তি ও শিল্প সম্বন্ধে শ্রমিকদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ব্যবহারিক শিক্ষা বিষয়েও স্থানীয় শ্রমিক সংঘ মালিকদের কর্ত্তব্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু পণ্য-শিল্প-উৎপাদন-বিষয়ক বৃত্তি

শিক্ষাই শ্রমিকদের শিক্ষার একমাত্র আদর্শ নয়। সৎসাহিত্যের অনুশীলন এবং পৌরজনিক ও প্রতিবেশীকভাবের উন্নত সাধনই জার্ম্মেণীর সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিশেষত্ব; বৃত্তি ও বার্ত্তিক শিক্ষায় কারু কর্ম্মের উপযোগী দক্ষতা এবং পৃথক পৃথক বৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষভাবে চর্চ্চিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বৃত্তি সম্বন্ধে শ্রমিকদের রুচি ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে,—সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহাতে তাহাদের শক্তি বর্দ্ধিত হয়,—তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ইহা হইতেই বেশ বুঝাইবে যে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক ও মানসিক উৎকর্ষ মূলক শিক্ষাই জার্ম্মেণীর সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষার নূতন আদর্শ।

বয়স্কদিগের শিক্ষা। সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হয় বলিয়া বিদ্যালয়গুলি উক্ত নামে অভিহিত হয়। এখানকার শিক্ষা সাধারণত বয়স্কদিগের শিক্ষা নয়। বয়স্ক শ্রমিকদিগের শিক্ষার জন্য জার্ম্মেণীতে নূতন একপ্রকার শিক্ষা-শালা স্থাপিত হইতেছে। বিদ্যালয়গুলির নাম ফোক্‌সোগুস্কুলেন (Volkohochschulen.) দেশের ছোট বড় নানা স্থানে এরূপ অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিচালন বিষয়ে ইহাদিগকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা হয় নাই। বিদ্যালয়গুলি সর্ব্বত্রই বেসরকারী চেষ্টার ফল। জার্ম্মেণীর বিভিন্ন মিত্র রাজ্য, স্থানীয় শাসন সংঘ, এবং নানা স্থানের শ্রমিক সংঘ দেশের সাধারণ লোকদিগের সহিত একযোগে বিদ্যালয়গুলির ব্যয় ভার বহন করেন। স্থল বিশেষে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিক সংঘ, স্থানীয় জন সমাজ ইত্যাদির সাহচর্য্যে অনেকটা স্বাধীন ও পৃথক ব্যবস্থা দ্বারা এরূপ শিক্ষার পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোথাও ত্রিশজন অথবা তাহারা কম থাকে; আবার কোথাও এই সংখ্যা একশতেরও অধিক হইতে দেখা যায়। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থাও নানা প্রকার। সময় সময় কোন কোন ফোক্‌সোক্‌স্কুলনে দুইটী বিভাগ থাকে;—প্রাবেশিক বিভাগে প্রাথমিক লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষাও প্রয়োজন হয়, এবং উচ্চতর বিভাগে এমন কি দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে সম্প্রদায় হিসাবে যাজকদিগের সম্বন্ধে জার্ম্মেণীর জন সাধারণের যে অনেকটা অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান তাহা পূর্ব্বেই

উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণেই বয়স্কদের শিক্ষাতেও ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। কিন্তু ইতিহাস, দর্শন, নীতিবিদ্যা ও ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়া বাইবেলের আলোচনায় কোন প্রকার আপত্তি থাকে না। ক্ষেত্র বিশেষে ক্রীড়া, ব্যায়াম, সঙ্গীত প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত বিষয়গুলিও উপেক্ষিত হয় না।

বয়স্ক শ্রমিকদিগের শিক্ষা অনেকটা অবসর সময়ের শিক্ষা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কলকারখানাও পণ্য শিল্পশালায় দৈনিক আট ঘণ্টার পরিশ্রমই দেশের নিয়ম। এই জন্য শ্রমিকদের শিক্ষার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্যও শিক্ষার আয়োজন হয়। ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্টের সর্ব্বপ্রধান বয়স্ক-বিদ্যালয়টী এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। এখানে ক্রমাগত এক বৎসরের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এবং যাঁহারা শ্রমিকদিগকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এখানে পাঠান, তাঁহারাই এই এক বৎসরের জন্য বিবাহিত শিক্ষার্থী শ্রমিকদিগের পারিবারিক ব্যয় ভার পর্য্যন্ত বহন করেন। থুরিঞ্জিয়া (Thuringia), স্লেস্‌হ্বিগ্‌ হোলষ্টাইন্‌ (Schleswig Holotein) ও হ্বুর্টেম্বের্গেও (Wartemberg) ছাত্র-শিক্ষকের বসবাস সম্বলিত বিদ্যালয়ে অনেকটা এইরূপ শিক্ষারই বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল স্থানে শিক্ষার কাল সাধারণতঃ দুই মাস, এবং বিষয়ও অনেক সংক্ষিপ্ত।

বয়স্ক শ্রমিকদের উন্নতির জন্য জার্ম্মেণীতে আরো নানা প্রকার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাট্যশালা স্থাপনের আন্দোলন (Little Theatre Movement), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান নির্ম্মাণে আন্দোলন (Little Garden Movement), এবং যুবকদিগের আন্দোলন (Youth Movement), এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। শিক্ষার উন্নতি এই আন্দোলনগুলির পরোক্ষ উদ্দেশ্য। সেই কারণে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। প্রথমটীর দ্বারা শ্রমিকেরা খুব অল্প ব্যয়ে নানা প্রকার অভিনয় দর্শন করে, দ্বিতীয়টীর দ্বারা তাহারা নগরের উন্মুক্ত উপান্ত-প্রদেশের ছোট ছোট উদ্যানে নাগরিক জীবনের গতানুগতিক, লালসাময় যান্ত্রিক আবহাওয়ার সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে কিছু কালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রকৃতির ফুল, ফল, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদির ভিতর সপরিবারে জীবন যাপন করে, এবং তৃতীয়টীর দ্বারা বালকবালিকাদের শিবির বিদ্যালয়ের অনুরূপ ব্যবস্থার

মধ্যে তাহারা মুক্ত প্রকৃতি সাহচর্য্যের সুযোগ পায়। এই সকল অনুষ্ঠানের ফলাফল চিন্তা করিয়া দেখিলে, জার্ম্মেণীর বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার যে জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক আধ্যাত্মিক ভাবের সংস্কার তাহা বোধ হয় সহজেই অনুমান হইবে।

বয়স্কদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একটী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং বীচক্রফ্‌ট (Beechcroft), লেচ্‌ ওয়ার্থ (Letch worth) ও কোক্‌হাউসের (Kock house) মত মাত্র কয়েকটী স্থানে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ এখানেও বয়স্ক বিদ্যালয় আন্দোলন (Adult school movement) নানা বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। বয়স্ক শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে (Extramural) নানা প্রকার শিক্ষার আয়োজন করিতেছে। আমেরিকাতেও এইরূপ নানা প্রকার শিক্ষার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু জার্ম্মেণীতে বয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য কোন প্রকার প্রকাশ্য আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরাজয়ের ফলে নিজেদের অভাব ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি অনেকটা অন্তর্ম্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক। জার্ম্মেণী ধীরভাবে অথচ নিঃশব্দে দেশের বয়স্ক শ্রমিকদিগের উচ্চতর শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিতেছে,—তাহা পতিত জার্ম্মেণ জাতির এই অভ্যন্তরীণ অভাব বোধ হইতেই উৎপন্ন। এই কারণেই বয়স্কদের শিক্ষার দেশব্যাপী অনুষ্ঠান অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনেকটা আধ্যাত্মিক; এবং সেই জন্যই অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ সুফল প্রদান করিতেছে। দেশবাসীর লৌকিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক এবং অন্তর্জ্জাগতিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষই ইহাদের মৌলিক শিক্ষাদর্শ, এবং এই কারণেই সমগ্র দেশটা একত্র হইয়া অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বয়স্ক শ্রমিকদের উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষাকালে তাহাদের সাংসারিক সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উন্নতিই এরূপ চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য নয়। তাহাদের এরূপ শিক্ষা জাতীয় সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের অনুকূল হইবে মনে করিয়াই, এই পতিত অবস্থাতেও জার্ম্মেণী এরূপ প্রভূত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এবং যাহারা শিক্ষা পাইতেছে তাহারাও যে এই জাতীয় আদর্শ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে,—এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। পুনরুক্তি দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাই আবার বলি,—জার্ম্মেণীর শিক্ষার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই জাতীয় আধ্যাত্ম ভাবের পরিবর্ত্তন। দুঃস্থ অবস্থায় দারিদ্র্যের মধ্যেও কেবল

এই ভাবের পরিবর্ত্তনই যে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে,—জার্ম্মেণীর বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার ইহার একটী অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

অন্ততঃ শিক্ষা সম্বন্ধে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের দেশেও কি এই ভাবের পরিবর্ত্তন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে না? *

শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়।

কবি নজরুল ইসলাম।

—:০:—

হে রুদ্র বিদ্রোহী কবি! ধুমকেতু রথের সারথি!
আজি তব ধন্য পূজারতি!
দীনহীনা দুখাতুরা হেরিয়া জননী
ব্যাকুলিয়া উঠেছিল তব বক্ষখানি,
তাই তুমি পায়ে দলি' শত অত্যাচার
নিবারিতে জননীর চিরদুঃখ ভার
লভি কারাগার
নীরবে সহিয়া কত, আছো তুমি জাগি'
নিপীড়িতা জননীর লাগি।

* Educational Ideals in Germany এবং Education in Germany—The Times Educational supplement—September 24, 1921.

হে কবি! যে সুর তুমি তুলি গেছ রুদ্র বীণা তারে
আজো তাহা বাজে বারে বারে
যে পথ দেখায়ে গেছ সব তুচ্ছ করি,
আজি সবে চলিয়াছে সেই পথ ধরি,
যে পতাকা বেঁধে গেছ মন্দিরের পরে—
আজো তাহা নির্ব্বিবাদে উড়ে বায়ু ভরে
উচ্চ নীলাম্বরে।
নহ তুমি বন্দী কবি! নহ পরাধীন
চিত্ত তব সতত স্বাধীন।

অন্ধকারে কারাগারে নিশিদিন হে কবি মহান!
দীপ্ত তব বিমথিত প্রাণ।
আপন অন্তরখানি করিয়া মন্থন
তুলিয়াছ কবিবর যে মহা রতন,
তাহারি পরশে আজি সবাকার প্রাণ
সোণা হয়ে গেছে শুধু—নহে ম্রিয়মান
আঁধার সমান।
হে পরশমণি তুমি—দেবের সাধনা—
জননীর আকুল কামনা।

ফিরিয়া আসিবে যবে—হেরি তব জননীর ছবি
মুগ্ধ হবে হে সমর কবি!
রক্তবাসে তনু ঢাকা—শুভ্র ভালে লিখা
উজ্জ্বল সিঁন্দুর বিন্দু জ্যোতির্ম্ময় টীকা,

আননে অমল দীপ্তি— মধুর হাসি
তোমারে বরিয়া লবে সগৌরবে আসি
কত ভালবাসি।
তোমারি শিখান গানে করিব বন্দনা—
গঙ্গাজলে গঙ্গারই অর্চ্চনা।

শ্রীরেণুকা দাসী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

রক্তাম্বরা।

—ঃ০ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধাঁধাঁ।

আমি আসনে প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা তরুণীর অপরূপ রূপশোভা দেখিতে লাগিলাম। তিনি আসমানীরং এর পাতলা বেনারসী পরিয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনের বেষ্টনের মধ্যে তাঁর মুখের লজ্জারঞ্জিত গোলাপী আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। খানিক পরে তরুণী রাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আমি হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের বিরক্ত কর্‌লাম। তোমার কাছে কেউ এসেছেন তা জান্‌তাম না।" রাণী হাসিয়া বলিলেন "কিছু গোপনীয় কথা হচ্ছে না ত ভাই। এই এদিকে এস, পরিচয় করিয়ে দিই।" তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আমার মামাত বোন ফুল্লরা সেন—আর ইনি ডাক্তার কর।" আমার স্ত্রী আমাকে নমস্কার করিয়া বসিলেন। তাঁর মুখে কি সে সুন্দর হাসির আভাস। তারপর বলিলেন "ডাক্তর কর আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমায় নিশ্চয় ক্ষমা কোরবেন।" আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলাম "নিশ্চয়ই।"

রাণীর মামাত বোন বলিয়া আমার সঙ্গে এই তরুণীটির পরিচয় করাইয়া দেওয়া, সত্ত্বও আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম যে ইনিই সেই মরণাহতা সুন্দরী এবং আট দিন আগে ইহাঁকেই আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। আমার নাম শুনিয়া তিনি ত একটুও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। সরল স্বাভাবিক ভাবে চাহিতে পারিলেন ত। তবে কি তিনি নিজের বিবাহের কথা জানেন না? আমি তাঁর চক্ষু দুটির দিকে ভাল করিয়া দেখিলাম সেই রাত্রে আমার স্ত্রীর বাম চক্ষুটি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল ইহার চক্ষে ত কিছু দোষ নাই। তিনি যখন রাণীর সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। যদি সত্যিই তাঁর নাম ফুল্লরা সেন তবে আদিত্যের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিবার কি দরকার ছিল? আমি ভাবিলাম সব কথা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তাঁর অসঙ্কোচ ব্যাবহারে বুঝিলাম তিনি আমায় যথার্থই চেনেন না, শেষে সন্দেহ হইল তিনি আমার স্ত্রী নহেন তাঁহারই মত দেখিতে আর কেহ।

তরুণী হাসিয়া বলিলেন "আজই আমরা ফিরে যাব দেশে, কিছু জিনিষ কেন্‌বার কথা ছিল এখান থেকে, নীরজা সে সব ভুলে গিয়ে গল্প কোর্‌ছ।"

"এরকম ভুল হওয়া ভাল।"

রাণী বলিলেন "ডাক্তার বাবু কি আমায় ঠাট্টা কোরছেন?"

আমি। আমি আমার রোগীদের সঙ্গে ঠাট্টা করি না।"

রাণী। বন্ধুদের সঙ্গে করেন না?"

আমি। বন্ধুদের কথা আলাদা। আমিই তাদের ঠাট্টার জিনিষ।

দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন, তারপর ফুল্লরা বলিলেন "ওঃ! এখানে কি গরমই পড়েছে! এখন দেশে যেতে পারলে বাঁচি।"

আমি। "কোথায় যাবেন? জমিদারী যেখানে?"

ফুল্লরা। হাঁ আমরা জমিদারীতেই যাব, তারপর রাঁচির কাছে রাজা যতীন্দ্রনাথের রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ আছে! আপনি তাঁকে জানেন?

আ। না, কতদিন থাকবেন সেখানে?

ফু। "পনের দিন। তাদের সঙ্গে আমাদের খুব আত্মীয়তা আছে।

রাণী। সত্যি যদি বাজার কোরতে হয় ত বড় দেরী হোয়ে গেল। চল তা হলে গাড়ী জুততে বল একবার ঘুরে আসি।"

আমি উঠিলাম। আমার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না তবুও উঠিতে হইল।

রাণী বলিলেন "ডাক্তার বাবু আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে কি বলুন ?"

আ। "প্রেসক্রপ্সন যা দিলাম ব্যবহার কোরবেন। ভাল হ'লে জানাবেন।"

ফুলরা বলিলেন "একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে হরনাথ দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

রাণী। কিন্তু আমি যে ডাক্তার করকে ডেকে প্রেসক্রপ্সন লেখাচ্ছিলাম সে কথাটা তাঁকে জানতে দেওয়া হবে না।

আ। মেয়েরা খুব কথা লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে।

ফু। ছেলেরাও পারে। তারা ভাবে কিছু লুকোন থাকলে জীবনে বুঝি রোমান্স হয়।

তাঁর কথার যেন বিশেষ কিছু অর্থ ছিল,—কিছু ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণের দর্পণ স্বরূপ সেই তাঁর স্বচ্ছ নীলাভ চোখদুটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মন থেকে বোল্‌ছেন ?"

ফু। কি জানি। হয় ত সবারি জীবনে কিছু কিছু লুকোবার প্রয়োজন আছে।

আমি "আবার দেখা হবে" বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। হায় আমার স্ত্রী আমায় চেনে না অথচ তাহাকে আমি রীতিমত রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ করিয়াছি। তাঁহার উপর দাবী করিব এমন কোন প্রমাণও আমার নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়াছি এসংবাদ আদিত্যরা এতক্ষণে অবিশ্যি পাইয়াছে। এখন সমূহ বিপদের আশঙ্কা। যেমন করিয়া পারি সে বাড়ীটি আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি বিনোদ আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বিনোদ বলিল "কোথায় উধাও হোয়েছিলে হে !"

"সমুদ্রে !"

"বল কি ! সমুদ্রে একেবারে ? কি রকম করে ?"

"উপরে চল বোলছি, বড় গোপনীয় কথা" তারপর উপরে গিয়া সব কথা বলিলাম। বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "এ রকম বিয়ে এই প্রথম, বিয়ে সত্যি হোয়েছিল ত ?"

"নয় ত কি ? রেজেষ্ট্রী করে আবার। তবু আমার স্ত্রী আমায় চিনতে পারলো না হে।"

"আদিত্য মহা তুখোড় লোক। চোখ ও'রকম হয়ে, রক্ষা হওয়া ত সহজ কথা নয়।"

"হাঁ বাঁ চোখের তারাটি বন্ধ হোয়ে গেছ্‌ল"

"আর আজ দেখ্‌লে দু চোখই ঠিক আছে ?"

"সম্পূর্ণ"

"কিন্তু ভাই ডাক্তারি মতে ত তা থাকতে পারে না কোন রকমে যদি তোমার স্ত্রী বেঁচেও যান তাঁর চোখ কখনো সারবে না।"

"তাইত আশ্চর্য্য। আমার যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তিনি আমার সামনেই মারা যান। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতাম কিন্তু তাঁরই সঙ্গে আজ কথা কয়ে এলাম।"

"আমি তোমায় এর খোঁজ কোরতে যথাসাধ্য সাহায্য কোরব। আমার মনে হয় এতে আরও কিছু বিশেষ রহস্য আছে নইলে আর আদিত্য অত টাকা শুধু বিয়ের জন্য দেয় ? আর রাণীকেও আমার সন্দেহ হয়।"

"আমারো হয় ভাই। তাঁর কথা থেকেই ত ধরা পড়ে।"

"হাঁ তা—তবে"—খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বিনোদ বলিল "হয়ত তোমায় ভালবেসে থাকতেও পারেন।"

"তা কি হয় ? আমি কখনো ওঁকে দেখিনি আগে।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল "তুমি যে কার্ত্তিক বিশেষ। আরও ত অনেকে তোমায় দেখে মজেছে আগে।"

"তুমি যে প্রশংসার ঢেউ লাগিয়েছ দেখ্‌ছি। তা যদি সত্যি হয় তবে যখন তিনি জানতে পারবেন যে আমি তাঁর বোনের স্বামী তাঁর ঘুমঘোর বড় নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙ্গবে যে।"

"এক কাজ কর। রাণীর সঙ্গে ভাব কর। তাহলে স্ত্রীর খোঁজখবর রাখ্‌তে পারবে অনায়াসে।"

"তা পারবো না বিনোদ। ফুল্লরাও আমার মত হয়ত কষ্ট পাচ্ছে।"

"এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। তুমি যে ফুল্লরাকে ভালবেসে ফেলেছ।"

"আমি ভালবেসেছি শুধু নয়। সে নইলে আমার চল্‌বে না।"

"আমি ভাবতাম তুমি কখনো বিয়েই কোরবে না। তোমার বিয়ে ত নয় রহস্যের গোলকধাঁধাঁ।"

মেজর।

পরদিন আবার আমার স্ত্রীকে দেখিবার জন্য প্রবল বাসনা হইল। আমি বরাবর বিনোদের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করিয়া রহস্যভেদের শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিলাম আমার স্ত্রীর গতিবিধির উপর নজর রাখা। আমার ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীর নিকট গিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলি কিন্তু বিনোদ আমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। সে বলিল "বরং তুমি যতীন্দ্রনাথের জমিদারীতে গিয়ে ওঁদের সব কাজকর্ম্মের উপর নজর রাখ। কিন্তু সাবধান কেহ তোমায় যেন না চিন্‌তে পারে। যদি সত্যি সত্যিই আসল কথা জানবার ইচ্ছা থাকে তা হ'লে খুব সাবধানে কাজ কোর্‌তে হ'বে।"

"আমি সত্যিই সব কথা বার কোরতে চাই যদি প্রাণান্তও হয় তবুও ফুল্লরাকে আমার পেতে হবে।"

"প্রমাণ না পেলে তাঁকে কি করে পাবে?"

"আদিত্যরা ত তাকে আবার মারবার চেষ্টা করতেও পারে।"

"তোমার তাকে রক্ষা ক'রবার চেষ্টা করা উচিত, তুমি গোপনে গোপনে আপনার কর্ত্তব্য কর।"

"ঠিক কথা। আমি তা'হ'লে যতীন্দ্রনাথের জমীদারীতে যাই।"

"হ্যাঁ দেখ, যদি এঁদের কিছু খবর পাও।"

"আমি ডিটেকটিভের কাজ অনেক সময়ে নিজে থেকে করেছি তারপর সন্ধান করতে পারলে পুলিসে খবর দিয়েছি। কাজেই এবারও কিছু জানতে পারবো আশা করি।"

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় বুকের পকেটে একটা আধপোড়া সিগারেট পাইলাম। ফুল্লরার সহিত যেদিন আমার বিবাহ হয় সেদিন এই জামাটিই পরিয়াছিলাম। আমি পোড়া সিগারেট কখনো পকেটে রাখি না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম এ একটু নূতন জিনিষ। এর ওপর গ্রীক ভাষায় নীল কালিতে কি লেখা ছিল। একটু পরেই মনে পড়িল এই সিগারেটটি মেজর দত্তর দেওয়া। আমি যখন ফুল্লরার চীৎকার শুনিয়া উপরে যাই তখন সেটি আমার হাতে ছিল। বোধ হয় আদিত্যের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় এটকে পকেটে ফেলিয়াছিলাম।

আমি সিগারেট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহাতে একরকম তীব্র বিষ মেশান ছিল। সেই বিষই লালার সঙ্গে শরীরের ভিতর গিয়া আমার ওরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছিল। মরি নাই এই যথেষ্ট।

বিনোদ ফিরিয়া আসিলে দুইজনে সে যে কি বিষ জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানারূপ পরীক্ষা করিলাম কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে না পারায় আমি অবশেষে সেটুকু যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। পরদিন আমি যতীন্দ্রনাথের জমিদারীর উদ্দেশে রওনা হইলাম। বিনোদ বাড়ীতেই রহিল। সে বার বার আমায় সাহায্য করিবার ইচ্ছা জানাইল।

আমি যতীন্দ্রনাথের জমীদারীতে এক হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। চা পান করিতে করিতে হোটেলওয়ালাকে রাজা যতীন্দ্রনাথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম তাঁর প্রাসাদ কাছেই।

আ। তাঁর বাড়ী কি বেশ বড়?

হো। হাঁ তা বই কি। তাঁর নায়েব গোমস্তা সবারি বাড়ী বড়।

আ। তাঁর নাম শুনেছি দেখিনি কখনো। কেমন লোক?"

হো। একটু মেজাজী ধরণের। লম্বা রোগা মাথার চুল সব পাকা। বড্ড বেশী খাজনা নেন। প্রজারা তাঁকে তত পছন্দ করে না।"

আ। তাঁর রাণীও এখানে থাকেন ত?

হো। দ্বিতীয় পক্ষের রাণী। তিনি শুনেছি সুন্দরী কিন্তু প্রথম পক্ষের ছেলের সঙ্গে নাকি বনে না।

আ। তাই নাকি? ছেলে আছে আগের পক্ষের? কত বড়?

এতক্ষণে আমার কৌতুহল বাড়িল।

হো। পঁচিশ বছরের ছেলে। খুব আমুদে। বেশীর ভাগ সহরে থাকেন। ব্যারিষ্টার। মাঝে মাঝে বাড়ী আসেন।

আ। মার সঙ্গে বনে না কেন?

হো। চাকররা ওদের ঝগড়ার মজার মজার গল্প বলে। কিছুদিন আগে রাণী রাজাকে বল্লেন যে সতীশকে তাড়িয়ে না দিলে তিনিই বাড়ী থেকে চলে যাবেন। রাজা ছেলেকে ত আর তাড়াতে পারেন না। চোটটা পড়্‌ল চাকর বাকরের উপর। সবাই ত কি হবে ভেবে অস্থির। শেষে সত্যি সত্যিই রাণী বাপের বাড়ী চলে গেলেন। এই দু'মাস হোল রাজা আবার ফিরিয়ে এসেছেন। এখন সব আবার মিটে গেছে।

আ। বাড়ীতে কি অনেক আগন্তুক অভ্যাগত আসেন?"

হো। হাঁ, রাজা সে বিষয়ে ভাল। বড় অতিথি পরায়ণ।

আ। তাঁদের নাম জান! আমার পরিচিত একজন আসেন। রাজা হরনাথ দত্ত।

হো। হাঁ, হাঁ। রাজা হরনাথ দত্তর রাণীর সঙ্গে আমাদের রাণীর খুব ভাব।

আ। আর একজন রাণী নীরজার বোন আসেন তাঁকে দেখেছ? ফুল্লরা সেন?

হো। নাম জানি না। দেখ্‌লে বল্‌তে পারি।

আ। দেখ্‌তে লম্বা ধরণের, খুব কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। খুব ফরসা আর খুব ভাল কাপড় চোপড় পরে থাকেন।

হো। হাঁ তাঁকে ত জানি। তিনিই ত সতীশবাবুর বাগ্দত্তা স্ত্রী।

আ। কি!

বিস্ময় ও দুঃখ যুগপৎ আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

হো। চাকররা বলে বিয়ে হলেই হয়। দুজনের খুব ভাব। অনেক দিন থেকে বাগ্দান হয়ে গেছে।

আ। আমি যাঁর বর্ণনা করলাম ঠিক তিনিই ত?

হো। আমি যাঁর কথা বোল্‌ছি তাঁর নাম বেলা।

তা হলে যে নামে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম সে সেই নামেই এখানে পরিচিত। বেলা আদিত্য! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি এখানেই থাকেন বেশীর ভাগ?"

হো। হাঁ বিশেষ যখন সতীশবাবু আসেন। অনেক সময়ে দুজনে বেড়াতে যান।

আ। হোটেলওয়ালার যাহাতে কোন সন্দেহ না হয় তাই বলিলাম "আমি যাঁর কথা বল্‌ছি তাঁর নাম বেলা নয়।

হো। চেহারায় অনেক মেলে কিন্তু।

আ। সতীশবাবুর বিয়ে কবে হবে?

হো। ঠিক নেই। কেউ বলে সৎমা হিংসেয় দিতে চায় না কেউ বলে রাজার পছন্দ নয়।

আ। তা হলে ওঁদের বিষয় খুব আলোচনা হয়?

হো। অনেকে অনেক রকম বলে কেউ কেউ বলে বেলা দেবীর বাবা নাকি জেলে গিয়েছিলেন।

আ। কে বলে?

হো। কি জানি গুজব ত এরকম।

আ। তাঁর বাবা কি কাজ করতেন?

হো। তাঁর বাবা সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন।

বেলা তবে ইচ্ছা করিয়াই আমার সঙ্গে অন্য নামে পরিচিত, কি উদ্দেশ্য তার? সে তবে সতীশকেই ভালবাসে। তাকে ভালবাসিলে সে এ বিয়ে অস্বীকার করিতে ত চাহিবেই। তবে তার বাপের নামে বদনাম থাকিলেও নাম বদলাইতে পারে বটে তবে এ বদনামের ভেতরও কিছু সত্যি আছে! হা ভগবান আমি যে কি করিব। আমি যে তাকে বিয়ে করেছি। তারপর বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া জমিদারের বাড়ীর ধারে পৌঁছিয়া বেশ ভাল করিয়া চারিদিক দেখিলাম। ভিতরটা দেখিবার ইচ্ছা হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া খিরকির দরজা দিয়া ঢুকিয়া সুর্কির রাস্তা ধরিয়া বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড আয়নার মত একটী পুকুর, বাড়ীখানিও প্রকাণ্ড, অনেক মহালে

বিভক্ত, দেখিতে ভারি সুন্দর। খানিক পরে বাড়ীর ভেতরকার ফুলবাগানে দশ বার জন লোককে দেখিতে পাইলাম। কয়েকজন তাস খেলিতেছিলেন, অন্যরা বসিয়া আছেন, ভৃত্য তাঁহাদের লেমনেড্ খাওয়াইতেছে। ঝোঁপের ভিতর দিয়া আগাইয়া গিয়া আমি লোক-গুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দূরে গেরুয়া রংএর রেশমের শাড়ী পরা একটি যুবতী উঠিয়া একজন সুবেশ যুবার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন। যুবা সিগারেট ধরাইয়া তাস খেলা দেখিতেছিলেন। আমি দূর হইতেও বুঝিলাম ওই যুবতীই আমার স্ত্রী। যুবক আমার স্ত্রীর পিছনে পিছনে উঠিয়া পড়িয়া একখানি চেয়ারে আমার স্ত্রীকে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। যুবকের আত্মহারা ভাব দেখিয়া বুঝিলাম তিনি বেলার রূপে একেবারে তন্ময়। এই বুঝি সতীশ! কিন্তু তখনি পিছনে শব্দ শুনিলাম। কেহ আসিতেছে বুঝি? আমি সাবধানে আত্মগোপন করিয়া যে আসিতেছে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। এক পুরুষের মূর্ত্তি। আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। এই ত সেই, যে আমায় মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই পোষাক সেই হাবভাব। মেঙ্গর এক দৃষ্টিতে আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিতেছিল, বুঝিলাম সে কোন অসদভিপ্রায়ে আসিয়াছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

ভক্তি মন্ত্র।

—ঃ০ঃ—

ঘন বন মাঝে দেবালয় এক,
এখনো সাহস করি',
আছে দাঁড়াইয়া পাষাণ দেবতা
পাষাণ বক্ষে ধরি'।

সৌম্য-মধুর গোপাল মুরতি,
যবন অস্ত্রাঘাতে
হারায়েছে আহা শ্রীঅঙ্গ রাগ
পূজা উৎসব সাথে।

নিয়মিত সেবা পূজা ও আরতি
পড়িয়া রয়েছে বাকী,
শুধু সন্ধ্যায় কেঁদে ওঠে হায়,
ব্যথিত হৃদয় শাখী।

নিঝুম দাঁড়ায়ে ঘন ঝাউ বন
আছে তার চারি ভিতে,
মৌন প্রকৃতি আনে গুরুভার
ভক্ত পথিক চিতে।

ক্ষত সে মুরতি শিখী চূড়া বাঁশী
নাহি আর কোন মান,
কতবার গিয়ে দেখেছি দেবতা
পাইনি দেখিতে প্রাণ!

একদা শুনিনু বৈষ্ণব এক
এসেছেন সেই বনে,
দেবত্বহীন দেবতায় পুনঃ
স্থাপিয়া সিংহাসনে,—
পূজেন নিয়ত ভকতির ভরে
সাজায়ে মনের মত,
জুটেছে আবার ভকতির টানে
ভক্ত সেবক কত!

শুনিয়া সে কথা গেলাম একাকী,
হেরিলাম পূজারীরে,
চুড়া-বাঁশী-মালা সেজেছে কেমন
দেখিছে ভক্ত ধীরে।
কখন হেলায়ে আরো বামদিকে
দেন শিখী চূড়াখানি,
ওষ্ঠ প্রান্তে ধরেন চাপিয়া
মোহন মুরলী আনি'।
মনের মতন হয় না সাজান
বিভোর ভক্ত সাধু,
এনেছে গো মরি নীরস কুসুমে
প্রেম কমলের মধু।
যা ছিল অভাব তাঁর সেই ভাব,
পূর্ণ করেছে আজি,
পাষাণে সত্য করেছে দেবতা
ভক্তের ভোজবাজী!
যে ঠাকুর সেথা ছিল এতদিন
প্রাণহীন মৃত-দেহ,
বিশ্বাস ভরে এতদিন হায়,
দেখে নাই যারে কেহ,—
তারে আজ শুধু ভক্তের হৃদি
করেছে জীবন দান,
ভক্তি মন্ত্রে পাষাণ জীয়ায়
এ কথা নহেক আন।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদূর অতীতে যখন বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় কন্দরে প্রবিষ্ট হয় নাই তখনও রাক্ষস-বিবাহ প্রথা ব্যতীত আধুনিক সভ্যজাতিপ্রবর্ত্তিত "কোর্টশিপ্" প্রথাও লিম্বু-গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও লিম্বুদিগের মধ্যে "কোর্টশিপ্" দ্বারা অনেক যুবকযুবতীর বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোর্টশিপে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, যুবকযুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ ও মিলামিশার ফলে যুবতী যদি দোহদ-সম্ভবিতা হয় যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া কন্যার পিতামাতা তাহাদিগকে যথেচ্ছা বিচরণ ও অবাধ দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। প্রণয়পাত্রীর প্রণয় লাভে সমর্থ হইলে, কৌশলে তাহার সঙ্গীত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত করিয়া যুবক তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। লিম্বু জাতির মধ্যে "কাশীলিম্বু" নামে একটি শাখাবিভাগ আছে, ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে একজন নাকি (বেনারস্) কাশী হইতে গঙ্গার স্রোত প্রবাহের বিপরীত দিকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয় পৃষ্ঠে অবস্থিত সুদূর লিম্বুয়ান প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। লুপ্ত অতীতের প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনার কোন উল্লেখ আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহার সহিত লিম্বুগণের অভিনব বিবাহ-পদ্ধতি ও সঙ্গীতানুরাগের কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়।

বেলা অধিক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া জাতিতত্ত্বের আলোচনা ত্যাগ করিয়া স্নানাহার সমাপনে ব্যাপৃত হইলাম। অশ্ব প্রস্তুত হইলে বেলা প্রায় বারটার সময় পুলবাজার ত্যাগ করিয়া ঝাপি যাত্রা করিলাম। হাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত ট্রাফিক্ অফিসের পার্শ্ব দিয়া চড়াই পথে উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিলাম, বামপার্শ্বে ক্ষুদ্র রঙ্গীন নদীর তটভূমি হইতে স্তরে স্তরে উর্দ্ধদিকে বিস্তর সবুজ ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া মৃদু মন্দ বাতাস ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল।

৫

নিম্নে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ, সম্মুখে সবুজ ধান্যক্ষেত্র ও চতুর্দ্দিকে মেঘমণ্ডিত সারি সারি পাহাড়—সকলগুলির অভিনব একত্র সমাবেশ দেখিয়া ডিঃ এলঃ রায়ের—

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কাল মেঘে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়, বাতাস কাহার দেশে।"

প্রভৃতি গানটি মনে পড়িতেছিল।

চা-কর অধিকৃত দেশে চায়ের পরিবর্ত্তে ধান্যের আবাদ দর্শন করিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জনৈক কৃষকের নিকট অনুসন্ধানের অবগত হইলাম যে নদীর অপর পার হইতেই চা-কর প্রভুদিগের রাজত্বের সীমানা শেষ হইয়া এপার হইতে রিলিং জমিদারের এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলে চা-কর প্রভুগণ তাঁহাদিগের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন নাই বলিয়াই আজও স্থানীয় কৃষকেরা ইচ্ছামত ধান্য, মাকই, মারুয়া, ও নানাবিধ শাক সব্জীর আবাদ করিয়া সুখে কাল কাটাইতেছে, নচেৎ তাহাদিগকেও দশ পয়সা দু আনা মজুরীতে সারাদিন চা বাগানে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইত।

ঝাপিতে রিলিং এষ্টেটের হেড কোয়াটার বলিয়া তথায় ম্যানেজার ও কতক[illegible] কর্ম্মচারী বাস করেন।

প্রায় সাত আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন বেলা প্রায় চারিটার সময় ঝাপি বাজার অতিক্রম করিয়া রিলিংএর কাছারী বাটীতে আসিয়া পহুঁছিলাম। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাহেবী পোষাক সজ্জিত যুবক জমিদার শ্রীযুক্ত ফফ্ সিং কাজী মহাশয় স্বয়ং আসিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। তাঁহার অমায়িক সুন্দর মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম, এবং সুন্দর আকৃতিখানির মত মধুর অন্তরখানি দেখিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম।

সত্বর চা ও জল খাবারের উদ্যোগ হইল, উভয়ে চা পান করিতে করিতে ইংরাজীতে গল্প আরম্ভ করিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদিগের জমিদারী সংক্রান্ত এক জটিল

মোকর্দ্দমার গল্প উত্থাপন করিলেন। রিলিং এষ্টেট তাঁহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু পরলোকগত জমিদারের বিধবা যুবতী পত্নী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করেন, এবং তিনিই এ জমিদারীর স্বত্ব ও উত্তরাধিকার জন্য এ সঙ্গীন মামলার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভূটিয়া ও সিকিমী লেপ্চাগণের সম্বন্ধে, হিন্দু বা মুসলমান আইনের মত বিধিবদ্ধ কোন আইন কানুনাদির অস্তিত্ব না থাকায় এ মোকর্দ্দমা লইয়া বিচারক মহাশয়দিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এক আদালতে জয় লাভ করিয়া ঊর্দ্ধতম আদালতে পরাজিত হইয়া, বহু অর্থব্যয় ও ক্ষতি সহ্য করিয়া উভয় পক্ষই বর্ত্তমানে মহামান্য প্রিভিকাউন্সলে বিচার-প্রার্থী হইয়াছেন এদিকে প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদারীর কোন প্রকৃত উত্তরাধিকার নাই এই অজুহাতে দার্জ্জিলিং খাসমহল বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট জমিদারী খাস করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় গেরুয়া বেশধারী এক স্থূলকায় বৃদ্ধ "নারাইন"* শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে একটি অতি ক্ষুদ্র হুকা হস্তে তথায় প্রবেশ করিলেন এবং কাজীসাহেবকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আসন ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ আসন পরিগ্রহ করিলে কাজীসাহেব তাঁহার সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া কহিলেন যে তিনি অবসর প্রাপ্ত একজন সুবেদার এবং সৈন্য বিভাগে কার্য্যকালে বহু দেশ পরিভ্রমণ দ্বারা বিভিন্ন দেশবাসী লোকজনের আচারব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সুবেদার সাহেব যদিও জাতিতে "রাই জমিদার" তথাপিও তিনি বাঙ্গালী সাধুর মত মস্তকে পাগড়ী, পরণে ধুতি ও গাত্রে লম্বা পাঞ্জাবি পরিধান করিয়াছেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক আলোচনা হইল এবং বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সহিতও তিনি অপরিচিত নহেন বুঝিতে পারিলাম।

গল্প করিতে করিতে মাঝে মাঝে হস্তস্থিত হুকাটিতে টান দিয়া ধূম উদ্গীরণ ও "নারাইন" "নারাইন" শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি নাতি ক্ষুদ্র ভুঁড়িটির উপর ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন।

* "নারাইন" অর্থাৎ নারায়ণ।

অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া তাঁহাকে রাইজাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা অন্তর্ভূক্ত ছিল। করিলাম। তদুত্তরে তিনি কহিলেন যে রাই জাতি পূর্ব্বে কিরাতজাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই কিরাতগণ মহাভারতাদি নানা প্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাসে কিরাতজাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই কিরাতগণ নানাবিধ দ্রব্যাদি আহরণ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে মৃগনাভি, কস্তুরী পশুচর্ম্ম, বনৌষধি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া পর্ব্বত-পাদমূলস্থ নিম্নদেশগুলিতে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত, এবং কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া নিরীহ সমতলদেশবাসীর ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিত; আবার কোন কোন সময় সীমান্ত দেশবর্ত্তী কোন সামন্ত রাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া অপরাপর নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইত। বর্ত্তমান কালে রাইগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও সাহসিকতা দর্শনে মনে স্বতঃই প্রতীতি জন্মে যে ইহারা সত্যসত্যই সেই অতীতের যে দুঃ- প্রকৃতি কিরাত দস্যুগণের বংশধর। এখনও দার্জ্জিলিংবাসিগণ রাইগণকে ভয়ানক চরিত্র বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য করে, ব্রিটিশ সুশাসনে বাস করিয়াও ইহারা কোন কারণে অল্প মাত্র উত্তেজিত হইলেই অপরাধীর অঙ্গে সামান্য কারণে ছুরিকাঘাত করিতে তিলমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। সাধারণতঃ—ইহাদিগকে কুলীগিরি ও ঘোড়ার সহিসের কার্য্য করিতে দেখা যায় কিন্তু কিছু কাল হইতে ইহারা অধিক সংখ্যায় পুলিশ ও পল্টনে ভর্ত্তি হইতেছে। রাই জাতি বহুকালাবধি লিম্বু জাতির সহিত একত্র অবস্থান হেতু উক্ত জাতির সহিত এরূপ ঘনিষ্টভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে উভয় জাতির হাবভাব ও আচারব্যবহারে কদাচিৎ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয়।

তবে বিবাহাদি ব্যাপারে রাইগণের মধ্যে এখনও গুর্খালিগণের মত বরপক্ষ হইতেই কন্যা পক্ষীয়ের নিকট উপঢৌকন* সহ বিবাহ প্রস্তাব প্রেরিত হয়। ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে ইহাদের বিশেষ কোন ধর্ম্মানুচরণে আসক্তি বা আগ্রহ লক্ষিত হয় না, তবে হিন্দু দেবদেবী যথা নারায়ণ, দেবী প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া মান্য করে।

পূর্ব্বে নাকি ইহাদের মধ্যে গোহত্যার প্রচলন ছিল কিন্তু ইহার প্রতিবিধানকল্পে একদা কোন গুর্খারাজ রাইগণকে বহুদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত করেন,

* স্রার মদ্য ও পক্ক শূকর মাংস।

এবং তদবধি উক্ত যুদ্ধের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইহারা গোহত্যায় বিরত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে এখনও গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন রহিয়াছে তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সুবেদার সাহেব তাঁহার ছোট্ট হুক্কাটিতে নূতন করিয়া তামাকু সজ্জিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, কাজী সাহেবেও শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলেন। রাত্রি ভোজের আয়োজনটি বিশেষভাবেই হইয়াছিল এবং অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী ছিল না সুতরাং সুদূর পল্লীদেশে প্রবাসে আসিয়াও নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সংযোগে রাত্রি ভোজ সমাধা করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন কাজী সাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয্য বশতঃ ঝাপিতেই মধ্যাহ্ন ভোজন ক্রিয়া সমাপণ করিয়া বেলা প্রায় বারটার সময় লোদমা যাত্রা করিলাম। কখন বা চড়াই পথে অশ্বারোহণে, কখন বা উৎরাই পথে পদব্রজে চলিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অথচ সুগভীর ঝরণা পার হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোদমার উপকণ্ঠে উপনীত হইলাম। লোদমা বাজারের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত ঝরণাটি (খোলা) দূর হইতে শুভ্র মেখলার ন্যায় দেখাইতেছিল। লোদমা বাজার অতিক্রম করিয়া পুলিশ পেট্রল হাউসে পহুঁছিয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিলাম।

লোদমা হইতে নেপাল ও সিকিম উভয় রাজ্যের সীমানা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, এ নিমিত্ত হাট বারে উক্ত দেশস্থ কৃষক ও গৃহস্থগণ যথেষ্ট পরিমাণে মাখন ও আলু লোদমা হাটে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, এবং সহর হইতে এ স্থান বহু দূরে অবস্থিত হওয়া নিবন্ধন ও পথ দুর্গম হওয়া বশতঃ লোদমাবাসী মাড়োয়ারী মহাজনগণই ঐ সকল দ্রব্যাদি স্বল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পরে দার্জ্জিলিং বাজারে অধিক মূল্যে চালান দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন।

রাত্রিতে বিশেষ শীত অনুভূত হইতেছিল, সুতরাং গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে ফালেলং বা ফলুট্ এ স্থান হইতে মাত্র আঠার মাইল দূরে অবস্থিত, সুতরাং এখানে শীতাধিক্য হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য জনক নহে। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া চা পানান্তে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

পাথেয়।

—:০:—

বড় নির্ম্মম এই ধরণী যে হায়
এ জীবন বড় সুকঠোর
হৃদয়ের মধু শুষে নিতে চায়
ছিঁড়ে দিতে চায় প্রেমডোর!

এ যে অচেনা প্রাণের খেলা-ঘর
তাই জানে না প্রাণের কত দর
চোখে চেখে চায় হেসে চলে যায়
খোঁজে না আপন কেবা পর!

ছি ছি এই ত ধরণী এই ত জীবন
এরি নাম এরা বলে সুখ!
কভু চোখে পড়ে যদি চেনা দুনয়ন
বুকে এসে ঠেকে জানা বুক;
ভাবি লুকায়ে রাখিব সে হৃদয়
যদি জীবনে জীবনে জেগে রয়
দুটি হৃদয়ের প্রদীপ আলোকে
ও জীবনে যদি দেখা হয়!

এই জীবন প্রদীপ নিভে গিয়ে আর
সে কি কভু ফিরে জ্বলে না?
দুটি হৃদয়ের পুরাণ সেতার
বিনিময় কথা বলে না?

এই সুখপ্রভাতের হাসি মুখে
এই বেদনা রাতের ভাঙ্গা বুক
প্রাণে প্রাণে এই জড়িত প্রেমের
ব্যথা-শঙ্কিত ভরা সুখ?

তবে এই কি সাজান পণ্যের হাটে
কড়ি দিলে প্রেম কেনা যায়?
সেকি লাগে না খেয়ার ও পারের ঘাটে
মরণের ঐ কিনারায়?
ওগো অচেনা আমার কে আপন
আহা চিরজীবনের পরিজন
প্রেমিকের প্রাণ বাঁচাও বাঁচাও
আশায় বাঁচাও এ জীবন!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রামায়ণের ধর্ম্ম।

—:*:—

ভিন্সেণ্ট স্মিথ রামায়ণের যে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা, লক্ষ্মণকে আদর্শ ভ্রাতা, সীতাকে আদর্শ স্ত্রী এবং হনুমানকে আদর্শ সেবক বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। নানা বিষয় রামায়ণ যে হিন্দুসমাজের কল্যাণই সাধন করিয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাংলায় রামচন্দ্রের উপাসক সংখ্যা তত অধিক না হইলেও উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রামচন্দ্রের উপাসক মণ্ডলী

অগণিত। হরেকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমেই বাঙ্গালী বেশ আত্মহারা হয়, রামচন্দ্রের নামে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই। কোন যাদুমন্ত্রবলে চৈতন্যদেব বাঙ্গালীকে কেমন করিয়া এই নূতন রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন তাহা ঐতিহাসিকগণ সুস্থির করিবেন। আমি এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র এই ভারতবিখ্যাত সর্ব্বজন-প্রশংসিত রামচন্দ্রের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিব। তবে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল যে বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য আলোড়ন পূর্ব্বক কোনও তথ্য বা অমৃত পাঠকপাঠিকা-গণকে উপহার দিবার ক্ষমতা আমার নাই। কারণ আমার সম্বল মাত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত বাল্মীকির রামায়ণ মাত্র। যদি মূল রামায়ণের সহিত এই গ্রন্থখানির অনৈক্য থাকে তবে সুধীমণ্ডলী যেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব ঈশ্বরসম্বন্ধে বা ধর্ম্মসম্বন্ধে রামচন্দ্র কি ধারণা পোষণ করিতেন; অর্থাৎ কবিগুরু, রামচন্দ্রের শ্রীমুখ দিয়া এবং তাহার কার্য্যকলাপ দ্বারা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষস বিনাশার্থে লইয়া যান। লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে চলেন। দশরথ অবশ্য রামচন্দ্রকে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার অনুমতির জন্য বশিষ্ঠ "সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ" এই কয়েকটি বিশেষণ দ্বারা রামচন্দ্রের পরিচয় রাজা দশরথ সকাশে প্রকাশ করেন। (বা ২১ স)। রামচন্দ্রের শিক্ষাসম্বন্ধে কবিগুরু পূর্ব্বেই কহিয়াছেন—"তিনি বেদবিদ মহাবীর, সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণ সম্পন্ন। তিনি তেজস্বী, সত্যপরাক্রম ও প্রিয়দর্শন। তিনি অশ্বরোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদে সুপটু এবং এবং পিতৃশুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগী (বা ১৮ স)। বিশ্বামিত্রের সহিত চলিতে চলিতে রাম ও লক্ষ্মণ যখন গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম স্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তাঁহারা দুই জনেই মহর্ষির নির্দ্দেশ মত তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিলেন (বা ২৪ স)। বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা প্রদান করিবার পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সরযূর জল লইয়া আচমন

করিয়া পবিত্র হইতে আদেশ করেন। রামচন্দ্র সহাস্যমুখে সে আদেশ পালন করিয়া ঐ বিদ্যা দুইটি গ্রহণ করিলেন (বা ২২ স)। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় এই সময়ে নদী-পূজা প্রচলিত ছিল এবং নদীর জলে স্নান কিম্বা আচমন করিলে মানুষ পবিত্র হইতে পারে এ ধারণ ও তখনকার লোকের ছিল।

নদী-পূজা বা river cult

এই নদীপূজা বা River cult এ নও ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে গঙ্গা যেমন পুণ্যতোয়া রুশিয়া ইজিপ্টে তেমনই ভল্গা ও নীল নদ ঐ দুই দেশের নরনারীর নিকট পুণ্যতোয়া। [গঙ্গা = ভঙ্গা = ভল্গা। ইহা সত্য হইলে, ভল্গা-তীরবাসী লোকই ভারতবর্ষে আসিয়া গঙ্গাকে তাহাদের দেশের নদীর নামে নামকরণ করিয়া স্বদেশে স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল ইহাই কি অনুমান করিতে হইবে? ঐতিহাসিকগণ কি বলেন?]

অতঃপর বালকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র তাড়কাকে বধ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং রাজধর্ম্ম সম্বন্ধেও উপদেশ দিতেছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন—"স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ, চাতুর্ব্বর্ণের হিতের নিমিত্ত রাজকুমারের ইহা কর্ত্তব্যই হইতেছে। যিনি লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাহাকে কি নৃশংস, কি অনৃশংস, কি পাপকর, কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি অধর্ম্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ইন্দ্র পৃথিবী বিনাশ-সঙ্কল্পকারিণী বিরোচন-সুতা মন্থরাকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণু ইন্দ্রের নিধনকামনাকারিণী শুক্র-জননী পতিপরায়ণা ভৃগুপত্নীকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও স্ত্রীহত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্দ্দেশে ঐ পিশাচীকে সংহার কর।" সুতরাং দেখা যাইতেছে বিশ্বামিত্র (১) রাজধর্ম্মানুশাসন (২) গুরুর নিদেশ এবং (৩) বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ব্যবহার এই তিন প্রকার যুক্তি দ্বারা রামকে স্ত্রীবধে লিপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই নারী কিন্তু অবলা নারী নয়, বরং ভয়ানক সবলা—যাকে বলে পুরুষের বাবা। ইহার উপর ইনি আবার অধর্ম্মশীলা

রাজধর্ম্ম

স্ত্রীহত্যা ঘৃণার্হ

যজ্ঞবিঘ্নকারিণী নরঘাতিকা। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তখনকার দিনে স্ত্রীহত্যা সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। রামচন্দ্র অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন এবং বিশ্বামিত্রের সহিত আসিবার সময় দশরথ বলিয়া দিয়াছিলেন—"বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে।" সেই জন্য বিশ্বামিত্রের নির্দেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন—"পিতার নির্দ্দেশ ও পিতার বাক্য গৌরব এই দুই কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব, কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো ব্রাহ্মণের হিত ও দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বধ করিব।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে পিতৃ আজ্ঞা ছিল বলিয়াই রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কথা শুনিলেন। দেশ ও গো-ব্রাহ্মণের হিতের কথা সর্ব্বশেষে যে রামচন্দ্র জুড়িয়া দিলেন তাহা শুধু বিশ্বামিত্রের অতবড় বক্তৃতার মানরক্ষা করিবার জন্য। বিশ্বামিত্র কথিত রাজধর্ম্ম এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ব্যবহার যে রামচন্দ্র সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন তাহা বোধ হইতেছে না। নতুবা তিনি যে তাড়কাবধে প্রবৃত্ত হইবার দুইটি কারণের উল্লেখ করিলেন তন্মধ্যে নিশ্চয়ই ঐ সকলের উল্লেখ থাকিত। স্ত্রীবধ যদি সমাজে ঘৃণার্হ পাপকর অযশস্কর ও নৃশংস বলিয়া বিবেচিত না হইত তবে এই কারণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইত না।

এইখানে বিশ্বামিত্রের রাজ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। রাজাকে যদি প্রজার হিতের নিমিত্ত পাপকর অযশস্কর ও নৃশংস কার্য্য করিতে হয় তবে সে রাজধর্ম্মকে পৈশাচপন্থী বলিতে হইবে। পাপ ও নৃশংসতার উপর যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত তাহাকে শান্তি না বলিয়া পৈশাচিক তৃপ্তি বলাই সঙ্গত। বিশ্বামিত্রের রাজধর্ম্মের সহিত চাণক্য রাজনীতি ও কৈশোর রাজনীতি তুলনীয়। এই তিনটিই একই ছাঁচে ঢালা। এই তিনটির মতে ভালমন্দ পাপপুণ্য সকলই দেশের জন্য রাজার পক্ষে করণীয়। এ রাজধর্ম্মকে অনেকেই বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে করেন।

সুতরাং দেখা গেল রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞার জন্যই বিশ্বামিত্রের নির্দেশানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র কথিত রাজধর্ম্ম পালনের জন্য নয়। বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে

পিতৃআজ্ঞা ও গুরুভক্তি

বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যাগ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। রামচন্দ্রকে এই শিষ্যত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন নির্বিঘ্ন যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন—"বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম, তুমি গুরুবাক্য যথার্থতই প্রতিপালন করিলে।" আমরা জানি পিতার আজ্ঞাতেই রামচন্দ্র রাক্ষস বধ করিয়া যজ্ঞরক্ষা করার জন্য বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আসেন, গুরু বিশ্বামিত্রের বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য নয়। আর গুরুত্ব ত পথে আসিতে আসিতে পাইয়াছেন। সুতরাং "গুরুবাক্য" এই কথা বলিবার কেবলমাত্র তাঁহার গুরুত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। কার্য্যও তাহাই হইল। "শর্ব্বরী প্রভাত হইতে না হইতেই রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন "ভগবন! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে! এই বাক্যের 'কিঙ্কর' হইতেই যে মনে করিতে হইবে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কিঙ্করত্ব স্বীকার করিলেন এবং তখনকার দিনে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে ছিল তাহা নয়। "আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে" এই বাক্যেরই উদার, মধুর বা ভদ্র (Polite) সংস্করণ হইতেছে রামচন্দ্র যাহা বলিলেন সেই বাক্যটি! ঐ কিঙ্কর শব্দ শিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্রাহ্মণ পূজনীয়

তবে ব্রাহ্মণগণ যে তখন পূজনীয় ছিলেন তাহা আমরা এই কাণ্ডেই পাই। ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াও রামচন্দ্র পরশুরামকে কহিলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ।" ব্রাহ্মণগণের জন্য যদি সমাজে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে রামচন্দ্র এই ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যবহার করিতেন না।

ব্রাহ্মণে দান

বিবাহের সময় এবং শ্রাদ্ধবাসরেও ব্রাহ্মণগণ এখনকার মত নানা প্রকার দান ও সমাদর পাইতেন।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

আর ব্রাহ্মণ হওয়া যে কতখানি আয়াসসাধ্য তাহা আমরা বিশ্বামিত্রের জীবনেই দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে যে ব্রাহ্মণ সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন তাহারও অনেক প্রমাণ রামায়ণে আছে।

তবে আমরা একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না। দশরথের মত এত বড় রাজা কেমন করিয়া তাঁহার অত স্নেহের রাম লক্ষ্মণকে সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে না দিয়া এক রকম নিঃসম্বল অবস্থায় অতবড় রাক্ষসবাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন—তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। রাজপুত্রের পক্ষে অতবড় শত্রুর বিরুদ্ধে পদব্রজে যাত্রা করাও গৌরবজনক নয়। বিশেষতঃ রামের বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। তখনকার দিনে বিবাহের পূর্ব্বে সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত এবং শিক্ষার জন্য মুনি ঋষিগণের আশ্রমে যাইয়া কয়েক বৎসর থাকিতে হইত। রামচন্দ্র জন্মাবধি বাড়ীতে থাকিয়াই ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিলেন। তাঁহাকে কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য এবং তাঁহাকে যজ্ঞাদির সহিত পরিচিত করিবার জন্য

ব্রহ্মচর্য্য

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে একরকম একাকী প্রেরণ করিবার কারণ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র শাস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মত গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্তি করা যে গৌরবজনক ও কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি নিজে আসিয়া বলিতেছেন—"মহাবীর রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজ প্রভাবে * * * যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোকবিখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইঁহার সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইঁহার নিমিত্ত ভীত হইবেন না। * * * অতএব এক্ষণে ইঁহাকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করেন।"

পুত্রবৎসল দশরথের অবস্থা বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শ্রবণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল।

কুলগুরু

তিনি কিছুতেই রামচন্দ্রকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইতেছিলেন না। কিন্তু কুলগুরু বশিষ্ঠ অনেকগুলি ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রের নাম করিয়া কহিলেন—"ঐ সকল অস্ত্রের আবার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ, মহাবীর্য্য, দীপ্তশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জ্ঞাত আছেন। ইনি অপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ইঁহার কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষির প্রভাব এই রূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইঁহার সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে কিছুই

সঙ্কোচ করিবেন না।" (বা. ২১ স)। বশিষ্ঠের কথা শুনিয়াই দশরথ রামলক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রাণীর সহিত মঙ্গলাচরণ করিয়া এবং রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীত

অস্ত্র শিক্ষা

মনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় নয় যে শস্ত্র শিক্ষার জন্যই রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রেরিত হইল। এই অনুমান গ্রহণ করিলে পূর্ব্বলিখিত বিশ্বামিত্র কথিত "গুরুবাক," এবং রামচন্দ্র কথিত "কিঙ্কর" শব্দ সহজ বোধ হয়, এবং উহাদের মধ্য হইতে dramatic ভাব তিরোহিত হয়। সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ সর্গে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হয়। এই দুই সর্গে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনেকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছেন। ঐ সকলের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রও রহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিবেন রামায়ণের সময়ে বন্দুকের মত কোন অস্ত্র প্রচলিত ছিল।

অস্ত্রশস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইবার আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সত্যরক্ষা

সত্যরক্ষা বা বাক্যানুযায়ী কার্য্য করা যে ধর্ম্মের অন্তর্গত তাহা রামায়ণে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দশরথ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন—"এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। ** ** ** আমি অবশ্যই আপনার নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব (১৮ স)। রাজা দশরথ রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইয়া এই সত্যরক্ষা করিয়া ছিলেন। এই সত্যরক্ষার জন্য পরে রামচন্দ্রকে বনে যাইতে হইয়াছিল এবং বালীকে অন্যায় পূর্ব্বক সংহার করিতে হইয়াছিল।

বৈরিশুদ্ধি

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম

বৈরশুদ্ধি বা প্রতিশোধ লওয়া যে তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল তাহা ষট্‌সপ্ততিতম সর্গে দেখিতে পাই। রাজা দশরথ সসৈন্যে পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের সহিত মিথিলা হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথে ক্ষত্রিয় কুলান্তক জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুর সংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন—"তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমার এই পৈত্রিক শরাসন গ্রহণ কর ও ইহাতে শর সংযোগ কর।" এই কথার উত্তরে রামচন্দ্র কহিলেন—"আপনি

পিতার বৈরিশুদ্ধির উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার সমুচিতই হইয়াছে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আপনি যে আমাকে দুর্ব্বল অক্ষম বোধ করিয়া অবমাননা করিতেছেন ইহা কোন মতেই আমি সহিতে পারি না।” সুতরাং দেখিলাম পিতৃবৈরী ও নিজবৈরীকে বিনাশকরা বা নির্য্যাতন করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অন্তর্গত এবং এখনকার দিনে coward বা ভীরু বলিলে মানুষের রক্ত যেমন গরম হইয়া উঠে এবং ন্যায়তঃ (morally) অবজ্ঞাকারীকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে তেমনই তখনকার দিনে ঐরূপ অবজ্ঞাকারীকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে তেমনই তখনকার দিনে ঐরূপ অবজ্ঞাকারীকে শাস্তি দেওয়া ক্ষাত্রধর্ম্মান্তর্গত ছিল।

পিতৃশুশ্রূষা ও আরধনা করা তখনকার দিনে ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও কর্ত্তব্য ছিল। এখনকার দিনেও ভারতবর্ষে পিতামাতার সেবাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু করিগুরু বাল্মীকি বালকাণ্ডে পিতৃশুশ্রূষা ও পিতার আরাধনার কথাই বলিয়াছেন, মাতৃশুশ্রূষা বা মাতার আরাধনার কথা বালকাণ্ডে বলেন নাই। মাতৃগণকে অন্যান্য গুরুজনের সহিত একসঙ্গে

পিতামতার সেবা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বালকাণ্ডের ৭৭ সর্গে দেখিতে পাই—“রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ** ** পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।” “রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পৌরকার্য্য সমুদয় পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে পুরবাসীদিগের প্রিয় ও হিতকর সকল বিষয়ই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।” বোধ হয় তখনকার দিনে পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক পূজনীয় ও আরধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার দিনে যদিও সকলে মাতাকে পিতা অপেক্ষা অনেক অধিক গুণে পূজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু কার্য্যতঃ অধিকাংশ সন্তানই মাতা অপেক্ষা পিতাকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত বাক্য হইতে আরও দেখিতে পাই যে নিজকে সুখী করা এবং অন্যান্য সকলের সুখ ও হিতসাধন করা তখনকার দিনেও মানব জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

সার্ব্বজনীন সুখ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে তখনকার দিনে প্রীতির বন্ধন ছিল এবং পরস্পরের ভাব বিনিময় এবং অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়ায় তখনকার দিনের দাম্পত্য জীবনও অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। বালকাণ্ডের সর্ব্ব শেষ সর্গে আমরা দেখিতে পাই “রাম তাঁহার (সীতার) প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জনকীর স্পষ্টই

মধুর দাম্পত্য জীবন জানিতেন এবং ** ** ** জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন।” ইহা হইতে মধুর ভাব দাম্পত্য-জীবন আর কি হইতে পারে ?

রামায়ণের সময় লোকের আদর্শ কত উচ্চ ছিল তাহা নারদের প্রতি বাল্মীকির প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায়। “এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান, মহান পরক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন ? কোন ব্যক্তি

আদর্শ পুরুষ সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন ? কোন ব্যক্তি লোক-ব্যবহার কুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন ? কোন ব্যক্তিই রোষ ও অসূয়ার বশবর্ত্তী নহেন ? রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন ?” (বা ১ স)। এই প্রশ্ন হইতে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শুধু রামায়ণের সময়ের আদর্শ নহে—তাহা চিরকালের আদর্শ। এই আদর্শে মনকে বড় করিয়া দেহকে খাট করা হয় নাই। ইহা হইতে ঐহিক বিষয় পরিত্যক্ত হইয়া পারত্রিক বিষয়কে বাড়াইয়া তোলা হয় নাই। এই আদর্শ শুধু লৌহকাঠিন্যের পরিচয় প্রদান করে নাই, পুষ্প পেলব কোমলতার পরিচয় দিয়াছে।

রামায়ণের যুগে ত্রিসত্য করা প্রচলিত ছিল। এখনও অনেকে ত্রিসত্য করিয়া থাকেন। সুখের বিষয় পুরুষ মহল হইতে এই শপথ করার রীতি অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা

ত্রিসত্য করা এই শপথ করার প্রথাকে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই ত্রিসত্য করার কথা আমরা (বা ৭১ সর্গে) দেখিতে পাই। “জনক

কহিলেন —"সুর কন্যার ন্যায় স্বরূপা বীর্য্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীত মনে অবশ্যই এই কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি (বশিষ্ঠ) রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিয়া দেন। * * * এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো হিরণ্যাদি দান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।" সুতরাং দেখিতে পাইলাম এখনকার মত রামায়ণের যুগে বিবাহের সময় পিতৃকৃত্য বা পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ এবং গো হিরণ্যাদি দান অনুষ্ঠিত হইত। এখন সম্ভবতঃ এই রকম শ্রাদ্ধের সময় পিতৃকুলের উর্দ্ধতন চারি পুরুষ এবং মাতৃকুলের উর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ড প্রদান করা হয়। এই রকম পিতৃশ্রাদ্ধকে পিতৃপূজা বলিলে যে বিশেষ ভুল হইবে তাহা নহে। চীন দেশে পিতৃপূজার প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও ইহার প্রচলন কম নয়। কারণ অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যত অনুষ্ঠান হয়, তাহার অধিকাংশের সহিতেই এই পিতৃশ্রাদ্ধ বিজড়িত। সুতরাং বলিতে হইবে চৈনিক প্রভাব ভারতবর্ষে কিম্বা ভারতবর্ষের প্রভাব চীনে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পিতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃপূজা

বা ৭২ সর্গে দেখিতে পাই, জনক কৃতাঞ্জলীপুটে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন—"আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম্ম আমার সঞ্চিত হইল।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে কন্যাদান করা বা কন্যার বিবাহ দেওয়া তখনও এখনকার মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত।

কন্যাদান-পরম ধর্ম্ম

বা ৫ সর্গে দেখিতে পাই "সাগ্নিক গুণবান বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা ঋষিগণ তথায় (অযোধ্যায়) নিরন্তর কাল যাপন করিতেছেন।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখন অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল, এবং বেদ বেদাঙ্গ জ্ঞানী এবং সত্যপরায়ণ ও দানশীল হওয়া ঋষিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল। রাজা দশরথও বেদ বেদাঙ্গপারগ, পরম ধার্ম্মিক, দূরদর্শী, তেজস্বী, যজ্ঞশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মার্থ কাম অনুসরণকারী ছিলেন। আর তাঁহার প্রজারা ছিল ধর্ম্মপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, হৃষ্ট, স্বধন-তুষ্ট, অলুব্ধ স্বভাব ও সত্যবাদী

অগ্নিপূজা

সঞ্চয়ী ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহও কামোন্মত্ত দুরাচার, ক্রুর, মূর্খ, ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিক ছিল না। সকলেই সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল (বাল কাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ)। সুতরাং দেখিতে পাই সুখের আর সীমা ছিল না। এবং ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া নগরবাসীর পক্ষে সাগ্নিক হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। ইহা হইতে রামায়ণী যুগে অগ্নিপূজা যে কতখানি ব্যাপক ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে বেদ বেদাঙ্গবেত্তা কেবল ঋষিরাই হইতেন। রাজা হইতেন বেদ বেদাঙ্গ পারগ আর প্রজারা হইত শুধু শাস্ত্রজ্ঞ।

আদর্শ সমাজ ঋষি, রাজা ও প্রজা

বা ৫ সর্গে বর্ণ বিভাগের কথা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে—"ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।" সুতরাং দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের পর বৈশ্য এবং বৈশ্যের পর শূদ্র এই ক্রমে জনসমাজ চারি স্তরে বিভক্ত ছিল। রিজ্ ডেভিড্ (Rhys Davids) এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন।

বর্ণ বিভাগ

পক্ষপাত শূন্য ন্যায় পরায়ণতা যে রামায়ণীযুগের ধর্ম্মান্তর্গত ছিল তাহা আমরা বা ৭ সর্গে দেখিতে পাই। দশরথের মন্ত্রীগণের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া কবিগুরু লিখিয়াছেন—"ইঁহারা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না।"

ন্যায়পরায়ণতা

অথর্ব্ববেদও যে রামায়ণের সময়ে প্রচলিত ছিল তাহা আমরা বালকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে দেখিতে পাই। রাজা যে যজ্ঞের বলে পুত্রমুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং সে যজ্ঞ অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পূর্ব্বে প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়াছিল। পুত্রের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে প্রথমেই পুত্রেষ্টি করা উচিত ছিল। সম্ভবতঃ অথর্ব্ববেদ তখন তত প্রচলিত ছিল না সেই জন্যই সকলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা না দিয়া অশ্বমেধের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এখনও অনেকে অথর্ব্ববেদকে বেদের মধ্যে ধরেন না।

অথর্ব্ববেদ

রামায়ণের সময়ে প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ধ্যানাদি করিতে হইত।

প্রাতঃকৃত্য

বা ২৩ সর্গে দেখিতে পাই রামচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান, অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রীজপ সমাপন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এখনও বিহার অঞ্চলে সকলেই প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিয়া থাকে এবং স্নানের পর গীতাপাঠ ইত্যাদি নানা প্রকার ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রামায়ণী যুগের প্রভাব এখনও অনেক স্থানে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অতিথি-পরায়ণতা

অতিথি-পরায়ণতা রামায়ণী-যুগে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ ছিল। বা ২৩ সর্গে দেখিতে পাই—"বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাপসেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বামিত্রের অতিথিসৎকার করিয়া পশ্চাৎ রামলক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন।" আরও অনেক স্থানে প্রাচীন ভারতের অতিথিপরায়ণতার কথা আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধর্ম্মশালা ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন ভারতবর্ষে অতিথিপরায়ণতাকে ধর্ম্মজগতে কত উচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ হইতে এই প্রথাটি এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

কার্ত্তিকপূজা

রামায়ণের সময়ে কার্ত্তিক পূজারও প্রচলন ছিল। বা ৩৭ সর্গে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিতেছেন, "এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয় সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া তাহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।" এখনও কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে কার্ত্তিকপূজার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়ম পরতন্ত্রতা

বা ৩৮ সর্গে দেখিতে পাই রাজা সগর নিজ পুত্র অসমঞ্জকে পাপাচারী, পৌরজনের অহিতকারী সাধুদ্রোহী হওয়ার জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় সমাজে ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধার্ম্মিক হইলে রাজপুত্রকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইত। রাজা যদি স্বেচ্ছাতন্ত্র বা absolute হইতেন তাহা হইলে সগর পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন সেই পুত্রকে কখনও পরিত্যাগ করিতেন না।

কৃচ্ছ্রসাধন-ধর্ম্ম

অপমৃত্যু-পাপ

রামায়ণের সময়ে কৃচ্ছ্র সাধন যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল তাহা আমরা বা ৪২ সর্গে দেখিতে পাই। পূর্ব্বপুরুষগণকে অপমৃত্যুর পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার জন্য রাজর্ষি ভগীরথ গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখনও পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী ও কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতেন।" ইহা হইতে আরও দেখিতে পাই যে ঐ সময়ে অপমৃত্যু পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখনও হিন্দুগণ অপমৃত্যুকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন। বা ৫১ সর্গেও দেখিতে পাই বালখিল্য ও বৈখানসের মধ্যে কেহ কেহ জলমাত্র পান এবং কেহ বায়ু মাত্র, কেহ শীর্ণ পত্র এবং কেহ কেহ বা ফল মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন। এই কাণ্ডের ৬৩ সর্গে দেখিতে পাই—"বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্ম পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাগমে অনাবৃত দেশে এবং শীতকালে অহোরাত্র জলের মধ্যে কালযাপন করিলেন।" এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রামায়ণী যুগে কৃচ্ছ্র সাধন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল।

শরণার্থীকে রক্ষা করা ধর্ম্ম

নরবলি

শরণার্থীকে রক্ষা করা রামায়ণের সময়ে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং তাহাকে পরিত্যাগ করা যে পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা আমরা বা ৬২ সর্গে দেখিতে পাই। মুনিবালক শুনঃশেফকে রাজা অম্বরীষ তাঁহার যজ্ঞাশ্বের পরিবর্ত্তে বলিদান করিবার জন্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। এই বালক প্রাণরক্ষার্থে বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন—"এই মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশীল, এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন কর। ইহাতে এই ঋষিকুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন

হইতে পারে।" সুতরাং দেখা গেল যে পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াও শরণার্থীকে রক্ষা করা তখনকার
দিনে কর্ত্তব্য ছিল। আরও দেখিলাম রামায়ণী যুগে নরবলি প্রচলিত

ধর্ম্ম

ছিল এবং অগ্নিকে তৃপ্ত করা, যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সাহায্য করা,
দেবগণের তৃপ্তি সাধন করা ও পিতৃ আজ্ঞা পালন করা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত
ছিল। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত না হওয়ায় তিনি কহিলেন—"পামরগণ!
তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিলি! ইহা শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধর্ম্ম তোদের
ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুকুর মাংসে

পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা অধর্ম্ম

উদর পূর্ণ পূর্ব্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।" সুতরাং বুঝা
গেল পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে সৎকর্ম্মশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও ঘোরতর
অধার্ম্মিক বলিয়া রামায়ণী যুগে বিবেচিত হইত।

বিশ্বামিত্রের জীবনী হইতে আমরা দেখিতে পাই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে ছিল এবং ব্রহ্মবলের
নিকট ক্ষত্রিয়বল নগণ্য ছিল। তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র নানাবিধ
অস্ত্রশস্ত্র তাঁহার নিকট হইতে লাভ করেন। এবং ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র পরে বশিষ্টের উপর
প্রয়োগ করেন। বশিষ্ঠ তখন তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিয়া

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে

কহিলেন—"বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয় বলের তুলনাই হয়
না। তুই আমার সেই অলৌকিক বল প্রত্যক্ষ কর।" ব্রহ্মদণ্ডের
দ্বারা বিশ্বামিত্রের দিব্যাস্ত্র সকল ব্যর্থ হইয়া গেল এবং বশিষ্টের দয়ার
জন্য তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল। এইরূপে পরাভূত হইয়া বিশ্বামিত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
করিয়া কহিলেন—"হা! ক্ষত্রিয় বলে ধিক; ব্রহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। * * *
এক্ষণে আমি স্থির নিশ্চয় হইয়া এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত
তপানুষ্ঠান করিব।" সুতরাং দেখা গেল বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন ব্রহ্মবল
ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল ব্রহ্মবল ক্ষত্রিয় বলের নিকট
একেবারেই নগণ্য। এবং সেই জন্যই তিনি বশিষ্টের কামধেনু শবলাকে জোর করিয়া লইয়া
যাইতেছিলেন। সুতরাং বুঝা যায় বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে জানিতেন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল
কিন্তু বশিষ্টের নিকট পরাজিত হইয়া বুঝিলেন ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে শক্তি

দ্বারাই নিরূপিত হইল ব্রাহ্মণ বড় না ক্ষত্রিয় বড়। শবলা নিজেকে বিশ্বামিত্রের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল সৈন্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার মধ্যে পহ্লব, যবন, শক, কম্বোজ, বর্ব্বর, কিরাত ও হারিত সৈন্যের নাম দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে বশিষ্ট এই সকল জাতীয় লোকের গুরুদেব ছিলেন, এবং উহারা তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিল। বোধ হয় তিনি উহাদিগকে হিন্দুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাহারা আসিয়া বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শবলাকে উদ্ধার করিল এবং বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ বশিষ্ট যে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অপেক্ষা শক্তিশালী বা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইল। বোধ হয় এই যুদ্ধের জন্যই রাজ্য হারাইয়া বিশ্বামিত্রকে তপস্যা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং বোধ হয় তাহার গুপ্ত অভিপ্রায় ছিল বর্ব্বর ইত্যাদিকে দলে টানিয়া আনিয়া বশিষ্টের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। এই সমস্ত আনুমানিক কচকচি ঐতিহাসিকগণের জন্য রাখিয়া দিয়া আমরা দেখিব কোন কোন স্তরের ভিতর দিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে গিয়া পৌছেন। 'সহস্র' এই শব্দটি অত্যুক্তি বোধে পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিবরণ প্রদান করিব।

অপরিমিত সন্তাপ লইয়া তপস্যা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে চলিলেন। এবং ফলমূল মাত্রে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এক বৎসর তপস্যার পরে তিনি রাজর্ষি লোক অধিকার করিলেন। তৎপর ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইয়া এবং তাঁহার জন্য এক অন্তরীক্ষ জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং তৎপর শুনঃশেফের প্রাণ রক্ষা করিয়া বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে গিয়া পুনরায় একবৎসর কঠোর তপস্যা করেন। এই বারের তপস্যার ফলে তিনি ঋষিত্ব লাভ করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি কামের বশীভূত ছিলেন। সেই জন্য মেনকার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত দশ বৎসর কাটাইলেন। পরে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া পুনরায় একবৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলেন। এই বারের তপস্যার ফলে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা আসিয়া তাহাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইল। বিশ্বামিত্র কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, বরং তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। কিন্তু অভিশাপ দিয়াই তাঁহার মনে হইল ক্রোধ রিপু তখনও আত্মাকে অধিকার করিয়া আছে। কাম নষ্ট হইয়াছে এইবার ক্রোধকেও নষ্ট করিতে হইবে। এইবার তিনি উত্তর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। একবৎসর তপস্যা করিয়া তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন, অন্ন প্রস্তুতও হইল। কিন্তু ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া সেই অন্ন প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদায় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া পূর্ব্ববৎ মৌন ব্রত ধারণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাসরোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে একবৎসর কাল তপস্যা করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ওঁকার, বষট্‌কার বেদ ও সমুদায় বরণ করিলে এবং সুরগণের অনুরোধে বেদবিৎ ও ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য বশিষ্ঠ আসিয়াও বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও মৈত্রি স্থাপন করিলেন। সুতরাং বুঝা গেল কাম এবং ক্রোধ জয় না করিলে কোন ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। আর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে ক্ষত্রিয়কে নিম্নলিখিত স্তর অতিক্রম করিতে হইত।

কাম ও ক্রোধ বর্জ্জনীয়

(১) রাজর্ষিত্ব

(২) ঋষিত্ব

(৩) মহার্ষিত্ব

(৪) ব্রহ্মর্ষিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব।

সুতরাং বুঝা গেল ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ও মহীয়ান ছিল।

ধনুপূজা

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে হিন্দুগণ যন্ত্রাদির পূজা করিয়া থাকেন। যাত্রার দিনেও গৃহস্থালীর তৈজসপত্র অর্চ্চিত হইয়া থাকে। রামায়ণী যুগে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ধনুর অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল। বা ৬৭ সর্গে দেখিতে পাই জনক বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন "ব্রাহ্মণ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন।"

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটিই হিন্দুগণের নিকট প্রধান দেবতা। কিন্তু দেবগণের প্রতি কার্য্য ব্রহ্মাকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া মনে হয় দেব ও মানব সমাজে ব্রহ্মার আধিপত্য নিতান্ত অল্প ছিল না। বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব তিনিই প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকার ও বর প্রদানে বড় হইলেও শক্তি হিসাবে রামায়ণের সময়ে বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মার পরামর্শ মতে দেবগণ রাবণবধের জন্য বিষ্ণুরই শরণ গ্রহণ করেন এবং কবিগুরু তাঁহাকেই ত্রিলোক পূজিত ত্রিজগৎপতি, দেবপ্রধান বলিয়া বর্ণনা করেন (বা ৫ স)। বোধ হয় মহেশ্বর পূর্ব্বে আর্য্যগণের দেবতা ছিলেন না। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দিতে প্রথমে স্বীকৃত ছিলেন না। কিন্তু দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া মহাদেব দেবগণের শিরচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে দেবগণকে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদানে সম্মত হইতে হইল। (বা ৬৬ সর্গ)। এই ঘটনার পূর্ব্বে মহাদেবের নাম রুদ্র ছিল এবং তিনি বোধ হয় অনার্য্যগণেরই দেবতা ছিলেন। কিন্তু এত বড় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াও রুদ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইতে পারেন নাই। রামায়ণের সময়ে বিষ্ণুই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা বা ৭৫ সর্গে দেখিতে পাই। ভৃগুনন্দন রাম রামচন্দ্রের পথ অবরোধ করিয়া কহিলেন, "কোন এক সময়ে সুরগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন, সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈব ধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্র দেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুই অধিক বল।"

বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা

অপ্রমেয় ব্রহ্ম

বেদান্তের বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত রামায়ণী যুগ যে পরিচিত ছিল তাহা আমরা বা ৭০ সর্গে দেখিতে পাই। সেখানে দেখি বশিষ্ঠ রাজা জনককে দশরথের বংশপরিচয় প্রদান কালে কহিতেছেন—"মহারাজ! প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন।" সুতরাং অপ্রমেয় ব্রহ্মের কথা বশিষ্ঠ জানিতেন।

সুতরাং দেখিতে পাইলাম রামায়ণী যুগের ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। বারান্তরে অযোধ্যাকাণ্ডের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

অকাল-বোধন।

'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' সোনার বঙ্গভূমি আজ শ্মশানে পরিণত। জরা-ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এই বিভীষিকাময়ী মহাশ্মশানে মৃত্যুর মশাল জ্বালাইয়া অনশনক্লিষ্ট কোটী কোটী নর-নারীর করুণ আর্ত্তনাদ দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে! নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিহারা নয়নে, অবসন্ন দেহে, ক্লিষ্ট পদে, সর্ব্ব-হারার দল আমরা বিলাস-মারীচের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি,—ওদিকে সুযোগ বুঝিয়া মায়াবী দারিদ্র্য-রাক্ষসকর্ত্তৃক আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী অপহৃতা হইয়া কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে নীত হইয়াছে কে জানে! লক্ষ্মীছাড়া আমরা তাই আজ উন্মত্ত অন্ধ-তাণ্ডবে চীৎকার করিতেছি,—অকাল—অকাল!

ঠিক্ এমনই একটি দিনে,—এমনই নির্ম্মল গগনে-পবনে, বর্ষাবিধৌত এমনই স্নিগ্ধ শারদ-প্রকৃতিবক্ষে এক অকালের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যখন নৃপকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র কুচক্রে পতিত হইয়া রাজৈশ্বর্য্য পরিহার পূর্ব্বক দীনবেশে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সীতা দেবীকে হারাইয়া সুগ্রীব সহায়ে মহাসঙ্কট-সঙ্কুল সমুদ্রপারে দুর্গম রাক্ষসপুরীতে সীতাউদ্ধারের জন্য ভীষণ সমরের অবতারণা করেন; পরিশেষে দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াও রাক্ষস-রাজ রাবণ বধে অকৃতকার্য্য হইয়া মহাব্যসনে অভিভূত হইয়া পড়েন। অকালের সেই পূর্ণপ্রকোপ-মুহূর্ত্তে, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা স্বর্গীয় দেবদূতবেশে, অকালে কালভয়হারিণী আদ্যাশক্তির উদ্বোধন করিয়া রাক্ষসবধশক্তি লাভের উপদেশ প্রদান করেন। তদবধি—

'বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনম্।'

চলিয়া আসিতেছে। উদরে অন্ন নাই, দেহে সামর্থ্য নাই,—বিশুষ্ক অধরকোণে ক্ষীণ হাসির রেশটুকু ফুটাইয়া দিয়া বিজলী-ঝিলিকের মত একটি ক্ষণিক আনন্দ-প্রবাহ তদবধি প্রতিবর্ষে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাহৃদয়ে সাড়া দিয়া যাইতেছে; কিন্তু হায় আর কত দিন?—

কত দিন আমরা বোধন-মন্ত্রের পুঁথিগত কীটদষ্ট বর্ণমালার সংযোজনা করিয়া বিদ্যুন্ময়ী শক্তিবীজের উদ্ধারপ্রয়াসী হইব? কোন্ বিধাতাপুরুষ স্বয়মাগত হইয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রণবপুটিত শক্তিবীজ ফুৎকারিয়া দিবে,—আর দৈবতেজা আমরা ধীরোদাত্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিব—

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা॥'

আর না। আর আমরা ব্যর্থ-প্রয়াসে উন্মত্তবৎ ইতঃভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইব না; আত্মশক্তি জাগরণে পরাঙ্মুখ হইয়া অগং পূজার বাহ্যাড়ম্বরে—

'শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥'

বলিয়া মহাশক্তিমাহাত্ম্যের অপচয় করিব না। আজ হৃদয়ে-হৃদয়ে প্রেমামৃতপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া সহস্রদল-কমলে মাতৃমূর্ত্তির আবাহন করিব। নহবতে প্রভাতী গাহিবে;—

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে।'

অবাঙ্মনসগোচর নহে, মা যে আমাদের গৃহে-গৃহে বিরাজমানা! শক্তিরূপিণী জননী-গণের কঙ্কণ-ঝঙ্কারে যতদিন না ইঙ্গিত করিবে—আনন্দ-ময়ীর আনন্দ-কুটীর কোন্ গুহায়, শক্তি-রাণীর সহযোগিনী শক্তি-প্রেরণায় যত দিন না প্রসুপ্ত ব্রহ্মবস্তুর উদ্বুদ্ধ হইবে, বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা, যন্ত্র-মন্ত্র, সাধন-ভজন তৎদিন সমস্ত নিষ্ফল, সমস্ত নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিচিত্র বিলাস অবদান পায়ে ঠেলিয়া—কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, কান্তি ও শান্তি-রূপিণী মাতৃ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা না করিয়া—

'জটাজুটসমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং'

শক্তিমূর্ত্তি আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে উদ্বোধনের কল্পনাও বৃথা!

এস অনন্যচিত্ত, অনন্যহৃদয়, অনন্যকর্ম্মা শক্তিউপাসক,—এস হে নবতান্ত্রিকের পূর্ব্বসাধক,—শক্তিবোধনের বেদাচার্য্য! আজ আমরা এই অকাল-বোধনের শুভ আমন্ত্রণ-অধিবাসে আমাদের প্রাণের ক্ষণিক উত্তেজনা, ভোগ-বাসনার উদ্দাম লিপ্সা বিসর্জ্জন দিয়া

ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহসে, অকুণ্ঠ স্থির চিত্তে গৃহে-গৃহে মাতৃমূর্ত্তির আবাহন করি। বাহ্যাড়ম্বরের তুমুল আয়োজন এ বোধন-প্রক্রিয়ার অঙ্গ নহে—ইহার প্রধান উপচার—বিবেক-গন্ধ প্রীতি-পুষ্প, নিষ্ঠা-ধূপ, জ্ঞান-প্রদীপ, আত্মবোধ-নৈবিদ্যসম্ভার থরে থরে সাজাইয়া মোহ-মহিষাদি বলি-দান পূর্ব্বক ধারোষ্ণশোণিতসিক্ত রক্তজবা মাতৃপদে অর্পণ করা। আজ গৃহে-গৃহে শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্ত্তির অর্চ্চনা হউক, পুরুষ প্রকৃতির নবসম্মিলিত রক্তস্রোত উজান বহুক, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এক হইয়া নবশক্তির দর্শন স্পর্শন ও প্রেমামৃত-রসাস্বাদন করুক, আর সম্মিলিত কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত হউক— 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥'

অকাল ঘুচিবে, হাহাকার মিটিবে, অশিব বিনাশ হইবে। নির্জ্জিত দ্বিসপ্তকোটীভুজে অপূর্ব্ব তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারে অপরাজিতার চরণে অর্ঘ্য দান করিয়া কৃতার্থ হইব। শক্তি-মণ্ডপে বিজয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। এ পূজায় আবাহন আছে—বিসর্জ্জন নাই, আগমনী আছে—বিজয়া নাই! অনাবিল প্রেমের আনন্দ-প্রশস্তি বন্ধনই এ পূজার পূর্ণ-অঙ্গ!—আর—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে॥

ইহাই প্রণাম মন্ত্র!

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ভুল-ভাঙ্গা।

—ঃ০ঃ—

(১)

জমীদার পুত্র সুকুমার ছেলেবেলা হইতেই নামে এবং কাজে সুকুমারই ছিল। সে কলিকাতা থাকিয়া কলেজে বি-এ পড়িত। বি-এ পড়িবার সময় বিয়েটা তার বাকী ছিল না। বাঙ্গলার বর—জমীদারের ছেলে,—কন্যার পিতার হাত এড়ান সহজ নয়। সুকুমারের স্ত্রী সুহাস্‌কে পাইয়া শ্বশুর শাশুড়ী একবাক্যে বলিলেন 'এমন বৌ আর হয় না।' এমন ভরা

আনন্দে এক বৎসর যাইতে না যাইতে বিধাতা পুরুষ সুকুমারের পিতার জীবন-ডোর কাটিয়া দিলেন,—হরপ্রসাদ সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার মহাপ্রস্থানে সুকুমারের জীবনের কাব্য ও কল্পনার শেষ হইয়া গেল—তাহাকে বুঝিতে হইল তাহাকেও খেলাধূলা ছাড়িয়া আর একটা গদ্যময় জীবন ভোগ করিতে হইবে।

যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া গুরুজনের আশীর্ব্বাদ লইয়া সুকুমার বি-এ পড়িতে কলিকাতা চলিয়া গেল। দুই বৎসর সে বাড়ী গেল না, এই দীর্ঘ দুই বৎসর সহপাঠী বন্ধু নীরদের সঙ্গে নিরিবিলি পড়াশুনা করাই তার জীবনের চরম আনন্দ হইয়া উঠিল। প্রত্যেক ছুটীতে বাড়ী হইতে মা ও স্ত্রীর বাড়ী যাইবার সনির্ব্বন্ধ তাগিদ আসিত,—সুকুমার জবাব দিত, পরীক্ষা না দিয়া সে বাড়ী ফিরিবে না।

(২)

একদিন দুপ্রহরে পাড়ার শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দা লইয়া সুহাসের নিকট সমবয়সী এক সই আসিয়া জুটিল। এ-কথা সে-কথার পর যার যার স্বামীর কথা উঠিল। বলা বাহুল্য স্ত্রীলোকেরা পরস্পর পরস্পরের স্বামীর সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে ভালবাসে,—এবং ঐ সঙ্গে স্বামীর মার একটু নিন্দা করিয়া আলোচ্য বিষয়ের চাটনী যোগায়। নানা রকমের কথা হইতে হইতেই নীরদের এক পত্র আসিল, নীরদ সুকুমারের আবাল্য প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী,—একত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহাতে সে লিখিয়াছে ;—

"বউদি, সুকুদাকে পত্র দিতে দিতে হয়রাণ হয়েছ বলেই মাঝখান থেকে আমি হতভাগা এক পত্র পেয়ে গেলাম। সুকুমারদাকে বাড়ী যেতে আমিও খুব তাগিদ দিচ্ছি,—সে সুকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ না হয়ে যাবে না বলছে। যা হোক পূজার সময় অবশ্যই তাকে পাঠাব, ভেবো না। তিনি আজকাল শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোকের ভারি ভক্ত হয়েছেন,—তার 'মেজদির' সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমায় ভুলছেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী "নীরদ।"

দুই সখী পত্র পাঠ করিয়া কতক বুঝিল কতক বুঝিল না।

সুহাসিনী বলিল "নীরদবাবুর চিঠিতো না এ হেঁয়ালী, বরাবর মনের কথা চেপে রেখে কলম চালায়।"

সই এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দেখ সুহাস্ রাগ করিসনে, সুকুমার ভাল ছেলে কিন্তু কলিকাতার কোন চট্টোপাধ্যায় বাড়ী যাতায়াতে চিঠি লেখাও শেষ বন্ধ করেছে—আমি তো ভাল বুঝছি না, আমার ভাসুরের মুখে শুনেছি কলিকাতায় ৮৩ লক্ষ লোকের বাস, একবার একজন লোক ছেড়ে দিলে আর খুঁজে বের করা দায়। আমার বিশ্বাস কোন মন্দ পথে"—ঢোক গিলিয়া বলিলেন "নইলে দেখ না—নইলে ও লিখবে কেন। সে তার মেজদির সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমাকে ভুলেছে।"

কথা কয়েকটি তপ্ত লৌহের জ্বালার মত সুহাসিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল—কি বিশ্রী কথা,—তাহার দুই গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "ভাই তুই এখন যা, ছিঃ এমন সর্ব্বনেশে কথা বল্‌তে আছে ?" অগত্যা সখী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে গেল, যে এ কথায় সুহাস এমন করিয়া কাঁদে কেন ? তাঁর স্বামী কতদিন মদ খেয়ে লাথি মেরেছে কত কুব্যবহার করেছে, কৈ তার মনে এমন ভাব তো কোন দিন হয় নি। বৎসর বৎসর স্বামীর কাছ থেকে ফর্দ্দ মত গহনা পেয়েই সে সুখী।"

—কিন্তু হায় সুহাসের তো তা নয়, গহনার তুচ্ছ স্বপ্ন তো তার ধ্যান নয়, তার সবই যে স্বামী ! স্বামীর নিন্দা শুনিবে, স্বামীকে অবিশ্বাস করিবে, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবে ইহার অপেক্ষা যে তার মরণও ভাল। মনে মনে সুহাসের যতই পবিত্রতা থাকুক না কেন, সখীর টাট্‌কা ইঙ্গিত তখনও তার মনের তলায় আঘাত করিতেছিল,—"তাঁর মেজদির সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমায় ভুলছেন !"

আর ভাবিতে পারিল না,—মনে মনে বলিল "হায় ভগবান শেষে এই করলে !"

সংসারের প্রায় লোকেরই দুই একটি এমন ব্যথাভরা গোপন কথা থাকে, যাহা নিজে সহ্য করিতে পারা যায় না অপরের নিকট প্রকাশ করাও চলে না। সুহাসিনীরও আজ তাহাই হইল—সে নীরবে দিনগুলিকে কোন মতে কাটাইতে লাগিল।

(৩)

পূজার আর এক মাস বাকী, পূর্ব্ব হইতেই সুকুমারের মা তাহাকে বাড়ী আসিতে জিদ্ করিতে লাগিলেন, "মাথা খাও" 'না খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব' 'মরা মুখ দেখিবে' প্রভৃতি কথা লিখিতেও ছাড়িলেন না,—এবং নীরদকে সঙ্গে আনিবার জন্য সে চিঠিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল।

চিঠি পড়িয়া সুকুমার হাসিয়া মাকে পত্র লিখিতে বসিল,—

মা, কিছুই করিতে হইবে না, ১৫ই তারিখে বাড়ী রওনা হইব—ভাবিও না, নীরদকে এত বলিলাম সে যাবে না।" ইতি— সেবকাধম—সুকুমার—

সুকুমারের আসিবার আর দিন দশেক বাকী আছে, এমন সময় ৮।১০ দিনের জন্য সুকুমার অন্য একটি বন্ধুর বাড়ী গেল, ইচ্ছা যে সেখান হইতে নির্দ্দিষ্ট দিনে বাড়ী আসিবে।— নীরদ সেই দিনই তল্‌পী বাঁধিয়া একেবারে পাপপুণ্যের লীলাভূমি কাশীতে গিয়া হাজির হইল, সঙ্গে ছোট্ট একটি বিছানা ও খান কয়েক উপন্যাস লইল মাত্র। ইচ্ছা বন্ধটা কাশীতেই কাটাইয়া যাইবে। কাশী পৌঁছাইয়া নীরদ সুকুমারকে এক পত্র দিল,—

প্রিয় সুকুদা,—

সম্ভব এতদিন পৌঁছে গেছ। বউদি তো দীর্ঘ দেড় বছর পরে তোমায় পেয়ে স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। যাক 'প্রেমের ব্যথা প্রেমিকা জানে' এখন আমার গোটা দুই কথা। 'বামুনের মেয়েটী' হঠাৎ বাসা থেকে গেল কোথায় ? ভেবে চিন্তে মনে করলেম এ তোমার কাজ। শেষে যতীশও বল্লে সে তোমাকে নিয়ে যেতে দেখেছে। ছিঃ বামুনের মেয়েটি একেবারে মজালে। যার মেয়ে সে শুন্‌লে কি ভাব্‌বে। বয়স হয়েছে—এত বড় মেয়ে নিয়ে উধাও, ছিঃ।

শুভাকাঙ্ক্ষী—"নীরদ"—

সুকুমার যখন অন্য একটি বন্ধুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত ইতাবসরে চিঠিখানা সুকুমারের বাড়ী যাওয়া—সুহাসের হাতে পড়ায় বিভ্রাটের শেষ অধ্যায়ও আরম্ভ হওয়া। সুহাসিনী আহারে বসিয়াছিল, হাতের ভাত রাখিয়া উঠিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কাটিয়া শ্বশ্রুমাতাকে সকল কথা জানাইল। তখন পূজা উপলক্ষে নহবৎএর সানাই সন্ধ্যায় পূরবী ঢালিয়া দিয়া পূজার করুণ উৎসবের ইতিহাসটা আনন্দ ও বিষাদ মণ্ডিত করিয়া মানবের মর্ম্মস্তলে জ্ঞাপন করিতেছিল। লোকজনের কোলাহল, সমবয়সীর উৎসব আনন্দ এক সঙ্গে সব বন্ধ হইল, পাড়ার মেয়েমহলের বিরাট পার্লামেণ্ট তখনই বসিয়া গেল। 'কোন পুরুষ কোথায় চরিত্র হারাইয়াছিল' 'কোন স্ত্রী কেমন কৌশলে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছিল' ইহারই একটা গোপন ইতিহাস ইহকাল হইতে পরকাল পর্য্যন্ত নানা ভাবে ব্যক্ত হইতে লাগিল। এমনি ভাবে পূজাটাকে সকলে মিলিয়া খুবই নিরানন্দ করিয়া তুলিল।

(৪)

রাত্রি ১০টা শারদচন্দ্রালোকে সুকুমারের ক্ষুদ্র প্রিয় জন্মভূমি দৃষ্টিপথে পতিত হইতেই স্নেহময় পিতার অভাব তার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। চখের পাতা ভিজিয়া আসিল। সে আবেগকম্পিত বক্ষে বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিতে বৃদ্ধ সরকার রামকানাই আসিয়া অভিবাদন করিল, কোন কথা বলিল না।

সুকুমার হাসিয়া বলিল "কি সরকার মশাই সব ভালতো ?"

সরকার হাঁ না হাঁ না করিয়া—কি বলিল কিছুই বোঝা গেল না। উদ্বেগ ও আনন্দ লইয়া বাড়ীতে পা দিতেই মা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, মৃত কর্ত্তার নাম ধরিয়া অনেক কি সব বলিলেন। মোট কথা কর্ত্তাও আসিলেন না, মাও মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, স্ত্রীও ঘরের দরজা খুলিলেন না। ব্যাপার কি কিছু বুঝিতে না পারিয়া সুকুমার দ্রুত গ্রাম্যসহচর মহেশের বাড়ী চলিয়া গেল। সুকুমারের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বিশ্রী

কান্নার শব্দ উঠিল যে গ্রামের সমস্ত লোক এই মনে করিয়াই ছুটিয়া আসিল যে চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী নিশ্চয়ই এই মাত্র কাহারও প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

মহেশের বাড়ী পশ্চিম পাড়ায় সে খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় সুকুমার গিয়া হাঁক দিল "মহেশ, মহেশ!" মহেশ খাওয়া ফেলিয়া একেবারে সুকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিল, "বাঃ তুমি কখন এলে ?"

কোন কথা না বলিয়াই সোজা সুকুমার বলিল—"মহেশ বল্‌তে পার আমাদের বাড়ী সবাই কাঁদছে কেন,—সব বেঁচে আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমায় দেখে বিশ্রী কান্না।"

মহেশ বিস্মিত হইয়া গেল, কোনই কারণ বলিতে পারিল না। সে রাত্রে সুকুমার মহেশের বাড়ী আহার করিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রে একবার মহেশ সুকুমারকে বলিল। "আচ্ছা তোমার বৌ এদানিং তোমায় পত্র দিত ?"

"হুঁ। বেশ রঙ্গ রহস্য করেই পত্র দিত। আজ দেড়মাস তার পত্র পাই নি,—তখন আমি এক পত্র দিয়াছিলাম।—"সুহাস তোর জন্য কি আন্‌ব জানাস্।"

সুহাসিনী তার জবাবে লিখেছিল—"একজন জীবন্ত সুকুমার।"

বাস্—আর কোন পত্র নাই।

পরদিন প্রভাতে সঙ্গে সঙ্গে মহেশ সুকুমারের স্ত্রীকে খুব শক্ত করিয়া ধরিল। সুহাসিনীকে ঘাঁটিও না বলিয়া নীরবে মহেশের হাতে দুইখানি পত্র গুঁজিয়া দিয়া ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া অসার হইয়া শুইয়া পড়িল।

রাস্তায় আসিতে আসিতে মহেশ পত্র দুইখানি দুই তিন বার করিয়া পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিল অসম্ভব, অসম্ভব সুকুমারের মত মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

পত্র দুইখানি আবেগ কম্পিত বক্ষে সুকুমারের হাতে দিতেই সুকুমার খানিকক্ষণ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া একেবারে গম্ভীর হইল,— তখন রাগে অভিমানে সে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। একবার মনে মনে বলিল "ওঃ—এই জন্যে গ্রামশুদ্ধ লোকের কাছে আমায় অপদস্থ করা ?"

তখনই নীরদের কাছে কাশীর ঠিকানায় এক তার করিল।—

"আমি মরতে বসেছি, বিলম্ব করিলে দেখা হইবে না।"

টেলিগ্রামখানা যথাবিহিত ভৃত্যের হাতে দিয়া সুকুমার একখানা সাদা চাদর টানিয়া আপাদ মস্তক ঢাকিয়া মহেশের বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। সুকুমারের হাসি এবং গাম্ভীর্য্য মহেশ কিছুই বুঝিতেও পারিল না কোন কথা আবার বলিতেও পারিল না।

বিকেলে জন কয়েক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া আনিয়া বাড়ীর সরকার মশাই বাবুকে আসিয়া অনেক বুঝাইল, "বয়স দোষে সবই হয় যা হইবার তা হইয়াছে, এখন নিজ বাড়ীর পূজা, আপনি বাড়ী আসুন।" সুকুমার কোন কথা বলিল না বাড়ীও গেল না। যাঁহারা লইতে আসিয়াছিলেন তাহারা ফিরিয়া যাইয়া সদ্য বলিদানের মহাপ্রসাদ খাইতে বসিয়া গেলেন।

(৫)

আজ বিজয়া। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পূজার দিনগুলি বিষাদমণ্ডিত হইয়া একটা ক্ষীণ উৎসবের রেখা টানিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এইদিনে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জনে যাইয়া থাকেন ইহাই এ বাড়ীর পূর্ব্বাপর নিয়ম। আজ গ্রামশুদ্ধ লোক আহারে বসিয়া বাড়ীর মালীক সুকুমারের চরিত্র লইয়া খুব আলোচনা করিতেছেন। গ্রামে যাহাদের বাড়ী, তাহারা জানেন আহারের সময় কাহারও নিন্দা-চর্চ্চা না হইলে গ্রাম্য প্রীতিভোজ সুনির্ব্বাহ হয় না।—সবাই সুকুমারের নিন্দায় মহামায়ার প্রসাদ পাইতেছেন। যে এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করিত সে মহেশ,—সে সুকুমারকে লইয়া এ তিন দিন ঘরের বাহিরও হয় নাই।

বৃদ্ধ ত্রৈলক্য মুখুজ্যে কুলীনের শ্রেষ্ঠ! ৫৬টি দারপরিগ্রহ করিয়া নরকের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যের পরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তিনিও সেদিন সন্দেশের টুকরাটুকু ভাল করিয়া গলার নীচে নামিতে না নামিতে বলিয়া উঠিলেন,—

"হেঃ সুকুমার,—ছোঁড়াটাকে ভাল বলে জান্‌তেম, ছোঃ ছোড়া এমন বিগ্‌ড়ে গেল—আমি জান্‌তেম না বুঝলেন গিরিদা,—

এই কানসারা নড়ে চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে,—
সেই বাঘেই মানুষ মারে।"

হেঃ চরিত্রবল যা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যা ডাকাতে নিতে পারে না আগুনে পোড়ে না—তাই কি না—হেঃ—একেবারে কলিকাল"—

এমন সময় সেই কথাটিকে বাঁধা দিয়া বজ্রপতনের মত ক্ষুদ্র সভাটিকে চমকিত করিয়া তুলিয়া মহেশ বলিয়া উঠিল,—

"হ্যাঁ মুখুজ্যে মশাই কলিকালই তো,—ঘোর কলি—নইলে যে লোকটি মরণের পথে যেতে যেতে ৫৬টি স্ত্রীলোকের গলায় দড়ি দেবার ব্যবস্থা করেছেন তাকে এনে সমাজে এক সঙ্গে খায়। মানুষ একটি নিয়েই অস্থির—আর আপনি এতগুলি নিয়েও স্থির, বীর বটে! কুলীনের মুখোস প'রে কোন্ ধর্ম্মে কোন্ যুক্তিতে এই ৫৬টি নারীর বৈধব্যের ব্যবস্থা করেছেন? আবার উঁচু গলায় কথা কৈছেন; লজ্জা করে না?"—মহেশ আর কি বলিতে যাইতেছিল সকলে সমবেত ভাবে বাধা দিয়া বলিল,—

"ওহে ছোক্‌রা থাম না, ব্যাপার কি? অমন চেঁচাচ্ছ কেন?"

এমন সময় দ্বিতীয় ঝড়ের মত নীরদ প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল —

"ও বেচারা অমন চ্যাঁচাচ্ছে কেন শুনবেন?—সুকুমার চক্রবর্ত্তী পরলোক গমন করেছেন বলে—আপনারা যে সবাই আনন্দ করে তার আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাচ্ছেন, মহেশ আপনাদের কাছে বল্‌তে চায়—যে সুকুমার বাবু মরেন নি। বেঁচে আছেন।"

মহেশ বলিল,—"নেঃ রাখ তোর হেঁয়ালী, একবার হেঁয়ালী চালিয়ে তো সর্ব্বনাশ করেছিস্—আবার বুঝি তাই সুরু করলি।"

তখন নীরদ সুকুমারের মা ও বৌকে ডাকাইয়া আড়ালে আনিল।—তারপর উঠানের মাঝখানে খুব জোরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল।—

"আপনারা সবাই এমন মূর্খ তা জান্‌তাম না। একজন লোককে সারাজীবন ভাল সচ্চরিত্র সরল জানা সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা কেউ বিচার করা বা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করলেন না। ব্যাপার কি শুনুন।

"প্রথম, সুকুমার দার স্ত্রী আমাকে সুকুমার সংবাদের জন্য এক পত্র দিলে।—তার উত্তরে আমি তাকে পত্র দিই তাতে শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে বাঙ্গালার একজন বড় সাহিত্যিক তার একখানা বই আছে নাম তার মেজদিদি। সুকুমারদা তাই তখন পড়ছিল আমি একটু রঙ্গ করে সেই কথাটাই লিখেছিলেম।"—তারপর—

দ্বিতীয় পত্রখানাও তাই—আমি কাশীতে কয়েকখানা উপন্যাস পড়বার জন্য সঙ্গে নি—তার ভেতর শরৎ বাবুর "বামুনের মেয়ে"—বইখানা ছিল। বুঝলেন মুখুজ্যে মশাই, কেচ্ছা ছাপার হরফে বেড়িয়েছে।—সেই বইখানা সুকুদা পরবে বলে বাড়ী নিয়ে আসে।—তাই তাকে রঙ্গ করে এই পত্রখানা দিয়েছি। সবাই—পাড়াগাঁয়ের ভুত চিঠী বুঝবে না অথচ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে সেই কাশী থেকে আমায় পাকড়াও করতে পার। ধন্য বউদি নিজের এমন ভোলানাথ স্বামী,—সবার চেয়ে তুমি তো তাকে ভাল জান—লেখা পড়া জান না,—"কেন বন্ধুর চিঠিপত্রে হাত দিতে গিয়েছিলে,"—বলিয়াই মহেশের হাত ধরে একেবারে তার বাড়ী গিয়ে হাজির।

সকলেই চুপ, সবাই অবাক,—সবাই এমন লজ্জিত যে আর মুখ তুলিয়া চাহিবার কার ও শক্তি ছিল না। মা বলিলেন "বধূর দোষ"। বধূ বলিলেন "সই আমার মনে আগুন জেলেছে" নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বলিলেন "স্ত্রী জাতের বিশ্বাস নেই—ওঁরা সব পারেন। যেখানে মেয়ে কর্ত্তা সেখানে আমাদের এত হল্লা করা ঠিক হয় নি।"

(৬)

সুকুমারের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে মহেশের বাড়ী যাইয়া—তিন বন্ধুকে বাড়ী আনিলেন। সকলেই সুকুমারের সঙ্গে তানা না না করিয়া আপোষ করিল। বিপদ যত সুহাসিনীর। নীরদ তাহার পক্ষ হইয়া অনেক কথাই বলিয়া রাখিয়াছিল——রাত্রে "দুর্গা প্রীতে হরি হরি বোল" বলিয়া সকলে যখন ফিরিয়া—আসিল।—তখন সুকুমার জননীর পদে নত হইয়া শুইতে গেল।

খানিক পরেই পাশের দরজাটা একটু নড়িল, একটু আবার নড়িল—আবার—তার পর সুহাসিনী তাহার কম্পিত দেহখানি কোনমতে ঘরের ভেতর প্রবেশ করাইয়া দিল, তাহার বসনখানি চখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে, অপরাধীর মত ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। সুকুমার বুঝিল প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে।

সে বলিল "আজ কাঁদতে নেই! আমায় প্রণাম করলে না সুহাস,—আজ যে বিজয়া।"

স্তম্ভিত সুহাসিনী অবাক; এই তো সেই শান্ত স্বর সেই দেবতার মত নির্ম্মল চরিত্র স্বামী-দেবতা। কি পবিত্র দেবমূর্ত্তি! অমনি দুহাতে তার দুটী চরণ মস্তকে স্পর্শ করিতেই

সুকুমার তাহাকে নিজের বক্ষে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "ভাল আছ।" কম্পিত কণ্ঠে
সুহাসিনী বলিল "ছিলাম না এখন আছি।" কতক্ষণ নীরব! উভয়ের মুখে কথা নাই
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুকুমার বলিল "কি ভাবছ সুহাস্!"
"ভাবছি মার পূজা এবার আমার সার্থক—মাটীর ভোলানাথ আজ আমার মাকে নিয়া গিয়া
আমায় সত্যিকারের ভোলানাথকে দিয়ে গেলেন।" বলিয়াই সুহাসিনী আবার স্বামীর পায়ে
লুটাইয়া পড়িল।

এমন সময় পান মুখে দিয়া বাহির বাড়ী শয়নের উদ্দেশ্যে যাইবার কালে নীরদ চেঁচাইয়া
বলিয়া গেল "সাবধান বৌঠান, চরিত্রহীন স্বামীকে ক্ষমা করো না।"
দীর্ঘ বিরহের পর এ মধুর মিলন বর্ণনার বিষয় নয়—শুধু এই কথাটি বলিতে চাই;—আমার
সহৃদয় পাঠকপাঠিকা সবাই দয়া করিয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়া পাঠান যে আপনি আর বই লিখিয়া নিজে নামকরণ করিবেন
না,—কারণ আপনার পুস্তকে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিতে সুরু করিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

শোক-সংবাদ।

এ মাসেও আর একটি মহাপ্রস্থানের সংবাদ:। 'সন্দেশে'র সর্ব্বজনপ্রিয় সম্পাদক, প্রসিদ্ধ
চিত্রশিল্পী, সুরসিক কবি, শিশু-সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত সুকুমার রায় বিগত ২৫শে ভাদ্র সোমবারে
অকালে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনন্যকর্ম্মী ও অটল-
ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন; প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া তিনি দুরারোগ্য কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন—
কিন্তু এই ব্যাধি তাঁহার দেহকে জীর্ণ শীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহার মনের অমিত বলকে
একটুও ক্ষীণ করিতে পারিয়াছিল না,—তিনি রোগশয্যায় পড়িয়াও সন্দেশের জন্য নিয়মিত
কবিতা ও ছবি আঁকিয়াছেন। বড় ভালবাসিত ছেলেরা তাঁর কবিতা,—সন্দেশ পৌঁছবামাত্র
তাঁর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া গৃহ মুখরিত করিত। সন্দেশের প্রতীক্ষায় ব্যগ্র শিশুরা আজও
সন্দেশ কেন আসিতেছে না জিজ্ঞসা করায়,—সন্দেশের সম্পাদকের মহাপ্রস্থানের কথা
তাহাদের জানাইলে—তাহাদের ক্ষোভ দুঃখের সীমা নাই,—এতগুলি শিশুর পবিত্র হৃদয়ের
অনাবিল আন্তরিক ভালবাসা সেই মহাপ্রেমিকের ক্রোড়স্থ সুকুমারকে নিশ্চয় শান্তিদান
করিয়াছে। মুক্তাত্মার স্বর্গসুখ ও পার্থিব যশঃ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের একমাত্র সান্ত্বনা।
গুণে আজ সুকুমার অমর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কবি ও বাজীকর।

১

সভার মাঝারে দেখাইছে খেলা
সঙ্গীত-বাজিকর,
স্তম্ভিত সবে, অপলক আঁখি,
কম্পিত থর থর!—
উঠিছে নামিছে ছন্দঃ রাগিণী,—
শ্বসিছে ফুঁসিছে ক্রুদ্ধা নাগিনী,
শ্রবণ-বিদারী বংশীবাদন
মুখরিছে খেলাঘর!

হেথা তোর ঠাঁই নাই ওরে কবি,
সরে আয়, সরে আয়
বুকের আড়ালে লুকাইয়া বীণা
দাঁড়া দূর নিরালায় ;—
ঝঙ্কারি' সুর নদী-কল্লোলে,
বিথারি' ছন্দঃ বায়ু-হিল্লোলে,
প্রাণ হ'তে গান বাহিরিয়া আসি
ছেয়ে যাক্ নীলিমায় !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

রক্তাম্বরা।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নৈশ আর্ত্তনাদ।

আমার লুকাইবার জায়গা হইতে আমি মেজরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার আগমনে কোন শুভ ইচ্ছা নিশ্চয়ই নাই। সে একমনে সকলকে একবার দেখিয়া তারপর আবার বাগানের ভিতর মিলাইয়া গেল। তাহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়া আমি তাহার সঙ্গ লইলাম, দেখিলাম একটি ছোট আন্ধকার হোটেলে সে ঢুকিয়া পড়িল। খবর লইয়া জানিলাম, সে দুদিন হইতে ওই হোটেলে আছে। কিন্তু ব্যাপার সহজ নয়, আমায় দেখিলেই সে চিনিয়া ফেলিবে। আর আমার স্ত্রী, রেজেষ্ট্রি আফিসে মেজরকে যখন বাবা বলিয়া পরিচয় দিয়াছে তখন সেও এই ষড়যন্ত্রের ভিতর আছে। কিন্তু

তারও জীবননাশের ত ভয় ছিল। সব আবার গোলমাল বোধ হইল। যাহা হউক মেজর আবার কেন আসিল, জানিতে হইবে। তার কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা হইতে যদি এরহস্যের কিছু কিনারা পাই। আমি গরীব চাষার পোষাক যোগাড় করিয়া পরিয়া মেজরের বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় রাত ৯টার সময় আমার আশা পূর্ণ হইল। মেজর ধীরে ধীরে জমিদার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম। সে বাগানের কাঠের বেড়ার ভিতর একটা ভাঙ্গা জায়গা দিয়া ভিতরে ঢুকিল। লোকটা তাহ'লে জানে যে এখন সদর দরজা বন্ধ। হয় ত সে নিজেই এ জায়গাটা ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিল। আমিও সেইখান দিয়া ঢুকিলাম। মাঝে মাঝে শুকনো পাতা ও ডাল ভাঙ্গার শব্দে মেজর কোন দিকে যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছিলাম। রাত্রি নিস্তব্ধ। অতি সামান্য একটু শব্দও অতি স্পষ্টরূপে শোনা যাইতেছিল। আমার ভয়ের অন্ত নাই কিন্তু তবুও সাহস করিয়া মেজরের পিছনে পিছনে বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িলাম। বৈঠকে তখন নাচগান চলিতেছিল; বাড়ীর সম্মুখে দুজন লোক বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারাও একটু পরে ভিতরে গেলেন। আমি ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। একদিকে পর্দ্দার আড়ালে মেয়েরা, অন্যদিকে ছেলেরা। কিন্তু আমার স্ত্রীকে কোথাও দেখিলাম না। বেশীর ভাগই ধনবান লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের পোষাকও খুব জমকালো। এ সব নাচগান আমার একটুও ভাল লাগিল না। আমার স্ত্রীর এ সবের দিকে তেমন আকর্ষণ নাই জানিয়া বড় আশ্বস্ত হইলাম। হঠাৎ পাশেই পায়ের শব্দ পাইলাম আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে সরিয়া আসিলাম। দেখিলাম লোকটি কিছু অন্যমনস্ক। একটু সামনে ঝুঁকিয়া চলেন। তিনি নিজের পথে সোজা চলিয়া গেলেন। প্রায় একঘণ্টা হইল আমি বাড়ীর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পাছে আবার কেউ আসে সেই ভয়ে আমি আবার বাগানে ঢুকিতে যাইব এমন সময়ে দরজায় একজন ফিকে গোলাপী রেশমের কাপড় পরা যুবতীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া ছায়ায় সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি যেন কারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন শেষে বাগানের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমিও পুকুরঘাটের পাশ দিয়া চলিলাম। ঘাটের সামনা সামনি আসিতে কার মৃদু আর্ত্তনাদধ্বনি কানে গেল। রাত্রিতে কতরকম আওয়াজের বিকৃতি হয় ভাবিয়া আমি আর দাঁড়াইলাম না। ঘাটের সামনে তক্‌তকে পরিষ্কার জল

ঝক্ ঝক্ করিতেছে কিন্তু স্বরটা মানুষেরই বলিয়া বোধ হইল। যাই হউক আমি একটা আলের কাছে আসিতে আবার কাহার কথা বলবার স্বর কানে গেল। আলের পাশে কলাবন আমি তাহার ভিতর ঢুকিলাম। কলাবনের মধ্যে সরু ফালি জায়গায় কাহারা কথা বলিতেছিল—আমি আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। তারপর দুজনের পোষকে দেখিতে পাইলাম,—ঈষৎ গোলাপী রংএর পোষাক পরা একজন মেয়ে আর অপর জন পুরুষ। তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গিয়াছে। তারই অস্পষ্ট আলোতে দেখিলাম পুরুষটি একটি গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। আর মেয়েটি তাঁর সামনে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া।

পু। ইচ্ছা করলে তুমি আরও আগে আস্‌তে পারতে। চারিদিকে এত লোক। বিপদের ভয় আছে। আমি একটি ঘণ্টা থেকে অপেক্ষা করছি।

যু। "আমি তোমার বারণ করেছিলাম আস্‌তে।" আমি আমার স্ত্রীর বীনাধ্বণির ন্যায় সুন্দর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

পু। "তা বটে।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল আর তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকেও চিনিলাম। এই মেজরদত্ত।

যু। হাসছ যে! বিপদ আমারই বেশী।

পু। মেয়েদের সঙ্গে পারবার যো নেই। দেখা করার দরকার না থাকলে তোমায় ডেকে পাঠাব কেন?

যু। বেশ এখন কি বোল্‌বে বল।

পু। বিশেষ দরকারী কথা আছে।

যুবতী ক্লান্তস্বরে বলিল "তোমাকে সাহায্য কোরতে হবে কেমন এই কথা ত? টাকা চাও?

পু। টাকা নয়। টাকা না হলে আমার চলে, আমি হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারি।

যুবতী বিরক্ত হইয়া বলিল "ঠাট্টা কোরছ? তোমার এ সাজে না। কারাগারের ভাত খাওয়ার চেয়ে হাওয়া খাওয়া ভাল বটে! কি চাই বল? এখনি ওঁরা আমার খোঁজ কোরবেন।"

পু। তোমার ভাবী স্বামী জানতে চাইবেন যে তুমি কার সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলে? কেমন? তা তুমি কিছু বুঝিয়ো আগের মতন। মিথ্যা কথা বল্‌বার ক্ষমতাটা খুব কাজে লাগে। মিথ্যাবাদীদের আমি হিংসা করি তারা এমন সহজে সব বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

পুরুষ চিরপরিচিতের ন্যায় কথা বলিতেছিলেন। তাঁর কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম যুবতীর সহিত তাঁর ঘনিষ্টতা আছে।

যু। মিথ্যাবাদীদের আমি ঘৃণা করি কিন্তু শুধু তোমাকে রক্ষা করবার জন্য ক'বার মিথ্যে বোলতে বাধ্য হোয়েছি।

পু। সেটাতে তোমারও ভালই হোয়েছিল। কিন্তু পরস্পরকে এর কম করে প্রশংসা করবার জন্য আমি তোমায় ডাকিনি।

যু। কেন ডেকেছ শীঘ্র বল। শেষবার এসে বল্লে বিদেশে যাবে গেলে না কেন?

পু। গিয়ে ফিরে এসেছি।

যু। কোথায় গিয়েছিলে?

পু। তাতে তোমার কি! আমাকে ত আর আদর করে বাড়ীতে নেমন্তন্ন কোরছ না।

যু। শত্রুকে নেমন্তন্ন?

পু। আমি তোমার শত্রু? বেশ। আমি জানতাম আমি বন্ধু।

যু। বন্ধু! অপরূপ বন্ধুত্ব! কেবল ষড়যন্ত্র কোরতে আর আমাকে তোমার দূতী কোরতে বাধ্য করা।

পু। আরে চট কেন? সব কাজই ত দুজনের ভালর জন্যে করি।

যু। তা জানতাম না। আমার ভাল চাইলে এমন বিপদের মুখে আমায় তুমি ডেকে পাঠাতে না।

পু। দরকারের জন্য ডেকেছি। তোমাকে সাবধান কোরতে চাই। চিঠি লিখে ত আর তা পারি না।

যু। কেন সাবধান?

পু। জহুরা এখানে এসেছে। এই নামটী আমি আমার মৃত পত্নীর বালিশের তলায় এক টুকরা কাগজে লেখা পাইয়াছিলাম। বুঝি না কিছু ব্যাপার এমনি গুরুতর!

যু। গুরুতর? আরও কিছু ভয়ঙ্কর? আমি কি রকম কষ্ট পাচ্ছি তাত দেখ্‌ছ।

পু। কি কোরবে বল?

যু। কি কোরব জানি না। বছর ভর কেবল কি ক'রে জহুরার কবল থেকে রক্ষা পাব তাই ভেবে আমার অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে গেল। ইচ্ছে হয় গলায় দড়ী দিই।

পু। তা কেন? ছি! একটু চালাক হ'লে মেয়েরা সয়তানকেও প্রতারণা কো'রতে পারে।

যু। সত্যি বল্‌ছি বাঁচতে সাধ নেই। বেঁচে কোন লাভ নেই, মরলেও কারো লোকসান নেই।

পু। মরলে লাভ কি কিছু আছে?

যু। তুমি ত এখন ঠাট্টা করবেই। তুমিই আমাকে এই অন্যায় কাজে জড়িয়ে নিয়ে তোমার কুপরামর্শ শুনে চল্‌তে আমায় বাধ্য কোরছ। আমি তোমায় প্রাণমনে ঘৃণা করি।

পু। নিঃসন্দেহ। আমি তোমার শত্রুতা কিন্তু কখনো করি নি।

যু। কর নি? অতীতের কথা ভুলে গেছ?

পু। যাক্ যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, এখন ভবিষ্যতের সুখের কথা ভাব।

যু। জহুরা এসেছে ত কি কোরতে বল তুমি?

পু। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

যুবতী ভগ্নস্বরে বলিল আমার মনে হয় আমি মরলেই সব চেয়ে, ভাল হয়।

পুরুষ ব্যগ্রস্বরে বলিল কি যে বল? তুমি পরমাসুন্দরী, কোন দুঃখে আত্মহত্যা কোরবে?

যু। বেঁচে কি লাভ?

পু। তুমি সতীশবাবুকে ভালবাস তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

যু। সতীশবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।

পুরুষ সহানুভূতিপূর্ণ তরল কণ্ঠে বলিল "সতীশ তোমায় ত ভালবাসে।"

যু। ওসব কেন বোল্‌ছ?

পু। তোমার কি তাকে পছন্দ নয়?

যু। তাতে তোমার কি?

পু। সে তোমাকে বিয়ের কথা বলে না?

যু। হাঁ, অনেকবার বলছেন।

পু। শেষ কবে বল'ছল?

যু। আজই সন্ধ্যার সময় বোল্‌ছিলেন।

পু। তুমি করতে চাইলে না?

যু। না।

পু। কেন?

যু। কারণ মস্ত বড় বাধা আছে জান না তা?

পু। সেইজন্য নিজের প্রাণ বাঁচাবার উপায় করবে না?

যু। প্রাণ কি কোরে বাঁচবে?

পু। সতীশের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেলে জহুরা আর তোমার কিছু কোরবে না।

যুবতী যেন একটু কিনারা পাইল, সে বলিল ওঃ! এদিক থেকে একথা কখনো ভাবি নি।

পু। বেশ আমার মতে সতীশকে তোমার বিয়ে করা উচিত। তাহলে নিশ্চিন্ত হবে।

যুবতী চুপ করিয়া রহিল। বোধহয় কথাটা ভাবিয়া দেখিতেছিল। তারপর বলিল "বোলছ বটে নিরাপদ হবো কিন্তু সব শত্রুর হাত এড়াতে পারবো না।"

পু। কেন? কাকে ভয়?

যু। তোমাকে।

পুরুষ বিরক্তিভরে বলিল "আমায় অবিশ্বাস কর না?"

যু। আমাকে যে নিজের ইচ্ছাধীন রেখেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি না।

পু। এত বিপদ মাথায় ক'রে তোমায় নিরাপদ কোর্‌তে এসেছি তা ভেবে দেখ।

যু। তার কারণ এই যে তোমার নিজেরও প্রাণের ভয় আছে।

পু। তা নয়। আমি দুটি পথ তোমায় বলে দি। এক সতীশকে বিয়ে করা। দ্বিতীয়—

যু। থামলে কেন ব'লে যাও।

পু। দ্বিতীয় আমার সাহায্য করা। আমি একটা মতলব এঁটেছি। তাতে আর জহুরার প্রতিহিংসা নেবার সা ্য হবে না।

যু। আবার মতলব। কোন্ কুকাজে সাহায্য চাই, যা কিছু পার আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও।

পু। কিছু খারাপ কাজ নয়। ওকে শুধু ঘাবড়ে দেওয়া।

যু। ঘাবড়ে দেওয়া? সয়তানেরও সাধ্য নেই।

পু। কি যে চট্ করে না ভেবেই মত প্রকাশ ক'রে বোস। ওরও কিছু দুর্ব্বলতা থাক্‌তে পারে।

যু। তুমি ওর দুর্ব্বলতার কি জান?

পু। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি নয় ত কি বোল্‌ছি।

যু। তাহলে তুমি যখন আমার বন্ধু তখন সবটা নিজেই কর না? এতগুলো কাজ দুজনে কোরছি এখন সব তোমায় আমি জানি। এখন নিজের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তেও তুমি আমায় সাহায্য কোরবে।

পু। তোমায় কিন্তু সাহায্য কোরতে হবেই।

যু। আমি কোরব না। আমি জানি তুমি আমার সাহায্য ছাড়াও সব খারাপ কাজ কোরতে পার।

পু। জহুরার অপকার করা খারাপ কাজ। জান ত সে তোমায় পেলে এক্ষুণি পায়ের তলায় ফেলে ঠাসে।

যু। আমাকে সে খুঁজে বার করবার আগেই আমি গলায় ছুরি দেবো।

পু। সময় যদি না পাও? আত্মহত্যা কোরতে মনের বলের দরকার।

যু। সে বলের জন্য ভেবো না তুমি।

পু। তোমার কি হোয়েছে আজ?

আমার স্ত্রী উদ্ধতস্বরে বলিলেন "আমি তোমার কথা কি আর শুন্‌ব? তুমি ত জহুরাকে খুন কোরতে বোল্‌বে?"

পু। তুমি ভুল বুঝেছ।

যু। একবার ভুল বুঝেছিলাম। এবার ঠিক বুঝেছি।

পু। এবার দুজনেরই বিপদ। তুমি সাহায্য কোরবে না কি? কোরতে হবে বই কি।

যু। কখনো না।

পু। জহুরাকে থামাতেই হবে।

যু। না থামালে ক্ষতি কি?

পু। আমার তাকে থামাবার একটা উপায় জানা আছে।

যু। তুমি আপনার উপায় দেখ। আমার তাতে কি?

পু। তোমায় আমার সাহায্য কোরতে আমি বাধ্য কোরব।

যু। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গী হ'তে কয়েকবার বাধ্য কোরছ কিন্তু আর না। এবার ও বাঁধন কাটব।

পুরুষ মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল "ওঃ! সে খুব মজা হবে।"

এবার যুবতী কুপিতা ফণীনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল "আমি আত্মহত্যা কোরব।"

পু। তুমি মর্‌লে বদ্‌নাম রটাবার ভার আমি নেব।

যু। মর্‌লে আমার নামে বদ্‌নাম দেবে? ঠিক্ ঠিক্। এবার নিজমূর্ত্তি প্রকাশ কোরেছ। তোমায় আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

পু। এই ত প্রথম শুন্‌ছি না।

যু। হা ভগবান। তোমার বিশ্বে আমার মত হতভাগী কেউ নেই। তোমায় শত ধন্যবাদ মেজর। তুমি আমাকে আমার হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।

পু। কেন তোমার বন্ধুরা তোমায় ত খুব ভালবাসে। তাদের মধ্যে তোমার সুনামও ত যথেষ্ট।

যু। আমি বালির স্তূপে দাঁড়িয়ে। যেদিন সতীশবাবু সব জানবেন কি বোলবেন?

২

পু। অত তুমি ভেবো না। পরে পস্তাবে। অত বেশী স্বামীর সুখের কথা ভাবলে সে তোমার দিকে তাকাবে না।

যু। আমার এ অবস্থার জন্য তুমি দায়ী। সংসারের লোক জানে আমি সরল বালিকা কিন্তু যেদিন সত্যি কথা প্রচার হবে, সে দিন? হে ভগবান আমার মৃত্যু ভাল?

পু। মেয়েদের ঘ্যান ঘ্যান করবার ক্ষমতা অদ্ভুত। এরকম বাগযুদ্ধে কি লাভ? বরং এসো জহুরার বিরুদ্ধে দু'জনে পরামর্শ করি।

যু। আমি কোরব না।

পু। কিন্তু কি রকম গুরুতর ব্যাপার জাননা ত? যদি সে তোমাকে খুঁজে পায়?

যু। কি হবে? সোজাসুজি বল, বেশী ঘোর প্যাঁচ কোর না তুমি ওকে ভয় কর?

পু। পৃথিবীতে আমরা ছাড়া শুধু সে আমাদের কথাটা জানে তাই তাকে ভয় করি।

যু। তুমি তাকে মারবার মতলব এঁটেছ।

পু। কথাটা যদি সত্যই হয়?

যু। তা হলে এই শেষবার বোল্‌ছি আমি কিছু কোর্‌ব না।

পু। এই যে তোমার শেষ মন্তব্য এর জন্য তোমায় পস্তাতে হবে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌ছ।

যু। বেশ সে আমি বুঝব। কিন্তু আজ থেকে আমি তোমার কোন বদ্‌ মতলবে নেই। আজ রাত্রে একটু আরামে ঘুমতে পারবো।

পু। বেশ দেখা যাবে।

যু। সহসা বেগে গৃহের দিকে চলিল, পুরুষও তাহার অনুসরণ করিল। অগত্যা আমিও অনুসরণ করিলাম। কিছু দূরে দেখিলাম পুরুষমূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া যুবতীকে ব্যগ্রভাবে কি বলিল, কিন্তু পাছে আমার উপস্থিতি ধরা পড়ে সেই ভয়ে আমি কাছে গেলাম না। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার স্ত্রী অদৃশ্য হইয়া গেল আমিও বাসায় ফিরিলাম। প্রভাতে হোটেলওয়ালা বলিল "শুনেছেন খুন হোয়েছে।"

"কোথায়?"

"রাজবাড়ীর বাগানে।"

"রাজবাড়ীর বাগানে খুন?"

আমি নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে।

হোটেলওয়ালা উত্তেজিত স্বরে বলিল "রাজা বাহাদুর খুন হোয়েছেন।"

"রাজা বাহাদুর? অসম্ভব।"

"না না সত্যি সত্যি। অদ্ভুত ব্যাপার। সকাল ৪টায় তাঁর লাস পাওয়া গেছে।"

আমি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করায় সে বলিল "পুলিশ সার্জ্জেণ্ট এখুনি চা খেতে এসে সব বোলছিলেন। একজন লোক সকালে পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে দেখে রাজা সেখানে প'ড়ে আছেন। তখন লোকজন ডাকাডাকি করে। তাঁকে কেউ খুন কোরেছে। পুলিশ সার্জ্জেণ্ট বোলছিলেন পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঘাটের উপর ফেলে দেওয়ায় প্রাণ বেরিয়েছে। ঘাটের ওপর ধ্বস্তাধ্বস্তিরও চিহ্ন আছে নাকি। একজন ডাক্তার ডাকা হোয়েছে তিনি বোলেছেন খানিক আগেই প্রাণ বেরিয়েছে। এ অঞ্চলে রাজার শত্রু কেউ ছিল না তবে খুব ভালবাস্‌ত না আর রাণীকে কেউ পছন্দ করে না। আপনি ত বাগানে যান নি জায়গাটা বুঝতে পারবেন না, চলুন না, আমার সঙ্গে দেখে আস্‌বেন।"

এতক্ষণে আমার চেতনা হইল। ভাগ্যিস কাল রাত্রে হোটেলয়ালার তার বোনের কাছে নিমন্ত্রণ ছিল, নয় ত অতরাত্রে চাষার সাজে ফিরিতে দেখিলে না জানি আমার কি দশা হইত। যাহা হউক মতি স্থির করিয়া তাহার সঙ্গে বাগান দেখিতে বাহির হইলাম, পথে সে অনর্গল বকিয়া চলিল। সে বলিল "রাজার শত্রু ত কেউ নেই তবে রাণী, যেন কেমনতর। পৃথিবীর সবারি সঙ্গে রাণীর বন্ধুত্ব কেবল রাজা ও রাজার ছেলের সঙ্গে ছাড়া। বড় ঘরের ব্যাপার বোঝা ভার। প্রথম রাণী রাজকন্যা ছিলেন। এঁর বংশের কাউকে লোকে জানে না। দেখুন পুলিশেরা যদি কিছু বুঝতে পারে।"

আমরা পুকুর ঘাটে গেলাম। কাল এই ঘাটেরই পাশ দিয়া যাইবার সময় মানুষের আর্ত্তনাদ-সূচক বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়াছিলাম। বোধহয় রাজাকে মরিবার জন্য আততায়ীরা লুকাইয়াছিল। তারা হয় ত আমাকে রাজা মনে করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল ওঃ! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি। একজন পুলিশ কনষ্টেবল জলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছিল সে বলিল রাত্রে রাজা ঘরে শুইয়াছিলেন কিন্তু মৃতদেহে ত সন্ধ্যারই পোষাক। খানিক পরে জানিলাম যে তাঁর সার্টের বহুমূল্য হীরকের বোতামগুলি চুরি গিয়াছে। তাহা হইলে চুরির উদ্দেশ্যেই রাজাকে খুন করা হইয়াছে। কিন্তু রাত্রে এমন নির্জ্জন স্থানে বাড়ী হইতে এতদূরে রাজা কি করিতেছিলেন যাহা হউক বেলা কোথায় দেখ। যাউক। আমি আমার স্ত্রীর প্রথম নমটিই বলিব কারণ সেই নামেই তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশনে গেলাম; শুনিলাম কয়েকজন মহিলা কলিকাতা গিয়াছেন। বেলা তাহা হইলে চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে পুলিশ ইনস্পেক্টর বরাটের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি কলিকাতা হইতে ডিটেক্টিভ পাঠাইবার জন্য তার করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কাছে এই আততায়ীদের সন্ধান নিবার অনুমতি চাহিয়া আমাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে কাজের ভার যে ডিটেক্‌টিভদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহারা অনুমতি দিলে কাজ করিতে পারি তারপর আমি কে, কোথায় থাকি, কি করি সব খবর নিলেন। পরদিন যথাসময়ে ডিটেক্‌টিভেরা আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার ও পুলিশ ইনস্পেক্টর সমস্ত ঘটনাটি প্রধান ডিটেক্‌টিভকে বুঝাইয়া তাঁহার হাতে কাজের ভার সমর্পণ করিয়া আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন "এই ভদ্রলোক আপনাদের সাহায্য কোরতে চান। ইনি একজন বড় ডাক্তার।" প্রধান ডিটেক্‌টিভ বলিলেন "অচেনা লোকরা অনেক সময় সব মাটি করে দেন তাই আমার আপত্তি।" আমি খুব সাবধানে কাজ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় তিনি তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবার অনুমতি দিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

ক্ষণিক সঙ্গীত।

—:০:—

আমার এ গান তব চরণ-তলায়
ঝরে-পড়া কুসুমের প্রায়
দিনেকে শুকায়।

তবু সে যে বিকশিয়া দিনেকের তরে
তব দুটি চরণের 'পরে
পড়িয়াছে ঝরে

তোমার পরশ-আশী চুম্বন-উন্মুখ
অবশিত দুরু দুরু বুক,—
এই তার সুখ।

সে যে শুধু একদিন আবরি চরণ
বিরচিয়া চারু আভরণ
লভেছে মরণ,

এই তো গরব তার, আর কিবা চাই?
পায়ে তব লভিয়াছে ঠাঁই,
ধন্য সে যে তাই।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:*:—

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান —কারাগার, সময়—রাত্রি, আকাশ গাঢ় মেঘাবৃত, মাঝে মাঝে
বিদ্যুৎ স্ফুরণ ও মেঘ গর্জ্জন। জাহান শৃঙ্খলাবদ্ধ পিঞ্জরে।

জাহান। জাহাঙ্গীর আমার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়ে খাঁচার পাখী করেছে, ভেবেছে বড়ই শাস্তি দিয়েছি। এ দুনিয়াটাই যে একটা বড় খাঁচা সে কথাটা কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না। বড় মজা সবাই আমরা খাঁচার পাখী কিন্তু এ খাঁচায়ই বসে কেউ বা গায়, কেউ বা হাসে আর কেউ বা চোখের জল ফেলে। (বিদ্যুৎ স্ফুরণ ও গর্জ্জন) উঃ—কি গর্জ্জন! কি আলো! বুঝেছি শিকার আরম্ভ হয়ে গেছে। ঐ যে আবার গর্জ্জন—মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়ে দুষমনটা আবার শিকারে মেতেছে,—হাতে তার শাণিত কৃপাণ, মুখে ক্রুর হাসি। (বিদ্যুৎ) ঐ যে আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে কৃপাণের উজ্জলতা ঝলসে উঠ্‌ছে, ওর সঙ্গে—তোমার ঐ নিষ্ঠুর কুটিল হাসির খর দীপ্তিটাও মিশিয়ে দিয়েছ?—আমায় ভয় দেখাচ্ছ? কে আছ? আমায় তরবারী দিয়ে যাও, এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা!

(হাতের শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল)

(লয়লার প্রবেশ)

লয়লা। জাহান!

জাহান। কে—কে তুমি?

লয়লা। চিন্‌লে না জাহান? আমি লয়লা।

জাহান। (একটু চিন্তিত ভাবে) লয়লা। এখানে কেন?

লয়লা। তোমায় মুক্ত করতে এসেছি।

জাহান। কি, মুক্ত করতে? মুক্তি কোথায়? এ সংসার একটা ভীষণ কারাগার, এর বাইরে একটা স্থান দেখিতে দিতে পার, যেখানে এ আলো, এ বাতাস, প্রবেশ করতে পায় না, যেখানে ঘৃণা নেই—ভালবাসাও নেই, শ্রদ্ধা নেই, ভক্তিও নেই—হৃদয় এ শৃঙ্খলের মত শীতল, অসাড়, নিস্পন্দ।

লয়লা। জাহান! বেড়িয়ে এসো। (কারাগারের দরজা খুলিয়া দিয়া) এই যে দরজা খুলে দিয়েছি—চলো যাই।

জাহান। আমায় জাহান্নামের পথ যদি কেউ বলে দিতে পার তবে তাই দাও আমি সেখানেই যাব আর কোথাও না। (বিদ্যুৎ বিকাশ) এই ঝলসিত বিদ্যুতালোকের মাঝে দাঁড়িয়ে কে তুমি? সত্যই কি তুমি লয়লা আমার প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্ন, আমার হৃদয়বীণার প্রথম ঝঙ্কার, আমার যৌবন বসন্তের প্রথম পুষ্প—লয়লা! লয়লা! আজ কেন এসেছ? প্রত্যাখ্যাত জাহানের বেদনা-কাতর মুখের পানে চেয়ে তোমার ঐ বিশ্বভোলানো হাসিটুকু হাস্‌তে?

লয়লা। আর না, জাহান! থামো মিনতি করি। দেরী করো না চলো (প্রহরীর প্রবেশ ও সেলাম করণ) ঐযে প্রহরী বলছে আর সময় নেই চলো।

জাহান। এ মিনতি কেন, লয়লা? আজ দয়া করে আমায় মুক্ত করতে এসেছ? আমি ত দয়া চাই নি। অভিনয় আমার শেষ হয়ে গেছে, তবে আর কেন?

লয়লা। চলো, জাহান! ঐ যে এখনি তারা এসে পড়বে—চলো।

জাহান। না, লয়লা! তুমি ফিরে যাও আমি যাব না।

লয়লা। সত্যি তুমি যাবে না? (কারাগৃহের লৌহদণ্ডগুলি ধরিয়া তদুপরি মস্তক স্থাপন করিয়া লয়লা দাঁড়াইয়া রহিল ও কিছুক্ষণ এ ভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিল।) জাহান! তোমায় আমি ভালবাসি।

জাহান। নিষ্ঠুর নারী! আজ উপহাস করতে এসেছ? একদিন উপেক্ষার দাবানলে আমার জীবনটাকে ছারখার করে দিয়ে আজ এসে বলছ "জাহান! তোমায় আমি ভালবাসি। পরিহাস! তীব্র পরিহাস!

লয়লা। না, জাহান! সত্যি—বলছি—।

জাহান। লয়লা! আজ তোমার ও সত্যমিথ্যায় আমার কিছু আসে যাবে না। পাহাড়ের শিখরের উপর দাঁড়িয়ে আছি—পায়ের নীচে পাতালস্পর্শী তমোময় প্রকাণ্ড গহ্বর হাঁ করে আমায় গ্রাস করবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই উদ্যত হয়ে আছে—আর তুমি এখন আমার ভালবাসার কথা বলতে এসেছ। বলো আজ জাহান! তোমায় আমি ঘৃণা করি তবেই আমি সুখে মরতে পারব।

লয়লা। জাহান! কি বলে তোমায় আজ বোঝাব, বলে দাও ওগো কি করে তোমায় বোঝাব? ঐ যে প্রহরী বলছে সময় শেষ হয়ে গেছে—কি আর করব যাই। জাহান! তোমায় আর ফেরাতে পারলুম না।

(জাহানের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে লয়লার প্রস্থান।)

পটপরিবর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—মেবার জয় সমুদ্রের তীরস্থ প্রাসাদের কক্ষ। কক্ষের সম্মুখে জয়সমুদ্র হ্রদ সূর্য্যাস্তের লোহিত রাগে—পশ্চিম আকাশেও গগনাঞ্চলচুম্বী হ্রদের শান্তবারি রাশি অনুরঞ্জিত রাণা অমরসিংহ পশ্চিম আকাশকে সম্মুখে রাখিয়া উপবিষ্ট। মহারাজ অজিতসিংহ ও জয়সিংহ পূর্ব্ব দিকে মুখ রাখিয়া আসনে উপবিষ্ট।

অমরসিংহ। মহারাজ অজিতসিংহ! মোগলের সৌভাগ্য আকাশ ক্রমশঃই গাঢ় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বর্ত্তমান মোগল সম্রাট ফরুকসিয়ার ঔরঙ্গজেবের উপযুক্ত বংশধর! সিংহাসনে বসেই কিনা ঔরঙ্গজেবের প্রদর্শিত জঘন্য রাজনীতির অনুসরণ করে রাজভক্ত রাজপুতজাতির উপর মুণ্ডকর স্থাপন করতে সাহসী হয়েছেন। এখন কি কর্ত্তব্য বলুন? মাথাপেতে এ অবমাননা সহ্য করবেন, না এ অধীনতা পাশ হতে মুক্ত হবার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করবেন? রাজভক্ত রাজপুত হাঁ, এ রাজভক্ত নামটা কেনবার জন্য অনেক ত্যাগ অনেক অপমান স্বীকার করতে হয়েছে।

জয়সিংহ। আপনার আদর্শ জাতি গঠন একটা স্বপ্ন বই কিছুই নয় এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, মহারাণা? আমি পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে মোগলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন মহারাণা! এ মুণ্ডকর আমাদের পবিত্র রাজ-ভক্তির শোচনীয় পুরস্কার!

অজিতসিংহ। অম্বররাজ! যে আদর্শ সম্মুখে রেখে—আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছিলাম আমার আজও বিশ্বাস যে আমার সে আদর্শ—স্বপ্ন নয় একটা প্রকাণ্ড বাস্তব। আমার বিফলতায় আমার আদর্শের গৌরব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, মহারাণা।

অমরসিংহ। আপনার এ কথা খুবই সত্য কিন্তু রাজনীতির প্রথম উপদেশটী এই যে ব্যবস্থা যেন সময়োপযোগী হয় তা পূর্ব্বেই দেখতে হবে। আপনি বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে পারেন নি তাই আদর্শ সত্য হয়েও আপনি বিফল হয়েছেন।

অজিতসিংহ। মহারাণা! আমি বিফল হয়েছি হৃদয় নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধতায় ভরে উঠেছে হাহাকারের প্রতিধ্বনি দিক্‌প্রান্তে মিশে গেছে; কিন্তু তবুও যেন মনে হয় এর একটা সার্থকতা আছে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সংগঠনে যুগে যুগে যে মহতী চেষ্টা সমাবদ্ধ হয়েছে—আমরা এ ক্ষুদ্র প্রয়াস তারই অন্তর্গত। হায়! কোন সুদূরে—আমার এ স্বপ্নলোক পৃথ্বীর আলোকে আলোকিত হবে? (সম্মুখে উদাস ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হবে, সত্যই হবে। জয়সিংহ! আজ হয় নি বটে কিন্তু দু তিন শত বছর পরে।

অমরসিংহ। যাই বলুন, মহারাজ! এ অপমান আর সহ্য হয় না। মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে আমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। অম্বররাজ! আপনার কি মত?

জয়সিংহ। আমারও সেই ইচ্ছা, মহারাণা।

অমরসিংহ। এই তোর ঠিক উপযুক্ত সময়। গুরু নানকের মহামন্ত্রে দীক্ষিত বিক্রান্ত শিখজাতি পঞ্চনদতীরে আপনাদিগকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। বিশাল দক্ষিণাপথে দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা যোগী দলপতির অধীনে আপনাদের কঠোর যথেচ্ছ লুণ্ঠন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা, তাতে আবার গৃহবিবাদ। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংশ অনিবার্য্য। এ বিধাতার কঠোর বিধান অজিতসিংহ। এ অলঙ্ঘনীয়।

অজিতসিংহ। মহারাণা! আমিও দেখতে পাচ্ছি যে পতন এর সুনিশ্চিত। আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। দেখলাম সম্রাট ফরাকসিয়ার অপরিণত বুদ্ধি তরুণ যুবক মাত্র। হোসেন আলিখাঁ আর আবদুল্লা খাঁ নামে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সম্রাট তাদের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি স্বরূপ। এই জঘন্য জিজিয়াকরের নিমিত্ত—সম্রাট দায়ী নন। দুরাত্মা

সৈয়দ দিল্লীর মাটী রাজরক্তে রঞ্জিত করেছে—আর ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করে রাজ্যশাসন করছে।

অমরসিংহ। আমাদের সেই ত্রিবলাত্মিকা সন্ধিপত্র আবার নূতন করে স্বাক্ষর করতে হবে। (সন্ধিপত্র দেখাইয়া) এই যে! এবারকার প্রধান সর্ত্ত এই যে রাজপুতনা আজ হতে স্বাধীন। এই ত্রিবলের মধ্যে কেহই মোগলের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারবে না, দরকার হলে বিপক্ষতাচরণ করে আপনাদের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করবে। আর ঐ অবমাননার নিদর্শন "জিজিয়া" কর্ আমরা আর বহন করব না! এই নিন স্বাক্ষর করুন (জয়সিংহকে প্রদান।)

জয়সিংহ। এত দিন পরে আমরা কর্ত্তব্য অবধারণ করতে পেরেছি।

(স্বাক্ষর করা ও পরে অমরসিংহকে প্রদান)

অমরসিংহ। এই নিন্ মহারাজ—

(অজিতসিংহকে প্রদান)

অজিতসিংহ। (স্বাক্ষর করিয়া মহারাণা অমরসিংহকে প্রদান) তবে এখন ওঠা যাক্, কি বলেন।

অমরসিংহ। হাঁ, সন্ধ্যা হয়ে এল। দেখেছেন অম্বররাজ! রক্তাক্ত বীরের মত সূর্য্যদেব কেমন পশ্চিম আকাশে নুয়ে পড়েছেন।

জয়সিংহ। মহারাণা! ঐ পূবদিকে চেয়ে দেখুন দিকবলয়ের ধারে চন্দ্রদেব কেমন হাসি হাসি মুখে নিশার আগমন প্রতীক্ষা করছেন, এ সন্ধ্যা বড় আশ্চর্য্যের।

অজিতসিংহ। হাঁ অম্বররাজ! এ সন্ধ্যা বড়ই আশ্চর্য্যের—এ মোগলসন্ধ্যা,—একের পতন অপরের উত্থান—এ ঠিক যেন সঙ্গীতের লয়, সাগরে তরঙ্গের খেলা। মোগলের সৌভাগ্য রবি ঐ অস্তমিত আর ও কার উদয় কে জানে—এ কি হিন্দুর!

পটপরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী সমাধিক্ষেত্র। কাল—রাত্রি, আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। লয়লা এক অঞ্জলি ফুলের মালা লইয়া জাহানের সমাধি মন্দিরের নিকট দণ্ডায়মানা।

গান।

লয়লা।

ছিন্নমুকুল ধূলি শয়ান আঁধার ঘন
আকাশ ভূবন
থেমে গেছে গান নিখিলেরি বীণে
রেখে গেছে রিশ প্রাণের কাঁদন
অজানার দেশে গেছে প্রিয়তম
শুনি,—সেথা নাই বিরহ মরণ
ভাল বাসা বাসি বাঁশি হাসিরাশি
মরণে দুজনে মধুর মিলন।

ব্যথা, ব্যথা—শুধু ব্যথায় ভরা আমাদের জীবন। যা চাই পাই না, যা পাই তাও আবার হারিয়ে ফেলি,—এ ব্যথা বড়ই গভীর। চোখে জল এনে দেয় না, উচ্ছ্বসিত কান্না এসে কণ্ঠকে অবরোধ করে না,—তবুও এ ব্যথা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার ম্লানিমাটুকুর মত করুণ, একটা ব্যর্থতার আলোয় জীবন কেমন ব্যথিয়ে ওঠে।

জাহান! জাহান! আমার এ আহ্বান কি জীবন-নদীর ওপারের আকাশটাকে আলোড়িত করে' প্রতিধ্বনি জাগাতে পারবে? কত দূরে তুমি চলে গেছ কত দূরে! এত বড় একটা প্রাণ নিরাশার ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে কত মহৎ, কত বড়। এ পারে বসে সময়ের ঢেউগুলি গুণে গুণে দিন কাটাচ্ছি আর শুধু ভাবছি কবে ওপারে গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিলিন হবে। সে মিলনের বারতা তোমায় জানাবার জন্য এ মালাটী আজ তোমায় দিতে এসেছি, গ্রহণ করবে কি? এই নাও (বলিয়া জাহানের সমাধির উপর মাল্য স্থাপন) জাহান! কৈ কণ্ঠে ত বল পাচ্ছি না—তোমার এ নিদ্রা কি করে আজ এ পার থেকে আমি ভাঙ্গাব? দুঃখের জীবন। আমার মত দুঃখিনী আর কে আছ এ সংসারে?

(লালকুমারীর প্রবেশ)

লালকুমারী। আছে বই কি? তোমার চাইতে অনেক বেশী দুঃখিনী, দেখবে? এই যে।

লয়লা। কে ? দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী ইমতিয়াজ ?

লালকুমারী। হাঁ। কিন্তু সে একটা স্বপ্ন দুদিনের জন্য আমায় সুখের আবেশে ডুবিয়ে দিয়ে কোথায় যেন সরে পড়েছে। কোথা হতে একটা ঝড়ো হাওয়া এসে আমার রঙীন; উজ্জ্বল আশার দীপ্তিতে ঝলমল প্রভাত-শিশির-বিন্দুটীকে এক নিমিষে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এ জীবনে কত বিচিত্রতার খেলাই দেখলুম—কখনো জাগরণ আবার কখনও—বা স্বপ্ন। এ যদি শুধু স্বপ্নই হোত, লয়লা। কত শত কল্পনার ফুল বাস্তব হয়ে গন্ধে স্পর্শে রূপে আমার এ জীবন সরোবরে—ফুটে উঠেছিল—আজ সরোবর শূন্য একটীও নেই, সব ঝরে পড়েচে। জন্মেছিলাম সেই সুদূর ইরাণের—নিভৃত ছায়াশ্যামল পল্লী গেহে, —আর এসেছিলাম বিলাসের কুসুম-শয়ন ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন দিল্লী নগরে সেই প্রথম যৌবনের এক অস্থির উন্মাদনায়. নবীন প্রেমের আকুল আহ্বানে, আর অদৃষ্টের কুটিল ইঙ্গিতে। রূপ যৌবন আর দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির বলে আমি এ ভারত জোড়া সম্রাজ্যটাকে শাসন করবার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলুম—কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সে রূপ, সে যৌবন এখনও কুসুমিত লতার মত আমায় জড়িয়ে রয়েছে—সে আশা এখনও বাড়াবাগ্নির মত দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে, তবে আমার সাম্রাজ্য দুটো অকস্মাৎ ছায়াবাজির মত ক্ষণিকের খেলা দেখিয়ে অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেল কেন ? দু দুটো সম্রাজ্য—আমার হয়েছিল। গেল দুটো একই সঙ্গে। যদি একটা থাকত। দিল্লীর সাম্রাজ্য শুধু যদি যেত ভাল, কিন্তু যে হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী আমি ছিলুম তা হারালুম কেন ? জাহান্দার, নাথ।

(জাহান্দারের সমাধির উপর মস্তক স্থাপন করিয়া—অবস্থান)

লয়লা। তাই বলছিলাম ব্যথাই জগতের প্রাণের সুর। জীবন একটা বিয়োগান্ত নাটক।

যবনিকা পতন ॥

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।
ও
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গান।

—:০:—

আপনার চরকায় তেল দাও মন,
আপনার চরকায় তেল দাও।
আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম
তা কেন রে ভুলে যাও।
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা
আপন মিনি পায় পোত্তি কোথা ;
কত্তে খুড়োর গঙ্গা যাত্রা
(কেন) বাপ মায় ভাগাড়ে ফেলে দেও।
ভেবে ভেবে পর ভাবনা
আপনার পায় কুড়াল মে'রনা ;
কত্তে গিয়ে পরের ধান্ধা
ইষ্ট নাম কেন ভুলে যাও।
সুখের সময় বন্ধু কত
দুঃখের ভাগী কে ব'ল ত ?
তুল্‌তে গাছে অনেক আছে
নামায় না কেউ জেনে নেও।
ছাড় অসার বাছ বিচার
লও ভেতরগাঁর সমাচার
আপ্ ভালাসে জগৎ ভালা
এইটু ভেবে বুঝে নেও।

গায় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা
দেখ্‌ছ স্বপন লাখ টাকা ;
বর্ষা এল টাপুর টুপুর
এই বেলা কুঁড়ে ছেয়ে নেও।
হলে আপন ন চাঙ্গা
কটোরা মে পাবে গঙ্গা।
ছিঁটে ফোঁটা মুখের কথা
আড়ম্বর সব শিকে থোও।
কোত্তে কোত্তে পর জল্পনা
দিন আঁখিরী হয় দেখ না ;
আসল কাজটা গুছিয়ে নিয়ে
নিজের দিনতো কিনে নেও।
ডুবে ডুবে যে জল খায়
শিবের বাপেও টের না পায়।
কথায় চিড়ে ভিজ্‌বে না ভাই
চোখের জলে কামিয়ে নেও।
—গেলে চ'লে বামুন ঘরে
কে ব'ল্‌না আর লাঙ্‌ল ধরে ;
পরের মুখে ঝাল খেয়ে না
যাচাই ক'রে বাজিয়ে নেও।

পড়েছে যে চিড়ের ফেরে
কার সাদ্ধি তায় উদ্ধার করে ;
দুষ্টে দূরে পরিহরে
চাচা তো আপ্‌নি বাঁচ'ও।
হ'য়েছে যে দিশেহারা
উত্তর যেতে যায় দক্ষিণ পাড়া ;
গাঁয় মানে না আপ্‌নি মোড়ল
কেন মিছে সাজ্‌তে চা'ও।
আপনার বেলা আঁটিশুটি
পরের বেলা দাঁত কপাটি ;
আপন পেটে ময়লা ভ'রে
পরগায় গন্ধে নাক সেঁক্‌টাও।
যার জন্যে কর চুরি
সেই চোর ব'লে দেয় পায় বেরী ;
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি
কে কার আর সেই এক বই পাও।

দীনসেবক—ব্রহ্মানন্দদাস।

রাজতরঙ্গিণী।

—ঃ০ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় তরঙ্গ।

মাতৃগুপ্তের মানসিক উৎকণ্ঠার অবধি না থাকিলেও পথাতিক্রমণে তিনি শ্রান্তি অনুভব করেন নাই। পথি মধ্যে নানা শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার মন উৎফুল্লিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন ফণিনীর ফণায় খঞ্জনপক্ষী অবস্থান করিতেছে। অশেষ শাস্ত্রদর্শী কবি মাতৃগুপ্ত এইরূপে বহু শুভ লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আশান্বিত হইলেন এবং দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে মহারাজের আদেশপত্র তাঁহার পক্ষে শুভদ হইবে। তাঁহার মনে হইল কাশ্মীর যদ্যপি আমি যৎসামান্য পুরস্কারও প্রাপ্ত হই তাহা হইলেও অন্য দেশের তুলনায় তাহা মূল্যবান বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পথি মধ্যে তাঁহার অন্য প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামীগণ তাঁহাকে সমাদরে আশ্রয় দান করিয়া ও অতিথিসৎকারে তাহার পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হয় নাই, এই প্রকারে বহু পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষ বনস্পতিবহুল বায়ু কম্পিত পত্ররাজি সুশোভিত বৃক্ষরাজিতে শোভায়মান ও মাঙ্গলিক দধি সমুদ্রবৎ শুভ্র হিমগিরি তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। বৃক্ষের রস গন্ধ গঙ্গাবারি-শিকরস্নাত মৃদু হিল্লোল মাতৃগুপ্তের নিকট অতি পরিচিত অন্তরঙ্গ বলিয়াই মনে হইল। যেন তাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই তথায় অবস্থান করিতেছে। ক্রমাবর্ত্তী প্রদেশে পদার্পণ করিয়া তিনি কম্বু নামক সুবৃহৎ ঢক্কা দেখিতে পাইলেন। এই ঢক্কা এক্ষণে সুরপুরে রক্ষিত আছে। অতঃপর মাতৃগুপ্ত বহু জনপূর্ণ ক্রমাবর্ত্তে লোকমুখে অবগত হইলেন যে কাশ্মীরে প্রধান মন্ত্রীগণ তথায় কোন কারণ বশতঃ অবস্থান করিতেছেন। তিনি পথিকের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞাপত্র প্রদান করিতে মন্ত্রিগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহাতেও শুভচিহ্ন সূচিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্য অভ্যুদয়ের সূচনা করিল। কতিপয় পথিক সেই শুভচিহ্নের পরিণাম দর্শন করিতে

তাঁহার অনুগামী হইল। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের দূত সমাগত হইয়াছেন শুনিবামাত্র দ্বারপালগণ ক্ষিপ্রপদে মন্ত্রীগণের নিকট তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। 'আগচ্ছত প্রবিশত,—আসুন প্রবেশ করুন' চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ অনুরোধ অভ্যর্থনা লাভ করিয়া অন্তরদ্বারে মাতৃগুপ্ত সামন্তগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র মন্ত্রীগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে তাঁহার যোগ্য সৎকার ও সসম্মান সমাদর করিলেন। মাতৃগুপ্ত তাহাদের নির্দ্দেশানুসারে মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইলে মন্ত্রিগণ অতি বিনীতভাবে তাঁহার প্রতি যথা সম্মান প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয় এক্ষণে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করুন।'

মাতৃগুপ্ত অত্যধিক সমাদরে যেন লজ্জিত হইয়াই মহারাজের আদেশপত্র তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। মন্ত্রিগণ প্রভুর আদেশপত্র পাঠ করণের উদ্দেশ্যে সকলে এক নিভৃতস্থানে গমন করিলেন। পত্র পাঠে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া সত্বর মাতৃগুপ্ত সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিনয়াবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনার নামই কি মাতৃগুপ্ত?"

মাতৃগুপ্ত ঈষৎ হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন "হাঁ, মহাশয়, আমারই নাম মাতৃগুপ্ত।"

মন্ত্রীগণ কাল বিলম্ব না করিয়া অভিষেক বস্তু সমূহ আনায়ন করিলেন। তাঁহাদের তৎপরতা দেখিয়া মনে হইল রাজ-অভিষেকের দ্রব্য-সম্ভার যেন পূর্ব্বে হইতেই সংগৃহীত ছিল। বায়ু বিতাড়নে সাগর যেমন উদ্বেলিত চঞ্চল হইয়া নানা প্রকার শব্দের সৃষ্টি করে অসংখ্য জনসঙ্ঘ তদ্রূপ অভিষেকোৎসবে আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া কোলাহলে স্থানটি মুখরিত চঞ্চল করিয়া তুলিল। অতঃপর মন্ত্রিগণ ও সামন্ত সমূহ সমবেত হইয়া মাতৃগুপ্তকে সুবর্ণ নির্ম্মিত মঙ্গলপীঠ রাজোচিত আসনে বসাইয়া অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করিলেন। অভিষেক-সলিলধারা মাতৃগুপ্তের শিলা-বৃঢ়বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত বক্ষে রেবা নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া ধরণী বক্ষে প্রবহমানা হইল। সে এক অপূর্ব্ব শোভা। এই রূপে আস্নাত, সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলেপিত ও বহু রত্নঅলঙ্কার মণিরত্নে বিভূষিত, করিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিল এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল, মহারাজ আমরা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট কাশ্মীরের সংরক্ষণ পালনের জন্য জনৈক মহামনা শাসন কর্ত্তা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সম্রাট বিক্রমাদিত্য, মহোদয়কে বহুগুণ সম্পন্ন ও কাশ্মীরের ন্যায় ভূস্বর্গ শাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত

স্থানে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মহাশয় এক্ষণে আমাদিগের এই রাজ্য পালন করুন। জীব যদিও নিজ কর্ম্মফলে জন্ম লাভ করে তথাপি পিতা মাতাই তাহারা জন্মের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। নিজ কর্ম্মফলে রাজ্যলাভ করিলেও অন্য ব্যক্তিগণও বাহ্যতঃ সেই রাজ্যলাভের কারণ বলা যায়। অদৃষ্টই যখন মূল তখন আপনি কাহারও নিকট বিনয় প্রদর্শনে তিনি আপনার এই সৌভাগ্যের কারণ এইরূপ বলিয়া কখন নিজকে বা আপনার এই মন্ত্রিগণকে লঘু করিবেন না।"

মন্ত্রিগণ এইরূপ নিবেদন করিলে রাজা মাতৃগুপ্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন এই সমস্ত অদ্ভুত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সমাদার ও সম্মান তাঁহার সর্ব্ব-সৌভাগ্যের মূল মহারাজা বিক্রমাদিত্যেরই প্রাপ্য ও তাহা স্মরণ করিয়াই বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল মাত্র মৃদু হাস্য করিলেন।

রাজা মাতৃগুপ্ত আত্ম সৌভাগ্যকে সম্মানিত ও প্রকট করিতে অকাতরে ধনরত্নাদি দান করিয়া সেই স্থানে সেই দিন নানা মঙ্গল উৎসবে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট নগর প্রবেশের প্রার্থনা করিলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার রাজ্যদাতা বিক্রমাদিত্যের নিকট নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। উপঢৌকন প্রদান কালে তাঁহার মনে হইল পাছে মহারাজা বিক্রমাদিত্য উপহার প্রাপ্তে বিবেচনা না করেন যে নবরাজ্যের ঐশ্বর্য্য উজ্জয়িনীর ঐশ্বর্য্যের তুল্য তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন রাজা মাতৃগুপ্ত প্রভু বিক্রমাদিত্যকে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আশঙ্কা মাতৃগুপ্তকে লজ্জিত করিল। তিনি তখনই কতিপয় ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া তাহাদের হস্তে অতি অল্প মূল্যের অথচ প্রচুর পরিমাণে উত্তম ফলাদি বিক্রমাদিত্যের নিকট পুনঃ প্রেরণ করিলেন, যেন বলিয়া দিতে মাতৃগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই নহেন, সেবক সম্রাটের নিত্যব্যবহারযোগ্য খাদ্য লইয়া তাঁহারই সমক্ষে সমুপস্থিত।

মাতৃগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অলৌকিক গুণরাশি স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; এবং একটি শ্লোক রচনা করিয়া জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা প্রভু বিক্রমাদিত্যের সকাশে প্রেরণ করিলেন।

নাকারমুদ্বহসি নৈব বিকত্থসে ত্বং
দিৎসাং ন শূবয়সি সুচয়সি সৎফলানি।
নিঃশব্দবর্ষণমিবাম্বুধরস্য রাজন্
সংলক্ষ্যতে ফলত এব তব প্রসাদঃ॥

হে রাজন্! আপনার অন্তরের ভাব কোনরূপ আকারে প্রকাশ করেন না, কোন বিষয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেন না, দানের অভিলাষ প্রকাশ না করিয়া উত্তম ফল দান করেন জলদের নিঃশব্দে বারিবর্ষণের মত আপনার প্রসাদ কেবল ফলের দ্বারায় সংলক্ষিত হয়।

মাতৃগুপ্ত অতঃপর বিশাল সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজধর্ম্মানুসারে কাশ্মীররাজ্য এরূপভাবে পালন করিতে লাগিলেন যে যেন তিনি পুরুষানুক্রমে ঐ সেই রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার দানের সীমা ছিল না কিন্তু দানেও তাঁহার আত্মইচ্ছা প্রকাশ পাইত। তিনি অন্যের বাক্যে নীত হইতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত ও উচিতকার্য্যে আসক্ত ছিল। ত্যাগশীল মাতৃগুপ্ত প্রচুর দক্ষিণাসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উদ্যোগী হইয়া যখন অবগত হইলেন যে যজ্ঞে বহু পশু হনন করা হইবে অমনি তাঁহার চিত্ত দয়ার্দ্র ও বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি আত্ম-অধিকৃত কাশ্মীরে রাজ আজ্ঞা প্রচারে জীবহত্যা একবারে নিবারিত করিলেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকার্য্যে মাংসের পরিবর্ত্তে মূল্যবান্ স্বর্ণ গুঁড়িকা-সংযুক্ত পিষ্টক প্রদানের ব্যবস্থা হইল। ঈদৃশ ব্যবস্থায় জনসাধারণ অসীম সন্তোষই লাভ করিয়াছিল। গুণবান্ রাজা স্বয়ং সাধারণের দুঃখ কষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সুখান্বেষীদিগের নিকট তিনি মহারাজা বিক্রমাদিত্য অপেক্ষাও সুগম ছিলেন; এবং তাঁহার উদারতা ও দানাধিক্যের জন্য তাঁহার রাজসভায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভা অপেক্ষাও অধিক লোক আকৃষ্ট হইত। তিনি বিশেষভাবে যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া পণ্ডিতগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন।

একদা মেণ্ট নামক জনৈক কবি তাঁহার সভায় স্বরচিত হয়গ্রীববধ নামক নাটক তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। রাজা গ্রন্থখানির পাঠ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত

ভালমন্দ কোন অভিমতই প্রকাশ করিলেন না কিন্তু গ্রন্থ পাঠ সমাপনান্তে মেণ্ট যখন পুঁথিবন্ধনে উপক্রম করিলেন, মাতৃগুপ্ত তৎকালে গ্রন্থরক্ষার জন্য সুবর্ণ পট্ট প্রদান করিয়া কাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, সামান্য আবরণে রক্ষিত হইলে কাব্য সৌন্দর্য্য বহির্গত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায়ই যেন সুবর্ণ আধার প্রদান করা হইল। কবি ভর্ত্তৃমেণ্ট রাজার গুণগ্রাহিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ ভাবে সংকৃত হইলেন। অতুল প্রীতির অতুলনায় সুবর্ণ পট্ট প্রদান যেন অতিরিক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইল।

এইরূপে কবি মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চারি বৎসর আট মাস, উনত্রিশ দিন অতিবাহিত করিলেন, অঞ্জনাতনয় প্রবরসেন তীর্থসলিলে পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কাশ্মীর প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রবরসেন শুনিলেন—মাতৃগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি অসীম বিক্রমে, তাঁহার পৈতৃক রাজ্য কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছে, শ্রবণ মাত্র প্রবরসেন ক্রোধে আত্মহারা হইলেন—রজনীর শিশিরে শিক্ত বৃক্ষপত্র যেমন সূর্য্যোদয়ে প্রখর তপন তেজে অচিরে উষ্ম হইয়া উঠে তদ্রূপ প্রবরসেনের পিতৃশোকজনিত ব্যকুলতা ক্রোধ সম্পাতে তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইল। স্বরাজ্য উদ্ধারের মানসে প্রবরসেন শ্রীপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তথায় অশ্বপাদ নামক এক সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া ফলমূল প্রদানান্তে বলিলেন—হে মহাভাগ! আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বলিয়া দিতেছি। হে সাধক, ভগবান শঙ্কর, তোমাকে কৃতার্থ করিবেন, তুমি যত্নবান হও। এই কথা বলিয়া শৈব সিদ্ধপুরুষ অশ্বপাদ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর প্রবরসেন রাজ্য প্রাপ্তির বাসনায় এক বৎসর তপশ্চরণে শ্রীপর্ব্বতে অতিবাহিত করিলে একদিন স্বয়ং শঙ্করই যেন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস তুমি নিত্য বস্তু মুক্তি না চাহিয়া কেন নশ্বর রাজ্য ভোগ করিতে চাহিতেছ?

ইহার উত্তরে প্রবরসেন ভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—মহাজনের নিকট সামান্য প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা যেরূপ প্রচুর ফল প্রদান করেন স্বয়ং মহাদেব যেমন পিপাসায় জলের মাত্র অভিলাষকে দুগ্ধ সাগর দান করেন মুক্তির প্রার্থনা না করিলেও শঙ্করের কৃপায় তাহা দুর্লভ নহে। আমার অন্তর মুক্তি প্রয়াসী হইলেও মহাদেব কি আমার মর্ম্মভেদী দারুণ অন্তর্ব্বেদনা ও আমার জ্ঞাতিগণের দারুণ অপমান অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

মহাদেবের ঈপ্সিত বর লাভ করিয়া প্রবরসেন কাশ্মীর লাভে সচেষ্ট; এদিকে কাশ্মীরের মন্ত্রীগণ সে সংবাদ অবগত হইয়া প্রবরসেনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহামনা প্রবরসেন মন্ত্রীগণকে মাতৃগুপ্তের অনিষ্ট সাধনে বিরত থাকবার জন্য অনুরোধ করিলেন; বলিলেন,—হে মন্ত্রীগণ, মাতৃগুপ্তের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র ক্রোধ নাই। গর্ব্বিত বিক্রমাদিত্যকে উচ্ছেদ করিতে আমার চিত্ত উদ্যত। কারণ শত্রু হইলেও যাহারা আক্রমণ ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে ক্লেশ দানে কোন পৌরষ? বরং যে ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ—তাহার নির্য্যাতনই শোভা পায়। পদ্ম চন্দ্রোদয় সহ্য করিতে পারে না সুতরাং পদ্মের চন্দ্র অপেক্ষা অপ্রিয় কেহ নাই। হস্তী পদ্ম দলিত করে বলিয়া তাহার দন্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়া কোন্ নীতির কার্য্য? যে ব্যক্তি শক্তিশালী উন্নত সে কখন নিজশক্তি প্রদর্শনের জন্য অযোগ্য পুরুষের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করে না। প্রত্যুত যে তাহার যোগ্য তাহার সমক্ষেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নিজের শৌর্য্য প্রদর্শন করে।

প্রবরসেন আর কাশ্মীরে গমন না করিয়া ত্রিগর্ত্ত দেশ আক্রমণ ও জয় করিলেন। বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রমেই উজ্জয়িনী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই প্রবরসেন শুনিতে পাইলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্য কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বারতা শ্রবণ মাত্রই প্রবরসেন অতিশয় শোকাবিষ্ট হইয়া হেঁট মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নান আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল। বীর হৃদয় শত্রু হইলেও বীরের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। অতঃপর প্রবরসেন শ্রুত হইলেন, বর্ত্তমান কাশ্মীরেশ্বর মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। হয়ত তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ মাতৃগুপ্তকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি কতিপয় প্রহরীসহ মাতৃগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। যথোপযুক্ত অভিবাদনান্তে প্রবরসেন সবিনয়ে মৃদুভাবে মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার রাজ্য ত্যাগের কারণ কি?

মাতৃগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"মহারাজ! যাঁহার অনুগ্রহে আমি কাশ্মীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলাম আজ তিনি স্বর্গে। সূর্য্যকান্ত মণির ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য কাহার প্রভাবে? দিঙ্মণ্ডল দীপ্তিকারী সূর্য্য কিরণ তাহাতে পতিত

হইলে না তাহার গৌরব—সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলে—সৌরকর হইতে সূর্য্যকান্ত বঞ্চিত হইলে উহা সমামান্য প্রস্তর ব্যতীত আর অন্য কি ?"

প্রবরসেন বলিলেন "হে ভূপতি। কেহ কি আপনার কোন অপকার করিয়াছে,—যাহার প্রতীকারে অপারগ হইয়া আপনার সেই প্রভুকে স্মরণ করিয়া অধীর হইতেছেন ?

এই বাক্যে রাজা মাতৃগুপ্ত ক্রোধে উত্তপ্ত হইয়া তাচ্ছিল্যের হাস্যে উত্তর করিলেন—কে আমার অপকার করিতে সাহসী ? আমা-অপেক্ষা কেহ বলশালী হইলেও আমার অপকারে অসমর্থ। যে গুণগ্রাহী রাজা আমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় ভস্মে ঘৃতাহুতি বা অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ রোপণ করেন নাই। যাহারা উপকারীর উপকার স্মরণ করে, যাহারা কৃতজ্ঞতায় অবনত, তাহাদের পক্ষে কি উপকারীর পদানুসরণ করা অস্বাভাবিক ; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সূর্য্যকান্ত-মণি কি নিষ্প্রভ নয় না ? চন্দ্রের তিরোধানে কি চন্দ্রকান্তমণি কান্তিহীন হয় না ? (আমার সৌভাগ্য সূর্য্যের মূল পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্য অন্তর্গত) অতএব এখন আমি শান্তি সুখ লাভের আশায় পুণ্যধাম বারানসীতে গমন করিয়া দ্বিজজনোচিত সর্ব্ব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অভাবে মণিময় দীপের অন্তর্ধানের ন্যায় আমার নয়নে সমস্ত সংসার তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে অতএব আমি মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ভীত হইতেছি। এরূপ অবস্থায় বিষয় ভোগস্পৃহার অস্তিত্ব কিরূপে আমাতে সম্ভব ?

মাতৃগুপ্তের সময়োপযোগী উক্তি শ্রবণ করিয়া ধীর প্রবরসেনও বিস্মিত হইয়া যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন,—হে ভূপাল মাতা বসুমতি সত্যই রত্নপ্রসাবিনী, কেননা তিনি আপনার মত অতি কৃতজ্ঞ মহাত্মা ধার্ম্মিকদিগকে প্রসব করিয়া দীপ্তি প্রাপ্ত ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন ! আমিও সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রশংসাভাজন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। কেন না এই মূর্খ স্থূল বিস্তৃত জগতের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই শ্লাঘ্য ও যোগ্যপাত্র বলিয়া বরণ করিয়া তিনি লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হে ধীর আপনি যদি এই সংসারে আবির্ভাব না হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংসার চিরদিনের মত এই সুউচ্চ কৃতজ্ঞতার আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইত। কৃতজ্ঞতার পথগুলি নিশ্চয়ই বহুদিন রুদ্ধ থাকিত কেন না নীচাশয় ব্যক্তিগণ উপকার প্রাপ্ত হইলে অনুদারতা বশতঃ মনে করে যে এই

ব্যক্তি যে আমার উপকার করিল ইহা আমারই কর্ম্মফল। তাহা না হইলে ইতঃপূর্ব্বেইত ঐ ব্যক্তির অনুগ্রহে আমি ইহা লাভ করিতে সমর্থ হইতাম। অথবা আমার দ্বারা কোন স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই সে আমার এইরূপ উপকার করিয়াছে ; যদ্যপি তাহাই না হইবে কেন তবে সে আমার উপকার করিতে গেল। এ সংসারে কাহারও ত দরিদ্র বন্ধুর অভাব নাই, তাহাকে না সাহায্য করিয়া আমাকে কেন সাহায্য করিবে ? নিজে লোভী অতএব তাহার স্বার্থের জন্যই সে আমার উপকার করিয়াছে।

যাঁহারা অতি গুণসম্পন্ন উদারপ্রকৃতি পুণ্যশীল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কেহ সামান্য উপকার করিলেও সেই সৎক্রিয়ার শতশাখা সমুদ্গত হয়, তাঁহারা এরূপ ভাবেই উপকারকে বৃহৎ বলিয়া মনে করেন। হে গুণগ্রাহি ! আপনিই যথার্থই গুণীগণের অগ্রগণ্য, জ্ঞানীগণও আপনার প্রশংসায় শতমুখ। সদ্ব্যক্তিগণও পরীক্ষিত মণির ন্যায় আপনাকে সমাদর করিয়া থাকেন। অতএব হে মহান্ গুণবান্ ধার্ম্মিক রাজন্ ! আপনি আমাদের প্রতি দয়া করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। এক্ষণে আপনি সিংহাসনকে অলঙ্কৃত করিলে গুণবানের প্রতি আমারও যে পক্ষপাতিত্ব আছে, আমিও যে গুণগ্রাহী ইহা জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া আমাকেও যশস্বী করিবে। হে রাজন্ ! মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনাকে পূর্ব্বে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় যাহা দান করিয়াছিলেন আমিও পুনঃ তাহাই আপনাকে দান করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় আপনার কাশ্মীরকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করুন।

উদার প্রকৃতি রাজা প্রবরসেনের এইরূপ অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতৃগুপ্ত মৃদু হাস্যের সহিত ধীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন 'হে মহারাজ ! নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে যে কয়েকটী বর্ণ উচ্চারণ না করিলে ভাব প্রকাশের উপায়ান্তর নাই আমি কিরূপে মহাশয়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইব, যদিও আমি মনে প্রাণে অনুভব করিতেছি যে আপনার ব্যবহার অকৃত্রিম ঔদার্য্যপূর্ণ তথাপি এক্ষণে আমি যাহা আপনার নিকট নিবেদন করিব হয়ত তাহা বিনীত বলিয়া বিবেচিত নাও, হইতে পারে। সকল ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব অবস্থার হীন ভাব স্মরণ করে এবং বর্ত্তমানের মাহাত্ম্যও মনে মনে অনুভব করে, অতএব আপনার পূর্ব্বকার অবস্থা আপনার অন্তরে নিশ্চয়ই জাগ্রত হইতেছে এবং আমরা উভয়েই উভয়ের মনোভাব অনুভব করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিমোহিত হইতেছি।

তাহা হইলেই, বলুন আমার মত ব্যক্তি একবার মহামতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহেই রাজা হইয়া পুনরায় সেই সম্পদেই পুনঃ আপনার নিকট হইতে ভিক্ষা লইব! কিরূপ করিয়াই বা ঔচিত্যকে এককালে ত্যাগ করিব? মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অসাধারণ ঔদার্য্যকে আমার ন্যায় ব্যক্তি সামান্য ভোগলালসার নিমিত্ত কিরূপে লঘু করিবে! হে নরনাথ, আর এক কথা বিষয় ভোগেই যদি আমার স্পৃহা থাকে তাহা হইলে যতক্ষণ আমার দেহে অভিমান বর্ত্তমান থাকিবে কে সে পর্য্যন্ত আমার সেই ভোগের পথ রোধ করিবে? যে রাজা আমার উপকার করিয়াছেন আমি যদি তাহার প্রত্যুপকার না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার স্বকৃত অপরাধের জন্য আমার দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তিনি এক্ষণে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন তাঁহার মহিমা অটুট রাখিয়া তাহার গরীমায় গৌরবান্বিত হইতে হইলে আমাকে বহু কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এক্ষণে আমি ভোগ লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা প্রকাশ করিব।

ইহা বলিয়া মাতৃগুপ্ত নীরব হইলে ভূপতি প্রবরসেন বলিলেন 'মহাশয়, আপনি যখন কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভোগলালসা ত্যাগে কৃতকল্প আমিও সেই জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই নিবেদন করিতেছি মহাশয় যত দিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আমি এই রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সম্পদ আপনারই ইহা জ্ঞানে স্পর্শ করিব না।

অতঃপর সুকৃত মাতৃগুপ্ত গৈরিকবাস সংগ্রহ পূর্ব্বক বারানসী ক্ষেত্রে গমন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ যতিব্রত অবলম্বন করিলেন। রাজা প্রবরসেনও প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন রাখিয়া সানন্দচিত্তে কাশ্মীরের উৎপন্ন সমস্ত ধন মাতৃগুপ্তকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ মাতৃগুপ্ত স্বয়ং ভিক্ষালব্ধ অন্ন মাত্র গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরের সমুদয় অর্থ বিত্ত প্রার্থী-দিগকে দান করিতেন। তিনি এইরূপে আরও দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

স্ত্রী-শিক্ষা।

—:০:—

মা সরস্বতী, যাঁর পায়ের নূপুরে ছন্দ দিনরাত বাঁধা, বেদ বেদান্ত সহচরীর মতো যাঁর সেবা করে চলেছে, সুর যাঁর হাতের বীণার গুঞ্জন করেই চল্লো কোন দিন বেসুরে বল্লে না, সেই যে দেবী ভারতী তিনি কি পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তো জানার উপায় নেই! কাছেই রয়েছেন যে সকল ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী তাঁদের সবাইকে কেমন শিক্ষা পদ্ধতি ধরে সুশিক্ষিতা করে তোলা হয়েছিল তার হিসেব কতকটা পরিষ্কার—কেউ তাঁরা আশ্রমের মধ্যে কেউ উত্তরা বাসবদত্তা মালবিকা জেবউন্নিসা—এঁদের মতো অন্তঃপুরে থেকে সুশিক্ষা পাচ্ছেন। শিল্প-শাস্ত্রের মধ্যেও দেখা যায় কুমারী অবস্থা থেকেই এক প্রস্থ কলা বিদ্যায় মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তার পরের যুগে,—অর্থাৎ অল্প দিন আগে দেখা যায় স্ত্রী-শিক্ষাটা গৃহিণী-পনা, পতিকে দেবতা বলে পূজা, এমনি কতকগুলো জিনিষে আটকেছে। অত্যন্ত আধুনিক কথা হল মেয়েরা এম-এ, বি-এ পাশ করছে, নবেল পড়ছে, গান গাইছে, বুট পরতে শিখছে, এবং সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে ও খানা খেতে শিখছে, আস্তে আস্তে পর্দ্দা পার্টিতেও যাওয়া আসা করছে।

ছেলেদের বিদ্যা শেখার ধারা বালকের জীবন-তরীটি চাকরী ত পৌঁছে দিয়ে গেল, এবং মেয়েদের শিক্ষা পাশ করা বর জুটিয়ে দিলে তো বহুৎ আচ্ছা! এই ভাবটা মনে রেখেই শিক্ষা দেওয়াচ্ছি আমরা অধিকাংশ ছেলে মেয়েকে; ছেলেকে চাকরী না করে দিলে সংসার চলবে না সুতরাং তার শিক্ষা যদি সেই দিকেই যায় তো তত দুঃখের কারণ নেই, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা এমন দিতে চল্লেম যে পরে সে যে ঘরের গৃহিণী হবে তার কাজ চালানোর পক্ষে সে একেবারেই অক্ষম রইলো শিক্ষার ফলে এবং তাড়াতাড়ি করে বিয়ে দেওয়ার দরুণ জ্ঞান অর্জ্জনের দিকেও তার অনেকখানি ঘাটতি থেকে গেলে তবে তো গোলযোগ!

সন্তান-পালন মেয়েরা আপনি শেখে, ঘরের কাজ তাদের শাশুড়ীর কাছে কুলাগত গঞ্জনা লাঞ্ছনা খেতে খেতে শিখতে হয়, অনেক আগুনে পুড়ে তবে হয় মেয়ে পাকা গিন্নি, এমন কোন

শিক্ষা তাদের কুমারী অবস্থা থেকেই দেওয়া কি চলে না যাতে করে এই আগুনে পোড়া থেকে তারা রক্ষা পায়!

নভেল-পড়া গিন্নি, সে তো ঘরের কাজে আসে না—আসে ঘর সাজাবার কাজে, তেমন শিক্ষা নাই দিলেম মেয়েদের, এর চেয়ে ঢের ভালো শিক্ষা চাই তবে বলবো মেয়েরা যথার্থ সুশিক্ষা পেলে। সংসারের কাজে সব দিক দিয়ে মেয়েটি সুপটু হলে, মন্দই বা কি নাই শিখলো গান বাজনা নভেল পড়া, চায়ের টেবিলে গাল-গল্প করতে শেখা, এমন কি মস্মিস্ত্ব আওড়ানোটা, পতিকে দেবতা বলতে অভ্যাসটাও না হয় নাই হল!

সতী সাবিত্রী ওসব মানুষের মন গড়া আদর্শ, সেই আদর্শে আমাদের স্ত্রীশিক্ষা ঠেকেছিল কি না তা জানতে কারু বাকি নেই, তবে সেগুলো এখনো আদর্শ লোকেই রয়েছে—বাস্তব জগৎ থেকে একটু তফাতে না হলে ওগুলোকে এখনো আদর্শ বলি কেন? সত্যি কথা হল সেকালের পাকা গিন্নি এবং একালের আধপাকা পণ্ডিতানী! এই দুয়ের সামঞ্জস্য যে শিক্ষার দ্বারায় হতে পারে সেটা আস্তে আস্তে আপনি আবিষ্কৃত হবে কিন্তু সে শিক্ষাও দু'চার দিনে মেয়েটিকে সুশিক্ষিতা করে দেবে এ আশা করা ভুল। বারো বছরের কোঠা পেরিয়ে অনেকদিন মেয়েকে অবিবাহিতা না রাখলে সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না কোন কালেই।

বিলাতে মেয়েদের জন্যে মাষ্টার আসে বই পড়া গান বাজনা শেখা ইত্যাদিতে কিন্তু তার আগে বাপ-মায়ে তাকে সুশিক্ষা দেয় অনেকখানি, এই গৃহ-শিক্ষা কোথায় হচ্ছে আমাদের মেয়েদের? বাপ-মা নিজে যেখানে অশিক্ষিত সেখানে ছেলে-মেয়েও অজ্ঞ, এ তো জানা কথা। আমরা নিজেদের শেখাবো যেদিন সেইদিন ছেলে-মেয়েদেরও কেমন করে শেখাতে হবে, কি বা শেখাতে হবে তা সহজেই বুঝবো। হয় তো বা তখন দেখবো বালিকা বিদ্যালয় বলে একটি বাজে জিনিষ দরকারই নেই, ঘরই যথেষ্ট মেয়েদের সুশিক্ষা দিবে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্র সদনে।

—:o:—

১৯শে আগষ্ট রবিবার সকালে রবীন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়ীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং বর্ত্তমানে দেশের লোকের মনে যে সব প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জেনে আসি।

কবি বল্লেন কিছুদিন রোগে ভুগে তাঁর স্বাস্থ্য অনেকটা ভেঙে পড়েছে। আমিও দেখলাম তিনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন কিন্তু দেহটা যদিও শুকিয়েছে মনটা কিন্তু একটুকুও সজীবতা হারায়নি।

কিছুদিন অবধি তাঁর রাজনীতিক মত সাধারণের নিকট তিনি প্রকাশ করেননি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি বিশেষ মন দিয়ে বিচার করছেন এবং সমস্যার সমাধানকল্পে গভীর চিন্তা নিয়োগ করছেন। আজকার দিনের কতগুলি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে তিনি পরম আগ্রহভরে আলোচনা করলেন এবং সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাব তিনি প্রকাশ করলেন, তা তাঁর অন্তরের আবেগে ভরপুর।

সেদিন তাঁর কাছে যা আমি শুনে এসেছি, তা সাধারণে প্রকাশ করবার অনুমতি আমি তাঁর কাছে চাইনি তবুও নিজের দায়িত্বে আমি তা প্রকাশ করছি, কেননা আমি বিশ্বাস করি যে কবির কথা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। তিনি যে শুধু সূক্ষ্ম বিচারে পারদর্শী তাহাই নয়—দলাদলির বাইরে নিভৃত থেকে তিনি দেশের অবস্থা যেমন স্থিরভাবে দেখতে পাচ্ছেন—দলাদলির দ্বন্দ্বে যাঁরা মত্ত হয়েছেন তাঁরা তা পাচ্ছেন না।

গড়ার কাজ—রবীন্দ্র নাথ বল্লেন, আমাদের গোড়া থেকেই সবটা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের নিজেদেরই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। দেশে যে সব সরকারী অনুষ্ঠান রয়েছে, যাতে করে দেশের লোকের উপর সরকারী প্রভুত্বই বেশী করে স্থাপিত হচ্ছে, দেশের

জনসাধারণের মনের ভাব এমন করেই তৈরী করা হচ্ছে যাতে তারা বলতে পারে আমাদের মঙ্গল কামনায় সরকার এত সব কাজ করছেন। সাধারণে অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে লোকের মনের উপর সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

কি করে আমরা তা করতে পারি? তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের কর্ম্মকুশলতা দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠানগুলিকে এমন অকেজো করে ফেলতে হবে, যাতে করে সরকার সেগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

তিনি মোটেও চান না যে, আমাদের সমস্ত উদ্যম নষ্ট করা হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করবারই উদ্দেশ্যে আর সেই জন্য বরাবরই তিনি নিজেদের অনুষ্ঠান গড়বার আগেই সরকারী শিক্ষালয় বা অপর অনুষ্ঠান বয়কটের বিরোধী।

কবি তারপর বল্লেন যে তিনি নবীন কংগ্রেস কর্ম্মীদের গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের কাজ করতে দেখেছে—সত্যিকার স্থায়ী ভাবের গঠন কার্য্য তাঁরা খুবই কম করেছেন। গত কয়েক বছর যাবত যে কাজ হয়েছে তা একেবারেই ভাসা ভাসা তাই এই আন্দোলনও একেবারেই ভাসা ভাসা রকমের হয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা—কবি তারপর বল্লেন, আজ দেশের সর্ব্বত্রই সব চেয়ে প্রবল ভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে হিন্দুমুসলমান মিলন-সমস্যা। তাঁর মনে হয় যে আজো পর্য্যন্ত নেতারা কার্য্যোপযোগী কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কেবল বিলাস-স্বপ্নই থেকে যাবে। কারু কারু মনে হিন্দুমুসলমানের মিলনের এমন একটা অস্পষ্ট ভাব রয়েছে, যাতে করে তাঁরা বলতে পারেন যে, বিদেশী প্রভুত্ব লোপ পেলেই মিলন সম্ভবপর হবে। কবির তেমন বিশ্বাস নেই। তিনি বল্লেন, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক মুসলমান কেন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আভিজাত্য-গর্ব্বিত শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্ব্বল।

মানব স্বভাব আজ যেমন রয়েছে, তাতে করে কবি বিশ্বাস করেন না যে, অবস্থার দাবী নয়, মনের উদারতা দিয়েই মুসলমান আজ হিন্দুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে নেবে!

কবি বল্লেন যে মোপ্লা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু মাত্র এত দুর্ব্বল, এমনি অসহায় ভাবে মুসলমানের দয়ার উপর সে বেঁচে আছে!

"আমি বিশ্বাস করিতে পারি না," কবি বল্লেন যে 'মালাবারে ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার দরুনই তা আর সম্ভবপর হবে না।'

হিন্দুমুসলমানের মিলন অসম্ভব-প্রায় করে তুলছে আর একটি যে প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। মসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্ম্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বনে আর এই ধর্ম্মের বন্ধনই দুনিয়ার এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে আর প্রান্তের মুসলমানের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

"আমি অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করেছি", কবি বল্লেন যে, আফগান বা অপর কোন মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তা'হলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কি না। জবাব তারা যা দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আমি বলছি, মহম্মদ আলির মত লোকেও বলেছেন যে কোন অবস্থায়ই কোন মুসলমান, যে দেশেই তার জন্ম হোক না কেন, অন্য কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াবে না।"

আঙ্গোরায় আজ বিরাট এক মোসলেম-শক্তি প্রবল হয়ে উঠছে। নিখিল-মোসলেম ভাবকে এই অভ্যুদয় অনেকটা শক্তি জুগিয়েছে। এর জন্য আমরা হিন্দুরা ততক্ষণই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ের সাহচার্য্যে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান হয়।

সমস্যার-সমাধান—এ সমস্যার সমাধান হবে না কেবলমাত্র হিন্দু খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে। অমিলের প্রধান একটা কারণ একটা পরম্পরা বর্ত্তমান।

বাইরের প্রলেপে কিছুই হবে না আর এতদিন পর্য্যন্ত কেবল আমরা তাই-ই করে আসছি।

"এই সমস্যা" কবি বল্লেন "মানব মনকে এমন করেই গুলিয়ে দেয় যে, সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, হাত পা ছেড়ে দেবার ভাবই প্রবল হয়ে উঠে।

কবি তারপর একটু হেসে বল্লেন—"আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবল মাত্র তা হলেই সম্ভবপর হয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে উঠে।"

"তারপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন—" একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোন ভাবে যা যায় না। এই-খানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।

ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু'সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি। হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনীতিক অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলিই ক্রমশঃ দুই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে যা আর কোন মতে সম্ভবপর হবে না।

পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে এই ভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।

হিন্দু মহাসভা—হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্র নাথ বল্লেন কেবল মাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।

"কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসলমানরা সন্দেহের চক্ষে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না?"—এ প্রশ্নের

জবাবে কবি বল্লেন—"হাঁ, তা হবে বৈ কি? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করছে এবং এখোনো করচে—আমরা তো কখোনো বাধা দিতে দাঁড়াইনি। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাইলে তারা কেন বাধা দেবে?"

কবি তারপর মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপার সম্বন্ধে বল্লেন—তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ?"

"কিন্তু"—কবি তারপর বল্লেন—হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।

কবি তারপর বল্লেন "আমি আমার জমিদারীতে দেখছি হিন্দু প্রজা কোনরূপ সংস্কারই বরণ করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাচ্ছে।"

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বল্লেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার কারণ হচ্ছে ওই সব সামাজিক ব্যবস্থা।

প্রায় দু ঘণ্টা আলাপ করার পর আমি কবির নিকট বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় দেবার সময় কবি আমায় হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে বল্লেন আর বল্লেন যে দেশের নেতাদের সবখানি মন দিয়ে আজ এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করাই দরকার।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

(২য় দফা)

গত ১৪ই ভাদ্র শুক্রবার বিকাল বেলায় হঠাৎ আর একবার রবিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। বিকেলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করছি এমন সময় স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সেন এসে বল্লেন, চলুন একবার রবিবাবুর বাড়ীতে যাওয়া যাক্। তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই বোলপুর চলে যাবেন, আবার কবে আসবেন ঠিক নেই, একবার মোলাকাত করে আসা যাক্। একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। কারণ আগের বার অরুণবাবু, আমি যাব সে খবরটা রবিবাবুকে দিয়ে রেখেছিলেন। যাঁরা কাজের লোক খবরাখবর না দিয়ে হঠাৎ তাঁদের উপর চড়াও করাটা আমি বরাবরই অপছন্দ করি। কিন্তু অরুণবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি ভরসা দিলেন, যে আমি গেলে রবিবাবু অসন্তুষ্ট হবেন না। যদি হন তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। কাজেই বেরিয়ে পড়লাম।

রবিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। কুশল প্রশ্নে জানলাম তিনি ভালই আছেন। বিজলীতে তাঁর গতবারে Interview বা বেরিয়েছিল তার কথা তুল্লেন যে তা ঠিকই হয়েছে। তবে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে আর দুএকটা কথা বলে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার কত্তে চান। তিনি বল্লেন যে "হিন্দু মহাসভায় পণ্ডিত মালব্যজী মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হিন্দুদের শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক বলেছেন।" আমি তাতে আপত্তি করে বল্লাম যে মালব্যজী ঠিক ও কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন যে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার শক্তি মনুষ্য মাত্রেরই থাকা উচিত, এবং হিন্দুদেরও থাকা উচিত। তবে একথা ঠিক পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে, বিভিন্নস্থানে, অত্যাচার হিন্দুদের উপরই হয়েছে, এবং হিন্দুরা তার প্রতিরোধ কত্তে পারে। এই সব ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অত্যাচার করেছে, একথাটা মালব্যজীর মনে গ্রথিত থাকা অসম্ভব নয়। এবং হিন্দু মহাসভার যে সব উদ্দেশ্যে আবাহন তার অন্যতম হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ কত্তে উদ্বুদ্ধ করা ও শারীরিক শক্তি ও সাহস অর্জ্জনে তাদের প্রবৃত্ত করা। এই হিসেবে হিন্দু মহাসভার হিন্দুদিগের শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের কথা পণ্ডিত মালব্য ও অন্যান্য বক্তারা বা

বলেছিলেন তাতে মুসলমানদের কারো কারো মনে এটা উদয় হওয়া বিচিত্র নয় যে হিন্দু-মহাসভা-আন্দোলন মুসলমান বিদ্বেষে দূষিত।

গায়ের জোর—রবিবাবু বল্লেন যে, গায়ের জোর, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, সকলেরই থাকা উচিত এবং তা অর্জ্জন করবার চেষ্টা মনুষ্য মাত্রেরই করা উচিত। শুধু মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন, সর্ব্বপ্রকার আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়তে পারার শক্তি মানব মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই, শুধু গায়ের বল থাকলে বা তা অর্জ্জনের চেষ্টা করলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না, অর্থাৎ organisation গড়ে ওঠে না।

পঞ্জাবে বা যুক্তপ্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাতুটাতু খায়। কিন্তু হিন্দুই পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই। মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানের এই organising spirit কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্ম্মই তাকে organise করেছে। মুসলমানের ধর্ম্ম সাম্যবাদমূলক। মুসলমানে মুসলমানে যে সহানুভূতি, তার sanction বা বনিয়াদ মুসলমান ধর্ম্মে। হিন্দুর ধর্ম্ম, অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলে বুঝি তা organisaitonএর পরিপন্থী। সাম্যবাদের উপর এ প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন এক বন্ধু সীমান্ত প্রদেশের এক গল্প বলছিলেন। আফ্রিদীরা প্রায়ই সীমান্তের ব্রিটিশ প্রজাদের উপর চড়াও কোরে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে যায়। একবার একটি হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। যে বন্ধু এই গল্প বলেছিলেন তাঁর বাসা এই ঘটনাস্থলের অতি নিকটে ছিল। তিনি দেখলেন যে হিন্দু প্রতিবেশী কেউ মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'ল না, তাতে তিনি একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি রকম? আপনারা যে টুঁ শব্দটি করলেন না। তাতে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "উয়েঃ ত বেনিয়াকা লেড়কী!"

কবি বল্লেন এই ত হিন্দুর mentality, মুসলমান কিন্তু কখনও এ রকম জবাব দেবে না।

অস্পৃশ্যতা দোষ—হিন্দুর অস্পৃশ্যতা বা untouchability শুধু দৈহিক বা physical নয়, তার চেয়ে প্রবল হচ্ছে moral untouchability বাংলাদেশে physical untouchability হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ নেই কিন্তু moral untouchability খুবই আছে। যাতে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সব বর্ণের মধ্যেই আছে।

গান্ধীজী ও মালবীয়জীর ভুল এই হয়েছে যে, তাঁরা মনে করেন—উচ্চ বর্ণের নিম্ন বর্ণ সম্বন্ধে untouchability অর্থাৎ physical untouchability বা দৈহিক অস্পৃশ্যতা দূর করলেই অস্পৃশ্যতা দোষ দূর হবে। অর্থাৎ ডাল পালা কিছু ছাঁট কাট কল্লেই সব ঠিক হয়ে যাবে—সঙ্ঘবদ্ধ বা organised হতে পারবে।" কবি বল্লেন "আমি তা মনে করি নি। হিন্দুদের দুর্ব্বলতার কারণ আরও Fundamental বা মূলগত। হিন্দুসমাজ মানুষের জন্মগত ভেদ করে রেখেছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেওয়া যায় না। জগতে কোনো জাত উন্নতি কর্ত্তে পারে নি যারা পারিবার্শ্বিক অবস্থা বুঝে নিজেদের ধর্ম্মগত বা অভ্যাস-গত আচার ব্যবহার না পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পেরেছে। কবে মনুসংহিতায় সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করে গিয়েছে আর যতই অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক না কেন তাই আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে হবে, এ বিশ্বাস না বদলালে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য সব জাতেরই কতকগুলি সংস্কার আছে এবং সংস্কার-গত আচার ব্যবহার আছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখানো যায় না। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সংস্কার ও আচার ব্যবহার উন্নতির পরিপন্থী তা ত্যাগ করতে পেরেছে। জগতে আমরা অর্থাৎ কেবল হিন্দুরাই তা ত্যাগ কর্ত্তে পারি। তাই আমরা মানুষে মানুষে জন্মগত বা অনৈসর্গিক প্রভেদ, যা হয় ত কোনো কালে, কোনোও উপযুক্ত কারণে বা নিষ্কারণে করা হয়েছিল, তা এখনও বজায় রাখতে চাই। বাস্তবিক ভগবান মানুষে মানুষে এমন কোন ভেদ করে দেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সত্য সম্বন্ধ তার ব্যতিক্রম কোরে কখনও সত্যিকার মিলন গড়ে উঠতে পারে না।

হিন্দু মহাসভা—কবি বল্লেন যে "হিন্দু মহাসভা যদি হিন্দু সমাজের কীট স্বরূপ, Physical ও Moral untouchability দূর কর্ত্তে পাত্তেন তা হলে, মুসলমানরা চটে গেলেও, কাজের মত এক কাজ হোতো। কিন্তু ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এই যে হিন্দু মহাসভা তার কিছু কর্ত্তে পাল্লে না। হিন্দু যেখানেই ছিল সেখানেই থাকলো এক পদও অগ্রসর হোলো না অথচ মুসলমানদের চটিয়ে দেওয়া হোলো। এখন যেখানে কুস্তির আখড়া হবে—মুসলমান অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বলবে, ঐ দেখ হিন্দুরা আমাদের মারবার জন্য গায় জোর কচ্ছে।

হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ত্তে হলে তাদের মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করে জোর কর্ত্তে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঘরের গলদ দূর কর্ত্তে পাল্লে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা (Physical ও moral) দোষ আছে তা নিরাকরণ কর্ত্তে পাল্লে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা কল্লে কিছু হবে না, মুসলমানও হিন্দুদের দেখা-দেখি গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা কর্ত্তে পারে। এ রকম চেষ্টা ও Counter চেষ্টা কেবল এক vicious circle ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল হবে কি? কবি বল্লেন যে "শরীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জ্জন করা দরকার সেত চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দ্দেশ করে তাই উৎপাটন করার চেষ্টাই হচ্ছে গোড়ার কথা।"

(৩য় দফা)

পল্লী-গঠনে হিন্দু-মুসলমান।

হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীসমাজ কি করে গড়া যেতে পারে, এবং সেই সমবেত চেষ্টার বনিয়াদে হিন্দু-মুসলমানের সত্যিকার মিলন কি করে হতে পারে কবি তাই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বল্লেন যে, এ দেশটা বাস্তবিক হিন্দু-মুসলমান, কারুর নয়। কারণ হিন্দু বা মুসলমান কেউ আমরা এদেশের জন্য বিশেষ কিছু করি নি। শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সবারই প্রেরণা আসে বিদেশীর কাছ থেকে। তারাই ব্যবস্থা করে, আমরা ঘাড় পেতে মেনে নিই। তারা রাস্তাঘাট করে দেয়, আমরা চলি। তারা স্কুল কোরে দেয় আমরা পড়ি; তাদের ম্যালেরিয়া তাড়ানোর প্রতীক্ষায় আমরা বসে থাকি। তারা যদি ভাল পানীয় জল সরবরাহ করে, আমরা পান করে বাঁচি, যদি না করে আমরা লাখে লাখে মরি। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে আমাদের কিছু নেই। যদি তা থাকত, তা হলে প্রত্যক্ষে সেগুলোর জন্য এবং পরোক্ষে দেশের জন্য আমাদের মমতা আসতো।

দেশাত্মবোধ—দেশাত্মবোধ কিসে জাগে? দেশ একটা abstract কিছু নয়।
দেশের শত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উপর মমতা থেকেই দেশাত্মবোধ জাগে। মুসলমানের দেশাত্ম-
বোধ নেই, সে কথা আগের বারেই বলা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরও যে বিশেষ আছে তা নয়।
দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পল্লীগঠনে মন দিতে হবে। যখন
পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় এক বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে
উঠেছে,—তখনই জানবে সত্যকারের দেশাত্মবোধের সূচনা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান
রক্ষা করবার জন্য তখন হিন্দু-মুসলমান আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়বে। কবি বল্লেন,
"সেদিন যে আমি বলেছিলেম, মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না সে কথা
সম্পূর্ণ সত্য নয়। মুসলমানের বাড়ীতে যদি ডাকাত পড়ে এবং সে ডাকাত যদি মুসলমান
হয় তাহা হইলেই কি সে মুসলমান ডাকাতের বিরুদ্ধে হাত তোলে না বা আত্মরক্ষার চেষ্টা
করে না? সেই রকম হিন্দু-মুসলমানের গড়া প্রতিষ্ঠান যদি আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণ-
কারী যদি মুসলমানও হয় তা হলে তা রক্ষা করবার জন্য মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে যুদ্ধ
করতে পরাঙ্মুখ হবে না। এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমানরা এসে যদি ঐ সকল
প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করে, তা হলেও মুসলমান তাকে বাধা দিতে কুণ্ঠিত হবে না। সারা
ভারতের পল্লীতে পল্লীতে যখন এই রকম প্রতিষ্ঠান সব গড়ে উঠবে তখন দেখবে সত্যকার
দেশাত্মবোধ জেগেছে। তখন যদি বহিঃশত্রু—মুসলমান—এসে ভারত আক্রমণ করে
তাহা হলে, মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মিলে তার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়বে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'এটা কি অসম্ভব যে, বহিঃশত্রু মুসলমান এদেশের মুসল-
মানদের বলবে যে এদেশটা জয় করে তোমাদেরই দেওয়া যাবে, হিন্দুদের সঙ্গে কেন
সরিকানে দখল করবে? মুসলমানের কাছে তখন কোন্‌টা বড় বলে বোধ হবে? ধর্ম্মের
টান, না হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য?"

কবি বল্লেন, "অবশ্য সেটা যে একেবারে অসম্ভব তা তিনি বলতে পারেন না।
লোকে ক্রোধান্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। ধর্ম্মান্ধ হয়েও নিজের স্বার্থ বলি দিতে
পারে। তবে আমি বলি এই যে, এই রকম ভাবে ঐক্য গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো

উপায় দেখছি নে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ঐ রকম সঙ্কটকালে মুসলমানের দেশাত্মবোধই জয়লাভ করবে।

স্বাদেশিকতা ও পল্লী-গঠন—আমি প্রশ্ন তুললেম যে, যদি ধরেই নেওয়া যায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টায় সংগঠিত পল্লী প্রতিষ্ঠান, উভয় সম্প্রদায়ের আদরের জিনিস হয়ে থাকবে, তা হলেও এতে যাকে আমরা Nationalism বলি তা কি করে হবে, অর্থাৎ—village patriotism কি করে national patriotism-এ transcend করবে? প্রাচীন ভারতেও তো পল্লী-সমাজ ছিল। পল্লীর লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সকল ব্যবস্থাই করে নিত। কিন্তু তাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা হয় নি এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য সমবেত চেষ্টাও হয় নি। কবি বল্লেন, "আমি যে পল্লী-সংগঠনের কথা বলছি সে isolated পল্লী নয়, পল্লীতে পল্লীতে রীতিমত সংযোগ থাকবে। এক পল্লীর যে জিনিসের অভাব অন্য পল্লী তা পূরণ করবে। প্রাচীন ভারতে যা ছিল সে অন্য রকম, তাতে এক পল্লীর অভাব মোচন হয়ে যা থাকত তা সেই পল্লীতেই ব্যয়িত হ'ত। এক পল্লীর সহিত অন্য পল্লীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু আমি যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি, সে হবে অন্য রকম। কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক organisation হবে এবং সেই organisation আবার বৃহত্তর organisation এর অংশ হবে। প্রত্যেক পল্লীর স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু সে স্বাধীনতার ফলভোগী শুধু সেই পল্লীই হবে না, সব পল্লীই তার অংশ পাবে। একের অভাব অন্যে পূরণ করবে, এই রকম এক সহানুভূতির সূত্রে দেশের সমস্ত পল্লী গ্রথিত হবে। এই প্রকারে Local patriotism থেকে national patriotism-এর স্বাভাবিক বিকাশ হবে। কারণ কোনো এক পল্লীর ক্ষতি হলেই সকল পল্লী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেই রকম এক পল্লীর সম্পদে অন্য পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হবে। সম্পদ আপদের ঐ ঐক্য বোধ থেকেই সঙ্কীর্ণতা দূর হবে এবং যাকে আপনি village patriotisn বলছেন তা national patriotism-এ পরিণত হবে।

সময়ের কথা—আমি বললেম, "কাগজে আপনার এই Scheme বেশ ভালই দেখা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, উৎসাহ উদ্যম ও শক্তি থাকলে ভারতব্যাপী এই রকম মহা অনুষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে সে সব কোথায়? এই বাঙ্গলা দেশের কথাই ধরুন

না কেন। ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। যারা এখনো বেঁচে আছে তারা জীবন্মৃত। এদের দিয়ে আপনি কি মনে করেন যে, এই বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্ভব হবে? সে শক্তি ও সামর্থ্য এদের কোথায়?"

কবি বল্লেন "ওকথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি নে যে, এ কাজ এদেশের লোকের দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় হতে পারে না। আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদেরও অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল ছিল না। তবুও তারা এই রকম অনুষ্ঠান গড়ে তুলেছিল।" আমি বল্লেম "আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বলতে পারিনে, সে দেশের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা হয় হয় কি না তাও জানিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি যে রকম অনুষ্ঠানের কথা বলছেন তা খুব কম জায়গায় করা সম্ভব হবে। এবং অন্যান্য জায়গায় এই সব অনুষ্ঠান কাজে পরিণত করবার বহু পূর্ব্বেই লোক মরে ভূত হয়ে যাবে।"

কবি বল্লেন, 'তা হলে আপনি কি কর্ত্তে চান?'

আমি বল্লেম, "আপনার পল্লী-সংগঠন কাজ কর্ত্তে থাকুন তা ভালই। যতদূর করতে পারেন করুন কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এই বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যতদিন না আমরা হাত কর্ত্তে পাচ্ছি ততদিন আমাদের গঠনমুলক কার্য্য অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের টাকা নিয়ে পুলিশ মিলিটারী সিভিল সার্ভিস ও বিদেশী ব্যবসাদারের পেট মোটা হচ্ছে আর আমরা পেটের জ্বালায় মারা যাচ্ছি। গবর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে এলে ব্যুরোক্রেসির পোষণের জন্য যে টাকাটা যচ্ছে তা আমরা আমাদের নিজেদের মঙ্গলকর বহু প্রয়োজনে ব্যয় কর্ত্তে পারতাম। দেখুন জাপান কত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যে, বাহুবলে জগতের প্রবল পরাক্রান্ত জাতিদের মধ্যে আসন করে নিয়েছে। যদি জাপানের গবর্ণমেণ্ট বিদেশী হত তা হলে কি বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কোন আশা থাকত?"

কবি বল্লেন "এই গবর্ণমেণ্টকে কি করে আপনি হাত করবেন? যা করে আপনি হাত করবেন—violence-ই হোক বা Non-violent Non-Cooperation-ই হোক, সেটা আমি যে ভাবে কাজ কর্ত্তে বলছি তার চেয়ে অনেক শক্ত।

"গবর্ণমেণ্টকে হাত করা যে শক্ত তা সত্যই কিন্তু আপনার প্রোগ্রামে আমার এই আপত্তি যে, প্রথমতঃ খুব কম জায়গাতেই এটা কার্য্যে পরিণত করা যাবে, এবং দ্বিতীয়তঃ যে সব বাঁধা বিঘ্ন বিপত্তি আছে বা উপস্থিত হবে তাতে কাজ বড় বেশীদূর এগুবে না, আর তৃতীয়তঃ সেটা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ যে, তার পূর্ব্বে এই মরনোন্মুখ জাতির আরও সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হবে। আয়র্ল্যাণ্ডেও, আপনি জানেন যে, শুধু অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কো অপারেটিভ Organisation-এ স্বাধীনতা আসে নি। স্বাধীনতার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন কর্ত্তে হইয়াছিল।"

কবি বল্লেন, "আমি বলছিনে যে, Government হাত করবার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করবার দরকার নেই। আমি বলি এই যে, সে চেষ্টাও হতে থাকুক এবং যাদের temperament আমার মত তাঁরা আমার প্রণালী অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা দেখুন।"

আমি বল্লেম, "তথাস্তু; এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।"

এইরূপ বোঝাপড়া হবার পর কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেম।

শ্রীমৃণালকান্তি বসু।

কলাবিদ্যা ও বস্তু-তান্ত্রিকতা।

শৈব-তন্ত্র মতে কলাবিদ্যা ৬৪টী। সে হিসাবে ইহার denotation—অর্থাৎ ব্যাপ্তি প্রসারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগই ধরা পড়ে। চিত্রাঙ্কন, কাব্য-রচনা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, ইত্যাদিই শুধু তান্ত্রিক কলাবিদ্যা নয় পানসাজা, চুলবাঁধা, গানগাওয়া এমন কি বিছানাপাতা, রন্ধন, বন্ধনও ঐ কলাবিদ্যা—চুম্বনও তাই কি না জানি না। জানিবার প্রয়োজনও কম কারণ আমরা ঐ উনকোটী অত শত কলার লীলা নাচাইয়া

দেখাইবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। এখানে আমরা বলিব কলার মৌলিক সত্তা,—যাহা তাহার মর্ম্মের ধর্ম্ম ও বাণী তাহারই কথা—কলা শিল্প বা আর্টের কথাই আমাদের প্রধান আলোচ্য আর তাহার সহিত বস্তু তন্ত্রের সম্বন্ধ কি সেই প্রসঙ্গে তাহাও নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আর্ট হইতেছে অন্তরের উপলব্ধিতে পাওয়া একটী ঋতম্ যাহা সত্যম সুন্দরম্—নিপুণ ভঙ্গিমায় তাহাকে আকার দিয়া রূপের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা। আর্ট একটা বৈচিত্র্য রেখা বিন্যাসের শিল্প কারু;—প্রকাশের রুচির চারু লাঞ্ছনায় সত্যের সুবলিত লীলাভিব্যঞ্জনা। একটী সৃষ্টির কাজ। কিন্তু এই সৃষ্টিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে চাই আবার একটা প্রতীক—একখানা কাঠাম। সেই কাঠাম-কঙ্কালের উপর ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, রস, মজ্জা বসাইয়া আর্ট একটী সত্যম সুন্দরম্ গড়িয়া তুলিবে— তারপর আর্টই আনিয়া দিবে Revelataion দৃষ্টি।

এই দৃষ্টিই বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দিয়া বুঝিতে দেয় জানিতে দেয় সেখানে কি ভাবের স্পন্দন কোন দ্রুত তালে কেমন করিয়া নাচিয়া আর্টের সৃষ্টিটাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। আবার এই কাঠামের উপর অবয়ব গড়িয়া তুলিতে হইলেই অস্থি মজ্জার—মাংস পেশী এ সকলের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণ করিতেছে বস্তু—বিষয়—উপলক্ষ্যের আবয়বী সত্তা। সুতরাং আর্টের সহিত বস্তুর একটা অঙ্গাঙ্গিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে—বস্তু লইয়াই আর্ট শিল্প গড়িয়া তোলে।

এখন তাহা হইলে বস্তু-তান্ত্রিকতাটা কি? আর্ট যখন তাহার সৃষ্টির মূলে যে বস্তুটী প্রকৃতির বক্ষ হইতে যে ভাবে লইয়াছে সেটীকে ঠিক তাহাই রাখে অবিচ্ছিন্ন অসংস্কৃত ভাবে বস্তুর জন্ম, জীবন, মরণের ছেদ ও ক্রমের মধ্যে বিবর্ত্তন নির্দ্দেশক চিহ্নের দিকে তত দৃষ্টি না দিয়া তাহার কোনো অংশ এতটুকুও পরিবর্ত্তন না করিয়া যতখানি সে পুরাপুরি সত্য উপাদান ও উপকরণটীকে একেবারে হুবহু তাই বলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয় তখনই আর্টের সৃষ্টির কলা হইল বস্তু তান্ত্রিকতা। অর্থাৎ আর্টিষ্ট বা শিল্পী যখন আদিম প্রভাতে প্রথম আদমের মূর্ত্তিটী আঁকিয়া ইভের পার্শে দাঁড় করাইতেছেন—তখন তাঁহার তুলিকা সোজা সরল সচ্ছন্দটানে একটা উলঙ্গ মূর্ত্তি বিনা বিচার বিবেচনায় আঁকিয়া তুলিতেছে—নারীর সম্মুখে

উলঙ্গ পুরুষ বলিয়া নীতি বা রুচি বিকারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আদমের অঙ্গে একখানি বসন টানিয়া দিতেছেন না তখনই সে সৃষ্টি হইল বস্তু-তান্ত্রিক। প্রসব ঘরে শিশুর জন্মের সময় মাতৃমূর্ত্তির ছবি আঁকিতে হইলে মার অঙ্গে কসা বডিস পেটীকোট সেমিজ পরাইয়া দিলে—নীতি বজায় থাকিতে পারে কিন্তু আর্ট মাঠে মারা যাইবে। সত্য সেখানে চাপা পড়িবে। যে সত্য উপলব্ধি—যে ঋতম্ শিল্পীকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহা প্রকাশিত হইল না—মিথ্যা লজ্জার আচ্ছাদনে একটা সত্য সুন্দরম্ ঢাকা পড়িয়া রহিল যে সত্যের সৃষ্টিই ছিল—আর্টিষ্টের উদ্দেশ্য মাথা কুটিয়া খুঁজিলেও তাহার সন্ধান আর সেখানে পাওয়া যাইবে না।

তবে কথা হইতেছে—এই দৃষ্ট বস্তুর কোন মতে স্থাপনা করিয়া গেলেই কি আর্টের কাজ শেষ হইল? আর্টের কি আর কোনো কর্ত্তব্যই নাই? আছে। বস্তুকে ঠিক তেমনি করিয়া সোজাসুজি ধরিয়া দেওয়া ফুট করিয়া তোলা তো সাধারণ ফটোগ্রাফ। বস্তুর ঠিক ফটোগ্রাফটা তুলিয়া ধরা আর্টের প্রকৃত উদ্দেশ্যও নয়—কাজও নয়। আর্ট শুধু নগ্ন নারীর অঙ্গের সম্মুখে ফোকাস করিয়া রাসায়নিক ছবি একখানা তুলিয়া লইয়া ক্ষান্ত হইবে না—সে ফুটাইয়া তুলিয়া দেখাইবে তাহারা অন্তরের রহস্যটী,—যে অপরূপ লাঞ্ছনায় ঐ বসনবিহীনতার মধ্যে নারীর নারীত্ব সকল অবয়বের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বোধের মধ্যে সত্য সৃষ্টির চরম সার্থকতাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—সেই নিষ্কলঙ্ক কাজলবিহীন মহিমময় মহত্ত্বটীকে সে নিমন্ত্রণ করিবে সৃষ্টির পুলকের মধ্য দিয়া—শ্রদ্ধার পূর্ণ স্তনখানিকে লালসার নীচ সঙ্কোচতার মধ্যে ডুবাইয়া ধরিবার জন্য আর্ট প্রলোভন সৃষ্টি করিবে না—এ সৃষ্টি ফটোগ্রাফের শিল্পের নয়—প্রকৃত কলার নয়। আবার ফটোগ্রাফও একটা কলা তাহাকেও কিন্তু স্বীকার না করিলে চলিবে না। এই আর্টের পরিচয় আমরা পাইতেছি—রবীন্দ্রনাথের কড়ি কোমলের অনেক কয়টী সনেটে। "স্তনে" কবি বলিতেছেন:—"সুমেরু বটে" "কনক অচল" 'উন্নত সতীর স্তন'—ইত্যাদি—শেষ করিতেছেন স্তনকে এই বলিয়া—

"হের গো কমলাসন-জননী লক্ষ্মীর,
হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।"

* * *

"দেবশিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।" বিদ্যাপতির "কনক কটোরা"—বা চণ্ডীদাসের ঐ রকমের মেরুচূড়ার বর্ণনার সঙ্গে—এ কবিতার তফাৎ—এখানে আর্ট অন্বর্থ—আর সেখানে ফটোগ্রাফ মাত্র।

তনুতেঃ—

"ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।"

বলিয়াই কিন্তু "স্মৃতিতে" বলিতেছেন ঃ—

যেন গো আমার তুমি আত্ম-বিস্মরণ
অনন্ত কালের মোর সুখ, দুঃখ, শোক

*   *   *

তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

সত্যকার আর্ট বলিব তাহাকেই যেখানে বস্তু-তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া একটা অনির্দ্দিষ্টের সুন্দরতম ভঙ্গিমায় অনন্তের অপরিসীম বিকাশ—একটা অপূর্ব্ব দ্যোতনা সে ফুটাইয়া ধরিবে। বিদ্যাপতি যখন বলিতেছেন ;—

"ধনি অলপ বয়সী বালা
জানি গাঁথলি পুহপ মালা
থোরি দরশনে আশা না পুরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা।"

এখানে আর্ট যদি কিছু থাকে সে রচনা-কলার দিক দিয়া বাস্তব সত্য কথনের মধ্য দিয়া কিন্তু আর্টের যাহা আর্ট সে দিক দিয়া নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনবলেন ;—

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি
হতাশ পথিক সেযে আমি সেযে আমি।

সেখানে এই বলিবার ভঙ্গিমটীর মধ্যে আমরা—পাই একটা অপরূপের নির্দ্দেশ ইহার ছন্দের মধ্যে শুনি অন্য একটা অবাঙ্ময় জগতের দিগ্বালচক্রের নীচ রক্ত বরণ অস্ত কিরণের মধ্যে মহিমময়ী পথিক বধূর অন্তর্বেদনার করুণ ধ্বনিটী—সেখানে ঐ বাণীর মধ্য দিয়া আর্ট নিজেই রূপ লইয়া ফুটিয়াছে—ইহার মধ্যে যেন রহিয়াছে একটা immensite বৃহতের বৈচিত্র্যের আভাস। এই বৃহৎকেই আবার বিদ্যাপতিতে পাই ;—ও যখন শুনি ঃ—

"শুন মাধব, রাধা স্বাধীনা ভেল"

অথবা— জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

কিন্তু সেখানেও বৃহৎ—এত বৃহৎ নয় যে আমরা ঐ সঙ্গীতের ধ্বনিতে অসীম মুক্তির ছন্দে শুনিব ; "ক্রুদ্দ তুজাফা"—সকল অসীমের সমবেত ডাক—সেখানে পাইব—সেই মহিমময় অনুভব—

মাত মাজফের আঁবিঁনাৎ
এ দে শেজের্দ্দি সোর—

"তরলিত বাতাসে মাথামাথি—ভগিনী ভগিনীর চুম্বনের" মধ্যে যাহা পাই—"এই" র Eternal beauty wandering on her way র মধ্যে যাহা দেখি।—ইহা পড়িয়া মনে হয় না :—'was it a vision or awaking dream—এমন কি Dido stood—upon the wild sea banks and waved her love to come again to carthage—এতটুকুও বুঝি পাওয়া যায় না—তথাপি এখানে একটা বৃহতের ভাব আছে, তাহা বিরাট না হইতে পারে কিন্তু বিপুল নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কথা হইতেছে সোজাসুজি যাহা বস্তু-তন্ত্র তাহাকে কি কাব্য-জগৎ হইতে নির্ব্বাসন করিতে হইবে ?

"পিঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব।"

চণ্ডীদাসের— গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।

স্নান সারিয়া সে যখন ;—চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর—

তখন কি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিব না ? "গোপন চুমোর জাফরাণি ছোপ" শুধু কি আকাশেই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইব—"ঢল ঢল যৌবন বাঁধা বসনে" রাখিয়া নীল শাড়ীর আড়ালের কিছু মনে করিতেই নাই, সেই কালিদাসের ;—

"শ্রোণিভার দন্সাগমনাকে খবরদার দেখিতে মানা"

কিম্বা—সেই মৃণালসূত্রান্তর মপি অলভ্যম—বক্ষের পার্শ্বের গৌরবকে ঘৃণা করিয়া বসনে মুখ ঢাকিয়া রহিব ? না। তাহা হইলে ত রসসৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইবে। রসধারার নির্ঝর গতি উপলাহত হইয়া মরিবে।

কাব্যসৃষ্টির গোড়ার কথা হইল রস—সৃজন। আর রস যাহা তাহা বিভিন্ন বস্তুর হইতে পারে কিন্তু তাহার উপলব্ধি ভোগের সার্থকতা তাহার আনন্দ একই !

"নলিনী দলগত জলমতি তরলম্
তদ্বজ্জীবনম্ অতিশয় চপলম্।"

ইহা পড়িয়া উপাচার্য্য যে প্রসাদ যে সত্যানুভূতি পাইলেন—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর"—

এ কবিতা পড়িয়া অবিবাহিত তরুণও সেই একই রকমের প্রসাদ ও সার্থকতা বোধ করেন। পরমার্থ সম্ভোগ আর রমণী সম্ভোগের তৃপ্তির মধ্যে রসের দিক দিয়া কোনো প্রভেদ আছে কিনা মাপিয়া দেখান বড়ই কঠিন। আমার তো মনে হয় একটুও প্রভেদ নাই। ঋষি তপস্যায় যে তৃপ্তি পাইতেছেন—ভোগী সম্ভোগে সেই তৃপ্তিই পায়। শ্রুতিও বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না। এই জন্যই বোধ হয় কালিদাস শ্লেষের বিশ থাকিলেও তাঁহার মনের কথাই লিখিয়াছিলেন যে—"নীবিবন্ধ উন্মোচন করিলেই আমি মুক্তি লাভ করি—আমার মুক্তির জন্য অন্য তপস্যার প্রয়োজন নাই।" প্রকৃত পক্ষে রসের প্রবাহ সত্য। অনুভব ও উপলব্ধির মধ্যেই সত্যের অস্তিত্ব। আর্ট সেই সত্যকে প্রকট করে।

ঈশ্বর সাধনায় মুক্তি পাইতে হয় ইহা যেমন সনাতন সত্য—যৌবন আসিয়া অঙ্গে জাগিয়া উঠিলে তরুণীর সঙ্গ লাভের উন্মাদনা, তরুণীকে চাহিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রেম করিবার কৌতূহল সেও তো চিরন্তন সত্যই। সুতরাং এ সত্যটাকে বাদ দিয়া শুধু ঐ এক ঈশ্বরই সত্য—জগৎ মিথ্যা, তাহার যা কিছু সব মিথ্যা এই আদর্শ লইয়া চলিলেই বা সংসারের চলে কেমন করিয়া ?

এই কারণেই কাব্যের স্রষ্টা যাঁহারা কবি, লেখক বা ঔপন্যাসিক তাঁহারা এই দিকটা সত্যের এই লঘুতর মধুময় দিকটা ধরিয়া চলিয়াছেন। শিল্পী বা কবি যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি অন্য একটা সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার গৃহীত ও কথিত সত্যটাকেই যে একমাত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে চান তা তো নয়।

তিনি প্রামাণ করিতে চান সেটাও একটা সত্য এই মাত্র। নীতিবাদী বলিতে পারেন বটে যে কবি তুমি, নারীর রূপ বর্ণনা করিও না কারণ ইহা মদিরা—লালসার নেশা বাড়াইয়া আনিবে কিন্তু কবি কখন বলেন না যে নীতিবাদি,—চুপ কর তোমার উপদেশে আমার কাজ নাই তোমার সত্য নিয়া তুমি সরিয়া যাও। তিনি বলেন হাঁ—তুমিও থাক কিন্তু আমাকেও ঘৃণা করিও না আমারও বাণী আছে—আমারও Message আছে—আমিও সেই এক রস স্বরূপ সত্য সনাতন পরম পুরুষের ভাণ্ডার হইতেই বস্তু ও সত্য আনিয়া রস সৃষ্টি করিতে বসিয়াছি। তপস্যাও তাঁরই ইঙ্গিত প্রেমও তাঁর ভাণ্ডারেরই ধন।

এখন কথা হইতেছে বস্তু-তান্ত্রিকতা বা Realisme এর সত্যিকার অর্থ হইতেছে—জিনিষটী যেমন তাহার আকার যেমন, চোখে যাহাকে যা দেখি স্পর্শ করিয়া যাহাকে যেমন অনুভব পাই ঠিক তেমনি করিয়া বস্তুটী ধরিয়া দেওয়া।

আর আমরা আগে বলিয়াছি—আর্টের কাজ সেইটীকে ঠিক সেইটী করিয়া গড়া। এই আর্টের যিনি আর্টিষ্ট আর্টকে যিনি আর্ট বলিয়াই জানেন—তাহার মধ্যে তিনি নৈতিক বিচার বিবেচনা বিধি নিষেধকে টানিয়া আনিয়া আর্টকে অযথা রুচির ভারে ভারাক্রান্ত করেন না। তিনি আপন মনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সৃষ্টিকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। প্রকৃত শিল্পীর রাজ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ, পাপ অশ্লীলতা ইত্যাদির বিচার নাই। সৃষ্টিকে তিনি

শিবম্ করিয়াই সব কথা গড়িতে চান না—তিনি চান শুধু সুন্দরম্। অভিরাম অপরূপ ব্যঞ্জনায় তাহাকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতে। শিল্পী সেখানে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নীচ, সঙ্কীর্ণতার অতীত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য যাহা তাহা ভোগের বস্তু হইলেও প্রকৃত শিল্পী নীতির দোহাই দিয়া সে বস্তুকে সত্যের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন না। এই জন্যই শিল্পীকে অনেক সময় নিছক চরিত্র অর্থাৎ সোজাসুজি যেমনটি আমাদের চোখে পড়ে ঠিক তেমন করিয়া সেইটি খাঁড়া করিতে হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসি নাট্যকার মোলিয়্যার নাকি নারীচরিত্র লিখিয়া তাঁহার বাড়ীর ধাত্রীকে পড়িয়া শুনাইতেন। সে যেখানে যে-কথাটি বদলাইয়া লিখিতে বলিত—মোলিয়্যার ঠিক তাহাই সেখানে বসাইয়া দিতেন। শ্লীলতা বা অশ্লীলতার তর্ক তুলিয়া চরিত্রটিকে স্ফুট স্বাভাবিকতার মধ্যে যে সত্য আছে তাহাকে নষ্ট করিতেন না। মোলিয়্যারের চরিত্রগুলিতে তাই দেখিতে পাই—একেবারে হুবহু মানুষ—আমাদের চারিপাশে প্রতিদিন যাহাদিগকে দেখি সেই সব লোক—তাহাদের মুখের উচ্চারিত প্রভাত-সন্ধ্যার নিত্য সাবলীল সুখ-দুখের বাণী। মোলিয়্যারের সগানারেল—তার ফাম দো সগানারেল মার্ত্তা—তার স্ত্রী—একেবারে মাটীর সংসারের মানুষ Tere à tere—কাঠুরিয়া সগানারেল। তার স্ত্রী বলিতেছে ;—

"পেস্ত দ্যু ফিফে।"

"তোর মড়া মরুক—শিংএ নিন্সে।"

সগানারেল উত্তর দিতেছে—"পেস্ত দ্য' লা কারোঞ্চ—"

"তুই মর মাগি থান্‌কী।"

রুচিবাগীশ মুখ বাঁকাইতে পারেন—স্বামীস্ত্রীর এই রকম আলাপ কথাবার্ত্তা? কিন্তু আর্ট মৃদু হাসিয়া বলিতেছে—হাঁ—স্বামীস্ত্রীর এই কথাবার্ত্তা। কারণ কাঠুরিয়ার ঘরের কথা আমি বলিতেছি যখন কাঠুরিয়া দম্পতীতে ঘরসংসারের কথা লইয়া বিবাদ লাগিয়াছে। যখন কাঠুরিয়া তার স্ত্রীর নিকট হইতে তার নেশার পয়সা বাহির করিতে চাহিতেছে।

Shekespeare এই নীতিতেই Iago গড়িয়াছেন ওথেলোর—সৃষ্টি করিয়াছেন—বুঝিতে দিয়াছেন যে ওথেলো যাহাই হউক না কেন জন্ম হইয়াছিল তাহার বর্ব্বর মুরের ঘরে। রাফেল ম্যাডোনা আঁকিয়াছেন—কিন্তু তরুণীর ছবি আঁকা কি একেবারে পাপ বলিয়া তাহা

হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন? অবনীন্দ্রনাথের মাতৃমূর্ত্তিও আছে মালিনীও আছে। হাফেজের মুক্তির পাশে আছে ওমর খৈয়মের রক্তরঙীন অঙুর রসের গান—তাঁর—"আয়ু-বিহঙ্গ উড়ে চলে যায়" দেখিয়া তিনি প্রাণের আবেগে ভিক্ষা করিতেছেন। "হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধর।"

শিল্পসূত্রের এই নজীরেই শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী, সাবিত্রী আবার বিন্দু ও গুণী দা। বিনোদ বৌঠানের চুম্বন পিপাসা-কাতর প্রসারিত ওষ্ঠ যুগল রবীন্দ্রনাথ—বিহারীর সম্মুখে ধরিয়াছেন—কারণ তাহা ধরিবার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিধবার কামনাকে কি আর তুমি নিয়মের শাসন দিয়া মানাইয়া থামাইয়া রাখিতে পার—সেযে সত্য। কিন্তু অপরাধ তো কিছু তাতে করেন নাই শিল্পী—বিহারী যে সে ওষ্ঠযুগল—প্রত্যাখ্যান করিল। আবার সেই বিহারীই আশা বৌঠানকে মনে মনে যদিও—কিন্তু ভাল না বাসিয়া যদিও সে মহীনদার বিবাহিতা স্ত্রী—পারিল না,—ইহাও সত্য। বিহারী মহৎ শিক্ষিত, তাই সে তার কামনাকে সংযমে দমাইয়া আনিল কিন্তু বিনোদিনী কিছুটা যেন—প্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃত বলিয়াই সে প্রকৃত যে নয়—তাহা নহে। বরং বিনোদিনীই তুলনায় বেশী প্রকৃত। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত রকম নীতি ঔষধই ব্যবস্থা করুন না কেন—সাহিত্য তাহাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারিবে না। তাঁর তিক্ত অ্যালোপ্যাথি অনেকের কাছে ফলপ্রদ ও অব্যর্থ বলিয়া লাগিবে না—অনেকে হয় ত ইউনানী হাকিমী মতে মিঠা ঔষধে পুষ্ট কুদ্দীস্তানের তুর্কী মেয়ে—কুর্ত্তিপরা গায়—দেখিতে চাহবে—তার আঁট-কাঁচুলির ভাবে বিভোর হইয়া যাইবে। কারণ শুধু নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখরকে লইয়া পৃথিবী নয়, সেখানে শৈবলিনিও আছে প্রতাপও আছে। নাট হামশনের Hungerকে যদি নীতির নিক্তিতে ওজন করিয়া লইতে হয়—তবে নোবেল প্রাইজ পায় কে? জুডারম্যানের Song of songs যদি বিশ্বসাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হয় তবে এ রাজ্যে থাকে কার কি? টলষ্টয়—ঋষি—কিন্তু Realismকে কি তিনি তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন?

সুতরং ইন্দ্রিয়কে চাপিয়া মারিয়া—অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে গেলে শিল্পীর চলিবে না—সাধকের চলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু সাধনাই জগতের একমাত্র সত্য নয়। লেখক

হইতেছেন একাধারে সঙ্গীতবিদ্ চিত্রকর—আর বাণীর স্রষ্টা। তার রচনার মধ্যে সুর, রূপ, অক্ষর তিনেরই সন্ধান পাওয়া চাই। তিনি শুধু তুরীয়ের তীর্থ যাত্রায় শূন্যবিহার করিতে চান যদি—তবে তাঁহাকে নিতান্তই ব্যর্থ হইতে হইবে। তিনি ভোগের মধ্যে দিয়াছেন ত্যাগ আর ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই অতীন্দ্রিয়ের নির্ব্বিকার বিভূতি লাভ করিবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রতীক্ষমানা।

(১)

বিদায় বেলার হতাশ কাঁদন গুম্‌রে মরে
হিয়ার পরে,
হায় গো উদাস পথিক প্রিয় অঝোর ধারায়
নয়ন ঝরে;
কণ্ঠে আমার নাই যে ভাষা মনের বেদন
কইতে নারি—
লুটাই ধূলায় ক্রৌঞ্চী সমান বক্ষে বাজে
আঘাত তারি;
কাল সারথির রথের চাকা ঘর্ঘরি যায়
ধরার বুকে,
বিফল যে মোর সকল পূজা হায় প্রিয়তম
তোমার দুখে!

(২)

বাদ্‌লা হাওয়া লাগায় কাঁপন জাগায় ব্যথা
চিরন্তন,
তড়িৎ শিখায় বজ্র রবে গর্জ্জে মরুৎ
সরিৎ বন;
নীড় হারা মোর মন্-বিহগী অন্তঃ বিহীন
অন্ধকারে—
খুঁজ্‌ছে কেবল আপন সাথী দিগন্তরের
সুদূর পারে;
শঙ্কা-সরস নেইকো আমার নেইকো প্রিয়
মরণ ভয়,
জানি তোমার অমল পরশ কর্‌বে সকল
বাঁধন ক্ষয়!

(৩)

তরুণ হাসির অরুণ আলো লুটিয়ে পড়ে
আঁখির ভায়,
প্রথম চুমোর পরশ কাঁপন শিউরে উঠে
সকল গায়;
আজও রণে অন্তরে মোর কুণ্ঠা কাতর
বিদায় বাণী—
কণ্টকিছে ক্লিষ্ট জীবন স্মৃতির কাঁটায়
বেদন গ্লানি;
শূন্য আমার বাসক শয়ন সঙ্গী বিহীন
দিবস রাতি,
নিমেষ-হারা পথ চেয়ে রই হায় প্রিয়তম
পরাণ-সাথী!

শ্রীসরোজকুমার সেন।

মরণ আড়াল।

—ঃগাঃ—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রলয়ের বিষাণে জাগ্রত একি ব্যবস্থা তোমার। মধ্য পথেই একদম পূর্ণচ্ছেদ—দাঁড়ি। বিন্দুতে মহা-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যুদ্ধ সজ্জার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ। প্রতিহিংসার বাড়বাগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতে না করাইয়া গর্জ্জনেই প্রভঞ্জনের লয়, মহা শত্রু যে,— কারতেই তাহার মহা-নির্ব্বাণের ব্যবস্থা! অসহ্য! এ ব্যবস্থা অসহ্য! যে, যে আমার সুখের পথে কণ্টক—তাহাকে করিতে হইবে জীবনের জীবন্ত মূর্ত্তিমান শনি যে, আমার যাহা কিছু অর্পণ করিতে হইবে তাহার মঙ্গল উদ্দেশে! ক্ষমা! হৃদয় উৎসারিত করিয়া আমার যাহা কিছু অর্পণ করিতে হইবে তাহার মঙ্গল উদ্দেশে! রক্ত অসম্ভব! এত মহৎ আমি নই যে অবতারের গৌরব-লালসায় আমি প্রলুব্ধ হইব! প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির মাংসে গঠিত এ দেহ,—বক্ষের শোণিত এখনো শত্রুর অত্যাচারে, কি কঠোর নির্ম্মম আলোড়নে টক্ বক্ করিয়া ফুটিতেছে,—আর আমি করিব শত্রুকে ক্ষমা! দলিত করিতে চাও আদেশ। অপরাধীকে ক্রোড় দিতে,—প্রশ্রয় দিতে—আরও দলিত করিতে চাও উৎপীড়িতকে! দয়াময় নাকি তুমি? সর্ব্বদর্শী বিচারক নাকি তুমি? এই কি বিচার আদালতের বিচারক একবার মিথ্যা সাক্ষ্যে দিশ হারা হইয়া জেলে পুরিয়াছিল আমাকে—সহ্য হইয়াছে তাহা; আর সর্ব্বদর্শী তুমি—কোন মোহে আত্মহারা হইয়াছ আজ তাহা অপেক্ষাও এ কঠোর—শাস্তির বিধান করিতেছ! মন চাহিতেছে যাহার মুণ্ডলাভ—সেই রাজচন্দ্রকে করিতে হইবে ক্ষমা! প্রতিহিংসার সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া আমার উপরই প্রতিহিংসার বাহস্থা করিয়া রাখিয়াছে দেবতা! ধিক সমাজ, ধিক সংস্কারে, সমাজের বিধানেই না আজ দুরাত্মা রাজচন্দ্র নিভার ন্যায় দেবী-প্রতিমার স্বামী! ঐ এক সর্ব্বকলুষনাশিনী গঙ্গার সম্মিলনে পাপাত্মার সমস্ত দুষ্কার্য্য আমার চক্ষে আজ দোষ আখ্যার অতীত,—রাজচন্দ্র ক্ষমার্হ! মহাশত্রু হইয়াও রক্ষণীয়!

ভাবিয়াছিলাম আপদের শান্তি হইবে সহজেই! আব্বাসই রাজচন্দ্রকে একদিন শেষ করিবে। তাহারই সুব্যবস্থা করিবার জন্যই আরও আগ্রহে এখানে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম,—কিন্তু শেষ—সব শেষ! রাজচন্দ্র অবধ্য! পাষণ্ডের মতি পরিবর্ত্তিত হইবার নয় কিন্তু উহার গতি ফিরাইতে হইবে! নরহরিদা, না, বলিল—'পাষণ্ডের হাত পড়লে যা হয়'—সেই দশা হইয়াছে নিভার, ছেলেটী পর্য্যন্ত তার অনাদৃত! নিভার অদৃষ্টে লেখা ছিল অবশেষে এই!

নিভাকে একবার দেখিবার জন্য মন অধীর হইয়া উঠিল,—এতদিন পরে, এত কাছে আসিয়াও তাকে না দেখিয়া যাইব,—এ সুযোগে দেখা না হইলে এ জীবনে আর দেখা হইবে কিনা কে জানে! যে জীবন আমার—বিপদ পদে পদে!

কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া বলিলাম, "নরহরিদা নিভার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে! কতকাল দেখি নি! বাড়ীতে ওদের আর কে আছে? বুঝ্‌ছই ত সকলেই সামনে আমার দেখা করারও উপায় নেই—অথচ দেখা ত করতেই হবে!'

বৃদ্ধ বলিল "বাড়ীতে ওদের বড় কেউ নেই,—একটা চাকরাণী! কিন্তু এবারে না হয় দেখা না-ই করলে,—বুঝতেই ত পারছ জানাজানিটা সুবিধের হবে না! রাজচন্দ্র তোমার বন্ধু নয়—তার বাড়ী ত......।"

আমি বলিলাম—"হ'ক না তাতে কি,...।" বলিতে যাইতেছিলাম—'রাজচন্দ্র উপস্থিত নাই'—কথাটা ভাবিতেই অন্তরে কে কষাঘাত করিল—অন্যের গৃহে তাহার অনুপস্থির সুযোগ লইয়া উপস্থিত হইব—নিভা যে পর-স্ত্রী! মন দৃঢ় করিলাম—নিভা,—আমার বাল্য সঙ্গিনী স্নেহের নিভা—হক সে পর-স্ত্রী—আমারও যে সংসারের প্রিয়তম বস্তু,—তার সামীপ্য লাভে হইবে আমার অপরাধ!"

একটু থামিয়া বলিলাম—"তাতে কি,—নরহরিদা, নিভার সঙ্গে আমার সাক্ষাতে দোষের কি হতে পারে, আমার নিজের বোন থাকলে কি এ অবস্থায়ও দেখা না করে ফিরতে পারতেম নিভা কি আমার বোনের চেয়ে কোন অংশে কম!"

বৃদ্ধ বলিল—"যা ভাল বোঝ ভাই! আমার ত বড় ভয় হয়,—ভুলে যাচ্ছ কেন রাজচন্দ্রের পূর্ব্বাপর ব্যবহার সে বিপদ আজও কাটে নি!"

বলিলাম—"ভুলিনি নরহরিদা, কিন্তু ভুলে যেতে হবে—এই নিভার জন্যই ভুলে যেতে হবে,—ও যাই করুক, আমি আর ওর অপকারের মধ্যে নাই,—লোকটাকে সুপথে আনতে হবে—নৈলে নিভার যে সুখ নেই!"

"রাজচন্দ্র আসবে সুপথে! নিভার হবে সুখ!"

নিভা এমনি বিপন্ন উপায় নাই,—তাহাকে সুখী করিবার পথ নাই—এ সমাজে অদৃষ্টই প্রবল,—শক্তি যেখানে একবারে শক্তিহীন পরমুখাপেক্ষী সেখানে আবার পুরুষকার! মন দমিলেও নিরাশ হইলাম না। আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ বাধা দিল না। উপস্থিত হইলাম রাজচন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখে। দ্বার ভিতর হইতে বদ্ধ—ডাকিলাম—"কে আছ? নিভা! নিভা!"

দ্বার খুলিতেই দেখি—নিভা! আমাকে প্রণাম করিল,—পায়ে হাত থাকিতেই জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ বিনোদ দা'!"

বলিলাম—"কেমন আছিস্ নিভা। এত কাল পরে চিনতে পেরেছিস্—ভুলিস্ নি তা হলে আমায়!"

নিভা কোন উত্তর দিল না।

বলিলাম "বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস নিভা!"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "হয়ে থাকি ত ভাল কথা! শরীর কি আর চিরদিনই এক রকম থাকবে যাক ও কথা,—তুমি এসেছ কবে,—এখন ত এখানেই থাকবে!"

বুঝিলাম নিভা শুনিতে কি চায়—কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা ত এক কথায় বলিবার নয়,—বুঝাইবারও নয়। বলিলাম—"নিভা—জন্মভূমিতে বাস করবার অদৃষ্ট নিয়ে জন্মিনি বোন—জেনে রাখ, আমি আজও কয়েদী—পলাতক কয়েদী, কেবল তোকে দেখব বলেই এখানে এ অবস্থাতে এসেছি!"

অকম্পিত কণ্ঠে নিভা উত্তর করিল—"দেখা ত হয়েছে—এখন তা হলে আর তোমার আপশোষ নেই,—এখানের কাজও শেষ হয়েছে বোধ হয়—বিনোদ দা!"

কি নির্ম্মম উত্তর—এই কি নিভা! বলিলাম—"আমি আমায় বিরক্ত হয়েছিস নাকি নিভা! তুই আমার কে ভুলে গেলি বোন! আমার যে কেউ নাই নিভা!"

এবারে সে আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মাটিতে বসিয়া পড়িল! "কেন আর সে কথা মনে কর দাদা, যা হবার হয়েছে—ভুলে যাও ভাই! জেনে যাও আমি বেশ আছি—সুখে আছি—আমি সন্তানের মা আমার আর অভাব কি!"

একটু থামিয়া বলিল "আর এখানে অপেক্ষা কর না বিনোদ দা—ওরা এখানে এসেছে,—বাজারে গেছে—কখন বা আবার এসে পড়বে—তা হলেই বিপদ! শত দোষী তোমার চরণে,—ক্ষমা কর দাদা,—ছোট বোনের দোষ নিও না!"

মনে মনে বলিলাম "দোষ নেব তোমার!" বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া বিদায় লইলাম। বিদায় বাক্য উচ্চারণেরও শক্তি হইল না! নিভার সন্তানকে পর্য্যন্ত দেখিবারও ভাগ্য হইল না। রাজচন্দ্র আসিয়াছে—শত্রুর পথ পরিষ্কার করিয়া অন্তর্হিত হইতে হইল আমাকে,—সেই শত্রুই আমার রক্ষণীয়!

বিদায় কালে কর্ণে আসিল, চাপা ক্রন্দনের দীর্ঘশ্বাস কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা। সহ্য হয় না আর! দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক!

নিভা তোরই স্নেহের হ'ক জয়।

ক্রমশঃ

শ্রী—